সর্বকালের সেরা ৫০ গল্প

শক্তিপদ রাজগুরু

সর্বকালের সেরা ৫০ গল্প

শক্তিপদ রাজগুরু

যূথিকা বুক স্টল
১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কোলকাতা- ৭০০ ০৭৩

SARBAKALYER SERA PANCHASH GALPA by Saktipada Rajguru, & Published by Satyaban Roy, 6, Bankim Chatterjee Street, Kolkata - 700073

Rs. 250.00

প্রচ্ছদ : তাপস সরকার

সত্যবান রায় কর্তৃক সত্যনারায়ণ প্রকাশন, ৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট থেকে প্রকাশিত এবং
নিউ বঙ্গশ্রী প্রেস, ১২/২, মদন মিত্র লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৬ থেকে মুদ্রিত
অক্ষরবিন্যাস : অ্যাডওয়েভ কমিউনিকেশন

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র : যূথিকা বুক স্টল, ১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট

দাম : ২৫০ টাকা

সূচীপত্র

স্বীকৃতি

অনিমেষ আর কমলা চায়, তাদের একমাত্র মেয়ে রীণার জন্মদিনের উৎসবটা যেন বেশ ঘটা করেই পালিত হয়, তার জন্য ওরা আয়োজনও শুরু করেছে। অনিমেষ একজন সাংবাদিক হিসাবে তার জীবন শুরু করেছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির কৃতী ছাত্র সে। নিজের পড়াশোনা ছাড়া কলেজে পড়ার সময় থেকেই সাহিত্য ও সাংবাদিকতার দিকে তার ঝোঁক ছিল। বেশ কয়েকটা নামী পত্র-পত্রিকায় লেখালেখিও করেছে। তখন থেকেই অনিমেষের নজর ছিল সাংবাদিকতার দিকে। সাংবাদিকরা সমাজ-এর অনেক অন্যায়-অবিচারের কথা জনসমক্ষে তুলে ধরতে পারে আবার জনমত গড়ার জন্য কাজও করতে পারে। তাই অনিমেষ বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া শেষ করে একটা নামী সংবাদ পত্রিকায় যোগ দেয়।

কয়েক বছরের মধ্যে সেই পত্রিকার অফিসের বিশিষ্ট কর্মীদের আস্থাভাজন হয়ে ওঠে। ধীরে ধীরে সে একজন বিশিষ্ট সাংবাদিক হিসাবে প্রতিষ্ঠা পায় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে বিশেষজ্ঞ হয়ে ওঠে। তাই অফিসে তার দায়িত্ব অনেক বেড়ে গেছে। আজকাল বেশির ভাগ সময় তাকে দিল্লিতে থাকতে হয়। সেখানে কেন্দ্রের মন্ত্রী থেকে সচিব ছাড়াও সর্বভারতীয় রাজনৈতিক দলের কর্তাদের আস্তানা। রাজনীতির নানা গোপন খেলা চলে সেখানে। দেশ-বিদেশের নানা পত্র-পত্রিকাও সেখানে সে সহজে পেয়ে যায়। সেই সঙ্গে নজর রাখতে হয় আন্তর্জাতিক রাজনীতির ঘটনাপ্রবাহের দিকে। তাই অনিমেষ খুবই কর্মব্যস্ত। তবে ক'দিনের জন্য সে এখন কলকাতার বাড়িতে এসেছে।

অনিমেষ তার মেয়ে রীণার জন্মদিন বেশ ধুমধাম করে পালন করে। বাবা এসেছে বলে রীণাও খুব খুশি। বাবাকে সে এখন অনেকটা সময় কাছে পায়। রীণা যখন ছোট ছিল তখন অনিমেষ কলকাতার অফিসে কাজ করত। তাই বাবার সান্নিধ্যটা তখন পেতে পারত। রীণা এখন বড় হয়েছে। স্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে কলেজে পড়ছে।

অনিমেষেরও পদোন্নতি হয়েছে। সে এখন দিল্লি অফিসের চার্জে। দিল্লিতেই থাকতে হয় তাকে। স্ত্রী কমলা রীণাকে নিয়ে কলকাতাতেই রয়ে গেছে। কারণ, রীণার মা কমলা একটা স্কুলের শিক্ষিকা। কমলা উচ্চশিক্ষিতা—রুচিবান মহিলা। ছাত্রীমহলে বেশ জনপ্রিয়। কমলা উচ্চশিক্ষিতা-আধুনিকা হলেও বেশ সহজ সরল ধরনের। উৎকট আধুনিকতা তার ভালো লাগে না। বেশ সাদাসিধে সে। আর ঘরোয়া। বাড়িতে নিয়মিত পূজা-আচ্চা করে। কমলা বলে, আধুনিক প্রযুক্তি, আধুনিক বিজ্ঞানের দিকটার সঙ্গেও আমাদের সকলকে পরিচিত থাকতে হবে। আজকের সভ্যতার ভালো দিকটা নিশ্চয়ই নেবে, কিন্তু তার উচ্ছৃঙ্খলতা অর্থাৎ খারাপ দিকটা নেবে না।

রীণা কলেজে পড়ে। সে চোখের সামনে দেখছে আজকের ছাত্র-ছাত্রীদের উচ্ছৃঙ্খল আচরণ, অবাধ মেলামেশা। অথচ সে দেখেছে কলেজের মধ্যেই এই সব আচরণ ছাত্র-ছাত্রীদের নিজেদের মধ্যের সুন্দর সম্পর্ক-গুলোকে কেমনভাবে তিক্ত করে তোলে। রীণা এসব থেকে দূরে থাকতে চায়। বাবাকে সে-কথা বলেও সে।

অনিমেষ বলে, Ok, তুই গ্র্যাজুয়েশন কর—তারপর তোকে দিল্লিতে জওহরলাল নেহেরু ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি করে দেব। নিজের কেরিয়ার যদি ঠিকঠাকভাবে গড়তে চাস তাহলে তোকে রাজধানীতে যেতেই হবে। কলকাতার একটা লিমিটেশন আছে—সেদিক থেকে দিল্লিই এখন অনেক ভালো।

তাই রীণা দিল্লিতে গিয়ে পড়ার স্বপ্ন দেখে। কলেজে এর মধ্যে অবশ্য রীণার দু-চারজন বন্ধু-বান্ধবী জুটে গেছে। ছেলেদের মধ্যে বিকাশ সেনকে কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা একডাকে চেনে। একজন নামী শিল্পপতির ছেলে সে। তার বাবার বড় কারখানা আছে কলকাতায়। দিল্লির কাছে গাজিয়াবাদে নতুন ফ্যাক্টরি তৈরি করেছেন। দিল্লির অভিজাত এলাকায় তাদের বাংলো। ওর ঠাকুর্দা ছিলেন দিল্লির সেক্রেটেরিয়াল স্টাফ। তখন থেকেই ওদের দিল্লিতে বসবাস। তাদের সিমেন্ট-এর ব্যবসা। বিকাশ কলেজে আসে একটা বড় গাড়ি হাঁকিয়ে। কলেজ ক্যান্টিনে দেদার খরচ করে বন্ধুদের জন্য। এই কলেজের ইউনিয়নের নেতা হয়ে উঠেছে সে। কলেজের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের পাণ্ডা সে।

রীণা ভালো গান গায়। কলেজের প্রায় সব অনুষ্ঠানেই তার গান থাকে। সেই সুবাদে বিকাশের সঙ্গে তার পরিচয়। বিকাশও এই সুন্দরী বুদ্ধিমতী মেয়েটার দিকে আকৃষ্ট হয়। বাসবী রীণাকে বলে, কিরে তোদের সেই রাজপুত্তুর বিকাশ সেন যে দেখি খুব এগোচ্ছে তোর দিকে।

রীণা হাসে। সে এসব ব্যাপারে তেমন গুরুত্ব দেয় না। বলে, তোরাও তো এক ঘটিতে জল খাস, তোদের বেলায় দোষ হয় না?

তবে রীণা লক্ষ করেছে শুধু বিকাশই নয়—আরও কয়েকজন তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে চায়। তাদের মধ্যে অর্কর কথা তার বিশেষভাবে মনে পড়ে। এমনিতে খুব সাদামাটা টাইপের ছেলে অর্ক। বিকাশের মতো আর্থিক স্বচ্ছলতা তার নেই। খুবই সাধারণ ঘরের ছেলে সে। তবে পড়াশোনায় অর্ক খুবই ভালো। কলেজের সেরা ছাত্রদের একজন সে। রীণা দেখেছে তাকে ক্লাসে মন দিয়ে নোট নিতে। লাইব্রেরিতেও নিয়মিত যায় সে। কলেজের হৈ-চৈ-এর থেকে দূরে থাকে অর্ক। শুধু তাই নয় কলেজের ম্যাগাজিনে তার লেখা কবিতা ছাপা হয়।

রীণা লক্ষ করে অর্ককে। অর্কর চোখে তা এড়ায় না। সেও দেখে সুন্দরী রীণাকে। কলেজের অনুষ্ঠানে রীণার গান শুনে সেদিন বলে, দারুণ গাইলে তুমি। তোমার রবীন্দ্রসঙ্গীত সত্যিই অপূর্ব।

রীণা অবাক হয়ে তাকায় অর্কর দিকে। বলে, তোমার কবিতা আমি পড়েছি। খুব সুন্দর কবিতা লেখ তুমি।

অর্ক তার কবিতার প্রশংসা শুনে রীণাকে বলে, কবিতা ভালো লাগে তোমার?

রীণা মাথা নাড়ে। বলে, হ্যাঁ। নতুন কিছু লিখছো?

অর্ক খুশি হয়ে বলে, লাইব্রেরিতে এসো, নতুন কবিতা শোনাব।

অর্ক বিকেলে লাইব্রেরিতে রীণার জন্য অপেক্ষা করে। রীণা আসে। অর্ক একজন মুগ্ধ শ্রোতা পেয়ে খুশি। সে ঠিক করে, আজ সে রীণাকে ক্যাম্পাসের বাগানে বসে তার লেখা কবিতা শোনাবে।

ওদিকে এ খবর বিকাশ সেনের কাছে পৌঁছে দেবার জন্য ছেলের অভাব হয় না। বিকাশের অনেক অনুচর আছে, তারা ওর পয়সায় ক্যান্টিনে বসে কফি-পকোড়া-সিগারেট খায়। তাদের একজন বিকাশকে বলে, বস, অর্কটা ওদিককার গাছতলায় বসে, রীণাকে প্রেমের কবিতা শোনাচ্ছে।

বিকাশ সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে বলে, শোনাক যত পারে। আরে রজনীগন্ধার চচ্চড়ি আর চাঁদের আলোর সরবত—এতে পেট ভরে না। মেয়েরাও পটে না। আজকালকার মেয়েরা খুব প্র্যাকটিকাল—ওসবে ভুলবে নারে।

বিকাশের মতো অর্থবানরা এমন কথাই ভাবে। রীণার মন অবশ্য এসব দিকে নেই। ভাবেও না কিছু। তাই সে তার জন্মদিনে বিকাশ, সন্ধ্যা, বাসবীদের সঙ্গে অর্ককেও নিমন্ত্রণ করেছে তাদের বাড়িতে।

অনিমেষদের ফ্ল্যাট একটা বিরাট হাউসিং কমপ্লেক্সে। আগে এখানে একটা বড় কারখানা ছিল। কারখানার মধ্যে পুকুর ছিল, কয়েকটা বড় বড় গাছও ছিল। সেই পুকুর, সেই গাছগুলো আজও আছে অতীতের সাক্ষী হিসেবে। এখনও সেই পুকুর, গাছ-গাছালিগুলো যত্ন করে রাখা হয়েছে। আলো দিয়ে সাজিয়ে তুলেছে। ওখানে সেই পুকুরের পাশে তৈরি হয়েছে ওদের কমিউনিটি হল। আজ সেখানে

চলেছে রীণার জন্মদিনের উৎসব। রীণা গান গায় বন্ধুদের সঙ্গে। অনিমেষ, কমলার বন্ধু-বান্ধবও এসেছে। সুন্দর পরিবেশ আরও সুন্দর হয়ে ওঠে।

কমলার সঙ্গে বিকাশ সহ ওর অন্য বন্ধুদের পরিচয় করিয়ে দেয় রীণা। বিকাশ-অর্ক সবাই এসেছে। বিকাশ খুশি হয়। বেশ খানিকক্ষণ গল্প-গুজব, গান-বাজনার পর কমলা অতিথিদের খাবার টেবিলে নিয়ে যায়। কমলা শুনেছে বিকাশের পরিচয়। ওদের ব্যাকগ্রাউন্ডটাও সবাই জানে। জানে কমলাও। কমলা বলে, বিকাশ, মাঝে মাঝে এসো। আমাদের ফ্ল্যাট তো চিনেই গেলে। এলে খুশি হব।

বিকাশ খুশি হয়ে বলে, আসব মাসিমা—আজ আসি।

অনিমেষও দেখেছে রীণার বন্ধুদের। পরিচয়ও হয়েছে। বলে অনিমেষ, সেন এন্টারপ্রাইসের দিল্লিতে তো বড় কারবার আছে।

কমলা বলে হ্যাঁ, বিকাশদের সিমেন্টের কারখানা আছে। কিন্তু ছেলেটাকে দেখলে, কেমন ভদ্র।

অনিমেষ একজন সাংবাদিক। অনেক শিল্পপতিকে দেখেছে সে কাছ থেকে। তাই বলে, ওদের আসল রূপটা যে কী তা সহজে কেউ জানতে পারে না। প্রয়োজন হলে নিজেদের স্বার্থে ওরা খোলস পাল্টে ফেলতে পারে।

কমলা বলে, সাংবাদিকদের এই এক স্বভাব। ওরা কিছুতে খুশি নয়। সব সময় ওরা সব কিছু খুঁটিয়ে জানতে চায়।

অনিমেষ প্রসঙ্গ বদলে বলে, সামনের সপ্তাহেই দিল্লি ফিরতে হবে। কলকাতায় এসে ক'দিন বেশ আনন্দে ছিলাম। দিল্লি ফিরে গিয়ে আবার সেই কাজের মধ্যে পড়তে হবে। দিল্লি বড় কর্মব্যস্ত শহর। আসলে ভারতের রাজধানী তো, একটার পর একটা খবর লেগেই আছে। তার তুলনায় কলকাতা অনেক শান্ত। কাজের চাপও ততো নয়।

পরদিন বিকালের ফ্লাইটে অনিমেষকে দিল্লি ফিরতে হবে। অনিমেষ দিল্লির চিত্তরঞ্জন পার্কে একটা ফ্ল্যাট কিনেছে। সুন্দর এই এলাকায় আগে বেশির ভাগই বাঙালিদের বসবাস ছিল। এখন অবশ্য অনেক কমে গেছে। তবে এখনও এখানে থাকলে মনে হয় যেন কলকাতাতেই আছি। ঘটি-বাঙাল-চাটগাঁয়াদের বাঙলা টানও শোনা যায়। এখানে দুর্গাপুজো-কালীপুজো-সরস্বতী পুজো মায় আসান বিবির পুজোও হয়। বাড়ির মেয়েরা পুজো-পার্বণে এগিয়ে আসে। আবার আবাসনের ছেলে-মেয়েরা একসঙ্গে নাটক করে। সব মিলিয়ে একটা পারিবারিক সম্পর্ক গড়ে তুলেছে নিজেদের মধ্যে।

এখানকার বাসিন্দাদের মধ্যে মধ্যবিত্ত যেমন আছেন তেমন আছেন নামী মানুষজনও। আছেন বড় ব্যবসায়ী থেকে দু-একজন মন্ত্রীও। এছাড়াও বেশ কিছু রাজনৈতিক নেতা, বিশিষ্ট সমাজসেবীও এখানে থাকেন।

ভবতোষ দত্ত-বিপাশা দত্ত তাঁদের মধ্যে অন্যতম। ভবতোষ দত্ত কলকাতার কাছে হুগলি জেলার নামী একজন নেতা। ভবতোষবাবুদের আদি বাড়ি হুগলি জেলার শিয়াখালার ওদিকে একটা গ্রামে। ওঁর পূর্বপুরুষ ছিলেন সেই গ্রামের জমিদার। জমিদার বংশের ছেলে হয়েও ভবতোষবাবু কিন্তু দেশসেবা, সমাজসেবার কাজ বেছে নিয়েছিলেন। তাঁর নিঃস্বার্থ কাজের জন্যই সারা এলাকার মানুষ তাঁকে শ্রদ্ধা করে, ভালোবাসে। স্কুল, রাস্তাঘাট, চিকিৎসা-ব্যবস্থার আমূল সংস্কার করে সেই এলাকার মানুষকে তিনি নানাভাবে সাহায্য করেছেন। ওখানকার কৃষকদের উন্নতির জন্য অনেক পরিকল্পনা নিয়েছেন। তাই ওখানকার মানুষ একজোট হয়ে তাঁকে নির্বাচিত করেছে লোকসভার সদস্য হিসেবে। ভবতোষবাবু রাজনৈতিক মহলে একটি সুপরিচিত নাম। তিনি একজন কর্মব্যস্ত নেতা। দেশ-বিদেশের নানা জায়গায় যেতে হয়। নানা উন্নয়নমূলক কাজের সঙ্গে তিনি যুক্ত। অনেক বড় বড় কমিটিরও তিনি কর্ণধার।

দিল্লিতে থাকার জন্য একটা ফ্ল্যাট কিনেছেন। এখানেই এখন স্ত্রীকে নিয়ে বেশির ভাগ সময় থাকেন। অবশ্য গ্রামের মানুষের সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ রয়েছে। সময় পেলেই গ্রামে যান। গ্রাম থেকেও

অনেকে আসে। তাঁর স্ত্রী বিপাশা শিক্ষিতা সুন্দরী। এক অর্থে স্বামীর যোগ্য স্ত্রী। বিপাশা দত্ত দিল্লি-কলকাতার সাংবাদিকদের কাছে খুবই পরিচিত নাম। বিপাশা বেশ কিছু স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। দিল্লিতে অনেক আন্তর্জাতিক সেবা সংস্থার কমিটিতে আছেন তিনি। দত্ত পরিবারের নাম, পরিচয়, সমৃদ্ধি সবই আছে। দিল্লিতে খুবই জনপ্রিয় তাঁরা। সকলের সঙ্গে মিলে মিশে কাজ করেন। বিপাশা দত্ত খুব ধার্মিক মহিলা। তবে তাঁদের কোনো সন্তান নেই। তাই সারাক্ষণ কাজে ব্যস্ত থাকেন ওঁরা দুজনে নিজেদের কষ্ট ভোলার জন্য সমাজসেবা, দেশসেবার কাজে নিজেদের জড়িয়ে রেখেছেন। চিত্তরঞ্জন পার্কের দুর্গাপুজো—সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান থেকে আরম্ভ করে তাঁদের আবাসনের সামাজিক উৎসবে ভবতোষবাবুরা সক্রিয় ভূমিকা নেন।

অনিমেষের সঙ্গে ভবতোষবাবুর পরিচয় হয়েছিল সাংবাদিকতার সূত্র ধরেই। অনিমেষকে সংবাদ সংগ্রহের জন্য নেতা-মন্ত্রী মহলে ঘোরাফেরা করতে হয়। অনিমেষের দিল্লি অফিসের অন্য রিপোর্টাররাও নানা খবর আনেন। এছাড়া কূটনৈতিক মহলের খবরের জন্য অনিমেষকে অ্যামবাসিগুলোর সঙ্গেও যোগাযোগ রাখতে হয়। বিভিন্ন এন জি ওর মাধ্যমে অনিমেষ জানতে পারে বিপাশা দত্তর নাম। তাঁর সেবাকেন্দ্রের কথা। ভবতোষবাবুর সঙ্গে তার আগেই পরিচয় হয়েছিল। তাঁর স্ত্রী যে বিপাশা দেবী তা সে জানত না। এতদিনে জানতে পারে।

সেদিন দেখা হতেই ভবতোষবাবু বলেন, অনিমেষ, তুমি কেমন সাংবাদিক হে—নেতাদের পেট থেকে গোপন খবর বের করতে হলে তাঁদের মিসেসের সঙ্গে আগে আলাপ জমাবে। দেখবে তাহলেই সব খবর পেয়ে যাচ্ছ।

অনিমেষ বলে, এবার থেকে তাহলে খবরের জন্য আপনার কাছে নয়, বৌদির কাছেই আসব।

ভবতোষবাবু বলেন, অবশ্য বৌদির কাছেও নানা প্রতিষ্ঠানের নানা খবরই পাবে। সাধাসাধি করতে পারলে ভেতরের অনেক গোপন ঘটনাও জেনে যেতে পার, যা তোমার বিশেষ প্রতিবেদনে ছাপতে পারবে।

বিপাশা বলেন, ওসব রাজনৈতিক জগতের গোপন খবর জানতে হলে নেতাদের কাছেই আসবেন, অনিমেষবাবু। মেয়েদের কাজে দু-নম্বরি ব্যাপার-স্যাপার কমই পাবেন। ওটা বেশি করে পুরুষরাই।

ভবতোষবাবু বলেন, অনিমেষ, শুনেছ তোমার বৌদির কথা। পুরুষদের সম্বন্ধে পুরুষ-বিদ্বেষীদের ধারণা এমনই।

দুজনের কথা শুনে হাসে অনিমেষ। অনিমেষ এই পরিবারের সঙ্গে অনেকটাই ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে।

বিপাশা বলেন, অনিমেষবাবু, আপনি তো এখানে একা থাকেন। কলকাতায় কে কে আছে?

অনিমেষ তার স্ত্রী আর একমাত্র মেয়ের কথা বলে। সব শুনে বিপাশা বলেন, তাদের তো দেখিনি।

অনিমেষ বলে, দু-একবার ছুটিতে এসেছে, এবার পুজোয় আসবে। তখন নিশ্চয়ই দেখা হবে। বিপাশা বলেন, ভালোই হবে, পুজোর ক'দিন জমিয়ে গল্প করা যাবে।

কমলাও ঠিক করেছিল, এবার পুজোর সময় মেয়েকে নিয়ে দিল্লিতে যাবে। রীণাও খুশি। কলকাতার একঘেয়ে জীবন থেকে কয়েকদিনের ছুটি পাবে। রীণা বলে, এবার কিন্তু দিল্লি গিয়েই ওখানকার পুজো দেখার পাশাপাশি কুতুব মিনার, রেডফোর্ট, হুমায়ুন টুম্ব থেকে আরম্ভ করে সব দেখব।

পরদিন কলেজে গিয়ে রীণা পুজোর সময় তাদের দিল্লিতে যাবার কথা বলল। বিকাশ থেকে আরম্ভ করে সকলেই সেখানে ছিল। দিল্লিতে বিকাশদেরও বাড়ি। সেও পুজোর সময় দিল্লি যায়। সে খুশি হয়ে বলে, দিল্লির পুজোও কিন্তু কিছু কম নয়। রীণা, এবার আমিও পুজোতে আমাদের বসন্ত বিহারের বাড়িতে থাকব। তোমাদের চিত্তরঞ্জন পার্কেও যাব। তোমার সঙ্গেও দেখা করব। দেখবে দিল্লির বাঙালিরা পুজোর সময় কতরকম অনুষ্ঠান করে। গান, বাজনা, নাটক কিচ্ছু বাদ যায় না। বাংলার কালচারকে তো প্রবাসী বাঙালিরাই ঠিক ঠিক ভাবে এখনও ধরে রেখেছে।

বাসবী বলে, তাহলে দিল্লিতেই যা, কলকাতায় আছিস কেন? অর্ক শুনেছে রীণার কথা। চুপচাপই

থাকে সে। ক্রমশ সে রীণার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। রীণাও ওর কাছ থেকে নোট, সাজেশান নেয়। লাইব্রেরিতে বিকাশরা আসে না। ওরা কলেজে পড়তে আসে না, আসে কোনোমতে ডিগ্রিটা পাবার জন্যই। বিকাশের তো চাকরির কোনো দরকার নেই। পাশ করলেই বাবার ব্যবসাতে বসে যাবে।

কিন্তু অর্ক ওদের দলের নয়। তাকে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দিতে হবে পায়ের তলায় মাটি পেতে হলে। সেইজন্য সে এখন থেকেই তৈরি হচ্ছে। রেজাল্ট তাকে ভালো করতেই হবে। তাই ছুটির পরে সে আসে লাইব্রেরিতে। রীণাও পড়াশোনাতে ভালো। রীণা জানে, অর্ক চায় রীণাও ভালো রেজাল্ট করুক।

রীণাও সেই চেষ্টা করে। বাবা-মাকে সে খুশি করতে চায়। রীণা প্রায়ই লাইব্রেরিতে আসে। অর্কর সঙ্গে পড়াশোনার ব্যাপারে আলোচনা করে।

সেদিন বিকেলে লাইব্রেরিতে যেতেই অর্ক বলে, এবার তাহলে পুজোর সময় থাকছ না এখানে?

রীণা বলে, না। বাবা লিখেছেন দিল্লি যেতে।

অর্ক বলে, যাও, ওখানে তো দেখার মতো অনেক কিছু আছে। তাজমহলও দেখে আসতে পার। আমাকে অবশ্য পড়ে থাকতে হবে এই কলকাতাতেই। কুয়োর ব্যাঙের মতো অবস্থা আর কি!

রীণা অর্কর কথার মধ্যে যেন একটা চাপা বেদনার আভাস পায়। এইটাই বোধহয় আমাদের মতো মধ্যবিত্তদের মানসিক যন্ত্রণা। বিকাশদের তা অজানা। ওরা সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্মেছে। মধ্যবিত্তের লড়াই-এর কথা আর কী জানবে!

পুজোর ছুটিতে দিল্লিতে এসেছে রীণা। এখানে এসে সেও খুশি। দিল্লিতে এখন যে এত গাছ তা সে জানত না। রাস্তা-ঘাটও সুন্দর। ফ্লাইওভারে ভরা। দিল্লিতে বেশ কয়েকটা প্রাচীন দুর্গাপুজো হয় বেশ ঘটা করে। কাশ্মীরি গেট, চিত্তরঞ্জন পার্ক, পুরোনো কালীবাড়ি, করলবাগ, বসন্ত বিহার—আরও বহু অঞ্চলের পুজোর বেশ নাম। নানারকম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও হয়। রীণার গানের কথা কী করে যেন জানতে পেরেছে এখানকার বাঙালিরা। অনিমেষবাবুকে সবাই চেনে। নামকরা সাংবাদিক। তাকেই সকলে ধরে তার মেয়ে রীণাকে বেশ কিছু অনুষ্ঠানে গান গাইতে বলার জন্য। তাদের কথামতো রীণাকে বলতে সেও খুশি হয়েই রাজি হয়।

এমনই একটা অনুষ্ঠানে গান গাইতে গেছে রীণা তার মা-বাবার সঙ্গে। রীণার গান প্রত্যেককে মুগ্ধ করেছে। গান শেষ হয়ে যাবার পর অনিমেষ একজন মহিলার কাছে তাকে নিয়ে গিয়ে বলে, এঁকে প্রণাম কর, রীণা। ইনি তোমার মাসিমা বিপাশা দত্ত। রীণা প্রণাম করে। সঙ্গে সঙ্গে মহিলা রীণাকে কাছে টেনে নেন। উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলেন, দারুণ গাইলে তুমি। কী মিষ্টি তোমার গলা। তোমার কথা তোমার বাবার কাছে অনেক শুনেছি—আজ দেখলাম।

অনিমেষ কমলার সঙ্গে বিপাশার পরিচয় করিয়ে দেয়। অনিমেষ বলে, বৌদি, এই কমলা—আমার মিসেস আর ইনি হলেন বিপাশা দত্ত। আমাদের ভবতোষ দত্তের স্ত্রী। বৌদি কিন্তু একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সমাজসেবিকা।

বিপাশা বলেন, ওসব থাক, আপনাকে আর সব বলে দিতে হবে না। পরিচিত হয়ে নেওয়ার ব্যাপারটা আমাদের মধ্যেই ছেড়ে দিন।

বিপাশা কমলা আর রীণার দিকে তাকিয়ে বলেন, চলো, তোমাদের দিল্লির পুজো দেখাব।

রীণা খুশিতে ঝলমল করে ওঠে। বলে, তাই চলুন মাসিমা, বাবার তো পুজোতেও ছুটি নেই।

বিপাশা বলেন, সে কী অনিমেষবাবু, পুজোর সময়তেও কাজ!

অনিমেষ বলে, পুলিশ আর সাংবাদিকদের ছুটি কোথায়। উৎসবের দিনেই তো তাদের বেশি কাজ।

বিপাশা বলেন, তাহলে এক কাজ করুন। আমি ওদের নিয়ে যাচ্ছি। উনি সকালের বিমানে আমেরিকায় গেছেন।

নিঃসঙ্গ বিপাশার দিন কাটছে একা। এইসময়ে রীণাকে কাছে পেয়ে বিপাশা খুশিই হন। রীণাও সহজভাবে মিশেছে তাঁর সঙ্গে। ক'দিন পরেই অনিমেষ লক্ষ করে সকালবেলাতেই বিপাশার গাড়ি

আসে। ওরা মা-মেয়েতে বের হয়। সারা দিল্লির পুজোমণ্ডপে টহল দিয়ে ফিরবে। বিপাশা দত্ত সুপরিচিতা। সবাই তাঁকে খাতির করে।

সেদিন ওরা গেছে বসন্ত বিহার এলাকার পুজো প্যান্ডেলে। দিল্লির পুজো মণ্ডপগুলোতে কলকাতার ছোঁয়া লেগেছে। যেমন সুন্দর মণ্ডপ তেমনি তার আলোকসজ্জা। বসন্ত বিহারের পুজোর উদ্যোক্তারা বিপাশা দত্ত আসায় খুশি হয়। রীণার পরিচয় পেয়ে তারা তাদের অনুষ্ঠানে গান গাইতে অনুরোধ করে। রীণা গান গায়। এত লোকের মধ্যে হঠাৎ দেখে, সামনে দাঁড়িয়ে তাদের কলেজের বিকাশ সেন।

রীণা অবাক হয়—তুমি! এখানে! বিকাশ বলে, এখানেই তো আমাদের বাড়ি—বলেছিলাম না। বলেছিলাম, দিল্লিতে এলে তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করব। তবে এভাবে তোমার সঙ্গে দেখা হবে ভাবিনি। তারপর চাপা গলায় জিগ্যেস করে, তা বিপাশা দত্তর সঙ্গে তোমার পরিচয় হল কী করে? খাস পি-এম-এর কাছের লোক ওঁরা।

রীণা এ ক'দিনে অবশ্য বুঝেছে বিপাশা দত্তর দিল্লিতে ভালোই প্রভাব। তাই বলে, উনি আমার মাসিমা। তারপর রীণা নিজেই পরিচয় করিয়ে দেয় বিকাশকে বিপাশা দত্তর সঙ্গে। রীণা বলে, কলেজে আমরা একসঙ্গে পড়ি। ওর নাম বিকাশ সেন।

বিকাশ প্রণাম করে কমলা আর বিপাশাকে। কমলা বলে, থাক বাবা। বিকাশ রীণার কাছ থেকে ওদের বাড়ির ঠিকানা জেনে নিয়ে বলে, দেখবে একদিন ঠিক চলে যাব তোমাদের ওখানে।

বিপাশার ডাকে চাইল রীণা। বিপাশা বলেন, চলো রাত হয়েছে। বাড়ি ফিরতে হবে।

বিপাশার বাড়ি এসেছে রীণা আর কমলা। বেশ সুন্দর একটা বাংলো টাইপের বাড়ি। সামনে বাগান। কমলা জেনে অবাক হয়, এত বড় বাড়িতে বিপাশা এখন একা। তাঁদের কোনো ছেলেপুলেও নেই। বিপাশা বলেন, সংসারের কথা ভবতোষকে ভাবতে হয় না। ও ওর কাজ নিয়ে ব্যস্ত। আমিও নানা কাজে সময় কাটাই। অনিমেষকে ফোন করে দিচ্ছি, আজ রাত্তিরে তোমরা এখানেই থাকবে।

সকাল থেকে ওরা বিপাশার কাছে আছে। দুপুরে খাওয়ার সময় বিপাশা নিজে পরিবেশন করেন। রীণা বলে, আর দিও না, মাসিমা—আর কত খাব? ঢের হয়েছে।

স্নেহভরে কমলার দিকে তাকিয়ে হাসেন বিপাশা। বিপাশা-কমলার মধ্যে কোথাও যেন কোনো মিল আছে। অন্যদিন তিনি তাঁর কাজের মধ্যে ডুবে থাকতেন। বাড়িতে মন টিকত না। আর এখন মনে হচ্ছে, তাঁদের বাড়িটা যেন কত জমজমাট। ওঁর নিজের বলে কেউ নেই। স্বামীও থাকেন নিজের কাজ নিয়ে। এখন তো আমেরিকায়।

আজ বিপাশার মনে হয় সন্তান, না থাকা বড় যন্ত্রণার। তাঁদের সংসারে রীণার মতো যদি কেউ থাকত। সেদিক থেকে কমলা অনেক ভাগ্যবতী। সে যা পেয়েছে বিপাশা তা পাননি। পেয়েছেন বিত্ত-বৈভব আর খ্যাতি। রীণার মনে হয়, এ বাড়ি বড় বেশি চুপচাপ। বিপাশার মনে যে একটা চাপা কষ্ট আছে তা বুঝতে রীণার দেরি হয় না। তার মনে হয়, তার মতো একটা মেয়ে থাকলে বিপাশার সব সাধ পূর্ণ হত।

সেদিন সকালে অনিমেষ-রীণা দুজনে বাজার সেরে ফিরছে। তাদের এলাকার মধ্যে বিকাশ তখন ...িয়ে ঢুকছে। রীণাকে দেখে গাড়ি থামিয়ে বিকাশ বলে, চলে এলাম, রীণা। অনিমেষ বলে, চলো আমাদের ফ্ল্যাটে।

বিকাশকে দেখে কমলা বলে, এসো বাবা।

অনিমেষ বলে, তোমরা কথা বলো। আমাকে একবার সাউথ ব্লকে যেতে হবে। পরে দেখা হবে, বিকাশ। সেদিন জমিয়ে গল্প করব।

বিকাশ জমিয়ে বসে। কমলাও এসে যোগ দেয় ওদের আড্ডাতে। বিকাশ বলে, চলুন না, একসঙ্গে আমরা আগ্রা ঘুরে আসি।

রীণা এক পায়ে খাড়া। সে বলে, মা, চলো না। সেই ছোটবেলায় গিয়েছিলাম। ভালো করে মনেও পড়ে না।

কমলা বলে, দেখি তোর বাবাকে বলে।

বিকাশ বলে, তাহলে ওঁকে বলে চলুন একদিন ঘুরে আসি।

সব শুনে অনিমেষ বলে, রীণা এত করে বলছে ওরা দুজনেই যাক। সকালে তাজ এক্সপ্রেসে যাবে, রাত্রে ফিরে আসবে। গাড়িতে না যাওয়াই ভালো।

বিকাশ আর রীণা দুজনে ভোরে দিল্লি থেকে বেরিয়ে তাজ এক্সপ্রেসে এসেছে আগ্রায়। আজ রীণার মনে কী এক বিচিত্র সুর বাজে। ওরা এসেছে আগ্রা ফোর্ট দেখে তাজমহলে। পেছনে বয়ে চলেছে যমুনার জলধারা। ওরা তাজের চত্বরে ঘুরছে। বিকাশ বলে, এখানে এলে সবাই কেমন প্রেমিক হয়ে ওঠে।

রীণা বলে, তাই নাকি, তুমিও কি সম্রাট শাহজাহান হয়ে গেলে? জান তো শাহজাহানের শেষ জীবন কেটেছিল আগ্রার দুর্গে বন্দি হয়ে। দেখে এলে তো সেই মিনারটা আগ্রা ফোর্টে।

বিকাশ বলে, তাহলে আমার শাহজাহান হয়ে কাজ নেই।

হাসে রীণা। প্রেম করবে আর তার জন্য দাম দেবে না!

বিকাশ বলে, না না, প্রেম করে মানুষ আনন্দের জন্য। যেখানে আনন্দ নেই সেখানে আমিও নেই।

রীণা বলে, এটা হল স্বার্থপরের কথা, প্রেমিকের কথা নয়।

বিকাশ বলে, ওসব তর্ক ছাড়ো তো। চলো ওদিকে কটা বিদেশি গাইডের কাছে কিছু শুনছে, আমরাও শুনে নিই।

রীণা বলে, নিজেরা যা দেখেছি তাই ভালো, কে কী বলছে ওসব শুনে কাজ নেই। একটু বোসো—এতক্ষণ ঘুরে পা ব্যাথা করছে। ওরা দুজনে যমুনা নদীর দিকে চাতালে বসে থাকে। রীণার মনে হয় আজও যেন এখানে অশরীরী আত্মা ঘুরে বেড়ায়। সুন্দর এই পরিবেশে মন যেন কেমন উদাস হয়ে যায়। বিকাশ বলে, চলো, বাড়ি ফিরতে হবে। ট্রেনের সময় হয়ে আসছে। দিনটা এত তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যাবে ভাবিনি।

রীণা বিকাশকে বলে, সুখের দিনগুলো খুবই ছোট, তাই তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যায়।

রীণা যেন এভাবেই ঘুরে বেড়াতে চায়। ক'দিন তাই বেশ ঘোরে দিল্লির আনাচে-কানাচে। কারণ, কলকাতায় ফেরার দিন এগিয়ে আসছে।

বিপাশা এই ক'দিন রীণাকে কাছে পেয়ে সব কিছু ভুলেছিলেন। ভবতোষবাবুও বিদেশ থেকে ফিরেছেন।

সেদিন রাত্রে ওরা এসেছে ভবতোষবাবুর সঙ্গে দেখা করতে। অনিমেষ আর ভবতোষবাবু সরকারি কাজকর্ম, রাজনীতির ভালো-মন্দ বিষয় নিয়ে তখন তুলকালাম শুরু করেছেন। তাঁদের সামনে বসে বিপাশা-কমলা রীণার সঙ্গে কথা বলছে। বিপাশা বলেন, কালই চলে যাবে রীণা। ক'দিন বেশ ভালোই কাটল তোমাকে নিয়ে।

রীণা বলে—মাসিমা, এরপরে আমার উৎপাতে অস্থির হয়ে উঠবে দেখো। গ্র্যাজুয়েশান করে আমি দিল্লিতেই চলে আসব। আমার খুব ইচ্ছা আমি জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পোস্ট গ্র্যাজুয়েশান করব। তারপর সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার জন্য তৈরি হব। আর দিল্লিতে থাকলে বুঝতেই পারছ তোমাকে যা জ্বালাতন করব তাতে তুমি অস্থির হয়ে উঠবে।

কমলা বলে, ওর খুব ইচ্ছা এখানেই পড়াশোনা করার।

বিপাশা বলেন, বেশ তো চলে এসো। তোমার ভর্তির ব্যবস্থা হয়ে যাবে। আর এখানে থেকেই পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতে পারবে। মেয়েরা আরও সমাজের কাজে এগিয়ে আসুক। দেখবে কত সুনাম পাবে। হ্যাঁ, কলকাতায় গিয়ে ফোন করবে। মাসিমাকে ভুলে যাবে না তো?

রীণা বলে—না, না। তোমার কথা আমার সব সময় মনে থাকবে। এবার দিল্লি এসে দারুণ কাটল তোমার জন্য, মাসিমা।

রীণা প্রণাম করে বিপাশাকে। বিপাশা রীণাকে কাছে টেনে নেন। তারপরই চমকে ওঠেন। মেয়েটার

দেহের স্পর্শ বিপাশার মনে অদ্ভুত অথচ বিচিত্র একটা অনুভূতি জাগায়। এই অনুরণন তাঁর কাছে নতুন। রীণাকে কাছে পেলে বিপাশার শূন্য মন কী এক পরম পাওয়ার আনন্দে ভরে ওঠে।

রীণারা ফিরছে কলকাতায়। কমলার স্কুলও খুলে গেছে। খুলেছে রীণার কলেজ। তাদের ফাইনাল পরীক্ষা কয়েকমাস পরেই। রীণা জানে তাকে ভালো রেজাল্ট করতেই হবে। তা নাহলে জে. এন. ইউ-তে চান্স পাবে না। তাই রীণা কোনোদিকে না তাকিয়ে শুধু পড়াশোনায় মন দেয়।

বিকাশও ফিরে এসেছে তাদের দিল্লির বাড়ি থেকে। তবে পরীক্ষা নিয়ে ওর বিশেষ মাথাব্যথা নেই। কলেজে এসেই সে তার দলবল নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। পুজো কেমন কাটল তারই আলোচনায় মত্ত সে ক্যান্টিনে। ওদিকের টেবিলে বসেছিল অর্ক। তাকে শুনিয়ে বিকাশ বলে, এবার দিল্লিতে রীণাকে নিয়ে খুব ঘুরেছি। রাজঘাট, শান্তিবন, রেডফোর্ট, আগ্রা কত জায়গায় যে গিয়েছিলাম।

রীণাকে তার বান্ধবীরা বলে, কী দুজনে খুব ঘুরেছিস? তাজমহল দেখেছিস?

সন্ধ্যা বলে, বেশ আছিস তোরা, আমরা পড়ে রইলাম কলকাতায়। যা এগিয়ে যা, উইশ ইউ গুডলাক।

বিকাশ খুশি হয়ে বলে, অনেক ধন্যবাদ। সে দরাজ গলায় অর্ডার দেয়—এই টেবিলে চার প্লেট চিকেন পকোড়া আর কফি—ফটাফট।

পকোড়া আর কফি টেবিলে আসতেও আর এক সঙ্গী বলে, থ্রি চিয়ার্স ফর বিকাশ আর রীণা।

রীণার এসব হৈ-চৈ ভালো লাগে না। চুপচাপ বসে দেখে অর্ককে। অর্ক চুপ করে বসে একমনে একটা বই দেখছিল। বন্ধুদের হৈ-চৈ-এ সে যোগ দেয় না। বিকাশ তখন দিল্লির নানা পুজো-প্যান্ডেলের গল্প করছে।

রীণার সঙ্গে অর্কর আবার দেখা হয় লাইব্রেরিতে। কলেজ প্রায় শূন্য। ক্যাম্পাসের গাছগুলোয় ঘরে ফেরা পাখির কলরব ওঠে। অর্ক বলে, সামনেই তো টেস্ট। বেশ ক'দিন ঘুরে এলে। পরীক্ষার জন্য চিন্তা হচ্ছে?

রীণা বলে, ঠিক ধরেছ তুমি। কী যে হবে?

অর্ক বলে, এখনও সময় আছে। মন দিয়ে পড়াশোনা করলে দেখবে সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি কিছু সাজেশান,নোটস পেয়েছি। কাল তোমাকে দিয়ে দেব।

রীণা অর্কর কাছে কৃতজ্ঞ। সে বোঝে ছেলেটা সত্যিই তাকে সাহায্য করতে চায়। বিকাশের কাছে এসব প্রত্যাশা করা বৃথা। রীণা বলে, তাই দিও, খুব ভালো হবে।

অর্ক বলে, কালই পেয়ে যাবে। আসি—কাল সব নিয়ে আসব।

বিকাশ যেমন সোচ্চার, অর্ক তেমনই নীরব। তবু রীণা অর্কের উপস্থিতি সব সময় অনুভব করে তার জীবনে।

কমলা দেখে, রীণা মন দিয়ে পড়াশোনা শুরু করেছে। রাত জেগেও পড়ছে। তাকে ভালো রেজাল্ট করতেই হবে। সেদিন অনেক রাত হয়ে গেছে, তবু রীণা পড়ছে। তাই দেখে কমলা বলে, এত খাটতে হবে না। বেশি রাত জেগে পড়া ঠিক নয়। শরীর খারাপ হবে। এবার শুতে যা।

রীণা এখানে এসে বিপাশাকে ফোন করে। বিপাশা খুশি হন। বলেন, জে. এন. ইউ-তে পড়তে হবে। তাড়াতাড়ি চলে এসো দিল্লিতে।

রীণাও তাই চায়। কিন্তু—মানুষ যা চায় তা কি আর সব সময় পায়! চায় এক, পায় অন্য কিছু। সব হিসেব আচমকা গোলমাল হয়ে যায়।

ক'দিন থেকে রীণার শরীরটা ভালো নেই। দুর্বলতা বোধ করে, অকারণে ঘাম হয়। সেদিন পড়তে বসে। রাত হয়ে গেছে। কমলা খাতা দেখা শেষ করে শুতে গেছে। হঠাৎ রীণার মাথাটা ঘুরে যায়। সে সামলাতে না পেরে মেঝেতেই পড়ে যায়। ছিটকে পড়ে টেবিল ল্যাম্পটা। ওই শব্দে কমলা ছুটে আসে। মেয়ের কাছে এসে দেখে রীণার জ্ঞান নেই—নাক দিয়ে রক্ত ঝরছে। চিৎকার করে কাজের

লোকদের ডাকে। তারা দুজনে মেঝে থেকে রীণাকে তুলে এনে বিছানায় শুইয়ে দেয়। মুখে-চোখে জল দিতে চোখ মেলে রীণা। নাক দিয়ে রক্ত পড়া বন্ধ হয়। কমলা তার গায়ে হাত দিয়ে দেখে, জ্বর। কমলা বলে, কালই তোকে ডাক্তারবাবুর কাছে নিয়ে যেতে হবে।

রীণা মাকে ব্যস্ত হতে দেখে বলে, তুমি এত ভাবছ কেন, মা? ক'দিন পড়ার চাপে আর ঠান্ডা লেগে এমন হয়েছে, দেখবে সব ঠিক হয়ে যাবে।

কমলা বলে, আমি জানি জ্বর, সর্দি-কাশিতে শরীর খারাপ হয়েছে তোর। তবু একবার চল ডাক্তারবাবুর কাছে। চেক-আপটা একবার করিয়ে নেওয়াই ভালো। সামনেই টেস্ট, তারপর আবার ফাইনাল পরীক্ষা। তোর বাবাও দিল্লিতে। একবার দেখিয়ে নেওয়াই ভালো।

রীণার শরীরটা সত্যিই ভালো যাচ্ছে না। সব সময় একটা দুর্বলতা যেন তাকে ঘিরে থাকে। নাক-মুখ দিয়ে মাঝে মাঝে রক্তও বের হয়। এসব কথা রীণা মা-কে জানায়নি। ভেবেছিল, সব ঠিকঠাক হয়ে যাবে কিন্তু কিছুই হয়নি।

ডাক্তারবাবু সব শুনে, রীণাকে পরীক্ষা করে গম্ভীর হয়ে যান। তিনি বলেন, আমি কয়েকদিনের ওষুধ দিচ্ছি।—জ্বরটা কমে গেলে ওকে আর একবার ভালো করে দেখতে চাই। তাছাড়া বেশ কিছু টেস্টও করা দরকার। এগুলো না করলে ওর ভেতরের রোগটা সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে না।

কমলা বলে, তেমন খারাপ কিছু নয় তো?

ডাক্তারবাবু বলেন, টেস্টগুলো না করিয়ে কিছু বলা যাবে না।

কমলা বলে, তাহলে যা কিছু টেস্ট করাবার দরকার করিয়ে নিন।

ক'দিন পরে ডাক্তারবাবু রীণার রক্ত থেকে আরম্ভ করে বেশ কিছু টেস্ট করালেন। রীণা বাড়ি ফিরে মাকে বলে, আমার কিছুই হয়নি, তোমরা শুধু শুধুই এত টাকা খরচা করছ।

কমলা এর মধ্যে দিল্লিতে খবরও পাঠিয়েছে অনিমেষের কাছে। রীণার অসুখের খবর পেয়ে অনিমেষও ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। এর মধ্যে একদিন অনিমেষ বিপাশাদের বাড়িতে যায়। ভবতোষ দত্তর সঙ্গে তার রীণার অসুখ নিয়ে কথা বলার দরকার। ইতিমধ্যে সে বিপাশাদের বাড়িরই যে একজন হয়ে উঠেছে। তাছাড়া বিপাশার সঙ্গে বেশ কয়েকবার কলকাতা থেকে ফোনে কথাও বলেছে রীণা আর কমলা। বিপাশা আগেই শুনেছিলেন রীণার অসুখের কথা। অনিমেষের কাছে বিপাশা রীণার অসুখের কথা বিস্তারিতভাবে শোনেন। অনিমেষ বলে, হঠাৎ শরীর খারাপ অথচ সামনেই পরীক্ষা।

বিপাশা বলেন, হ্যাঁ, ওর রিপোর্টগুলো দেখে ডাক্তারবাবু কিছু বলেছেন?

অনিমেষ বলে, ভাবছি আমি দু-দিনের জন্য কলকাতায় গিয়ে নিজেও একবার দেখে আসব রীণাকে।

বিপাশা বলেন, তাই যাও অনিমেষ, একা কমলা রয়েছে ওখানে—তোমার এ সময়ে যাওয়াটা উচিত। তুমি গিয়ে রিপোর্টগুলো দেখে ডাক্তারবাবু কী বলেছেন জানিও আমাকে। বিপাশার রীণার জন্য মন কেমন করে। ক'দিনের আলাপ—তবু রীণা যেন তাঁর বড় আপনার হয়ে উঠেছে।

কলকাতায় এসে অনিমেষ রীণাকে দেখে থমকে যায়। অমন হাসি-খুশি মেয়েটা ক'দিনের মধ্যে কেমন যেন বদলে গেছে। সেই চনমনে ভাবটা আর নেই।

রীণারও ভালো লাগে না শুয়ে শুয়ে দিন কাটাতে। কলেজে যেতে পারছে না। কী একটা কঠিন রোগ যে তার শরীরে বাসা বেঁধেছে কে জানে। সবসময় দুঃসহ ক্লান্তি আর দুর্বলতা তার সঙ্গী। মাথা ঘোরে, জ্বর জ্বর ভাব। মাঝে মাঝেই নাক দিয়ে রক্ত পড়ে।

কলেজের বন্ধু-বান্ধবদের দু-এক-জন আসে। বিকাশও আসে। ফুল-ফল নিয়ে আসে বিকাশ। রীণার অবশ্য জ্বর জ্বর ভাবটা কমেনি। দিনের বেলায় রীণা একাই থাকে বাড়িতে। বিকাশ আসে গাড়ি হাঁকিয়ে। মাঝে-মধ্যে কমলার সঙ্গে বিকাশও যায় ডাক্তারের কাছে। রীণার জন্য বিকাশকে ভাবতে দেখে কমলাও খুশি হয়। বিকাশ বলে, রীণার অসুখ নিয়ে এত ভাবছেন কেন? দেখবেন তেমন কিছু নয়। রীণাকে বলে, আরে এত ঘাবড়ে যাচ্ছ কেন? ইট ইজ নাথিং।

বিকাশ রীণাকে সঙ্গ দিতে চায়। হাসি-খুশি রাখতে চায়। রীণাকে হাসানোর চেষ্টা করে। কমলাকে সাহস দেয়। বিকাশের এই স্বভাবটা ভালো লাগে রীণার। বিকাশ চায় রীণা ওর সঙ্গে বের হয়। কিন্তু রীণার তা পছন্দ নয়। কারণ, বিকাশের সঙ্গে বেরুনো মানেই হয় ওর সঙ্গে ক্লাবে যেতে হবে নয়তো ওর বন্ধুদের সঙ্গে হৈ-চৈ করতে হবে। রীণার এসব একদম ভালো লাগে না। কিন্তু কমলার মনে হয় বিকাশ যেন অনেক ভরসা আর আনন্দ বয়ে আনে। তাই রীণাকে বলে, ছেলেটা বড় ভালো রে।

রীণা জবাব দেয় না। সেদিন এসেছে অর্ক। রীণা শুয়ে শুয়ে তার কথাই ভাবছিল। অর্ককে দেখে খুশি হয় রীণা। অর্ক বলে, পরীক্ষার আগে তুমি অসুস্থ হয়ে পড়লে, তাড়াতাড়ি সেরে ওঠো, রীণা। আমি তোমার জন্য বেশ কিছু নোটস এনেছি—এগুলো পড়ো। তোমার অনেক সুবিধা হবে।

রীণার চোখে জল আসে। সে বলে, আমি কি পরীক্ষা দিতে পারব অর্ক?

অর্ক বলে, এত ভেঙে পড়ছ কেন? দেখবে সব ঠিক হয়ে যাবে। তুমি ওসব ভাবনা ছেড়ে পড়াটা চালিয়ে যাও।

তখনই বিকাশ এসে হাজির হয়। অর্ককে দেখে বিকাশ খুশি হয় না। তবু বলে, কী রে অর্ক, কেমন আছিস?

অর্ক বিকাশদের এড়িয়ে চলে। বিকাশের কথার উত্তরে অর্ক বলে, রীণার অসুখের খবর পেয়ে দেখতে এসেছিলাম। চলি রীণা—ভালো থেকো।

অর্ক বের হয়ে যেতে বিকাশ নিজেই রীণাদের কাজের মেয়েকে চা-এর অর্ডার দিয়ে বলে, ওই ভিজে বেড়ালটা ঠিক এসে পড়েছে এখানে? বোধ হয় তোমায় জ্ঞান দিতে এসেছিল?

রীণা জবাব দিল না। বিকাশ বলে, আজ তোমার বাবা আসছেন। গাড়ি এনেছি, চলো এয়ারপোর্টে যাই। তোমায় দেখলে খুশি হবেন। তৈরি হয়ে নাও।

রীণার ঘরে আসতে আসতে বিকাশের কথা কমলার কানে যায়। সে বলে, তাই যা রীণা—বাড়িতে তো শুয়ে আছিস। একটু ঘুরে আয়, ভালো লাগবে। এত করে বলছে বিকাশ।

রীণা বিকাশের সঙ্গে এয়ারপোর্ট যায় মায়ের ইচ্ছাতেই। সে বোঝে মা চায়, সে তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠুক। আগের মতো হয়ে যাক।

অনিমেষ এসে গেছে। এর মধ্যে রীণার সব পরীক্ষার রিপোর্টও এসে যায়। রিপোর্টগুলো নিয়ে অনিমেষ আর কমলা দুজনেই যায় ডাক্তারবাবুর কাছে। কিন্তু রিপোর্টগুলো দেখতে দেখতে খুবই গম্ভীর হয়ে ওঠেন ডাক্তারবাবু। বলেন, অসুখটা খুবই জটিল। রীণার মেরুদণ্ডের মধ্যে রোগটা চেপে বসেছে। ওর বোন-ম্যারো রিপ্লেস করতে হবে। শুধু ওর নিকটতম আত্মীয় মা-বাবা বা ভাই-বোনেরই বোন-ম্যারো নিয়ে রীণার মেরুদণ্ডে প্রতিস্থাপন করতে হবে। আগে এসব দুরারোগ্য মারণব্যাধি ছিল। কোনো চিকিৎসাই ছিল না। এই রোগে মৃত্যু ছিল অবধারিত। এখন চিকিৎসা বিজ্ঞানের অগ্রগতির জন্যে এই অসুখের চিকিৎসা সহজ হয়ে উঠেছে। রোগীরাও বেঁচে যাচ্ছে, সুস্থ হয়ে উঠছে। এসব কেস এখন আর কঠিন নয়। তবে রীণার জন্যে ওর নিকটতম আত্মীয়—মা-বাবা বা ভাই-বোন কারো বোন-ম্যারো চাই। তাহলেই ওকে সারানো যাবে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বোন-ম্যারো রিপ্লেস করতে হবে কিন্তু।

অনিমেষ ভয় পায়। বলে, আমরা দু-একদিনের মধ্যেই জানাচ্ছি আপনাকে। ডাক্তারবাবুর চেম্বার থেকে বেরিয়ে আসে ওরা। কেমন যেন দিশাহারা অবস্থা ওদের। ভেবে ভেবে কূল পায় না। একে তো এত বড় জটিল রোগটার খবর জানাতে পারবে না রীণাকে। তার ওপর ...

কমলা বলে, এখন কী হবে? ডাক্তারের কথা শুনলে তো?

অনিমেষ বলে, এটা তো ওঁর মতামত। ওঁর ভুলও তো হতে পারে। আমার মনে হয় দিল্লিতে নিয়ে গিয়ে রীণাকে বড় হাসপাতালে দেখাই। ওখানে অত্যাধুনিক চিকিৎসাব্যবস্থা আছে। সবার আগে দিল্লির ডাক্তারদের মতামতটা নিতে হবে।

কমলা বলে, তাহলে তো ভালোই হবে। তাই চলো দিল্লিতে। ওখানে বিপাশাদি, ভবতোষবাবুদেরও

সাহায্য পাব। মনে হয় ভালোই হবে। তুমি একবার বিপাশাদিকে ফোন করে দাও। তিনি যদি কিছু করতে পারেন।

অনিমেষ আজ বিষণ্ন। বিপাশা দত্তও দিল্লিতে চিন্তায় আছেন। রীণার অসুখের ব্যাপারটা তাঁকে জানানো দরকার। সে ফোন করে দিল্লিতে। বিপাশা দত্ত মিটিং-এর পর তখন সবে বাংলোয় ফিরেছেন। ফোনটা বেজে ওঠে। বিপাশা তাঁর মোবাইলটা তুলতেই ওদিক থেকে অনিমেষবাবুর গলা ভেসে আসে।

বিপাশা রীণার অসুখের খবর শুনে বলেন, ওকে দিল্লিতেই নিয়ে এসো। এখানে স্পেশালিস্ট দিয়ে ওকে পরীক্ষা করাব, তাদের মতামত নিয়ে যা করার করতে হবে। ওখানে ফেলে রেখো না মেয়েটাকে। যত তাড়াতাড়ি পার ওকে নিয়ে এসো দিল্লিতে।

অনিমেষও বলে, তাই ভালো, আমরা ক'দিনের মধ্যেই দিল্লি যাচ্ছি।

রীণার চোখে জল। মা-বাবা তাকে রোগের ব্যাপারটা বিশদভাবে না বললেও রীণা বুঝতে পারে তার জীবনের মেয়াদ একটু একটু করে কমে আসছে। তবু মনের জোরে সে অসুস্থ অবস্থাতেই টেস্ট পরীক্ষা দিয়েছে নিয়ম রক্ষার জন্য।

রীণাকে দিল্লি নিয়ে যাবার কথা শুনে খুশি হয় বিকাশ। বিকাশ বলে, আরে আগে শরীর, তারপর পড়া। তোমার পাশ না করলেও চলবে। কিন্তু তাকে দিল্লি নিয়ে যাবার কথা শুনে ভেঙে পড়ে রীণা। অনিমেষ বলে, চেক-আপ করিয়েই তোকে কলকাতায় ফেরত পাঠিয়ে দেব, তুই ফাইনাল পরীক্ষা দিতে পারবি।

রীণাকে যেতে হবে দিল্লিতে। এইভাবে সে দিল্লি যেতে চায়নি। কিন্তু উপায় নেই। রীণার দিল্লি যাবার কথা অর্ক আগেই শুনেছিল। তাই একদিন দেখতে এল। অর্ক বলে দিল্লি গিয়ে বড় ডাক্তার দেখিয়ে এসো।

বিকাশ ওদের প্লেনে তুলে দিতে আসে। বিকাশ রীণাকে বলে, দিল্লিতেই তোমার সঙ্গে দেখা হবে।

দিল্লিতে আসার পরদিনই বিপাশা এসেছেন অনিমেষদের ফ্ল্যাটে। এর মধ্যে তিনি অল ইন্ডিয়া ইন্সটিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সে রীণাকে দেখাবার ব্যবস্থা করে ফেলেছেন। কিছু দিন পরে তাকে দেখানো হবে। তার আগে অনিমেষ বিপাশার সঙ্গে হাসপাতালে যায়। সেখানে ডাক্তারদের সঙ্গে তাদের রীণার অসুখ নিয়ে বিশদ আলোচনাও হয়েছে।

বিপাশা সব শুনেছেন। বিপাশা অনিমেষকে বলেন, অনিমেষ, এটা আজকের দিনে তেমন ভয়ের কেস নয়। রীণার নিকট আত্মীয় বলতে তোমরা দুজনেই আছো। ওর মা-বাবা। তোমাদের মধ্যে একজনের বোন-ম্যারো পেলেই ওর অপারেশন করা যাবে। অবশ্য তার আগে দেখতে হবে কারটা ম্যাচ করে। রীণা ধীরে ধীরে সেরে উঠবে। আর যে বোন-ম্যারো ডোনেট করবে তাকেও কয়েকদিন হসপিটালে থাকতে হবে। তারপর সব ঠিক হয়ে যাবে। তোমাদের মধ্যে কে ডোনেট করবে সেটা তোমরাই ঠিক করে জানাও। তারপর সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে। তবে সেটা যত তাড়াতাড়ি করা যায় ততই ভালো। শুনলে তো ডাক্তার শ্রীবাস্তবের কথা—দেরি হলে কমপ্লিকেশান হতে পারে। তোমরা যা ডিসিশান নেবে দু-একদিনের মধ্যে নিয়ে নাও। আর এই কথাটা রীণাকেও জানিয়ে দিতে হবে। তাহলে ও মানসিকভাবে তৈরি হতে পারবে।

চিন্তার কালো ছায়াটা আরও গভীর হয়। অনিমেষ-কমলা ভেবে পায় না কী করবে। যে-কঠিন সত্যিটা তারা এতদিন লুকিয়ে রেখেছিল, আজ সেই কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি হয়েছে তারা। এতদিনের মিথ্যেটা আজ তাদের দরজায় কড়া নাড়ছে। অনিমেষ বলে, এখন কী হবে, কমলা?

কমলাও ভাবছে একই কথা। কিন্তু কোনো উত্তরই তাদের কাছে নেই। অনিমেষ বলে, সেদিন তো ভাবিনি যে এরকম একটা পরিস্থিতির মুখে পড়তে হবে। যে কথা ওরা সারা জীবন লুকিয়ে রাখতে চেয়েছিল আজ তা প্রকাশ করতেই হবে। কিন্তু রীণার কী হবে, ওকে ওরা কীভাবে বাঁচাবে?

অনিমেষ-কমলার বিয়ের পর তাদের সংসার শূন্যই ছিল। তাদের ঘরে কোনো সন্তান আসেনি।

অনেক চিকিৎসাও করিয়েছিল তারা, কিন্তু মা হতে পারেনি কমলা। কিন্তু কমলার মা ডাক শোনার বড় ইচ্ছে। তাই সাত-পাঁচ ভেবে তারা একটা সিদ্ধান্ত নিল। তারপর খোঁজ-খবর নিয়ে সেদিন অনিমেষ আর কমলা মফঃস্বলের এক জেলা শহরের অনাথ-আশ্রম থেকে একটা কয়েক মাসের শিশুকে দত্তক নিয়েছিল। সেই শিশুই রীণা। প্রায় উনিশ বছর ধরে ওরা বাবা-মায়ের মতোই স্নেহ-মমতা দিয়ে রীণাকে মানুষ করেছে। তাকে জানতেও দেয়নি যে রীণা তাদের সন্তান নয়, সে নাম-পরিচয়হীন অনাথ।

রীণাও জানে এরাই তার বাবা-মা। এই তার বাড়ি-ঘর। আজ রীণার সব স্বপ্ন ভেঙে যাবে যদি সে তার পরিচয় জানতে পারে। কত বড় আঘাত পাবে যখন সে জানবে অনিমেষ-কমলা তার কেউ নয়। এত স্নেহ, এত ভালোবাসা সব মিথ্যে হয়ে যাবে তার কাছে। আর এই রোগও সারাতে পারবে না কোনোমতে। মেয়েটা তার পরিচয় হারিয়ে প্রায় বিনা চিকিৎসাতেই বিদায় নেবে এই পৃথিবী থেকে বুক ভরা ঘৃণা আর একরাশ হতাশা নিয়ে।

বাধ্য হয়ে তারা বিপাশাকে সব কথা জানায়। বিপাশা সব শুনে বলেন, তাহলে সেই বাচ্চা মেয়েটার বাবা-মায়ের খোঁজ হয়তো অনাথ-আশ্রমই দিতে পারে।

অনিমেষ বলে, সে তো অনেকদিন আগেকার ঘটনা।

বিপাশা বলেন, তুমি আমায় অনাথ-আশ্রমের নাম ঠিকানা দাও, নিশ্চয় ওটা সরকার থেকে স্বীকৃত। আমিও চেষ্টা করছি যাতে ওই বাচ্চাটার বাবা-মায়ের খোঁজ পাওয়া যায়।

একটু থেমে বিপাশা বলেন, যেভাবেই হোক বাচ্চাটার মা-বাবার খোঁজ পেতে হবে। তা নাহলে মেয়েটাকে বাঁচানো যাবে না। মা-বাবার মধ্যে একজনের খোঁজ পেলে হয়তো মেয়েটাকে বাঁচানো যাবে। সেই অনাথ-আশ্রমে আমিও যাব তোমার সঙ্গে অনিমেষ।

অনিমেষ বলে, আপনি যাবেন বৌদি!

বিপাশা বলেন, এটা আমাকে করতে হবে। এও আমার সমাজসেবার মধ্যে পড়ে। তুমি যাবার ব্যবস্থা করো। ক'দিন কমলা না হয় এখানে থাকবে রীণাকে নিয়ে। মেয়েটাকে দেখাশোনা করতে হবে তো।

ওরা চলে গেছে। একা রয়েছে ফ্ল্যাটে কমলা রীণাকে নিয়ে। এর মধ্যে বেশ কিছুদিন কেটেছে। বিকাশও কলকাতা থেকে পরীক্ষা দিয়ে দিল্লিতে চলে এসেছে। রীণার শরীর ভেঙে পড়েছে। পরীক্ষা দেওয়া হয়নি। কমলা আজ বিকাশকে আসতে দেখে খুশি হয়। কমলা বলে, এসো বিকাশ। তুমি এলে আমি খানিকটা ভরসা পাই।

মানুষের মন খুবই দুর্বল। বিপদের দিনে সে শক্ত অবলম্বন খোঁজে। কমলা দেখেছে এখানে বাঙালি মহিলারা মুশকিল আসান বিবির পুজো করে।

কয়েকজন সধবা মেয়ে একত্রিত হয়ে, ঘট পেতে ফুল-মালা সাজিয়ে আসান বিবির ব্রতকথা পাঠ করে। এতে নাকি সংসারের সব বিপদ দূর হয়। সব মুশকিলের আসান করে দেন দয়াময়ী আসান বিবি। কমলা দেখেছে ওদের ঐ ব্রত-পুজো। বিপদের দিনে কমলাও যেন আসান বিবির একনিষ্ঠ ভক্ত হয়ে ওঠে। সে চোখের জলে আসান বিবির ব্রতকথা পড়ে—আসান বিবির নামে পুজোও দেয়।

রীণা বলে, মা, তুমি তো এসবে বিশ্বাস করতে না!

কমলা মেয়েকে বলে, আসান বিবি বড় জাগ্রত রে মা। মায়ের দয়ায় সব বিপদ কেটে যাবে।

বিকাশ এখন প্রায়ই আসে এ বাড়িতে। সব শুনে বলে, তা হতেও পারে। আমাদের বাড়িতেও দেখি মাও আসান বিবির ব্রত পালন করে। ঘট পেতে পুজো করে।

বিপাশা-অনিমেষ এসেছে সেই অনাথ-আশ্রমে। অনিমেষ প্রথমে চিনতেই পারেনি। সেই জরাজীর্ণ খড়ের চালের আশ্রম আজ আর নেই। সেখানে উঠেছে বিরাট তিনতলা পাকা বাড়ি। চারদিকে উঁচু

পাঁচিল, সবুজ গাছ-গাছালি, বাগান, কচি-কাঁচাদের কলরব শোনা যায়। একদম বদলে গেছে আশ্রমটা। দু-একজনকে বিপাশার পরিচয় দিতে তারা হকচকিয়ে যায়। সুপারও এসে পড়েন।

অনিমেষ সুপারকে বলে, আজ থেকে উনিশ বছর আগে এখান থেকেই একটা কয়েক মাসের শিশু কন্যাকে দত্তক নিয়ে গিয়েছিলাম আমি। আজ তার খুব বিপদ। তার মা-ই পারেন সেই মেয়েটার জীবন ফিরিয়ে দিতে। তাই দিল্লি থেকে আমরা ছুটে এসেছি। যদি সেই বাচ্চাটার মায়ের কোনো খোঁজ পাওয়া যায় আপনাদের পুরোনো রেকর্ড থেকে তাহলে হয়তো আমার মেয়েটা বেঁচে যাবে।

সুপার ভদ্রলোক সব শুনে বলেন, অনেক বছর আগেকার কথা। সেই সময়ের কোনো স্টাফই এখন বেঁচে নেই। আর পুরোনো রেকর্ডও কিছু নেই। দু-তিনবার বন্যায় তখনকার মাটির ঘর ভেঙে গিয়েছিল। বহু পুরোনো রেকর্ড সেই সঙ্গে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। সেই সময়কার ফাইল-টাইল কিছুই আর নেই।

এমন সময় একজন কর্মচারী বলে, তখনকার দিনের পুরোনো স্টাফদের মধ্যে রেবাদি এখনও বেঁচে আছে। তারও অনেক বয়স হয়ে গেছে।

বিপাশা বলেন, দয়া করে যদি ঠিকানাটা জানান।

কর্মচারীটি বলে, সে তো থাকে পাণ্ডুয়াতে তার মেয়ের বাড়িতে। আমার ভাইঝির বাড়ি সেখানে। পাণ্ডুয়া সিনেমা হাউসের কাছে ওদের বাড়ি। রেবাদি হয়তো আপনাদের সাহায্য করতে পারবে। আমার ভাইঝি চিনিয়ে দিতে পারবে রেবাদিকে।

অনিমেষ বলে, তাই দিন, দেখি তারা যদি কিছু জানাতে পারে।

বর্ধমান থেকে আবার গাড়ি নিয়ে তারা ছুটে চলেছে জি-টি রোড ধরে পাণ্ডুয়ার দিকে।

অনিমেষ হতাশ হয়ে বলে, বৌদি, এ যেন খড়ের গাদায় সুঁচ খোঁজা।

বিপাশা বলেন, তবু খুঁজতে হবে অনিমেষ, নাহলে ফুলের মতো মেয়েটা চোখের সামনে শেষ হয়ে যাবে।

ওরা ঘণ্টাকয়েকের মধ্যে পাণ্ডুয়াতে এসে পড়ে। পাণ্ডুয়াতে দুটো সিনেমা হল। ওরা একটাতে যায়। সেখানে একটা সিনেমা হাউসের সামনে বা আশে-পাশে কোনো বাড়ি দেখতে পাওয়া যায় না। এবার তারা যায় শহরের সংলগ্ন আরেকটা সিনেমা হাউসের সামনে। একজন চায়ের দোকানদারকে নামটা জানাতে সেই দেখিয়ে দেয়—পুকুরের পাড়ে ওই বাড়িটা।

বিপাশারা এগিয়ে আসেন। একজন বয়স্কা ভদ্রমহিলাকে নামটা জানাতে সে জানায়, রেবাদির মেয়ের বাড়ি এইটাই, কিন্তু রেবাদি তো অসুস্থ।

বিপাশা বলেন, তার সঙ্গে দেখা করতেই হবে। খুব দরকার। আমরা দিল্লি থেকে আসছি।

ওদের কথা শুনে ভদ্রমহিলা ঘরের ভিতরে নিয়ে যায়। একটা তক্তপোশে শুয়ে আছে রেবাদি।

অনিমেষ তাকে বলে, উনিশ-কুড়ি বছর আগেকার কথা—আপনাদের অনাথ-আশ্রম থেকে একটা মেয়েকে দত্তক নিয়েছিলাম ...

অনিমেষের কথা কানে যেতেই ভদ্রমহিলা একদৃষ্টে দেখতে থাকে তাকে। কী যেন মনে করার চেষ্টা করে বলে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েছে। সাতাশ নম্বরের সেই বাচ্চা মেয়েটার কথা বলছেন তো?

অনিমেষও চমকে উঠে বলে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, সাতাশই ছিল তার নম্বর। তখন একদম ছোট্ট। সে সময় বিবেক রায় ছিল সুপার। বর্ধমানের পুরোনো রাজবাড়িতে থাকত।

মহিলা বলে হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওই সুপারের সময় তো আপনারা দত্তক নিয়েছিলেন।

বৃদ্ধা উঠে বসে তক্তপোশের নীচে থেকে একটা সুটকেস বের করে। সুটকেসের ভিতরে রাখা ফাইল আর কাগজপত্র ঘাঁটতে থাকে। বলে, সেবার দামোদরের বন্যায় আমাদের ঘর ডুবে গিয়েছিল। তখন বাচ্চাদের সামলাব না কাগজপত্র সামলাব। দু-চারটে ফাইল যা পেয়েছিলাম তা এনেছিলাম আধভেজা অবস্থায়, পরে এসব আমার বাড়িতেই পড়েছিল, ওরাও আর খোঁজ করেনি। আমারও খেয়াল হয়নি। দেখি এর মধ্যে যদি কিছু থাকে।

বৃদ্ধা চশমা চোখে দিয়ে কাগজপত্র দেখতে দেখতে একটা চিঠি পেয়ে বলে, সাতাশ নম্বরের ব্যাপারে আর কিছু নেই, শুধু এই চিঠিটা রয়েছে। বিপাশার দিকে চিঠিটা এগিয়ে দেয় বৃদ্ধা। একটা দামি লেটার হেডে লেখা চিঠি। কলকাতার বালিগঞ্জের দিকে একটা কোম্পানির নাম ও ঠিকানা দেওয়া। কোম্পানির মালিকই বিবেক রায়কে চিঠি লিখেছে, তিনি একটা কয়েকমাসের শিশুকন্যাকে অনাথ-আশ্রমে পাঠাতে চান। তার সঙ্গে একটা বেশ মোটা টাকার ব্যাঙ্ক ড্রাফটও দিয়েছেন। তাতে লেখা আছে যেন এই বাচ্চাটিকে তাদের আশ্রমে রেখে মানুষ করা হয় আর এই চিঠিটা যেন কোনোদিন বাইরে প্রকাশ করা না হয়।

বিপাশা-অনিমেষ দুজনেই চিঠিটা দেখে। অনিমেষ বলে, এখানে গেলে হয়তো একটা খবর পেতে পারি। আজই এই ঠিকানায় গিয়ে খোঁজ করতে হবে, বৌদি।

বিপাশা কোনো কথা বলেন না। অন্যমনস্ক তিনি। চুপ করে বেরিয়ে আসেন বৃদ্ধাকে ধন্যবাদ জানিয়ে।

অনিমেষ আর বিপাশা দুজনেই এসেছে বালিগঞ্জের সেই ঠিকানায়, তখন বিকেল নামছে। বিপাশা বৃদ্ধার বাড়ি থেকে বেরিয়ে আর কোনো কথাই বলেননি। কী যেন ভাবছেন। বড় চুপচাপ তিনি। ওরা এসে দেখে সেই ঠিকানায় আর কোনো পুরোনো বাড়ি নেই। সেখানে গড়ে উঠেছে বেশ কয়েকটা সাত-আটতলা অভিজাত ফ্ল্যাট বাড়ি। ফ্ল্যাটের কেয়ারটেকার বলে, সেই কোম্পানি অনেক দিন আগেই উঠে গেছে। তাদের বাংলো ছিল ওদিকটায়। কোম্পানি উঠে যেতে মালিক নিজেই বাড়ি-জমি-জায়গা বিক্রি করে দেন দেনার দায়ে।

এখন সেই মালিক কোথায় আছেন? অনিমেষ জিজ্ঞাসা করে।

কেয়ারটেকার মাথা নেড়ে বলে, শুনেছি সেই কোম্পানির মালিক মারা গেছেন। শুনেছি তাঁদের দু-একজন আত্মীয় যারা ছিল তারাও কলকাতা ছেড়ে চলে গেছে। তাদের কোনো খবর আর কেউ জানে না।

হতাশ হয় অনিমেষ। অনিমেষ বলে, সব চেষ্টাই বৃথা হয়ে গেল, বৌদি। খালি হাতেই দিল্লি ফিরতে হবে।

বিপাশাও ক্লান্ত। অসম্ভব চুপচাপ হয়ে গেছেন তিনি। আস্তে আস্তে বলেন, ফিরে চলো।

অনিমেষ অনেক কষ্টে চোখের জল আটকে বলে, আমাদের চোখের সামনে ফুলের মতো নির্দোষ মেয়েটা মরে যাবে। আমরা অসহায়ের মতো তাই দেখব। কিছু করতে পারব না!

হতাশ অনিমেষ বাড়ি ফেরে। বিপাশার কাছে অনিমেষের মেয়ের অসুখের কথা শুনেছিলেন ভবতোষবাবু। কোথায় ওরা গিয়েছিল তাও জানতেন। তাই জিগ্যেস করেন, কী হল তোমাদের মিশন? কোনো খোঁজ-খবর পেলে?

বিপাশা কোনোমতে উত্তর দিয়ে গম্ভীর হয়ে যান। ভবতোষবাবুর সামনে থেকে সরে যান। ভবতোষবাবু বিপাশার কষ্ট বোঝেন। রীণাকে বড় ভালোবেসে ফেলেছে সে।

ওদিকে খবরটা রীণার কাছেও পৌঁছেছে। রীণা দেখেছে, তার মা কাঁদছে, তার বাবাও নানা জায়গায় পাগলের মতো ঘুরছে। কমলা ভেবেছিল, অনিমেষ হয়তো রীণার মা-বাবার খবর পাবে। তাই ফিরে আসতেই কমলা অনিমেষকে জিজ্ঞাসা করে, রীণার মা-বাবার কোনো খবর পেলে? ওর মা-বাবা দুজনের কাউকে না পেলে তো রীণাকে বাঁচানো যাবে না। রীণা বারান্দা দিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ তাদের কথা শুনে জানলার কাছে দাঁড়িয়ে পড়ে। রীণা কমলার মুখে মা-বাবার কথা শুনে চমকে ওঠে। রীণার কানে আসে কমলার কথা, যে অনাথ-আশ্রম থেকে ওকে এনেছিলাম তারা কিছুই বলতে পারল না?

অনিমেষ বলে, অনেক খোঁজ করলাম কিন্তু কোনো খবরই পাওয়া গেল না। এদিকে বোন-ম্যারো না পাল্টানো গেলে ওকে বাঁচানো যাবে না।

কমলা বলে, নিজেদের ছেলেপুলে হল না—অনাথ-আশ্রম থেকে একজনকে ঘরে এনেছিলাম তাকেও বাঁচাতে পারব না? কথা বলতে বলতে কেঁদে ওঠে কমলা।

রীণার মনে ঝড় ওঠে। সে জানত, অনিমেষ-কমলাই তার বাবা-মা। কিন্তু আজ সে জানতে পারল, এই বাড়ির মানুষজনের সে কেউ না। সে এক নাম-পরিচয়হীন অনাথ সন্তান। দয়া করে তাকে এরা আশ্রয় দিয়েছে। ঘুম আসে না রীণার, তার নিজেরই নিজের ওপর ঘৃণা হয়।

সকালে অনিমেষ-কমলা চায়ের টেবিলে চা খাচ্ছে—রীণা এসে দাঁড়ায়। রাতে ঘুমোয়নি। চেহারাটা উস্কো-খুস্কো। কমলা বলে, কীরে শরীর খারাপ?

রীণা বলে, এসব নিয়ে আর ভাবতে হবে না তোমাদের।

মানে! অনিমেষ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকায়। তারপর বলে, এসব কী বলছিস মা তুই?

রীণা বলে, ঠিকই বলছি। আমি তোমাদের কেউ না। আমি পরিচয়হীন একটা মেয়ে। এতদিন ধরে তোমরা আমার জন্যে অনেক করেছ। এবার আমাকে শান্তিতে মরতে দাও।

অনিমেষ-কমলার মধ্যে চোখাচোখি হয়। যে কঠিন সত্যিটা তারা দুজনে এতদিন ধরে গোপন করে রেখেছিল, আজ তা রীণার কাছে প্রকাশ হয়ে গেছে। কমলা বলে, কী যা-তা বলছিস, রীণা!

রীণা বলে, আমি সব জেনে গেছি। আমি জানি আমি কে। এবার আমার ভাগ্যই আমাকে টেনে নিয়ে যাবে। আমিও মুক্তি পেতে চাই, মুক্তি পেতে চাই। কথাগুলো বলতে বলতে রীণা ছুটে চলে যায়। নিজের ঘরে গিয়ে সে কান্নায় ভেঙে পড়ে।

রীণা-অনিমেষ কেউ খেয়াল করেনি এই সময় বিকাশ ড্রইংরুমে এসে ঢুকছিল। বাইরে থেকে রীণার উত্তেজিত গলা তার কানে গেছে। শুনেছে তার আসল পরিচয়। বিকাশও অবাক হয়। রীণা তাহলে অনিমেষবাবুদের মেয়ে নয়! ওকে ওরা অনাথ-আশ্রম থেকে এনেছিল। রীণা নাম-পরিচয়হীন একটা অনাথ মেয়ে!

কমলাই প্রথম দেখে বিকাশকে। উত্তেজনা সামলে কমলা বলে, এসো বিকাশ। যেন কিছু হয়নি এমন একটা হাবভাব করে বলে, বিকাশ—চা খাবে তো?

বিকাশ প্রায়ই সকালে এসে চা খায়, গল্প করে রীণার সঙ্গে, খবরের কাগজের খবর নিয়েও আলোচনা করে। কিন্তু বিকাশ আজ বসতে চাইল না। তাড়াতাড়ি চলে গেল।

আজ রীণার সম্বন্ধে যা শুনেছে বিকাশের মনেও তার ঝড় তুলেছে। নাম- পরিচয়হীন একটা জারজ মেয়ের দিকে সে কেন ঝুঁকবে? সমাজে তাদের যথেষ্ট সুনাম আছে। সেখানে রীণার মতো একটি অনাথ মেয়ে অচল। বিকাশ মনস্থির করে ফেলে। বলে, আমি আজ আসি। জরুরি কাজ আছে। আমাকে এক্ষুনি যেতে হবে।

কমলা অবাক হয়। সে বলে, রীণার সঙ্গেও দেখা করবে না, ডাকছি তাকে, তুমি বসো।

বিকাশ বলে, থাক। পরে দেখা করব। এখনই আমাকে যেতে হবে।

কমলা অনিমেষের দিকে তাকিয়ে বলে, বিকাশ এইভাবে চলে গেল!

অনিমেষ বলে, ও বোধ হয় রীণার কথাগুলো শুনেছে কমলা। তাই চলে গেল। ওদের বংশ-মর্যাদা , আর নীল রক্তের দম্ভের কাছে রীণার মতো মেয়ে অচল।

কমলা অবাক হয়ে বলে, কী বলছ তুমি? বিকাশ রীণাকে ভালোবাসে।

অনিমেষ বলে, ওদের ভালোবাসা অন্য ধরনের। তারা হিসাব করে পা ফেলে। সব দিক ভেবে ভালোবাসে, কমলা। তাই রীণাকে ভুলতে ওর দেরি হবে না।

কমলা বলে, সত্যি মেয়েটার ভাগ্যটাই খারাপ।

রীণাও দেখেছে বিকাশ আজ অন্যদিনের মতো তার ঘরে আসেনি। তার সঙ্গে দেখা না করেই চলে গেল কেন? সে কি কিছু শুনেছে? রীণা লক্ষ করেছে বিকাশ এখন আর আগের মতো তাকে নিয়ে উচ্ছ্বসিত হয় না, বরং ঠান্ডা গলায় বলে, জরুরি কাজ আছে, কারখানায় যেতে হবে। পরে সময় করে দেখা করতে আসব। তার সময় যে কখন হবে তা অবশ্য জানায় না বিকাশ।

ক'দিন কিশোর আসছে না। রীণা বুঝতে পারে তার জীবন থেকে যেন সবই হারিয়ে যাচ্ছে একটু একটু করে। রীণার মনে হয়, নাম-গোত্রহীন একটা মেয়ের কাছে কে আসবে। নিজের শরীর নিয়ে সে আর ভাবে না। তার মনে হয়, তার দিন শেষ হয়ে আসছে। রীণা কাঁদছে। সে ধীরে ধীরে নিজেকে বদলে ফেলার চেষ্টা করে।

অনিমেষ-কমলাও ভেঙে পড়েছে। মেয়ের এই অবস্থার জন্য তারা নিজেদেরকেই দায়ী করে। বিপাশাও কয়েকদিনের জন্য বাইরে গিয়েছিলেন। ফিরে আসার পর থেকে মনে হচ্ছে, তিনিও যেন কেমন বদলে গেছেন। শুধু তাই নয়, ওরা খবর পেয়েছে, বিপাশা আজকাল বাইরের কাজকর্মও কমিয়ে দিয়েছেন। প্রেসের লোকজনদের ফিরিয়ে দিচ্ছেন। জরুরি কাজেও যাচ্ছেন না। তাদের সঙ্গেও বিশেষ দেখা করছেন না। তিনি যেন নিজেকে দু'দরজার মধ্যে বন্দি করে রেখেছেন।

ভবতোষবাবুও অবাক হন বিপাশার এই পরিবর্তনে। তিনি কর্মব্যস্ত লোক, তবু স্ত্রী-র দিকে তাঁকে এখন নজর দিতে হচ্ছে। সেদিন ভবতোষবাবু বিপাশাকে জিগ্যেস করলেন। তোমার কি শরীর খারাপ? কোথাও যাচ্ছ না। প্রেস-মিটিং অ্যাটেন্ড করছ না। দিনরাত ঘরে বসে আছে, রীণার সঙ্গে দেখা করতেও যাচ্ছ না, কী হয়েছে তোমার?

বিপাশা ভবতোষবাবুকে এড়িয়ে যেতে চান। তিনি বলেন, না, না আমি ঠিক আছি। তুমি ব্যস্ত হচ্ছ কেন?

ভবতোষ চুপ করে যান। তবু যেন তাঁর মনে দুশ্চিন্তার একটা কালো ছায়া নামে। ভেবে পান না, কী হয়েছে বিপাশার। ওদিকে সামনে ভেসে ওঠে রীণার মুখটা। আজ সে নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে তিল তিল করে এগিয়ে চলেছে অসহায়ের মতো। অনিমেষ-কমলার জীবনে নেমে এসেছে অন্ধকার।

বিপাশার মনে পড়ে অতীতের কথা। আশ্রমের সেই বয়স্কা মহিলার দেওয়া চিঠিটা রয়েছে বিপাশার কাছেই। চিঠির সইটা তাঁর বাবার। তবে কি, তবে কি ... কেঁপে ওঠেন বিপাশা। যে আশঙ্কাটা ওঁর মন জুড়ে ছিল, মনে হচ্ছে তাই বুঝি সত্যি। বিপাশার মনে পড়ে তাঁর কুমারী জীবনের কথা।

তখন সে সবে কলেজে ঢুকেছে—সেখানেই পরিচয় হয় কিশোরের সঙ্গে। ক্রমশ তাদের ঘনিষ্ঠতা বেড়ে ওঠে। সেবার কলেজ থেকে স্টাডি ট্যুরে গিয়েছিল তারা—ভুটানের কোনো এক পাহাড়ি গ্রামে। সেখানকার বন-বাংলোয় থাকার সময় এক দুর্বল মুহূর্তে তাদের শারীরিক মিলন ঘটে যায়। তখন সদ্য যৌবনে পা রাখা বিপাশার ভালো-মন্দ বিচার করার বুদ্ধিও ছিল না। ফলে সেই ভুলের মাসুল দিতে হয়েছিল বিপাশাকে। এমনটা যে ঘটতে পারে তা সে ভাবতেও পারেনি।

বিপাশা মা হতে চলেছে। খবরটা তার বাবার কানে যায়। তার বাবার বিরাট ব্যবসা। কলকাতায় বড় ফ্যাক্টরি অফিস। জন্মের আগেই বাচ্চাটাকে শেষ করে দিতে চেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু বিপাশা তা করতে দেয়নি। তাঁদের বংশমর্যাদা-আভিজাত্য ও বিপাশার ভবিষ্যতের কথা ভেবে তিনি তার সেই অবৈধ সন্তানকে অনাথ-আশ্রমে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু বিপাশাকে জানতে দেননি অনাথ-আশ্রমটির কথা। তারপর কালের চক্রে তাঁর ব্যবসা উঠে যায়। বাবাও মারা যেতে বিপাশা সব বিষয়-আশয় দেনার দায়ে বিক্রি করে দেয়, এমনকি বাড়িটাও। বিপাশা তখন থেকেই দিল্লিতে। পড়াশোনা শেষ করার পরে বিয়ে হয় ভবতোষবাবুর সঙ্গে।

অতীতের সেই ঘটনাটা ভুলে গিয়েছিলেন বিপাশা। আজ এতদিন পরে তিনি জেনেছেন, তাঁর সন্তান বেঁচে আছে আর সেই সন্তানই এই রীণা। তাঁর বাবার চিঠিটা পড়ার পর তিনি নিশ্চিত। কিন্তু আজ তিনি কী করবেন? ভবতোষবাবু কিছুই জানেন না। সব শোনার পর তাঁর মানসিক অবস্থা যে কী হবে কে জানে। একদিকে তাঁর সন্তান অন্যদিকে স্বামী, সংসার, সব কিছু। কী করবেন বিপাশা?

বিপাশার জীবন আজ একটা কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। বিপাশার সন্তান রীণা। অনিমেষ-কমলার পরিচয়ে সে আজ এত বড় হয়েছে। কিন্তু আজ সে মৃত্যুশয্যায়। অথচ তিনি পারেন ফুলের মতো মেয়েটাকে মৃত্যুর দুয়ার থেকে জীবনের আলোতে ফিরিয়ে আনতে।

কিন্তু আজ যদি প্রকাশ পায় বিপাশারই মেয়ে রীণা, তাঁর অবৈধ সন্তান, তাঁর কুমারী জীবনের কলঙ্ক!

তাঁর ও ভবতোষের সামাজিক প্রতিষ্ঠা, সুনাম—সব কিছুর ওপর যে কলঙ্কের দাগ পড়বে। মিথ্যা হয়ে যাবে তাঁদের সামাজিক পরিচয়-প্রতিষ্ঠা। এত বড় সর্বনাশ নিজেদের জীবনে ডেকে আনতে পারবেন না বিপাশা। সব জানার পর তিনি ক'দিন ধরে নিজের মনের সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু ভেবে পাচ্ছেন না তিনি কী করবেন। একবার মনে হচ্ছে, তিনি তাঁর এত বড় সর্বনাশ করতে পারবেন না। আবার তাঁর অন্য মন বলছে তাঁর মাতৃত্বের কর্তব্য করতে। তাঁর মনে হয়, যতই সে মেয়ে তাঁর কলঙ্কের হোক, তবু তিনি মা। মা-সন্তানের সম্পর্ক চির পবিত্র। মা হয়ে দেখবেন তাঁর সন্তান বিনা চিকিৎসায় তিল তিল করে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। মা হয়ে তিনি তাঁর মিথ্যা প্রতিষ্ঠা পরিচয়কে আঁকড়ে ধরে থাকবেন স্বার্থপরের মতো। মেয়েকে বাঁচাতে এগিয়ে আসবেন না তিনি। বিপাশা হতাশায় ভেঙে পড়েন। নিজের উপরই তাঁর ঘৃণা হয়।

গোড়ার দিকে রীণা বিকাশের সঙ্গে বেড়াতে যেত। একদিন তো বিকাশদের কারখানাতেও গেছে সে। যমুনা নদীর পার হয়ে নয়ডায় বিকাশদের কারখানা। আরও নানা জায়গায় যেত সে। রীণার সময়টা দিব্যি কেটে যেত। কিন্তু বিকাশ এখন আর আসে না। এক একদিন সে একাই বেরোয়।

সেদিন রীণা রাজঘাটের দিকে বেড়াতে গেছে কমলার সঙ্গে। ঘরে বন্দি হয়ে থাকতে তার এখন অস্বস্তি হয়। কিচ্ছু ভালো লাগে না। জীবন তার কাছে অর্থহীন। কারও সামনে বেরোতে ইচ্ছে করে না। সেদিন কমলা তাকে জোর করে নিয়ে বেরিয়েছে। হঠাৎ তারা দেখে বিকাশকে অন্য একটি মেয়ের সঙ্গে। মেয়েটি তেমন সুন্দরী নয়, তবে তার নিজেকে সুন্দর করে তোলার চেষ্টাটা প্রকট হয়ে উঠেছে। বিকাশ আর সেই মেয়েটা ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে কথা বলছে, হাসছে। রীণা ওদের দেখে গাছের আড়ালে গিয়ে দাঁড়ায়। সে ধীরে ধীরে মার কাছ থেকে একটু সরে গিয়ে একটা গাছতলায় দাঁড়ায়। সে বুঝতে পারে, বিকাশের কাছে তার কোনো দাম নেই। তাকে ছেড়ে বিকাশ এখন ঐ মেয়েটির প্রেমে ডুবে আছে।

ওদিকে ক'দিন ধরে ভেবে বিপাশা ঠিক করেছেন, সব দায় তিনি এড়িয়ে যাবেন। রীণা যে তাঁর সন্তান তিনি তা কাউকে জানতে দেবেন না। তাহলে তাঁদের সুনামে কলঙ্ক লাগবে না। কেউ জানবে না নিজের মেয়ের মৃত্যুর জন্য তিনিই দায়ী। এই ভাবেই এড়িয়ে যাবেন বিপাশা তাঁর সব দায়, সব কর্তব্য। নিজের চোখের সামনে দেখতে হবে না মেয়ের মৃত্যু। সেই ভালো, বিপাশা নিজেকেই নিজে শেষ করে দেবেন। আর তাই ক'দিন ধরে তিনি নানা ওষুধের দোকান থেকে সংগ্রহ করেছেন বেশ কিছু ঘুমের বড়ি। ঘুমের ওষুধ খেয়ে তিনি পাড়ি দেবেন পরপারে। কেউ কোনোদিন জানতে পারবে না বিপাশা দত্তর আত্মহত্যার কারণ।

রীণার দেহ-মন আজ বিষণ্ণ-অবসন্ন। বিকাশও আর আসে না। ও এলে তবু কলকাতার গল্প, কলেজের গল্প করে বেশ খানিকটা সময় কেটে যেত। বিকাশদের পরীক্ষার ফল বেরিয়ে গেছে। বিকাশের আর পড়াশোনা করার দরকার নেই। সে এখনই গাজিয়াবাদের কারখানাতে ম্যানেজারি শুরু করেছে। এর মধ্যেই কারখানায় আরও একটা নতুন ইউনিট তৈরি করার কাজে হাত দিয়েছে সে।

সেদিন সন্ধ্যাবেলায় হঠাৎ বিকাশের ফোন আসে। রীণা ধরেছে ফোনটা। বিকাশ চড়া গলায় বলে, রীণা তোমার গোয়েন্দাগিরি আমি ধরে ফেলেছি। তবে শুনে রাখো তোমার পরিচয়টা আমি জেনে গেছি। আমাদের মতো পরিবারের ছেলে একজন নাম-পরিচয়হীন মেয়েকে ভালোবাসতে পারে না। এই কথাটাই তোমাকে স্পষ্ট করে জানিয়ে দিচ্ছি। তাই আমার পেছনে ঘোরার চেষ্টা কোরো না। ওটা বামনের চাঁদ ধরার মতোই। আমি তোমাকে ঘৃণা করি।

ফোনটা কেটে যায়। রীণার কানে কথাগুলো যেন জ্বলন্ত শলাকার মতো প্রবেশ করে। ফোনটা রেখে দিয়ে সে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। বিকাশ তো জানে তার অসুখের কথা। তাহলে সে কেন তাকে এইভাবে আঘাত করল। রীণার জীবন থেকে সবই হারিয়ে যাচ্ছে। চলে যাবার আগে এই সমাজ বুঝি তাকে চরম আঘাত করতে চায়।

কমলা অসহায়ের মতো বসে থাকে আর কাঁদে। বিপাশাদিও আজকাল আসেন না। উনি এলে অন্তত কথা বলতে পারত। তার মনে হল, বিপাশাদিও ক'দিন আসেননি তাদের বাড়িতে। কমলা অবশ্য সেই আসান বিবির ব্রত করে চলেছে—পুজো করছে অন্য মেয়েদের সঙ্গে। অনিমেষ বলে—এত কিছু করেও কোনো লাভ হল না। তোমার আসান বিবি আর কী করবেন?

কমলা বলে, আমার দৃঢ় বিশ্বাস মা মমতাময়ী, নিশ্চয়ই তিনি একটা পথ বের করে দেবেন।

আর কোনো পথ পাননি বিপাশা। সেদিন রাত্রে অনেক ভাবনা-চিন্তার পর নিজেকেই শেষ করে দেবেন বলে ঠিক করেন তিনি। তাই বেশ কিছু স্লিপিং পিল খেয়ে শুয়ে পড়েন। বার-বার তাঁর চোখের সামনে ভেসে ওঠে রীণার মুখটা। গলায় আঙুল দিয়ে বমি করেন বিপাশা। চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে ঘুমের বড়ি।

ঘরে ঢুকে চমকে ওঠে ভবতোষ, এ কী করেছ বিপাশা? এত স্লিপিং পিল খেয়েছিলে কেন? ভবতোষ ডাক্তারকে ফোন করেন। ভি-আই-পি-দের ব্যাপার। সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার, অ্যাম্বুলেন্স এসে পড়ে। নার্সিংহোমে যাওয়ার পর সেখানে চিকিৎসা শুরু হয়। সুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরেন বিপাশা। এইবার বিপাশা অসহায় কান্নায় ভেঙে পড়ে তাঁর গোপন অতীতের কথা স্বামীকে জানান। সব শুনে চুপ করে বসে থাকেন ভবতোষ।

ভবতোষ নিজের কেরিয়ার নিজে তৈরি করেছেন। এর জন্য ভবতোষকে অনেক ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করতে হয়েছে। তাঁর আজকের এই যশ, প্রতিপত্তি পেয়েছেন নিজের যোগ্যতায়। ভবতোষ বিপাশার অতীতের সেই সব কথা শোনেন। বিপাশা বলেন, ফুলের মতো মেয়েটা বিনা দোষে এত বড় সাজা পাবে? রীণাকে আমি বাঁচিয়ে তুলতে চাই। তাই মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এলাম। ভবতোষ ভেবেছেন কথাটা। তিনি বলেন, ঠিকই করেছ, বিপাশা। তবে এসব কথা আমাকে আগে জানানো উচিত ছিল। আমাকে কি বিশ্বাস করতে পারনি?

ভবতোষ বলেন, যে প্রতিষ্ঠা-সুনাম এত সামান্য আঘাতে ভেঙে পড়ে, সেই সুনাম-প্রতিষ্ঠা থেকে বদনামই ভালো বিপাশা। একটা মেয়েকে বাঁচাবার জন্যই তুমি আজ অতীতের সব সত্যকে মেনে নেবে। এটাই আমি চাই। এর জন্য আমাদের পরিচয় যদি ওকে দিতে হয়—তাই দেবে। এর জন্য যদি ঠুনকো সম্মান-প্রতিষ্ঠা যায়—তবে তা যাক। আমার জন্য চিন্তা কোরো না বিপাশা। তুমি আজই জানিয়ে দাও অনিমেষদের যে রীণা তোমার মেয়ে। তোমার বোন-ম্যারো দিয়ে তুমিই রীণাকে বাঁচিয়ে তুলবে।

অনিমেষ একবারে ভেঙে পড়েছে। আজ সব আশাই তারা ছেড়ে দিয়েছে। রীণাও তার অদৃষ্টকে মেনে নিয়ে মনে মনে তৈরি হয়েছে পৃথিবী ছেড়ে যাবার জন্য। ওদের মনের যখন এমন অবস্থা তখনই একদিন তাদের বাড়িতে প্রবেশ করে এক তরুণ। পরনে স্যুট। দেখতে ভালোই। রীণা চমকে ওঠে অর্ককে দেখে। সে বলে, অর্ক তুমি!

অর্ক বলে, আমি এখানে ইউ-বি-আই-এর ম্যানেজার হয়ে এসেছি। এখানে এসে খুঁজতে -খুঁজতে তোমাদের ঠিকানা পেয়ে চলে এলাম। কিন্তু তোমার শরীর যে আগের থেকে অনেকটা খারাপ হয়ে গেছে, রীণা!

অনিমেষ-কমলাও এসেছে ড্রইংরুমে। রীণাই পরিচয় করিয়ে দেয়, এই অর্ক। কলেজে আমরা একসঙ্গে পড়াশোনা করতাম। অর্ক—আমার মা-বাবা।

কমলা সেদিনের পর আজ যেন রীণাকে খুশি দেখে। অর্ককে দেখে রীণা সত্যিই খুশি হয়েছে। রীণা বলে, আমার দিন তো ফুরিয়ে এসেছে, অর্ক। তবু যাবার আগে তোমার দেখা পেলাম।

অর্ক বলে, এসব তুমি কী বলছ? দেখবে সব ঠিক হয়ে যাবে। ভগবান অত নিষ্ঠুর নন। ছাড়ো তো ওসব কথা। বিকাশ এখন আর আসে না? ও তো এখানেই রয়েছে। সেদিন দেখা হয়েছিল।

রীণা চুপ করে যায়।

কমলা বলে, কেন জানি না বাবা, ও আগে প্রায়ই আসত, এখন আর আসে না।

অর্ক বলে, ও তো বিয়ে করছে। সেদিন ব্যাঙ্কে এসে বিয়ের কার্ডও দিয়ে গেল।

কমলা হতাশ হয়। রীণাই বলে, মা, যার পৃথিবীতে থাকার দিন শেষ হয়ে গেছে তার জন্য কেন চিন্তা করছ? আমার তো যাবার সময় এগিয়ে আসছে। বিকাশ তো ঠিকই করেছে।

হঠাৎ কলিং বেলটা বেজে ওঠে। বাইরে গিয়ে দেখে বিপাশা-ভবতোষবাবু দাঁড়িয়ে আছেন। বেশ কয়েকদিন পরে তাঁরা এসেছেন। তাঁদের দুজনকে একসঙ্গে দেখে অনিমেষ-কমলা দুজনেই অবাক হয়। বলে, দাদা-বৌদি আপনারা!

ভবতোষই বলেন, অনিমেষ, আমরা রীণার জন্য এসেছি। আমি এমস-এ সব ব্যবস্থা করে রেখেছি। ওর বোন-ম্যারো রিপ্লেসমেন্টের কাজ ওরা করে দেবে আর আসল ডোনারও পেয়ে গেছি।

আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে অনিমেষের মুখ। সেই সঙ্গে অবাকও হয়। বলে, আপনারা কি ওর মা-বাবার সন্ধান পেয়েছেন?

ভবতোষ বলেন, ওর মা-কে পেয়েছি। এই যে সে তোমাদের সামনে। অনিমেষ-কমলা অবাক হয়ে একসঙ্গে চেঁচিয়ে ওঠে, বৌদি!

এবার বিপাশা এগিয়ে আসেন, বলেন, হ্যাঁ, অনিমেষ। সেই চিঠির খামটা দেখেই বুঝে গিয়েছিলাম, ওটা আমার বাবারই লেখা। আর আমিই রীণার হারিয়ে যাওয়া মা।

রীণা অবাক হয়ে দেখছে বিপাশাকে, সামনে তার এক মমতাময়ী মূর্তি। বিপাশা ওকে বুকে টেনে নেন। যে মেয়েকে নিজের অজান্তে গত কিছুদিন তিনি চিনেও চিনতে চাননি, আজ তাকেই তিনি আলোর জগতে ফিরিয়ে আনতে চান।

অর্ক খুশি হয়ে বলে ওঠে, রীণা, বলেছিলাম না সব ঠিক হয়ে যাবে। ভগবান আছেন।

অপারেশান হয়ে গেছে। এখন সুস্থ হয়ে উঠেছে রীণা। এবার অনিমেষ-কমলাও ফিরে পেয়েছে তাদের মেয়েকে। বিপাশা ফিরে পেয়েছেন তাঁর মেয়েকে। তাঁদের জীবনের শূন্যতাও পূর্ণ হয়ে উঠেছে। তাই রীণা আজ নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখে। হাসপাতালে রোজ আসে অর্ক। বিকাশের মতো স্বার্থপর সে নয়। অর্ক আজ এসেছে রীণার জীবনে নতুন আনন্দ নিয়ে। সে সব জেনেছে, সব শুনেছে। রীণার মনে হয়, পৃথিবীটা সত্যিই সুন্দর।

দখলদার

শীতের সকালের রূপটাই এখানে আলাদা। দিগন্ত প্রসারী ধানক্ষেতে সোনা রং ধরেছে। পাকা ধানের মঞ্জরীর ভারে ধানক্ষেত ভারাবনত। বাতাসে ওঠে পাকা ধানের মিষ্টি সুবাস। ধানক্ষেতের মধ্যে মাঝে মাঝে এক মুঠো ছড়ানো সবুজপাতার মতো টিয়াপাখির ঝাঁক কলরব করে নামে, লাল ধারালো ঠোঁটে ধানশিষগুলো কেটে ফেলে ঠুকরে ঠুকরে খায়।

আবার নিজেদের খেয়ালেই আকাশে উড়ে উধাও হয়ে যায় কর্কশ শাসানি দিয়ে। কদম চলেছে আলপথ দিয়ে নোটনের সকালের পান্তা নিয়ে।

ভোর থেকেই নোটন ধান কাটতে লেগেছে মাঠে। কুয়াশা পড়ে এখন ভোরের দিকে। কুয়াশায় ভেজা ধান কাটলে শিস ঝরে কম, রোদ পেয়ে কুয়াশা মরে গেলে তখন শুকনো ধানগাছ কাস্তের চোট পেতেই যেন আর্তনাদ করে নীরবে, ধানও ঝরে যায়। তাই সকাল হবার আগেই কাজ এগিয়ে রাখতে চায় নোটন।

কদম চলেছে, শিশির-ভেজা আলপথ দিয়ে। সোনাধানের সুবাস ভিজে বাতাসে, তার গানের কলি বেজে ওঠে ঃ

সুকাল বিলার বাওড় লেগে
জলে জাগে ঢেউ লো, পথ আগুলে
কেলে ছোঁড়া, সঙ্গে যে নাই কেউ লো ...

কদমের রূপ যৌবন সহজেই সকলের চোখে পড়ে। কচি কলাপাতার মতো সতেজ লাবণ্য ওর সারা শরীরে, নিটোল পুরুষ্ট দেহ, উদ্ধত বুক আর চোখের চাহনিতেও যেন মাতাল করার ক্ষমতা রাখে, চলার ছন্দে ফুটে ওঠে কী মত্ততা। পানপাতার মতো মুখ ডাগর চোখ, চিবুকটা মসৃণ পেলবতায় অপরূপ। পাঁচ গাঁয়ের মধ্যে এমন রূপ ওদের সম্প্রদায়ের কারো ঘরেই নেই।

লোকে বলে—নোটনের বরাতজোর হে, ন' বলে এমন বৌ মেলে?

আর টুসু-ভাদু পরবে জাগরণের রাতে ওই কদমের নাচগানও সবাইকে মুগ্ধ করে।

সবাই খুশি।

অবশ্য কদম মোটেই খুশি নয়। কিন্তু কদম খুবিই বুদ্ধিমতী তবে লেখাপড়া তেমন জানে না, তাদের ঘরে লেখাপড়াটার তেমন চলও নেই। কোন্ ছেলেবেলায় গাঁয়ের পাঠশালে গেছিল, তারপর থেকেই গাঁয়ের বাবুদের বাড়িতে কাজ করেছে। বিনিময়ে খাওয়া, সামান্য টাকা পেয়েছে তাদের সংসারে।

জীবনটা শিশুকাল থেকেই সংগ্রামমুখর। সেখানে লেখাপড়া শেখার, জীবনকে কিছুটা উপভোগ করার সময় নেই। কদমও অযত্নবর্ধিত শালগাছের মতো লোকচক্ষুর অন্তরালে কবে যৌবনবতী হয়ে উঠল, সে খবর সে নিজেই জানে না।

তারপর এসেছে নোটনের ঘরে। আশা ছিল ওর ঘরে গিয়ে কিছুটা স্বস্তি পাবে। ক্রমশঃ দেখেছে কদম, তার রূপযৌবনের দিকে কত মানুষের তীক্ষ্ণ বুভুক্ষু দৃষ্টি। মেয়েরা সহজেই বুঝতে পারে ওই লোলুপ চাহনির অর্থ। নিজেও মনে মনে খুশি হয়। পুরুষের মনের ওই নীরব কামনা কদমের মনেও তার মূল্যকে বুঝিয়ে দিয়েছে। তার প্রত্যাশাও বেড়েছে। নিজের যোগ্যতার দামই প্রত্যাশা করে কদমের সেই ভোগী মন।

কিন্তু নোটন তার কোনো প্রত্যাশাকেই পূর্ণ করতে পারে নি। একটু সেজেগুজে থাকতে চায় কদম, অন্যের চোখে নিজের এই আকর্ষণটাকে সে প্রকট করে তুলতে চায়। কিন্তু নোটনের সেই সামর্থ্য নেই। নোটনের বাবার বিঘে দশেক জমি ছিল। কিন্তু নোটনের বাবা গোবিন্দের ছিল মদের নেশা। রোজ সন্ধেয় সে হরি সাহার ধেনো মদের দোকানের বাঁধা খদ্দের ছিল। দমভর মদ গিলে এসে বাড়িতে বৌটাকে পেটাত, নোটন তখন ছোট। বাবার ভয়ে সে বাড়ি থেকে পালাত, কারণ ধরা পড়লে তার গায়েও দু-চারটে কিল লাথি জুটত। তাই বাবার আসার খবর পেলেই (খবরটা পাওয়া যেত গোবিন্দের মদ্যপ গলার গানে, খুশিতে গীত কণ্ঠে সে আসত) নোটন পালাত। দূর থেকে মায়ের আর্তনাদ শুনত অসহায়ের মতো, আর নিষ্ফল রাগে ফুঁসত। ক্রমশঃ বড় হতে নোটন এবার রুখে দাঁড়ায়। বাবার হাতটা ধরে গর্জে ওঠে—ফের মায়ের গায়ে হাত তুললে ওই হাত মুচড়ে ভেঙ্গে দেব। তখন নোটন ভরজোয়ান। গোবিন্দ থেমে যায়। মাও নিষ্কৃতি পায়।

কিন্তু ততদিনে ক্ষতি যা হবার তা হয়ে গেছে। গোবিন্দের নেশার খরচ যোগাতে তার বিঘে সাতেক জমি কখন গ্রামের মহাজন ধনকেষ্ট পালের কবলে চলে গেছে। নোটন জানতে গোবিন্দ বলে—বিক্রি তো করিনি। বন্ধক রেখেছি। দু'সনের ধান উঠলেই দু'ক্ষেপে ওর টাকা ফেলে দোব। ব্যস, জমি আবার আমার। কিন্তু সে সময় গোবিন্দ পায় নি। সেই বছর দারুণ শীত পড়েছিল। শালবন পাহাড় এলাকা, এখানে শীতের কামড় বেশ জোরালো। সেদিন গোবিন্দ ভরপেট মদ গিলে রাতে বাড়ি ফেরার সময় নেশার ঘোরে পথ ভুলে গ্রামের দিকে না এসে বনের দিকেই চলে যায় আর পথ ভুলে এদিক ওদিক ঘুরে বনের ধারে পড়ে যায়, হুঁশ-জ্ঞান নেই। রাতভর ওই হিমে পড়ে থাকার ফলে নিউমোনিয়া হয়েই মারা গেল দু'তিন দিন ভুগে।

কদম তখন সবে এ বাড়ির বৌ হয়ে এসেছে। সে জানত না গোবিন্দের জমির বেশিটাই কোন্ ফাঁকে হাতবদল হয়ে গেছে। ফলে সংসারে নেমে আসে দারিদ্র্যের কালো ছায়া। ওর মনে হয় গোবিন্দ নয়, নোটনই ওকে ঠকিয়েছে। তবু কোনোমতে মুখ বুজে সয়ে দিন কাটাতে চেষ্টা করে কদম।

নোটন এখনও স্বপ্ন দেখে। তাদের ছিল একলপ্তে দশবিঘে জমি। গোবিন্দ তরুণ বয়সে বেশ ভালোভাবেই চাষবাস করত। এখন নোটন দেখে তার লাগোয়া জমির সাতবিঘে ধনকেষ্ট পালের দখলে, এক দিকে বিঘে তিনেক জমিতেই নোটন এখন হাই ইলডিং ধানের চাষ করে।

ঠিকমতো সার, জল দেওয়ার দরকার এই সুখী ধানগাছগুলোকে। বছরে দু'বার ধান চাষ করে। মাঝে অন্য ফসল। কিছু সবজি করতে পারলে এখন দুর্গাপুর বাজারের পাইকেররা ক্ষেত থেকেই ফসল নিয়ে যায়, নগদ দাম দিয়ে। নোটন নিজের ছাড়াও দত্তবাবুদের কিছু জমি ভাগে চাষ করে। হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে আনাজ ফলায়। এখন দামও পায় ভালো। নোটন স্বপ্ন দেখে এই ধনকেষ্ট পালের বন্ধকী দশ হাজার টাকা সে ফেলে দিয়ে বাকি সাতবিঘে পৈতৃক জমি উদ্ধার করবে। তখন তার দিন বদলাবে।

তাই ভাগের জমির আয়, ফসল বিক্রির আয় সে জমিয়ে রাখে তিল তিল করে তার শোবার ঘরের এক কোণের মাটির নিচে একটা মজবুত বাক্সের ভিতর।

তাদের গঞ্জে এখন ব্যাঙ্ক হয়েছে। কিন্তু সেখানে লেখাপড়া না জানলে খুবই অসুবিধা। বাবুরা কী জমা করতে কী করবে তা জানে না। সই না মিললে টাকাও দেবে না। তাছাড়া পাঁচজনে জানবে নোটন ব্যাঙ্কে টাকা রেখেছে। এসব ঝামেলার থেকে মাটির নিচে মা লক্ষ্মীর ভাণ্ডার রাখাই নিরাপদ। নোটন তিল তিল করে জমাচ্ছে। কদমকেও জানায়নি, একেবারে বন্ধকী টাকা মিটিয়ে জমির দখল নিয়ে চমকে দেবে কদমকে। নোটন তাই দিনান্ত পরিশ্রম করে।

আজও এসেছে মাঠে। ধান তুলে আলুর চাষ করবে। আর কাঠা দশেক জমিতে বোম্বাই পিঁয়াজও লাগাবে। তবু হাজার খানেক লাভ তো হবেই। আলু থেকেই ভালো ফলন হবে। হাজার দুয়েক লাভ থাকবে। তাহলে এবারই চৈতমাসে জমি ছাড়িয়ে নিতে পারবে সে।

কদম আসছে মাঠ দিয়ে, তার গানের সুর নীরব আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে। পগারের ওদিক থেকে নোটন দূরে বৌকে দেখতে পায় না, তবে তার গান শুনে খুশিই হয়, জোরে জোরে ভিজে ধানগাছের

মুঠিতে কাস্তে চালাতে থাকে। কদম হঠাৎ সামনে ধনকেষ্ট পালকে দেখে চাইল। ধনকেষ্ট অবশ্য আগেই কদমকে দেখেছে। পালমশাই-এর নজর চারিদিকেই। না হলে গ্রামের কেন, পাঁচ গ্রামের মধ্যে এক বিশেষ ব্যক্তি হয়ে উঠত না। গ্রামের ওদিকে তার বিরাট ধানকল, শহরেও ছেলের ব্যবসা, বাড়ি। জিপ হাঁকিয়ে গ্রামে আসে মাঝে মাঝে।

পালমশায়ও এ দিগরের নামি লোক। নিজে অবশ্য অঞ্চলপ্রধান হয়নি। বলে, ও সব রাজনীতিতে নাই, ব্যবসা বাণিজ্য করি, তাই ভালো। তবে সকলেই জানে পঞ্চায়েতের প্রধান কেন, এখানের এম্-এল-এ সাহেবই, পালমশায়ের কৃপাধন্য, তাঁর কৃপা না হলে এখানে ওরা পায়ের তলে মাটিই পেত না। তাই তারা পালমশায়ের ইঙ্গিতেই চলে, মায়, এখানের থানার দারোগাবাবুকে ও সপ্তাহে একদিন ওঁর বৈঠকখানায় রাতে হাজিরা দিতে দেখা যায়।

ওই এম-এল-এ দারোগার মতো তাবড় ব্যক্তিরা আসেন দিব্যি সুস্থ মানুষ, অধিক রাতে যখন বের হন, পালমশাই-এর বিশেষ দ্রব্যগুণে তাঁরা তখন ঝড়ে কাঁপা তালগাছের মতো টলটলায়মান। অবশ্য পালমশাই নাকি নীলকণ্ঠ, ত্যানার পা কিছুমাত্র টলে না।

পালমশাই জানেন মাটিই লক্ষ্মী। এই জমি থেকেই তাঁর সব স্বনামে বেনামে কয়েকশো বিঘে সরেস জমি তাঁর দখলে। ধানকলের জন্য নিজের জমির ধান ছাড়াও এলাকার চাষিদের চাষের আগেই দাদনের টাকা, সার দিয়ে রাখেন। ধান উঠলে সব বিক্রি করতে হবে তাঁকে।

এ হেন পালমশাই এখনও গ্রামেই থেকে গেছে। সকালে একবার মাঠে ঘুরে আসে। চারিদিকে নজর রাখতে হয়, আজও এসেছে। কদমকে দেখে। নিটোল দেহে যৌবনের ঢেউ তুলে আসছে কদম। পালমশাই-এর নজর আছে ওর উপর। অবশ্য এখানের যা কিছু সরেস, যা কিছু সেরা, সেটার উপরই নজর পড়ে পালমশাই-এর। ধনকেষ্ট পাল সে সব জিনিস দখলও করে, সে যে ভাবেই হোক।

ধন পালের নজর ছিল গোবিন্দের ওই দশবিঘে জমির উপর। খালের ধালের ধারে সরেস জমি, ওখানে ধান ছাড়াও আলু, বেগুন, টম্যাটো, ফুলকপি এসব চাষ ভালো হয়। তার থেকে সাতবিঘের দখল সে নিয়েছে। বন্ধক দিয়েছিল গোবিন্দ। এখন ও জানে ওই জমি ছাড়াবার চেষ্টাও করবে নোটন। কিন্তু পালমশাই যা গিলে ফেলে তা আর ওগরায় না। ও জমি দেবেই না, উল্টে বাকি তিনবিঘে জমি নোটনের হাত থেকে নিয়ে নিতে চায় সে। কদমকে দেখে বলে, কোথায় চললি রে সাতসকালে?

কদম দেখছে পালমশাইকে। লোকটার টাকার গল্প সেও শুনেছে কিন্তু বাইরে তার কোনো পরিচয়ই নেই। সহজ সাদামাটা লোক। কদমও জানে, ওর চাহনির ভাষাটা। বলে সে— মাঠে।

পালমশাই বলে, এই শীতে শিশিরে পা কনকনিয়ে ওঠে, তবু বেরুস। আহা—বলি এসব তোর জানা নয় রে কদম। নোটনটাকেও বলি—মাঠে চাষ করে কী পাস! এখন চাষে আছেই বা কী, শহরে কাজকর্ম করগে—আরামে থাকবি। কদমও মনে মনে স্বপ্ন দেখে, গ্রামের এই অভাব-অভিযোগ, দুঃখ থেকে মুক্তি পেয়ে শহরে যাবে। সেখানে পুকুর থেকে জল তুলতে হবে না, মাঠে ঘাটেও ঘুরতে হবে না, অন্ধকার ঘরে টেমি মাত্র কিছুক্ষণের জন্যে জ্বেলে (তেলের অভাবে) বাকি রাত অন্ধকারে মশার কামড় খেয়ে পড়ে থাকতে হবে না।

শহরে সে একবার গেছিল বাবুদের বাড়ির বিয়েতে তত্ত্ব নিয়ে। দেখেছে পথঘাট, ঘরবাড়িতে বিজলি বাতি জ্বলে। গাঁয়ে দু'এক ঘরে অবশ্য জ্বলে। কিন্তু শহরে সকলের ঘরেই জ্বলে। চকচকে রাস্তা, দোকানপাট কত সাজানো। সিনেমাও দেখেছে সেখানে। সে এক প্রাচুর্যের জগৎ। কদমের চোখে কী নেশা এনেছিল ওই জগৎ! বারবার সেখানে যেতে মন চায়। পালমশাই যেন সেই স্বপ্নই দেখায় তাকে।

কদম বলে, শহরে কে কাজ দিবে গ? অচেনা জায়গা!

পালমশাই জানে কি করে মানুষকে লোভ লালসার জালে জড়াতে হয়। সব মানুষই ওই রিপুর বশীভূত। সমাজের উঁচুতলার মানুষের চাহিদা আরও বেশি—নিচুতলার চাহিদা কম। কিন্তু আকারটা ভিন্ন হলেও প্রকারটা একই।

এইগুলোকে খেলিয়েই পালমশাই নিজের কার্যসিদ্ধি করে। বলে পালমশাই, আমার তো শহরে

কারখানা আছে। দেশের লোক তোরা, তোদের জন্য কাজ সেখানে থাকবেই। মাস-মাইনে, পাকা কোয়ার্টার। মানে বাসা, কলের জল, বিজলির আলো—সব পাবি।

কদম দেখছে পালমশাইকে। ডাগর দু'চোখ তুলে শুধোয়—সত্যি! দিবা চাকরি?

হাসে পালমশাই—শুধু ছেলেরাই সেখানে চাকরি করে না, মেয়েরাও কাজ করে। কত মেয়ে সেখানে কাজ করে। নিজেরা নিজেদের টাকায় ঘরসংসার করে। সেখানে তুইও কাজ করবি। দু'জনের রোজগার তো কম হবে না, এখানের চেয়ে ঢের ভালো থাকবি।

কদম স্বপ্ন দেখে। পালমশাইও বুঝেছে, ওষুধটা ঠিকমতো ধরেছে। কদমের মতো মেয়েকে হাতে আনতে পারলে পালমশাইও খুশি হবে। ওসব কাজের জন্য পালমশাই-এর শহরের কারখানার বাইরে নির্জন শালবন পাহাড়ের কোলে একটা বাগানবাড়ি আছে। পালমশাই সেখানে অন্য মানুষ।

কিন্তু জালে ঠিকমতো জড়াতে হবে শিকারকে। তাই কিঞ্চিৎ টোপও দিয়ে রাখল মাত্র। বলে পালমশাই—

—ভেবে দ্যাখ, এখানে কী পাস? এর নাম বাঁচা? তোর মতো মেয়ের এইভাবে বাঁচা দেখলে কষ্ট হয় রে। নোটনকে বোঝা। পরে দেখা হবে। সন্ধ্যার পর কাছারিতেই থাকি।

নোটন এসব খবর জানে না। সে অন্য হিসাবে চলে। ধান এবার ভালোই হয়েছে। আলু আর সবজির বাজারটা পেলেই এবার সে বন্ধকী জমি ছাড়িয়ে নিয়ে ভালো করে চাষ করবে।

কদম পান্তা এনেছে। ভোর থেকে কনকনে শিশির-ভেজা ধান কাটতে কাটতে হাত দুটো অবশ হয়ে আসে নোটনের। মাটিও হিমঠান্ডা। পা দুটোতে যেন সাড় নেই। উঠে আসে, আলের উপর। এখন রোদ উঠেছে। কিছুক্ষণ চাদরটা জড়িয়ে নিয়ে আলে বসলে বেশ ওম লাগে। খিদেও পেয়েছে।

নোটন খেতে থাকে। কদম দেখছে মানুষটাকে। শীতের দাপটে ওর হাত পা ফেটে ফেটে গেছে, মাথার চুলগুলো ধানমাঠের এলোমেলো ধানগাছগুলোর মতোই বিশৃঙ্খল।

নোটন বলে, এবার ধান, আলু সবজির ফলন পেলে জমির বন্ধকী টাকা সব ফেলে দিয়ে সামনের সন থেকে নতুন করে চাষ ফাঁদব।

কদমের মনে পড়ে পাল মশাই-এর কথা। শহর-জীবনের ঝকমকে পরিবেশ, তার নিজের চাকরি করে টাকা রোজগার করার কথাও। এইভাবে কষ্টে সৃষ্টে মাঠে রোদ জল হিমে ঘুরতে হবে না। বলে কদম—এতেই রক্ষে নাই, দিনভর খেটে দিন চলে না, আবার চাষ বাড়াবে? চাইল নোটন কদমের দিকে। মেয়েটার মাথায় যেন সব সময় অন্য হিসাবের পোকা কিলবিল করে। নোটন যা বলবে ও বলবে তার উল্টোই। নোটন বলে, না তো চাষির ছেলে আর কী কাজ করব? মাটির কাছাকাছি আছি, যা করতে হয় তা মাটি থেকেই করব।

ছাই করবে। গদাইকে দেখনি?

—গদা! ওই ফোঁপর দালালটা!

—গদাই এখন শহরে চাকরি করে, ভালো টাকা পায়। কেমন দামি প্যান্ট জামা জুতো পরে আসে গাঁয়ে।

নোটন অবাক হয়। বলে, ওর জমি নাই। বন্ধক ছাড়ালে দশবিঘে দোফসলী জমি পাব। শহরে ফুটানি করতে গে'লাভ কি? পায়ের তলে মাটি যাদের নাই, তারাই শহরে যায়।

ওসব কথা ছাড় তো!

কদম চুপ করে যায়। বেশ জানে সে, নোটন তার কোনো কথার কোনো দাম কোনোদিনই দেয়নি। বরাবর তাকে অবজ্ঞা আর অবহেলাই করেছে।

কদম এতদিন ওর সব অবজ্ঞা, অবহেলা সহ্য করেছে। আজ সেই বঞ্চনাগুলোরই হিসাব করতে চায় কদমের মন। গুম হয়ে কি ভাবছে সে। নোটনের খাওয়া হয়ে গেছে।

কদম নীরবে থালা ঘটি নিয়ে চলে গেল। নোটনের নষ্ট করার মতো সময়ও নেই। বেশি বেলা হলে এ-জমির ধান আধকাটা করে যেতে হবে, তাই সে তাড়াতাড়ি এ-জমির ধান কাটা শেষ করতে চায়।

কদম এবার ভাবছে কথাটা। বেশ জেনেছে, নোটন গ্রাম ছেড়ে এই মাটি ছেড়ে যাবে না কোনোদিনই। কদমের মনের পুঞ্জীভূত বঞ্চনার জ্বালা ক্রমশ নীরব প্রতিবাদের রূপ নিতে চায়।

সে জানে না, নোটন পালমশায়ের ওই টাকা কোথা থেকে দেবে। দু'একবার জিজ্ঞাসা করেও উত্তর পায়নি কদম। নোটন বলে টাকার জোগাড় হয়ে যাবে। অর্থাৎ কোথাও টাকা তার আছে। আর জানে কদম, একবার ওই জমি ছাড়াতে পারলে নোটন এখানেই শিকড় গেড়ে বসবে। কদমকেও সারাজীবন এই নিষ্ঠুর বঞ্চনা সয়ে বাঁচতে হবে এই গ্রামের অন্ধকারে, এই কঠিন জীবনের লড়াই করে।

শহরের হাতছানি তাকে ডাক দেয় বার বার। সেদিন রাতেও কথাটা বলে কদম, শহরে চাকরি ঠিক পাবে। দুর্গাপুরে তো কত লোক কাজ করে, এখানে পড়ে থেকে কাদা ঘেঁটে কী পাবে? সেখানে মেয়েরাও কাজ করে, টাকা রোজগার করে। দু'জনে কাজ করে অনেক পয়সা পাব, পাকা বাসা পাব।

নোটন গর্জে ওঠে—থামবি? না হলে টুঁটি টিপে ন্যাতার মেরে। কদমও এবার ফুঁসে ওঠে—ভাত দেবার ভাতার নয়, কিল মারবার গোঁসাই! কি দিয়েছ? একখানা ভালো শাড়ি, বাস-তেল, সাবান-গহনা—কি দিয়েছ? গাঁয়ে শুধু খেটেই মলাম!

নোটন অবাক হয়। কদম যে মনে মনে তার বিরুদ্ধে এসব অভিযোগ খাড়া করেছে তা জানত না। নোটন বলে—লোভ বেশি করিস না, মরবি। লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। কদমও ফুঁসে ওঠে—ওসব কথা রাখো তো! ন্যানা নাই, ফনা আছে। মরদ! ঢের দেখেছি এমন মরদের মুরোদ।

কাঁথাখানা গায় দিয়ে ওপাশে শুলো। মনে তার আগুন জ্বলছে। নোটন বলে, জমিটা ছাড়াই, তার পর সনেই তোকে গয়না একখান দোব।

কদম জবাব দিল না। বেশ বুঝেছে, নোটন শহর যাবে না। কদমকেও এইখানে বন্দি দশাতেই থাকতে হবে জীবনভর সব বঞ্চনা সহ্য করে। মেয়ে হয়ে জন্মেছে, তার নিজের ইচ্ছার কোনো মূল্যই কেউ দেবে না।

রাত কত জানে না।

জ্বালাভরা মন নিয়ে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল কদম। শীতের রাত। মেঝে ফুঁড়ে হিম ওঠে, আর বাতাসও বেশ কনকনে ঠান্ডা। একটা কাথায় এই শীত ভাঙ্গে না। মাঝরাতে ঘুম ভেঙে যায় কদমের। দেখে, পাশে নোটন নেই।

ঘরটা অন্ধকার। কি ভেবে কদমও বের হয়ে আসে নিঃশব্দ পায়ে। দেখে, ঘরের ওদিকে লক্ষ্মীর ঘর। একটা ছোট্ট কুঠুরি। সেখানে লক্ষ্মীর আসন-পট রয়েছে। ওই ঘরের মধ্যে একটা লম্ফ জ্বেলে মাটির নিচেকার গর্ত থেকে নোটন একটা চটে জড়ানো বাক্স বের করে সেখানে বসেই বেশ কয়েক বান্ডিল নোট গুনছে। মনে হয়, কয়েক হাজার টাকাই। কদম অবাক হয়। এবার বুঝেছে কদম নোটনের ওই গুপ্ত সঞ্চয়ের কথা। তাকেও বিশ্বাস করেনি।

ওই টাকা দিয়েই, আর এবছরের ফসল বেচার টাকাতে নোটন বন্ধকী জমি ছাড়াবে। ওই টাকা সে জমিয়েছে গোপনে, তার জন্যই কদমকে এতদিন অভাব আর বঞ্চনা সহ্য করতে হয়েছে তিলে তিলে। আর ওই টাকার জোরেই জমি ছাড়িয়ে নোটন এখানেই গেড়ে বসবে; কদমকেও বন্দিনী করে রাখবে। লোকটা দারুণ স্বার্থপর। তার স্বার্থেই কদমকে নিজের স্বপ্ন সাধ বিসর্জন দিয়েই এই মাটিতে পড়ে থাকতে হবে সব কষ্ট সহ্য করে।

সরে আসে কদম। ঘরে এসে কাঁথা মুড়ি দিয়ে আবার শুয়ে পড়ে। সে যে নোটনের ওই গোপনতম ব্যাপারটা দেখেছে, সেটা জানতে দিতে চায় না নোটনকে। ওই সঞ্চয়ই আজ কদমকে আরও নিষ্ঠুর, কঠিন, স্বার্থপর করে তুলেছে।

নোটনের এই কৌশল, ষড়যন্ত্রই। তাকে বঞ্চিত করে আটকে রাখার ষড়যন্ত্রকে কদম নীরবে মেনে নেবে না। এর উচিত জবাবই সে দেবে।

কদম তাই সাবধানে এগোতে চায়। নোটন এখন মাঠের কাজে ব্যস্ত। ধান তোলার পর এবার আলু লাগাবে। দু'তিন জন কৃষাণ মাঠ চাষ দিয়ে মাটি তৈরি করতে হবে। আলুর জমির মাটি হবে ভুরো

চিনির মতো আলগা, তাতে সার নিমখোল দিয়ে মাটির বতর এনে তবে আলুর বীজ ভেলি করে লাগাতে হবে। এখন সময় নেই তার।

বিডিও অফিসে যেতে হচ্ছে সার, আলুবীজের জন্য। পারমিট চাই।

কদম মাঠে যথারীতি খাবার নিয়ে যায়। মুখ বুজে কাজই করে, কিন্তু মনের অতলে সেই স্বপ্নটাকে বাস্তবে রূপ দেবার কথাও ভাবছে।

আর তাতে ইন্ধন দেবার কাজটা পালমশাইও ঠিকমতো করে চলেছে। সন্ধ্যার মুখে পালমশাই-এর খামার বাড়িতে আসে কদম। ধনকেষ্ট পালকেই বলে কদম—

—লোকটা আপনার বন্ধকী টাকা ফেলে দিয়ে ওই জমি খালাস করে নেবে।

—তাই নাকি? ধনকেষ্ট পাল একটু বিব্রত বোধ করে। তবু শুধোয়, এত টাকা কোথায় পাবে ব্যাটা?

—তার যোগাড় করছে। বলেছে এবার আলু সবজির দাম পেলেই সব টাকা দিয়ে দেবে। আলুও লাগাচ্ছে অনেক জমিতে। ধনাপাল চায় না ঐ জমি ছাড়িয়ে নিক নোটন। উল্টে সে ভাবছে বাকি তিন বিঘা জমিও সে কেড়ে নেবে নোটনের কাছ থেকে। এবার তাকে সেই পথই নিতে হবে। আর পালমশাই জানে অন্যের জমি কিভাবে দখল নিতে হয়। এসব কাজে সে খুবই নিপুণ।

পঞ্চায়েতের কাছে সারের পারমিটের দরখাস্ত করতে হবে, তাই পালমশাই বোর্ডের প্রধান নরহরি আর কেরানি প্রসাদকে ডেকে বুদ্ধিটা দেয়। ওই নোটনের দরখাস্ত লিখে দেবার সময় কোর্টপেপারে ওর টিপছাপও একটা নিয়ে নিতে হবে। প্রধান, স্বায় কেরানিও পালমশাইকে চেনে। জলে বসে করে কুমিরের সঙ্গে বিবাদ করা যায় না। ঐ গর্হিত কাজের জন্য অবশ্য পালমশাই নগদ শ'পাঁচেক টাকাও দেবে তাদের। ফলে কেরানি বলে,—

—ওসব হয়ে যাবে পালমশাই। টিপছাপ দেওয়া কাগজ আপনার হাতে পৌঁছে দেব দু'একদিনের মধ্যেই।

পালমশাই একদিক থেকে শত্রুকে আক্রমণ করে না। সে জানে যুদ্ধে সাঁড়াশি আক্রমণই প্রতিপক্ষকে করতে হবে, সেইটাই এনে দেবে তাকে নিশ্চিত জয়। তাই এদিকের কাজ পাকা করে এবার পালমশাই কদমের কথাই ভাবছে। মেয়েটাকে তার নজরে ধরেছে। শুধু জমিই নয়, নোটনের সবকিছুই দখল করবে এবার পালমশাই। কদমকে একবার গ্রাম থেকে বের করে নিয়ে যেতে পারলে কদমের আর এই গ্রামে ফেরা সম্ভব হবে না। তখন সমাজের মাথা পালমশাই-ই গ্রামসমাজের পবিত্রতা, শালীনতার প্রশ্ন তুলে কদমকে মাটিছাড়া করবে। আর কদম তখন বাধ্য হয়ে তার হাতে আসবে পুরোপুরি ভাবেই। পালমশাই সেইমতো কাজই করবে।

অবশ্য কদমকে এসব কথা জানাতে চায় না এখন ধনা পাল। এখন সে কদমের একমাত্র শুভাকাঙ্ক্ষী। কদমকে পালমশাই বলে, নোটন কী বলে? শহরে যাবে? তাহলে তোমাদের কাজের ব্যবস্থা করি, একটা বাসার ব্যবস্থাও করতে হবে। নোটনকে দেখা করতে বল একদিন।

কদম দেখছে পালমশাইকে। লোকটা তাদের জন্য সত্যিই কিছু করতে চায়। এই গাঁয়ের—আশপাশের গ্রামের অনেক ছেলে এমনকি মেয়েদেরও, শহরে তার কারখানায় কাজের ব্যবস্থা, সেখানে বাসার ব্যবস্থাও করেছে বলে জানে।

গদাই তাদেরই একজন। এ গাঁয়েরই ছেলে। গাঁয়ে বাউণ্ডুলের মতো ঘুরত, মেলায় অয়েলক্লথের জুয়ার ছক পেতে বসে জুয়ার খেলা চালাত। এহেন নিষ্কর্মা গদাই এখন শহরে থাকে, ওখানে চাকরি করে।

গদাই গ্রামে আসে যখন, অন্য মানুষ। পালমশাই-এর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। বলে, এমন মানুষ হয়না রে নোটন, দেবতুল্যি মানুষ।

নোটন হাড়ে হাড়ে চেনে ধনা পালকে। ক্রমশঃ জেনেছে, ওই ধনা পাল তার বাবাকে দু-চার বোতল মদ গিলিয়েই ওই জমির বন্ধকী দলিল করে নিয়েছে। সে একথাও জানে, এখন ধনা পাল এই দিগরের মাথা। অনেকের অনেক সর্বনাশ করে ধনা পাল নিজের কাজ গুছিয়ে নিয়েছে।

নোটন অবশ্য এর মধ্যে ওর কাছে গেছে। পালমশাই খুশি হয়, ভেবে নেয় কদম ওকে বলেছে কথাটা, নোটন তার বাকি জমি বিক্রি করে শহরেই চলে যাবে। চাকরি অবশ্য একটা দেবে তাকে, কিন্তু তারপর শহরে ওকে হঠিয়ে দিয়ে কদমকে দখল করবে পালমশাই। পালমশাই বলে, আয় নোটন। তাহলে সুমতি হয়েছে। আর, গ্রামে কী আছে? এখন শহরেই ভিড় করছে সব মানুষ। নগদ পয়সা সেখানেই।

নোটন বুঝেছে কদমকে কে ওই সব কথা বুঝিয়েছে। নোকটার নজর যে কদমের দিকে, তাও বুঝতে দেরি হয় না নোটনের। কদম তাহলে লোকটার কাছে আসে। নোটন রাগ চেপে বলে—তার জন্য আসিনি পালমশাই।

—তবে? একটু অবাক হয় পালমশাই। নোটন বলে—

—এসেছিলাম আমার বন্ধকী জমিগুলো ছাড়ানোর ব্যাপারে। পালমশাই জানে. এখন তার হাতে নোটনের মারণাস্ত্র এসে গেছে। ওর টিপছাপ দেওয়া সাদা কোর্টপেপার বোর্ডের কেরানি তাকে দিয়ে গেছে। ওই দিয়েই নোটনের পায়ের তলের মাটি সে কেড়ে নেবে। সে-সব কথায় না গিয়ে পালমশাই নিপাট ভালোমানুষের মতো বলে, বেশ তো, নিবি। তবে সুদে মূলে প্রায় দশহাজার টাকা হয়েছে।

—তা দিয়েই নোব। নোটন জানায়—সামনের মাসের শেষেই নোব।

—পালমশাই বলে, আয়। তখন ব্যবস্থা করে দেব।

নোটন বাড়ি ফিরেই গর্জে ওঠে—খুব যে শহরের কথা বলিস, তা কোন্ শালা ঐ মতলব দিয়েছে তোকে, এ্যাঁ? ডুবে ডুবে জল খাচ্ছিস? নচ্ছার মেয়ে—

কদম গর্জে ওঠে—যা তা বলবে না?

—ফের চোপা! তবে রে,—নোটন আজ বীর বিক্রমে লাফ দিয়ে গিয়ে কদমের চুলের মুঠি ধরে দমাদ্দম লাথি কিল মারতে থাকে। কদম এতদিন অনেক কিছু সহ্য করেছে। আজ গায়ে হাত তুলতে দেখে অবাক হয় সে। নীরবে মারটা হজম করে। নোটন গর্জাচ্ছে—

—ওই পালমশাই আর তার চামচে ওই শালা গদাই-এর সঙ্গে কুনোদিন কথা বললে তোর গলায় পা দিয়ে শেষ করে দোব, হ্যাঁ।

তার বাবা গোবিন্দও মাকে এমনি করেই পেটাত। আর সে যোগ্য বাপের ব্যাটাই হয়েছে। এমন দুষ্টু মেয়েকে এবার সযুত করে দেবে সে। সে-ও এবার তার সব জমির মালিক হবে।

কদম দাওয়ায় বসে আছে! নোটন প্রহার করে শাসিয়ে মাঠে গেছে। কদম আজ ওই আঘাত আর অপমানে মনে মনে যেন বিদ্রোহিণী হয়ে ওঠে। নোটনের সব বঞ্চনারই এবার সে উচিত জবাব দেবে। আজ তার মনে এক নতুন সত্তার জাগরণ ঘটে।

সন্ধ্যার মুখে পালমশাই তার খাস কামরায় বসে তেজারতির হিসাবপত্র দেখছে। বাকি দেনার দায়ে আর কি দখল করা যায়, তারই হিসাব করছে। এমন সময় কদমকে ঢুকতে দেখে চাইল—

—আয়, কদম—একি!

কদমের কপালে নোটনের পরাক্রমের ছাপ তখনও আঁকা রয়েছে। কদম আজ মনস্থির করেই ফেলেছে। বলে সে—

—আমাকে শহরে একটা কাজ দেবা পালমশাই?

পালমশাই ওর দিকে চেয়ে থাকে। মেয়েটাকে এতদিন ধরে চেষ্টা করেও হাতে আনতে পারেনি। আজ নোটনের কয়েকটা আঘাতেই মেয়েটার মনে এমনি ভাঙ্গন আনবে, ভাবতে পারেনি। পালমশাই জানে, এই মতান্তর সাময়িক। পরে হয়ত আবার কদমই বদলে যাবে। ধূর্ত লোকটা জানে, লোহা গরম থাকতে থাকতে ঘা মারলেই মনমতো আকৃতিতে আসে। তেমনি ওকে এখনই মদত দিয়ে ওর মনের জ্বালাকে কাজে লাগাতে চায়। তবু বলে—নোটন যাবে না?

কদম বলে, ও যেখানে যাবার যাক। আমাকে কাম কাজ দাও, থাকার একটুন জায়গা দাও, এখানে আর থাকব না। শেষ দিকে কদমের কণ্ঠস্বর বেদনায় অপমানে বুজে আসে।

পালমশাই বুভুক্ষু দৃষ্টিতে দেখছে মেয়েটাকে। এবার তার দখলদারি ওখানেও শুরু হবে। পালমশাই আজই সব ব্যবস্থা করে ওকে পাচার করে দেবে। পরদিন সকালে ঘুম ভাঙ্গে নোটনের। কদমকে দেখে না। বোধহয় ঘাটে গেছে। আজ নোটনের মনটাও ভালো নেই। কাল রাগের বশে ওইভাবে মারাটা ঠিক হয়নি। এখন কিছুটা দুঃখও হয়।

কদম আর ফেরে না। ওদিকের ঠাকুর ঘরের দরজা খুলেই অস্ফুট আর্তনাদ করে ওঠে নোটন। দৌড়ে যায়। দেখে আটনের নিচের মাটি খুঁড়ে কে তার তিল তিল করে সঞ্চিত সেই টাকা নিয়ে চলে গেছে। হাহাকার করে ওঠে নোটন। কদম-ই হারিয়ে যায় নি, সে সঙ্গে করে নিয়ে গেছে নোটনের নতুন করে বাঁচার সব আশ্বাসটুকুও। ওই জমি বন্ধক মুক্ত করে নোটন নতুন করে বাঁচত—সেই স্বপ্ন সাধও নিঃশেষ হয়ে গেল।

শুধু ঘরের বউই নয়, তার মাটিটুকুর দখলদারিও কেড়ে নিয়েছে কোন্ অদৃশ্য এক দানব। তাকে চেনে নোটন—কিন্তু কিছু করার সাধ্য নেই।

ভয়

নিতাই হে—কোথায় আছো হে—এ—এ—এ! ভোর রাতের স্তব্ধতা ভেদ করে ডাকটা বাঁশ সরবন ঢাকা কানা ময়ূরাক্ষীর তীরে বালিচরের বুকে—বুনোনাম অর্জুন গাছের ছায়াঘন অন্ধকারে ছড়িয়ে পড়ে। বেশ ভরাটি গলায় কে নিতাইকে হাঁক পাড়ছে।

আবার শোনা যায়—ওহে নিতাই সংসার রসাতলে গেল হে—এ—এ!

একটু অবাক হই, ঘুম ভেঙে গেছে। নদীর ধারে সাবেকি আমলের ডাকবাংলো—মেঝেটা ক্রমশঃ জমিসমান হয়ে গেছে, নিচু টালির ছাউনি। ছোট মফঃস্বল শহর, বিজলিবাতি এলেও ডাকবাংলোর সেই ব্রিটিশ আমলের কেরোসিনের ডিবাই জ্বলে। এই বিকট চিৎকারে শেষরাতেই ঘুম ভেঙে গেছে।

চৌকিদারও জেগে উঠেছে, ডাক শুনে গজরায়—শালা মরেও না! ব্যাটা নিতাইয়ের বাচ্চা—কসাই।

আবার পাশ ফিরে শোয় সে, ওদিকে তখন রাস্তার বেওয়ারিস কুকুরের দল সেই হাঁকডাকে বিরক্ত হয়ে রকমারি কণ্ঠে প্রতিবাদ করে শান্তিভঙ্গের জন্য। ডাকবাংলোর ক'টা নেড়ি কুত্তাও দৌড়ল সেই প্রতিবাদে যোগ দিতে।

তারপরই কাণ্ডটা ঘটে যায়। ডাকবাংলোর গেট ফটক অতীতে ছিল, এখন ওসব কিছুই নেই, সকলের জন্যই অবারিত দ্বার। সেই দরাজ গলার ডাকটা এবার আরও কাছে আসে—নিতাই হে—চালের দর যে বেড়ে গেল হে—নিতাই।

কুকুরগুলোও গলা তুলে চিৎকার করে—আর দেখা যায় একটা বেশ দশাসই চেহারার লোক হন্তদন্ত হয়ে দৌড়ে এসে ডাকবাংলোর বারান্দায় উঠেছে—পিছনে ধাবমান এক ব্যাটেলিয়ান রকমারি সাইজের কুকুরবাহিনী তারস্বরে চিৎকার শুরু করেছে।

—সতীশ!

চৌকিদারের নাম সতীশ, সেও এবার উঠে সামনে ওই দশাসই লোকটাকে দেখে ফুঁসে ওঠে।

—রাতভোর ঘুমুতে দেবে না পাড়ার লোকদের, ওই নিতাই নিতাই করে চন্দরমাশায়!

আমিও বের হয়ে আসি। সেই লোকটার পায়ে রক্ত পড়ছে, বলে সে—নিতাই হে—কুকুরে কামড়ালো হে—

ওর দুই হাতে দুটো গাবদা কত্তাল পিটতে থাকে ঝমর ঝমর করে। আর সেই বিশাল বপু থপথপ করে ঈষৎ নৃত্য করতে থাকে।

—কুকুরে কামড়েছে হে নিতাই—

ভোরের বেলা—ঘুমোবো না এই বেশে এসে উন্মাদ নৃত্য দেখাবে মানুষটা! ধমকে উঠি—কি হচ্ছে এখানে? থামুন তো মশায়!

কে কার কথা শোনে। চিৎকার করছে সে—নিতাই হে—ঘোর কলিকাল হে—এ—, নামপ্রেমে কেউ মজলো না হে—

চৌকিদারকে বলি—এ কি পাগলের কাণ্ড!

সতীশ ওকে থামাবার চেষ্টা করে—চন্দরমাশায়, থামো গো!

লোকটাও ঝমর ঝমর করে কত্তাল বাজাচ্ছে আর ভালুকের মত থপ্ থপ্ করে নাচতে নাচতে

বলে—থামার উপায় নেই, হে নিতাই, রিল ফিট করা আছে হে—ওহে নিতাই—এদের উদ্ধার করো হে নিতাই—

লোকটা এইভাবে নাচতে নাচতে আর চিৎকার তুলে বের হয়ে গেল ডাকবাংলো থেকে। কুকুরের কামড়ের খেয়াল নেই। ওর এই বেপরোয়া ভাব দেখে কুকুরগুলোও বোধ হয় ঈষৎ লজ্জা পেয়ে সরে গেছে।

চন্দমাশায় চলেছে বজ্রকণ্ঠে হাঁক পাড়তে পাড়তে নিতাই হে—বাজার চড়ে গেল হে—মাঠে ধানও নাই হে—

যেন রিপোর্টিং করে চলেছে কাকে।

ঘুম আর হলো না, সকালে চা খেয়ে বের হতে হবে। ক'দিনের জন্য এসেছি এখনে জরুরী সরকারী কাজে। সকালে সতীশ চা-জলখাবার এনেছে। শুধোই ওকে—ওই পাগলটা কে? উঃ জ্বালিয়ে গেল!

সতীশ বলে—চন্দরমাশায়ের কথা বলছেন স্যার? পাগল কেন হবে, সারা এলাকার লোককেই পাগল করে তুলেছে স্যার। ওই তো ওর বাড়ি—

বারান্দা থেকে দেখা যায় রাস্তার ওপারে বিরাট তিনতলা বাড়িটা, বারান্দা—নীচের বারান্দার সব মজবুত গ্রিলে আটকানো, জানালাও পোক্ত। বাড়ি নয় যেন ছোটখাটো দুর্গ আর বেশ অবস্থাপন্ন লোকের বাড়ি তা বোঝা যায়।

বলি—ওঁর বাড়ি?

সতীশ বলে—শহরে আরও দু'তিনখানা বাড়ি আছে, বাজারে দোকান—সেসব ছেলেরা দেখে, উনি থাকেন এই বাড়িতে। থানার কাছেই ওই বাড়ি করে এসেছেন কয়েক বছর, সেই নকশাল হাঙ্গামার সময় থেকেই।

অর্থাৎ বেশ সঙ্গতিপন্ন লোকই। অথচ দেখেছি ওকে একটা ছোট্ট ধুতি আর ফতুয়া পরা এক বিচিত্র অবস্থায়।

দিনের আলো ফুটেছে, এখন ওই বাড়িটা শান্ত-স্তব্ধ। সতীশকে শুধোই—উনি খুব ভক্ত লোক, না?

সতীশ মুখ ভার করে বলে—ভক্ত? এক নম্বরের শয়তান?

সরকারী কাজ—থানাতেও আসতে হয়। একথা সে-কথার পর আজকের ভোরের সেই কথা বলতে তরুণ থানা অফিসার পরেশবাবু বলেন তাহলে নিতাই দর্শন হয়েছে আপনার? উঃ জ্বালিয়ে মারলে মশাই!

—আজ তো কুকুরে কামড়েছে দেখলাম!

পরেশবাবু বলেন—কুকুরের দোষ কি বলুন! যা বিকট আওয়াজ করে রাতভোর, পাড়ার লোক তো আমাকে কত কমপ্লেন করেছে, দিনের বেলায় চন্দ্রমশায় রাস্তায় বেরুলে ছেলেরাও লাগে পিছনে, ঢিল ছোঁড়ে, টিটকারী দেয়, ও চলে আসে থানায়। এক বিশ্রি ব্যাপার ঘটে প্রায়ই ওকে নিয়ে।

বলি—লোকটা নামগান করে—

পরেশবাবু বলেন—উঃ! টের পাবেন ক্রমশঃ। দু'চার দিন তো আছেন। ওর এই নামগান আর বিকট চিৎকারের কোন সুরাহা করতে পারিনি।

দিনভোর মফঃস্বলের কোন থানায় ইনসপেকশানের কাজ সেরে ধূলিধূসর হয়ে জিপ থেকে নেমে ডাকবাংলোয় ঢুকলাম।

সতীশ জল ধরে রেখেছে, রান্নাবান্নাও তৈরী। স্নান করে খেয়ে নিয়েছি। মফঃস্বল শহরের একপ্রান্ত, পিছনে নদীর মরা খাত—ওদিকে দিগন্তপ্রসারী ধান-ক্ষেত, সন্ধ্যার পরই সুনসান হয়ে যায়। এদিকের রাস্তাতেও লোক চলাচল কমে আসে, থানার গেটে মিটমিটে একটা বাল্ব জ্বলছে। শান্ত স্তব্ধ শহরে রাত নেমেছে সন্ধ্যার পর থেকেই।

শুতে যাবো—হঠাৎ আকাশ-ফাটানো চিৎকার ওঠে অন্ধকার বিদীর্ণ করে।

—নিতাই—হে—এ—

আর সেই সঙ্গে বিকট শব্দে দুই ডাবরের মত কত্তাল বাজছে গগন বিদীর্ণ করে। চমকে উঠি—এ শব্দটা রাস্তা থেকে নয়, এ শব্দটা উঠছে ওই তিনতলা দুর্গের ছাদ থেকে।

অসহায়ের মতো চেয়ে থাকি। স্রেফ গলার যে এত জোর হতে পারে তা জানা ছিল না। সতীশকে শুধাই কতক্ষণ চলবে হে।

সতীশ টেবিল থেকে খাবার পর বাসনপত্র ওঠাচ্ছিল। বলে সে-চলবে মানে? এই রিল এসটার্ট করলো স্যার—যতক্ষণ দম থাকবে চলবে, তা ধরেন রাত বারোটা অবধি, আর ওদিকে শুরু হবে ভোর তিনটে থেকে। সাধে কি কুকুরে কামড়ায় ওকে, পাড়ার ছেলেরা লোকজন ওর পিছনে লাগে। দ্যাখেন কখন থামে চন্দ্রমাশায়।

ভাবনাতে পড়ি।

রাত এগারোটা বাজছে, তখনও ছাদ থেকে গগনবিদারী হুঙ্কার ভেসে আসে—নিতাই হে—তুমি কি দেখতে পাচ্ছো না হে—উদ্ধার করো হে—

এদিক-ওদিকে দুচারটে ছেলে মনে হলো ওর বাড়ির বন্ধ দরজা-জানালায় ঢিল ছুঁড়ছে, কিন্তু সে তো তিনতলার ছাদে তখন কত্তাল পিটছে আর চিৎকার করছে।

ঘুমের দফা গয়া। বাজলো তখন প্রায় বারোটা, ঘুমিয়ে পড়েছি। কিন্তু মাত্র কয়েক ঘণ্টা। তারপরই আবার শুরু হয় কুকুরের চিৎকার, কত্তালের শব্দ আর চন্দ্রমশায়ের হুঙ্কার নিতাই হে—তুমি কি কানেও শোন না, চোখেও দ্যাখো না হে—, আলুর দর বেড়ে গেল নিতাই হে—

ঘুমোয় কার সাধ্যি। বিছানায় ছটপট করি।

মনে হয় এখান থেকে পালাতেই হবে।

পুলিশের বিশেষ বিভাগের চাকরি—তাই লোক চরিত্র জানার দরকার। ওই চন্দ্রমশায় এক বিশেষ চরিত্র। সেদিন বাজারে ওর ছেলের দোকানে গেছি কিছু খবর জানার জন্যে।

ওর বড় ছেলে ভুবনবাবু বলে—বাবার কথা বলবেন না, কারোও কোন কথাই শোনেন না। ও-বাড়িতেই থাকি না ওঁর জন্যই। ওঁর টাকাপয়সাও নিইনি, অন্য বাড়িতে থাকি—নিজের চেষ্টায় এই ব্যবসা করছি। বাবার সাহায্য পেলে আরও বাড়াতে পারতাম, কিন্তু তিনি কিছুই দেবেন না, আমিও নেব না।

অর্থাৎ একমাত্র ছেলেকেও বিশ্বাস করে না চন্দ্রমশায়, মেয়েদেরও বিয়ে হয়ে গেছে। তারা কেউ এলে বাবার কাছে থাকে না, বাবাও চায় না। তারা দাদার বাড়িতেই আসে।

অর্থাৎ চন্দ্রমশাইয়ের বিশ্বস্ত বলতে সেই অদৃশ্য নিতাই। দুনিয়ায় আর কাউকে বিশ্বাস করতে পারে না সে। সকলের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করে এক দুর্গে বাস করছে।

থানা-অফিসার পরেশবাবু বলেন—অন্য কোথাও থাকার ব্যাবস্থা করি, ওখানে ঘুমুতে পারবেন না। আমাদেরও প্রথম প্রথম হয়েছিল, ক্রমশঃ সয়ে গেছে।

জানাই—লোকটা রাতভোর এসব করে, দিনে—

পরেশবাবু বলেন—দিনে অন্য মানুষ।

—তাই একটু দেখা দরকার। জানাই তাঁকে।

পরেশবাবু বলেন—থানার কাউকে সঙ্গে দিই—নাহলে দেখাই করবে না।

শুধোই অচেনা অজানা লোকের সঙ্গে দেখা করে না বুঝি?

দেখা করা একটু কষ্টসাধ্যই। চন্দ্রমশাইয়ের বাড়িটা দুর্গের মতই। চারিদিকে তালা। দরজার কড়া নাড়তে একটা ফুটো দিয়ে কে চোখ রেখে দেখে নিয়েছে। সঙ্গে উর্দিপরা পুলিস দেখে বোধহয় দরজাটা ফাঁক করে একজন মুষকো লোক চায়—কি দরকার?

সঙ্গী কনস্টেবলটি দরকার জানাতে দরজা আরও একটু খুলে গেল, দেখি ঠেটে ন'হাতি মোটা এক ধুতি আর সেই ফতুয়া পরা চন্দ্রমশায়, গলায় ইণ্ডিদুয়েক এক কণ্ঠি, হাতে কপালে তিলকছাপ। পায়ে সেই-দিনের কুকুর কামড়ানোর দরুন একটা ন্যাকড়া জড়ানো।

—কি প্রয়োজন?

সঙ্গী কনস্টেবলকে বিদায় করে বলি—একটু কথা আছে ভিতরে চলুন।

অগত্যা দরজাটা আবার তালা বন্ধ করে আমাকে নিয়ে চললো বোবামুখ করে। ওদিকে একটা ঘরে কাউন্টার মতো, গ্রিল লাগানো, ভিতরে দেওয়াল জুড়ে তাক—খোপ খোপ করা, তাদের কোনটায় বাসনপত্র কোনটায় ঘটি-কাপ, সেলোফেন মোড়া শাল কোট— একটা বাহারের কাঁথাও দেখলাম। তাকগুলো সবই ভর্তি—বাঁদিকে বাইরের একটা ঘরে বেশ কিছু লোক বসে আছে, কারোও হাতে কাঁসার বাসনপত্র, কেউ এনেছে রূপোর গহনা, সোনার গহনাও।

কেউ তাড়া দেয়—চন্দমশায়, গহনা কটা পানমরা দেখে বন্ধক রেখে ট্যাকাটা দাও।

কেউ বলে—দুটো খাগড়াই বগি বন্ধক রাখবো।

অন্যজন বলে—দুশো ট্যাকা দিলা তিন বছর আগে, এজন্য ছ' কিস্তিতে কুল্যে সাড়ে চারশো দিইছি বাপজান, ইখনও বলো তিনশো পাবা—

চন্দ্রমশায় ওদের বলে—তাড়া দিলে আজ কিছুই হবে না।

ওরা চুপ করে যায়। অর্থাৎ চন্দ্রমশায়ের ব্যবসাটা বন্ধকী, সুদের কারবার ইত্যাদি।

এ ঘরে এনে বসিয়ে বলে—আপনার কিছু বন্ধক রাখবেন নাকি? তবে সুদ আগাম কেটে নেব। আর বাইরের লোক—সোনার জিনিস রাখতে হবে।

দেখছি ওকে। বলি—না, ওসবের জন্য আসিনি।

চন্দ্রমশায় অবাক হয়—অ্যাঁ! এখানে ওই সব ছাড়া তো কেউ আসে না। আমারও সময় নেই, তাহলে—

অর্থাৎ বিদায় করতে চায় আমাকে। আমি এবার বলি—পুলিসের অফিসার আমি, সদর থেকে আসছি।

এবার চন্দ্রমশায় চাইল—হঠাৎ! এখানে কোনরকম তঞ্চকতা করি না স্যার। সুদের ব্যবসা আমার পৈত্রিক—

বলি—তা তো দেখছি। কিন্তু লোকজনের শান্তিভঙ্গ করে রাতভোর এত চিৎকার করেন কেন?

চন্দ্রমশায় নিস্পৃহকণ্ঠে বলে—নিতাইকে রিপোর্ট করি স্যার। দুনিয়া অনাচারে ভরে গেছে। সংসার অধর্মে রসাতলে গেল। অবিচার আর অত্যাচারই চলছে স্যার, তাই নিতাইকে জানাই—

শুধোই—নিতাইবাবু কে?

এবার চন্দ্রমশায় আমাকে আপাদমস্তক জরিপ করে বলে—আপনি হিন্দুশাস্ত্রও জানেন না? নিতাই—নিত্যানন্দকে জানাই স্যার! গৌর-নিতাইয়ের নাম শোনেননি?

বলে উঠি—নিতাইকে ডাকতে হয় ডাকুন। এমন রাতভোর বিকট গর্জন করলে থানাকে বলে যাবো আপনাকে অ্যারেস্ট করে সদরে চালান করবে শান্তিভঙ্গের চার্জে। বুঝলেন?

চন্দ্রমশায় স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে।

বলে সে—কিন্তু ভয় করে যে স্যার—কিছুদিন—কয়েক বৎসর আগেই চোখের সামনে এক রাতে যা ঘটে গেল!

ঘটনাটা আমিও থানা থেকেই জেনেছিলাম। কয়েক বৎসর আগে ওর বড় ভাইকে কিছু বেপরোয়া ছেলে রাতের অন্ধকারে বাড়ি চড়াও হয়ে ভোজালির আঘাতে টুকরো টুকরো করে শেষ করে গেছল, ওকেও ছাড়তো না। ও খাটের নীচে বাক্স প্যাঁটরার আড়ালে লুকিয়ে বেঁচে গেছল। কিন্তু সেই অসহায় মানুষটার নৃশংস হত্যাকাণ্ড দেখার পর থেকেই সে কেমন অস্থির হয়ে উঠেছিল। এখনও রাতের অন্ধকার ঘনিয়ে এলে মনে হয়, তারা এসে তার বাড়ি চড়াও হয়ে তাকেও ভোজালির আঘাতে তেমনি করে শেষ করবে—

কম্পিত কণ্ঠে বলে চন্দ্রমশাই—তাই স্যার, রাত নামলে ঘুম আসে না, মনে হয় ওরা আসছে, তাই স্যার, নিতাইকে ডাকি—তার স্মরণ নিই, সব দুঃখের কথা তাকে জানাই, স্যার বিশ্বাস করুন—

ওকে দেখছি, ওর ওই তিলকছাপ, কণ্ঠির বোঝা, করতাল বাজিয়ে বিকট চিৎকারের কারণটা যে ওর মনের আতঙ্কের জন্যই—এটা বুঝেছি।

বের হয়ে এলাম। আবার দরজায় মজবুত তালা পড়ে চন্দ্রমশায়ের দুর্গে। আবার সন্ধ্যার অন্ধকারে গগনবিদারী হুঙ্কার শোনা যায়।

—নিতাই হে—এ—এ।

মান সম্মান

এবার ইউনিট ট্রাস্ট ভালো একটা স্কিম করেছে মিঃ মিত্র, প্রায় চৌদ্দ পার্সেন্ট দিচ্ছে, ওতেই রাখলাম কিছু। আর একটা ব্যাপারে আপনার কাছে পরামর্শ নিতে এসেছি, এই লাইনে অভিজ্ঞ লোক আপনি।

শশধর মিত্র এককালে শেয়ার বাজারের কাজকর্ম করতেন, এখন রিটায়ার করেছেন; ছেলেদের সংসারে এখন মাথা গুঁজে আছেন কোন মতে।

স্ত্রী আগেই গত হয়েছেন। এখন আর শেয়ার বাজারের সেই আমদানীও নেই, বাতিলই হয়ে গেছে, তবু ওই পটলবাবুর কথায় যেন অতীতের স্বীকৃতি খুঁজে পায়। বললেন, কি ব্যাপার পটলবাবু?

পটলবাবু এ পাড়ার পুরোনো বাসিন্দা। অবশ্য এই পাড়াটাই নতুন গড়ে উঠেছে। এককালে শহরের লাগোয়া এই অঞ্চল পতিতই পড়েছিল। লোকজন বিশেষ আসত না। শহরের লোক এখানে মরা গরু কুকুর অন্যসব জঞ্জালই ফেলত।

সেই ভাগাড়েই এখন এই নতুন বসত রাসবিহারী নগর গড়ে উঠেছে। এ নাম কে রেখেছিল জানা যায় না। তবে আজকের বাসিন্দারা রাসবিহারী বসুর বিপ্লবের সঙ্গে আদৌ পরিচিত হবার কোন লক্ষণই দেখায় না। পটলবাবুর বাড়িটাই এখানে প্রথম হয়েছিল, তখন দামও সস্তা ছিল।

মফঃস্বলের কোন গ্রামে ওনার বাড়ি। সেখানকার নাকি জমিদারই ছিলেন পটলবাবুর পূর্বপুরুষ। এখনও সেখানে খাস জমি-বাগান-পুকুর এসব আছে। তার থেকেও আমদানী কম হয় না।

এছাড়াও শহরে একটা স্টেশনারি দোকান আছে, ছেলেই বসে সেখানে। পটলবাবুও যান। এছাড়া শহরের জমিবাড়ি এসব বেচাকেনার কাজও করেন। তার থেকে দমকা ভাল আমদানীই হয়ে থাকে।

সেসব খবর পাড়ার দুচার জন লোক মাত্র জানে।

তাদের মধ্যে এই শশধর মিত্র একজন।

পটলবাবু বলেন—এখন এ সি সি, ব্রুকবণ্ড, টাটার শেয়ারের দাম তো চড়ছে, যদি ধরুন লাখখানেক ওই টাটার শেয়ারেই লাগাই?

মিত্র মশাই চেয়ে দেখছেন পটলবাবুকে।

লোকটার বরাতই অমনি, শশধরবাবুর হিংসা হয় ওকে। তবু বলে টাটার শেয়ারের মার নাই ওতেই লাগান। তাতে দুপয়সা কম পান ক্ষতি নেই।

পটলবাবুর সিঁটকে চেহারাটা দেখে মনে হবে না যে এমনি লাখ টাকা নিয়ে এখানে ওখানে গুঁজে রাখেন তিনি। পাকানো চেহারা, মাথায় চুল আর নেই, চকচকে টাক, পরনে সেই সস্তা খাদির রংজ্বলা পাঞ্জাবী, পায়ে একটা স্যাণ্ডল—তার তলাটা ক্ষয়ে মাটির লেভেলে এসে গেছে।

তার তুলনায় শশধর মিত্রের পোশাকও ভাল, বাড়িটাও ছিমছাম, বসার ঘরে সোফা সেট এসব ত রয়েছে। তবু শশধরের মনে হয় ওই পটলবাবুর তুলনায় সে হতদরিদ্র। ব্যাঙ্কে তার শেষ সম্বল মাত্র কয়েক হাজার টাকা, তাও কলসীর জল। গড়াতে গড়াতেই শেষ হয়ে যাবে। তখন?

অথচ ওই লোকটার নানা জায়গায় লাখ লাখ টাকা তখন ডিম পেড়েই চলবে।

—তাহলে টাটাতেই লাগাই। পটলবাবু আর একবার যাচাই করে নিয়ে বের হলেন। ছাতাটা কতকালের পুরোনো কে জানে।

পটলবাবুর স্ত্রী তখন সবে দুপুরের ঘুম থেকে উঠেছেন। মোটাসোটা চেহারা। কাজের মেয়ে একটা আছে তবে সেও ঠিকের ঝি, বিকালে আসে। কলতলায় বাসন মাজছে কাজের মেয়েটা আর গজগজ করছে,সারা দুনিয়ার বিরুদ্ধেই যেন সব সময় তার অভিযোগ। পটল গিন্নী নিরুপমা বাড়ির এঘর ওঘর দেখে তাদের মেয়ে কুন্তলাকে পান না।

এখন কলেজের ছুটি। ওদের এই একমাত্র মেয়ে। দেখতেও মন্দ নয়। এক ছেলে আর মেয়ে তাঁদের। ছেলে পরিতোষ দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পরই দোকানে বের হয়ে গেছে শহরে, কুন্তলার ঘরে থাকার কথা। এখন ছুটি তবুও মেয়ে যখন তখন বের হয়ে যায়।

নিরুপমা চোখে চোখে রাখার চেষ্টা করেন মেয়েকে। যা দিনকাল পড়েছে এখনকার ছেলে মেয়েদের এতটুকু বিশ্বাস নাই, কখন কি করে বসে কে জানে।

অবশ্য নিরুপমা জানে তাদের মেয়ে তেমন নয়। এমনিতে শান্ত, চুপচাপই থাকে। শাড়ি ব্লাউজ পরে তাতে শালীনতার চাপ ফুটে ওঠে। আজকের মেয়েদের মত পেট পিঠ বের করে পোশাক পরে না। পড়াশোনাতেও নাকি ভালই।

তবু ভয় হয় নিরুপমার। তাই কাজের মেয়ে, মানদাকে শুধোয় ছোড়দি কোথায় গেল রে? মানদা বাসন মাজতে মাজতে বলে, তাকে তো দেকিনি, বৌদিই দরজা খুলে দিল।

নিরুপমা চিন্তায় পড়ে—তাহলে গেল কোথায়?

মানদা বলে, গেছে কোথাও। শোনলাম বিজনি টকিতে কি একটা খুব মারামারির ছবি এসেছে, শহরের ছেলেমেয়ে বৌঝিরা জোড়ায় জোড়ায় ভিড় করছে। সিখানে যায় নি তো?

থাম্‌তো! মরণদশা। আমার মেয়ে তেমন নয়—নিরুপমা ঝাঁঝিয়ে ওঠে।

মানদা বলে, কে জানে বাবু, না হলেই ভালো, যা দিনকাল পড়েছে!

সে বাসন মাজতে থাকে।

নিরুপমার মনে কেমন একটা ভয় হয়। তেমন যদি কিছু ঘটে যায়। পরক্ষণেই মনে মনে জবাবটা খুঁজে নেন, তার মেয়ে এমন নয়। হতেই পারে না।

নিরুপমা ছেলের বৌকে সমীহ করে চলেন। এখন ছেলে ব্যবসাপত্র মোটামুটি করছে। তার আয়েই সংসার চলে।

অবশ্য স্বামী পটলবাবু দেশের জমিজায়গা বাগান পুকুরের মাছ থেকেও আমদানী করেন। শহরে টুকটাক কাজও করেন।

তবু ছেলে বৌ-এর ঘাড়েই সংসার।

নিরুপমা বলেন, স্বামীকে—মেয়ে বড় হল, এবার বিয়ে-থার চেষ্টা করো বাপু।

পটলবাবুও ভেবেছেন কথাটা। মেয়ের বিয়ে দিতে তাঁরও সাধ হয়। দিতে পারলে জীবনে একটা মহাদায় থেকে তিনি উদ্ধার পাবেন।

কিন্তু সাধ্য কই তেমন। মোটামুটি ভাল ঘরে মেয়ে দিতে গেলে হাজার পঞ্চাশ ষাটের কম হবে না। সে টাকার যোগাড় করাও কঠিন।

পটলবাবুর এই পাড়ায় আশপাশের পাড়াতেও একটা নাম ডাক আছে। পটলবাবু দেখেছেন পাড়ার আচ্ছা আচ্ছা লোকও তাকে দেখে নমস্কার করে, যেচে কথা কয়। যারা কথা বলতে সাহস করে না, তারাও দূর থেকেই তাঁকে সমীহ করে, ও চলে গেলে চাপা স্বরে অনেকেই বলে—লোকটা টাকার কুমীর। কত টাকা যে ওর শেয়ার বাজারে খাটছে, তার সুদ লাভ কত কে জানে! অথচ দ্যাখ, কোন বারফাট্টাই নাই। কত সহজ সরল মানুষ। কেউ বলে—বনেদী বড়লোকরা আজকের দিনের হঠাৎ টুপাইস কামানো দু'নম্বরী মালদের মতো নয় রে।

পটলবাবু জানেন লোকের সামনে তার অন্য একটা ভাবমূর্তি আছে। বাড়িতে ছেলে বৌও তাঁকে সমীহ করে চলে।

অবশ্য স্ত্রীর কথায় পটলবাবু তার মনের চিন্তা-ভাবনাগুলোকে দূর করে বলেন, কুন্তলার বিয়ের জন্য এত ভাবছো কেন? দেখবে—ঠিক সময়েই সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

আর কবে হবে? নিরুপমা স্বামীর জবাবে খুশী হতে পারেন না। মায়ের মন! মেয়ের ব্যাপারগুলোকে তিনি এখন যেন কেমন অন্য চোখেই দেখছেন।

কুন্তলা তখন শহরের অন্যদিকে নদীর ধারে নির্জনে বসে আছে বিজনের সঙ্গে। বিজন তাদের কলেজেই পড়ত। তখন থেকেই আলাপ ও ঘনিষ্ঠতা।

বিজনের বাবা শহরের আদালতে ওকালতি করেন। অবশ্য তেমন নামডাক নেই। বিজনের বাবা কমলবাবুকে লোকে বলে এপিঠ ওপিঠের উকিল অর্থাৎ সাধারণত এপিডেভিট ইত্যাদি মামুলি কেসই করেন। কোনমতে মক্কেল ধরে আর দু'একটা ছুটকা কেসই জোটে তাঁর।

তবু রোজ কালোকোট পরে আধ মাইল পথ হেঁটেই কোর্টে যান। যেদিন কেস জোটে সেদিন মক্কেলকে দুয়ে কিছু আমদানী হয়, নাহলে শুকনো মুখে আবার হেঁটেই বাড়ি ফেরেন।

বিজন জানে বাবার অবস্থা, তাই বি-এ পাশ করে এখন কাজের চেষ্টাই করছে। ছোট শহর। কাজের সুযোগও তেমন নেই। বাজারের হোলসেলের আড়তদার কোল্ড স্টোরেজের মালিক নসুবাবুর গুদামেই কাজ করে।

তবু কুন্তলা আসে তার কাছে।

আর বিজনও বের হয়ে আসে এই নির্জনে। দুজনে নানা স্বপ্ন দেখে। কুন্তলা বলে, আর কতদিন তোমার পথ চেয়ে থাকবো বিজন?

বিজন জানে তাদের অবস্থা। তার সামান্য রোজগারে বিয়ে করাও ঠিক হবে না। স্বপ্ন দেখে কালেক্টরীতে কাজ পাবে।

তাই বলে, কটা মাস পরেই ভালো চাকরী পাবো কুন্তলা। সেদিন তুমি আসবে আমার ঘরে। ততদিন একটু সবুর করো।

কুন্তলা যখন বাড়ি ফেরে তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। মা যেন তার পথ চেয়ে ছিল—মেয়ের গলায় কি সুর গুনগুন করে। কুন্তলাও স্বপ্ন দেখে বিজনকে বিয়ে করবে, ঘর বাধবে। মায়ের কথায় চাইল।

কোথা গিয়েছিলি সেই তখন থেকে?

কুন্তলা অবশ্য বুদ্ধি করে একটা খাতাও নিয়ে গিয়েছিল। সেটা দেখিয়ে বলে, কেয়াদের বাড়িতে গেছিলাম ইংরাজী পড়তে। বাবাকে বলি কোচিং ক্লাশে ভর্তি করে দাও। বাবার খরচা হবে যে।

নির-পমাও জানেন কথাটা। পাড়ার লোকেও পটলবাবুকে বলে হাড় কেপ্পণ।

পটলবাবু নিজের জগৎ নিয়েই রয়েছেন। তাঁর ঘরের একদিকে আলমারিটা খুলে রাতে পটলবাবু আলমারী থেকে খাতাপত্র বের করে বসেন খাওয়া দাওয়ার পর।

ওদিকে ছেলেও দোকান থেকে এসে শুয়ে পড়ে। কুন্তলার ঘরের আলো নিভে যায়! পটলবাবুর এই রাতে কাজ করার জন্যই গিন্নী গজগজ করতেন। দিন ভোর খেটে একটু শান্তিতে ঘুমোবো তার উপায় নেই।

পটলবাবু বলেন হিসেব নিকেশ করতে হবে তো?

কর তোমার হিসেব, আমি কুন্তলার ঘরে শুচ্ছি গে। পটলবাবুও নিশ্চিন্তে কাজ করতে পারেন। তাঁর অনেক কাজ। খাতাপত্র খুলে আজই তাঁর ব্যাঙ্কের খাতা থেকে এক লাখ টাকা তোলা দেখিয়ে সেই লাখ টাকাটা টাটার শেয়ার কেনার খাতে লিখে রাখেন। ওদিকে গ্ল্যাক্‌সো-লারসেন টুবরো-ইণ্ডিয়া টি কোম্পানীর শেয়ার থেকে দশ পার্সেন্ট হিসেবে পাঁচ লাখ টাকার সুদ বাবাদ টাকাটাও ব্যাঙ্কের খাতায় জমা করেন। আর এবার গুডইয়ার টায়ারের শেয়ারে লোকসানও করেছেন। তাদের বাজার পড়ছে। সাড়ে তিন লাখ টাকার শেয়ারে ফাইভ পার্সেন্ট 'লস্'ই হয়ে গেল। লোকসানের খাতে টাকাটা লিখে রাখেন।

আর কাগজে দেখতে থাকেন নীলগিরি টি ইণ্ডিয়ান কফি-র শেয়ার চড় চড় করে চড়ছে। ওই

গুডইয়ারের সব শেয়ার 'লস্' করে বিক্রী করে বাকী দুলাখ পঁচাত্তর হাজারে ওই কফি কোম্পানীর শেয়ারই কেনেন খাতায়।

খাতাগুলোর দিকে চেয়ে থাকেন পটলবাবু। প্রায় তেইশ লাখ টাকা তার খাটছে ওই খাতায় কলমে। তার থেকে আয়ও যেমন খাতায় জমা হয়। লোকসানও তেমনি হয়। এইসব নিয়েই তাঁর জগৎ।

এল আই সি-তে কাজ করেন তাঁর প্রতিবেশী রমেশবাবু। পরদিনই তাঁর বাড়িতে চা খেতে খেতে বলেন, কফির আন্তর্জাতিক বাজার এখন বেশ চড়া। ভাবছি আড়াই লাখ টাকা ওই কফি কোম্পানীর শেয়ারেই লাগাই। ছেড়ে দিই গুডইয়ারের শেয়ার। ষাট হাজার লস্ হয়ে গেল। কি করা যাবে মশায়।

রমেশবাবু বললেন ষাট হাজার টাকা লস্?

হ্যাঁ—বাজে শেয়ারে গেল, তবে এশিয়ান পেন্টস্ পুষিয়ে দিয়েছে। সাত লাখে যা প্রফিট এল তাতেই কভার করে গেলাম লস্। আর ওই কোম্পানীতে নেই মশায়।

রমেশবাবু দেখছেন সম্ভ্রম ভরে পটলবাবুকে লাখ লাখ টাকা লোকটার। রমেশবাবু দিনভোর খেটে পান মাত্র আটহাজার টাকা। গাল ভরা নাম ফিল্ড অফিসার। দামী স্যুট পরতে হয়। অথচ পটলবাবু আধময়লা ধুতি আর পাঞ্জাবী পরে লাখ লাখ টাকার খেলা খেলছেন। রমেশবাবু সেদিন পাড়ার মনোজবাবুকেও বলেন কথাটা। মনোজবাবু বলেন সত্যি লোকটা টাকার পাহাড় বানিয়েছে।

অথচ বোঝার কোন উপায়ই নেই। পাড়ায় চাঁদা দেবার বেলায় কত কাঁদুনি গায়। হাড় কিপ্‌টে।

নন্দবাবু সায় দেন পিঁপড়ের পিছন টিপে গুড় বের করে লোকটা। পোশাক আশাক দেখেছেন।

রমেশবাবু বলেন, পয়সা ধরে রাখতে গেলে এমনই হতে হয় মশায়।

পটলবাবু জানেন ওরা —শুধু ওরা কেন পাড়ার সকলেই তাঁকে সমীহ করে। বাজারের দোকানদাররাও তাকে জিনিস বিক্রী করে ধন্য হয়। লোকের চোখে পটলবাবু দেখেছেন সম্ভ্রমের ছোঁয়া। পথ দিয়ে গেলে অনেকেই চেয়ে দেখে, ফিসফাস করে পটলবাবুর কত লাখ টাকা আছে তার হিসাবটা করে। পটলবাবু গম্ভীরভাবে চলে যান ওদের সামনে দিয়ে মাথা উঁচু করে।

শান্ত শহর। এখানে অনেকেই অনেককে চেনেন। সামান্য খবরও বিদ্যুৎ বেগে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। সেদিন সন্ধ্যার পর ওই পটলবাবুর মেয়েকে কমল উকিলের ছেলে বিজনের সঙ্গে নদীর ধারে এক পড়ো ভাঙা মন্দিরে নাকি বেশ অসংযত অবস্থাতেই হাতেনাতে ধরে ফেলে ওই পাড়ার ছেলেরা।

বিজন প্রতিবাদ করতে ওকে মারধোর করে। ঘুসিতে বিজনের নাক ফেটে রক্তারক্তি হয়ে যায়। কুন্তলাকে আর বিজনকে নিয়ে আসে ওই নীতিবান ছেলেরা একেবারে পটলবাবুর বাড়িতেই।

পটলবাবু এমনিতে নীতিবান মানুষ। তিনি চটে ওঠেন। মেয়ের গায়েই হাত তুলতে যাবেন এমন সময় পটলবাবুর স্ত্রী নিরুপমা এসে ওই উকিল পুত্রকে দেখে গর্জে ওঠেন, আমার মেয়ের সর্বনাশ করার মতলব হতচ্ছাড়ার, আজ তোর একদিন কি আমার একদিন।

তারপর, উঠানে পড়েছিল একটা চ্যালা কাঠ তাই দিয়ে বেশ কয়েক ঘা মারতে এবার পটলবাবু বাধা দেন। এক হাতে তালি বাজেনা, তোমার মেয়েও এমন কিছু ধোয়া তুলসীপাতা নয়। কত বার বলেছি মেয়েকে সামলাও, এখন পরের ছেলেকে মারলেই হবে?

নিরুপমা ফুঁসে ওঠেন, ওই ছেলেটাই যত নষ্টের মূল।

আবার চ্যালা কাঠ তুলতে এবার পটলবাবু থামান গিন্নীকে। হাত পিঠ ছড়ে গেছে চ্যালা কাঠের আঘাতে। বিজনের নাক'ত গেছে আগেই।

পাড়ার লোকজন কোন রকমে নিরস্ত করে। ততক্ষণে খবরটা কমল উকিলের বাড়িতেও পৌঁছে গেছে ডালপালা গজিয়ে।

কমল উকিল আইনকানুন জানেন, তিনি'ত বেশ কয়েকজন প্রতিবেশীকে নিয়ে পটলের বাড়িতে এসে দেখেন পটলগিন্নী তখন চ্যালা কাঠ নিয়ে ছেলেকে পিটতে চলছেন নতুন উদ্যমে। বিজনের প্রেম নিবেদন যে এমনি পর্যায়ে পৌঁছবে তা ভাবেনি বিজন। যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে সে।

এমন সময় কমল উকিল এসে হাজির। তিনি গর্জে ওঠেন, বাড়িতে কৌশলে আটকে এই ভাবে

রক্তপাত ঘটাবেন ছেলের? মারবেন!

পটল গিন্নী বলেন, আমার মেয়েকে ফুসলে নিয়ে গিয়ে সব্বোনাশ করার তাল, চুপ করে থাকবো? বদমাইস দুশ্চরিত্র কোথাকার! আপনার মেয়ে গেল কেন? কচি খুকি তো নয়।

কমল উকিলের কথায় পটলবাবু কি বলার চেষ্টা করতে এবার পটলগিন্নী শোনায়, বেশ করেছি।

কমল উকিল বলেন, দেশে আইন নেই?

ভারি আমার ঘেসো উকিল তার আবার আইন!

কমল উকিল বলেন, এবার কমল উকিলের খেলাই দেখাব—চলে আয় বিজন।

কমল উকিল এবার সোজা থানাতেই যান সাথীদের নিয়ে, তার আগে নসু ডাক্তারের ওখানে গিয়ে ছেলের ক্ষতের চিকিৎসা করিয়ে যোগ্য ডাক্তারী সার্টিফিকেট নিয়েই থানায় গেছেন। উকিল মানুষ—তেমন কেসও জোটে না। হঠাৎ একটা ফৌজদারী কেস হাতে পেয়ে বেশ জম্পেশ করে ডাইরী করিয়েছেন। পটলবাবু মায় পটল গিন্নীকেও আসামী করেছেন। ছেলেকে কৌশলে তাদের মেয়েকে দিয়ে ব্ল্যাকমেল করা, বাড়িতে কৌশলে নিয়ে গিয়ে মারাত্মক ভাবে আঘাত করে খুনের চেষ্টা, মায় ৩০২ ধারা অর্থাৎ খুনের চেষ্টার দায়েই পটলবাবুর পরিবারকে জড়িয়ে দেন কমল উকিল।

আর পরদিনই আদালতে কেসও ঋজু করে দেন তিনি সঙ্গে সঙ্গে। আসামীদের অর্থাৎ পটলবাবু তস্য গৃহিণী মায় মেয়েকেও শমন ধরান।

এবার সারা শহরে ঢি ঢি পড়ে যায়।

এসব ক্ষেত্রে ছেলের চেয়ে সামাজিক কলঙ্ক বেশী হয় মেয়েরই। অনেকেই পটলবাবুর ওই সব লাখ লাখ টাকার শেয়ার কেনাবেচার খবর জানত।

অনেকে বলে টাকার গরমে পটলবাবুর মাথাই খারাপ হয়ে গেছে। মেয়েটাও ডুবে ডুবে জল খেত। এবার বুঝবে মজা। ও মেয়ের গতি কি হবে কে জানে?

গুপীর চায়ের দোকানে বসে এখন এই আলোচনাই হয়। কেউ বলে—টাকার কুমীর হে ব্যাটা, টাকার জন্যে ওই দাগী মেয়েরও পাত্রের অভাব হবে না।

এবার সমন পেয়ে পটলবাবু ঘাবড়ে যান। গিন্নীও কোর্ট ঘর করার কথা ভেবে চমকে ওঠেন। রাগের বশে ওইসব মারপিট করা ঠিক হয়নি।

পটলবাবু বলেন, কোর্ট ঘর হলে মেয়েটার কেলেঙ্কারীর কথা চাউর হবে। মেয়ের বিয়েথা আর হবে?

পটলগিন্নীও ভাবছেন কথাটা।

এমন একটা বিশ্রী পরিস্থিতিতে পড়বেন তিনি ভাবেননি।

পটলবাবু মনে মনে প্রমাদ গণেন। ছেলেও বলে কুন্তলারও দোষ। এখন কেচ্ছা কাহিনী ছড়াক চতুর্দিকে। তার চেয়ে ওই কমলবাবুরা পালটি ঘর। যা হবার হয়েছে। কুন্তলার ওই বিজনের সঙ্গে বিয়ে থা দিয়ে কেসটা মিটিয়ে নাও গে হাতে পায়ে ধরে।

পটলবাবুও উকিল দিয়েছেন।

কিন্তু তাঁর উকিল নটবর পালও বলেন, তাই ভাল পটলবাবু। আজকালকার ছেলেমেয়েদের মতিগতি বোঝা ভার। মিটিয়েই নিন, সবদিক বজায় থাকবে। বলেন তো আমিই কথাটা কমলকে বলি, আপনিও চলুন।

কমল উকিল বুঝেছেন এবার তাঁর কোর্টে বল এসেছে। আর পটলবাবুর ওই লাখ লাখ টাকা শেয়ারের খবর, মাসে সুদ বাবদ অনেক টাকা আমদানীর খবরও জানে শহরের সবাই।

কমল উকিলকে তাই পটলবাবু মিটমাট করে পটলবাবুর ছেলের সঙ্গে কুন্তলার বিয়ের প্রস্তাব দিতে প্রথমে কমল উকিলের স্ত্রীই বলেন, ওই মেয়েকে ঘরে আনব? ওর জন্যে আমার ছেলের সর্বনাশ। ও মেয়েকে নেবনা। আদালতেই এর বিচার হবে। দেখবো কে ঘরে নেয় ওই দাগী মেয়েকে।

পটলবাবুও বিপদে পড়েন।

বলেন, যা হয়ে গেছে ভুলে যান, মেয়েটার কোন দোষ নেই।

কমল উকিল জানেন কোথায় কখন কিভাবে মোচড় মারতে হবে। তাই এবার তিনিও মৌকা পেয়ে বলেন, পটলবাবু শুনি আপনার তো লাখ লাখ টাকা কোম্পানীর কাগজ শেয়ারে খাটে তার মাসিক সুদও কম নয়। মেয়েও এসবের অংশীদার। তবে ওসব গোলমালে আমি নেই। আপনার মেয়েকে ঘরে আনতে পারি তবে এক শর্তে।

কি সেই শর্ত—পটল যেন মিইয়ে গেছে। কমল উকিল বলেন, ছেলেকে পাঁচ লাখ টাকার ভাল কোম্পানীর শেয়ার না হয় ক্যাশে দিতে হবে। ওইটা পেলে আমি মামলা তুলে নেব। ছেলের সঙ্গে আপনার মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থাও পাকা করে দেব্। ব্যাস্।

পাঁচ লা-খ টাকা! পটল বিড়বিড় করে। নটবর উকিলও বলেন, এত আপনার হাতের ময়লা পটলবাবু। মেয়েটার মান ইজ্জৎ, ভবিষ্যতের কথাটাও ভাবুন। কোর্টে এসব নোংরামির প্রমাণ হলে মেয়েটার জীবনই বরবাদ হয়ে যাবে। আপনার এত আছে, এটুকু দিয়ে মেয়ের বিয়েটা দিয়ে দিন, সব দিক বজায় থাকবে। মেয়ের সম্মান, আপনার সম্মানও ঠিকঠাকই থাকবে।

পটলবাবু ঝিম মেরে গেছেন।

উকিলবাবু বলেন, কথাটা ভেবে দেখে জানাবেন। পরশু কোর্টে কেস ওঠার আগেই আপোসে মিটমাট করে নিতে হবে। নাহলে মেয়ের কি সর্বনাশ হবে ভাববেন!

পটলবাবু টলতে টলতে বাড়ি ফেরেন। পটলগিন্নীও এগিয়ে আসেন--কি কথা হল? কমলবাবু ছেলের বিয়ে দিতে রাজী? ওগো।

পটলবাবু গর্জে ওঠেন—তখন তো চ্যালাকাঠ নে যুদ্ধ করতে গেলে, ভবিষ্যতের কথাটা ভাবলে না? এখন মোচড় দিচ্ছে ব্যাটা উকিল। বলে ছেলেকে পাঁচ লাখ টাকা দিতে হবে তবেই কোর্ট কাছারি না করে মেয়েকে ঘরের বৌ করে নে যাবে।

পটলগিন্নী বলেন, ওমা? এত সুখবর গো। মানে? পটল খিঁচিয়ে ওঠে।

তোমার তো শুনি লাখ লাখ টাকা শেয়ারে খাটে। রোজ রাতভোর তার হিসেব নিকেশ কর। তার থেকে মেয়ের বিয়ের জন্য টাকাটা দেবে। পাঁচ লাখ টাকা গেলে তোমার গায়ে বাজবে না। মেয়েটার মান ইজ্জৎ বজায় থাকবে। ভবিষ্যতে সুখী হবে। তাই দিয়ে দাও, বাপু। ছেলেটা সত্যিই ভাল। সাত চড়েও রা নেই।

স্ত্রী'র দিকে চেয়ে থাকেন পটলবাবু। ওদের ছেলে বৌমাও সব শুনে বলে, তাই দাও বাবা ও টাকা গেলে তোমার গায়ে লাগবে না। যা থাকবে তাই ঢের। নাহলে কুন্তলার কি হবে!

পটলবাবু এবার ভেঙে পড়েন। এতদিন ধরে কঠিন চেষ্টায় তিনি নিজেকে কেন্দ্র করে বিরাট এক অর্থবান ধনী মানুষের পরিমণ্ডলই রচনা করেছিলেন। সমাজে মাথা উঁচু করে চলতেন, দুপাশের লোকজন, প্রতিবেশীদের সমীহ, সম্ভ্রম আদায় করে। ওই স্রেফ খাতায় লাখ লাখ টাকার কাল্পনিক লেনদেন করে তাঁর আশপাশে একটা কাল্পনিক জগৎ গড়ে তুলেছিলেন। স্বপ্নের বেলুনেই ভেসে চলতেন তিনি।

আজ সেই বহু চেষ্টায় গড়া স্বপ্নের জগৎটাই হারিয়ে যাবে। কিন্তু উপায় নেই।

পটল আর্তকণ্ঠে বলেন, ওসব লাখ লাখ টাকা আমার কোন কালেই ছিল না রে। শুধু খাতায় কলমে ওই সব জমা খরচের হিসেব করেই রাজা সেজে থাকতাম। আমার কপর্দকও নেই। কিছুই নাইরে। কি আর্তনাদে হাহাকারে ভেঙে পড়েন অসহায় পটলবাবু।

নিরুপমা, তাঁর ছেলে বৌমা দেখছে ওই অসহায় ভেঙে পড়া মানুষটাকে।

মেয়ের মানসম্মান ত গেলই, তার চেয়েও ব্যাকুল হয়েছেন পটলবাবু। তাঁর এত দিনের গড়া ওই ধনী ব্যক্তির বাতাবরণটিও আজ সম্পূর্ণ বদলে গেছে।

তিনি যে কত গরীব, কত নিঃস্ব, আজ এই মুহূর্তে সেই কথাটাই বার বার মনে পড়ে।

আঠারো ভাঁটির মা

হুঁসিয়ার। বাবা দক্ষিণরায়ের হানা গ ... ভীতত্রস্ত কণ্ঠস্বর রাতের আদিম আরণ্যক অন্ধকারকে ভরে তোলে। নিমেষের মধ্যে জেগে ওঠে গাং-এ নৌকার মানুষগুলো। শশী গুণীন নৌকার গলুই-এ দাঁড়িয়ে হাঁক পাড়ে বজ্রগম্ভীর স্বরে—তফাৎ যাও। কার আজ্ঞে—বাবা দক্ষিণরায়ের আজ্ঞে!

জয় মা বনবিবি!...

ওর একক সতেজ কণ্ঠস্বর এতগুলো লোকের ভীতত্রস্ত আর্তনাদকে ছাপিয়ে ওঠে। মশালের আলোগুলো আদিম অন্ধকার ভরে তোলে। জোয়ারের জলে নৌকাগুলো ভাসছে, দুলছে, ফরেস্টের বাবুদের নৌকা থেকে জোরালো টর্চের আলোয় উছলে ওঠা হেঁতাল গরান কেওড়াবনের কিছুটা দেখা যায়। কাঠ মহাজন গুপীনাথ সাপুই চীৎকার করে ওঠে—ওই যে, ওই—

অনেকেই দেখেছে, ভয়ে শিউরে ওঠে ওরা। কালো ডোরাকাটা ভরযোয়ান একটা বাঘ ওপাশের ডিঙ্গি নৌকা থেকে লাফ দিয়ে নেমে কি যেন নিয়ে চকিতের মধ্যে বনের গভীরে লুকিয়ে গেল। শশী গুণীন হাঁক পাড়ে।

—জয় মা বনবিবি।

ওপাশের নৌকা থেকে কে চীৎকার করে ওঠে—বিলেস! বিলেস নাইগ! ...

ডিঙ্গিটায় ঘুমিয়ে ছিল বিলেস, সেখানেই বাঘটা উঠেছিল তারপর আর বিলেসের দেখা নেই। চমকে ওঠে বাওয়ালির দল। দলের একজনকে বাঘে নিয়েছে, আর সে ওই শশী গুণীনের ছেলে বিলেস!

শশী গুণীন এটা বিশ্বাস করে না, তাই গর্জে ওঠে—না না। কক্‌খনো হতি পারে না। ওর দুচোখ জ্বলে ওঠে ভাঁটার মত ধক্ ধক্ করে। গুণীন ঘেরবন্ধন—দেহবন্ধন—মুখবন্ধন করেছে এখানের বনে বসেই। তার সাধন মিথ্যে হতে পারে না। সাত পুরুষের গুণীন বংশ। অনাচার করে না—ঘরে মা বনবিবির আটন। তার সিদ্ধাই ব্যর্থ হতে পারে না। তাই সদাপে গর্জন করে ওঠে শশী গুণীন।

—মা বনবিবির আজ্ঞা মিথ্যে হতে পারে না। দেহবন্ধন—মুখবন্ধন—ঘেরবন্ধন করেছি মায়ের আজ্ঞায়।

হঠাৎ অন্ধকারে কার হাসির শব্দে চমকে ওঠে শশী গুণীন। ভীতত্রস্ত মানুষগুলোর চোখে আজ আশ্বাস নেই। ভয়ের আদিম ছায়া মাখানো। শশী গুণীন ভোলার দিকে চেয়ে থাকে। ভোলাও তুক তাক করে নিজেকে অন্য গুরুর চেলা বলে জাহির করে। তাই জানায় সে।

মুখবন্ধন—ঘেরবন্ধন ক্যামন করলা গুণীন যে নিজের ছেলাটাকেই বড় শিয়ালে গিলে গ! এ্যাঁ—সব ফক্কি।

কথাটা শেষ হবার আগেই শশী গুণীন লাফ দিয়ে বুনোবাঘের মতো এসে ওর টুটি টিপে ধরে গজরাচ্ছে—তোর জিব টেনে ছিঁড়ে দেব! শুনে রাখ—আমি শশী গুণীন বলছি—মায়ের আজ্ঞে মিছে হতে পারে না।

বিলেস মরেনি। না—

রাতের অন্ধকারে বনের দিক থেকে বাতাসের সাপ্টা শোনা যায়, ফুঁপিয়ে ওঠে জোয়ারের মাতনজাগা

বড় গাং, সমুদ্রের বুক থেকে ও যেন মত্ততার যোগান পেয়েছে। মশালের আলোগুলো রাতের গভীরে ম্লান হয়ে নিভে নিভে আসছে।

এ কোন বিচিত্র এক জগৎ, মানুষের অস্তিত্ব এখানে অর্থহীন, প্রকৃতি গহনে ওই ক'টি মানুষ এমনি অতল তমসায় কি সর্বনাশ আর মৃত্যুকেই প্রত্যক্ষ করে শিউরে উঠেছে!

শশী গুণীন এই মৃত্যুকে মানতে পারে না, কান পেতে কি শুনছে সে। দেখছে আঁধারে সন্ধানী দৃষ্টি মেলে।

কোথায় বনের গভীরে চাপা গর্জন শুনছে শশী গুণীন। তার মুখে স্বস্তির আশ্বাস জাগে। বাঘটা শিকার ধরতে পারেনি নিষ্ফল ব্যর্থতার জ্বালায় তাই গর্জাচ্ছে। বিলেস মরে নি, কিন্তু রাতের অন্ধকারে কোথায় পালালো এইটাই প্রশ্ন হয়ে ওঠে। মনটা হাল্‌কা হয়, তার মন্ত্র মিথ্যা হয়নি। বেঁচে আছে বিলেস।

সকালের আলোয় বড় গাং-এর ধারের খালে নৌকাবসতের বাওয়ালিরা জেগে উঠে স্নান সারছে। ওদের মুখে চোখে তখনও গতরাতের সেই ছবিটা ভেসে ওঠে। মৃত্যুর পদধ্বনি শুনেছিল তারা।

তবু অবাক হয় শশী গুণীন। অভ্যাসমত স্নান সেরে বনের ধারে নেমে এরমধ্যে গরান খুঁটি, পাতা দিয়ে বনবিবির আটন তৈরি করে পুজোর আয়োজন করছে। মাকে নিবেদন করবে জোড়া মুরগী, পুজো সেরে তবে বনে ঢুকবে ওরা গুণীনকে নিয়ে। শশী গুণীন গতরাতের এতবড় ঘটনাকে আমলই দেয়নি। হঠাৎ গুপীনাথ মহাজনের ডাক শুনে চাইল সে। কয়েকজন বাওয়ালীর সঙ্গে গুপীনাথ ভাঁটির বনে সাবধানে নেমে এসে বল্লে—মায়ের পুজো তুমিই করবে গুণীন?

গুপীনাথের কথায় চমকে ওঠে শশী গুণীন। এতকাল ধরে নোতুন ঘেরে মাকে পুজো দিয়েছে তাদের বংশ। গুপীনাথও ব্যাপারটা বুঝতে পেরে বলে—মানে কাল রাতে বিপদ হয়ে গেল, এই অশৌচ অবস্থায় মায়ের পুজো—

শশী গুণীনের চোখ দুটো বারুদের মত দপ্‌ করে জ্বলে উঠতে গিয়ে থেমে গেল। তবু চাপাস্বরে গর্জায়—মহাজন, বিলেস মরেনি। বড় শিয়াল তাকে ছোবে না মায়ের আজ্ঞে।

ভোলা এগিয়ে এসে বলে—তোমার ছেলে বেঁচে থাকুক গুণীন। তবু অশৌচ গায়ে পুজো করবে এতগুলো লোকের ভালোমন্দের কথাটা ভাবো। পাগলামি—

—ভোলা! রুদ্ধ আবেগে কি চরম অপমানে গর্জে ওঠে মানুষটা। থরথরিয়ে কাঁপছে গুণীনের সারা দেহ, সব তেজ বিক্রম ওর কি দারুণ আঘাতে চুরচুর হয়ে গেছে। ও বিকৃত কান্নাভিজে গলায় বলে,

—না, না। সে মরেনি রে। মরে নি—অশৌচ হয়নি আমার। একটা বনস্পতি যেন চকিত বজ্রাঘাতে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে। সব সবুজ ওর মুছে গেছে। আহত অপমানে দুঃসহ কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে শশী গুণীন। ওরা তার মায়ের পুজোর অধিকারও কেড়ে নিল। গুপীনাথ মহাজন বলে—গাঁ বসতে ফিরে যাও গুণীন, মন বুঝ করে এসো।

ওরা আজ তাকে বাতিলের দলেই ফেলেছে।

গাং-এর বিস্তীর্ণ বুকে সন্ধ্যা নামে রং-এর তুফান তুলে। শ্যাম বনসীমায় শেষ সূর্য ঘন বেগুনী রং আভা মাখিয়ে আঁধারে হারিয়ে যাবে, দু'একটা গাং চিল বাসা খুঁজে ফিরছে। কোন ঘর ফিরতি মধুলায়ের পাটাতনে মুখ কালো করে আজ আবাদে ফিরছে শশী গুণীন। বিলেসের এই হারিয়ে যাওয়া তার উঁচু মাথা ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছে, গ্রামে ফিরছে আজ পরাজিত একটি মানুষ। বিলেসের কথাই মনে পড়ে।

বেয়াড়া বেবশ একটা ছেলে। বলে কয়েও তাকে পথে আনতে পারেনি শশী গুণীন। ও যেন তার গোত্রছাড়া। ভোগালো সুন্দর চেহারা, মাথায় বাবরি চুলে তেড়ি কেটে রঙীন জামা গায়ে দিয়ে যাত্রার দলের আখড়া দেয়। গান গায়, বাঁশী বাজায়। শশী গুণীন ওর মাকে বলে,

—বাওয়ালির ব্যাটার ইকি ধরণ রে বৌ! রূপখান যেন মেয়েছেলের মতন, ওরে কয়ি দিও পুজোর

আটনে যাতি। ইবার ঘেরে যাবার কথা কয়ো, বাদাবনে, যাবে না বাওয়ালির ব্যাটা? এ্যাঁ, ওতেই চলবে?

মেঘনা কেন আবাদের বাওয়ালিদের বৌ-ঝিদের কাছে বাদাবন শয়তানের রাজা, জলে কুমীর কামট আর ডাঙ্গায় সাপ বাঘের মুলুক। মরণ সেখানে পদে পদে। তবু বাওয়ালি যায় জীবিকার সন্ধানে বনের টানে। বাওয়ালি বৌ-ঝি আউড় চুল রাখে, মাথায় তেল নেই। গায়ে খড়ি ওঠে। সাঁঝ পিদীপ দেয় মা বনবিবির থানে আর উদাস চাহনীতে চেয়ে থাকে ভাঁটির গাং-এর দিকে কখন দিকহীন গাং-এর সীমায় জোয়ারের টানে ওরা ঘরে ফিরবে বাদাবন থেকে। কেউ ফেরে—কেউ আর ফেরে না। গাং-এ তলিয়ে যায়—বাদাবন বাঘের পেটে যায় আর বাওয়ালি বৌ-ঝির চোখের জলে গাং-এর জল লোনা হয়ে ওঠে। মেঘনা বলে।

—পাঁচটা লয় সাতটা লয়, একটা ছেলে তাকেও বাদাবনে লই যাবা?

শশী গুণীনের কাছে বাদাবন মা বনবিবির আটন, আঠারো ভাঁটির মায়ের রাজ্য। বনবিবির দেওয়াসী বংশ তারা। মায়ের আজ্ঞায় তার মুখবন্ধন ঘের বন্ধন ব্যর্থ হয়নি। এ চাকলার লোকের ভিড় জমে মন্দিরে। জলপড়ায় তেল পড়ায় কাটি ঘায়ের চিকিৎসায় তারা মন্ত্রসিদ্ধ। ঘেরের কাঠমহাজনরা সাধ্য সাধনা করে বনে নিয়ে যেতে। তারা ভরসা পায় শশী গুণীনের উপস্থিতিতে। সেই গুণীন বংশের সন্তান অই বিলেস তার বংশধর। শশী গুণীন বলে—ছেলের মাথাখান খাসনি বিলেসের মা, গুণীনের ব্যাটা গুণীনই হবে। যাত্রার দলের বাজনদারকে কে পুঁছে। ওরে ইবারই ঘেরে লই যাবো। বিলেসের চোখে জাগে অন্যস্বপ্ন। ঝুমুর দলের সেরা নাচিয়ে চাঁদনী তাকে বেঁধেছে কি বাঁধনে। তাই হাটে গঞ্জে ঝুমুরের আসরে এসে জোটে। বাঁশী বাজায় ওদের দলে। —দলের কর্ত্রী পরাণ দাসী বলে—মিষ্টি বাঁশী গো ছেলের।

চাঁদনীর চোখে নেশার ঝিলিক। ও বলে—কেষ্ট ঠাকুর গ মাসী তাই তো রাধা হইছি। কই গো নাগর, খাও। লজ্জা কিসের?

বিলেস এর মধ্যে মদও ধরেছে। ডেলাইটের আলো ঝলমল আসরে চাঁদনীর সোনার বরণ দেহের ছন্দ সুর তাকে মাতাল করেছে। চাঁদনী বলে চোখ মটকে।

—গুণীনের ব্যাটা গ, তা বাঘিনীকেই বশ করতে লাগছে।

বিলেস ওর নিটোল দেহের অতলে যেন তলিয়ে যায়।

বাড়ি ফিরছে বিলেস, রাতের অন্ধকারে হঠাৎ ভেড়ির সামনে বাবাকে দেখে দাঁড়ালো। শশী ওর পথ চেয়েই ছিল। অনেক কথাই কানে আসে তার। আজ সব দেখে শশী গুণীন চমকে ওঠে।

—বিলেস! এত গুণ হয়েছে তোর? ব্যাটা হারামজাদা—

শশী গুণীনের চোখ জ্বলে ওঠে নিষ্ঠুর কাঠিন্যে। মদের গন্ধ, বিলেসের চোখে চাঁদনীর স্বপ্ন। সব নির্মম আঘাতে যেন টুকরো টুকরো করে দিয়ে শশী গুণীন গর্জাচ্ছে—ই গোণেই তোরে বাদাবনে যাতি হবে।

মেঘনাও এসে পড়েছে, কি বলতে যায় সে, কিন্তু শশী গুণীন শোনায়—খবরদার। কুন কথা বলবে না। বিলেসকে সেই জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে গেছল বাদাবনে এই পরিবেশ থেকে।

কার বুকফাটা কান্নার শব্দে চমক ভাঙ্গে শশী গুণীনের। ওদের ঘাটে এসে ভিড়েছে নৌকাটা। আজ একাই বাদাবন থেকে ফিরছে গুণীন। বিলেসের খবর ঢের আগে যেন হাওয়ায় এখানে পৌছে গেছে। মেঘনা আর্তনাদ করে ওঠে।

—গুণীন! ছাই ওসব বুজরুকি তোমার। নিজের ছেলেটাকে বাঘের মুখে তুলি দিই এলা? কি মুরোদ তুমার?

গ্রাম বসতের লোকজন ভিড় করেছে। মেঘনা কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। শশী গুণীন দেখেছে ওই জনতার চেখে মুখে কি অবিশ্বাসের ছায়া নেমেছে।

তাদের মনেও আজ জেগেছে সংশয় আর সন্দেহ। শশী গুণীন দেখেছে ওদের চোখে অবিশ্বাস, হয়তো

পরিহাসের তীক্ষ্ণতা। তার এতদিনের সহজাত সেই সংস্কারকে ওরা মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিতে চায়। মেঘনা কাঁদছে আর চীৎকার করে বলে —জবাব দাও? শুধাও তোমার ওই রাক্ষুসী বনবিবিরে?

মা! শত্তুর—রাক্ষসী! ওর মূর্তিখানা ইবার ভাঙ্গি গাং-এর জলে ফেলি দিব। তোমার ওই মিথ্যে লোকঠকানির গুণীনগিরি।

অসহায় কণ্ঠে বলে শশী—না! না রে মিথ্যে লয়। মা আছেন!

গাং-এর ধারে ছায়ানামা বটগাছের নীচের ওই বনবিবির থানের মূর্তিটার দিকে চেয়ে থাকে শশী গুণীন। তার সাতপুরুষের আটন। ছায়া আলোর আভায় ওই মৃন্ময়ী দেবীমূর্তির পাশে দাঁড়িয়ে রাজা দক্ষিণ রায়। রাজা দক্ষিণ রায় বাদাবনের দেবতা, বাঘ-এর দেবতা। দক্ষিণ রায় আরও প্রতিষ্ঠা লাভের জন্যই নরবলি দিতে চেয়েছিল দুখীরাম নামে এক গরীবের সুলক্ষণ ছেলেকে ধরে এনে, পুজোর আয়োজন করছে, ছেলেটা কাতর হয়ে মা বনবিবির স্মরণ নেয়। মা বনবিবি দুঃখীর মা মা ডাক শুনে তাকে উদ্ধার করে নিয়ে যায় দক্ষিণ রায়কে জব্দ করে। দয়াময়ী মা—দক্ষিণ রায়ের এই দুঃসাহসের জন্য তাকে শাস্তি দিতে চান, দক্ষিণ রায় শক্তিমান হয়েও মা বনবিবির কোপকে ভয় করে, তাই বড় গাজি খাঁকে নিয়ে মায়ের দরবারে এসেছে ক্ষমা চাইতে। সেখানে দেখে মা বনবিবির কোলে সেই দুঃখীরাম। মা ক্ষমা করেন দক্ষিণ রায়কে তবে এক শর্তে! তিনি সত্যবন্দী করান দক্ষিণ রায়কে।

—আঠার ভাঁটির মধ্যে আমি সবার মা। মা বলে যে ডাকে তার দুঃখ থাকে না। রায় বলে—

শুন মাতা আরজ আমার,
সত্য সত্য তিন সত্য সত্য অঙ্গীকার।
বনেতে আসিয়া যেবা মা বলে ডাকিবে,
আমা হতে হিংসা কদাচ না হবে।

মা বনবিবির মূর্তির চোখ দুটো কি বেদনায় টলটলে হয়ে উঠেছে, পাশে বীর বেশে সজ্জিত রাজা দক্ষিণ রায় মায়ের চরণ স্পর্শ করে ওই সত্যবন্ধন করছে। তার চোখে ক্ষমার মাধুর্য এতকাল ধরে দেখেছে ওই মূর্তিকে, পুজো করেছে। কিন্তু মনে হয় আজ সেই মৃন্ময় মূর্তিতে চকিতের জন্য প্রাণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, ওদের চোখে কি দীপ্তি, গুণীন শশী সেই ক্ষণিকের প্রদীপ্ত আভাতে দেখেছে তার মনের অতলের সব অন্ধকার ভরে ওঠে কি বিশ্বাসের ঝলকে। গুণীন গর্জে ওঠে।

—না! সত্যবন্ধন মুখবন্ধন ঘেরবন্ধন দেহবন্ধন মিথ্যে লয়, হতে পারে না। আর বিলেস মরেনি। হারামীর বাচ্চা কোথায় পালিয়েছে—আমার উঁচু মাথাটা নিচু করে গেছে!

ওরা আজ তা মানে না। জানে মিছে কথা। বিলেস বাঘের মুখেই গেছে।

রাতের পর রাত নামে। বিলেসের কোন খবর নেই, ক্রমশঃ গ্রামবসতের মানুষের মনে ওটা যেন সত্য বলে মনে হয়েছে। মেঘনা এখনও গুমরে কাঁদে। শশী গুণীন গুম হয়ে বসে থাকে মন্দিরের গাছতলায়। আহার নিদ্রা যেন ভুলে গেছে। স্তব্ধ নির্বাক চাহনি মেলে চেয়ে থাকে, অন্ধকারে আশ্বাস খোঁজে। লোকজন পুজো দিতে আসে, চেলারাই ওসব করে। শশী গুণীনের মনে হয় কোথায় একটা ক্লান্তি অবিশ্বাসের কালো আঁধার নামছে ওর মনে। এতদিন তাহলে কি অর্থহীন একটা সংস্কারকেই জড়িয়ে ধরেছিল, মিথ্যাকেই চরম সত্য বলে জেনেছে আর ঠকে এসেছে। এত লোককে ঠকিয়েছে মা বনবিবি—বাবা দক্ষিণ রায়, তাদের সত্য বন্দী, অসহায় মানুষের জন্য ভালবাসা এসব মিথ্যা!

নাইলে তারই এ সর্বনাশ কেন হবে? বিলেসের সেই হারিয়ে যাওয়াটা তার সবকিছু বিশ্বাসকে অর্থহীন করে তুলেছে। এ যেন তারই অপমৃত্যু।

হঠৎ উৎকর্ণ হয়ে ওঠে শশী গুণীন। সামনে গাং-এর প্রশস্ত বিস্তারে জোয়ারের ঢল চলেছে। দূর রাতের অন্ধকারে ভেসে চলেছে কালো বিন্দুর মতো কয়েকটা নৌকো। ...শশী গুণীনের চোখের দৃষ্টি

প্রখর, বাদাবনের গহনে ওরা দেখতে পায় হিংস্র প্রাণীর অস্তিত্ব, কানে শোনে দূরাগত বাতাসে তাদের পদশব্দ, ঘ্রাণশক্তি ওর তাদের থেকেও প্রখর। হঠাৎ সেই বাদাবনের গুণীন যেন চমকে ওঠে। ওই ক্ষীণ শব্দ হাসির বিকৃত একটু সাড়া তার সারা মনে ঝড় তুলেছে। হুঙ্কার দিয়ে ওঠে গুণীন—কে যায়? কার নৌকা? জলের বুকে হঠাৎ কাদের চকিত স্তব্ধতা নামে। সেই হাসির সাড়া আবছা সুর নিমেষের মধ্যে থেমে যায়। ওরা দেখে দূরে ভেড়ির উপর ছায়ার মতো দীর্ঘদেহী মানুষটাকে। কে জানায়—ঝুমুর দলের নাও। কালিগঞ্জে যাবে। ও ও— শশী গুণীনের চোখ জ্বলছে, না—ভুল সে শোনে নি। তার চোখ কান এখনও তীক্ষ্ণ, বাদাবনের জানোয়ার তাকে ফাঁকি দিতে পারে না বিলেসও আজ পারে নি। এতদিন ধরে গুণীন তারই হারানো বিশ্বাস, জীবনের বিধৃত সত্যকে অন্বেষণ করেছে। আজ কি দুর্বার রাগ আর কাঠিন্যে সারা মন ভরে ওঠে। বিলেস আজ তার কেউ নয়। ওইই তাকে ঠকিয়েছে, অপমান করেছে সব থেকে বেশী। দুঃসহ রাগে ফুলে ওঠে শশী গুণীনের বন্য মন।

বিলেস পালিয়ে এসেছিল সেই রাতে বনের ঘের থেকে কোন চোরাকারবারী মধু বাওয়ালির নৌকায়। বাঘটা যখন নৌকায় হানা দিয়েছে বিলেসেরা তখন অনেক দূর পথ পাড়ি দিয়ে এসেছে। বাড়ির দিকেও যায়নি। তার মনে চাঁদনীর নেশা। আলো ঝলমল আসরে চাঁদনীর ছন্দময় দেহটা তাকে ডাক দিয়েছে। তাই ঠিক খুঁজে খুঁজে শমসের নগরের হাটে তাদের পেয়েছিল বিলেস। ওদের সঙ্গেই রয়ে গেছে—এক ঘাট থেকে অন্য ঘাটে ফিরেছে; এবার কালীগঞ্জের হাটের গাওনা শেষ করে চাঁদনীর সঙ্গেই চলে যাবে বসিরহাটে ওদের আস্তানায়। চাঁদনী বলে—নোতুন পালা ধরো মাসী এবার দলের নোতুন গায়েনদার পেয়েছো। কি গা আবার পালাবে না তো?

হাসছে বিলেস। সকালের আলোয় গাং ভরে উঠেছে। মাঝ গাং-এ নৌকোগুলো নোঙর করা হয়েছে মুগ্ধ স্তাবকদের ভিড় এড়াবার জন্য। বিলেস চাঁদনীর চোখে কি নতুন স্বপ্ন দেখে। তাই বলে—না। আর যাবো না চাঁদনী তোকে ছেড়ে।

হঠাৎ পাশেই এসে ভিড়েছে ছোট ডিঙ্গিখানা, চাপা গর্জন ওঠে—বিলেস। বনের জানোয়ারের বুক কাঁপানো এই গর্জন। বিলেস তার বাবাকে চেনে, জানে ওই বুনোমানুষটাকে। উশকোখুশকো চুল, দুচোখ জ্বলছে। বলিষ্ঠ দেহের পেশীতে কি দুর্বার শক্তি সঞ্চয়। ঝুমুরদলের ওরা চমকে ওঠে। এতদিন পর আজ শশী গুণীন তার হারানো সত্যকে খুঁজে পেয়েছে, সারা দেশের মানুষ জানবে শশী গুণীনের দেহবন্ধন মিথ্যে নয়। মা বনবিবির দেওয়াসী সে। তার ছেলেকে বাঘে ছুঁতে পারে না তার মুখবন্ধনের জোরে। বিলেস ভীত চকিত স্বরে বলে ওঠে—বাবা!

—না! আমি তর কেউ নই। উঁচু মাথা নিচু করেছিস। বংশের মুখে কালি দিইছিস তুই। আজ এই নরকের পাঁকে মরা থেকে তোর বাদাবনে বাঘের থাবায় মরাই ছিল ভালো। বাওয়ালির ব্যাটার মত মরতিস! আজ!

বিলেস জানায়—ওখানে যাবো না। কোন কথাই শুনবো না তোমার।

—থাম! যাতি হবে না তরে। তোর দেহবন্ধন মুখবন্ধন সব বন্ধন খুলি নিলাম। তুই আমার কেউ নস। তাই তরে আজ যমের মুখেই ছাড়ি দিলাম। যা—লাফ দিয়ে এসেছে গুণীন এই নৌকায়, টলছে ছোট নৌকাটা। আর্তনাদ করে ওঠে চাঁদনী। বিলেসও বুঝতে পারেনি, কি ভয়ে বাবার এই রুদ্রমূর্তির কাছ থেকে সরে যাবার চেষ্টা করতেই গাং-এর জলে ছিটকে পড়েছে বেকায়দায় বিলেসের দেহটা। হাবুডুবু খেয়ে নৌকার দিকে এগিয়ে আসে সে। কোটালের জোয়ারের স্রোত চলছে, হঠাৎ অদূরে দেখা যায় জল মাথায় করে জেগে ওঠে একটা বিরাট কুমীর। আশপাশেই ছিল সেটা, জলে কি পড়ার শব্দে মাথা তুলেই বিলেসকে হাবুডুবু খেতে দেখে তিরবেগে ছুটে আসে কুমীরটা ওর ভাসমান দেহটা লক্ষ্য করে।

চীৎকার করে বিলেস, অস্ফুট আর্তনাদ শেষ হবার আগেই কুমীরটা ওকে ধরে শূন্যে ছুঁড়ে দেয়, দুহাত

তুলে ব্যাকুল কণ্ঠে চীৎকার করে ওঠে সে—সেই চীৎকার শেষ হবার আগেই কুমীরটার বিশাল মুখের মধ্যে এসে আটকে যায় ওর দেহটা। পরক্ষণেই জল তোলপাড় করে কুমীরটা বিলেসকে নিয়ে তলিয়ে গেল। আর দেখা যায় না।

স্তব্ধ নির্বাক বিস্মিত বেদনাহত চাহনিতে চেয়ে থাকে শশী গুণীন। নদীর দুদিকে গঞ্জের হাজারো লোক ভেঙ্গে পড়েছে। গাং-এর বুকে কয়েকটা নৌকা এদিক ওদিক খুঁজছে। নিষ্ফল সেই অন্বেষণ—বিলেসের কোন পাত্তা আর মেলে না।

হঠাৎ কি রুদ্ধ আবেগে শশী গুণীনের চাপাপড়া পিতৃহৃদয় আর্তনাদ করে ওঠে—কেনে? কেনে ওর মুখবন্ধন দেহবন্ধন খুলি নিলাম?

মা বনবিবি এ কি করলি মা! ... এ কি করলি—ই কি আজ্ঞে দিলি মা! ই কি বললাম!

...সুন্দরবনের গহিণে আজও কাঠ বাওয়ালির দলে দেখা যায় শশী গুণীনকে। মুখে ওর অজস্র রেখায় বহু অভিজ্ঞতার ... বেদনার আভাস, নীলাভ দুটো চোখ জ্বলে—মাথার আতেলা সাদা চুলগুলো বাতাসে ওড়ে, খল খল শব্দ ওঠে গলার কাচকড়ার মালায়, হাতে বাঁকানো হেঁতালের লাঠি বিড় বিড় করে বনের গভীরে চলেছে। ঝপ্ ঝপ্ কুঁড়ুলের কোপ-এর শব্দ ওঠে, বনে নেমেছে ওরা জীবিকার তাগিদে আর ওই বুড়ো শশী গুণীন ওদের মনে এনেছে বিশ্বাস—দুর্জয় সাহস, ওর মুখবন্ধন-দেহবন্ধন-ঘেরবন্ধন বৃথা নয়। হাজারো বিলেসের জন্যে আর ওর মমতা বন্ধন।

বনের ছায়ানামা অন্ধকারে, দূরসন্ধানী দৃষ্টি মেলে মাঝে মাঝে চীৎকার করে—তফাৎ যাও। কার আজ্ঞে? মা বনবিবির আজ্ঞে, বাবা দক্ষিণ রায়ের সত্যবন্ধন!

আদিম আরণ্যক জগৎ, গাং-এ তুফানের শব্দ ওঠে, বনে বনে জাগে বাতাসের অস্ফুট গুঞ্জরণ, গেও গরাণ কেওড়া ফুলের সুবাসে ওই জগৎ সৌরভময়, সেই আরণ্যক পরিবেশে শশী গুণীনের গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বর বাদাবনের একটি পরম সত্যকে, কি নির্ভয়ে আশ্বাসকে বিঘোষিত করে।

মাটির কাছাকাছি

নিরাপদ এখনও বেশ শক্ত পোক্তই আছে। দেহটা এককালে ইস্পাতের মতই কঠিন আর মজবুত ছিল। নিটোল চেহারা, হাত দুটোয় দেহের শক্তির প্রকাশ, চলতো মাথা উঁচু করে।

দুহাত দিয়ে লাঙলের বোঁটা টিপে ধরলে জোয়ান বলদ দুটো টানতে হিমশিম খেতো। লাঙলের ফলা মাটির বুকের গভীরে বসে যেতো, সদ্যকর্ষিত মাটি উলটে পড়তো। ধারালো ফলার দুপাশে মাটির মিষ্টি সোঁদা গন্ধে বুক ভরে যেতো। এ যেন মায়েরই স্পর্শ।

নিরাপদ দীর্ঘদিন জীবনের সঙ্গে, মাটির সঙ্গে, ঝড় বৃষ্টি ধূ ধূ রোদের সঙ্গে লড়াই করে বাঁচার রসদ সংগ্রহ করেছে। একাই বাঁচেনি সে, তার কঠিন পরিশ্রমে একটা সংসার বেঁচে ছিল।

একখানা হালের জমি-বিঘেপনেরো জমি, নিজে কোদাল চালিয়ে বনের গড়ানি জল আটকাতে বাঁধ দিয়েছিল। সেবারের খরার সময় সস্তা ধানের মজুরি দিয়ে জন খাটিয়ে, নিজে খেটে এই বাঁধটা দিয়েছিল নিরাপদ।

শক্ত পাথুরে মাটি, টাংনার কোপ বসতে চায় না, নিরাপদের হাতের পেশীগুলো ফুলে ওঠে—পিঠটা বেঁকে যায় ধনুকের মতো পাথরের চাই ফাটাতে, তবু থামেনি নিরাপদ। তার স্ত্রী ললিতা বলতো-কি হবে এখানে? এই টংরা মাটিতে?

-কুয়ো খুড়াবো রে ভূপির মা, দেখবি ই পাথরের বুক ফাটাতে পারলে নীচে কাঁচধার অফুরান জল আছে। সারা মাটিতে সিচ হবেক, ই মাটিতে সোনা ফলবেক, তবে হঃ- কষ্ট না করলে মা বসুমতীও কিছু দিবেক নাইরে।

নিরাপদ জীবন ভোর লড়াই করেছে,তার লড়াই থামেনি, ওই মাটির নীচের পাথর ফাটিয়ে সে বিরাট কুয়োও করেছে, অফুরান জল।

ওদিকে বর্ষার বনগড়ানি জলকে বাঁধ দিয়ে আটকে সেই জলের সেচ দিয়ে—সার দিয়ে এই মাটিকে উর্বরা ফলবতী করেছে। নিরাপদের ক্ষেতের ধানের গোছ আর ঘন সবুজ রং দেখে পাঁচখানা গাঁয়ের লোক বলতো—হ্যাঁ, চাষের বহর জানে নিরাপদ। শুধু ধানই নয়, তারপর আছে ওই অফুরান কুয়োর জল। প্রথমে নিজেই বালতি বালতি তুলে নালা দিয়ে ক্ষেতে নিয়ে যেতো। আলু, গম, আনাজপত্রও হতে শুরু করলো ক্ষেতে।

দুই ছেলে ভূপতি আর নৃপতি। ললিতাও বলতো ওদের বাপের সঙ্গে আলুর ক্ষেতে ভেলি দে গা।

নিরাপদই বলতো—না। না বউ। ওদের পড়াশোনায় খুব মাথা। ওদের পড়তে দে। দুটো মনিষ আছে—আমিও একাই একশো, ওদের লাগবে না। তুরা পড়াশুনা কর বাপ। ফাস্টো হতে হবেক।

নিরাপদ নিজে পড়ার সুযোগ পায় নি। বাবা ছেলেবেলাতেই মারা গেছল, কাকাও তাকে আলাদা করবার নামে নিজেরা ভাল জমিগুলো নিয়ে ওকে গ্রামের বাইরে বনের ধারে এই জমি দিয়ে বলে—একলপ্তে সব জমি হলো তোর।

সেদিন থেকেই নিরাপদের সংগ্রাম শুরু হয় এই মাটির সঙ্গে। তিনচার বছর ধরে কঠিন পরিশ্রম করেছিল সে এই জমিকে হাঁসিল করতে, তারপর বাঁধ, কুয়োর জল পেয়ে এবার পায়ের নীচে মাটি পায়।

সেবার আলু, সবজি বেচে লোকটা পাম্প সেট কেনে, আর কষ্টকরে জল তুলতে হয় না। পাম্প চালু করে দিলেই জল ওঠে—শুধু নালি কেটে মাঠে ধরিয়ে দিতে হয়।

ভূপতি সেবার চারটে লেটার নিয়ে পাশ করে, জিলার মধ্যে ভালো ফল করে জলপানি পেয়ে শহরের কলেজেই ভর্তি হলো। বোর্ডিং-এর খরচা আছে, এদিকে নৃপতিও এবার ম্যাট্রিক দেবে। পড়াশোনাতে

সেও খুব ভালোই। গাঁয়ের লোক বলে—সত্যিই তোর বরাত রে নিরে, ডাঙা জমিতে ঘাম ঝরিয়ে সোনা ফলালি আর ছেলে দুটোও দেখালো—তাদেরও হিম্মৎ আছে, একেবারে রত্ন!

নিরাপদ কথা কম বলে। গ্রামের আটচালায় যখন সকলেই আসরে বসে, তাস পাশাও খেলা হয়, সন্ধের সময় বিশু কাটায় হ্যারিকেন জ্বেলে রামায়ণ পড়ে, ওদিকে কার্তিক মাষ্টার রাজনীতির ভাষণ দিয়ে হাঁক পাড়ে—লাঙল যার জমি তার। সেইসব আসরে যায় না নিরাপদ।

ভোর থেকে সে তার নিজের কাজ, ক্ষেত খামারের কাজ, সার ছিটানো নিড়ানো এই সবই করে। নিরাপদ বলে—তুমাদের বাপ মায়ের আশীব্বাদ গ খুড়ো।

ললিতাও স্বামীর সঙ্গে সাধ্যমত খাটে। নৃপতিও পাশ করে কলেজে পড়ছে। নিরাপদর খাটুনি আরও বেড়েছে। ছেলেদের মানুষ করতে হবে, বোর্ডিং-এর খর্চা আছে, বইপত্র, জামাকাপড়ও চাই। নিরাপদ নিজে কোনদিন দামী ধুতি পাঞ্জাবী পরেনি। খাটো ধুতি আর একটা ফতুয়া কখনও পরে, নাহলে ধুতি গামছাতেই কাজ চলে যায়। ছেলেদের জন্য সে প্যান্ট সার্ট জুতো সবই জোগায়। তাদের জন্যই নিরাপদ ললিতা দিন রাত পরিশ্রম করে। ক্ষেতে পড়ে থাকে, ধান ছাড়াও আলু, গম, সরষে, আনাজপত্রও করে। পাইকেররা ক্ষেত থেকেই তার ফসল দাম দিয়ে নিয়ে যায়।

ভূপতি পাশ করে শহরের ব্যাঙ্কে চাকরী পায়। নৃপতি পড়ছে, সে ভালো রেজাল্ট করে বাঁকুড়াতেই ডাক্তারী পড়ছে। গ্রামে আসে ছেলেরা—নিরাপদ ললিতা চেয়ে দেখে। তাদের ক্ষেত যেমন ফসলে সবুজ, ছেলেরাও তেমনি কৃতি।

ললিতা বলে—এবার ভূপির বিয়ে থা দাও।

নিরাপদ বলে—ঘর দোর তো করতে হবেক। মাটির ঘরে ছেলের বউ আনবে?

মাটির কাছাকাছি থাকি, মাটির ঘরই বা মন্দ কিসের গো' আমার শরীর গতিকও ভালো বুঝছি না। দ'' নিতে কষ্ট হয়।

নৃ' তিও মাকে দেখেছে তার ক'বছরের ডাক্তারী পড়া বিদ্যে দিয়ে বলে—শহরে নিয়ে চলো বাবা মাকে, কলেজের স্যারদের দিয়ে দেখাবো। বুকের ব্যথা ভালো নয়।

হাসে ললিতা—খুব ডাক্তার হয়ে গেছিস না রে? অর্জ্জুন ছালগুড়ো খাচ্ছি, ওতেই ঠিক হয়ে যাবেক, শশী কবীরাজ বলেছে। আর যাবার সময় হলে যেতেই হবেক রে—কে আটকাবেক?

ললিতা চলেই গেল। নিরাপদ তাকে আটকাতে পারেনি। নৃপতিও এসেছিল, ইনজেকশনও দিয়েছিল। ওর বউও ডাক্তার। কায়স্থের ঘরের মেয়ে ললিতা এর আগে ভূপতির বিয়ের চেষ্টা করেছিল।

দু'একটা মেয়ের সন্ধানও আসছিল। কিন্তু ভূপতিই বলে—বাবা, তোমাদের বিয়ে নিয়ে ভাবতে হবে না।

ললিতা বলে—সেকি? ঘরে বউ আনবো না? কাজ করছিস—ব্যবসাও করছিস বললি, বিয়ে থা করবি না?

ভূপতিই জানায় শহরের কোন ব্যবসাদারের মেয়ের সঙ্গেই তার বিয়ের ব্যবস্থা হয়ে গেছে। সেই ভদ্রলোকের সঙ্গেই ব্যবসাপত্র করছে। এ বিয়েতে লাভই হবে।

ললিতা চুপ করে যায়। নিরাপদও গম্ভীর। জীবনের কঠিন কষ্ট, সেই সংগ্রামের দিনগুলোর কথা মনে পড়ে। ছেলেদের মানুষ করার জন্যই তারা দুজনে দিন রাত পরিশ্রম করেছে। রোদে পুড়েছে—বুকটা হাপরের মতো ভারি হয়ে গেছে লাঙলের বোঁটা ধরে ওই মাটি চষতে। বৃষ্টিতে ভিজে চাষ করেছে। হাড় কাঁপানো হিমে ধান কেটে ঘরে তুলেছে। ভূপতি নৃপতি ছিল গাঁয়ের রত্ন। তার সন্তান।

আজ বাবা মায়ের মতামতেরও কোন দামই দিল না ভূপতি। ললিতা ভেবেছিল কোন গৃহস্থ ঘরের গ্রাম্য মেয়েকে বৌ করে আনবে। আলতা পরে সে ঘুরবে, ঘরের কাজকর্ম করবে। লক্ষীপুজোর রাত জাগবে বৌ ঝিয়ের সঙ্গে। হিমরাতে কুয়াশার মাঝে সুর উঠবে—এসো পৌষ যেওনা।

পৌষলক্ষ্মীর আবাহন হবে তার আলপনা দেওয়া আঙিনায়, উলুধ্বনি উঠবে তার ঘরে। কিন্তু সেই সাধটুকুও পূর্ণ হতে দেয় নি। ললিতার মনে একটা হতাশাই জাগে।

কি হবে তার সংসারের? সে এই বাড়ির বৌ হয়ে এসে তার শাশুড়ীর কাছে এই সব অনুষ্ঠান, রীতি-নীতি শিখেছিল। সেগুলোকে সে ধরে রেখেছিল, আশা করেছিল তার ছেলের বৌকে সে সব ভার দিয়ে যাবে। কিন্তু শহরের ধনীর দুলালী, সেকি আসবে তার মাটির ঘরে ইতু পূজা, পৌষ লক্ষ্মীর পূজা করতে, সন্ধ্যায় তুলসী মঞ্চে প্রদীপ জ্বেলে শাঁখ বাজাতে?

নিরাপদ কোন কথাই বলেনি। ভূপতির বিয়ে হয়ে গেল সহজেই। গ্রামের লোকজন বাসে করে বরযাত্রী গিয়ে শহরের ঝকঝকে প্যান্ডেলে বসে ফ্রায়েড রাইস—চিলি ফিস—আইসক্রীম খেয়ে ধন্য ধন্য করেছিল। নতুন বৌ মমতা এসেছিল তিনদিনের জন্য। বাড়িঘর দেখে মমতা বল্লে ভূপতিকে এ কোথায় আনলে? এটাচড্ বড় বাথ নাই। মাটির উঠান, খড়ের ঘর।

ললিতা বলে—এই ঘরেই তো জনম কাটালাম মা।

মমতা বলে—আপনারা পারেন বলে কি সবাইকে পারতে হবে? নিরাপদও শুনেছে কথাটা। ললিতা কি জবাব দিতেই যাচ্ছিল, নিরাপদই থামিয়ে দেয় ওকে। মমতা বলে ভূপতিকে—কালই শহরে ফিরে চলো। এখানে মানুষ থাকতে পারে না। গাঁয়ের বাইরে বাড়ি—শেষে চোর ডাকাতে না শেষ করে যায়।

ওরা ফিরে গেছল শহরের মানুষ শহরেই। ললিতা বলে ভূপি শেষে এই করলো? বাবা মায়ের কথা—দেশঘরের কথা ভাবলো না?

নিরাপদ বলে—যা ভালো বোঝে করতে দাও ভূপির মা।

মমতা বলে—নৃপতির বিয়ে আমরাই দেখে শুনে দোব।

নিরাপদ জবাব দেয় না। বলদ দুটোকে জাব দিতে থাকে।

ওই কালা আর ধলা দুটো বলদকে কিনেছিল আশুড়ের হাটে। দখন সই জোড়াই। নধর দেহ, তেমনি চোখগুলো যেন রাজ্যের মমতা মাখানো। ছোট নিরেট শিং। সাতহাজার টাকা পড়েছিল, ঝোঁকের বশেই কিনেছিল জোড়াটাকে, কিন্তু ঠকেনি।

লাঙলে জুড়ে দেখেছিল নিরাপদ ওদের। নিরাপদর তখনও গায়ে অটুট শক্তি, পেশীগুলোয় ঢিল পড়েনি, শক্ত মুঠোয় আদ্দা মাটিতে লাঙ্গলের বোটা টিপে ধরে হাকাতে থাকে—চল? চল্—

বোটা টিপে ধরেছে যেমন তেমন গরু হলে শিরদাঁড়ায় টান পড়তো ওই শক্ত মাটি বেয়ে লাঙ্গল টানতে, কিন্তু কালা-ধলা বেশ সহজভাবে চলছে, বোটার চাড়ে ফলার দুদিকে মাটি কেটে যাচ্ছে, একটানা লাঙ্গল টিপে বিঘাখানিক বাকুড়ির ও মাথায় পৌছে দেখে সুন্দর সরল রেখায় এসেছে ওরা। নিরাপদ বলে—সাবাস কালা-ধলা। সাবাস। সেদিন থেকেই ওরাই এখন নিরাপদের সঙ্গী, বন্ধু, দোসর। ওদের ডাগর চোখের চাহনিতে নীরব এক প্রীতির ভাষা ফুটে ওঠে। মানুষের বন্ধুত্বের মধ্যে থাকে কোন উদ্দেশ্য, স্বার্থ; অবলা এই প্রাণীদের বন্ধুত্বে স্বার্থের ঠাঁই নাই। বন্ধু সেজে এরা নেয় না কিছুই, দিয়েই যায় অনেক।

ভূপতি শহরে ভালো ব্যবসা করছে। নৃপতিও ডাক্তারী পাশ করে এখন মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে রয়েছে। মাঝে মাঝে বাড়ি আসে। ভূপতি আসে কখনও সখনও গাড়ি হাঁকিয়ে। তার একটি মেয়ে হয়েছে। বেশ সুন্দর, তাকেও আনে সেবার। ললিতা ওকে বুকে জড়িয়ে ধরে। মেয়েটা সরে দাঁড়ায়। ভূপতি বলে—দাদু, দিদা হয়।

মেয়েটি মাথার একরাশ চুল দুলিয়ে বলে—তারা তো শহরে ড্যাডি, এরা দাদু দিদা কেন হবে?

আগামী প্রজন্মের কাছেও কোন স্বীকৃতি এদের নাই। বৈকালে ওরা আবার চলে গেল শহরে। ললিতা বলে—সবাই পর হয়ে গেল? তবে কেন এতসব করেছিলে?

নিরাপদ জবাব দেয় না। ললিতার শরীরও ভেঙ্গে পড়েছে। নিরাপদই সকাল সন্ধ্যা চা টা করে, রান্নার কাজেও হাত লাগায়। দুজনের রান্না এক বেলাতেই সেরে রাখে। রাতে জল দেওয়া ভাতই খায়।

ললিতা তবু আশা করে নৃপতির জন্য গ্রামের মেয়েই আনবে। কিন্তু নৃপতি ওর সঙ্গেই পাশ করা এক কায়স্থের মেয়েকেই বিয়ে করেছে।

ললিতা খবর পেয়ে চমকে ওঠে—বিয়ে করে ফেললেক, অন্য জাতে? ক্যামন বিয়ে গো?

নিরাপদ বলে—আজকাল সরকারের অপিসে সই করেই বিয়ে হয়, আজ জাত ফাতের বালাই শহরে আর নাই। বলেছে বৌকে সে দেখাতে আসবে।

ললিতা ফুসে ওঠে—না করে দিও। একজনের বৌ-কে দেখলাম, আর একে দেখে কাজ নাই। ওদের বৌ ওরাই নিয়ে ঘরকন্না করুক। আমরা খাটতেই এসেছিলাম জনম ভোর। খেটেই গেলাম, আমাদের আবার সখ-সাধ। কি তার দাম।

ললিতা আজ অসহায় কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। নিরাপদ বলে—চুপ দে বউ। কাঁদিস না। কেঁদে লাভ কি। ওরা সুখে থাকুক। আমাদের দিন এই মাটিতেই কেটে যাবে ঠিক।

ললিতা বলে—তাই যেন যায়, ওদের দরজাতে যেন কুনদিন যেতে না হয়, উপোশ দেব—তবু ওদের কাছে ফুটো কড়িও নেবো না।

ললিতার দেহমনও যেন কি আঘাতে ভেঙ্গে পড়েছে। বুকের ব্যথাটাও বেড়েছে। শশী কবরেজ বলে—বড় ডাক্তারকেই দেখাও নিরু, ঠিক ভালো বুঝছি না।

নিরাপদই তাদের গাঁয়ের মদনকে সদরে পাঠায় বড় ডাক্তার আনতে আর নৃপতি ভূপতিকেও যেন খবরটা দেয়।

খবর পেয়ে নৃপতি তার ডাক্তার স্ত্রীকে নিয়ে এসেছিল।

ভূপতিও এসেছিল গাড়ি নিয়ে।

নৃপতি ভেবেছিল মাকে ওই গাড়িতে করে শহরে হাসপাতালেই আনবে। কিন্তু ললিতা ওই মাটি ছেড়ে আর আসেনি। সেই দিন সন্ধ্যাতেই ললিতা মারা যান। নৃপতিও ওর বৌকে অবশ্য শেষ দেখা দেখেছিল মাত্র। কথা বলেনি।

নিরাপদ দেখেছিল ললিতার চোখে কি নীরব বেদনার ছায়া। জীবনে তার কোন সাধই পূর্ণ হয়নি। সব আশা স্বপ্ন তার হারিয়ে গেছে। সেই ব্যর্থ বেদনা বুকে নিয়েই চলে গেল ললিতা।

... দিন তবু থেমে থাকে না। সব অন্ধকার কাটিয়ে আবার সূর্য ওঠে, দিন আসে দিন যায়। নিরাপদর জীবনে এবার একটা শূন্যতা নেমেছে। বয়স বাড়ছে। ললিতা চলে গেছে প্রায় বার বছর হলো।

ললিতার স্পর্শ মাখানো ছিল সারা বাড়িতে। উঠান ছিল ঝকঝকে, গোবর নিকানো। তুলসী গাছটা ছিল ঘন সবুজ, ওদিকে দুচারটে ফুলের গাছ, পুঁই, শশার মাচা, গোয়ালের চালে লাউ গাছটা সবুজের পশরা সাজিয়ে বসতো।

এখন সেই সবুজের স্পর্শ আর নাই। কামিন মেয়েটা দায়সারা করে ঝটপট দেয় মাত্র, উঠানে কেচোর পাল মাটি তুলছে। ওদিকে কালকাসিন্দে, আপাংগাছের ভিড় ও সুরু হয়েছে। ঘরটার দরজা জানালায় রং জ্বলে গেছে। গোয়ালটা টিকে আছে কোনমতে।

গরু দুটো আছে, আর আছে সেই কালা আর ধলা। ওদেরও বয়স হয়েছে। তাদের অবস্থাও ওই নিরাপদের মতই। ক'বছরেই নিরাপদের সেই দেহটা যেন ঘুণ পোকায় খাওয়া কাঠের মতই হয়ে গেছে। সেই পেশীগুলো এখন ঢিলে হয়ে গেছে, হাতের চামড়া ঝুঁকে গিয়ে শিরাগুলো ঠেলে উঠেছে। গলার নীচের চামড়া ঝুলে পড়ে ওর মুখের আদলই বদলে গেছে। সামনের দাঁতগুলো পড়ে গেছে। নৃপতি বলেছিল দিনকতক শহরে চলো বাবা, দাঁতগুলো তুলে দিয়ে বাঁধিয়ে দোব।

নিরাপদ বলে—সুস্থ শরীরকে ব্যস্ত করে লাভ কি রে। এই বেশ আছি। বয়সকালে চুল পাকবে না, দাঁত পড়বে না তা কি হয়?

নিরাপদ দেখে কালা-ধলাকে। ওদের দেখেই নিজের বয়সটার কথা ভাবতে পারে। ওদেরও সেই জেল্লা আর নাই। দাঁতগুলো ক্ষয়ে গেছে। আর সেই তেজ ওদের নাই।

ঝিমোয় আর জাবর কাটে চোখ বুজে। এতদিন রোদে জলে লাঙল টেনেছে, ধান বোঝাই গাড়ি অনায়াসে টেনে দুমাইল দামোদরের বালি ভেঙেছে। রাতারাতি দূর পথ পাড়ি দিয়ে মাল আনতে সদরে গেছে। এখন? পাঁচকাঠা লাঙল দিতে হাঁপ ধরে নিরাপদের, ওই গরুদুটোরও। এবার আর ওদের দিয়ে চাষ করা যাবে না।

নিরাপদ হঠাৎ গাড়ির শব্দে চাইল।

নিজেই উনুনে ভাতে ভাত চাপিয়েছে। এখন ভাতেই আলু, উচ্ছে, পটল, কাঁচকলা, কুমড়ো যা জোটে সেদ্ধ করে নেয়। আর একটা গরুর দুধ, তাই ফুটিয়ে ওই দিয়েই খাওয়া সেরে নেয়।

ভূপতির গাড়ি, নৃপতিও গাড়ি কিনেছে। সেটা লাল রং এর মারুতি, এটা অন্য গাড়ি। ভূপতির গাড়িতেই নৃপতিও এসেছে। ওদের দেখে নিরাপদ উঠে আসে—আয়। বোস।

ওদিকে ঘরটায় একটা তক্তপোষ পাতা—আর দুটো চেয়ারও আছে। একটার হাতল আর নাই। ললিতাই সুখী মিস্ত্রীকে দিয়ে ছেলেদের জন্য বানিয়েছিল। ও তারই স্মৃতি।

আজ ভূপতি নৃপতি একটা উদ্দেশ্য নিয়েই এসেছে। দেখছে তারা বাড়ির জীর্ণ অবস্থাটা। আগে এসময় বাবা মাঠে সবজির চাষ করতো। গম—ওদিকে সরষে, এপাশে কফি, বেগুন—লাল ফলভরা টম্যাটোর ক্ষেত, সব সবুজ! আজ সেই ক্ষেত পড়ে আছে। সবুজের চিহ্ন আর নেই। কেমন ছত্রভঙ্গ অবস্থা।

বাবার শরীরও ভেঙ্গে পড়েছে। শেষ বয়সে একা পড়ে আছে এখানে। দেখাশোনা করার তেমন কেউ নেই। থাকলেও তাদের সাহায্যও নেবেনা নিরাপদ। নিজের হাতেই এখনও সবকিছু করে। এর মধ্যে নিরাপদই ওদের জন্য চাও করে এনেছে।

ভূপতি বলে—তুমি ব্যস্ত হয়ো না বাবা। বোসো—জরুরী কথা আছে।

—জরুরী কথা? তোদের? আমার সঙ্গে? বিস্মিত হয় নিরাপদ।

ভূপতি বলে—চাষবাস আর করতে পারবে না।

বলে নিরাপদ—তাই মনে হচ্ছে। কালা-ধলার বয়স হয়েছে, আর লাঙল টানতে পারবে বলে মনে হচ্ছে না। এবার হাটে একজোড়া বলদ কিনতে হবে—

ভূপতি বলে—ওদেরই নয়, বাবা—তোমারও বয়স হয়েছে।

আর রোদে বৃষ্টিতে মাঠে কাজ করতে পারবে না। এসব চাষবাস ভাগে দিয়ে চলো আমাদের সঙ্গে শহরেই থাকবে।

অবাক হয় নিরাপদ—এসব হাতে গড়া জিনিষস ছেড়ে দিয়ে চলে যেতে হবে শহরে? তোদের কাছে?

নিরাপদ মাঝে মাঝে নানা কাজে শহরে গেছে, তাদের বাড়িতে গেছে ক্ষেতের ফসল—ঘরের দুধের সন্দেশ তৈরী করে পাঠাতো ললিতা।

দেখে ওই বৌমাদের । বড় বৌ ধনীর দুলালী। নিরাপদের পরণে আধময়লা ধুতি, ফতুয়া। বড় বৌ ওকে প্রণাম অবধিও করে না। দোতালায় নিয়েও যায় নি। নিরাপদও নীরব, ঘরে বসে দুচারটে কথা বলে বের হয়ে এসেছে।

ছোট বৌ নৃপতির বৌ-কে কোনদিন দেখেছে, কোনদিন দেখেও নি। হাসপাতালে ব্যস্ত। সাদর-সশ্রদ্ধ অভ্যর্থনা কোথাও পায়নি। মনে হয়েছে ওখানে নিরাপদ অপাংক্তেয়। কথাটা ললিতাকেও বলতে পারেনি। বলেছে—ওরা আসতেই দিচ্ছিল না। তোমার কথাও বার বার শুধোচ্ছিল।

ললিতা শুধোয়—ভূপি, নুপু, বৌমারা কেমন আছে? কতদিন আসেনি।

নিরাপদ বলতে পারে না ললিতাকে যে ওরা বদলে গেছে, এবাড়ির আর কেউ নয়। নিরাপদকেও তারা স্বীকৃতি তেমন দেয় না। নিরাপদ বলে—সময় কই ওদের। ব্যস্ত লোক! —তবু মাকেও দেখতে মন চায় না ওদের?

এর জবাব দিতে পারে না নিরাপদ। ললিতাকেও তারা কোন স্বীকৃতি দেয়নি। আজ এসেছে ওরা তাকে নিয়ে যাবার জন্য। ভূপতি বলে—এতদিন মা ছিল, মা আজ নাই, আমাদের কিছু কর্তব্য করতে দিন। কিছুদিন আমার বাড়িতে কিছুদিন নৃপতির বাড়িতে পালা করে থাকবেন। শহরে থাকলে সেবা যত্ন হবে, ডাক্তারী ত হবে। আর আমরাও নিশ্চিন্তে থাকবো। এভাবে এখানে পড়ে থাকবেন? নিরাপদ চুপ করেই থাকে।

নৃপতি বলে—অনেক খেটেছেন। এবার বিশ্রাম নিন শহরে বসে।

এসব জমি জারাত ভাগে ভাগ দিয়ে দিন—ফসলের সময় এসে ভাগ নিয়ে যাবেন।

ভূপতি বলে—তাহলে কালা-ধলাকে, গরু-টরু বিক্রী করে দেন। আমরা সামনের রবিবার এসে নিয়ে যাবো আপনাকে। আমার ওখানেই প্রথম উঠবেন।

নিরাপদের মনটা কঠিন হয়ে ওঠে। তাদের কাছে নিরাপদ অচেনা মানুষ, তার এই মাঠ, ঘর—ওই ক্ষেতে, বুকের ঘাম-রক্ত মেশানো আছে। ললিতা মিশে আছে এই মাটিতে। রয়েছে তার যৌবন—কত

স্বপ্ন, স্মৃতি, এসব ছেড়ে এক হৃদয়হীন শহরে সে যেতে পারবে না।

নৃপতি বলে — বাবা আজ আমাদের ফিরতে হবে। জরুরী রুগী ফেলে এসেছি। এই রবিবার তাহলে গোছ গাছ করে রেখো। চলি আমরা —

নিরাপদ কোন জবাবই দিল না। ছেলেরা বাবাকে কোন প্রতিবাদ করতে না দেখে খুশী হয়। বাবা তাদের কথাই মেনে নিয়েছে বোধ হয়। নিরাপদও মনে মনে তার সিদ্ধান্ত ঠিক করে নিয়েছে। গাড়িটা লাল ধুলো উড়িয়ে মোরামের রাস্তা দিয়ে ইউক্যালিপটাস বনের ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেল।

তখন ছিল হলুদ সোনালী সবুজ শালবন। শালপাতা বিক্রী করেও দিন চালাতো অনেকে, এখন সেই শালবন কেটে বিদেশী ইউক্যালিপটাস গাছই লাগানো হয়েছে। সেই বনের ভিতর ওদের গাড়িটা হারিয়ে গেল।

নিরাপদ বাইরে আসে।

পড়ন্ত বেলা। দুদিন আগে জোর বৃষ্টি হয়ে গেছে। মাটিতে এসেছে বীজধান ফেলার সময়। চাষের প্রারম্ভিক পর্ব। ছেলেরা তাকে এই মাটি, ললিতার কাছ থেকে, তার নিজের জগৎ থেকে দূরে এক হৃদয়হীন, মাটির স্পর্শহারা পরিবেশে নিয়ে যেতে চায়, কালা-ধলার কাছে এসে দাঁড়ালো নিরাপদ। এতদিনের সঙ্গীদের, বিক্রী করে দিতে হবে কসাই-এর হাতে। নিজেকে সঁপে দিতে হবে এক বিজাতীয় পরিবেশে, থাকতে হবে ওদের দয়ার উপর নির্ভর করে।

নিরাপদকে দেখে গরুদুটো গলা বাড়িয়ে দেয়, শিং নাড়ে, ওদের ডাগর চোখে নীরব আকুতি। অবলা প্রাণীগুলোও বুঝেছে তাদের দিন শেষ হয়ে আসছে। নিরাপদের মনে হয় ছেলেদের কাছে তার আর ওই গরুগুলোর কোন স্পর্শই নেই। ওরা যেন তাদের করুণার পাত্র, তাই এসেছিল। নিরাপদকে করুণা করে তাদের কাছে আশ্রয় দিতে।

নিরাপদ আজও সবল, আজও সে কর্মক্ষম। ওদের করুণার পাত্র তারা নয় ছেলেদের কাছে। মনের অতলে একটা জোর খুঁজে পায় নিরাপদ। পেশীগুলো যেন আবার কঠিন হয়ে ওঠে। এই শক্তি তাকে অর্জন করতেই হবে।

মাটির উপরের রস মরে গেছে, নীচের মাটি এখনও সরস। নিরাপদ কালা-ধলাকে এনে বীজতলার মাঠে লাঙ্গলে জুড়েছে। লাঙলের বোটাটা টিপে ধরে হাক পাড়ে-চল।

চল ধলা!

কালা-ধলা এবার যেন করার মত কাজ পেয়েছে।

সরস মাটি লাঙ্গলের ফলায় উলটে উঠে আসে, সদ্যকর্ষিত মাটির বুক থেকে মিষ্টি বহুদিনের চেনা সোঁদা গন্ধ। নিরাপদ বুক ভরে সেই সুবাসিত বাতাস টেনে নেয়।

মসৃণ গতিতে চলছে কালা-ধলা।

নিরাপদ দেখছে বিস্তীর্ণ প্রান্তর, ধানসিড়ি ক্ষেত নেমে গেছে নীচের বাড়ির দিকে। পুকুরটায় জল রয়েছে। কালই বীজ ফেলবে, বর্ষার মুখেই কলকলিয়ে উঠবে বীজধান। ততদিনে একজোড়া বলদও কিনে নেবে।

এই সবুজ মাঠ—এই মাটি—এই বাড়ি—তুলসীমঞ্চ সর্বত্রই রয়েছে ললিতা। তাকে ছেড়ে, এই এতদিনের চেনা পৃথিবী ছাড়া সহরে করুণার পাত্র হয়ে যাবে না নিরাপদ।

এই জগতে প্রথম চোখ মেলেছিল এই জগতের মাঝেই শেষবারের মতো চোখ বন্ধ করবে সে।

নাহ? শক্তি তার এখনও আছে—বাঁচার লড়াই করার শক্তি। লাঙলের বোটা ধরে গরু দুটোকে নিয়ে মাটি চষছে নিরাপদ হেই তা-তা? ডাইনে রে ধলা। সাবাস্।

এ যেন সেই চিরযুবা নিরাপদই।

বিস্ফোরণ

কেয়া ভাবেনি যে তাকে এইভাবে বহরমপুর থেকে চলে যেতে হবে। অবশ্য মেয়েদের জীবনে এটাই স্বাভাবিক ঘটনা। এক সংসারে মানুষ হয়ে হাসি-কান্নায় দিন কাটিয়ে সব পালা চুকিয়ে তাকে অন্য আর এক সংসারে যেতে হয়। সেখানে হয় নতুন জীবনের পালা শুরু। সেইটাই হয় তার নিজের ঘর। যেন একটা গাছ এতদিন এক মাটিতে বেড়ে উঠেছিল। তারপর অন্য মাটিয়ে গিয়ে তাকে আবার নতুন করে ফুলে-ফুলে ভরে উঠতে হবে। তাই মেয়েরা এই বিয়ে নামক বন্ধনটাকে মেনে নিয়ে অন্য একজনের সঙ্গে আবার নতুন করে ঘর বাঁধে।

তাই এটা ছিল কেয়ার কাছে সহজ স্বাভাবিক। কিন্তু কেয়া এতে খুব খুশি হতে পারেনি। কারণ অবশ্য ছিল। ছেলেবেলাতেই কেয়ার বাবা-মা মারা যান। কেয়ার বাবা ভূপতিবাবু গ্রামের স্কুলের মাস্টার ছিলেন। কিছু জমি-জারাত ছিল। তার আয়পয়ও কিছু হতো। সেই সঙ্গে চাকরির মাইনে, টুইশনির কিছু টাকা মিলিয়ে ভূপতিবাবুর সংসার মোটামুটি চলে যেত।

সংসারে লোক মাত্র তিনজন—স্বামী, স্ত্রী আর কেয়া। কেয়া পড়াশোনাতেও খুব ভালো। প্রতি বৎসরেই ক্লাসে প্রথম হয়ে উঠতো। এছাড়া গানও শিখতো মন দিয়ে। তবু ভূপতিবাবু বলতেন—তুই পড়াশোনাটা মন দিয়ে কর। অধ্যাপনা করবি মা। যা মাথা তোর।

ভূপতিবাবু জীবনে স্বপ্ন দেখতেন তিনি এম. এ. করে পি. এইচ. ডি করবেন। অধ্যাপক হবেন। সেদিন তাঁর সংসারের অবস্থা ভালো ছিল না। বাবাও হঠাৎ মারা গেলেন, সংসারে টাকার দরকার। গ্র্যাজুয়েশন করার পর আর পড়াশোনা করতে পারেননি। গ্রামে এসে বসেছিলেন। দু'একটা টুইশানি করতেন। সেই সময় স্কুলের প্রধান শিক্ষকই তাঁকে স্কুলের শিক্ষকতার কাজে বহাল করেন। সেই থেকেই স্কুলে রয়েছেন ভূপতিবাবু। তাঁর নিজের জীবনের অপূর্ণ সাধটা তিনি তাঁর মেয়ের মধ্যে দিয়েই পূর্ণ করার স্বপ্ন দেখেন। তাঁর স্ত্রী বলেন, আর মাস্টারিতে কাজ নেই। নিজে যা করছো করো। স্কুলের পড়া শেষ হলে এবার একটা সুপাত্রের খোঁজ-খবর করে ওর বিয়ের ব্যবস্থা করো। মেয়েদের বেশি পড়ে কী হবে! ঘর-সংসার করুক।

ভূপতিবাবু বলেন, মায়ের আমার পড়াশোনায় কত মাথা তা তো জানো না।

কেয়া বাবা-মায়ের মধ্যে তার ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনার কথা শুনতো। নিজে অবশ্য বাবার মতটাকেই সমর্থন করে মনে মনে। এর মধ্যে তাদের স্কুলের বড় দিদিমণিকে দেখেছে, বিয়ে-থা করেননি। বিদুষী মহিলা। বেশ আছেন পড়াশোনা নিয়ে, কোনো বাধ্য-বাধ্যকতা নেই। নিজের পায়ে নিজে দাঁড়িয়েছেন।

কেয়ার মন চায় সে কোনো কলেজেই পড়াবে। গ্রামের অনেক বৌ-ঝিদের দেখেছে, স্বামী নামক একটা লোক যেন তাদের দখল করে রেখেছে। পরাধীন সেই জীবনকে মেনে নিতে পারে না কেয়া।

কেয়া এইসব ভাবনাগুলোকে এড়াবার জন্যেই যেন গান-পড়াশোনা নিয়ে থাকে। তার মনে হয়—তার ওই চাওয়াটাকে পূর্ণ করতে হলে তাকে তৈরি হতে হবে। সে যেন সেই জীবনের প্রস্তুতিই নিচ্ছে। এমনি দিনে কেয়ার বাবা ভূপতিবাবু তিন দিনের জ্বরে মারা গেলেন। ডাক্তার রোগটা ঠিক ধরতেও পারেনি। ফলে যা হবার তাই হলো।

ভূপতিবাবু মারা যাবার পর কেয়ার মা যেন একেবারে ভেঙে পড়েন। একা কী করবেন দিশা পান না। কেয়ার তখন ক্লাস টেন চলছে। এমনি দিনে শহর থেকে কেয়ার এক মামা এসে পড়লো।

নরহরিবাবু বহরমপুর কোর্টের কোনও উকিলের মুহুরি। বেশ চালু-পুরিয়া ওই নরহরিবাবু। ভূপতিবাবু থাকাকালীন মাঝে মাঝে আসতো বোনের কাছে। ভগ্নীপতিকে বলতো, ভূপতিদা, রিটায়ার করার পর গাঁয়ে না থেকে শহরে চলুন। ওখানে বাড়ি করে থাকবেন। কেয়াও কলেজে পড়তে পারবে। আর এই বানে ডোবা অজ গাঁয়ে পড়ে থেকে কী করবেন?

ভূপতিবাবু চুপ করে শুনতেন শালাবাবুর কথা। কেয়ার মা বলতেন, নরুর কথাটা শোনো। গাঁয়ে থেকে কী হবে। কেয়ার বিয়ে-থা দিয়ে শহরেই চলো।

ভূপতিবাবু স্ত্রীর মনের কথাটা জানতেন। কিন্তু নিজে উৎসাহিত হতেন না।

কেয়াও স্বপ্ন দেখতো তারা শহরে যাবে। সেখানে কলেজে পড়বে। শহরের জীবনে অনেক স্বাধীনতার স্বাদ রয়েছে। গ্রামে তা নেই।

এখানে বুঝে সমঝে চলতে হয়, বিশেষ করে তাদের মতো সদ্যযৌবনা মেয়েদের।

বাবা মারা যাবার পর এবার কেয়ার মা নরহরির কথাটা নতুন করে ভাবছেন। কেয়ারও আর এই গ্রামের জীবন ভালো লাগে না।

শহরে থাকলে সে সহজেই কলেজে পড়তে পারবে। গ্রামে থাকলে তাকে এই গ্রামেরই কোনও সাধারণ ছেলেকে বিয়ে করে হাঁড়ি ঠেলে আর কুচো-কাচাদের সামলে জীবনপাত করতে হবে। এটা ভাবতেই কেয়ার মন অজানা ভয়ে শিউরে ওঠে। না, ওই জীবনকে সে মেনে নিতে পারবে না কোনোমতেই। তাই কেয়াও বলে, শহরেই চলো মা। এখানে আর মন টিকছে না।

নরহরির হিসাবটা অন্যরকম। সে জানে ভূপতির বিষয়-আশয়ের খবর। এর মধ্যে নরহরি এখানের ব্যবসায়ী পালমশাই-এর সঙ্গেও কথা বলেছে। পালমশাই তার উকিলের মক্কেল। সেই সুবাদেই নরহরি তাকে চেনে। পালমশাই এদের বাড়ি-ঘর জমি-জায়গা সব পেলে ভালো দাম দেবে। অবশ্য নরহরিও মোটা টাকা পাবে কমিশন বাবদ। তার পরেও যা থাকবে তাতে কেয়াদের জন্য শহরের বাইরে একটা ছোট বাড়ি কিনেও কিছু টাকা ব্যাঙ্কে রাখা যাবে।

নরহরি বলে বোনকে, আর ক'টা বছর, কেয়া বি.এ পাশ করলেই ওকে একটা চাকরিতে ঢুকিয়ে দেব ডি. এম. সাহেবকে বলে। ব্যাস! আরামসে থাকবি মায়ে-বেটিতে।

কেয়াও স্বপ্ন দেখে কলেজে পড়বে। চাকরি করবে। কেয়া বলে, তাই চলো মা।

নরহরি অবশ্য পুরো বেইমানি করেনি। কমিশনের টাকাটাই নিয়েছিল। বাকি টাকাতে ওদের জন্য একখানা ছোট বাড়ি করে দিয়েছিল আর ব্যাঙ্কেও রেখেছিল বাকি টাকা।

কেয়া কলেজে পড়তে থাকে এবং রেজাল্টও খুব ভালো করে। অনার্স নিয়ে পড়ছে। এমনি দিনে কেয়ার মায়ের শরীরটা ভালো যাচ্ছে না। মাঝে মাঝে বুকে ব্যথা হয়। ডাক্তার বলেছেন, সাবধানে থাকতে। নিয়মিত ওষুধপত্র খেতে। ব্যাঙ্কের টাকাও ফুরিয়ে এসেছে। সংসার চলছে টেনে-টুনে। কেয়া এর মধ্যে দুটো টুইশানি ধরেছে।

এমনি দিনে কেয়া দেখেছিল কমলকে। তার এক ছাত্রীর দাদা। শহরে ওদের জামা-কাপড়ের বড় দোকান। একটা মোটরবাইকে চড়ে কমল যাতায়াত করে।

সেদিন কেয়ার রাত হয়ে গেছে পড়াতে পড়াতে। কেয়াদের বাড়িটা শহরের বাইরে। সেদিকটা এখনও নির্জন। আগে ছিল আমবাগান, এখন কিছু বসত হলেও গাছ-গাছালি রয়ে গেছে।

কেয়ার কেমন ভয় হয় ফিরতে। কমলই বলে, চলো, পৌঁছে দিই।

কেয়া ইতিউতি করে। কমলই বলে, ভয় নেই!

না-না চলুন!

কেয়া ওর মোটরবাইকের পিছনে বসে। ভয় করে যেন ছিটকে পড়ে যাবে। তাই আলতোভাবে জড়িয়ে ধরে কমলকে। কেয়ার সারা শরীরে এক বিচিত্র শিহরণ জাগে। বলিষ্ঠ একটি পুরুষের স্পর্শ সে জীবনে এই প্রথম পেয়েছে।

চলতে চলতে একটা গর্তে পড়ে বাইক লাফিয়ে ওঠে। বাঁচার তাগিদেই কেয়া যেন কমলকে আরও

বেশি আঁকড়ে ধরে। সারা দেহেমনে জাগে বিচিত্র একটা সাড়া। অনাস্বাদিতপূর্ব একটা অনুভূতি! একজনকে যেন একান্তে নির্ভর করে চলেছে সে।

এসে গেছি।

কমলের কথায় চমক ভাঙে কেয়ার। কেয়া বলে, ওই তো আমাদের বাড়ি।

কমল বলে, পথের যা অবস্থা! গাড়ি চালানোই দায়। চলি।

চলে যায় কমল। কেয়া এবার এদিক-ওদিকে চেয়ে দেখে। না—কেউ দেখেনি। মনে কি বিচিত্র সাড়া জাগে—বাড়ির দিকে এগিয়ে চলে সে।

কেয়ার মনে নতুন কী সুর বাজে। কমলকে তারপরও দেখেছে। প্রায়ই সন্ধ্যার পর ওকে বাড়িতে পৌঁছে দিতে আসে। পরে কমল ওদের বাড়িতেও আসে। কেয়ার মা ওকে চেনেন। বড়লোকের ছেলে। কিন্তু অহমিকা নেই এতটুকু। তার চাল-চলনেও তেমন কোনো প্রকাশ নেই। কত ভদ্র ছেলে।

কেয়ার মাও এবার যেন স্বপ্ন দেখতে শুরু করেন, ওই কমলকে নিয়ে। তিনি চান তাঁর মেয়ে সুখী হোক। সেদিন তিনি জিজ্ঞাসা করেন, কমল কেমন ছেলে রে?

কমলের চিন্তাটা কেয়ার নিজের মনের মধ্যেও বাসা বেঁধেছিল। এখন মাকেও এই নিয়ে কথা বলতে দেখে সলজ্জ কণ্ঠে বলে, বড়লোকের ছেলে।

মা বলেন, তোর জন্য বড় ভাবনা হয় রে। আমার শরীরের যা হাল।

সেই বিপদটাই ঘনিয়ে আসে কেয়ার জীবনে। মাও চলে গেলেন হঠাৎ। কমলই সৎকারের সব ব্যবস্থা করেছিল। অবশ্য ওর মামা নরহরি এখানে প্রায়ই আসে। এবার বোন মারা যেতে কেয়াকে বলে নরহরি, শোন কেয়া, তোর একা কিন্তু এই বাড়িতে থাকা ঠিক হবে না। তুই আমার ওখানে চল। আমিও নিশ্চিন্তে থাকব।

নরহরির বাড়িটা শহরের মধ্যে। কেয়া সেখানেই উঠে আসে। তখন বি. এ. পরীক্ষা দিচ্ছে সে। নরহরি আর তার স্ত্রী মালতীই এখন কেয়ার গার্জেন। নরহরির নিজের ছেলেমেয়েও আছে। কেয়াকে তাদের পড়াতে হয়। তাদের অনেক বায়নাও সামলাতে হয় কেয়াকে। তবু মামীমার গলার স্বর বাড়তে থাকে, একটা মেয়েকে বসিয়ে বসিয়ে খাওয়ানোর খরচ কত জানো?

কেয়া শোনে কথাটা। সে চেষ্টা করে যদি কোনো একটা কাজ পাওয়া যায়। কিন্তু এই সমাজে ভদ্র একটা কাজ পাওয়া এখন খুবই কঠিন। কোনো দলের তকমাও তার নেই। তবু কমল বলে, স্কুল বোর্ডে শিক্ষকতার জন্য দরখাস্ত দাও দেখি।

কেয়ার নিঃসঙ্গ কষ্টের জীবনে কমলই যেন একমাত্র সাথী। অন্ধকারে সে-ই যেন একটু আশার আলো।

কেয়ার ওপর কমলের এই মমতাকে বাঁকা চোখে দেখে মামীমা। সে এবার বলে নরহরিকে, ভাগ্নীকে বিদেয় করার চেষ্টা করো। নাহলে কোনদিন না বিপদ বাধায়। বাড়িতে আমার মেয়ে বড় হচ্ছে। এসব দেখে কি শিখবে সে।

কথাটা কেয়ারও কানে আসে।

নিরীহ মানুষ নরহরি। সে গিন্নীকে চটাতে পারে না। তাছাড়া সত্যিই কেয়ার বিয়ের বয়স হয়েছে। তাই কেয়ার জন্য ছেলের সন্ধান শুরু করে।

ফুড ডিপার্টমেন্টে কাজ করে সুনীল। কলকাতায় মেসে থাকে। চাকরি নিয়ে মফঃস্বল শহরে এসেছে। ডিপার্টমেন্টের বড়বাবু নরহরির খুবই পরিচিত সে। সে সুবাদেই নরহরি সুনীলকে ধরে এবং কলকাতাতে সুনীলের বাবা-মায়ের কাছে গিয়েও কিছু টাকা দেবার কথা বলে বিয়েতে তাদের মত করায়। সুনীলও বাবা-মায়ের কথামতো বিয়েতে রাজী হয়।

সব শুনে মামীমা বলে, বিয়ের খরচাপাতি তো কম নয়, তার যোগাড় হবে কী করে?

নরহরি বলে, দেখি, কীভাবে কী করা যায়। কেয়ার বাড়িটাই বিক্রি করতে হবে।

কেয়ার কাছে এই বাড়ির পরিবেশ ক্রমে যেন অসহ্য হয়ে উঠেছে। সে আপ্রাণ চেষ্টা করছে চাকরি

পাবার। স্বাধীনভাবে বাঁচতে চায় সে। কিন্তু কোথায় সেই মুক্তির পথ? চাকরির কোনো সন্ধানই পায় না। কমলও চেষ্টা করে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না।

ওদিকে মামীমাও উঠে পড়ে লেগেছে। কমলকে সে দেখতে পারে না। কারণ কমল কেয়ার ওই বাড়ি বিক্রিতে বাধা দিয়েছে।

মামীমা বলে, দেবে না? বিনা পয়সায় মজা করার মওকা কেন ছাড়বে? মেয়েটার সর্বনাশ করবে।

কেয়া সেদিন রাগে ফেটে পড়েছিল। সেই-ই বলে। মামাবাবু, বাড়ি আমি বিক্রি করবো।

নরহরি বলে, তাই কর মা। কলকাতায় যেতে পারবি। সুনীল প্রমোশন পেয়ে কলকাতাতেই যাবে। সুখে থাকবি।

সুখেই থাকবো! কেয়া মনে মনে বলে কথাটা। জীবনে সে যা চেয়েছিল কিছুই পায়নি। নিষ্ঠুর বিধাতা তাকে নিয়ে যেন নিদারুণ খেলা খেলে চলেছেন। কেয়া অসহায় পুতুল মাত্র। তাই ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে নিজেকে সে নিয়তির হাতেই তুলে দেয়।

কমলের বাড়িতেও অশান্তি শুরু হয়েছে এই নিয়ে। তার বাবাও কেয়াকে গৃহশিক্ষিকার কাজ থেকে বিদায় করেছেন। কমলেরও বিয়ের চেষ্টা চলছে। প্রতিবাদ করেছে কমল। তাই নিয়েই ওদের বাড়িতেও অশান্তির সূত্রপাত হয়েছে।

সব শুনেছে কেয়া। নিজেকেই তার দোষী মনে হয়। এই পরিস্থিতির জন্য সেই-ই দায়ী। তাই নিজেকে সরিয়ে নেবার জন্য সে সুনীলকেই বিয়ে করতে রাজী হয়। বাড়িটাও বিক্রি করে দেয়।

কেয়া এবার নতুন এক জগতে চলেছে। সেই চেনা শহর— তাদের বাড়ি— আজ সবকিছুই যেন তার জীবন থেকে হারিয়ে গেছে।

সুনীল বিয়ের পরই প্রোমোশন পেয়ে আবার কলকাতাতে ফিরে চলেছে। সেও খুশি।

কেয়া এখন সুনীলের জীবনের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়েছে। কমল তার বিয়েতে আসেনি। কেয়া জানে নিজের হাতেই সে ওই বাঁধনটাকে কেটেছে। সুনীলকে যখন দেখে সে—মনের অতলে কোথায় একটা হাহাকার জাগে। কী যেন তার হারিয়ে গেল। সুনীল কেয়ার জীবনের এই বেদনার কাহিনীটা জানে না। সে কেয়াকে পেতে চায় নিজের দাবি নিয়েই।

বহরমপুরের দিনগুলো কেয়ার জীবন থেকে হারিয়ে গেছে। সুনীলের সঙ্গে এসেছে কেয়া তার বাড়িতে। শ্যামবাজারের দিকে এক গলির মধ্যে সুনীলদের জীর্ণ বিশাল দো-মহলা বাড়ি। ওর ঠাকুরদার নামেই এই গলিটা। একদিন মিত্তির বাড়ির খুবই নামডাক ছিল। বনেদী পরিবার। তখন দোল-দুর্গোৎসব হতো, গৃহদেবতার নিত্য সেবা হতো।

সে সব বৈভবই চলে গেছে কয়েক পুরুষের ব্যবধানে। পড়ে আছে স্মৃতির বেদনা নিয়ে বিশাল দো-মহলা বাড়ি। পলেস্তারা খসছে, কড়িবরগাও জীর্ণ। নিচের তলাটা অন্ধকার। ওই বড় বাড়ির খাপে খোপে বহু শরিক এখন কোনোমতে মাথা গুঁজে রয়েছে। সব গেছে। তবুও তাদের বনেদিয়ানার অহংকার যায়নি।

সুনীলের বাবা রিটায়ার করেছেন। বাড়িতে তিন ছেলে আর মেয়ে। মা-ই সংসারের কর্ত্রী। কেয়া বিয়ের পর এই প্রথম আসছে। তাকে বরণ করে ঘরে তোলা হলো। কেয়া দেখে কলকাতার সেই বনেদী মহিলা সমাজকে।

তাকে সবাই যেন সন্ধানী দৃষ্টিতে দেখছে। কে বলে, এ বাড়ির বৌদের রং চাঁপাফুলের মতো। কর্তারা গায়ের রং দেখে বৌ ঘরে আনতেন। এ কি বৌ আনলে দিদি? গায়ের রংটা তেমন নয়।

কেয়া শোনে কথাটা। সুনীলের মা সাবিত্রী বলে, ছেলের পছন্দ। পাড়াগাঁয়ের মেয়ে।

সুনীলের বোন বলে, বৌদি অনার্স নিয়ে বি. এ পাশ করেছে।

মহিলারা ওতেও খুশি যে হয়নি তা তাদের মুখ দেখেই বোঝা যায়।

কেয়া নিজের ঘরে আসে। তাদের অংশে নিচের খান তিনেক ঘর পড়েছে। ওদিকে রান্নাঘর বাথরুম। কেয়া ঘরে ঢুকেই চমকে ওঠে। এ যেন জেলখানার ঘর। কোনোদিনই আলো ঢোকেনি।

বাতাসও আসে কোনোমতে ফাঁক-ফোঁকর দিয়ে। তাই দিনের বেলাতেও আলো জ্বালতে হয়। পাখা চালাতে হয়। তার উপর লোড-শেডিং তো আছেই।

কেয়ার মনে পড়ে বহরমপুরের তাদের খোলামেলা বাড়ির কথা। চাঁপার গন্ধে, আমের মুকুলের গন্ধে বাতাস আমোদিত হতো। ফুটতো বাতাবীলেবুর ফুল।

এখানে কোনো সুবাস নেই। আকাশও দেখা যায় না। সুনীল বলে, তোমার একটু অসুবিধা হবে। কিন্তু কী আর করা যাবে? নিজের বাড়ি।

কেয়া দেখেছে সুনীলকে। এখানেও দেখে তাকে। একেবারে বাপ-মায়ের বাধ্য সন্তান। সুনীলের বাবা অবশ্য নগদ এক লাখ টাকা নিয়েছিলেন নরহরির কাছ থেকে। তারপর কিছু গহনাও। অন্য সব জিনিসও। কেয়া সুনীলের কথায় বলে, এখানে থাকতে হবে? তোমার চাকরিতে তো কোয়ার্টার পাবার কথা।

সুনীল বলে, তার জন্য তো টাকা কাটবে। তারপর মা-ভাই-বোন-বাবা রয়েছেন—।

কেয়া বুঝেছে তার জন্য সুনীলের কোনো ভাবনাই নেই। তাকে এখানেই থাকতে হবে।

কেয়া এই বন্দী জীবনকে মেনে নিতে পারেনি। সকাল থেকেই তার কাজ শুরু হয়। বড় জা কলকাতার মেয়ে। সে কেয়াকে পেয়ে সব কাজ থেকে যেন হাত গুটিয়ে নেয়।

শাশুড়ি সাবিত্রীর বাতের ধাত। গায়ে পায়ে ব্যথা। তাই কাজও তেমন করতে পারে না। এতদিন বড় বৌমাই সংসারের কাজ করতো। এবার সে কেয়ার উপর কর্তৃত্ব ফলাতে চায়। শাশুড়িও কেয়াকেই ঠেলে দিতে চায় সংসারের কাজে। বলে, একটু কাজকর্ম করো বৌমা। পড়াশোনা করে মেয়েদের কী হয়? সেই তো হাঁড়ি ঠেলতেই হবে। মন দিয়ে সংসারধর্মই করো। সংসারের কাজই মেয়েদের কাছে বড়ো।

অর্থাৎ সবাই মিলে তারা কেয়াকে আদর্শ গৃহিণী সাজাবার প্রচেষ্টা চালায়। ভোর থেকে উঠে চা করা। তারপর হেঁসেলে ঢুকে জলখাবার। জলখাবার বলতে রুটি-তরকারি। ওদিকে সুনীল আর বড় দাদা অনিলের অফিসের ভাত। তারপর শাশুড়ির পরিচর্যা শুরু করতে হয়। ওদিকে শ্বশুরমশায়ের এর মধ্যে দু-একবার চায়ের ফরমাশও হয়। বড় বৌমা তখন আনাজ কুটতে ব্যস্ত। সে ওই নিয়েই থাকে। বাকি সব কিছু সামলাতে হয় কেয়াকে।

কেয়ার কাছে এই বন্দী জীবন অসহ্য হয়ে ওঠে। সে স্বপ্ন দেখেছিল সুনীল কলকাতায় তার পড়ার ব্যবস্থা করবে। তাই কেয়া সুনীলকে বলে, এইভাবে নিজেকে শেষ করতে পারবো না।

কেন? ঘর-সংসার তো সব মেয়েই করে।

সুনীলেব কথায় কেয়া বলে, এর নাম ঘর-সংসার করা? লেখাপড়া শিখে ঝি-গিরি করতে হবে?

সুনীলও বোঝে কেয়ার দুঃখটা। কিন্তু সে অসহায়। বলে সে, বাবা-মা রয়েছেন।

তাহলে বিয়ে করতে গেছলে কেন? স্ত্রীর কথা তুমি নিজে ভাববে না, ভাববেন তোমার বাবা-মা?

ওদের উত্তেজিত কথাগুলো শাশুড়ির কানে যায়। ঠারে ঠোরে শাশুড়ি শোনায়, আমাদের বাড়িতে মেয়ে-বউরা কেউ কোনোকালে সেজেগুজে পরপুরুষের সঙ্গে চাকরি করতে যায়নি। তারা ঘর-সংসারের কাজই করেছে। পতিসেবা করেছে।

কেয়া চুপ করে থাকে। বড় জা ওদিক থেকে বলে ওঠে, কই, আটা মাখা হলো? জলখাবার কখন হবে? কেয়া আজ বলে, ওটা তুমিই করো। আমার শরীর ভালো নেই বড়দি।

উঠে চলে যায় কেয়া। শাশুড়ি দেখে, আর তার জের পড়ে সুনীলের উপরই।

সন্ধ্যায় সুনীল বাড়ি ফিরতেই এবার রাগে ফেটে পড়ে সাবিত্রী। বলে সে, ওই ডানাকাটা পরী উড়ুক্কে মেয়েটাকে বিদেয় কর। নাহলে ওর ব্যবস্থা আমিই করবো।

কেয়া দিনভোর কিছুই খায়নি। শরীর খারাপ বলে শুয়ে আছে। সুনীল ঘরে ঢুকে চড়া সুরে বলে, এসব কী হচ্ছে? এ বাড়ির নিয়ম-কানুন মেনেই চলতে হবে। নাহলে—

কেয়া স্থির কণ্ঠে বলে, নাহলে?

সুনীলের নীল রক্ত এবার গর্জে ওঠে। বলে সে কঠিন স্বরে, এ বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হবে।

চলে যেতে হবে?

কেয়া চাইল। দেখছে সে সুনীলকে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে কোনো বন্ধন আছে সেটাও এই বনেদী বাড়ির মানুষরা যেন মানতে চায় না।

এদের পূর্বপুরুষ ঘরের বৌদের ফেলে রেখে রাতে মহফিল করতে যেতো বাঈজী বাড়িতে। স্ত্রীর চেয়ে রক্ষিতার সম্মান ছিল বেশি।

আজ সেই দিন বদলেছে। তবু এদের মেয়েদের দাসী করে রাখার অভ্যাসটা এখনও বদলায়নি। শুধু ধরনটা পাল্টেছে মাত্র।

কেয়া নতুন করে দেখছে সুনীলকে। এতবড় দুনিয়ায় তার যাবার কোনো ঠাঁই নেই। নিজের বাড়ি বিক্রি করে সে নিঃস্ব হয়ে এ বাড়িতে এসেছিল। আজ তার কাছে কোনো পথই খোলা নেই। তবু মন চায় বিদ্রোহ করতে। কিন্তু কোনো পথ তার সামনে নেই। সুনীলের কথাটা কানে বাজে। স্ত্রীর কোনো অধিকারই নেই! সে দাসী মাত্র!

বড় বৌ বলে, দু-পাতা ইংরেজী পড়ে মাথা বিগড়ে গেছে। আমরাও লেখাপড়া জানি। এত ডাঁট দেখাতে শিখিনি।

সাবিত্রী বলে, খেজুর গাছ তেলপানা হয়ে যাবে। কই গো নবাবনন্দিনী, রান্না হলো?

কেয়া ঘুপসি রান্নাঘরে রান্না করছে। ঘামছে, শুনছে ওদের কথা।

সেদিন দুপুরের স্তব্ধতা নেমেছে পাড়ায়। ছোট ননদ বাইরে থেকে এসে ডাকে কেয়াকে, তোমার একখানা চিঠি এনেছে পিওন। বললে, সই করে নিতে হবে।

কেয়া অবাক হয়, আমার চিঠি!

এখানে এসে ক'মাসেই সে বাইরের জীবনকে ভুলে গেছিল। এবার তার চমক ভাঙে।

দালানে আসে। এসময় এবাড়ির সবাই নিদ্রা দেয়। কেয়াই তাদের ডেকে বিকেলের চা দেয়। তাই কেয়ার এই চিঠিখানার খবর কেউ জানতেও পারে না।

খুব খুশি হয় কেয়া আজ চিঠিখানা পেয়ে। জেলায় স্কুল শিক্ষিকার জন্য দরখাস্ত দিয়েছিল বিয়ের আগে। সেই দরখাস্ত মঞ্জুর করা হয়েছে। কেয়া বহরমপুরের একটি মেয়েদের স্কুলে শিক্ষিকার চাকরি পেয়েছে। মেয়েদের হোস্টেলে থাকতেও পারবে।

কেয়াও মনস্থির করে ফেলেছে। সেই রাতেই সুনীলকে বলে, আমি চলে যাচ্ছি।

অবাক হয় সুনীল, কেন?

কেয়া বলে, এই বনেদী বাড়ির আইন-কানুন মেনে চলতে পারলাম না। এই জেলখানা, এই বন্ধন থেকে আমি মুক্তি চাই।

সুনীল দেখছে কেয়াকে। এ যেন অন্য একটি মেয়ে। আজ তার কণ্ঠস্বর বলিষ্ঠ, সতেজ। সে যেন নারীত্বের হারানো সম্মান ফিরে পেয়েছে।

সুনীল গর্জে ওঠে, গেলেই হলো! স্বামীর কথামতো চলতে হবে।

কেয়া আজ স্থির কণ্ঠে বলে, তুমি ডিভোর্সের দরখাস্ত করো। যা হয় অপবাদ দিও। আমি বাধা দেব না। কালই চলে যাবো আমি।

ওই শান্ত মেয়েটি যেন তাদের কল্পিত বনেদিয়ানার প্রাসাদে আজ একটা বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে।

জীবনের ঋণ

—কি গো! আমাকে ভুলেই গেলে দেখছি। কখন থেকে ডাকছি, শুনতেই পাওনা!

বসন্ত চমকে ওঠে ওই কণ্ঠস্বর শুনে। কমলার গলা। এ তার অতি পরিচিত স্বর, এর সঙ্গে ফুটে ওঠে চোখের সামনে কমলার সুন্দর পানপাতার মতো কোমল মুখ। দীর্ঘ টানা চোখ। ওর চোখের ঝিলিক যেন সারা মুখে হাসির আভা হয়ে ফুটে ওঠে।

বসন্ত ধড়ফড় করে বিছানায় উঠে বসে। কিন্তু না, কাউকে দেখতে পায় না। জানলার বাইরে থেকে একফালি ম্লান চাঁদের আলো এসে পড়েছে মেঝেতে। দামি আলমারি, পালঙ্ক সবই রয়েছে। কিন্তু কি আশ্চর্য কেউ তো নেই। তবু কমলার ওই কণ্ঠস্বর যেন বাতাসে ভাসে। বাতাসে ভেসে আসে ম্লান শিউলির সুবাস। সবই ছিল এমনি—কমলাও ছিল সেদিন, ঘরের লক্ষ্মী হয়ে। তারপর সব কেমন তছনছ হয়ে গেল, সব হারিয়ে গেল—কমলাও।

বসন্ত বিছানায় উঠে বসে—নিঝুম রাত্রি, শুনশান গ্রাম, বসন্তের ঘুম আর আসে না। সেই অতীতের ঘটনাগুলো এমনি নিঃসঙ্গ রাতে বার বার তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। সেই অতীতের দিনগুলোকে ভুলতে চায় বসন্ত, ভোলার চেষ্টাও করেছে নানা কাজের মধ্যে জড়িয়ে ফেলে নিজেকে। এখানে সে নতুন করেই বাঁচতে চায়। কিন্তু রাত নির্জনে তার অবচেতন মনের অতল থেকে কমলা যেন বার বার জেগে ওঠে ওই নীরব আকুতি নিয়ে। কমলা এখন কোথায় তা জানেনা বসন্ত, বেঁচে আছে কি নেই তাও জানা নেই।

তবু তার মনে আজও সজীব প্রাণময় হয়ে বেঁচে আছে কমলা। তার সব প্রীতি, ভালবাসা, মান-অভিমান, রাগ-অনুরাগ নিয়ে। তাই বসন্ত এখন সন্ধান করে কমলার, তার ঘর আজও শূন্য হয়ে আছে। নতুন ঘরে সে আনবে কমলাকে এই স্বপ্ন দেখে বসন্ত। সেই সঙ্গে মনে পড়ে হারানো সেই দিনগুলোর কথা। সময়ের অনেক মালিন্য পার হয়ে সেই অতীতের বর্ণময় মুহূর্তগুলো আজও বসন্তের চোখে ফুটে ওঠে।

পাড়ার নামী পরিবারের সন্তান বসন্ত ভট্টাচার্য। এককালে ওই অঞ্চলের জমিদার ছিল তার পূর্বপুরুষ। বিশাল চকমিলানো দু-মহলা বাড়ি, জমিজমা, বাগান-পুকুর, দুর্গামণ্ডপ সবই ছিল। দোল, দুর্গোৎসবে প্রচুর জনসমাগম হতো।

জমিদারির কিছু মহল নেই—তবু যা রয়েছে তাতে ঠাট-বাট বজায় রেখেই চলত তাদের সংসার, বসন্ত নিজেও ছিল করিৎকর্মা পুরুষ। জমিদারি রক্ত তার দেহে, তবু সে ছিল বুদ্ধিমান, কর্মঠ আর ব্যবসাও বুঝত। বসন্ত নিজেই গঞ্জে, ধান, চাল-এর আড়ৎ করে বেশ দু-পয়সা রোজগার করতে থাকে। তার ব্যবহারও ভালো, লেখাপড়াও শিখেছে। তখনকার দিনে বি. এ পাশ করেছিল। তাই আড়ৎ থেকে এবার নিজের বুদ্ধি আর পরিশ্রমে ধানকল চালু করে।

এ সময় তার বিয়ে হয় বাড়িতে। মানে বাবাই তার সব। আর এক পিসিমা ছিল তাদের সংসারের কর্ত্রী। বিধবা মহিলা দাদার সংসারের ভার নিয়ে মা-মরা বসন্তকে মানুষ করে। সেই তাগিদেই বাবা ছেলের বিয়ে দেন, কমলা আসে নববধূ হয়ে তাদের সংসারে। পাড়াপড়শি সকলেই অবাক হয়। বসন্তের এক দূর সম্পর্কের ঠাকুমা কমলাকে দেখে বলে,

—ওরে মালতী! এ যেন দেবী চক্ষুরে। এ দেবীর অংশ। ও বসন্ত! একে অমর্যাদা করিস না। এ সাক্ষাৎ কমলা।

দেবীর মতো রূপ। কমলাও ক'দিনে এই সংসারকে আপন করে নেয়। বসন্ত ধানকল করার জন্য অনেকদিন চেষ্টা করছিল। এবার তার পরিকল্পনাও কার্যে রূপ নেয়। বসন্তের বাবাও ভেবেছিলেন জমিদারি থাকবে না। বিশেষ করে যে প্রজারা এতদিন মুখ বুজে জমিদারের সব অত্যাচার, অন্যায় সহ্য করেছে, তারা একদিন শোষণের বিরুদ্ধে সরব হবেই। সেদিন তাদের শোষণ করা চলবে না। সবকিছুই চলে যাবে। তাই তিনি একটা মহল বিক্রি করে দেন ভালো দামেই। আর সেই টাকাতেই ধানকল গড়ে তোলে বসন্ত। বসন্ত কমলাকে বলে—তুমি সত্যিই আমার ঘরের লক্ষ্মী, তুমি আসার পর ধানকল হল, ব্যবসাতে দুটো পয়সার মুখ দেখছি।

কমলা বলে—সৎপথে থেকে খাটবে, দেখবে দিন ঠিকই চলে যাবে। বেশি লোভ কোরো না। আমাদের বেশি টাকার দরকার নেই।

বসন্ত দেখেছে কমলার অন্য মেয়েদের মতো বিলাস-ব্যসনের দিকে নজর নেই। গহনাও সে পরে না, প্রসাধনও সে করেনা। ঈশ্বরই তাকে এভাবে রূপবতী করে তুলেছিলেন যে, মানুষের তৈরি কোনও অলঙ্কার তার রূপকে বাড়াতে পারেনা। সামান্যতে সে অসামান্য রূপবতী আর সেবাপরায়ণাও।

এরমধ্যে সে সংসারের সব ভার নিয়েছে। শ্বশুরমশাইও খুশি। তিনি বলেন—আমার নিজের মেয়ে নেই, এবার মেয়ে পেয়েছি।

পিসিমা বলেন—কমলা। তুই দেখছি আমার গতরে বাত ধরিয়ে দিবিরে। আমাকে বসিয়ে রাখলে বাতেই ভুগতে হবে। একা তুই কত করবি।

কমলা সংসারের ভার ছাড়া দেবসেবার ভারও নিয়েছে। নিজেই মন্দির সাফ করে, দেবতার জন্য মালা গাঁথে। ভোগের ব্যবস্থা করে, পূজার ঘরে ওকেই মনে হয় যেন দেবী। লালপাড় সাধারণ শাড়িতে ওর দেবীরূপ যেন প্রকট হয়ে ওঠে।

বসন্ত সারাদিন ব্যবসা ধানকল নিয়ে ব্যস্ত থাকে। আগে গঞ্জে একটা ধানকল ছিল নাসির খাঁয়ের। পাঞ্জাবের দিক্কার এক পাঠান এদেশে এসে সরকারি টাকাতে ধানকল করেছিল। লোকটা খুবই দাম্ভিক আর চাষিদের কাছ থেকে ধান নিয়ে দামও ঠিকমতো দিত না। কেউ টাকার জন্য চাপ দিলে তাকে নানাভাবে বিব্রত করত। পুলিশও ছিল নাসির খাঁয়ের বংশবদ। তার এক আত্মীয় ছিল পুলিশের কর্তা। তাই নাসির খাঁ এখানে এতদিন অবাধে লুটপাট চালিয়েছে। এবার বসন্তের ধানকল তৈরি হতে স্থানীয় চাষিরা তাকেই ধান দেয়, ন্যায্য দামও ঠিকমত পায়। ফলে বসন্তের ধানকল লাভের মুখ দেখছে আর নাসির খাঁও এইবার বুঝেছে, ওই বসন্তই তার একনম্বর শত্রু। তার ব্যবসা চৌপাট করে দিয়েছে কাজের বসন্ত ভট্টাচার্য।

নাসির খাঁ-এর চর অনুচরও কিছু আছে। আর নাসির স্থানীয় কিছু লোককে টাকা দিয়ে আর ধর্মের জিগির তুলে হাতে এনেছে। এমনিতেই এখানে এখন ছোটখাটো ঝামেলা লেগেই থাকে। আর নাসির খাঁও চায় এই দাঙ্গা-লুঠপাটের ধারা অব্যাহত রাখতে, কারণ এসব করেই নিজেদের প্রতিষ্ঠা কায়েম করতে হবে এই পবিত্র দেশে। যে দেশকে তারা এসে শাসন করছে দূর পাকিস্তান থেকে।

নাসির খাঁ-এর কাছে বসন্তদের সব খবরই পৌঁছায়। আর নাসির খাঁও জেনেছে বসন্তের স্ত্রীর কথা। লোভী লোকটা তাই গোপনে গোপনে আবহাওয়া উত্তপ্ত করে তোলে, তারজন্য কিছু টাকা খরচও করে। নাসির খাঁ জানে কাজ হাসিল করতে পারলে তার হাতে আসবে ওই বসন্তের ধানকল ও আরও অনেক কিছু। ওদের বড় বাড়িটা পেলে নাসির খাঁ ওখানে জমিয়ে হাভেলী করতে পারবে।

সেদিন হাটে সামান্য একটা ব্যাপার নিয়ে ভরদুপুরে বেশ দাঙ্গা হয়ে গেল। নাসির খাঁ অবশ্য সেদিন সামনে আসেনি। তার লোকজনও নিমেষের মধ্যে হাটে বেশকিছু দোকানপাট লুট করে বেশ মোটা টাকা হাতিয়ে অনেক দোকানে আগুন লাগিয়ে দিল। ভয়ে ত্রস্ত জনতা পালায় যে যেদিকে পারে। আবহাওয়াও থমথমে। পুলিশ এসে বেশকিছু লোককে ধরে নিয়ে যায়। বসন্তও তখন আড়তে ছিল। তার গুদামও লুঠ হয়ে গেল। বাধা দিতে পারেনি ওই উন্মত্ত লোভী হিংস্র জনতাকে। তার আড়তেও আগুন ধরানো হল।

আরও আশ্চর্যের কথা পুলিশ এসে অন্যদের সাথে বসন্তকেও ধরে নিয়ে গেল থানায়। সারা এলাকায় একটা উত্তপ্ত আবহাওয়া। মাঝে মাঝেই এমন আঘাত, অত্যাচার আসে। অনেক হিন্দু পরিবারই এদেশ ছেড়ে চলে গেছে তবু বেশকিছু রয়ে গেছে। সাতপুরুষের ভিটে-জমি-জায়গার মায়ায় তারা অনিশ্চিতের পথে যেতে পারেনি। ভেবেছিল আবার আগেকার মতো সম্প্রীতি ফিরে আসবে। আবার শান্তিতে বাস করতে পারবে তারা।

কিন্তু একশ্রেণির মানুষ তা চায় না। নাসির খাঁয়ের মতো মানুষরাই এসব অশান্তি, অগ্নিকাণ্ড ও লুঠপাটের মূল। তারাই ওখানের ভালো মানুষদেরও বদলে দিয়েছে নিজেদের স্বার্থে। সারা এলাকায় যেন আতঙ্কের ছায়া নেমেছে। ওদিকে নাসির খাঁয়ের লোকজন রটিয়ে দেয় অন্য অঞ্চল থেকে দলবেঁধে মানুষজন আসছে হাটে আগুন লাগাবার প্রতিশোধ নিতে। তাই তারাও এবার বের হয়েছে উদ্ধত এই মুষ্টিমেয় কিছু মানুষকে শিক্ষা দিতে। আর তাদের লক্ষ্য ওই বসন্ত ভট্টাচার্য আর ক'জনের বাড়ি, তাদের গ্রাম। গ্রামকে তারা উজাড় করে দেবে।

রাতের অন্ধকারে ওপাশের আলোর মিছিল ধেয়ে আসে। ধেয়ে আসে লুটেরার দল। এবার আর রক্ষা নেই। রাতের অন্ধকারে ওই দস্যুর দল হানা দিতে আসছে। গ্রামের অসহায় মানুষ আজ বিপন্ন। বসন্তও পুলিশ হাজতে। সকালে ধরে নিয়ে গেছে বেশকিছু লোকজন, তরুণদেরও। এই সুযোগেই তারা চরম আঘাত হানতে চায়।

বোন আর বৌমাকে নিয়ে বসন্তের বাবা ওই রাতেই বের হয়ে পড়েন। সঙ্গে গ্রামের কিছু মানুষ। কিন্তু পথেই হানা দেয় দস্যুর দল। ওদের আক্রমণে যে যেদিকে পারে পালাবার চেষ্টা করে। পিসিমা, মালতী, ও কমলাকে নিয়ে পালাবার চেষ্টা করে। ওদিকে দস্যুর দল পুরুষদের অনেককেই তখন আক্রমণ করেছে। মেয়েদেরও ঘিরে ফেলার চেষ্টা করে। বাইরে ঘন ঝোপ, কচু বন, বেতবন। ওই অন্ধকারেই এখন অসহায় বিপন্ন নারী, পুরুষ বাঁচার জন্য ওই বনে ঢুকে পড়ে। তাদের অনেকেই ওই দস্যুদের দা-কুড়ুলের আঘাতে লুটিয়ে পড়ে। জ্বলতে থাকে পিছনে ফেলে আসা গ্রাম। রাতের বাতাস অসহায় আর্ত মানুষের আর্তনাদে ভরে ওঠে।

বসন্ত হাজত থেকে ছাড়া পেল তিনদিন পরে। এর মধ্যে হাজতে বসেই নানা খবর শুনেছে। এবার ছাড়া পেয়ে ছুটে আসে। গ্রামে গ্রামে এখন শ্মশানের নীরবতা। পুলিশ টহল দিচ্ছে। চারিদিকে পোড়া ঘরবাড়ির ধ্বংসস্তূপ, এখানে ওখানে পড়ে আছে মৃতদেহ। বসন্তের বাবাকেও তারা শেষ করেছে। বাড়িতেও আর কিছু নেই। দরজা-জানালাও ভাঙা। আর ধানকল এখন নাসিরের দখলে। পিসিমা, কমলাকে খুঁজে পায়না। কে বলে,

—আশ্রয় শিবিরে অনেকে রয়েছে। সেখানেও থাকতে পারে তারা। বসন্ত শহরের দু-তিনটে আশ্রয় শিবির ঘুরে একটাতে পিসিকে পায়। ছিন্ন মলিন বেশ। পিসিমা বসন্তকে দেখে আর্তনাদ করে ওঠে।—ওরে বসন্ত, সব আমাদের হারিয়ে গেল; তোর বাবা, বৌমা—

বসন্ত বলে—বাবাকে ওরা মেরে ফেলেছে পিসি। কিন্তু কমলা তার খোঁজ তো নাই।

ওদিকে হাওয়া আরও গরম হয়ে উঠেছে। গ্রামের আর কিছু নেই, বাবাও নেই। কমলা কোথায় তাও জানেনা। এখানে ওখানে খুঁজেও পায় না। কমলার বাবা আগেই দেশ ছেড়েছেন। এবার বসন্তদেরও সব হারিয়ে শূন্য হাতেই দেশ ছাড়তে হবে।

ক'দিন হেঁটে, নৌকায় কোনওমতে এসে একরাতে বাঁশবন জঙ্গলের পায়ে-চলা পথ ধরে বসন্ত পিসিমাকে নিয়ে এদেশে এসেছিল। সে আজ অনেকদিন আগেকার কথা। কমলাকে খুঁজেছে পথে-ঘাটে, নানা রিফিউজি ক্যাম্পে। কিন্তু কোথাও তার খবর পায়নি।

আজও সেই কমলাকে খুঁজছে বসন্ত দীর্ঘ সংগ্রামের মাঝেও। রাত কত জানে না। ঘড়িতে ঢং ঢং করে দুটো বাজতে বসন্তের হুঁশ ফেরে। বিছানাটা শূন্য, বসন্ত ঘুমোবার চেষ্টা করে। সকাল থেকেই তার অনেক কাজ। দেশ-ঘরবাড়ি ছেড়ে এখানে এসে এখন বসন্ত পায়ের তলে মাটি পেয়েছে অনেক

লড়াই করে। নবনগর কলোনির বয়স প্রায় পনেরো বছর। ওই সময় এটা ছিল শালবন সীমার বাইরে বিশাল প্রান্তর। কঠিন মাটিতেও ঘাস হয় না। বৈশাখের খররৌদ্রে কালো লেলিহান শিখায়, জমি যাতে ফসল হয়, সেসব জমি আরও অনেক নিচের দিকে। ওদিকে শুরু হয়েছে শালবন। একটা পাহাড়ি নদীর স্রোত বয়ে এসেছে এই প্রান্তরের গা বেয়ে। বছরের অন্য সময় এটা একটা বালির রেখাপথ হয়ে পড়ে থাকে। বর্ষার সময় ওর বুকে নামে গেরুয়া ঢল। তখন লালচে ঘোলা বেনো জলে বয়ে যায় কোমরভ'র। জল ওইটুকু হলে কি হবে স্রোতের বেগে পারাপার হওয়া কঠিন।

বসন্ত তাদের ওই এলাকার বেশকিছু সর্বহারা মানুষদের নিয়ে এসে এখানেই বসতি করে। সেদিন অবশ্য সরকার তাদের মতো ছিন্নমূলদের জন্য কিছু সাহায্যের হাত বাড়িয়েছিলেন। বসন্তই নিজে উদ্যোগ নিয়ে কর্তাদের সঙ্গে দেখা করে ওই বিস্তীর্ণ রুক্ষ প্রান্তরে বাস করার অনুমতি আদায় করেছিল। আর প্রথমেই সরকারি খরচাতে ওই নদীর উপর একটা বাঁধ দিয়ে একটা বিশাল জলাশয়ও করা হয়েছিল; ওই পাহাড়ি নদীর জলকে ওখানে বেঁধে তার থেকে দুদিকে ছোট ক্যানেল করে এই অঞ্চলে জলসেচের ব্যবস্থা করতে এবার এদের পরিশ্রমে সেই রুক্ষমাটিও সবুজ সরস হয়ে ওঠে।

এদিকে বিস্তীর্ণ এলাকায় গড়ে ওঠে এদের ঘরবাড়ি, ইস্কুল। অন্যদিকে ওই রুক্ষমাটিতে এরা জল পেয়ে নানা ফসল ফলাতে থাকে। সারা এলাকায় মানুষের সামনে বসন্ত ভটচায যেন আশার আলো এনেছে। এনেছে বাঁচার আশ্বাস। বসন্ত এখানেও আড়ত করেছে আর সরকারি ঋণ নিয়ে ওই প্রান্তরের বুকে ধানকলও গড়েছে। তার মনের অতলে সেই স্বপ্নই জাগে বারবার। কমলার স্বপ্ন। তার অতীতের হারানো সমৃদ্ধিকে সে ফিরিয়ে আনবে, ফিরিয়ে আনবে কমলাকেও। তার দৃঢ় বিশ্বাস কমলা একদিন ফিরে আসবে তার ঘরে, তার আসার জন্যই বসন্ত আবার নতুন করে ঘর গড়েছে।

কমলার সেই কথাগুলো বসন্ত আজও ভোলেনি। কমলা বলত—নিজের জন্য যেটুকু দরকার মাত্র, সেটুকুতেই তোমার অধিকার। বাকি যা পাবে মানুষের সেবায় দিও, দেখবে জীবনে তুমি ঠকবে না।

বসন্ত সেই কথাটা আজও মনে রেখেছে। সে এই কলোনির বিশাল কর্মমঞ্চে প্রথম থেকেই নিজেকে নিয়োজিত করেছিল। লাখ লাখ টাকা দিয়ে বাঁধ তৈরি হয়েছে। তারই তদারকিতে গড়ে উঠেছে স্কুল। ওদিকে ছোট হাসপাতাল। আজ বসন্ত কয়েকজন সঙ্গীকে নিয়ে এই প্রান্তরের রূপ বদলে একটি আদর্শ নগরীতে পরিণত করেছে। গড়ে উঠেছে ধানকল—আরও অনেক ছোটখাটো শিল্প উদ্যোগও গড়েছে।

কাগজওয়ালারাও আসে বসন্তের সঙ্গে কথা বলতে। সরকারি আমলাও আসেন। সারা এলাকার মানুষ এক ডাকে বসন্তকে চেনে, মানুষের বন্ধু বলে।

তাই এখানের মানুষও চায় এবার ভোটে তারা বসন্তকেই তাদের প্রতিনিধি নির্বাচিত করবে।

এদিকে পিসিমার বয়স হচ্ছে। মালতী দেখেছিল তাদের আগেকার অবস্থা। তারপর সব হারিয়ে পথে পথে ঘুরেছে, এক ক্যাম্প থেকে আর এক ক্যাম্পে দিনযাপন করেছে সরকারি ত্রাণ নিয়ে। আজ আবার দিন বদলেছে। বসন্ত দিনরাত পরিশ্রম করে আবার ব্যবসা চালু করেছে। নিজেদের একটা আশ্রয় গড়েছে। কিন্তু সেই ঘর শূন্যই রয়ে গেছে। পিসিমা বলেন—বসন্ত এবার বিয়ে-থা কর বাবা। আমারও বয়স হচ্ছে। ঘর সংসার তো দেখতে হবে।

—বিয়ে! বসন্ত কথাটা ভাবেনি এতদিন। কাজের মধ্যেই রয়ে গেছে সে। তাছাড়া তার চিন্তনে-মননে আজও কমলাই ধরা রয়েছে। তাছাড়া তার মনজুড়ে রয়েছে শুধু কমলা।

পিসিমাও সেটা জানে, তাই বলে

—যার পথ চেয়ে আছিস সে আর নেই রে। থাকলে নিশ্চয়ই তার খবর পেতিস। যে নেই তার জন্য ভেবে ভেবে নিজেকে আর ঠকাস না। বিয়ে-থা করে ঘর-সংসার কর।

বসন্ত বলে, পিসিমা বয়স তো হল।

—কি আর বয়স তোর। এখনও জীবনের অনেক পথ বাকি। একা একা সে পথ চলা যায় না রে। তুই অমত করিস না, মেয়ে আমি দেখছি। তুইও চিনিস।

—কে?

—কেন মানসী। স্কুলের চাকরিটা তাকে তুই তো করে দিয়েছিস। ভালো মেয়ে, ভালো ঘরও।

বসন্ত অবাক হয়। মানসীকে সে চেনে। এই কলোনির মেয়ে। শান্ত, শিক্ষিতা।

বসন্ত বলে—একটু ভেবে দেখতে দাও পিসিমা।

পিসিমা বলে—কমলাকে ভুলে যা বসন্ত। যে নেই তার কথা ভেবে লাভ কি!

বসন্ত তবু মন থেকে কমলাকে মুছে ফেলতে পারে না। জীবনে প্রেম একবারই আসে। একটি কমলদল তিল তিল করে জলাশয়ের অতল থেকে মাটির প্রাণরস আহরণ করে নিজেকে পরিপূর্ণ করে সূর্যের আলোয় চোখ মেলে নিজেকে তুলে ধরে। তারপর আবার তা ঝরে যায়। রিক্ত হয় তার বর্ণচ্ছটা। প্রেমও তেমনি, একবারই আসে। একজনকে ঘিরে। তাই কমলাকে ভুলতে পারেনি বসন্ত। আর কাউকে সেখানে প্রতিষ্ঠিত করতে তাই মন সায় দেয় না। এতদিন এতকাল ধরে তাকেই খুঁজেছে। তার জন্য প্রতীক্ষা করেছে। সেদিন ওরই এক বন্ধু বলে,

—কল্যাণেশ্বরী মন্দিরের ওদিকে পাহাড়তলিতে বিরাট একটা মন্দির, আশ্রম, সেবাকেন্দ্র গড়ে উঠেছে। এক দেবীই সেখানে আছেন। কোনও বিখ্যাত সাধকের মেয়ে। তিনি ভূত-ভবিষ্যৎ সব বলে দিতে পারেন।

বসন্ত কর্মযোগী মানুষ, নিজের ভাগ্যই শুধু নয়—বহুজনের ভাগ্যকে সে গড়েছে তার কর্মপ্রতিভা দিয়ে। সে কাজে বিশ্বাসী, তাই বলে—তিনি কি করবেন!

বন্ধু বলে—তার কাছে জানা যেতে পারে তোর হারানো কমলা বেঁচে আছে কি নেই। বেঁচে থাকলে তিনি নিশ্চয়ই তার খবরও দিতে পারবেন। ওরে আমি নিজে ফল পেয়েছি। বহুজন পেয়েছে তাদের হারানো আত্মীয়ের সন্ধান। চল না একবার।

বসন্ত বলে—ওসবে আমার বিশ্বাস নেই।

হঠাৎ সেবার ওদের কলোনিতে পানীয় জলের লাইন আনার জন্য ওই দিকেই সেই ওয়াটার ওয়ার্কস-এর কর্তাদের সঙ্গে দেখা করতে যেতে হয়েছে বসন্তকে। তাদের অনুমতি পেলে তারা কলোনিতে পাইপ লাইন পাবে। ওটার খুবই দরকার।

বসন্ত গেছে কল্যাণেশ্বরী ওয়াটার সাপ্লাই কোম্পানির অফিসে। ওখানের গেস্ট হাউসেই উঠেছে। সুন্দর পরিবেশ, ওদিকে প্রাচীন মন্দির বড় গাছগাছালিতে ঢাকা। নিচে একটা পাহাড়ি নদীতে তিরতির করে বয়ে চলেছে জলধারা। নদীর ব্রিজ পার হয়ে বেশ কিছুটা প্রান্তর তারপরই মাথা তুলেছে পাহাড়গুলো। গাছগাছালিতে ঢাকা পাহাড়। সুন্দর শান্ত প্রকৃতি। ওদিকে দেখা যায় বড় হাসপাতাল। গরিব, সাধারণ বহু মানুষ ওখানে বিনামূল্যে চিকিৎসা, ওষুধ পায়। ইনডোরেও রোগী অনেক। সুন্দর ঝকঝকে পরিবেশ।

ওদিকে অন্নসত্র। এলাকার গরিব অসহায় বহু শিশু, মেয়ে, বৃদ্ধ সেখানে পায় অন্ন-আশ্রয়। নদীর ধারে সবুজ পরিবেশ পাহাড়ের গায়ে সুন্দর মন্দির। দেশসেবাই নয়, হাজারো মানুষের সেবাই এদের ব্রত। এই সেই বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর আশ্রম। এখন তিনি বৃদ্ধ হয়েছেন। দেবী মা-ই এই সেবাব্রত সেবাকেন্দ্র চালান। হাজারো মানুষের ভিড় জমে থাকে সারাদিন। দেবী মা-ই তাদের নিয়ে ব্যস্ত।

বসন্ত দূর থেকেই দেখে ওই লোক সমাগম। বহু মানুষ ব্যাকুল আর্তি নিয়ে চলেছে, অনেকে ফিরছে কি এক প্রসন্নতা নিয়ে দেবী মায়ের দর্শন হয়েছে তাদের। পেয়েছে তাঁর সেবা-সাহায্য-আশ্বাস। হাজারও মানুষ ফিরছে সেই অনাবিল তৃপ্তি নিয়ে।

বসন্তের ব্যাকুল মনও ছুটে যেতে চায় সেখানে। তার অবিশ্বাসী মনও আজ এদের মুখে-চোখে তৃপ্তির স্পর্শ দেখে যেন আশান্বিত হয়ে ওঠে।

বিকেলের দিকে অধিকাংশ যাত্রীই ফিরে যায় যে যার ঘরে। বাস, ট্যাক্সি, ট্রেকারের ভিড় কমে। জায়গাটা তখন যেন আরও মহিমাময় হয়ে ওঠে। দিনের আলো মুছে যায় পাহাড়-বনের বুক থেকে। বাতাসে নদীর কলরব মুখর হয়ে ওঠে। দোকানে খদ্দেরের ভিড় নেই। ওদিকে মন্দিরে তখন আরতির

শঙ্খ বেজে ওঠে। দেবী মা এই সন্ধ্যায় নিজে আরতি করেন।

বসন্ত পায়ে পায়ে এগিয়ে যায় সেই চত্বরে। অতিথিশালা, বারান্দা ছাড়িয়ে মন্দিরের দিকে। নাটমন্দিরে কিছু ভক্ত তখনও রয়েছে। মন্দিরে আরতি শেষ হয়ে আসছে। তারপর দেবী মা ভক্তদের দর্শন দেবেন। তাই অনেকেই প্রতীক্ষা করছে।

পঞ্চপ্রদীপের শিখা হাতে দেবী মা আরতি করছেন। তার সুন্দরপ্রসন্নতাভরা পবিত্র মুখে সেই আলোর আভা, তন্ময় হয়ে তিনি আরতি করছেন মূর্তির।

চমকে ওঠে বসন্ত। তার চোখের সামনে ফুটে ওঠে অতীতের সেই হারানো কমলার সুন্দর সৌম্য পবিত্র মুখ। মুদ্রিত সেই দেবীনেত্র। তারপর চিনতে ভুল হয় না। এ কমলাই, যাকে সে এতদিন ধরে খুঁজেছে জীবনের পথে পথে। সেই লাঞ্ছিতা কমলাই জীবনের বহু কষ্ট-কাঠিন্যের পথ পার হয়ে নিজের জীবনকে ত্যাগ, সেবার মাধ্যমে নতুন করে গড়ে তুলেছে। সাধারণ নারী থেকে আজ দেবীতে পরিণত হয়ে বহুজনকে মাতৃস্নেহে সেবা করে চলেছে। তাদের বরাভয়দাত্রী হয়েছে। মাতৃত্বের আসনে মমতাময়ীর আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিটি মানুষেরই জীবনের কাছে কিছু ঋণ থাকে। কেউ সেই ঋণ শোধ করে ফিরে যায় পৃথিবী থেকে। কেউ আরও অনেক লুটে নিয়ে আরও ঋণভার নিয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়। কমলা এই জীবনের সাধনা দিয়ে ঋণমুক্ত হবার পথেই এগিয়েছে। এই বিশ্ব মাতৃত্বের আসন থেকে তাকে ঘরের ছোট গণ্ডিতে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার কোনও অধিকার বসন্তের নেই।

আরতি শেষ হচ্ছে, শঙ্খ-ঘণ্টা বাজছে, সেই সুরধ্বনি প্রতিধ্বনিত হচ্ছে পাহাড়ে পাহাড়ে। তারায় ভরা আকাশ, ফিরে আসছে বসন্ত। আজ সে তৃপ্ত, তার মনেও অনাবিল তৃপ্তির আশ্বাস। কমলা বেঁচে আছে, সগৌরবে বেঁচে আছে। ঈশ্বর তাকে অনেক দিয়েছেন।

বসন্ত ফিরে আসে কাজ শেষ করে। কলোনিতে এবার ওয়াটার লাইন বসবে। হাসপাতালের আরও এক্সটেনশন হবে। তার সামনে নানা কাজ।

পিসিমা বলেন— কি রে! তাহলে মানসীর বাবাকে বলি, বিয়ের দিনক্ষণ ঠিক করুক।

বসন্ত বলে—পিসিমা, এতদিন এইভাবেই কাটল, আর এই বয়সে সংসারে জড়ানোর কি দরকার।

পিসিমা অবাক হন। সেকি রে!

বসন্ত বলে—পিসিমা, এই পৃথিবীতে ঈশ্বর মানুষ জন্ম দিয়েছেন। তারজন্য অশেষ ঋণ, জীবনের সেই ঋণভার কিছুটা শোধ করে দিয়ে যেতে হবে তো। সেই কাজটাই করতে দাও। নিজেকে নিয়ে তো সংসার নয়—তার বাইরেও করার অনেক কিছু আছে। পিসিমা এক নতুন বসন্তকে দেখছেন—আজ যেন ও অনেক কিছু পেয়েছে যার সন্ধান পিসিমাও জানেনা।

যোগফল-শূন্য

শশধরবাবু অপিস থেকে যখন বের হলো তখন সন্ধ্যা পার হয়ে গেছে, ডালহৌসীর ভিড় আর তত নেই, লোকজন অনেকেই দিনভোর এখানে বাঁচার রসদ সংগ্রহের লড়াই করে এবার যে যার ঘরে ফিরে গেছে। দিনের বেশীর ভাগ সময়ই এই জায়গা কর্মব্যস্ত থাকে।

দশটা থেকে শুরু হয় অপিস যাত্রীদের ভিড়। হাওড়া-শিয়ালদহ থেকে বাবুদের শোভাযাত্রা শুরু হয়। দূর-দূরান্তের গ্রাম-শহর থেকে লাখ-লাখ মানুষ আসে ট্রেনে।

ট্রেনগুলো প্ল্যাটফর্মে দাঁড়াতে মুখ খোলা আলুর বস্তার মত লোকজনের দলও প্ল্যাটফর্মে ছিটকে পড়ে। তারপর শুরু হয় চলমান জনস্রোত।

অপিস শুরু হবার পর এবার আসে সারা এলাকা থেকে রকমারি হকার, খাবার, চা-ওয়ালাদের, ফলওয়ালাদের ভিড়। সারা অপিস পাড়ায় যেন মাহেশের রথের মেলা বসে। নিত্যদিন।

কৃষ্ণনগরের সরভাজা, সরপুরিয়া, রানাঘাটের পান্তুয়া, বর্ধমানের সীতাভোগ, মিহিদানা, জয়নগরের মোয়া, মায় মোল্লাচকের দই অবধি মিলবে এখানে।

আর বারুইপুরের লিচু, বসিহাটের হিমসাগর, 'আম-জনাই' এর মনোহরাও মিলবে, খাদ্য বানাত চাউমিন, কচুরী, টোষ্ট-ফুচকা কি নাই?

দিনভোর কলরব বিকিকনি চলে, অফিসের বাবুদের জন্য রাস্তায় জলযোগের সব ব্যবস্থাই আছে এখানে।

শশধর আগেও দেখেছে ডালহৌসীর অবস্থা। তখন ডালহৌসীর বাগানও ছিল সাজানো। ফুলগাছও ছিল পথে এত ভিড়ও ছিল না।

কিছু কালমুখো সার্জেন্ট ঘুরতো মোটরবাইকে করে। শান্ত পরিবেশ ছিল। দুপুরে ডালহৌসীর গাছের ছায়ায় রামচরিত মানস পাঠও হতো। সাহেবী অফিসের দারোয়ানরা কপালে ফোঁটা কেটে অবসর সময়ে সবুজ ঘাসে বসে সেই পাঠ শুনে জয়ধ্বনি দিত জয় সীয়াবর রামচন্দ্র কি জয়।

প্রনামীর থালায় প্রণামীও পড়তো।

সেই ডালহৌসীর পরিবেশে সবুজ ছোঁয়া আর নেই। এখন রুক্ষতায় ভরা একটা বিশৃঙ্খল জনসমুদ্র আর গাড়ির জঙ্গল।

মানুষ যত বেড়েছে—গাড়িও বেড়েছে তত। সবুজ ধ্বংস হয়েছে। মানুষের হাহাকার বেড়েছে। তাই মানুষ জীবিকার সন্ধানে নানা রূপে সমবেত হয় এখানে।

দিনশেষে আবার উধাও হয়। পড়ে থাকে শূন্য ডালহৌসী এখনকার বিবাদী বাগ।

শশধরবাবুর মনে পড়ে চাকরীতে আসার সেই প্রথম দিনগুলো।

তখন সবে ইংরাজ যেন যাবো যাবো করছে এদেশ থেকে। সেই সময় চাকরীতে ঢুকেছিল শশধর। গ্রাম-সম্পর্কের এক কাকা ছিলেন ওই কোম্পানীর বড়বাবু। বেঁটে গোলগাল চেহারা।

সার্টটার শেষ প্রান্ত থাকত কাপড়ের নীচে। কাপড়টা পরতেন মালকোঁচা দিয়ে। তার উপর কোট। বারোমাসই কোট পরতেন। পায় চকচকে জুতো। সাহেবদের সামনে ফিটফাট থাকতে হতো। বড়বাবুদের পদমর্য্যাদাও কিছু ছিল তখন।

সাহেবদের তোষামোদ করে মন যুগিয়ে চলতেন, তারা আর বড়বাবুদের মন যোগাতো তামাম কেরানীকুল, কেরানী মহলে বড়বাবুই ছিলেন সর্বময় কর্তা।

এ হেন বড়বাবুই শশধরকে নিয়ে সি রায় সাহেবের খাশকামরায়, হেঁট হয়ে প্রণাম করে, শশধরও

প্রণাম করে। বড়বাবু বলেন—মাই নেফিউ স্যার, নো ফাদার, মাদার। ইউ আর নাও ফাদার মাদার স্যার। গিভ হিম এ নোকরী। হি ইজ বি-এ-পাস স্যার। সাহেব একবার নীল চোখ মেলে শশধরকে আপাদ-মস্তক জরীপ করে বলে—নোকরী খালি থাকিলে দিতে পারো।

ব্যস, চাকরী হয়ে গেল শশধরের এক কথায়।

সেদিনগুলো ছিল বেশ শান্তির। চাকরীর জন্য আজকের মত এত হাহাকারও ছিল না। এত ভিড়ও ছিল না।

ছিল না কোন পার্টি কোন দলের দাদাদের দাপট।

সেই চাকরী করতে করতে তিরিশটা বছর কোন্ দিকে পার হয়ে গেছে তা জানতেও পারেনি শশধর।

এর মধ্যে গঙ্গার বুক দিয়ে অনেক জল বয়ে গেছে। বাংলার উপরও অনেক ঝড়-ঝাপ্টা এসেছে। যুদ্ধ মন্বন্তর রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা, তারপর দেশ বিভাগ।

শশধরের জীবনের উপরও কম ধকল যায়নি। চাকরীর কয়েক বৎসর পর বিয়েও করেছিল শশধর। তখন খুলনা জেলা ছিল কলকাতার কাছেই। শিয়ালদহ থেকে ছাড়তো খুলনা মেল।

শনিবার বৈকালে শশধর অফিস সেরে নিয়ে শিয়ালদহে উঠতো কয়েক ঘণ্টার রাস্তা। বারাসাত পার হলেই লাইনের দুধারে সুরু হতো বন বাদাড়, বেতবন।

মাঝে মাঝে দু'একটা নিরিবিলি ছোট ষ্টেশনে লোকালয় তেমন নেই। ফাঁকা মাঠ, দু'চার ঘর বসতি নিয়ে গ্রাম-আবার মাঠ। বনগাঁ ছিল যশোর জেলার মহকুমা শহর। বনগাঁ হয়ে যশোর তার কয়েকটা ষ্টেশন পরই শশধরের ষ্টেশন। সন্ধ্যার পরই বাড়ি পৌঁছাতো।

বাড়িতে অধীর আগ্রহে পথ চেয়ে থাকতো শশধরের স্ত্রী। স্বামীকে দেখে এগিয়ে আসতো।

—এত দেরী।

ষ্টেশন থেকে মাইল দুয়েক ধান মাঠ পার হয়ে সবুজ ছায়াঘন তাদের গ্রাম কেশবপুর। শেখপাড়ার ওদিকেই তার বাড়ি—বাবা মা কয়েক বছর হল মারা গেছেন।

শশধরের কিছু জমিজমা—পুকুর এসব আছে। ধান-পাট কিছু হয়। পুকুরের ধারেও চাষীরা আনাজপত্র করে। নারকেলও হয় প্রচুর। সব মিলিয়ে সংসারের অভাব অনটন তেমন ছিল না। প্রাচুর্য ছিল না নিশ্চয়ই, তবু দিন ঠিকই চলতো।

বাবা মা মারা যাবার আগে শশধরের সংসারে তার প্রথম সন্তান এসেছিল। শশধরের মা সাধ করে নাতির নাম রেখেছিল গোপাল। ঠাকুর দেবতার নাম—উচ্চারণ করলে পুণ্যি হবে। তাই ওই নামই রেখেছিল।

বাবা মারা যাওয়ার পর তবু মা ছিল সংসারে।

শশধর সপ্তাহের ছ'দিনই বাইরে। তবু মায়ের ভরসাতেই সংসার ছেড়ে বাইরে থাকতো সে।

মা-ই চাষ-বাষ বাড়ির কাজ এসব দেখাশোনা করতো। শশধর কিছুটা নিশ্চিন্ত ছিল। কিন্তু মা-মারা গেল হঠাৎ ক'দিনের জ্বরে। শশধর গিয়ে মাকে শেষ দেখা দেখতেও পায়নি।

মায়ের সৎকার করে মানার মাকে বলে—এবার কি হবে গোপালের মা? মা তো গেলেন—এই বাড়িতে তুমি একা ওই বাচ্চা দুটোকে নিয়ে থাকবে কি করে? দেশ বাড়ি-ঘর ছেড়ে যাওয়া মুস্কিল।

তখন অবশ্য সেই সর্বনাশা ঝড় ওঠেনি। দুবার বিক্ষিপ্ত ঘটনা ঘটেছে, মন্বন্তর—মড়কও চলছে। তবে তাদের দিকে ওটা তত মারাত্মক রূপ নেয়নি।

যুদ্ধের আতঙ্কে বরং কিছু লোক কলকাতা ছেড়ে গ্রামের নিরাপদ আশ্রয়েই ফিরে গেছে। সমস্যার সমাধান করে ফতিমা চাচী। ওদেরই ভাগচাষ করে আবদুল। বাবার আমল থেকে আবদুলই ওদের জমির চাষী, বাগানের রক্ষক। ধর্মভীরু লোক বয়স হয়েছে তবু এখনও শক্ত পোক্ত চেহারা।

ওর হাতের শক্ত মুঠিতে লাঙলের ফলা এখনও মাটিতে চেপে বসে। কোদালের কোপে যখন আল বাঁধে মনে হয় ভরা জোয়ানই মাটি কোপাচ্ছে।

এখনও লাঠি খেলে এলাকার পাঁচ গ্রামের মানুষ আবদুলকে সমীহ করে। ফতিমা ওর স্ত্রী। বয়স হয়েছে চাচীর, তবু বেশ হাসিখুশী।

শশধরের সমস্যাটা কঠিন। এমন কিছু চাকরি করে না যে এখনই কলকাতা না হোক আশপাশে কোথাও বাসা করবে। তাছাড়া মনোরমাও শ্বশুরের ভিটে ছেড়ে যেতে চায় না। জমি-জমা বাগান পুকুরে আয়-পয়ও মন্দ নয়। কিন্তু একা থাকাও ত সমস্যা।

সব শুনে ফতিমা চাচী বলে—কি গো শশধর। বৌমারে নিই যাবা নাকি? শশধর বলে।

—একা একা থাকবে কি করে চাচী, তাই ভাবছি। আবদুল ওদিকে বসে হুকো টানছিল, বলে সে।

—কেন? ভাবার কি আছে বাপ? আমরা কি মইরা গেছি? আমার পোলার সংসার যদি দেখতি পারি আর একটা পোলার সংসার দেখতি পারবো নি?

ফতিমাও বলে—তুমি নিশ্চিন্তে যাও। বৌমা পোলাদের জন্য ভাববা না। মনোরমা তো বলে।

—চাচা, চাচীরা আছে। পাশে দত্ত মাসী রয়েছে। তুমি তো ফি শনিবার আসছ। অত ভাবনা কিসের?

মনোরমা দেশের বাড়িতেই রইল। শশধর চাকরী নিয়ে রইল কলকাতায়, তবু তার মন পড়ে থাকে সেই সবুজ গ্রামেই। গোপালের পর তাদের সংসারে এসেছে গগন। তাদের দ্বিতীয় সন্তান। গোপাল গ্রামের পাঠশালায় যায়।

তবে সেও এর মধ্যে খুবই দুরন্ত হয়ে উঠেছে। গ্রামের কার বাগানে আম-জাম-জম্বুরা ফলে সে সব হিসাব তার নখদর্পণে। কোন্ গাছের ডালে টিয়া শালিখের বাসা ক-টা ডিম আছে সে খবরও সে বই-এর পড়ার থেকে ভালো জানে।

মাঝে মাঝে ছেলেদের সঙ্গে মারপিঠও করে। আবদুল ওকে ধরে আনে বলে—গুন্ডা হবি নাকি? দিমু পটকাই। এক পটকানে তার সিধা করি দিমু।

মনোরমাও বড়পুত্রকে নিয়ে ভাবনাতেই পড়ে। ওদিকে তখন দেশ বিভাগের ঝড় উঠেছে।

শশধরও দেখেছে কলকাতার বুকে দাঙ্গার নির্মম দৃশ্য। চেনা নাই, জানা নেই, কোন শত্রুতাও নেই। শুধু হিন্দু, মুসলমান এই অপরাধে একজন অন্যজনের বুকে নির্মম ভাবে ছুরি মারতেও দ্বিধা করে না।

মেসে কেটেছে তার বিনিদ্র রাত। ছাদ থেকে দেখেছে মহানগরীর এখানে-ওখানে আগুন জ্বলছে,আর্ত কলরব ওঠে।

শশধরের মনে পড়ে তার গ্রামের কথা। তার স্ত্রী পুত্র পরিবারের রক্ষক আবদুল শেখ। ফতিমা চাচী। আর এখানে হিন্দু মুসলমান পরস্পরের শত্রু। এই আগুনের আঁচ এই শহরেই সীমাবদ্ধ থাকে না।

খবেরর কাগজে খবরগুলোও বের হয়। পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলাতেও সুরু হয়েছে সর্বনাশা দাঙ্গা। ঢাকা, বরিশাল, নোয়াখালি সর্বত্রই এই সর্বনাশা আগুনের আঁচ ছড়িয়ে পড়েছে।

কলকাতার পথ-ঘাটও নিরাপদ নয়। যে যেখানে পারছে শত্রুর নিকেশ করতে যেন উঠেপড়ে লেগেছে।

শশধর দুরু দুরু বুকে সেদিন দেশে যায়। ট্রেনটা কোনমতে পৌঁছেছে তাদের ষ্টেশনে। তখন পশ্চিম দিগন্তে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। ষ্টেশনে নামতে দু'চারজন চেনা মুখ তাকে ঘিরে ধরে। কলিম তার সহপাঠী ছিল। কলিম-সবীব্ বলে—কলকাতায় কি হচ্ছেরে?

শশধর বলে—আর বলিস না।

কে বলে—পাকিস্তান আমাগোর চাই। সেই লড়াই কলকাতায়, ঢাকা-বরিশালেও শুরু হয়েছে। আমরাও এবার চুপ করে থাকবো না।

শশধর চুপ করে থাকে, ওই ট্রেনে নেমেছে তাদের গ্রামের হরিপদ দত্ত, কেশব দাস। আশপাশের গ্রামেরও দু'চারজন স্থানীয় মানুষ। দত্ত মশায় বলে—শশধর, একসঙ্গে গেরামে চল। দিনকাল সুবিধের নয়। বান্ধার অন্ধকার নেমেছে।

তারাগুলো এখানে আরও বেশী ঝকমক করে। সেই আভায় আলপথে চলতে অসুবিধে হয় না। সবুজ পাট গাছগুলো হাঁটু ভোর হয়েছে, বাতাসে মিষ্টি বাবলা ফুলের সুবাস।

তবু এই পরিবেশও যেন বদলে গেছে, মহানগরের সেই রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের আঁচ লাগবে বোধ হয় এখানেও — দত্তমশায় বলে।

—আজকাল ছেলেরাও মাথা তুলেছে। পুরোনো মানুষদের কথা ওরা শুনতে চায় না। ওরা বলে পাকিস্তানই করবো আমরা এখানে। পানপুরের ঘোষমশায় বলে।

—ব্যাটারা তলে তলে তৈরী হচ্ছে। রাতের বেলায় মিটিং করছে। কখন কি করে বসে কে জানে? জান মান নিয়ে আর থাকা যাবে না এখানে।

শশধর চুপ করে শোনে ওদের কথা। দত্তমশায় বলে—কলকাতায় এর মধ্যেই পূর্ববঙ্গ থেকে লোকজন দলে দলে সর্বস্ব হারিয়ে পালিয়ে আসছে।

ঘোষ বলে—সেকি হে। জমি-জারাত সাতপুরুষের ভিটে। এসব ছেড়ে একেবারে শূন্যহাতে চলে আসছে।

শশধরও দেখেছে ট্রেনগুলো আসছে সর্বহারাদের নিয়ে, শিয়ালদহ স্টেশনে তিল ধারণের জায়গা নাই।

দত্তমশায় বলে—প্রাণ মানই বড় কথা হে নাহলে ওইভাবে সর্বস্ব হারিয়েও পথে পথে ঘুরছে হিন্দুস্থানে কেন?

ঘোষ বলে—আমাদের কি হবে কে জানে?

দত্তমশায় বলে—গ্রামের সকলকে সাবধান করে দাও হে। চুপ করে মুখ বুজে মার যেন না খায়।

শশী কয়াল বলে—ওরাইতো এখানে সংখ্যায় বেশী হে। ওদের জোরই বেশী। শশধর এর কি জবাব দেবে জানে না।

শান্ত খুলনাতে যে এমনি গোলমাল শুরু হবে কোনদিন তা ভাবেনি। দুরু দুরু বুকে বাড়িতে আসে।

মনোরমাও স্বামীর পথ চেয়েছিল। স্বামীকে দেখে যেন বুকে বল পায়। বলে সে—পথে কোন ঝামেলা হয় নি তো?

—না! কেন বলতো? শশধর শুধোয়। মনোরমা বলে—এখন হিন্দুদেরও সহ্য করতে পারে না এখানের অনেকে। হাটতলাতে গোলমাল হয়েছিল পরশু। হিন্দুদের দোকানে আগুন দিয়েছে, লুটপাট করেছে।

—তাই নাকি। শশধরও একটু ঘাবড়ে যায় ওসব কথা শুনে। শহরের সেই আগুনের তাত এসে এবার দূর গ্রাম সবুজেও লেগেছে।

পরদিনই খবর আসে নশীপুরের হাটতলাতে আবার মুসলমান কিছু তরুণ হামলা করেছে। খুন জখম অগ্নিসংযোগ লুটপাট সবই হয়েছে।

সারা এলাকায় একটা থম থমে ভাব। দেশ ভাগ হবেই। এইসব অংশ চলে যাবে পাকিস্তানে। এর মধ্যে তাদের গ্রামের আশপাশের গ্রামেও প্রচুর মানুষ শোভাযাত্রা করে বের হয়। তাদের উদ্ধৃত কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয় লড়কে লেঙ্গে পাকিস্থান।

এরাও লড়াই-এর জন্য তৈরী হচ্ছে।

আবদুল—গ্রামের কিছু বয়স্ক মানুষও প্রমাদ গণে, দেখেছে তাদের আর মানতে চায় না একালের ছেলেরা। এর মধ্যে গ্রামে এসেছে বাইরের থেকে কিছু মানুষ, তারাই তরুণদের নিয়ে মিটিং মিছিল করছে।

আবদুল—অন্যরা বলে—এসব কি হতিছে বাপধনরা। এতকাল একসাথে হিন্দু-মুসলমান বাস করছি এখন ছেলেরা বলে—এখন দিন বদলেছে চাচা। হিন্দুদের শাসন আর চলবো না। এহন দেশটা হইব আমাগোর। পাকিস্তানই হইব। তোমরা চুপ মাইরা থাকো। যা করার আমরাই করুম। তারপরই ওসব হামলা—হাট লুঠ, মার, দাঙ্গাও সুরু হয়ে যায় এখান ওখানে। আর সহজেই বেশ কিছু পেয়ে যাবার পথ পেয়ে অনেক চতুর স্বার্থপর মানুষ তাদের দলে ভিড়ে বেশ শোর শোর শ্লোগান দিয়ে আকাশ বাতাস ভরিয়ে তোলে। আবদুলরাও বুঝেছে তাদের আর কেউ মানছে না। নতুন প্রজন্ম অনেক

পাবার আশায় মরিয়া হয়ে উঠেছে। তারাই এখন নেতা-কর্তা হবার স্বপ্ন দেখে।

আবদুলও এসেছে শশধরের বাড়িতে পরদিন সকালে। ফতিমা গোয়াল সাফ করছে। মনোরমার মনে শান্তি নাই। একটা আতঙ্কের ছায়া নামে।

শশধর বলে—ব্যাপার কেমন বুঝছো চাচা? এখানে কি কোন গোলমাল হবে?

আবদুল বলে—ঠিক বুঝতি পারছি না বাপ। দিনকালই বদলে গেছে। নতুন পোলাদের ওরা খ্যাপাইছে ওই পাকিস্তানের স্বপ্ন দেখাই। ওরাই এইসব হাটলুট, মারপিট সব আকাম করত্যাছে। ওগোর আর ভরসা করিনা বাপজান।

ফতিমা বলে—শয়তানের বাচ্চাগোর চিৎকার শোননি—কয় লড়াই করুম। এই তগোর লড়াই?

মনোরমাও বুঝেছে বিপদের সম্ভাবনা রয়েছে। ওদিকে সব ছেড়ে যাবার কথাও ভাবতে পারে না। শশধরের রোজগার সামান্যই। এখন গোপাল, গগন ছাড়া তাদের সংসারে এসেছে তার মেয়ে নন্দা।

বিদেশে এই এতগুলি প্রাণীর মুখে অন্ন জোগানো কম বিপদের কথা নয়। এখানে তবু জমির ধান ফসল থেকে আয় হয়। ঘর বাড়ি রয়েছে, গরুর দুধও কিনতে হয় না। পায়ের তাল মাটি হারিয়ে ভেসে যাবার কল্পনাও করতে পারে না শশধর।

মনোরমা বলে—দেশের ভাবগতিক সুবিধার বুঝছি না বাপু। তুমি কলকাতার আশপাশের একটুন জায়গা কিনে রাখো। যদি এদেশে ত্যামন কিছু হয় সেখানে গে মাথা গুঁজতে পারবো।

শশধরও ভাবনায় পড়ে। ফতিমা বলে—বাপজান, তুই ভাবিস না। আমাদের না মাইরা বৌমা-পোলাগোর কেই মারতি পারবো না। তুই ভাবিস না।

শশধর ফের কলকাতায়। তখন কলকাতায় জনতার ঢল নেমেছে। ওদেশ থেকে হাজার হাজার মানুষ সব হারিয়ে এসেছে এদেশে। এখানের অবস্থাও অন্যরকম।

শশধর বুঝেছে তাদেরও বিপদ হবে। এমনি দিনে দেশ বিভাগের নোটিশ বের হলো। চমকে ওঠে শশধর—তাদের দেশ পাকিস্তানে পড়েনি।

বুকটা খুশীতে ভরে ওঠে। সেইদিনই সে বের হল দেশের দিকে। তাহলে তাদের উপর খাঁড়ার কোপ পড়ছে না। তারা শান্তিতেই হিন্দুস্থানে থাকতে পারবে।

ট্রেনে সব মানুষের মুখে খুশির আভা। শশধর তাদের ষ্টেশনে নেমে দেখে ইন্ডিয়ার তেরঙ্গা ফ্ল্যাগ উড়ছে।

দোকানপাট খোলা। সেই চীৎকারও স্তব্ধ হয়ে গেছে। খুশি মনে বাড়ি ফিরে শশধর। আবদুল বলে—খোদা যা করেন ভালোর জন্যই বাপজান।

মনোরমা বলে—যা ভাবনায় পড়েছিলাম। এখন নিশ্চিন্ত। এবার শান্তিতে থাকতে পারবো।

শশধরও খুশী। দেশ মাটি ছাড়তে হবে না তাদের ওদের মত। সেই সময়ে চারিপাশের গ্রামের হিন্দুরা মিছিল বের করে। কিছু প্রাচীন পন্থী বয়স্ক মুসলমানরাও খুশী। আবদুলও মিছিলে যায়। ওরা এখন ইন্ডিয়ার লোক।

এ যেন দুঃস্বপ্নই।

পরের পরদিনই বিশেষ খবর বের হলো। খুলনা যশোর পাকিস্তানেই পড়েছে। ইন্ডিয়ায় নয়। মুর্শিদাবাদের জন্যই খুলনা যশোহরকে ছাড়তে হয়েছে।

পরদিনই সারা এলাকার চেহারা বদলে যায়। মাটির তল থেকে যেন দৈত্যের দল মাটি ফুঁড়ে বের হয়েছে। সারা এলাকার মানুষ এবার পাকিস্তানের পতাকা নিয়ে বের হয়ে পড়ে।

তাদের এতদিনের স্বপ্ন এবার সফল হয়েছে। ইন্ডিয়ার পতাকা নেমে যায়। সর্বত্র ওঠে পাকিস্তানের পতাকা। আর বেশ কিছু বেশী উৎসাহী জনতা কেশবপুরের হাটতলার কিছু মিষ্টির দোকান থেকে জোর করে সব মিষ্টিই লুটে নেয়— তার পরই হাটের অন্য দোকানগুলোও রেহাই পায় না।

পুলিশ লাঠি চালালে জনতাও ফুঁসে ওঠে। তাদের দেশ তাদের মারার অধিকার পুলিশের নাই। তাই নিয়ে থানা অবরোধ—গোলমাল কিছু আক্রমণের ঘটনাও ঘটে যায়।

তার জের এসে শান্ত এই গ্রামেও পৌঁছে যায়। অবশ্য এখানে গোলমালটা বেশী হয় না। হিন্দু-মুসলমান উভয় দলের চেষ্টাতে সেটা বন্ধ হয়।

কিন্তু মনে হয় এটা সাময়িক। এর পর আরও কিছু ঘটা বিচিত্র নয়।

শশধরও ভাবছে কথাটা। দেখেছে কেশবপুর হাট লুটের ঘটনা-মারপিট। আগুন লাগানোর চেষ্টাও। কোন মতে হাট থেকে পালিয়ে এসেছিল। কারণ ওই মারমুখী জনতা কয়েকজন নিরীহ পথচারী হিন্দুকেও মেরেছে। সেই প্রথম রক্তপাত ঘটলো ওদের এলাকায়।

মনোরমা বলে—এখানে আর থাকা যাবে না গো। শশধর ভাবেনি যে সর্বনাশটা এত তাড়াতাড়ি এসে পড়বে। এরজন্য সে প্রস্তুত ছিল না। তবু ভেবেছে সে কথাটা। দত্তবাবুরা মেয়েদের আগেই কলকাতার কাছে ব্যারাকপুরে কোন আত্মীয়দের ওখানে পাঠিয়েছে। আজকেই চলে যাচ্ছে। আর বাকীরাও তত ভীত হয়ে পড়েছে।

আবদুলই বলে—দিনকাল বদলে গেল বাপজান। আর তো কিছু কওয়া যায় না। পোলাপানরা এহন সর্দার হয়েছে। কেশবপুর হাটে যা করছে—তারপর ওদের বিশ্বাস নাই।

অর্থাৎ আবদুল চাচাও আর ভরসা দিতে পারে না। শশধর বুঝেছে চলে যেতেই হবে। তাই বলে—চাচা, এসব জমি পুকুর তুমিই নাও—কিছু টাকা দাও আমাকে। আবদুলের চোখও ছলছল হয়ে ওঠে, বলে—এসবের মালিক তো আমারেই ...াইছিলা, দুঘরেই এর থেকেই খেতাম, আজ বইলা যাতি হবে—

—তাই টাকার দরকার চাচা। সাতপুরুষের ভিটেজমি তুমিই নাও। তারপর দেখি বরাতে কি আছে। ক'টা দিন ওদের একটু রাখো—আমি ওদিকে একটা ব্যবস্থা করেই এসে নিয়ে যাবো ওদের।

আবদুল বলে—টাকা হাজার দশেক আছে দিব। যে জমি জারাত এখনই বেচবা না। যদি দিন বদলায় আসবা। টাকা ফেরৎ দিই দিবা তখন।

কলকাতার আশপাশের জলা হোগলা বন-পলিত জমি প্রচুর পড়েছিল। এতদিন ওদিকে যাবার দরকারও বোধ করেনি কেউ। এবার ওই জনস্রোত এসে পড়ছে সব হারিয়ে। তাদের আশ্রয় চাই।

ওই মানুষ গুলোও বুঝেছে দেশের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে তাদের বলি দেওয়া হয়েছে। তাই তারাও এবার ওইসব জমি জবর দখল করেই ম্যথা গোঁজার ঠাঁই করছে।

শশধরও এর মধ্যে তাদের এলাকার বেশ কিছু ঘর হারানো মানুষের সন্ধান পায় শিয়ালদহ ষ্টেশনের বাইরে। তারা এর মধ্যেই দেশছেড়ে এসে গেছে। ওদেরই একজন কলকাতা থেকে সামান্য দূরে সোদপুরের ওদিকে রেললাইন পার হয়ে বেশকিছু খাসজমির সন্ধান এনেছে।

মদন ঘোষের বাড়ি কেশপুরেই। তারই দূর সম্পর্কের কোন আত্মীয় নটবরবাবু আগেই সোদপুর অঞ্চলে চাকরী করতো। বেশ সাহসী-সৎ আর বলিয়ে কহিয়ে মানুষ। এখন ওই অঞ্চলের নামী নেতা, চাকরী ছেড়ে এখন দেশসেবার কাজই করেন। ওই এলাকায় তার প্রতিষ্ঠা প্রতিপত্তিও আছে।

মদন তার কাছেই গিয়েছিল যদি কোন সাহায্য পায়। নটবরবাবু তাদের ওই জায়গাটার সন্ধান দিয়েছেন। তবে জানিয়েছেন খাস জমি সরকারের প্রায় চল্লিশ বিঘের মত জমি বড় রাস্তার ধার থেকে শুরু হয়েছে। সরকারের লোকজন বাধা দিতে পারে। তবে দখলকারীরা যদি না হঠে—পুলিশ যাতে বেশী জোর না করে সেটার ব্যবস্থা তিনি করবেন।

মদনই এসে খবরটা দিতে ওই মানুষগুলোও ওই জায়গা জবরদখল করার মতলব করে। ওই ভাবেই টালিগঞ্জ-যাদবপুরের জলা হোগলাবনের দখল নিয়েছে অনেকে।

এরাও তৈরী হয়। কমিটিও গড়ে ওঠে। শশধরও বুঝেছে জমি একটু তার চাই। তাই সেও এদের দলে ভিড়েছে। গোপনে এদের প্রস্তুতি চলে।

এর মধ্যে এরা দুচার জন মাতব্বর গিয়ে জায়গাটা দেখে এসেছে। শশধরও গেছল তাদের সঙ্গে। ষ্টেশনে নেমে রেললাইন পার হয়ে বেশ কিছুটা যেতে হয়।

চারিদিকে মাঠ-জলা, দু'একটা বাড়ি উঠেছে আশপাশে। একদিকে এর মধ্যে বেশকিছু জায়গা সাফ

করে বাড়ি উঠছে—ওসব জায়গা দাম দিয়ে কেনা। তাই সরেশ, আর কাছেই।

এদের জমিটা একটু দুরে। রাস্তার বাঁদিকে প্রায় বিঘে চল্লিশ জমি। কিছু ডাঙ্গা কিছু জলা—অবশ্য জল বেশী নাই। কোথাও কাদা—ওদের মধ্যেই আলোচনা হয়ে যায়। পাঁচ-কাঠা করে আপাততঃ চারশো পরিবার ওখানে দখল নেবে। আর বাকী নিচু জমির থেকে মাটি তুলে পুকুর করে সেই মাটি দিয়ে নিচু জমিই ভরাট করে নেওয়া হবে। যাতে জল না জমে।

রাত তখন দুপুর। জনতা ওইরাতে বাঁশ-দড়ি নিয়ে এগিয়ে এসেছে। তার আগে বারাসতে কোন বাঁশ দরমা টিন ওয়ালাকেও বলা হয়েছে। ভোর নাগাদ তারা ট্রাকে করে ওসব মাল পাঠাবে। ভোর থেকেই ওই জমিতে ওরা যেমন করে হোক ঘর তুলে নেবে।

শশধর এসব কাজ কখনও করেনি। কিন্তু এখন সবই গেছে তাদের। লজ্জা-বিবেক রেখে আর বাঁচা যাবে না। তাই সেও সামিল হয়েছে এই জবর দখলে। ওরা যে যার জায়গায় খোঁটা পুঁতে দড়ি বেঁধে দখল করে রাত ভোর ওখানেই বসে থাকে। মশার ঝাঁক এসে ঘিরে ধরে, তাদের কামড়ে ছটফট করছে ওরা। মানুষের কলরবে জলা-ভূমিতে এতদিনের আশ্রয় নেওয়া দুটারটে ঢোঁড়া, দাঁড়াস সাপও বিব্রত হয়ে পালায়। দু'একটা শিয়ালও আশ্রয় হারিয়ে দূরে গিয়ে চীৎকার করে।

এরা বসে আছে নিজের নিজের দখলীকৃত জায়গাতে। ভোরে যথারীতি কিছু মজুরও আসে ট্রাকে বাঁশ দরমা নিয়ে। পাকাপাকি দখলই করবে।

এই সময় দুটো পুলিশ ভ্যানও এসে পড়ে। পুলিশ নামছে। এরাও যে যার জমিতে বসে থাকে। দলনেতাদের প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়।

—আমাদের জমি চাই, আশ্রয় চাই।

পুলিশ লাঠি নিয়ে নেমেছে। মদন বলে—কেউ নড়বেন না। ওদেশেও মার খেয়ে এসেছি। এখানেও মার খেয়েই মরবো, তবু নড়বো না।

এমন সময় এসে পড়ে নটবরবাবু। সঙ্গে দু'একজন অফিসার। এরাও নড়বে না। পুলিশ লাঠি চার্জ করে হঠাবে। নটবর বাবুর কথাতে শেষ অবধি পুলিশ ফিরে যায় দু'চারটে বেড়া-দরমা ভেঙ্গে দিয়ে। তার বেশী কিছু করে না।

নটবরবাবু এবার ওদের বলেন—আপনারা ঘর তুলুন যে যার জায়গায়। নিজেদের মধ্যে অশান্তি করবেন না। তারপর দেখা যাক এই জায়গার সরকারী স্বীকৃতি আদায় করা যায় কিনা। এখন তো থাকুন।

সকলে ওই মানুষটির প্রতি আজ কৃতজ্ঞ।

নটবরবাবু না এসে পড়লে পুলিশ তাদের উপর লাঠি চার্জই করতো। শশধরও দেখে নটবরবাবুকে এই প্রথম। মানুষটি তাদের বলে—পথ ঘাটের জায়গা রাখবেন। নিজেদের যাতায়াতের পথও রাখতে হবে। এই সব এলাকার চেহারা বদলে যাবে। গাড়ি যাবার পথও রাখবেন। এখন পাতকুয়া করুন। টিউব ওয়েল বসাবার ব্যবস্থা করছি খাবার জলের জন্য।

ওই দখলকারীদের মধ্যে গুপীনাথও ছিল। মাথায় গামছা জড়ানো। গায়ে একটা ময়লা গেঞ্জি, আর একটা লুঙ্গি গুটিয়ে পরা, লোকটা বেশ রসিক।

সেই বলে—হঃ বসতি পেলি শুতি চাই। জায়গা পাইছি, এহন আর অনেক কিছুই দিতি হবে স্যার। এই তো সবে গাইড়া বসলাম।

শশধরও এর মধ্যে একটা পুকুরের পাড়ে খানিকটা জায়গা পেয়ে সেখানে দরমার বেড়া দিয়ে উপরে টিন চাপিয়ে দুখানা ঘর বারান্দা মত করেছে। ওদিকে একটা নর্দমা, ওই নর্দমার উপরই বাঁশের পাটাতন করে চটের বেড়া দিয়ে টয়লেট বানানো হয়েছে। আর এখানে মাটি এমনিতেই জলা, কয়েক হাত খুঁড়ে মাটির পাট বসিয়ে একটা পাতকুয়োও বানিয়ে নেয়।

এই করতেই আবদুলের দেওয়া টাকার অনেকটাই খরচা হয়ে যায়। বাকীটা এখানের ডাকঘরে জমা রাখে। কখন কি দরকার হয় কে জানে।

তখন ক'মাসেই দেশের চেহারাও বদলে গেছে। মানুষের ভিড় বেড়েই চলেছে। আর সেই ভিড় এখন কলকাতার আশপাশের ফাঁকা জায়গাগুলোয় ছড়িয়ে পড়ে। গজিয়ে উঠেছে কলোনী। উদ্বাস্তু, কলোনী রিফুইজী এসব কথাগুলো এদেশে আগে চালু ছিল না। এখন যত্রতত্র চালু হয়ে গেছে। দেশের তাবড় ছোট বড় নেতাদের নাম নিয়ে ওইসব জায়গা জবর দখল করে এক এক জনের নামকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য কলোনীর পত্তন করেছে। এখনও করে চলেছে।

শশধর অফিস থেকেও কিছু লোনের চেষ্টা করেছে। এবার দেশে আর থাকা যাবে না। সহজে আসা যাওয়াও করা যাবে না। কারণ একই বাংলাদেশ এখন দু'টুকরো হয়ে দুটো দেশে পরিণত হয়েছে। তাই দু'দেশের মধ্যে সহজে যাতায়াত আর করা যাবে না। পাকিস্তানই বাধার সৃষ্টি করে।

পাসপোর্ট-ভিসা এসব চাই ভারতীয়দের ওদেশে ঢুকতে গেলে। একবেলার পথ, এক ভাষার দেশ, দুটোর মধ্যে দুস্তর ব্যবধান গড়ে উঠেছে। গড়ে উঠেছে একটা অদৃশ্য প্রাচীর।

শশধর আর খুলনা মেলে চেপে সন্ধ্যার মধ্যে বাড়িতে যেতে পারবে না। ওই মাটিতে তার আর কোন অধিকার নেই। কারণ সে ভারতীয়।

এবার চলেই আসছে শশধররা।

মনোরমা বলে—সাত পুরুষের ভিটে ঘর জমি সব ছেড়ে যেতে হবে?

শশধর বলে—আর উপায় নাই গোপালের মা। এখন ওদেশে গিয়ে ছেলে-পুলেদের মানুষ করে কোনমতে খেটে-খুটে খেতে হবে।

—আর জমির আয়পয় থাকবে না? মনোরমার চোখে জল নামে। আবদুলের বয়স হয়েছে। সেই শক্ত মানুষটা আজ বয়সের ভারে নুয়ে পড়েছে। চোখেও দেখতে পায় না ঠিকমত, যে লাঠি দিয়ে সে এলাকার মানুষকে দাবিয়ে রাখতো, সেই লাঠিতে ভর করে আজ তাকে চলতে হয়।

ফতিমার চোখে জল। এতদিনের চেনা আপনজনরা এবারে চলে যাচ্ছে। আবদুল গোপনে শশধরের হাতে আরও কিছু টাকা দিয়ে বলে—আর নাই বাপজান তোর বিষয় ন'কড়ায় ছ'কড়ায় নিলাম রে। ছেলেদের হাতে সব ওরা এখন বদলে গেছে।

ফতিমা ওই পাসপোর্ট ফোর্ট বোঝে না। সে বলে—মাঝে মাঝে আসবি বাপ।

পাসপোর্ট ভিসার হাঙ্গামার আগেই শশধর তারপর পরিবার নিয়ে এসে হাজির হলো এই দেশে। গোপাল তখন ওখানের স্কুলে ক্লাস সেভেনে পড়ছে। অবশ্য পড়াশোনায় গোপাল মোটেই ভালো নয়। সেদিক থেকে গগন অনেক ভালো ছেলে। ক্লাসে ফার্স্ট হয়—আর নন্দাও পড়াশোনায় খুব ভালো।

শশধর বলে—এবার এখানেই স্কুলে ভর্তি করে দোব তোদের।

মনোরমাদের নিয়ে শিয়ালদহ ষ্টেশনেই নামে শশধর। মনোরমা অবাক হয়ে দেখছে জনসমুদ্রকে। গোপাল, গগন ও নন্দা কেমন হকচকিয়ে গেছে। এত বড় বাড়িই কখনও দেখেনি। এত লোক, মায়ের আঁচল ধরে আছে। শশধরও সাবধানে ওদের নিয়ে আসে।

বাইরে তখনও ছিন্নমূল মানুষের ভিড়। যে যেখানে পারছে ঠাঁই নিয়েছে। নোংরা থিক্ থিক্ করছে। দুর্গন্ধ ওঠে—তার মাঝেই ওরা পড়ে রয়েছে সরকারী সাহায্যের আশায়।

মনোরমা বলে—এরা কারা?

শশধর বলে—এরাও আমাদের মতই ওদেশ থেকে সব হারিয়ে এখানে এসেছে। এখনও থাকার জায়গা পায়নি। এই ভাবেই পড়ে আছে সরকার থেকে খেতে দেয় মাত্র।

মনোরমা দেখে সেই দেশত্যাগের যন্ত্রণাকে, তারও মনে পড়ে ফেলে আসা গ্রাম, বাড়ি, জমি ও পুকুরের কথা। এদেশে তবু স্বামীর চাকরিটা ছিল তাই রক্ষে, না হলে তাদের এইভাবেই খোলা আকাশের নীচে এই নোংরায় পড়ে থাকতে হতো।

সোদপুর ষ্টেশনে নেমেছে ওরা। সঙ্গে সংসারের শেষ সম্বল ভর্তি দুটো বাক্স, একটা বস্তা, সঙ্গে নারকেল গাছের ঝাঁটা অবধি এনেছে মনোরমা।

দুটো রিক্সায় করে কোনমতে আসতে হয়। খানিকটা পথ রয়েছে, বাকীটুকুতে পথ নাই। পথের রেখা

পড়েছে মাত্র। ওই মাঠ জলার ধারে পর পর দরমার ঘর। টিনের চাল দেওয়া কুঁড়েঘরের মতই। তেমনি একটা বাড়ির উঠানে এসে পকেট থেকে চাবি বের করে তালা খুলে বলে—চলো।

মনোরমা অবাক হয়ে দেখছে তাদের নতুন আশ্রয়। তাদেরই নয়—আশপাশের এইসব ধরনের ঘরই গড়ে উঠেছে। মনোরমার মনে পড়ে তার ফেলে আসা বাড়ির কথা।

মাটির ঘর, খড়ের পুরু ছাউনি, উঁচু দাওয়া—ওদিকে রান্নার ঘর, গোয়াল, গরু দুটোর কথা মনে পড়ে। মনে পড়ে তাদের চোখের কাতর চাহনি। অবলা জীব, তারাও বুঝেছে ওরা চিরকালের জন্য তাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছে।

ঘরের চারিদিকে দেওয়াল—মাটির, তবু অন্তঃপুরের একটা আব্রু ছিল। ওদিকে তুলসী মঞ্চ উঠানে দু'তিনটে নারকেল, একটা আম-বাতাবী লেবুর গাছ। বাতাসে, ওঠে মিষ্টি সুবাস।

এখানে? অন্তঃপুরের দুদিক মিশেছে পথে। আব্রুর বালাই নেই। একটা ছায়া তরুও নাই। ঘরের দাওয়া মিশেছে উঠানে।

পূর্ণপাত্র

তখন রয়েছি দ্বারকাতীর্থে। ভারতের শেষ সীমান্ত আরব সমুদ্রের তীরে ছোট্ট একটি শহর। সরকারি দপ্তর, একটা সিমেন্টের কারখানাও রয়েছে স্টেশনের পাশে। তবে এই একমুঠো শহর প্রধানত পরিচিত দ্বারকাধীশের মন্দিরের জন্যই।

স্টেশন শহর থেকে বাইরে। রুক্ষ প্রান্তর আর বড় বড় কাঁটা গাছ চারিদিকে। এই প্রান্তরে স্টেশন চত্বরে তবু ডিপটিউবওয়েল আছে, পানীয় জল তবু কিছু মেলে, এই শহরে তা প্রায় অমিলই।

দূরে গোপীতালাও নামে কোন বড় দিঘি একটা আছে, সেখান থেকেই গাড়িতে পানীয় জল এনে শহরে বিক্রি করা হয় চড়া দামে।

যদিও শহরটা আরব সমুদ্রের সীমাহীন জলরাশির তীরে। তবু জল সেখানে অমিল। তাই আগে থেকেই আমরা রেলওয়ে রিটিয়ারিং রুম বুক করে ওখানেই রয়েছি। সকাল বিকাল মন্দিরেই যাই, আশপাশে সমুদ্রতীরে দিন কাটাই।

দুতিন কিলোমিটার পথ বড়জোর, টাঙ্গাও সস্তা। যাতায়াতের কোনো সমস্যাই নেই।

দ্বারকাধীশের বিশাল মন্দির আরব সমুদ্রের তীরে। শোনা যায় আসল দ্বারকাপুরী এখন সামনের অতল সমুদ্রের তলে নিমজ্জিত, তার অস্তিত্বের কিছু নিদর্শনও পাওয়া গেছে।

দ্বারকাধীশের মন্দিরে শ্রীরাধিকার স্থান নেই। মূল মন্দিরে দ্বারকাধীশ শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি আর মা দেবকীর মূর্তিও দেখা যায় অন্য প্রান্তে।

ওদিকে আলাদা করে শ্রীকৃষ্ণের অন্য স্ত্রীদের মন্দির। মন্দিরের নীচেই আরব সমুদ্রে এসে পড়েছে গোমতী নদী।

ছোট্ট নদী—যখন জোয়ার থাকে না তখন গোমতী শুধু বালুচরই। হেঁটেই পার হওয়া যায়। ওপারে শূন্য- প্রায় প্রান্তর, দু'একটা মন্দির রয়েছে ছড়ানো ছিটানো। সেগুলোর নামডাক নেই—ওখানে একটা মন্দিরে চৌবাচ্চায় দেখেছিলাম—একটা শিলা চৌবাচ্চার জলে ভাসমান।

গোমতীর তীরে দ্বারকা শহরের প্রান্তে সাধুদের আশ্রয়ের জন্য বেশ কিছু পাথরের ঘর রয়েছে।

সামনে গোমতী। ওপারে বিস্তীর্ণ দিগন্ত প্রসারী রুক্ষ প্রান্তর। সাধুরা দূর-দূরান্ত থেকে এখানে তীর্থযাত্রায় এসে ওই সব কুঠিয়ায় থাকেন।

আমরা এখানে ওখানে ঘুরি। কোনোদিন হেঁটে বালুচর পার হয়ে ওপারের নির্জন প্রান্তরে চলে যাই। সেই শিলাভাসা মন্দিরেও সেদিন গেছি। তত চালু মন্দির নয়। তাই লোকজনও বিশেষ নেই। তারা বোধহয় কোন কাজে শহরে, এপারে এসেছে। আমরা চৌবাচ্চার ভাসমান শিলা তুলে দেখি—রহস্যটা বোঝা গেল তার। ভাসার পাথরটা সাদা বেলে পাথরের, কেজি চারেক ওজনের। আর তার গায়ে অজস্র ছিদ্র রয়েছে, আঁকা বাকা ছিদ্রগুলো পাথরের ভিতরে জটিল গলিঘুঁজির কাজ করেছে যাতে পর্যাপ্ত বাতাস থেকে যায়। জলের দুদিকের চাপে বাতাস মধ্যে এত পরিমাণ থাকে যে তাতেই হালকা বেলেপাথর জলে ডোবে না।

আমার সঙ্গী মিছরিমোহন খুবই দুষ্টবুদ্ধি ধরে ফেলে। সে বলে—কেউ নেই, পাথরটা ঝুলিতে পুরে নে চল। দেশে গিয়ে মন্দির করে দুপয়সা আমদানী হবে।

আমিই বাধা দিই। রেখে দে। ওসবে কাজ নেই।

ফিরছি তখন জোয়ার এসে গেছে। সমুদ্রের নীলাভ জলরাশি ঢুকেছে। গোমতীতে তখন দুকূলপ্লাবী জল। বালুচরে তখন তুফান বইছে। অবশ্য এসময় পারাপারের নৌকা থাকে—পার হয়ে শহরে ফিরতে কোনো অসুবিধা হয় না।

নদীর ধারে পরিক্রমারত সাধুদের কুঠিয়া। অনেক সাধুও আসেন। দুচারদিন থাকেন। জপ ধ্যান করেন এই পরিবেশে আবার হারিয়ে যান। এ এক বিচিত্র জীবন। পথে পথে ঘোরেন ঈশ্বরের সন্ধানে। অমৃতের সন্ধানে।

মন্দির তীর্থ এই দ্বারকা। অতীতে ছিল শ্রীকৃষ্ণের রাজধানী। আজও হাজার হাজার তীর্থযাত্রী আসেন ওই পুণ্যতীর্থে। ওপাশে রয়েছে শঙ্করাচার্য প্রতিষ্ঠিত মঠ—তিনিও এসেছিলেন এই তীর্থে।

সেই পথ ধরে আসেন কি যেন অমৃতস্পর্শ পাবার আশায় হাজারো মানুষ—কত সাধু-সন্ত। আমার মত অভাজনও এসেছে।

সেদিন সকালে গেছি মন্দিরে। ভোরের মঙ্গলারতি এখানে দেখার মতো। ছোট শহরের মানুষজনও অনেকে আসেন। আসে তীর্থযাত্রীর দল সেই আরতি দর্শন করতে। সকলেরই এখানে অবারিত দ্বার। এ ভক্তেরই মন্দির।

আরতি দর্শনের পর বের হয়ে আসি, বাইরে যাই ভুজিয়ার দোকানে। এখানে ভাজা-ভুজি মেলে নানা ধরনের। চা খাচ্ছি। কয়েকজনকে দেখলাম তারা কিছু চাঁদা তুলছেন। ওই কুঠিয়ায় কোন এক সাধু কাল রাতে দেহ রেখেছেন। তাঁর সৎকারের জন্য তীর্থযাত্রীদের কাছে তারা টাকা চাইছেন।

আমরাও কিছু দিলাম। কি খেয়াল বশে ওদিকেই গোমতীর ধারে কুঠিয়াগুলোর পানেই এগিয়ে যাই। দেখা যায় একটা কুঠিয়ার সামনে ভিড় জমেছে। অনেকেই রয়েছে। চাতালে রয়েছে সেই সাধুর শবদেহ। সৌম্য শান্ত চেহারা মৃত্যুর স্পর্শেও যেন সেই প্রসন্নতা লুপ্ত হয়ে যায়নি। সম্বল বলতে একটা কম্বল আর ওদিকে বালুচরে পড়ে আছে তার শূন্য কমণ্ডলু।

মিছরিমোহন বলে—সাধু তো শেষ রে। জীবনে সব ছেড়ে কী পেয়েছিস বলতে পারিস? শূন্য হাতেই ফিরে গেল। কমণ্ডলুও শূন্য।

ওর প্রশ্নের কী উত্তর দেব ভাবছি। হঠাৎ দেখি গোমতীতে জোয়ার এসেছে। আরব সমুদ্রের নীলাভ জলরাশিতে গোমতীর বুক ভরে গেছে। আর সেই জল এসে পরিপূর্ণ করেছে সন্ন্যাসীর পরিত্যক্ত সেই কমণ্ডলু। মনে হয় নিঃস্বরিক্ত হয়ে ওই অচেনা সাধু মহাত্মা দুনিয়া থেকে ফিরে যায় নি। তার জীবনপাত্রও কোন অমৃত ধারায় সঞ্জীবিত হয়েছিল। ঐ পূর্ণ কমণ্ডলুর মতোই। সেটা দেখার চোখ আমাদের নেই। সেই পূর্ণতার স্পর্শ পাবার ভাগ্যও নেই।

গোমতীর চরে বহু মানুষ এসেছে। সাধুর উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানাতে। কে যে কোথা থেকে এলো—কোথায় গেল, তাও কেউ জানে না। তকে কেউ চেনেও না। তবু পরম আত্মীয়ের মতো তাকে শ্রদ্ধাভরে শেষ বিদায় জানালো। আমিও তাদের একজন।

জোয়ার থেমে গেছে। শূন্য বালুচর—সাধু নেই। তার পরিত্যক্ত শূন্য কমণ্ডলু তখনও পূর্ণ হয়ে রুক্ষ বালুচরে পড়ে আছে, যেন জগতের উদ্দেশে নিবেদিত ওই শান্তিবারি।

আরব সমুদ্রের অসীমে সূর্য অস্ত যাচ্ছে রং-এর তুফান তুলে। আঁধার নামে—তারাগুলো জেগে ওঠে আকাশে। আরতির দামামা বেজে ওঠে সমুদ্রতীরে দ্বারকাধীশের মন্দিরে। অন্ধকার আকাশে বাতাসে সেই শব্দ ধ্বনি প্রতিধ্বনি তোলে।

'অবিশ্বাসের জ্বালার চেয়ে বিশ্বাস করে ঠকাও ভালো।'

—সদ্গুরু

হিরো থেকে জিরো

মার্ভে বীচে বিকাল গড়িয়ে সন্ধ্যা নামছে। সন্ধ্যা এখানে মনোরম, সূর্য ক্রমশ নিস্তেজ হয়ে একটা গোলাপী রঙের থালার মতো ধীরে ধীরে অসীম সমুদ্রের বুকে নেমে আসে। শেষ আলোর আভায় সমুদ্রের উত্তাল ঢেউ যেন মাতাল হয়ে ওঠে ওই সূর্যের স্পর্শের মত্ততায়। দুর্বার আকর্ষণে সূর্যটা নিষ্প্রভ হয়ে কোন মুহূর্তে ওই জলের বুকে হারিয়ে যায়।

সীগাল পাখিদের কলরব ওঠে, বীচের এদিকে ভেলপুরী, বাটাটা, পানিপুরী, কোল্ড ড্রিংকস্, কফির দোকানে আলো জ্বলে ওঠে। প্রবীর নিজেকে কেমন নিঃসঙ্গ বোধ করে এই সময়।

তবু ওদিকে তাকে নজর রাখতে হয়, দূরে সমুদ্রের বুকে দু'একটা কালো বিন্দুর মতো মাছধরা ট্রলারগুলো মাঝসমুদ্র থেকে ফিরছে। রাত হলে ওরা ওদিকে বীচে এসে ভিড়বে। ততক্ষণে মার্ভে বীচের যাত্রীদের কোলাহলও থেমে আসবে, প্রবীরের কাজও শুরু হবে। ওই ট্রলারগুলোর দু'একটাতে তাদের মাল আসে। প্রবীর ওদের সঙ্গে অন্ধকারে সেই সব মালপত্র নিয়ে, ওদিকে পাহাড়ের গায়ে দু'একটা ঝুপড়িতে রাখে। অন্ধকারেই গাড়ি আসে—সেসব মাল পাচার হয়ে যায়। প্রবীর নগদ বেশ কিছু টাকা পায়। দিনভোর ওই ঝুপড়িতে না হয় বীচে কাটায়। কোনো কোনো দিন চলে আসে জুহুর বীচে, গোবিন্দর সঙ্গে দেখা হয়। গোবিন্দ সেখানের বড় একটা দোকানে কফি, স্যান্ডউইচ, চীজ পকৌড়া এসব বেচে। মালিক বংশীলালও তাকে ভালোবাসে। গোবিন্দই বলে, এই বীচেই মালিক একটা দোকান আমাকে করে দেবে। তুইও আয় প্রবীর। দুজনে সেই দোকান গড়ে তুলবো। ওসব ব্যবসা এখানে ভালো চলে। দাদা-মাওয়ালিদের মালিকই সামলে দেবে।

প্রবীরও কথাটা ভাবছে। মনে পড়ে প্রবীরের আগেকার কথা। বছর দুয়েক হয়ে গেল প্রবীর কলকাতা ছাড়া। কলকাতার কথা বারবার মনে পড়ে প্রবীরের। কিন্তু সেখানে ফেরার পথ আর নেই তার।

প্রবীর, গোবিন্দ আর সোনালী তিনজনে ছিল ঘনিষ্ঠ বন্ধু। একসঙ্গে কলেজে পড়তো। প্রবীর পড়ার চেয়ে নাটক-সিনেমা এসব নিয়েই মাথা ঘামাতো বেশি। আর সোনালী ভালো গান গাইতো। পাড়ার ফাংশানে, নাটকে তার ছিল বিশেষ ভূমিকা। দেখতেও সুন্দরী। প্রবীরদের নাটকে তার নায়িকার ভূমিকা বাঁধা। গোবিন্দ সেকেন্ড লীড করতো।

কলেজের ফাংশানে গোবিন্দর কমিক স্কেচ থাকবেই। প্রবীরের সেখানে হরবোলার ভূমিকা। তার গলায় পাখির ডাক, ইঞ্জিনের শব্দ, কুকুরের ডাক, তাদের ঝগড়া—ওসব ছিল খুবই উপভোগ্য। বন্ধুরা বলতো, প্রবীর, তুই যা ডিরেকশান দিস তাতে তোর ফিল্ম ডিরেক্টার হওয়া উচিত। তরুণ মজুমদার, তপন সিন্হাদের মতোই ছবি বানাবি তুই।

সোনালীর বন্ধুরাও বলতো, এবার সিনেমায় নাম সোনালী, তোর যা অভিনয় ক্ষমতা আর জৌলুস তাতে তুই ঠিক স্টার হয়ে যাবি, টাকা-গাড়ি-বাড়ি সব হবে।

সোনালীর বাবা একটা বেসরকারী অফিসে উদয়াস্ত পরিশ্রম করে যা পান তাই দিয়ে কোনোমতে দিন চালান মাত্র। সোনালীর কোনো শখ-সাধ মেটাবার সাধ্য তার বাবার নেই। সোনালী দেখে ক্লাসের অন্য মেয়েরা কত দামী শাড়ি-পোশাক পরে আসে। তাদের ঘিরে ফরাসী পারফিউমের সুবাস। ওদের কাছে সোনালী ম্লান, তাই সোনালীর অতৃপ্ত মন স্বপ্ন দেখে অনেক কিছু পাবার। ওদের একদিন দেখিয়ে দেবে যে সেও কোনো অংশে কম নয়। বরং তার যোগত্য অনেক বেশি।

প্রবীরের বাবা একটা ব্যাঙ্কের কেরানি। মা শিক্ষয়িত্রী। প্রবীর তাঁদের একমাত্র সন্তান। তাই প্রবীরের

জন্য মোটা হাতখরচের বরাদ্দ আছে। প্রবীর মাঝে মাঝে দমকা কিছু পায়। সোনালীকে তার স্বপ্নের কথা শোনায় প্রবীর, সে মস্ত ডিরেক্টার কাম অভিনেতা হবে। সোনালীরও গুণমুগ্ধ সে। তাকেই হিরোইন বানাবে। গোবিন্দর বাবার শ্যামবাজারের দিকে একটা চপ-কাটলেট-চা এসব বিক্রির দোকান আছে। গোবিন্দ মাঝে মাঝে বসে দোকানে, কিন্তু প্রবীরদের সঙ্গে সেও স্টুডিওতে ঘোরে চান্সের সন্ধানে। প্রবীর ঘুরে ঘুরে ক্রমশ ক্লান্ত। টালিগঞ্জের স্টুডিওর ওদিকে চায়ের দোকানে বসে প্রবীর বলে, কলকাতায় কিছুই হবে না।

সোনালীও আসে। সে-ও এর মধ্যে স্টুডিওপাড়ায় ঘুরছে। দেখেছে অনেককে, তারা চান্স দেবার নাম করে তার দিকে এগিয়ে আসে, নানা প্রলোভন দেখায়। কেউ হোটেলেও নিয়ে যেতে চায়। কিন্তু সোনালী চিনিছে ওদের, তাই প্রবীরকে বলে, সত্যি রে প্রবীর, এখানে কিছুই হবে না। মুম্বাই যেতে পারলে কিছু করা যেত।

গোবিন্দ বলে, ঠিক বলেছিস সোনালী। সেখানে অল ইন্ডিয়া মার্কেট, কত বাঙালী ডিরেক্টার, স্টার আছে। ওখানে যেতে পারলে কিছু করা যেতো রে, এখানে নো চান্স।

কথাটা ভাবছে প্রবীর। সে মনে মনে ঠিক করেছে মুম্বাই যেতেই হবে, আর তার জন্য তৈরি হতে থাকে সে।

সোনালীও ভাবছে কথাটা। গোবিন্দ বলে, তাই চল। সোনালী বলে, কিন্তু টাকার দরকার। সেখানে থাকতে হবে, ঘুরতে হবে স্টুডিওতে, তারপর চান্স।

আর প্রবীর এখনই স্বপ্ন দেখছে সে ডিরেক্টার কাম অভিনেতাই হয়েছে, গাড়ি, বাংলো হয়েছে, বড় বড় অক্ষরে তার নাম, তার ছবি ছাপা হচ্ছে। রূপালী পর্দা তাকে সারা ভারতে পরিচিত করছে।

সেই আশা, স্বপ্ন নিয়ে হিরো, হিরোইন হবার জন্যই তারা তিনজনে এসে হাজির হয়েছিল মুম্বাই-এ। কলেজের পরীক্ষাও দেয়নি। প্রবীরের বাবা ফ্ল্যাট কিনেছেন, ক'দিনের মধ্যেই বায়নার টাকা দিতে হবে, তাই ব্যাঙ্ক থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা এনে আলমারিতে রেখেছিলেন। পরদিন বাবা অফিসে গেছেন, মাও স্কুলে। প্রবীর বাবার আলমারি থেকে প্রায় তিরিশ হাজার টাকা নিয়ে বের হয়ে পড়ে। সোনালীও তার শেষ সম্বল সামান্য কিছু গহনা, আর বাবার মাইনের টাকাটা নিয়েই বের হয়। গোবিন্দ বাবার মহাজনকে দেবার জন্য হাজার চারেক টাকা রাখা ছিল, সেটা হাতিয়ে বের হয়ে পড়ে স্বপ্ননগরী মুম্বাই-এর দিকে।

প্রবীর এখনও সেই দিনগুলোর কথা ভুলতে পারে না। ভি.টি.-তে নেমেছে তিনজনে। অজানা শহর। কোথায় স্টুডিও, কোথায় ওইসব ডিরেক্টার, স্টাররা থাকে তা জানে না। এমন সময় এক ভদ্রলোক ওদের দিকে এগিয়ে আসে। অজানা শহরের মানুষদের ভাষাও অজানা। তার মাঝে একজন বঙ্গসন্তানকে দেখে তারা যেন অকূলে কূল পায়। সেই তাদের নিয়ে যায় তার বাসায়। বলে—বাঙালী ছেলে, বিদেশে হোটেলে এত খরচা করে কেন থাকবে? আমার ঘর তো খালিই পড়ে থাকে। ওখানে থাকো, ঘরভাড়া যাহয় দেবে আর স্টুডিও লাইনে আমার অনেক চেনা-জানা।

তারপর ওর কথাবার্তায় বোঝা যায় যে তাবড় ডিরেক্টার, প্রোডিউসার, বড় বড় শিল্পীরা তার খুবই চেনাজানা। প্রবীর খুশি হয়। বড় একটা বাড়ির ওদিকে একখানা ঘরে এসে ওঠে ওরা। আর সেই ভদ্রলোক নিরাপদবাবুই তাদের নিয়ে ঘোরে নানা স্টুডিওতে। ধর্মেন্দ্র, রাজেশ খান্না, সলমন খান, রাখীদের গাড়ি থেকে নামতে দেখে নিরাপদ এদের এদিকে দাঁড় করিয়ে রেখে ওদের কাছে যায়। পরে ফিরে এসে বলে,—তোমাদের দেখালাম হে, ওই যে উনি রামানন্দ সাগর, ওই তো শক্তি সামন্ত। বুঝলে প্রবীর তোমাকে ওদের কাছে নিয়ে যাবার জন্য কথাও বললাম, সামনের সপ্তাহেই নিয়ে যাব। ব্যস একটা পিকচার করতে পারলে—

ওদিকে ওদের টাকা খরচ হয়ে যাচ্ছে জলের মতো। বাড়ির কথা মনে পড়ে। প্রবীরের মনে হয়, বাবাকে ঠকিয়েছে সে, সোনালী তো অধৈর্য হয়ে ওঠে। গোবিন্দ বলে, ওই নিরাপদ আমাদের নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাচ্ছে না তো রে? টাকাও নিচ্ছে, কাজের নাম নেই।

কথাটা এবার তিনজনেই বলে নিরাপদকে। নিরাপদও বুঝেছে এরা এবার কাজ চায়। সেদিন নিরাপদ

বলে, কালই চলো, কাজের ব্যবস্থা করেই এসেছি, দেখবে নিরাপদর খেল।

পরদিন সকালে উঠে তারা নিরাপদর খেলই দেখে। নিরাপদ বেপাত্তা। আরও অবাক হয় তারা। প্রবীর চমকে ওঠে। তার সুটকেসের তালা খোলা, হাজার কুড়ির মতো টাকা ছিল, সেটা নেই। সোনালী আর্তনাদ করে, আমার গয়না, সাতশো টাকাও নেই; গোবিন্দ তার ব্যাগ হাতড়ে বলে, শালা আমার তিন হাজার টাকাও ফিনিশ করে গেছে।

অর্থাৎ নিরাপদ খেল দেখিয়ে নীরবে মুম্বাই শহরের ভিড়ে মিশে গেছে। এবার তারা বুঝতে পারে এটা নিরাপদের ঘরও নয়, লজের একটা ঘর। তাদের এক সপ্তাহের ঘরভাড়া দিয়ে তবে পথে বের হতে হবে। হাতে কিছুই নেই, শেষ সম্বল প্রবীরের গলার চেন বিক্রি করে তারা এবার জুহু বীচে এসে আশ্রয় নেয়।

এই জুহু বীচে কর্মরত প্রবীরের আজ সেই দু'বছর আগেকার অভাব-অনাহারের দিনগুলোর কথা, সোনালীর কথা মনে পড়ে। বীচে এখনও লোকজন রয়েছে। ওদিকে দু'চারজন বাঙালী ছেলে-মেয়েকেও দেখে, যেন উদ্‌ভ্রান্তের মতো ঘুরছে। একটা ছেলে জুতো পালিশের দলে বসে জুতো পালিশ করছে।

—একদম চকচকে করে দেব দাদা।

প্রবীর চাইল ওর দিকে, শুধোয়, বাঙালী?

—কলকাতা থেকে এসেছিলাম দাদা হিরো হতে। এখন বুটপালিশ মোতিলাল।

ওর কথাটা প্রবীরকে চমকে দেয়। মনে পড়ে তার নিজের কথা। সেও সব হারিয়ে পেটের জ্বালায় এই বীচে হরবোলার ডাক ডেকে দশ-বিশ টাকা রোজগার করতো, থাকতো একটা ঝুপড়িতে।

ওখানেই শেঠ রতনলাল সোনালীকে দেখে। হাওয়ায় ওর চুল উড়ছে, উদ্ধত যৌবন যেন বশ মানে না। শেঠ রতনলালের নজর যেন জহুরীর নজর। সে জানে এই মেয়েদের, তাই এগিয়ে যায় সোনালীর দিকে, মুগ্ধ দৃষ্টিতে বলে, বাঃ! ক্যা নাম তুমার? বঙ্গাল সে আয়া?

সোনালী বলে তার বিপদের কথা। হিরোইন হতে এসে অগাধ জলে পড়েছে। বাড়ি ফেরারও মুখ নেই। ওই প্রবীর ভালো ডিরেক্টার।

প্রবীরও এসে পড়ে, শেঠজী বলে, তুম ডিরেক্টার আছে?

প্রবীর দেখছে শেঠজীকে, ওদিকে তার বিদেশী গাড়ি দাঁড়িয়ে। শেঠজীকে দেখেই মনে হয়, এ যেন মা লক্ষ্মীর বরপুত্র। তাদের এই চরম দুর্দিনে এসেছে সাহায্য করতে। শেঠজী তার কার্ড দিয়ে বলে, বঙ্গাল সে বহুৎ মশুর ডিরেক্টার, কলাকার মুম্বাইয়ে আসলো। হামি পিকচার বানাবে। তোমাদের জরুর চান্স দেবে, কাল সাম কো পাঁচ বাজে অফিস মে আও, বাতচিত হোগা।

গোবিন্দ এখন ফিল্মের স্বপ্ন ছেড়ে বীচের একটা রেস্তোরাঁয় কাজ করছে। তার বাড়ি ফেরার পথ নেই। কলকাতায় বাবার রেস্তোরাঁয় চপ-কাটলেট বানানোর অভিজ্ঞতাই এখানে তার কাজে লেগেছে। দোকানে কাজ করে, দোকানেই থাকে কোনোমতে। তবু এদের কাছে আসে।

সব শুনে গোবিন্দ বলে, কে জানে, এখানে অনেকের কোটি টাকাও আছে। শেঠজী যখন বলেছে যা তোরা। তারপর ছবি যদি হয় তাহলে আমায় একটা চান্স দিস। তবু জানব মুম্বাই আসা সার্থক হলো।

প্রবীর ওই শেঠজীর অফিসেও গেছে সোনালীকে নিয়ে। বোধহয় এবার তাদের স্বপ্ন সার্থক হবে। শেঠজীর অফিসটাও দারুণভাবে সাজানো। গদিওলা চেয়ার, মেঝেতে পুরু কার্পেট, দেওয়ালে মসৃণ কাঠের প্যানেল। কয়েকজন শিল্পীর ছবিও শোভা পাচ্ছে। তাদের মধ্যে রেখা আছে। আজকের দু'এক জন অভিনেত্রীর ছবিও রয়েছে।

শেঠজী ওদের খাতির করে বসায়। এর মধ্যে দু'একজন লোকও আসে। তাদের সঙ্গে ছবির প্রোডাকশন নিয়ে আলোচনা হয়। সোনালীদের জন্য এসেছে কফি, বিস্কুট। তারপর শেঠজীই ওদের নিয়ে বের হয় স্টুডিওতে।

এখানে এর আগেও এসেছিল ওরা সেই নিরাপদবাবুর সঙ্গে। সেদিন গাছতলাতে দাঁড়িয়েছিল।

আজ শেঠজীর গাড়ি থেকে নেমে ওরা একটা ঝকঝকে অফিসে ঢোকে। এটা নাকি শেঠজীর স্টুডিওর অফিস। দু'একজন শিল্পীও আসে।

সোনালী, প্রবীর এবার স্বপ্ন দেখে তারা রূপালী পর্দায় নামার সুযোগ পেয়েছে। শেঠজী বলে, প্রোডাকশন হামি জলদি শুরু করবে প্রবীরজী। তুমি স্টোরি রেডি করো। এইসা কিশসা বানানে হোগা—যা কোই হিলানে নেহি সকেগা।

প্রবীর বলে—দারুণ স্টোরি আছে শেঠজী।

শেঠজী সোনালীকে সেদিনই একটা ভালো শাড়ি গিফ্‌ট করে। এমন শাড়ি সোনালী জীবনে পায়নি। ওই ঝুপড়িতে একটা ফেরিওয়ালা পরিবারের সঙ্গে রয়েছে, সেখানে এ শাড়ি বেমানান। সমস্যার সমাধান করে শেঠজীই। বলে, তুমি হিরোইন বনবে, তার জন্যে ট্রেনিং ভি লাগবে। স্টাইল, ম্যানারর্স ভি শিখনে হোগা, হিন্দীও শিখনে হোগা। আউর হিরোইন ঝোপড়পট্টিসে আয়া—ই খবর কিসিকো পতা লাগ যায়ে তো পিকচার ভি চৌপাট হো যায়েগা।

সোনালীও ভাবছে কথাটা । আজ তার মনে রূপালী জগতের স্বপ্ন। এর জন্য সে কলকাতায় দেবেনের কথাও শোনেনি। দেবেন ব্যাঙ্কের কর্মী, মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে। তবু সোনালীকে ঘিরেই সে স্বপ্ন দেখেছিল। ঘর বাঁধতেও চেয়েছিল। কিন্তু সোনালীর চোখে সেদিন স্টার হবার স্বপ্ন, ঘরের বাঁধন সে মানতে পারেনি। দেবেনের ভালোবাসার কোনো মর্যাদাই দেয়নি। সে ঘর ছেড়ে কাউকে কিছু না বলে মুম্বাই পাড়ি দিয়েছিল। আজ সে হিরোইন হতে চলেছে, তাই শেঠজীর কথায় বলে, তাহলে কি হবে শেঠজী?

শেঠজী ওর পিঠে পরম স্নেহভরে তার কুলোর মতো থ্যাবড়া হাত বোলাতে বোলাতে বলে, ফিকির মৎ করো। ভার্সোয়া মে হামরা এক ফ্ল্যাট খালি পড়া হ্যায়, উধারই ঠায়রনা। সমুচা এনতাজাম হামি করবে। হিন্দী, ডান্সিং, উগারা সব শিখবে।

ওই ঝোপড়পট্টির নোংরা পরিবেশ থেকে সে উঠবে সুন্দর সাজানো ফ্ল্যাটে, এবার উপরতলার মানুষদের সমাজে মিশবে, হিরোইন হবে। সোনালী এক কথাতেই রাজী হয়।

প্রবীর অবশ্য শেঠজী-সোনালীর এই সব নাটকের কথা জানতে পারে না। শেঠজী তাকে স্টোরি রেডি করতে বলে সোনালীকে নিয়ে বের হয়। হোটেল, বারে যায়। এখন সোনালীও বদলাতে শুরু করেছে। ওর ফ্ল্যাটে যাবার কথায় প্রবীর অবাক হয়, বলে সে, তুই চলে যাবি ফ্ল্যাটে?

সোনালী বলে, হ্যাঁ, এই নোংরা পরিবেশে থাকলে হিরোইনের গ্ল্যামার থাকবে না। তাছাড়া তুই তো অফিসে আসবি, দেখা হবে। ফ্ল্যাটের ঠিকানা, ফোন নাম্বারও দিচ্ছি, চলে যাবি মাঝে মাঝে।

প্রবীর বলে, এককথায় রাজী হয়ে গেলি সোনালী? একবার নিরাপদের পাল্লায় পড়ে সব হারিয়েছি, আবার এই শেঠের বাচ্চা কি করবে কে জানে?

সোনালী বলে, নারে। যেচে আসছে এই চান্স। একে ছাড়বো না। দেখবি হিরোইন হবোই, তোকেও ডিরেক্টার হতে হবে। বাই—

সোনালী এবার ঝোপড়পট্টি ছেড়ে শেঠজীর ফ্ল্যাটে চলে গেল। প্রবীরের কথায় কান দিল না। উপরে উঠতে গেলে সিঁড়ির দরকার। উঠে যাওয়ার পর আর সিঁড়ির দরকার হয় না। সেটাকে পিছনে ফেলেই এগিয়ে যায়।

সোনালী কলকাতায় দেবেনকেও ফেলে এসেছে। এখানেও এবার প্রবীরকে ফেলেই চলে গেল। একা প্রবীর এই অচেনা জগতে। গোবিন্দ বংশীলালের দোকানে কফি-পকৌড়া নিয়ে ব্যস্ত। বিকেল থেকে সে দম ফেলার অবকাশ পায় না। প্রবীর একা একা বীচের এদিক-ওদিকে ঘোরে। ঘুরতে ঘুরতে এইখানের জন, ডিসুজাদের সঙ্গে আলাপ হয় ওর।

ওরা বলে, ইয়ার, হিরো তুমকো হাম বানায়ে গা।

প্রবীর পর পর ক'দিন গেছে শেঠজীর অফিসে। সেখানের প্রোডাকশন ম্যানেজার বলে, শেঠজী নেই। দু'একবার দেখা পেলেও শেঠজী তাকে আর তেমন পাত্তাই দেয় না।

সোনালীর ফ্ল্যাটেও গেছে প্রবীর। দেখে ফ্ল্যাট তালাবন্ধ। শেঠজীর সঙ্গে সোনালী লোনাভালার বাংলোয় গেছে গল্প আলোচনার জন্য। হতাশ হয়ে ফেরে প্রবীর।

অভাব তার নিত্যসঙ্গী। কলকাতায় ফেরার মুখও নেই। শুনেছে বাবা মারা গেছেন, মা দামী ফ্ল্যাট ছেড়ে অন্যত্র চলে গেছেন। আজ প্রবীর জীবনযুদ্ধের এক পরাজিত সৈনিক। তাই এবার সে ডিসুজার কথায় বলে, তুমি হিরো বানাবে আমাকে?

হাসে ডিসুজা। বীচের ওদিকে একটা ধাবার ঠেকে ওরা বসে থাকে। সন্ধ্যার পর শুরু হয় ওদের আসল কাজ। ডিসুজা বলে, সিওর, আরে রোকড়া যার হাতে সেই হিরো। রোকড়া মিলেগা—তুম্ ভি ফ্ল্যাট মে রহেগা, আয়েশ করেগা, গাড়িমে ঘুমেগা, আও কাম করো। যোয়ান আদমী মুম্বাইমে বৈঠ্‌কে ভিখ মাঙ্গোকে ক্যা?

প্রবীর আজ জীবন সম্বন্ধে সব আশাই হারিয়েছে। তারা তিনজন এসেছিল এখানে। দুজনে যে ভাবে হোক পায়ের তলে মাটি পেয়েছে। এবার প্রবীরও টাকা উপায় করবে—অনেক টাকা। তাই সে ওই জন, ডিসুজাদের দলেই ভিড়ে যায়।

রাত গভীরে বীচ নির্জন হয়ে যায়। ওদিকে তখন অন্ধকার। ঢেউ ভাঙার শব্দ ওঠে, ট্রলার এসে থামে। ওরা সাবধানে নেমে যায়। নৌকা থেকে কার্টুড়, বড় বিদেশী প্যাকেট সব নিয়ে ওদিকে ট্রাকে তোলে। অনেক ধরনের মালই আসে।

মাল পাচারও হয়ে যায়। প্রবীর পায় অনেক টাকা। এত টাকা সে কখনও পায়নি। কোনো দিন গাড়িতে করে মুম্বাই ছাড়িয়ে চলে যায় পানডেল-খাণ্ডালার দিকে। কোনো পাহাড়-ঘেরা উপত্যকায় মাল পৌঁছে দিয়ে আসে। টাকাও পায় অনেক।

সেদিন ও আর ডিসুজা জনকে নিয়ে চলেছে পাহাড়ের পথে এক জায়গায় মাল পাচার করতে। একটা গাড়ি তাদের পিছনে আসছে। অনেক গাড়িই তাদের ওভারটেক করে চলে যায়, কিন্তু এটা যায় না। জন রিয়ার ভিউ মিররে দেখছে গাড়িটাকে। কি ইঙ্গিত করতে ডিসুজা গাড়িডসিটের নিচ থেকে রাইফেল বের করে পিছনের গাড়িটাকে লক্ষ্য করেই গুলি ছোঁড়ে। প্রবীর অবাক হয়—কি করছ?

সঙ্গে সঙ্গে পিছনের গাড়ি থেকে একটা গুলি এসে লাগে গাড়ির ছাদে। ডিসুজার গুলিতে পিছনের গাড়ির টায়ার ফেঁসেছে, বোধহয় ড্রাইভারের চোট লেগেছে। গাড়িটা গাছে গিয়ে ধাক্কা মারে। গর্জায় ডিসুজা, ব্যাটা পুলিশ, জলদি ভাগো।

প্রবীর বুঝতে পারে এদের পরিচয়। মুম্বাই-এর অন্ধকার জগতের সঙ্গে সে টাকার লোভে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছে। এরা সাপের চেয়েও বিষধর, বাঘের চেয়েও বেশি হিংস্র, রক্তলোলুপ। প্রবীর বলে, এবার কি মাল?

ডিসুজা গর্জে ওঠে—মু বন্ধ কর লে, নেহি তো তেরা ভি গোলিসে মু বন্ধ কর দেগা।

প্রবীর বুঝেছে সে নিজে চরম বিপদ ডেকে এনেছে। এদের কারবারের অনেক খবর সে জেনে গেছে, এখন ওরাও তাকে ছেড়ে যেতে দেবে না। তবু প্রবীর ওদের সেই সব জানতে না দিয়ে কাজ করে চলেছে ওদের সঙ্গে। দেখেছে লাখ লাখ টাকার কারবার করে এরা, আর এদের পিছনে রয়েছে প্রশাসনের অনেকে। খোদ মন্ত্রী, নেতারাও এদের থেকে ভালো প্রণামী পায়। তাই তাদের কারবারও ভালোই চলে।

রতনলাল শেঠের হোটেল, সিনেমা প্রোডাকশন, এক্সপোর্ট ইম্পোর্টের ব্যবসা আছে। ওগুলো সব লোক-দেখানো। তার আসল ব্যবসা এই অন্ধকারের ব্যাপারই। তাই বেশ কিছু বিদেশী বস্‌ও আসে। হোটেলে তাদের আপ্যায়ন করে শেঠজী নান উপাচারে, আর সেই আপ্যায়নে খুশী হয়ে বিদেশীরাও তাকে দরাজ হাতে বিদেশ থেকে সোনা, ড্রাগস, ইদানীং অস্ত্র, বিস্ফোরকও উপহার দেয়। সেগুলো থেকে কোটি টাকার ব্যবসা হয়, বিদেশীরাও ভাগ পায়।

সোনালী ক্রমশ দেখছে শেঠজী ছবি তৈরির গল্পই করে মাত্র। দু-চারজন পেটোয়া ডিরেক্টার, শিল্পীদের নিয়ে বৈঠকে ঢালাও হুইস্কি চলে, সোনালীও থাকে সেখানে। শুধু মদ্যপান হুল্লোড়ই হয়, আর সোনালীকে মাঝে মাঝে হোটেলে পাঠায় বিদেশীদের আপ্যায়ন করতে। অবশ্য তার জন্য ভালো টাকাও পায়

সোনালী। সে এখন এই বিচিত্র জীবনেই অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। তবু মনে হয় এর জন্যই কি সে সব ছেড়ে এখানে এসেছিল? দেখে সিনেমা হাউসের কাটআউটে কত নতুন হিরোইন আসছে, সোনালীও ওই স্বপ্ন দেখেছিল। কিন্তু এমন এক ধাপ্পাবাজের হাতে পড়েছে যে তাকে শুধু টোপ হিসাবেই ব্যবহার করে চলেছে। তবু এরই মধ্যে সোনালী সিনেমা লাইনের এক প্রযোজককে পেয়ে যায়, যে তাকে চান্স দেওয়ার আশ্বাস দেয়। সোনালী শেঠকে বলে, আমি বুঝতে পেরেছি, ছবি তুমি কোনোদিনই করবে না। আমি এবার চলে যাব ভাবছি। এখানে আর নয়।

শেঠ চমকে ওঠে। সোনালী তার বস্‌দের চেনে। পুলিশের কাছে মুখ খুললে তার বিপদ হবে। তাই বলে, আরে পিকচার জরুর বানাবে হাম।

সোনালী বুঝেছে সোজা কথায় ও তাকে যেতে দেবে না। পালাতেই হবে এই নরক থেকে। তাই ভাবছে সে।

শেঠজী শুনেছে জন, ডিসুজার কাছে নতুন ছেলেটার কথা। প্রবীরের হিম্মৎ আছে, সে তাদের কারবার ভালোই রপ্ত করেছে। শেঠজীও বুঝেছে ওই ছেলেটাকে সে এবার আসল কাজেই পাবে। তাই তাকে দেখতে চায়। ডিসুজা বলে, হামি ওকে এখনে পাঠিয়ে দেব বস্‌।

দু'বছর পার হয়ে গেছে। প্রবীর, সোনালী, গোবিন্দ কলকাতা থেকে নিরুদ্দেশ হয়ে যাবার পর গঙ্গা দিয়ে অনেক জল বয়ে গেছে। প্রবীরের বাবা মারা গেছেন, গোবিন্দের বাবা তবু খুশি। ছেলে মুম্বাই গিয়ে বীচে দোকান দিয়ে ভালো রোজগার করছে। সোনালীর বাবা মা মেয়ের খোঁজও পাননি। একজন তবু ভোলেনি সোনালীকে, সে দেবেন। এখন ব্যাঙ্কের অফিসার হয়েছে সে, সোনালীর খোঁজও করে এখনও। প্রমোশন পেয়ে সে মুম্বাই-এ পোস্টিং পেতে খুশিই হয়। সেখানে থেকেই সোনালীর খোঁজ করবে সে। তার শূন্যঘর পূর্ণ হবে।

দেবেন মুম্বাই-এ এসে স্টুডিওপাড়া, বীচের এদিক ওদিকে খোঁজে। সোনালীকে পায় না। দেখে সোনালী, প্রবীরদের মতো অনেককে যারা স্টার হবার স্বপ্ন নিয়ে এই শহরে এসে এখন হকারি, না হয় কোনো সাধারণ কাজ করে দিনযাপন করে। হিরো হতে এসে তারা জিরো হয়ে ঘুরছে পথে পথে অনাহারক্লিষ্ট মুখ নিয়ে।

প্রবীরকে ডিসুজা বলে, অব তু সচমুচ হিরো বনেগা। বস্‌ তুঝে বুলায়া। প্রবীরের মনে বিদ্রোহ দানা বেঁধে উঠেছে। পুলিশের খাতাতেও এখন তার নাম উঠেছে। নিজের হাতে সেও গুলি চালিয়েছে একাধিকবার, আত্মরক্ষার জন্য কাউকে মারতেও হয়েছে। হিরো হতে এসে সে পা পিছলে অন্ধকার জগতের পথে গিয়ে হাজির হয়েছে, ফেরার পথ আর নেই।

গোবিন্দকে দেখে তার হিংসা হয়। গোবিন্দ এখন সেই দোকানের মালিকের মেয়েকে বিয়ে করে আর একটা দোকান দিয়েছে। তার স্ত্রী শুভলক্ষ্মীকেও দেখেছে প্রবীর। শান্ত মেয়েটিও দোকানে বসে। মুম্বাই এসে গোবিন্দ সুখেই আছে।

প্রবীর হারিয়ে গেছে। সোনালীর সঙ্গেও মাঝে মাঝে দেখা হয় কোনো হোটেলে। সোনালী এখন অন্য জগতের বাসিন্দা। দামী গাড়ি—টাকা—পোশাক সবই আছে তার। কিন্তু সোনালী বলে, কেন এলাম এখানে, ফিরেই যাবো কলকাতায়।

তার মনে পড়ে কলকাতার সেই শান্ত জীবন। মনে পড়ে দেবেনকে। তার ভালোবাসার কোনো দামই দেয়নি সোনালী। আজ তার জন্যই মনে হাহাকার জাগে। সোনালী ঠিক করেছে এই নরকের জীবনে আর নয়, সে ফিরে যাবে তার নিজের জগতে।

শেঠজী সেদিন সোনালীকে বের হতে দেখে বাধা দেয়। কোথায় চললে?

সোনালী আজ স্পষ্ট সুরেই জানায়, আমি কলকাতায় ফিরে যাবো। এখানে আর নয়। তোমার ধাপ্পা এবার বুঝেছি। তুমি একটা শয়তান, স্মাগলার। সেই অন্ধকারের নরকে পা দিতে আর রাজী নই। আমি চলেই যাবো।

—খবরদার! ই সব মতলব ছোড় দো সোনালী। শেঠজী বাধা দেয় ওকে।

কিন্তু সোনালী আজ মরিয়া, সে চলে যাবেই। তাই তাকে শেষ করার জন্যই রিভলবার বের করেছে রতনলাল শেঠ। এমন দু'চারটে বিদ্রোহীকে শেষ করেছে সে আগেও। তাদের লাশ কেউ কোনোদিন খুঁজে পায়নি। পাবেও না। শেঠজীর দল তাদের দুনিয়া থেকে নীরবে সরিয়ে দিয়েছে। সোনালীকেও সে দেবে শেষ করে। কিন্তু পারে না। এই সময়ই বসের সঙ্গে দেখা করতে আসে প্রবীর। আর প্রবীর ওই শেঠজীকে দেখে চমকে ওঠে। বাইরে ব্যবসাদার, প্রযোজক সাজা লোকটাই যে মুম্বাই-এর স্মাগলারদের পাণ্ডা তা জানতো না। শুধু তাকেই নয়, সোনালীকেও ওই শেঠজী সর্বস্বান্ত করে অন্ধকারের জীবে পরিণত করেছে।

সোনালী প্রবীরকে দেখে আর্তনাদ করে ওঠে, বাঁচাও প্রবীর এই শয়তানের হাত থেকে। প্রবীরও বুঝেছে সোনালীর বিপদের কথা। সে আজ মুক্তি পেতে চায় এই জগৎ থেকে, তাই ওই শেঠজীর উপরই ঝাঁপিয়ে পড়ে। অতর্কিত আক্রমণে শেঠজী ছিটকে পড়ে আর তার রিভলবার ছিটকে পড়ে ওদিকে।

এই অবসরে সোনালীও বের হয়ে লিফট দিয়ে নেমে পড়ে পথে। শেঠজীর শিকার হাতছাড়া হয়ে গেছে। সমূহ বিপদ তার। সেও মুক্ত হতে চেষ্টা করে, একটা ফুলদানী তার পায়ে লেগে সশব্দে ছিটকে পড়ে। ওই শব্দে এসে পড়েছে ডিসুজা আর শেঠজীর এক অনুচর। প্রবীর তখন রিভলবারটা হাতে পেয়ে শেঠজীকেই শেষ করতে যাবে, তার আগে ডিসুজার গুলি লাগে প্রবীরের বুকে। ছিটকে পড়ে সে।

অন্ধকার মুছে ভোর হচ্ছে, পথ দিয়ে ছুটছে সোনালী। বীচের দিকে চলেছে ভ্রমণার্থীর দল। দেবেনও যাচ্ছিল। হঠাৎ কুয়াশার মধ্যে থেকে সোনালীকে ব্যাকুলভাবে ছুটে আসতে দেখে চাইল। দেবেন এগিয়ে আসে, সোনালী।

সোনালী চমকে চাইল—দেবেন, দেবু!

কত দিন পর আবার সোনালী পায়ের নীচে মাটি পেয়েছে। বঞ্চিত জীবনে পেয়েছে একটু আশ্রয়, নতুন ঠিকানা।

বীচের ওদিকে পুলিশ হেপাজতে চিতাটা জ্বলে ওঠে। গোবিন্দ দেখছে প্রবীরের মৃতদেহ। এমন অনেক ডেডবডিই আসে এখানে, পুড়ে ছাই হয়ে যায়। গোবিন্দ পুলিশের ভয়ে আজ প্রবীরের কাছেও যায় না।

আরব সমুদ্রের তীরে অজানা অচেনা একটা মৃতদেহ পুড়ে শেষ হয়ে গেল, কেউ তার খবরও রাখল না। তবু বীচে, স্টুডিওর আশেপাশে হবু হিরো-হিরোইনদের ভিড় কমে না। স্বপ্ন নিয়ে অনেকে আসে হিরো হতে, তাদের অনেকেরই শেষ পরিণতি ঘটে এমনি শূন্যতার মাঝেই। আরব সমুদ্রের ঢেউ প্রবীরের ছাইটুকু মহাসাগরে ভাসিয়ে নিয়ে গেল।

আশা নিরাশা

বিজয় মিত্রের সময়টা কিছুদিন ধরে ভালো যাচ্ছে না। অবশ্য যাবার কথা নয়। গ্রহ-নক্ষত্র-দামি রত্নে তার বিশ্বাস নেই। তবে সে বিশ্বাস করে তার ভাগ্যকে। ভাগ্য সহায় না থাকলে কোনও বড় কাজ হয় না। সেই বড় কিছু করার চেষ্টা থেকে বিরত থাকতে সে চায় না।

বিজয়ের পৈতৃক একটা ছোট ব্যবসা ছিল। ওর বাবা মৃত্যুঞ্জয় মিত্র মৃত্যুকে অবশ্য জয় করতে পারেনি। তিনি আজ বেঁচে নেই। তবে মরার আগেই খেটে খুটে আর কিছু টাকা সংগ্রহ করে তিন চারখানা লরি কিনে ছোটখাটো ট্রান্সপোর্টের ব্যবসা শুরু করে সেই ব্যবসাকে কিছুটা বাড়িয়েছিলেন। নিজের ছাড়া আরও কয়েকজন মালিকের লরি এনে একটা গুদাম আর তার সঙ্গে সঙ্গে ছোট খাটো ঘরে অফিস করে ট্রান্সপোর্ট কোম্পানি চালাতেন। বিজয় গ্র্যাজুয়েট হয়েছে। তার আসা সে এম. এ করে অধ্যাপকই হবে। শান্তির চাকরি। নিজেকেও পড়াশোনার মধ্যে রাখতে পারবে। বাবার ওই ট্রান্সপোর্টের ব্যবসাতে ঝামেলা আছে, পুলিশের হুজ্জুতি তো লেগেই আছে। তাদের পছন্দমতো প্রণামী না পেলেই কখনও ওভার লোডিং-কখনও অন্য কোনও আইনভঙ্গের কেস দেবে। দৌড়োও থানা-আদালত। এছাড়াও ড্রাইভার খালাসিদের সমস্যা আছে। রাস্তায় গাড়ি খারাপ হয়ে গেলে দৌড়োও, রিপেয়ারিং কর, অন্য গাড়ি পাঠাও। গাড়ি মাল নিয়ে দেরিতে পৌঁছোলে পার্টির সঙ্গে গোলমাল।

মৃত্যুঞ্জয় বোঝান বিজয়কে। নিজের হাতে গড়েছি এই কোম্পানি। এখন কোম্পানির নামে লোন পাওয়া যাবে। তুই নতুন গাড়ি কেন। ব্যবসা বাড়া। এতেই তো সব হয়েছে। এই ব্যবসা ছাড়িস না। দেখবি ব্যবসা বাণিজ্য যত বাড়বে, এই ব্যবসাও ততই বাড়বে। আর চাকরি করে কী হবে? কত টাকা পাবি? বিজয় অবশ্য এসব কথা ভাবার সময়ও পায়নি। মা আগেই মারা গেছেন। বাবাও একরাতে খাওয়ার পর সেই শুলেন আর ঘুম ভাঙেনি।

বিজয় ভাবতে পারেনি তার বাবা হঠাৎ এভাবে তার ঘাড়ে সব ফেলে দিয়ে চলে যাবেন। ভেবেছিল এক, আর হল এক। শেষ পর্যন্ত বাবার ব্যবসাতেই আসতে বাধ্য হল। কারণ ব্যবসার পাওনা টাকা-ব্যবসা বন্ধ হয়ে গেলে আর আসবে না। পাওনাদাররা হাত গুটিয়ে নেবে। আর এত গাড়ি চলছে। তার মধ্যে নতুন তিন চারখানা গাড়ির কিস্তিও দিতে হবে ব্যাংককে। বাবা বলতেন, আমার কিছু হয়ে গেলে এই ব্যবসাকে বাঁচিয়ে রাখবি বিজয়। আমার রক্তজল করা পরিশ্রমে গড়ে তোলা এই ব্যবসা যেন উঠে না যায়। বহু লোকের রুজিরুটি হয় এর থেকে। তোরও ভালোভাবে দিন চলে যাবে এর থেকেই।

বিজয় ট্রান্সপোর্ট ব্যবসাতে নেমে পড়ল, মাঝে মাঝে দু'একটা রুটে তার মাল বোঝাই গাড়ি লুট হয়ে যায়। এক ড্রাইভার বলে—এসব কেউ ইচ্ছা করেই করে সাবজি। আমাদের কোম্পানিকে বিপদে ফেলার জন্য।

বিজয় চটে ওঠে। এমনিতে সে পড়াশোনার সাতে সাথে ক্যারাটে বক্সিং প্র্যাকটিস করে। এমনকি সে রাইফেল ক্লাবের নামী শ্যুটার। প্রাইজও পেয়েছে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায়। দু'একবার তার মাল লুট হতে বিজয় বলে—তাদের ধরতেই হবে। নজর রাখো। কোনও খবর পেলে আমাকে জানাবে।

ড্রাইভাররা নজর রাখে। এই এলাকার গুণ্ডাদের অনেককে তারা চেনে। অন্য কোনও ট্রান্সপোর্ট কোম্পানিও এমনি লোকদের পোষে। তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী কোম্পানিকে ঘা দেবার জন্য। ড্রাইভার সিংজি

এদের পুরনো লোক। সেও বিজয়কে ভালোবাসে। তার কোম্পানিকে বাঁচাতে চায়। কারণ বিজয় স্টাফদের ঠিকঠাক মাইনে, বোনাস দেয়। তাদের ভালোমন্দের খবর নেয়। এক ড্রাইভার অসুস্থ হয়েছেন। মালদহের হাসপাতালে ভর্তি আছে। বিজয় নিজে মালদহ হাসপাতালে গিয়ে তাকে দেখে আসে। তার চিকিৎসার সব খরচ দেয়। তার পরিবারকেও টাকা দিয়ে আসে।

তার এই রকম ব্যবহারে ড্রাইভার-খালাসিরাও খুশি। বিজয় তাদের সঙ্গে দোলের দিন রং খেলে। স্টাফদের সঙ্গে তার সম্পর্ক ভালোই। সিংজি সেদিন ওই লোকগুলোকে তাদের গুদামের আশেপাশে ঘুরতে দেখে। তার সন্দেহ হয়। বিজয়কে বলে। বিজয়ও সব শুনে বল্লে, সিংজি, তোমার গাড়ির পিছনে আমিও গাড়ি নিয়ে যাব ওইদিন। কারা এসব করছে জানা দরকার। তাদের শিক্ষা দেওয়া দরকার।

বিজয় তার জিম ক্লাবের দুচারজন মেম্বারকেও এই অভিযানের কথা বলে। তার মধ্যে হরিশ-গোপাল নামী কুস্তিগির। আর বাদলও বক্সিং চ্যাম্পিয়ন। তার পাঞ্চের জোরও দারুণ। আর গায়ে শক্তিও। বাদল বলে, চলতো, ওই পেশাদার মস্তানগুলোকে একটু শিক্ষা দিতে হবে।

বিজয়ের মাল বোঝাই ট্রাক চলেছে রাতের অন্ধকারে হাইওয়ে দিয়ে। হাইওয়ে এখন অনেক ফাঁকা। রাতে নির্জন পথে ছুটে চলেছে দুচারটে দূর পাল্লার ট্রাক, বাস। দুদিকে দিগন্ত প্রসারী মাঠ। গ্রাম এখান থেকে অনেক দূরে।

ড্রাইভার সিংজি গাড়ি চালাচ্ছে। হঠাৎ দেখে পথের উপর একটা গাড়ি আড়াআড়ি পথ আটকে দাঁড়িয়ে আছে। পুলিশও দাঁড়িয়ে আছে ওই ট্রাকটার পাশে। যেন হাইওয়ে দিয়ে কোনও গাড়ি পালাচ্ছে, তাকে ধরার জন্যই ওরা পথ আটকে রয়েছে। সিংজি হর্ন দিচ্ছে দূর থেকে। তবু গাড়িটা ওরা সরায় না। সিংজি ব্রেক কষে গাড়িটা থামাতেই ওই পুলিশের পোশাক পরা লোকগুলোই তার গাড়িতে উঠে দড়ি কেটে মাল নামাতে থাকে। ওদের দু'জন ভোজালি বের করে সিংজি আর খালাসিকে আটকে দিয়েছে। চিৎকার করলে গলা নামিয়ে দেব। একদম চুপ।

সিংজিও বুঝেছে ওরা পুলিশ নয়। পুলিশের চোখে ধুলো দেবার জন্যই পুলিশের ইউনিফর্ম পরে ট্রাকে ডাকাতি করছে। পুলিশের ট্রাকটা পাশে এনে এই ট্রাক থেকে দামি মালপত্র তুলছে ওই ট্রাকে।

হঠাৎ আর একটা ট্রাক এসে কখন থেমেছে পিছনে, ওরা কেউ খেয়াল করেনি। সেই গাড়ি থেকে নামছে বিজয় তার দলবল। একটা লোক বন্দুক হাতে ওদিকে পাহারা দিচ্ছিল। অন্যরা এগাড়ি থেকে ওগাড়িতে মাল তুলছে। আর দুজন দাঁড়িয়ে আছে ভোজালি হাতে খালাসি-ড্রাইভারকে আটকে। বিজয়ের এক সঙ্গী গোপাল গিয়ে একটা রডের প্রচণ্ড আঘাত করতে ওর হাত থেকে ভোজালি পড়ে যায়। একজনের ডানহাত ভেঙে যায় রডের আঘাতে। বিজয়, অন্যান্যরা ট্রাকে উঠে বাকি লোকগুলোকে মারতে থাকে। মার খেয়ে লোকগুলো ছিটকে পড়েছে রাস্তায়।

লুটেরা গাড়ির ড্রাইভার ছিল গাড়ির ভিতরই। হঠাৎ লুটেরা বাহিনীর উপর এই অতর্কিত আক্রমণ আর বেধড়ক মারতে দেখে সে অন্ধকারেই কোনওমতে গাড়ি ফেলে পালায়।

এর মধ্যে হাইওয়েতে ডাকাতির খবরও ছিড়িয়ে পড়ে। পিছনের গাড়ি-ট্রাকও সব থেমে রয়েছে। পুলিশের হাইওয়ে পেট্রোল ভ্যানগুলি এসে পড়েছে। বিজয়ই বলে, দেখুন, ট্রাকে ডাকাতি করছে—

পুলিশ ওই দলবলকে অ্যারেস্ট করে। ওরা নাকি প্রায়ই এই রাস্তার উপর ডাকাতি করে। বিজয় বলে, কেউ ওদের আমার ট্রাকের উপর হামলা করার জন্য নির্দেশ দিয়েছে। ওদের চাপ দিয়ে সেই খবরটা বের করুন। পুলিশ অফিসার বলে, এদের আমরাও খুঁজছি অনেকদিন ধরে। হাতে পাইনি। আপনাদের জন্যই আজ ধরতে পারলাম। এবার সব খবরই বের করব। আপনাকেও একটু থানায় যেতে হবে। একটা এফ আই আর করতে হবে। বিজয় বলে—নিশ্চয়ই যাব। ওদের সব খবর আমার চাই।

সত্যিই বিপদে পড়েছে বীরভদ্র পাল। বীরভদ্রর ব্যবসা আছে। কলকাতার বড়বাজারে দোকান-অফিস। বেশ কয়েকটা কোম্পানির সেলিং এজেন্ট সে। আর একটা ট্রান্সপোর্ট কোম্পানির পার্টনার। অবশ্য বীরভদ্র ট্রান্সপোর্ট কোম্পানির অফিসে কমই আসে। অফিসে বসেই ট্রান্সপোর্ট-কোম্পানির খবরাখবর রাখে, কাজকর্ম চালায়। বিজয়ের ট্রান্সপোর্ট কোম্পানির ট্রাক অনেক দামি মাল নিয়ে যায় উত্তরবঙ্গ-অসম-মেঘালয়ের দিকে।

বীরভদ্রের কাছে খবর যায় বিজয়ের ট্রান্সপোর্ট কোম্পানির কোন ট্রাকে কী মালপত্র যাচ্ছে। লুটেরা দলের সঙ্গে যোগাযোগ করে। খবর দেয়। ভালো টাকাও দেয়। তারপরই রাতের অন্ধকারে নির্জন পথে সেইসব ট্রাকের মাল লুট হয়ে যায়। আর সেই লুটের মাল চলে আসে বীরভদ্রর গুদামে। বীরভদ্রও সেইসব মাল বিক্রি করে লাখ টাকা রোজগার করে। তার কোম্পানির ট্রাকের মাল ঠিকমতো পৌঁছায় পার্টির কাছে। অথচ বিজয়ের ট্রাকে মাঝে মাঝেই হামলা হয়। বিজয় দেখে অনেক কোম্পানিই তাদের মাল দেয় না। বিজয়ের লোকও খবর আনে।

—স্যার, আমাদের ট্রান্সপোর্টে মাল না দিয়ে অনেক কোম্পানিই এবার অন্য ট্রান্সপোর্টে মাল দিচ্ছে। বিশেষ করে ন্যাশনাল ট্রান্সপোর্টই সব মাল পাচ্ছে।

বিজয়ের ম্যানেজার ভুবন খুবই করিতকর্মা লোক। তার বুদ্ধি সাহস আর ধৈর্য আছে। ভুবন বলে, ওটা বীরভদ্রর কোম্পানি।

বীরভদ্রকে চেনে ভুবন। তার সঙ্গে ভুবন কিছুদিন কাজ করেছে। লোকটার অন্ধকার জগতের সঙ্গে চেনাজানা। ভুবন সেই জগতের কিছু লোকদের ওর এখানে আসা যাওয়া করতেও দেখেছে। তারা বেআইনি মালও পাচার করে ওদের ট্রাকে। আরও অনেক কিছুই করে। তাই ভুবন বলে, ওতো ডেঞ্জারাস লোক স্যার! আমার মনে হয় আমাদের বিজনেস ডাউন করার জন্যই ওই গ্যাংটাকে দিয়ে এসব করায়।

বিজয়ও খাতাপত্রে দেখছে লুটপাট হওয়ার জন্য তাদের কোম্পানির অনেক টাকা লোকসান হয়েছে। আর এই লোকসানের জন্য কোম্পানির অবস্থাও খুব খারাপ হয়ে গেছে। এইভাবে চললে কোম্পানি তুলেই দিতে হবে।

বিজয়ের মনে পড়ে বাবার কথা। বাবা বলতেন, এই কোম্পানিকে বাঁচিয়ে রাখবি। বিজয়ও বাবাকে কথা দিয়েছিল। সৎভাবে সে ব্যবসা করছে। এখন তার নিজের ঘর সংসার হয়েছে। তার স্ত্রী প্রমীলা আর একটি ছেলে জয়কে নিয়ে তার সুখী সংসার। বিজয় তার কোম্পানির আয় একাই ভোগ করেনি। যা জোগাড় হয়েছে তা থেকে কোম্পানির ফান্ডে কিছু রেখেছে। আর বাকিটা সে স্টাফদের দিয়ে দেয়। তাই তার কর্মচারীরাও খুশি।

ভুবন বলে, আমার মনে হয় এসবের মূলে ওই বীরবাবুই। আমাদের এই বিপদে ওরই লাভ হচ্ছে।

বিজয়ও শুনেছে কথাটা। সেও সৎ নিষ্ঠাবান আর সাহসী তরুণ। যদি ব্যাপারটা সত্যি হয় সেও বীরভদ্রকে ছেড়ে দেবে না। তবে ব্যাপারটা সত্যি কি না তাই জানা দরকার। সঠিক না জেনে কারও বিরুদ্ধে কিছু করতে চায় না বিজয়। তাই তাকে এসব খবরই নিতে হবে।

যে লোকগুলোকে সেদিন পুলিশ লুট করার দায়ে অ্যারেস্ট করেছিল, তারা জামিনে ছাড়া পেয়ে গেছে। পুলিশের কাছ থেকে তাদের ঠিকানাও পেয়েছে বিজয়। তাদের দু'একজনের সঙ্গে বিজয় নিজেই যোগাযোগ করে। ওদের সবাই থাকে বস্তির পরিবেশে। এত করেও সুস্থভাবে বাঁচার উপায়ও তাদের নেই। ওইসব লুটপাটের কাজও বন্ধ হয়ে গেছে পুলিশের জন্য। ওদের অভাব বেড়েছে। কাজও নেই। বিজয় ভুবনকেই বলে ওই লোকগুলোকে তার কাছে নিয়ে আসতে। ভুবন করিতকর্মা লোক। সেও এবার কী ভেবে বিজয়ের এই কাজকে সমর্থন করে। আর নিজে যাতায়াত করে এই দলের বেশ কয়েকজনকে নিয়ে আসে বিজয়ের গুদামে। তাদের শিখিয়ে পড়িয়ে এনেছিল ভুবন। বিজয় তাদের কিছু টাকা দেয়। তারাও এই বিপদের সময় বেশ কিছু টাকা পেয়ে খুশিই হয়।

বিজয় বলে, আমি তোমাদের কাজ দেব। টাকাও দেব।

বিজয়ের একটা কারখানা আছে হাওড়ার দিকে। সেখানে শাবল-কোদাল-গাঁইতি-বেলচা এসব তৈরি হয়। গ্রামীণ অঞ্চলে এর বাজারও ভালোই। লোকগুলোকে ওখানেই কাজ দেয় বিজয়।

ওরাই এবার বলে, ওসব কাজ করতে হত টাকার জন্য। ওই বীরভদ্রবাবুই রাতের অন্ধকারে বিশেষ গাড়ির নম্বর দিতেন, আমরা সেসব ট্রাকের মাল লুট করতাম।

বিজয় এবার ঘোড়ার মুখ থেকেই রেসের খবর পেয়েছে। ভুবনও রয়েছে। ভুবন চতুর লোক। সে ওই ডাকাতের দলকে এনেছে অন্ধকারে কাজ করবার জন্যই। তবে ভুবনেরও কিছু লাভ থাকবে।

বিজয় এতবড় খবরটা শোনে মাত্র। বীরভদ্রর ওপর ভুবনের রাগ আছে। কারণ বীরভদ্রর ওখানে কাজ করার সময় ভুবন বীরভদ্রের ওই অন্ধকারের মালেরও কিছুটা পেত। অবশ্য বীরভদ্র তা টেরও পেত না। তবে সেই খবর জানতে বীরভদ্ররও দেরি হয়নি। ভুবনের এই চিটিং বাজির, বাটপাড়ির খবরটা জানতে পেরে ভুবনকে আর তার কোম্পানিতে রাখেনি বীরভদ্র। যা তা বলে তাড়িয়ে দেয় ওকে। সেই মাসের মাইনেও দেয়নি তাকে।

ভুবনও সেই অপমানের কথাটা ভোলেনি। তাই সেও চেয়েছিল বিজয় এবার জবাব দিক বীরভদ্রকে। কিন্তু বিজয়কে চুপচাপ থাকতে দেখে হতাশ হয়েছিল ভুবন।

বিজয়ের ট্রাক লুট এখন বন্ধ হয়েছে। পুলিশ কয়েকজনকে শাস্তি দিয়েছে। বাকিদের বিজয় তার কারখানাতে চাকরি দিয়ে ওই দলও ভেঙেছে। ফলে বিজয় এখন শান্তিতে ব্যবসা করছে। এতেই সে খুশি।

বিজয়ের স্ত্রী প্রমীলাও শান্ত ধরনের মহিলা। অন্যান্য মেয়েদের মতো তার চাওয়ার মাত্রাটা মোটেই বেশি নয়। সামান্য নিয়েই সে খুশি। বিজয় যে তার স্টাফদের একটু বেশি টাকা দেয়, অনেক গরিব-দুঃস্থকে সাহায্য করে, এতে বাধা দেয় না প্রমীলা। তাদের একমাত্র ছেলে জয়কে নিয়ে প্রমীলাও বেশ সুখেই আছে।

সেবার ওদের বিবাহ বার্ষিকীতে বিজয় প্রমীলাকে বলে, এবার একটা নেকলেস দেব তোমাকে।

প্রমীলা বলে—ওসব কিছুর আমার দরকার নেই। তুমি বরং ওই টাকায় গরিব ছাত্র-ছাত্রীদের কিছু বই দেওয়ার ব্যবস্থা কর। কথাটা বিজয়ও ভেবেছিল।

কিন্তু স্ত্রীকেও কিছু দিতে চায় সে। তাই ওই সাহায্যের কাজ আপাতত বন্ধ রেখে সে নেকলেসই কেনার মনস্থ করে। কিন্তু প্রমীলা নিষেধ করতে খুশিই হয় বিজয়। বলে, সত্যি প্রমীলা, তুমি যে এই কথা বললে, তাতে আমি খুশিই হয়েছি। ওদের ব্যবস্থা হয়ে যাবে। তোমাকেও এটা নিতে হবে।

ওদের শান্তির সংসারে প্রমীলা যেন সেই শান্তির রক্ষক।

প্রমীলা সামান্য নিয়েই খুশি থাকতে চায়। বেশি লোভ তার নেই। সেইজন্য বিজয়ও বেশ কিছুটা শান্তিতে আছে।

কিন্তু এই সংসারে বেশ কিছু লোক আছে যারা নিজেদের লোভ লালসা চরিতার্থ করার জন্য এমন কিছু কাজ করে যাতে অন্যের শান্তিও বিঘ্নিত হয়।

বীরভদ্র আবার অন্যদলকে নিয়েই রাতের অন্ধকারে লুটপাটের কাজে নেমেছে। তার রাগ ছিল বিজয়ের ওপর। ভুবনের ওপরও। এতদিন তার ব্যবসা বন্ধ ছিল ওই দুজনের জন্য। এবার বিজয়ের ট্রাক সমেতই মাল উধাও হয়ে গেছে। ট্রাক চলে যেতে বিজয়ও ভেঙে পড়ে। ভুবনও খবর আনে। সেই বলে বিজয়কে, ওই বীরভদ্রই আবার নতুন দল গড়ে এইসব কাজ শুরু করেছে। আমাদের কাজ কারবার কি তুলে দিতে হবে? এতগুলো লোক করে খাচ্ছে, তারাই বা যাবে কোথায়?

বিজয় ভাবছে কথাটা। তারও মনে হয় বীরভদ্রর এই নোংরামির জবাব দিতেই হবে।

বিজয়ও মনস্থির করে ফেলেছে। ভুবন বলে, এবার তাহলে ওই বীরভদ্রের ট্রাকেই ডাকাতি করি। ব্যাটা বুঝুক, ইট মারলে পাটকেলটা খেতে হয়।

বিজয় এতদিন সৎভাবে থেকে ব্যবসা করতে চেয়েছিল। কিন্তু দেখেছে এটা যেন ভালো মানুষদের পৃথিবী নয় এখানে বাঁচতে গেলে নখদন্ত বের করে আক্রমণ করতে হবে। দরকার হলে লুটপাট করতে হবে। বে আইনি কাজও করতে হবে। নাহলে বাঁচাই যাবে না। তাই বিজয় বলে, তাই কর ভুবন। বীরভদ্রকে শিক্ষা দিতেই হবে। কারখানার ওই দলটাকেও কাজে লাগাও।

ভুবনও তাই চায়। অন্ধকারের আমদানির সঠিক হিসাব কেউ রাখতে পারে না। ভুবনেরও ভালোই আমদানি হবে। সেও চায় বিজয়ের মতো বুদ্ধিমান, ঠান্ডা মাথার সাহসী, করিতকর্মা লোক এই অন্ধকারের পথে নামুক। তাতে তারই লাভ হবে। তাই ভুবনও উৎসাহ দিয়ে বলে, আপনি ভাববেন না।

বীরভদ্রর ট্রান্সপোর্টের বেশ কিছু খবর পাবার ব্যবস্থাও করছে ভুবন। তাদের কারখানার মদন-পতিত-ন্যাপা-ইয়াসিনদের ভুবন জানায়, তাদের আবার অপারেশনে নামতে হবে। মদন-ইয়াসিন এতদিন রাতের অন্ধকারের কাজই করেছে। বাধ্য হয়ে কারখানায় কাজ করেছে। তাতে তাদের মন ভরে না। হাত পা নিস্‌পিস্ করে। ভুবনের কথা শুনে তারাও খুশি হয়। বাঘ যেন রক্তের স্বাদ পেয়েছে। তাই এবার ওরাও বলে, আপনি কিছু ভাববেন না স্যার, শুধু সব খবর আমাদের দিয়ে দেবেন, আর ট্রাকের ব্যবস্থা করবেন। বাকি কাজ আমরাই করে দেব। বীরভদ্রকে জবাব দিতে হবে।

ভুবনও এর মধ্যে বেশ কিছু খবর পেয়েছে বীরভদ্রের ট্রাকের মালের ব্যাপারে। যারা এমন চোরাই মাল কিনে নেয়, ভালো দামও নেয়, ভুবন তাদের সঙ্গেও যোগাযোগ করে। আর তারা পুরো দামে বিক্রি করে ভালো লাভও করে।

বীরভদ্র এতদিনে অনেকের মাল লুট করেছে। এবার তার দুট্রাক ভর্তি দামি মাল লুট হয়ে যায় রাতের অন্ধকারে। ভুবনের নির্দেশে ওই মাল তাদের কোম্পানির গুদামে চলে যায়।

সকালে খবরটা কাগজেও ছাপা হয়। কয়েকলাখ টাকার মাল লুট হয়ে গেছে। আর বিজয়ও খুশি হয়। ভুবন এসেছে নিরীহ নিপাট ভালো মানুষের মতো। টাকার ব্যাগটা এগিয়ে দেয় বিজয়ের দিকে। বলে, এতে পাঁচলাখ টাকা আছে। পরশু রাতেই বীরভদ্রের দু'ট্রাক মাল লুট হয়ে গেছে। এই তার দাম। পাঁচ লাখ মতো আছে খরচা টরচা মিটিয়ে।

বিজয় বলে, সাবাস! ব্যাটারা টের পায়নি তো?

ভুবন বলে, না-না, কাক পক্ষীতেও জানতে পারেনি।

ভুবন অবশ্য আগেই লাখ খানেক টাকা সরিয়েছে।

বিজয়বাবুও কিছু টাকা বের করে বলে, এই দশহাজার তুমি রাখো। আর এই কুড়ি হাজার ওদের মধ্যে ভাগ করে দিও।

ভুবন ওর অন্ধকারের লোকদের যা দেবার আগেই দিয়েছে। তবু এ টাকাও তার হাতেই আসবেই। তাই খুশিই হয়। বলে সে, তাই দেব স্যার। আরও খবর আছে। আজ ওর ট্রাকে দামি মাল যাবে ওড়িশার দিকে। ওটাও সাফ করে দেব।

বিজয়ের তখন যেন ঘা দেবার নেশাতেই পেয়ে বসেছে। তাছাড়া এত সহজে এত টাকা আসবে তা ভাবেনি। তারা অনেক খেটে ব্যবসা করে রোজগার করে। শুধুমাত্র লোক লাগিয়ে কাজ করিয়ে একরাতে পাঁচলাখ টাকা-এ যেন ছিল কল্পনাতীত। বিজয় বলে—তাই করো। তবে খুব সাবধান। যেন পুলিশ বা অন্য কেউ টের না পায়।

ভুবন বলে, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। কেউ টের পাবে না। ঠিকমতো কাজ শেষ হলে মায়ের দয়ায় লাখ পাঁচেক টাকা আবার পাবেন।

বিজয় দেখেছে একমাসের মধ্যে তিন-চারবার রাতের অন্ধকারে তার দলবলকে কাজে লাগিয়ে সে যে টাকা পেয়েছে তা কম নয়। আর সবচেয়ে বড় কাজ হয়েছে, বিজয়ের মনে এসেছে একটা প্রতিবাদের সুর। এতদিন সে নীরবেই অনেক আঘাত সহ্য করেছে। ব্যবসা তুলে দেবার কথা ভেবেছে। ঋণের দায়েও জড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু এই অন্ধকারের ব্যবসাতে বেশ কিছু টাকা কামিয়ে সে সব

দেনাও শোধ করেছে। আর নতুন উদ্যোগে ওই ট্রান্সপোর্ট ব্যবসার আড়ালে অন্ধকারের ব্যবসাও শুরু করেছে।

বীরভদ্রর মতো লোক যে এতদিন এই কাজ করেছে সেও এবার বুঝতে পারে তার চেয়েও অনেক বুদ্ধিমান-কৌশলী আর শক্তিমান কেউ এসেছে এই অন্ধকার জগতে যে এসেই তার উপর ঘা মেরে তারই লাখ লাখ টাকা লুট করেছে। শুধু তারই নয় আরও দু'একটা ট্রান্সপোর্ট কোম্পানির ওপর হামলা করে প্রচুর ক্ষতি করেছে?

মোহনলাল রাজস্থানের লোক। ওর পূর্বপুরুষ মোঘল সম্রাটের বিরুদ্ধে লড়েছিল দেশের স্বাধীনতার জন্য। সেই বংশের বংশধর মোহনলাল আজ লড়ছে শুধু টাকা আর প্রতিষ্ঠা বাড়াবার জন্য। অনেক কিছুরই ব্যবসা মোহনলালের। গঙ্গার ধারে একটা পুরনো বাগানবাড়ি কিনেছে বরানগরের দিকে। সেখানে একসময় কোনও বাঙালি জমিদার পয়সা উড়িয়ে মৌজমস্তি করতেন। এখন সেখানে মোহনলাল দুতিনটে বড় বড় গোডাউন বানিয়ে নানারকম মাল স্টক করে সমগ্র ইস্টার্ন জোনে সাপ্লাই দেয়।

মোহনলালজি অন্ধকার দলের লুটপাট করা সব মালই কিনে নেয়। যারা লুটপাট করে তারাও নগদ পায়। অবশ্য অনেক কম দামেই মোহনলাল সে সব মাল কেনে। আর অন্ধকারের ওরাও মাল পাচার করে টাকা নিয়ে চলে যায়।

ভুবন ওই লোকটার কাছেই এনেছিল বিজয়কে। বিজয়ও আঁটঘাট বেঁধে কাজ করতে চায়। মোহনলালের সঙ্গে যোগাযোগ হতে খুশিই হয় বিজয়। মোহনলালের খুঁটির জোর আছে। দিল্লির বেশ কয়েকজন নেতা তার পরিচিত। তাদের নাম ডাক প্রতিষ্ঠা আছে। সেই সুবাদে মোহনলাল এখানের প্রশাসনের মধ্যে দুচারজন উঁচু তলার লোককে হাতে পেয়েছে। আর নীচের তলার লোকদেরও বঞ্চিত করে না মোহনলাল। তাদেরও কিছু দেয় নিয়মিত। ফলে মোহনলাল এসব কাজ ছাড়াও আরও অনেক কিছু করে। ডক এলাকায় তার দলেরও প্রতিষ্ঠা আছে। ফলে বিদেশি মালও আসে অনেক কিছু। বর্ডার এলাকা আর হিমালয়ের ওদিকে মেঘালয়েও তার ঘাঁটি আছে।

বিজয়ও দেখেছে মোহনলালের ব্যবসার প্রসার। লোকটার কথাবার্তাও খুব ভালো। বিজয় মোহনলালের সংস্পর্শে এসে ক্রমশ দেখেছে যে অন্ধকার পথেও নানা ব্যবসা চলে। বিদেশ থেকে আসে ড্রাগস্-হেরোইন। যার দাম কোটি টাকার ওপর। আসে নানা রকমের বিদেশি অস্ত্র। চড়াদামে সে সব বিক্রি হয় বিশেষ মহলে। সাবধানে আঁটঘাট বেঁধে কাজ করতে পারলে লাখ লাখ টাকা আমদানি হবে। আর ওই অন্ধকার পথে ট্রাকের উপর হামলা করতে হবে না। ওসব সত্যিই বিপজ্জনক কাজ।

বিজয়ও এখন ভুবনকে বিশ্বাস করে। ভুবনও বিজয়কে এই পথে নামিয়ে লাভবান হয়েছে। সামান্য মাস মাইনেতে এখন ভদ্রভাবে বাঁচা যায় না। ভুবনের স্ত্রী, একটি মেয়ে আছে। সেও স্বপ্ন দেখে একদিন তাকে আর চাকরি করতে হবে না। সেও মালিক হবে। তাই লেগে আছে সে বিজয়ের সঙ্গে।

বিজয় এর মধ্যে মোহনলালের কথামতো চলে কিছু হেরোইন আনিয়েছে বাইরে থেকে। এসব মাল আনায় সুবিধা আছে। অ্যাটাচির মধ্যেই কয়েকলাখ টাকার মাল চলে আসবে। শুধু ভয় পুলিশের। আর মোহনলালই তা কিনে নেয়। তার বিভিন্ন জায়গায় যোগ আছে। কিছু বাঁধা পার্টিও আছে তারাই সঙ্গে সঙ্গে নগদ টাকা দিয়েই কিনে নেয়। বিজয় দেখে ওসব ঠেকের মালিকদের। তারাও বিজয়কে দেখেছে মোহনলালের সহচর হিসাবে। তাই বিশ্বাসও করে। একটা ডিলেই বিজয় প্রায় বিশ লাখ টাকা লাভ করে এক রাতেই। ভুবনও সঙ্গে রয়েছে। সেও বেশ কিছু টাকা পায়। আর মোহনলালজি নিজে মদ খায়না, তবে তার ওই গুদাম কাম বাগানবাড়িতে অতিথি আপ্যায়নের এসব আয়োজন হত। অনেক রাত অবধি চলে সেই পার্টি। খুশির পার্টি। বিজয়ও এতদিন ব্যবসা করছে। একরাতে বিশলাখ টাকা কখনও কামায়নি। ভুবন বলে, আজ একটু পান হয়ে যাক স্যার। মায়ের দয়ায় নতুন ব্যবসাতে নেমেই এত রোজগার হয়ে গেল। মায়ের পুজোও দিতে হবে। আর আজ মায়ের একটু প্রসাদ পান করুন।

দাও হে একটা গ্লাস—বিজয় মদ্যপান যে করেনা তা নয়। তবে মদের উপর তার কোনও বিশেষ আকর্ষণ নেই। আর নিয়মিত খায় না। পার্টিতে বড়জোর একপেগ। আজ খুশির চোটে তিনচার পেগ স্কচ হুইস্কিই গিলে ফেলে বিজয়। নেশাটা বেশ রঙিন হয়ে ওঠে। মনে হয় যেন খুশির হাওয়ায় সে উড়ে চলেছে দূর আকাশে।

প্রমীলা কিছুদিন থেকে দেখেছে বিজয় যেন কেমন বদলে গেছে। তখন অফিসের কাজের পর সন্ধ্যাতেই বাড়ি ফিরত। গল্প-গুজব হত বাড়িতে। দু'একজন পুরানো বন্ধুও আসত বাড়িতে। প্রমীলা টোস্ট-চা সাপ্লাই করত। জয়ও পড়ার পর বাবার কাছে এসে বসত। প্রমীলাও যোগ দিত আড্ডায়। আবার কোনওদিন তারা যেত দক্ষিণেশ্বর-আদ্যাপীঠ। কোনওদিন যেত সেকেন্ড হাওড়া ব্রিজ পার হয়ে বোটানিক্যাল গার্ডেন। না হয় নিক্কো পার্কে। জয়ও খুশি হত। রাতে কোনও দামি রেস্তোরাঁয় খেয়ে দেয়ে বাড়ি ফিরত।

বেশ ছন্দেই চলছিল তাদের সংসার। প্রমীলা মাঝে মাঝে দেখত বিজয়ের মনটা কেমন উদাস-বিষণ্ণ। বিজয় বলত, ভালোভাবে বাঁচতে বোধহয় দেবে না এ সংসারে। ওর কথায় প্রমীলা আশ্বস্ত বোধ করত। শুধোত,

—কেন? কী হবে?

বিজয় বলে—আজও দুখানা ট্রান্সপোর্টের ট্রাক লুট হয়েছে। প্রচুর টাকাই লোকসান দিতে হবে। এভাবে চললে ব্যবসাই তুলে দিতে হবে। পুলিশও ধরতে পারছে না ওই লুটেরার দলকে।

প্রমীলা বলে—এ নিয়ে ভেবে কী হবে? দেখবে সব ঠিক হয়ে যাবে।

তবে বিজয়ের সেই হাল যেন মুছে যায় ক্রমশ। দেখেছে প্রমীলা, বিজয় এখন অফিস থেকে দেরি করে ফেরে। সন্ধ্যার সেই আড্ডা আর বসে না। বন্ধুরাও এসে ফিরে যায়। প্রমীলা বিজয়ের জন্য অপেক্ষা করে। বিজয় তখন মোহনলালজির ঠেকে বসে ভবিষ্যতের পরিকল্পনা করে ভুবনের সঙ্গে। দেখেছে মোহনলালের কাজ কারবার। আর ক্রমশ নিজের অজান্তেই বিজয়ও মোহনলালের দলে মিশে গেছে। দু'একটা বিজনেস ডিলও করছে। বেশ টাকাও আসছে।

বাড়ি ফিরতে দেরি হয়ে যায়। জয়ও বাবার জন্য অপেক্ষা করে ঘুমিয়ে পড়ে। প্রমীলা বলে, —কিছুদিন থেকে দেখছি তুমি রাত করে বাড়ি ফের। অবনীবাবু নরেনবাবুরাও এসে ফিরে গেলেন। এত কী কাজ কর যে সারাদিনেও শেষ হয় না?

বিজয় বুঝেছে অন্ধকারের কাজ অন্ধকারেই করতে হয়। তবে যা করবে প্রমীলা জানতে পারবে না। বলে সে,—একটা নতুন ব্যবসা শুরু করছি। তাই একটু খোঁজ-খবর-যোগাযোগ করতে হচ্ছে।

—কিসের ব্যবসা? প্রমীলা শুধায়।

—বিজয় সেই ব্যবসার কথা জানাতে পারে না। বলে-ইয়ে, মাল ইমপোর্ট-এক্সপোর্টের কাজ। ট্রান্সপোর্টের ব্যবসার চেয়ে এতে লাভ বেশি। প্রমীলার মনেও কেমন যেন একটা সন্দেহ দানা বাঁধে। বিজয়ের টাকার প্রতি লোভটা কমই ছিল।

প্রমীলা বলে—আমাদের বেশি টাকার দরকার নেই। যা আছে পৈত্রিক ব্যবসা থেকে, সেই টাকাই ধরে রাখো। বেশি টাকা মানেই বেশি অশান্তি। কী দরকার এসবে?

হাসে বিজয়-নো রিস্ক-নো গেন। ব্যবসা করতে গেলে কিছু ঝুঁকি নিতে হবে বৈকি। ও নিয়ে ভেব না।

প্রমীলার মনের অতলে সেদিন থেকেই যেন একটা কালো মেঘ জমেছে। এবার সেটা বুঝছে প্রমীলা। বিজয় প্রায়দিনই বাণ্ডিল বাণ্ডিল টাকা আনে আর এদিক ওদিক সেই টাকা রাখে। বাথরুমের সিলিংয়েও একটা জায়গা বানিয়েছে। টাকা রাখার জায়গা। প্রমীলা বলে, এত কিসের টাকা এসব?

—মহাজনের টাকা। মাল কিনতে হবে তো। জবাব দেয় বিজয়। —ব্যাঙ্কে কেন রাখো না। বাড়িতে এত ক্যাশ টাকা রাখা ঠিক নয়। বিজয় বোঝাতে পারে না, অন্ধকারের টাকা ব্যাঙ্কে রাখা যায় না। বলে দু'একদিনের মধ্যে টাকা দিতে হবে। আর ওরা সব বিদেশি পার্টি। ওরা ক্যাশই নেয়।

প্রমীলার ভালো ঠেকে না। দেখে প্রমীলা ভুবন তো আসেই, তার সঙ্গে আরও দু'একজন লোক আসে। দোতলায় বিজয়ের নিজের ঘরে বসেই কথাবার্তা হয়। ওদের কথাবার্তাও কিছু কিছু কানে আসে প্রমীলার। ওরা বলে,—আপনার মাল আপনি পেয়ে যাবেন বিজয়বাবু।

ভুবন বলে—ওসব মাল রাতেই পাচার করে দেব স্যার। কেউ টের পাবে না। মায়ের দয়ায় কয়েক লাখ টাকা পেয়ে যাবেন।

প্রমীলা বেশ বুঝেছে এসব ব্যবসা সোজাপথে হয় না। অন্ধকারের পথ। বিচিত্র সব লোক পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে লাখ লাখ টাকা রোজগার করে। বেআইনী ব্যবসা। প্রমীলা এসব কথা শুনেছে। সিনেমাতেও দেখেছে মাফিয়াডনদের কাহিনি।

প্রমীলা সেই রাতেই বলে বিজয়কে, ওগো, দরকার নেই এসবের। আমি শান্তিতে সংসার করতে চাই। জয়কে মানুষ করতে চাই। তুমি এসব কাজ কোরো না। পুলিশ জানতে পারলে সর্বনাশ হবে। এসব ব্যবসা ছেড়ে দাও।

অন্ধকার জগতের নেশায় তখন মেতে উঠেছে বিজয়। আর ভুবনও তাকে নানাভাবে মদত দিচ্ছে। বিজয় প্রমীলার কথায় বিরক্ত হয়। এতদিন সে প্রমীলার কথার দাম দিয়েছে। কিন্তু এখন টাকার স্বাদ পেয়ে সে মাংসাশী বাঘের মতো হিংস্র হয়ে উঠেছে। প্রমীলার কথার উত্তরে কঠিন স্বরে বলে, আমার ব্যবসার ব্যাপারে তোমার মাথা ঘামানোর দরকার নেই। আমি যা ভালো বুঝছি তাই করব। আমাকে বাধা দিও না।

ধমকে সরিয়ে দিল প্রমীলাকে। প্রমীলা বাধা দিতে গিয়েও পারে না। ভুবন বলে, বউদি, আপনি ভেতরে যান। উনি কোনও অন্যায় কাজ করছেন না। ব্যবসার খাতিরে একটু আধটু এমন করতে হয়। সবাই করে। আপনি যান—

প্রমীলা সরে আসে। বেশ বুঝেছে যে তার শান্তির সংসারে এবার শনি গ্রহ ঢুকেছে। অজানা ভয়ে তার অন্তর কেঁপে ওঠে। বিজয়ের এখন আর সংসার-স্ত্রী-পুত্রের দিকে তাকাবার সময় নেই।

এর কিছুদিন পরেই প্রমীলা দেখে অনেক রাতে বিজয় মদ খেয়ে কোনওমতে টলতে টলতে অ্যাটাচি হাতে ঘরে ঢুকছে। জয় ঘুমোচ্ছে পাশের ঘরে। রাত তখন অনেক। অ্যাটাচি খুলে নোটভর্তি একটা বড় প্যাকেট নিয়ে বাথরুমের ওপরে সিলিংয়ে রেখে নেমে এল। প্রমীলা সবই দেখে। মাতাল হয়ে এই অবস্থায় কোনওদিন বিজয় বাড়ি ফেরেনি। আজ তার এই উন্নতি দেখে চটে ওঠে প্রমীলা। বলে, বেশ উন্নতিই হয়েছে দেখছি। এত টাকা কোথায় পেলে? বিজয় ধমকে ওঠে, শাট্ আপ। কোনও কথা বলবে না। তোমাকে বলেছি, এ সব ব্যাপারে মাথা ঘামাবে না। একদম সায়লেন্ট থাকবে। প্রমীলা বলে তুমি বেআইনি কাজ কারবার করবে, অন্ধকার জগতে পা দিয়ে এইসব জঘন্য কাজ করবে আর আমি মুখ বুজে তাই দেখব!

—হ্যাঁ, তাই দেখবে। তোমার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কোনও অভাব রাখিনি। বিলাস বৈভবের মধ্যে রয়েছ, তাই থাকবে। তার বেশি কোনও ব্যাপারে মাথা ঘামাবে না।

আজ বিজয় মোহনলালজির বাগানে জীবনের পরম সুখানুভূতিই পেয়েছে। মোহনলালজি তার হোটেলের দু'একজন মহিলা স্টাফকেও আনে অতিথিদের বিশেষ পরিচর্যার জন্য। মিস্ পাতিল এসব কাজে বিশেষ পটু। ওয়েট্রেসের কাজ করে। আর রূপ যৌবনও তার আছে। মিস পাতিলও জানে সেই রূপযৌবনকে পুরুষের দরকারে পেশ করে তাদের অপ্রকৃতিস্থ অবস্থার সুযোগ নিয়ে ওদের জালে ফেলবে। এর আগেও বিজয়কে জালে জড়াতে চেয়েছিল। কিন্তু পারেনি। বিজয় তখনও অমানুষ-অন্ধকারের জীব হয়ে ওঠেনি।

ভুবনও চেষ্টা করেছিল বিজয়কে অন্ধকারের জগতে টেনে নামাতে। নাহলে কোনও আশা পূরণ হয়ে উঠবে না। ব্যবসাতে ষোলোআনা উন্নতি হবে না। আজ ভুবনই নিজের প্রয়োজনে মদ দেয়

বিজয়কে। আর ক্রমশ মদের নেশায় আর মিস পাতিলের উদগ্র যৌবনের নেশায় ডুবিয়ে দিতে চায়। বিজয়ও মদের নেশায় মাতাল হয়ে উঠেছে। মাতাল হয়ে উঠেছে মিস পাতিলের রূপের নেশায়।

কাল সন্ধ্যায় আবার এই বাগানে আসবে এই কথাও জানিয়ে আসে মিস পাতিলকে। ভুবনও চায় বিজয় একটু গভীর জলে নামুক।

প্রমীলার ওই কথাগুলো মোটেই ভালো লাগেনি বিজয়ের। প্রমীলাও বুঝেছে সর্বনাশ যা হবার তা হয়েছে। তাই সে কঠিন কণ্ঠে জানায়, এসব অন্ধকারের কাজ যদি ছেড়ে না দাও, আমি তোমাদের সব কাজের খবর, ওই বাগানবাড়ির গুদামের ঘর, সব কথা পুলিশকে জানাব। খবরের কাগজ-টিভির লোকদের মায় খোঁজ খবরকেও জানাব। তারপর দেখি কে তোমাদের বাঁচায়। দলসমেত অ্যারেস্ট করে নিয়ে যাবে পুলিশ।

—খবরদার। একটা কথাও ফাঁস হলে বিপদ হবে তোমারও।

প্রমীলা বলে—তিনদিন দেখব। তারপর যা হয় হোক। আমি পুলিশে যাবই।

—পুলিশে যাবে! বিজয় এবার অগ্নিমূর্তি হয়ে প্রমীলার গালে সপাটে একটা চড়ই মারে। অতর্কিত আঘাতে ছিটকে পড়ে প্রমীলা। টেবিলের বড় চিনামাটির ফুলদানিটা ভেঙে চুরমার হয়ে যায় সশব্দে।

ওই শব্দে আর বাবার কঠিন কণ্ঠস্বর শুনে জেগে উঠেছে জয়। ঘুম চোখে এ ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ভীত চাহনিতে সে দেখে তার মা ছিটকে পড়েছে। টেবিলের কোণে লেগে কপালটা ফেটে গেছে। জড়িত কণ্ঠে গর্জাচ্ছে বিজয়, শেষ করেই দেব। মুখ খোলার চেষ্টা কোরো না। জয়ও মায়ের কান্না দেখে কেঁদে ফেলে। বিজয় বের হয়ে যায়। জয় দেখছে নতুন এক বিজয়কে।

বিজয়ের মনেতর অতলে একটা ভয়ও জাগে। পরদিন সকালে তার ঘুম ভাঙে। দেখে প্রমীলার কপালে ব্যান্ডেজ। প্রমীলা গতকাল জয়ের কাছেই শুয়েছিল। বিজয়কে চায়ের কাপটা দিয়ে কোনও কথা না বলে চলে গেল প্রমীলা। বিজয় নিজের ঘরে বসে খবরের কাগজটা পড়ছে। কিন্তু তার মনে ভেসে ওঠে গত কালকের রাতের ঘটনাগুলো। বিজয় দেখে, জয় স্কুলে যাবার জন্য তৈরি হচ্ছে। অন্যদিন জয় তার ঘরে ঢুকে বাবাকে গুডমর্নিং জানায়। দু'একটা আবদার করে যায়। বিজয়ও ছেলেকে আদর করে বিদায় দেয়।

আজ জয় মায়ের সঙ্গে বারান্দা দিয়ে বের হয়ে গেল বাইরের রাখা গাড়ির দিকে। অন্যদিনের মতো তার কাছে আসে না। গুডমর্নিং জানায় না। বিজয় অবাক হয়। খুব খারাপ লাগে বিজয়ের।

মোহনলাল মাঝে মাঝেই এখন বিজয়ের বাড়িতে আসে ব্যবসার খাতিরে। আজও এসেছে সে। বিজয় আজ খুবই চিন্তান্বিত। মোহনলাল বলে, এত ভাবনার কী আছে?

বিজয় বলে, বাড়িতে সমস্যা হয়ে গেছ মোহনলালজি। আমার স্ত্রী এসব কাজে বাধা দিতে চায়। সে পুলিশকেও আমাদের কথা জানাতে পারে।

বিজয়ের মুখে পুলিশের কথা শুনে চমকে ওঠে মোহনলাল—সে কী বিজয়বাবু! এ তো ঘর শত্রু বিভীষণ। পুলিশে গেলে আমাদের তো চরম বিপদ হবে, কারবারভি চৌপট হবে। ক্রোড় রুপেয়া ভি চৌপট হবে।

বিজয় বলে, তাইতো ভাবছি মোহনলালজি। মোহনলাল বলে—এ প্রবলেম তো এক মিনিটেই সলভ্ হয়ে যাবে। কী করে? বিজয় জিজ্ঞাসা করে।

—আরে আপনার লোকজনদের বলুন, মা ছেলে দু'টোকেই খতম করে দেবে। লাশ গায়েব, কোঁই কুছ মালুম পাবে না। আপনি বাঁচলে বাপের নাম—

বিজয় বলে—ঠিক বলেছ। খুব বেড়েছে, মা ছেলে দুটোকেই খতম করে দেব। আজই।

প্রমীলা ফিরছিল। সে শোনে ওদের কথা। সেও বুঝেছে কত হিংস্র হতে পারে এই জানোয়ারগুলো। নিজের জন্য সে ভাবে না। তার সন্তানকে বাঁচাতেই হবে এদের হাত থেকে। তাই এই বাড়ি ছেড়েই চলে যাবে সে। এদের নাগালের বাইরে। এই লোকগুলোর থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাবে জয়কে।

কিন্তু কলকাতায় তার কোনও আত্মীয়ের বাড়িতে যাওয়া যাবে না। তার মনে পড়ে স্বামী

কেশবানন্দের কথা। সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী —নদীর ধারে মাইথন পাহাড়ের সুন্দর পরিবেশে তার আশ্রম। স্কুল- ছাত্রাবাস -মহিলা নিবাস সবাই আছে। তাদের বংশধর গুরুদেব। দেবতুল্য মানুষ তিনি। তিনি আগেও বলেছিলেন, তোর ছেলেকে আমাকে দে। আমি ওকে মানুষ করব। ওরে, ইংরেজি বিজ্ঞানকে এখন গ্রহণ করতেই হবে। তার সঙ্গে আমাদের ঐতিহ্য-পরম্পরার মিশ্রণ ঘটাতে পারলেই হবে প্রকৃত শিক্ষা। আমি ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ারিং গড়তে জানিনা। তবে মানুষ গড়ার চেষ্টা করি। দু'একজন মানুষও হয়েছে আশ্রম থেকে। তোমার ছেলেও হবে।

প্রমীলার মনে পড়ে গুরুদেবের সেই অভয় বাণী। —দুঃখ—বিপদে ভেঙে পড়িস না। ইষ্টনাম স্মরণ করে দুঃখটাকে সহনীয় করে তোলার চেষ্টা করবি। দেখবি জয় তোর হবেই মা।

রাত নামছে। জয় ঘুমোচ্ছে। বাড়িটাও নিস্তব্ধ। ওকে জামা-প্যান্ট পরিয়ে বলে, চল, আমরা বেড়াতে যাব ট্রেনে।

—বাবা যাবে না মা?—

জয়ের মুখ চেপে ধরে প্রমীলা। বলে চুপ্। একদম কথা না। তোর বাবা জানলে যেতে দেবে না। চল্—

ওরা পিছনের দরজা দিয়ে বাইরে আসে। পথটা নির্জন প্রায়। একটা ট্যাক্সিকে হাত দেখিয়ে থামিয়ে জয়কে নিয়ে উঠে পড়ে প্রমীলা। বলে, হাওড়া স্টেশন চলো।

সেবা নিকেতন আশ্রমটা কল্যাণেশ্বরী মন্দিরের দিকে। ছোটখাটো একটা শহরই গড়ে উঠেছে এই মন্দিরের জন্য। ওদিকে মাইথনের ছোট পাহাড় শ্রেণী। পাহাড়ের বুক থেকে আঁধার মুছে দিনের আলো ফুটছে। ওদিকে মন্দিরের ঘন্টা বাজছে। উপত্যকায় তখনও ট্যুরিস্টদের-মন্দিরে আগত পুণ্যার্থীদের ভিড় জমেনি। এপারে জনপদ হোটেলগুলোর সবে ঘুম ভাঙছে। চায়ের দোকানগুলো খুলছে। দোকানিরা এবার দোকান পশার লাগাবে।

কেশবানন্দ মহারাজ ভোরে উঠে এদিকে মায়ের মন্দিরে প্রণাম করে মালা দেন। ওদিকে তার ছাত্রাবাসে তখন প্রার্থনা সঙ্গীত শুরু হয়েছে। হঠাৎ দেখেন একটা অটো এসে থেমেছে আশ্রমের গেটে। নামছে প্রমীলা সঙ্গে তার ছেলে জয়। কেশবানন্দও খুশি হন, এসো মা।

প্রমীলা রাত জেগে এসেছে। চেহারাতে উস্কোখুস্কো ভাব। মুখে চিন্তার ছায়া। জয়-প্রমীলাও ওকে প্রণাম করে। প্রমীলা বলে, বাবা—ওর কণ্ঠস্বরে উদ্বেগ চোখে জলের ধারা। মহারাজ যেন একটা কিছু অনুমান করে নিয়েছেন। বলেন, মা, এখন তুমি ক্লান্ত। ছেলেটারও ঘুম হয়নি রাতে। এখন তোমরা ঘরে গিয়ে বিশ্রাম নাও, স্নানাহার কর। বিকালে তোমার সঙ্গে কথা হবে।

তার এক শিষ্যাকে বলেন—মাতৃসদনের দোতলায় এদের জন্য একটা ঘরের ব্যবস্থা করে ওখানের লোককে বলে দাও—ওদের আহারাদির ব্যবস্থা করে দেবে। যাও মা—

জয় অবাক হয়ে দেখছে। চারিদিক বন-পাহাড়। দূরে একটা ছোট ঝরনা বয়ে চলেছে। সবুজ গাছগাছালিও রয়েছে আশ্রমে। পাখিদের কলরব ওঠে। ওঠে প্রার্থনা সঙ্গীত।

"তুমি নির্মল কর-মঙ্গল করে
মলিন মর্ম মুছায়ে
তব পুণ্য কিরণ দিয়ে যাক মোর
মোহ কালিমা ঘুচায়ে।"

ওই সুরটা প্রমীলার মনেও কি সান্ত্বনা আনে। জয় বলে, কত পাখি—ওই দেখ মা একটা ময়ূর। গাছে গাছে কত ফুল। জায়গাটা খুব সুন্দর! না মা—

প্রমীলা বলে—আমরা এইখানেই থাকব বাবা।

—সত্যি! খুব ভালো হবে মা। বাবা, ভুবন কাকাদের চিৎকার-ধমক এখানে নেই। কত ছেলে রয়েছে। ওই তো স্কুল মা—

জয়ও নতুন জায়গাটাকে যেন ভালোবেসে ফেলেছে।

বিজয়ের ঘুম ভাঙেনি। তখনও তার মদের নেশাটা কাটেনি। একটু ঘোর রয়েছে। বেয়ারা চা দিতে আসে। বিজয়কে অন্যদিন চা দেয় প্রমীলা। তাকে না দেখে শুধোয় বিজয়, মেমসাহেব কোথায়?

বেয়ারা বলে—তিনি তো নেই। জয়বাবুকে নিয়ে তিনি কাল রাতেই চলে গেছেন। এখনও আসেননি। কোথায় গেছেন তাও কাউকে বলে যাননি।

বিজয় এবার চটে ওঠে— সেকি!

এবার তার ভয়ই হয়। কে জানে বাড়ি থেকে বের হয়ে তার মাসির বাড়িতেই গেল কি না। যদি পুলিশে যায়। বিজয় ফোন করে মাসির বাড়িতে। কিন্তু কোথাও যায়নি। তারাও ভাবনায় পড়ে।

মহাবিপদের গুরুত্ব বুঝে বিজয় ফোন করে ভুবনকে। ভুবন কথাটা শুনে চমকে ওঠে। তার মনে হয় প্রমীলা বোধহয় কাল রাতে তাদের কথা শুনেছে কোনওভাবে। তাই ওদের হাত এড়িয়ে চলে গেছে।

ভুবনও এসে পড়ে বিজয়ের ওখানে। বিজয় বলে, থানা-পুলিশের কাছে যায়নি তো? ভুবন অবশ্য এসব জায়গায় তাদের লোক রেখেছে। তার জন্য মাসে মাসে ভালো টাকা দিতে হয়। এসব কারবারে এমন খরচা করতেই হয়। ভুবন বলে, তেমন কিছু হলে আমি খবর পেতাম। তবু আমি খবর নিচ্ছি। আপনিও দেখুন যদি কোনও হদিশ পান। এমনও তো হতে পারে আমাদের ভয়েই পালিয়েছে—

বিজয় এখন নিজেকে, তার ব্যবসাকে বাঁচাতে চায়। তাই বলে, তা যদি হয় ভালোই হয়েছে। আপদ গেছে। ও আর বাধা দিতেও আসবে না।

ভুবন বলে। আমরাও তাহলে-নিশ্চিন্ত হয়ে এই ব্যবসার কথা ভাবতে পারব। দুষ্টু গরুর চেয়ে শূন্য গোয়ালই ভালো!

গোয়াল অবশ্য শূন্য থাকে না। সেখানে গোরু ঠিকই জুটে যায়। ক'দিন ওরা একটু সাবধানে চুপচাপ থাকে। বিজয় দু'এক জায়গায় খোঁজ করেছে প্রমীলার। পায়নি। তবে পুলিশের কাছে যায়নি তা বুঝেছে। তাই বিজয় বলে, ভুবন, থানায় একটা মিসিং রিপোর্ট করে রাখো। ওরা রেকর্ড রেখে দিক। খোঁজ খবর আর করতে হবে না।

ভুবনও খুশি হয় বিজয়ের এই উদাসীনতায়। বলে সে—তাই করছি স্যার। একটা রেকর্ড রাখা উচিত।

প্রকৃতিতে শূন্যস্থান থাকে না। একটা চলে গেলে আর একটা সেই শূন্যস্থান পূরণ করে। মোহনলালের কাছেও খবরটা পৌঁছায়।

সব শুনে মোহনলাল বলে—ব্যস্, লাইন কিলিয়ার।

এসে পড়ে বিজয়। মোহনলাল বলে, আসুন বিজয়বাবু। এবার মন দিয়ে বিজনেস করুন। আর ওয়াইফ চলে গেছে, যানে দিজিয়ে। অউরৎ কা কমি কভি নেহি হোগা। ভুবন আজ বাগানে পার্টির বন্দোবস্ত করো। দুবাই-আবুধাবি থেকে তিনচার শেখ সাহেব এসেছে। ওদের অনারে পার্টি। বিজয়বাবু তুমিও চলো। নয়া ব্যবসার ভি বাতচিত হবে। এখন ব্যবসা করো আর লেড়কি নিয়ে মৌজমস্তি করো। ব্যস্ খালাস্—

বিজয়ও ভাবছে কথাটা। এবার সে এই স্রোতেই গা ভাসাবে। তার চাই টাকা-প্রতিষ্ঠা। সেই পথের বাধা হয়েছিল প্রমীলা। সেও তাকে মুক্তি দিয়ে গেছে।

বাগানের পার্টিতে চিফ হোস্ট সেই মিস পাতিল। উচ্ছল যৌবনা মেয়েটাও ভুবনের কাছে শুনেছে বিজয়বাবুর স্ত্রীর চলে যাবার কথা। বিজয়বাবু এখন এই ব্যবসা থেকে বেশ রোজগার করছে। আর মিস পাতিল বিজয়ের বড় বাড়িটাও দেখেছে। সেখানেও গেছে দু'একবার। এবার মিস পাতিলও ভাবছে এই বাড়িতেই তার দখল কায়েম করবে।

তাই আজ পার্টিতে বিশেষ নজর রেখেছে বিজয়ের ওপর। ওকে দেখছে ভুবন। মিস পাতিলের রূপ

ওকেও যেন টানে। মিস পাতিল দেখছে বিজয়কে। বিজয়ের চোখে বুভুক্ষু চাহনি। মিস পাতিল এই চাহনির অর্থ বোঝে। মদের গ্লাস এগিয়ে দিয়ে বলে, টেক ইট মিঃ বিজয়। টেক ইট ইজি মাই ডিয়ার। বিজয়ের গালে নরম হাতের ছোঁয়া দিয়ে আদর করে মিস পাতিল। বিজয় আজ যেন তার শূন্য জীবনে সঙ্গী পেতে চায়। উপভোগ করতে চায় জীবনকে। চায় অনেক অনেক টাকা-প্রতিষ্ঠা-নাম সব কিছু।

প্রমীলা অনেক চাওয়ার সংসারকে ছেড়ে এসেছে এই নতুন পরিবেশে। এখানে মাতৃভবনে রয়েছে তার মতো সমাজে অবহেলিত অনেক মেয়ে। আশ্রমে তারা নানারকম কাজ করে। শ্রমভবনে নানারকম হাতের কাজ করে। সেইসব জিনিস বিক্রিও হয় ভালো দরে। আর তার লাভ থেকেই চলে মাতৃভবন। প্রমীলা লেখাপড়া জানে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিও তার আছে। তাই সে পড়ায় স্কুলে।

জয় এখন আর মায়ের কাছে থাকে না। সে থাকে আশ্রমের ছাত্রাবাসে। অনেকখানি এলাকা নিয়েই আশ্রমের নানা কর্মযজ্ঞ চলে। সবাই এখানে কাজ করে আশ্রমের জন্য। সমাজের সার্বিক কল্যাণের দিকেই নজর মহারাজের। শিক্ষাদানের সঙ্গে চলে শরীর চর্চা।

জয় এখানকার স্কুলের কৃতী ছাত্র। ক্লাসের ফাঁকে, না হয় মন্দিরে প্রার্থনার সময় জয় আসে মায়ের কাছে। জয় এখন কিশোর। সুন্দর স্বাস্থ্য, খেলাধুলাতে ভালো। আর পড়াশোনাতেও সে ক্লাসের মধ্যে সেরা। এই স্কুলের মধ্যেই নয়, এই অঞ্চলের মেধাবী ছাত্রদের সে অন্যতম। মহারাজও বিশেষ স্নেহ করেন তাকে। সেদিন জেলার ফুটবল প্রতিযোগিতায় শিল্ড জয় করে ফিরেছে এই আশ্রমের স্কুলে। আর এই জয়ের লড়াইয়ে নেতৃত্ব দিয়েছে জয়ই।

ব্যান্ড বাজিয়ে ছেলেরা শিল্ড নিয়ে ফিরছে। আশ্রমে আজ খুশির ছোঁয়া। মহারাজ বলে, এসবের মূলে ওই জয়ই। ওই আমাকে বলে ফুটবল টিম করেছে স্কুলে। পড়াশোনার সঙ্গে চাই খেলাধুলার চর্চাও। স্বামী বিবেকানন্দও এইসব খেলাধুলার কথা বলেছেন।

জয় জেলার চ্যাম্পিয়নশিপ খেলতে গিয়ে বেশ কয়েকটা নামী স্কুলের নজরে পড়েছে। তারা চায় জয়কে তাদের স্কুলে আনতে। তাই পরদিনই সেখানের নামী স্কুলের প্রেসিডেন্ট যিনি আবার উকিল, তিনি স্কুলের সেক্রেটারিকে সঙ্গে নিয়ে আশ্রমে আসেন। মহারাজের পরিচিত উকিলবাবু। তিনি বলেন, মহারাজ, আপনার স্কুলের জয়কে আমরা আমাদের স্কুলে চাই। ওখান থেকে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করে কলেজেই পড়াব ওকে। পাশ করলে একটা চাকরিও হবে। আর ওর জন্য থাকার ব্যবস্থাও হবে আমার বাড়িতে। কোনও অসুবিধা হবে না। ওখানে কলকাতার নামী কোচের ট্রেনিংও করবে। একটু অভিজ্ঞতা হলে কলকাতার নামি দলে খেলবে।

এমন সুযোগ হাতছাড়া করতে চান না মহারাজ। ছেলেটার মধ্যে সম্ভাবনা আছে। তাই ডেকে এনে জয়কে ওদের কথা জানান। জয় বলে, আমি আশ্রম ছেড়ে তোমাকে ছেড়ে কোথাও যাব না ফাদার। আমাকে তুমি তাড়িয়ে দিও না।

কেঁদে ফেলে কিশোর জয়। ও এই আশ্রমের মায়াবন্ধনে পড়ে গেছে। মায়ের কাছে শুনেছে বাবা তাদেরকে বাড়ি ছেড়ে আসতে বাধ্য করেছেন। সেই চরম দুঃখের দিনে মহারাজ তাদের আশ্রয় দিয়েছেন। পিতৃস্নেহে প্রমীলাকে বেঁধে রেখেছেন।

জয় মাঝে মাঝে সন্ধ্যার পর মায়ের ঘরে আসে। পড়াশোনাও দেখে নেয়। মা ছেলেতে এই সময়ই হয় তাদের সুখ-দুঃখের কথা। প্রমীলা আজ বেশ কয়েক বছর হল চলে এসেছে ঘর ছেড়ে। এখন এই আশ্রমই তার ঘর বাড়ি। আশ্রমের কর্মীরাই আজ তার আপনজন।

তবু মাঝে মাঝে মনে হয় সেই ঘরের কথা। বিজয়ের কথা। অনেক আশা স্বপ্ন নিয়ে ঘর বেঁধেছিল প্রমীলা। ভেবেছিল জয়কে মানুষ করবে। ওকে বিদেশ থেকে লেখাপড়া শিখিয়ে আনবে। কিন্তু সব স্বপ্ন তার ব্যর্থ হয়ে গেছে। সেই স্বামীর হাত থেকে নিজেকে আর তার সন্তানকে বাঁচাবার জন্যই ঘর ছাড়তে বাধ্য হয়েছে। প্রমীলার মনে একটা চাপা রাগই রয়েছে বিজয়ের জন্য। কোনওমতে সেদিন প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছে। তার আশা জয়ই একদিন তার সন্ধান করে বের করবে। আর জবাবও

চাইবে সে বিজয়ের ওই জঘন্য কাজের। জয়কেও বলে প্রমীলা, তোকে মানুষ হতে হবে জয়। লোভ-লালসা জয় করে তুই মানুষ হবি। নিজের পায়ে দাঁড়াবি। আর যে লোকটা তোর সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে তোকে পথে বার করে দিল, তার কাজের কৈফিয়ত চাইবি।

জয় বলে, তোমাকে যে এইভাবে বের করে দিয়েছে, তাকে আমি কোনওদিন ক্ষমা করব না। তাই আমাকে মানুষ হতেই হবে। শক্তি অর্জন করতে হবে।

জয় কাঁদছে। সে ওই উকিলবাবুর ওখানে যাবে না। আশ্রমেই থাকবে। মহারাজ বলেন, তোমার উন্নতি হবে।

—আপনারা আশীর্বাদ করুন, আমি অনেক কিছুই পাব মহারাজ। আমি এইখানেই থাকব।

জয়কে কিছুতেই রাজি করানো গেল না। মহারাজও খুশিই হন, জয় লোভকেও জয় করেছে। জীবনে ও অনেক বড় হবে যদি এই জেদ এই মানসিকতা রাখতে পারে।

বিজয় এখন খুবই ব্যস্ত। এখন তার ব্যবসা বেশ ভালোই চলছে। অবশ্য বাইরে দেখা যায় বিরাট ট্রান্সপোর্ট কোম্পানির মালিক। দু'তিনটে গুদামও আছে তার। বহু কোম্পানির মাল নিয়ে তার ট্রাকগুলো সারা ভারতের এ কোণ থেকে ও কোণে দৌড়চ্ছে। দিল্লি-বোম্বাই-মাদ্রাজ-হায়দরাবাদে তার ট্রান্সপোর্ট কোম্পানির নিজস্ব অফিস গুদাম আছে। আর এমনিতে সে নেতাদের কাছের লোক। ছোটখাটো অনেক রাজনৈতিক দলকে সে অনেক টাকা দেয়। আর বহু সমাজসেবী সংস্থাও তার কাছ থেকে প্রতিমাসে মোটা টাকাই পায়। তাই বিজয়বাবু এখন সমাজে সুপরিচিত লোক।

মিস পাতিলও এতদিন ওয়েট্রেসের কাজ করেছে। ছোটবেলাতেই তার বাবা-মা মারা যেতে অনাথ লিলি তার দূর সম্পর্কের এক মামার কাছে মানুষ হয়েছে। অফুরান রূপ যৌবন মেয়েটার দেহে। ক্রমশ সেও বুঝতে পারে তার রূপ-ঐশ্বর্যের খবর। সেও বাধ্য হয়ে নেমে পড়ে সেই যৌবন ফিরি করতে। ক্রমশ ছোট্ট লিলি পরিণত হয় মিস পাতিলে। বাঙালি মহলে ওঠা বসা করতে করতে বাংলা ভাষাটাও বেশ বলতে পারে সে। দুঃখ-কষ্ট ঘোচে তার। টাকা হয়। নিজের একটা আশ্রয়ও জোটে।

কিন্তু সেও এক চিরন্তন নারী। সেও একটা স্থায়ী আশ্রয়, একজন মানুষকে সঙ্গী হিসাবে চায়। যার প্রচুর টাকা আছে। প্রতিষ্ঠা আছে। মোহনলালের হোটেলেই সে কাজ করত। মোহনলালই কাজ দিয়েছিল। অবশ্য তার জন্য দামও দিতে হয়েছিল তাকে। মোহনলালের মতো লোভী একটা মানুষের বহু অত্যাচার সয়েও ওখানে পড়ে ছিল।

মোহনলাল লিলিকে তার কাজে লাগাত। বিভিন্ন দেশি-বিদেশি পর্যটককে খুশি করে বহু টাকার মাল আমদানি করে কম দাম দিয়ে। পরে সেসব মাল বিক্রি করে পুরো টাকা ঘরে তোলে।

মোহনলালও এবার বিপদে পড়েছে। বিজয়কে সেই-ই কারবারে এনেছিল। অন্ধকার জগতের অলি গলি চিনিয়েছিল তাকে। বিজয়ও টাকা রোজগার করেছে। মোহনলালেরও আরও বেশি বেআইনী মাল বিক্রি হয়েছে। তাই বিজয়কে হাতে রাখার জন্যই লিলি ওরফে মিস পাতিলকে ভিড়িয়েছিল ওর সঙ্গে।

কিন্তু মোহনলাল দেখেছে মিস পাতিল এবার তাকে ছেড়ে বিজয়ের বাড়িতে গিয়ে উঠেছে। এখন সে নাকি বিজয়ের ট্রান্সপোর্ট কোম্পানির সেক্রেটারি।

ওটা নামকা বাস্তে। সেজেগুজে লিলি এখন অফিসের ঠান্ডা ঘরে বসে। অফিসে সে এখন ম্যাডাম। আর বিজয়ই এখন লিলির পরিচিতি বিদেশি কাস্টমারদের হাতে এনে তাদের মাল সেই কিনছে। এতে বিজয়ের ব্যবসা আরও জমে উঠেছে। ভুবনও খুব খুশি। এখন সেও ভালো আমদানি করছে।

মোহনলাল চটে ওঠে। তার বিদেশি পার্টি তাদের হোটেলে মোহনলালকে দেখে একটু অবাক হয়ে তাকেই জানায়, মোহনলালজি, বিজয়বাবুকেই মাল দিতে হবে। বিজয়বাবু নিজে দুবাই গিয়ে বস্‌কে হাতে এনেছে। বসের হুকুম, সব মাল যাবে ওর ওখানেই। তাছাড়া ও তো সব টাকা মিটিয়ে দেয়।

মোহনলাল মাছের তেলেই মাছ ভাজত। ওদের টাকা দিত ওদের মাল বিক্রি করে। এখন আগে

থেকেই লাখ লাখ টাকা ওদের মিটিয়ে দিয়েছে বিজয়। মিস পাতিলকেও বলেছে, ওখানে কি কাজ করো তুমি! আমার এখানে চলে এসো। আমার বাগান বাড়িতেই থাকবে।

মিস পাতিল এখন কিছুটা সামাজিক স্বীকৃতি লাভ করেছে ওই ট্রান্সপোর্ট কোম্পানির সেক্রেটারি হয়ে। সেই হোটেলের কলগার্লের অন্ধকার নরকের জীবন থেকে সে এখন সামাজিক জীবনের স্বাদ পেয়েছে। আর তাকেও নিজের ঘরে ঠাঁই দিয়েছে বিজয়। লিলির স্বপ্ন-আশা সে এবার বিজয়ের স্ত্রীর স্বীকৃতিই পাবে। তাই সেও মোহনলালের ডাকে সাড়া দেয় না।

এসব খবর রাখে ভুবন। লোকটা খুবই সাবধানী, চতুর। আশে পাশে সে কড়া নজর রাখে। মোহনলালের এই সব ব্যবসার খবরও জেনেছে সে। মায় লিলিকে ও এখান থেকে নিয়ে যাবার ষড়যন্ত্র করছে তাও বলে ভুবন বিজয়কে। ভুবন বলে, মোহনলালকে এখন বিদেশিরা মাল না দিয়ে আমাদের দিচ্ছে, মোহনলাল তাই চটে উঠেছে। মিস পাতিলও আর মোহনলালের ওখানে যায় না। এসবের জন্য মোহনলাল রেগে গেছে—

বিজয় বলে—লোকটা কিন্তু ডেঞ্জারাস। ও আমাদের বিপদে ফেলতে পারে ভুবন।

ভুবন বলে—একটু নজর রাখছি ওর উপরও।

সেদিন রাতেই পুলিশ বিজয়দের গঙ্গার ধারে গুদামে হানা দেয়। ভুবনও এসে পড়ে। বিজয় বলে, এতদিন তো পুলিশ কোনও রেড করেনি। আমরা তো ওদের প্রণামী ঠিকমতো দিই। তাহলে হঠাৎ রেড কেন? ওখানে তো তিনচারদিনের আসা চালানের মাল সব রয়েছে।

ভুবন বলে—ওসব মাল আগেই চলে গেছে বিভিন্ন পার্টির কাছে। ওখানে পুলিশ শত সার্চ করেও কিছুই পাবে না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমিও খবর নিয়েছি। কেউ হয়তো মন্ত্রী মহলেই আমাদের নামে কিছু লাগিয়েছে। আর সেই মন্ত্রীমশাই পুলিশকে খেপিয়ে দিয়েছে।

বিজয় বলে—খোঁজ খবর নাও ভুবন। আমাদেরও খুঁজে বের করতে হবে শত্রুকে।

ভুবন তার চর-অনুচরদের রেখেছে অনেক জায়গাতেই। পুলিশেও এর মধ্যে তাদের খবর দেবার লোকও আছে। তারাই খবরটা দেয়। বিজয়ও খবরটা শুনে চমকে ওঠে, সেকি! মোহনলালজিই এসব করিয়েছে! দেখাচ্ছি ব্যাটাকে একবারে পারেনি। আবারও ও ঘা মারার চেষ্টা করবে।

ভুবনও বিজয়কে পুরোপুরি ছাঁপমারা একজন মাফিয়া বানাতে চায়। তাতে তারই লাভ। বিশেষ করে ভুবনও এখন একটা স্বপ্ন দেখেছে। তার দলে বেশ কিছু সাহসী ছেলেও এসে গেছে। ভুবন নিজেই বিজয়বাবুর দলের জন্য বেশ কিছু ছেলেকে সংগ্রহ করেছে।

তাদের মধ্যে বিপুল সবচেয়ে কাজের ছেলে। এর মধ্যে সে কোন দলের হয়ে দু'তিনটে লাশও ফেলে দিয়েছে। কেউ টেরও পায়নি। ভুবন বলে, বিজয়বাবু, মোহনলালকে আর বাঁচিয়ে রাখা ঠিক হবে না। ও থাকলে আমাদের বিপদ হবে।

বিজয় বলে—তা তো বুঝলাম। কিন্তু কী করা যায়?

ভুবন স্থির গলায় বলে—ওকে উড়িয়ে দিতে হবে। নাহলে আমরা শান্তিতে বাঁচতে পারব না। আর ও উড়ে গেলে ওর বিজনেসও আমরাই পেয়ে যাব।

বিজয় একটু অবাক হয়—বলছ কি ভুবন?

ভুবন বলে—একাজে এসব আকছার হয় স্যার। আপনি ভাববেন না। আমিই সব ব্যবস্থা করে দেব। লাখ খানেক টাকা খরচা পড়বে। তবে নিখুঁত কাজ হবে। কেউ টেরও পাবে না।

বিজয়ও নিজেকে বাঁচাবার জন্যই এই পথ নেবার কথা ভাবছে। বলে সে—টাকার জন্য ভেব না। ক্যাশ থেকে নিয়ে নেবে। তবে কাজ যেন নিখুঁত হয়।

দু'তিনদিন পরই খবরটা ছড়িয়ে পড়ে। ব্যবসাপত্র ভেঙে যাওয়ার ফলে মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে মোহনলালজি। বেশ কিছুদিন ধরেই তাকে মানসিক অবসাদ চেপে ধরেছিল। আগের দিন রাতে নিজের বেডরুমে, নিজেরই রিভলবারের গুলিতে নিজেকে শেষ করেছেন। পুলিশ সুইসাইড নোটও

পেয়েছে। ভুবন বিজয়কে বলে, আপনি ওর এতদিনের চেনাজানা। চলুন আমরা ফুলমালা নিয়ে ওকে শ্রদ্ধা জানিয়ে আসি।

শোকাচ্ছন্ন বিজয়-ভুবনরা যায়। মোহনলালের প্রাণহীন দেহের উপর ফুলমালা দিয়ে শেষ শ্রদ্ধা জানায়। যেন বন্ধু বিয়োগের শোকে নিথর হয়ে যায়।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ করে গাড়িতে ওঠে। বিজয় বলে, যাক্, আমাদের তাহলে কিছু করতে হয়নি!

গলা নামিয়ে ভুবন বলে, বিপুলের হাত। ধরা কঠিন স্যার! দেখলেন তো! কে বলবে মার্ডার? নিখুঁত সুইসাইড। পুলিশও তাই মেনে নিয়েছে। দেখলেন আমার খেল—

বিজয় দেখছে ভুবনকে। মোহনলালকে যে এইভাবে ঠান্ডা মাথায় খুন করে সব ঘটনাকে সুইসাইড বলে নিখুঁতভাবে সাজিয়ে যে পার পেয়ে যাবে তা ভাবেনি। বিজয় এখন নিশ্চিন্ত। পিছনের শত্রুকে শেষ করেছে। আজ বিজয় এসেছে একটা স্কুলের অনুষ্ঠানে। সেখানে ছাত্রদের প্রকৃত মানুষ হয়ে দেশ সেবার জন্য তৈরি হবার উদাত্ত আহ্বান, জয়ধ্বনি।

—এখন দেশের প্রতিটি মানুষের কর্তব্য দেশকে ভালোবাসা—দেশের মানুষকে ভালোবাসা—দশের জন্যে মহৎ কাজ করতে হবে।

ওর গুদাম থেকে তখন ট্রান্সপোর্টের ট্রাকের মালের সঙ্গে হেরোইনের বেশ কিছু পেটি চলেছে উত্তরবঙ্গে। ব্যবসা বাড়াতে সেখানের তরুণ সমাজকে নেশা ধরানোর জন্য। মোবাইল ফোনে সাংকেতিক শব্দে খবর আসে, সব মাল নিরাপদেই পাচার করা হয়ে গেছে। বিজয় তখন মাইকে ঘোষণা করে।

—দরিদ্র, মেধাবী ছাত্রদের পড়ার জন্য স্কুল কর্তৃপক্ষকে একলক্ষ টাকা দান করছে।

ক-টা দিন যেতে না যেতেই মোহনলালজির মৃত্যু নিয়ে কিছু প্রশ্ন জেগে উঠেছে। মোহনলালের ভাই পুলিশকে জানিয়েছে, সুইসাইড নোটটা তার দাদারই হাতের লেখা কি না তা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। এটা খুনের তদন্ত করা হোক। বিজয়ের কানে কথাটা তোলে ভুবনই। বিজয় ঘাবড়ে যায়। যদি পুলিশ সত্যিই তদন্ত করে আর সত্যি ঘটনা প্রকাশ পায় তখন কী হবে?

ভুবন বলে, ওসব নিয়ে ভাববেন না। সবাই জানে আপনার ট্রান্সপোর্টের ব্যবসা। আপনি একজন আদর্শ দেশপ্রেমিক—সমাজসেবী।

—তাই তো ভয় হে! যদি আসল খবর জেনে যায় সবাই?

হাসে ভুবন। বলে—কেউ টের পাবে না স্যার। আমি ওসব তদন্তের উপর পাথর চাপা দিয়ে দেব। তবে কিছু খরচা—বিজয় বলে—খরচার জন্য ভেব না। যেভাবে হোক পাথর চাপাই দাও তদন্তের উপর।

বিজয়ের অন্ধকার ব্যবসার বিজয়রথ এখন অপ্রতিহত গতিতে চলেছে। কাগজওয়ালারা, টিভিগুলোও তার দেশপ্রেম মানব দরদের কথা দরদ দিয়ে তুলে ধরছে।

সময় বসে থাকে না। সে তার নিজের গতিতেই বয়ে চলে। প্রমীলা এখন তার এই আশ্রমের জীবনকেই মেনে নিয়েছে। রোজ সকালে প্রার্থনা সঙ্গীতে দেখা হয় জয়ের সঙ্গে। জয় এবার উচ্চমাধ্যমিক দিয়েছে। মাধ্যমিকে ভালো রেজাল্ট করে স্কলারশিপ্ পেয়েছে। তার আশা যে উচ্চমাধ্যমিকেও ভালো ফল করবে। তারপর বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি পেয়ে গেলে শিক্ষকতাই শুরু করবে। জয় দেখেছে তার সহপাঠীদের, তাদের অনেকেরই স্বপ্ন ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার হবে। জয় বলে, হতে পারলে ভালো, তবে ওটাই একমাত্র আশা-স্বপ্নে পরিণত করার মতো কিছু নেই। ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার দরকার নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু একটা সমাজকে, দেশকে এগিয়ে যেতে হলে আরও অনেক শ্রেণীর মানুষ দরকার। শিক্ষক-অধ্যাপকরা না থাকলে ওসব তো হবেই না। মানুষও গড়ে উঠবে না। আমি চাই একজন প্রকৃত শিক্ষক হতে। আমার বেশি চাওয়ার সাধ নেই। বরং কিছু দিতে

চাই সমাজকে—দেশকে।

মহারাজও শোনেন ওর কথা। প্রমীলা বলে, তোর নিজের পথে তুই এগিয়ে যাবি জয়। পায়ের তলে শক্ত মাটি পাবি। আমাদের অপমানের জবাব দিবি সেই মানুষটাকে। এই আমি চাই।

জয়ও তা জানে। মায়ের এই চরম অপমান-অবহেলার জবাব তাকে দিতেই হবে। কলকাতায় গিয়ে সে বিজয় মিত্রকে খুঁজে বের করবেই। সে নাকি একজন নামী ব্যবসায়ী, বিশিষ্ট সমাজসেবী। জয় জানে সেই সমাজসেবীর অতীতের ইতিহাসটা।

মহারাজ বলেন, কিছু করার জন্য নিজেকে তৈরি হতে হবে জয়। এবার পরীক্ষাটা ভালোভাবে পাশ কর। তারপর ভাবা যাবে।

প্রমীলাও আজ মহারাজের উপরই নির্ভরশীল। ওই সকলত্যাগী মানুষটা আজ তাদের মতো বহু নিপীড়িত মানুষের জন্য জীবনপাত করছেন।

জয় এখন জেলার নামী ফুটবল প্লেয়ার। জেলার টিমের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করে। কলকাতার লিগেও খেলতে গেছে কয়েকবার। এখন সামনে পরীক্ষা। তাই পড়াশোনা নিয়েই ব্যস্ত।

পরীক্ষা হয়ে গেছে। কলেজ বলতে বেশ কিছুটা দূরে আসানসোল কলেজ। জয়ের চিন্তা হয়। আশ্রমের এই পরিবেশ ছেড়ে হয়তো তাকে এবার অন্য পরিবেশ যেতে হবে।

উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফল বের হয়েছে। জয় নিজের যোগ্যতায় একটা বিশেষ স্থান দখল করেছে। কাগজেও বের হয়েছে তার হাসি। তার বাবার নামও ছাপা হয়েছে। মহারাজ আজ সবচেয়ে বেশি খুশি হয়েছেন। তার আশ্রম স্কুলের নামও ছড়িয়ে পড়েছে। প্রমীলার চোখে জল আসে। বার বার সে কাগজে ছাপা ছবিটা দেখে। আজ যদি ওর বাবা ওখানে থাকত তাহলে হয়তো অনেক ভালো শিক্ষার সুযোগ পেত। কিন্তু মনে হয় প্রমীলার এই ভালো। সে এবার মহারাজের প্রদর্শিত পথেই চলবে। জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবে।

হঠাৎ প্রমীলার চোখে পড়ে খবরের কাগজের পাতায়। আর একটা ছবি। বিজয় কোন জনসভায় দেশসেবার বাণী প্রচার করছেন। সমাজ কল্যাণের জন্য বেশ কিছু টাকাও দান করেছেন। প্রমীলা চোখ ফিরিয়ে নেয় জয়ের ডাকে।

—মা, মহারাজ তোমাকে ডাকছেন।

কলকাতায় মহারাজের প্রিয় শিষ্য মহাদেববাবু ছিলেন কোনও কলেজের অধ্যাপক। সেই সঙ্গে সাংবাদিকতাও করেছেন। এখন তিনি দু'একটা সমাজ কল্যাণমূলক সংস্থার সঙ্গে জড়িত। কলকাতায় নিজের বাড়ি একমাত্র পুরনো কাজের লোক গোপালকে নিয়েই তাঁর সংসার। এছাড়া তিনি কলকাতার নামী ফুটবল ক্লাবের মেম্বার।

মহারাজ তাঁকেই লিখেছিলেন জয়ের কথা। জয়ের সম্বন্ধে সব কথা জানিয়ে অনুরোধ করেছিলেন যদি মহাদেববাবু ওকে বাড়িতে রেখে কলেজে পড়ার আর সেইসঙ্গে ফুটবল খেলার সুযোগ করে দেন তিনি বাধিত হবেন। ছেলেটা জেলাস্তরে খেলে। জাতীয় প্রতিযোগিতাতেও যোগ দিয়েছে কয়েকবার।

মহাদেববাবুও জাতীয়স্তরে ফুটবল কমিটির সক্রিয় সদস্য। তাই জয়ের নামটা তার চেনাজানা। আর খবরের কাগজে জয়ের রেজাল্টও দেখেছেন। বাড়ি তো পড়েই আছে। একটা ভালো ছেলেকে রেখে পড়াতে তাঁর কোনও অসুবিধাই হবে না। মহারাজকে মহাদেববাবু খুবই ভক্তি করেন। ছেলেটাকে পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য লিখে দিলেন মহারাজকে। এখান থেকে ও পড়াশোনা—খেলাধুলাও করবে।

মহারাজ তাই প্রমীলা-জয়কে ডেকেছেন। মহাদেববাবুর চিঠিখানা দেখিয়ে বলেন, খুব সৎ-আদর্শবান শিক্ষক মহাদেব। প্রকৃত সমাজসেবী। আর খেলাধুলার জগতেও একটা পরিচিত নাম। আমার ইচ্ছা জয় তুমি কলকাতায় ওর বাড়িতে থেকে নামী কলেজে পড়বে। ভালো টিমে ফুটবল খেলার সুবিধাও করে দেবে ও। আমিও নিশ্চিন্ত থাকব।

প্রমীলার ভয় হয়। কলকাতার সমাজকে সে দেখেছে। তাদের লোভ-চাওয়ার সীমা নেই। সেই লোভের রাজ্যে গিয়ে পড়লে যদি হারিয়ে যায় জয়! মহারাজ ওর চিন্তার কারণটা অনুমান করে বলে, ভয় পাচ্ছ? না মা—জয়কে আমি সেই শিক্ষা দিইনি। ও নিজেকে সংযত করেই চলবে। আর মহাদেব তো রয়েছে। সে আমাকে শ্রদ্ধা করে। সংসারে সে একা। তাই সকলকে নিয়েই তার সংসার। তুমি অমত কোরো না মা। আজ সকলকেই জয়ী হতে হবে। ভালো-মন্দ সমাজে থাকবেই। তাই সেই ভালো-মন্দ বিচার করতে হবে জয়কেই। তুমি ভেব না।

প্রমীলা আর কোনও কথা বলে না। সেও মত দেয় মহারাজের কথায়। প্রমীলাও জানে সেই বিজয় মিত্রকে খুঁজে পেতে হবে জয়কে। জয়েরও একটা চাপা রাগ আছে বাবার উপর।

মহাদেববাবু বেশ হৃদ্যতার সঙ্গেই গ্রহণ করেন জয়কে। জয়ও এখানে এসে খুশি হয়। বেশ সুন্দর বাড়িখানা। নীচে জিম মতো আছে। মহাদেববাবু বিদ্যাচর্চার সঙ্গে শরীরচর্চাও করেন। বাড়িতে তাঁর পুরনো কাজের লোক গোপালও বেশ হাসিখুশি—সাদাসিধে লোক। জয়কে বলে, তুমি এসেছ দাদাবাবু, শূন্য বাড়িটা তবু ভরে উঠল। আমারও কথা বলার একটা লোক হল।

জয় বলে, আমারও। তা কাকাবাবু গেছেন কোথায় ?

গোপাল বলে—তবে আর বলছি কি! কখন যে কোন্ কাজে কোথায় যান তা তিনিই জানেন। এসে পড়বেন, তুমি চা খাও। দোতলার ওই কোণার ঘরেই থাকবে তুমি। দক্ষিণ মুখী। হাওয়া ঢোকে প্রচুর।

এসে পড়েন মহাদেববাবু। বলেন, জয়! এই পাড়াতেই স্কটিশচার্চ কলেজের অধ্যক্ষ আমার বন্ধু থাকেন। তাঁর কাছে গিয়েছিলাম তোমার কথা বলতে। উনি সব দেখে খুব খুশি। কালই যেতে বললেন। শীঘ্রই ভর্তির ব্যবস্থা করে ফেলতে হবে। সামনের সপ্তাহ থেকে ক্লাশ। কলেজেও তোমাকে এমনি ভালো ফল করতে হবে।

—আর ফুটবল? তার কী হবে? জয় তার খেলার কথাও বলতে ভোলে না।

মহাদেববাবু বলেন—ঠিক আছে। কাল তো ময়দানে যাব। তুমিও যাবে সঙ্গে। সে ব্যবস্থাও করে দেব।

জয় খুশি। মহাদেববাবু যে এককথার মানুষ তা বুঝেছেন। আর দেখেছে নিঃসঙ্গ এই আদর্শবান মানুষটাকে। মহারাজও ঠিকই বলেছিলেন। মহাদেববাবুর আশ্রয়ে এসে জয় নিজেকে কলকাতা শহরে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে।

বিজয়ের ব্যবসা চলছে রমরম করে। এখন ভুবনও ব্যবস্ত। তার দলবলও কাজ করছে। ডকে বিদেশি জাহাজে মাল আসে। পুলিশেরও কড়া নজর থাকে। তবু তার মধ্যে দিয়েই তাদের মাল বের হয়ে আসে ট্রান্সপোর্টের গাড়িতে অন্য মালের সঙ্গে। সীমান্ত এলাকায় তাদের বেশ কয়েকটা ঘাঁটি আছে। সেইসব ঘাঁটিতে বহু লাখ টাকার বেআইনি মালপত্র আনা হয়, আর সুবিধামতো সেই সব মাল তাদের গুদামে চলে আসে।

দু'একজন মানুষ তাদের মাল নিয়ে টাকা দেয়নি। বিজয়ও হিসাব পত্র দেখে জানায় ভুবনকে।—এদের টাকা আদায় কর, না দিতে পারলে তো কোম্পানির লোকসান হবে।

ভুবন বলে—ওর জন্য ভাববেন না। বিজয়ও দেখেছে এই ব্যবসা জগতে খুন করাটাও যেন সহজ কাজ। ভুবন এসব কাজে দারুণ পটু। বিজয় ভুবনকে খুব ভালো চিনেছে। লোকটার লোভ-লালসা প্রচণ্ড। ওর পাল্লায় পড়েই বিজয় এই অন্ধকার জগতের পথে পা বাড়িয়েছিল। অর্থ পেয়েছে অনেক। পেয়েছে সে সমাজসেবী হয়েছে! পেয়েছে বহু মানুষের শ্রদ্ধা। এবার তার মনে হয়, ওই অন্ধকার পথের ব্যবসাপত্র তুলেই দেবে। ফিরে আসবে মূল স্রোতে, মাথা উঁচু করে। এতদিন মানুষের সামনে দেশ সেবকের মুখোশ পরে সবাইকে প্রতারিত করেছে। বিজয় দেখেছে, যে এই মুখোশপরা ভালোমানুষ সেজে যদি সমাজের মানুষের ভালোবাসা আদায় করতে পারে, সত্যিকার ভালোমানুষ

হলে তো আরও অনেক কিছুই করতে পারবে। তার মনে পড়ে স্ত্রী পুত্রের কথা। প্রমীলা জয়কে নিয়ে কতদিন হল চলে গেছে। সেও তাদের আর খবর নেয়নি। স্বামী পিতার কোনও কর্তব্যই সে করেনি। কোথায় কীভাবে আছে তারা, কিছুই জানে না। আজ নিজের প্রতি ঘৃণা বোধ হয়। নিজেকে নিয়ে, নিজের কামনা লালসা নিয়ে মেতে ছিল সে। মোহনলালের কথায় সেদিন নিজের স্ত্রী পুত্রকেও সে খুন করতে চেয়েছিল। সেই দুঃখ ঘৃণাটা ক্রমশ তার কাছে বড় হয়ে উঠেছে। তাই মনে হয় আর অন্ধকারের পথে এগোবে না সে।

ভুবনও লক্ষ করেছে বিজয়ের মনের এই পরিবর্তনটা। বিজয় বলে—ভুবন, অনেক হয়েছে। এবার এই ব্যবসা বন্ধই করে দেব। এসব সমাজের সর্বনাশের কাজ আর করব না। আমি বিদেশি পার্টিদেরও বলছি, আর মালপত্র নেব না।

ভুবন এবার চমকে ওঠে। তার অনুমান তাহলে সত্যি। এসব কাজে নামলে পিছু হটা যাবে না। ভুবনের চাই আরও অনেক টাকা। সে এখন নিজেও শক্তিধর। বেশ বুঝেছে ভুবন বিজয় বিদেশের পার্টিদের যদি নিজে এসব কথা বলে, তারা আর মাল দেবে না। ভুবনের আমদানি, তার দলবলের কাজও বন্ধ হয়ে যাবে। ভুবন তা হতে দিতে পারে না।

ভুবনের দলের প্রধান বিপুল ভুবনকে বলে, এসব কি শুনছি বস্! বিজয়বাবু এসব কাজ ছেড়ে দিতে চায়। ওটাকে ফুটিয়ে দিচ্ছি মোহনলালের মতো, ব্যস্, তাহলে তুমিই হবে চিফ বস্। এতদিন ধরে সেই কাওয়ার্ড লোকটার হয়ে কাজ করেছ এত বুদ্ধি দিয়ে। তোমার জন্যই ও এতবড় হয়েছে। কোটি কোটি টাকার মালিক হয়েছে এখন ডুবিয়ে দিয়ে যাবে আমাদের। তার আগেই ওকে ফুটিয়ে দেব।

ভুবনও সেই কথাটা ভাবছে। বিজয় না থাকলে সে নিজেই চিফ ডন হবে। তাই ভুবনও বলে, পারবি? পারবি বিপুল?

বিপুল বলে—আমার নিপুণ হাতের কাজ তো জানো গুরু।

বিজয় সেদিন একটা সমাজসেবী সংস্থার অনুষ্ঠান সেরে ফিরছে। এখন তার মনে হয় ভুবনকে সে জানিয়ে দেবে একাজে সে আর নেই। নির্জনপথে গাড়িটা চলছে। হঠাৎ সামনে একটা গাড়ি এসে পথ আটকায়। বিজয় চাইল। বিপুলকে সে ঠিক চেনে না। ওরা ভুবনের লোক। ভুবন তার তুরুপের সব তাস দেখাতে চায় না। নির্জনপথে বিপুল রিভলভার দিয়ে গুলি করতে যাবে, চমকে ওঠে বিজয়। হঠাৎ একটা অন্য তরুণ এসে বিপুলের হাতে লাথ মারতে হাতটা উপরদিকে উঠে যায়। আর গুলিটা আকাশের দিকে ছিটকে যায়। ছেলেটা এবার বিপুলের হাতের রিভলভার কেড়ে নেয়। এবার বিপদে পড়ে বিপুল। সামনে তারই রিভলবার হাতে সেই তরুণ বলে, দিনে দুপুরে রাস্তায় খুন করবে গাড়ি থামিয়ে। শেষই করব তোমাকে।

বিপুল আর তার চ্যালারা ভাবতেও পারেনি যে এইভাবে ওদের অস্ত্র কেড়ে নিয়ে ওদেরই হুমকি দেবে কেউ। ওরা এবার ভয় পায়। ধরা পড়লে পুলিশও ছাড়বে না। আর বিজয়ও চিফ মাফিয়া ডন। পুলিশে খবর না দিয়ে ডনই শেষ করে দেবে ওদের।

ওরা কোনওমতে গাড়িতে উঠে প্রাণ নিয়ে পালায়। ছেলেটা চলে যেতে যাবে। বিজয়ের ডাকে চাইল। বিজয় বলে, তুমি আজ আমাকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছ। তোমাকে এমনি ছেড়ে দিতে পারি না। চল আমার সঙ্গে। তাছাড়া ওরা আশেপাশে থাকতে পারে। তোমাকে ওরা ছাড়বে না। তাই তোমাকে নিরাপদে পৌঁছে দিতে হবে।

ছেলেটা আর কেউ নয়, জয়। সে কলেজ থেকে ফিরছিল। নির্জন দুপুরে পথে এই কাণ্ড দেখে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। ভদ্রলোককে বাঁচাবার জন্য। বাঁচাতেও পেরেছে।

বিজয় ওকে ওর বাগানবাড়িতে নিয়ে আসে। দু'চারজন কাজের লোক ছাড়া বাড়িতে আর কেউ নেই। বিশাল হল-ঘরটাতে বসার ব্যবস্থা রয়েছে। জয়ও এর মধ্যে জেনেছে বিজয়বাবু সংসারে একা। অনেকদিন আগে তার স্ত্রী চলে গেছে তাদের একমাত্র সন্তানকে নিয়ে। বিজয় বলে, তুমিই আমাকে

বাঁচিয়েছ, নাহলে ওই শয়তানের দল আমাকে শেষ করত। তোমার ঋণ আমি কোনওদিন শোধ করতে পারব না।

—কী কর?

জয় জানায়, আমি একটা আশ্রমে মানুষ হয়েছি। কলকাতায় এসে এক ভদ্রলোকের আশ্রয়ে মানুষ হয়েছি। কলেজে পড়ছি।

বিজয় আলমারি খুলে একটা মোটা প্যাকেট বের করে বলে, এটা রাখো। হাজার পঞ্চাশ টাকা আছে। তোমার পড়াশোনার কাজে লাগবে। যদি দরকার হয় আরও পাবে। জীবনে বড় হও।

জয় বলে, এ টাকা আমি নিতে পারব না। মহারাজের নিষেধ আছে। এর মধ্যে এদের খাবারও এসে গেছে। বিজয় বলে, টাকা নেবে না?

জয় ওকে আঘাত দিতে চায় না। তাই বলে, আপনার কাছে রেখে দিন, দরকার হলে চেয়ে নেব।

বিজয় বলে—তুমি আমার ছেলের মতো। নিজের ছেলের জন্য কিছু করতে পারিনি। তাদের উপর করেছি শুধু অবজ্ঞা আর অবহেলা। আজ তারই প্রায়শ্চিত্ত করছি। খাও তুমি, আমি আসছি।

বিজয় ভিতরে চলে গেল। জয়ও উঠে পড়েছে। হলের দেওয়ালে অনেক ছবি টাঙানো আছে। সেগুলো দেখছে। হঠাৎ ওদিকে একটা ছবির দিকে নজর যেতে চমকে ওঠে জয়। ছবিতে তরুণ বয়সের বিজয়কে দেখা যায় আর তার সঙ্গে তার স্ত্রী আর ছোট একটা ছেলে। ওই মহিলা আর কেউ নয় তার মা। আর ছোট ছেলেটা সে নিজে। আজ তার মনে হয় এতদিন ধরে যাকে খুঁজছিল জয় এ সেই ভদ্রলোক—তার বাবা। সেই ভদ্রলোক যে তাকে আর তার মাকে খুন করতে চেয়েছিল। আজ তার দলই নিজেদের স্বার্থে বিজয়কে শেষ করতে চায়। জয়ই তাকে বাঁচিয়েছে।

বিজয় ফিরে এসে দেখে খাবার-দাবার পড়ে আছে টেবিলে। সেই তরুণ ওই ছবির সামনে দাঁড়িয়ে আছে। চোখে মুখে ওর উত্তেজনার ছাপ। বিজয় বলে, কই, খাওনি?

জয়ও এবার ওর কথার জবাব না দিয়ে উত্তেজনাভরা কণ্ঠে বলে, আপনি বিজয়বাবু? বিজয় মিত্র না?

বিজয় অবাক হয়, হ্যাঁ কেন বল তো?

জয় ছবিটা দেখিয়ে বলে, এটা কার ছবি?

—আমারই। অনেকদিন আগের তোলা। সঙ্গে আমার স্ত্রী আর ছেলে। ওরা বহুদিন আগেই এই বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে।

জয় বলে—চলে যায়নি। আপনি তাদের খুন করতে চেয়েছিলেন, সেটা জানতে পেরে আপনার স্ত্রী আপনার সন্তানকে নিয়ে পালিয়ে গেছে। বিজয় চমকে ওঠে—কী বলছ এসব তুমি?

—ঠিকই বলছি। আমিই সেই ছেলে। আর উনি আমার মা।

এবার বিজয় আঁতকে ওঠে। এতদিন ধরে ওদের কথাই ভেবেছে। ওদের প্রতি অবিচার করেছে। বিজয় এগিয়ে আসে।

—ওরে জয়, আমি তোর সেই হতভাগ্য বাবা!

জয় প্রতিবাদ করে—আমি তা মানি না! কী করেছেন বাবার কর্তব্য? নিজের স্ত্রী-পুত্রকে খুন করতে চেয়েছিলেন। একটা অমানুষকে আমি আমার বাবার স্বীকৃতি দিই না। আর পরিচয়টা আগে জানা থাকলে নিজের জীবন বিপন্ন করে আপনার মতো লোককে বাঁচাতে যাবার আগে দু'বার ভাবতাম। আমি আপনাকে ঘৃণা করি—

বিজয় কিছু বলার আগেই জয় বের হয়ে যায়। বিজয় ব্যাকুলভাবে ডাকতে থাকে। জয় সাড়া না দিয়ে দ্রুত পায়ে বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে বিজয়। আজ তার জানা হল না প্রমীলা বেঁচে আছে কি না। কোথায় আছে? জয়ের কাছে তাকে স্বীকৃতি পেতেই হবে। জয়ের কলকাতার ঠিকানাটা আগেই জেনেছিল ওখানেই যেতে হবে, মহাদেববাবুর কাছে।

জয় তার অতীতকে ভুলে নতুন করে বাঁচতে চায়। তার বি. এসসি ফাইনাল পরীক্ষা হয়ে গেছে।

এখন তার মন খেলার দিকে। নামী দলের হয়ে খেলার সুযোগ পেয়েছে জয়। তার টিম লিগ ম্যাচ এবার ফাইনাল খেলবে। সে সারাক্ষণ মাঠে প্র্যাকটিসে ব্যস্ত। তার জন্যই আজ দলের উন্নতি। ফাইনালে জিততেই হবে টিমকে।

মহাদেববাবু সকালে বাড়িতে রয়েছেন। বিজয়কে আসতে দেখে তাকালেন। বিজয় মিত্রের নামটা তার চেনা। বিরাট ট্রান্সপোর্ট কোম্পানির মালিক। বিশিষ্ট সমাজসেবী। বিজয় এসেছে জয়ের খোঁজে। সে মহাদেববাবুকে তার অতীতের সব কথাই বলে। জয়কে তার বাড়িতে নিয়ে যেতে চায়। প্রায়শ্চিত্ত করতে চায় তার সব ভুলের। আবার নতুন করে বাঁচতে চায় সে।

মহাদেববাবুও তাই চান। তাই তিনিও বিজয়কে প্রমীলার ঠিকানাও দেন। সেই আশ্রমের ঠিকানা। বলেন, আপনি গিয়ে মহারাজের কাছে সব কথা জানান। আমার মনে হয় মহারাজই পারবেন সব সমস্যার সমাধান করতে। বিজয় বলে, তাই যাচ্ছি। তবে আপনিও যদি একটু বুঝিয়ে বলেন।

মহাদেবাবু বলেন, সামনে ওর লিগ ফাইনাল। ওর খুব ইচ্ছে বড় প্লেয়ার হবার। এখন ওই নিয়েই ব্যস্ত রয়েছে। আপনি আশ্রম থেকে ফিরে এসে জানান, ওর মাও লিগ ফাইনালের সময় এখানে আসবে। মহারাজের সঙ্গে বলুন। হয়তো সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। আমিও চাই জয় তার নিজের পরিচয়েই সমাজে মাথা তুলে বাঁচুক। ওর মাও।

প্রমীলা আশ্রমের কাজে নিজেকে ডুবিয়ে দিয়েছে। আশ্রমের গার্লস্ স্কুলের সেই-ই প্রধানা শিক্ষিকা। মহারাজও তার কাজে খুশি। এই অঞ্চলে ওর স্কুল বেশ জনপ্রিয়। আশ্রমের নানা সেবামূলক কাজের জন্য এলাকার লোকও খুশি।

ভোর থেকেই আশ্রমের নানা কাজ শুরু হয়। আশ্রমের নতুন অতিথিশালায় সেদিন হঠাৎ এসে হাজির হয় বিজয়। এই পর্বতবেষ্টিত সবুজ উপত্যকায় সুন্দর আশ্রম দেখে মুগ্ধ হয়। সকালে মহারাজ বসেন তাঁর ঘরে। সাধারণ মানুষের সেখানে অবাধ দ্বার। বিজয়ও তার সঙ্গে দেখা করে নিজের পরিচয় দিয়েছে। জানিয়েছে তাকে সব কথা। আজ সে অনুতপ্ত। তার স্ত্রী প্রমীলাকে আজ সে নিজের ঘরে নিয়ে যেতে চায়।

মহারাজও বিজয়কে তার নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে সব কথা শোনেন। বেশ বুঝেছেন তিনি, বিজয় আজ অনুতপ্ত। মহারাজও চান প্রমীলা-জয় তাদের হারানো পরিচয় ফিরে পাক। সমাজে ওরা নতুন করে বাঁচুক। তাই তিনি প্রমীলাকে ডেকে পাঠিয়েছেন।

প্রমীলা ভাবতেই পারেনি যে বিজয় এতদিন পর খুঁজে খুঁজে এখানেই আসবে। আর ওই মানুষটাকে এখানে দেখে বলে, মহারাজ, ওঁর কোনও কথাই বিশ্বাস করবেন না। ওঁর মতো লোকের পায়ের স্পর্শে এ পবিত্র আশ্রমও অপবিত্র হয়ে যাবে। ওঁকে চলে যেতে বলুন। নিশ্চয়ই উনি কোনও বিশেষ মতলব নিয়ে এতদিন পর এসেছেন—

বিজয়ও অবাক হয়। বলে সে—আমি আজ অনুতপ্ত।

—তাতে আমার কিছুই যায় আসে না। সেদিন যাদের শেষ করে দিতে চেয়েছিলে, আবার তাদের ডেকে নিয়ে গিয়ে সেই কাজটা করবে না, তা কে জানে? দয়া করে আমাকে এখানে শান্তিতে থাকতে দাও। জয়কেও তার নিজের চেষ্টাতেই পায়ের তলে মাটি পেতে দাও। ওর শান্তির জীবনে আর তুমি অশান্তি এনো না। তোমার কাছে এইটুকুই চাওয়া—

বিজয় বলে—আমাকে কি ক্ষমাও করতে পার না?

—তোমাকে ক্ষমা করা আমার কাছে কঠিন কাজ। এতগুলো বছর কীভাবে কেটেছে আমাদের, একবার খবরও নাওনি। তোমার থেকে দূরে থাকাই ভালো। তুমি চলে যাও। আমাদের মুক্তি দাও।

মহারাজ শুনছিলেন প্রমীলার কথা। ওর ব্যর্থ জীবনের কাহিনি, ওর দুঃখের ইতিহাস তিনি সবই জানেন, তাই তার এই প্রতিবাদের কথায় তিনিও বাধা দেননি।

প্রমীলাই বলে, মহারাজ, আপনি আশ্রয় না দিলে মা ছেলেতে মরেই যেতাম। আপনিই আমার

কাছে দেবতা-অন্নদাতা। আমাকে আশ্রমেই থাকতে দিন। অনেক পাবার আশায় যেন আর ভুল না করি এই আশীর্বাদই করুন।

মহারাজকে প্রণাম করে প্রমীলা বের হয়ে যায়। বিজয়ও হতাশ হয়। বলে সে,—আমার প্রার্থনা কি পূর্ণ হবে না মহারাজ?

মহারাজ বলে—ঈশ্বরকে ডাকো, তিনি দয়াময়। সবার মনস্কামনা তিনি পূর্ণ করেন। আমরা তো উপলক্ষ মাত্র।

বিজয় হতাশ হয়েই শূন্য হাতে আশ্রম থেকে ফিরেছিল। মহারাজও শুধুমাত্র আশাই দিয়েছেন তাকে। আর কিছুই করেননি। আজ বিজয়ের মনে হয় সত্যি এতদিন যা করেছে, সব ভুলই করেছে। জীবনে বহু অর্থ সে রোজগার করেছে, কিন্তু অন্তরের দিক থেকে সর্বহারা-নিঃস্ব। এবার বিদেশি পার্টিদেরও জানিয়ে দেয় যে সে আর কারবার করছে না।

বিপদে পড়েছে ভুবন। এবার সেই কারবারও উঠে যাবে। বিপুল বলে, বস্ একবার উড়িয়ে দিতে গিয়ে পারিনি। দুসরা বার খালি হাতে আসব না। ওর ব্যবসাপত্র তুমিই দখল করবে। আমরা তোমাকেই চিফ মেনে নিয়ে কাজ করব।

ভুবন বলে, তাই হবে। এবার খোঁজ খবর নে। এখন তো দেখছি বিজয়বাবু শ্যামবাজারে মহাদেববাবুর বাড়িতে যাতায়াত করছে।

—ওই ছোঁড়াটা —ওই যে ফুটবল খেলে, সেই তো সেদিন আমাদের রুখে দিয়েছিল। বিজয়বাবু ওকেই বডিগার্ড রাখতে চায় মোটা টাকা দিয়ে। বিপুল বলে।

ভুবন বলে, দুটোকেই উড়িয়ে দেব।

বিপুল বলে সামনে লিগ ফাইনাল খেলা। জয় খেলবে সেদিন। মনে হয় বিজয়বাবুও যাবে মাঠে ওর খেলা দেখতে।

ভুবন বলে, খেলা শেষ হলে দুটোকেই উড়িয়ে দিতে হবে।

বিজয় এসেছে মহাদেবের কাছে। মহাদেববাবু লিগ ফাঁইনাল নিয়ে ব্যস্ত। বিজয় বলে আশ্রমের সব কথা। বলে, জয়ের মাই আমাকে ফিরিয়ে দিল।

মহাদেববাবু বলেন, প্রমীলা দেবী আসছেন ফাইনাল খেলার দিন। আপনিও মাঠে আসুন সেদিন।

লিগ ফাইনালের দিন মাঠ কানায় কানায় পূর্ণ। বিজয়ও এসেছে। দেখে ভি আই পি সিটে মহাদেববাবুর সঙ্গে প্রমীলাদেবী এসেছেন। জয়ও মাঠে নামার আগে মাকে, মহাদেববাবুকে প্রণাম করে। প্রমীলাও দেখে বিজয়কে। কিন্তু না দেখার ভান করে মুখ ফিরিয়ে নেয়। জয়ও পিছনের সারিতে বিজয়কে দেখেও যেন না দেখে চলে গেল। ওর আশীর্বাদের যে কোনও দরকারই নেই সেটাই যেন জানিয়ে দিয়ে চলে গেল। বিজয়ের মনে একটা হতাশার বেদনা। তবু সে এসেছে। আশা ছাড়েনি।

খেলা শুরু হয়। জয় এই দলের অন্যতম সেরা প্লেয়ার। তার পায়ে বল পড়তেই দর্শকরাও উত্তেজিত হয়ে ওঠে। চিৎকার ওঠে-গোল -গোল চাই—জয়ও খেলছে দারুণ। আর তার জন্যই ওদের টিম দুটো গোল দিয়ে জেতে ফাইনাল ম্যাচ।

তাদের টিম জিতেছে। মহাদেববাবুও খুশি হয়। টিভি-মিডিয়ার লোক জয়কে ঘিরে ধরেছে। ওদের ছাড়া পেতে সন্ধ্যা হয়ে যায়। বিজয় ওদিকে একাই দাঁড়িয়ে আছেন। তার মনে হয় এবার যদি এই খুশিতে তার প্রার্থনা মঞ্জুর হয়। মহাদেববাবু বলেন, চলো ফিরতে হবে।

ওরা বাইরে কার পার্কিংয়ের দিকে এগিয়ে যায়। মাঠে তখন আলো জ্বলে উঠেছে। তবু গাছ গাছালির ছায়ান্ধকার রয়েছে। বিজয়ও নজর রেখেছিল ওদের উপর। মহাদেববাবুর কথামতো বিজয় গাড়ির দিকে চলেছে।

বাইরে ভুবন তার দলবল নিয়ে ওৎ পেতে ছিল। ভুবন প্রমীলাকে দেখে চমকে ওঠে। বিজয়ের স্ত্রীকে সে চেনে। আর জয়কেও চিনেছে। ভুবনের কাছে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়।

বিজয় তার স্ত্রীকে ফিরে পেয়ে এই ব্যবসা ছেড়ে আবার নতুন করে বাঁচতে চায়। বলে ভুবন, বিপুল, ওই জয় আর বিজয়, দুটোকেই খতম করতে হবে। বিপুলও তৈরি।

ওদের দেখতে পেয়েছে বিজয়। বিপুল সেই মুহূর্তেই গুলি করেছে জয়কে। কিন্তু তার খেয়াল হয় কে যেন লাফ দিয়ে সামনে পড়ে তাকে ধাক্কা দিয়ে মেরে মাটিতে ফেলে দিল। আর গুলিটা এসে লাগে তার বুকে। সে বিজয়। নিজের সন্তানকে বাঁচাবার জন্যই আজ সে এই কাজ করেছে। গুলির শব্দে দর্শকদের মধ্যে কলরব ওঠে। আর মাঠের পুলিশ বাহিনীও এসে ঘিরে ফেলে ভুবন-বিপুলদের দলসমেত। প্রমীলা-জয়ও চমকে ওঠে, রক্তাক্ত বিজয়কে দেখে।

জয় বলে, এ কী করলেন?

বিজয় দেখছে তার স্ত্রী-পুত্রকে। বলে সে, জীবনে তোমাদের উপর অন্যায়-অবিচারই করেছি। আজ এটুকু করে তবু প্রায়শ্চিত্ত করে গেলাম। জয়, একদিন তুমি আমাকে ওদের হাত থেকে বাঁচিয়েছিলে। আজ সেই ঋণের কিছুটা শোধ করার চেষ্টা করলাম।

প্রমীলা দেখছে। সেও এবার বিজয়ের অবস্থা দেখে ব্যাকুল হয়ে ওঠে। বলে, ওকে হাসপাতালে নিয়ে চল।

বিজয়ের জীবনপ্রদীপ যেন নিভে আসছে। বলে সে, জীবনে অনেক অর্থ-প্রতিষ্ঠা পেয়েছি। পাইনি বাবার-স্বামীর স্বীকৃতি। প্রমীলা জয়কে নিয়ে শান্তিতে থাকো। আমার সব কিছু আশ্রমের কাজে লাগিয়ো। আমার আত্মা শান্তি পাবে। আর যদি পার আমাকে ক্ষমা কোরো।

প্রমীলা বলে, ওরে জয়, তোর বাবা—

জয়ও আজ দেখে, নিজের প্রাণ দিয়ে সন্তানকে বাঁচিয়ে পিতার কর্তব্য পালন করেছে বিজয়। জয়ও কান্নায় ভেঙে পড়ে।

—বাবা!

কিন্তু বিজয় তখন ঢলে পড়েছে মৃত্যুর কোলে। জয়ের সেই স্বীকৃতি-প্রমীলার আর্তকণ্ঠ তার কানে আর কোনওদিনই পৌঁছাবে না।

কালরাত্রি

কুসুমপুর বেশ বর্ধিষ্ণু গ্রাম। জেলায় তার নামডাকও আছে। স্কুল-কলেজ, রেলপথ দু-তিনটে ধানকলও আছে এখানে। ফি-বছর ফসলের ফলনও ভালো। তেফলসি জমি সব। ধান যেমন হয়, শাক-সবজিও। সেচের সুবন্দোবস্ত আছে।

দিন গুজরানের জন্য এখানকার মানুষকে অত চিন্তা করতে হয় না। গড়গড়িয়ে চলে জীবন। পড়াশুনোর পাশাপাশি পড়ুয়ারা মেতে থাকে গানবাজনায়। আর বছরভর তারা অপেক্ষা করে থাকে শীতের শেষের মেলাটির জন্য। তখন যা আমোদ-আহ্লাদ হয় তার তুলনা নেই।

অঞ্চলে মেলাকে জবরদস্ত করে তুলতে অঞ্চলপ্রধানেরও পরিশ্রমের শেষ নেই। বর্তমান অঞ্চলপ্রধান ভূপতিবাবুরা ছিলেন এককালের জমিদার। জমিদারি গিয়েছে। তবে ভূপতিবাবুরা আজও বেশ সম্পন্ন। ধান-চাল-পাটের ব্যবসায় গুছিয়ে নিয়েছেন সংসার।

ভূপতিবাবুদের ধানকল ভালোই চলছে। নরেনই দেখে ব্যবসাপত্র। ভূপতিবাবুর ছেলে সে। ইতিমধ্যে কলকাতাতেও শুরু করেছে ছোটখাটো একটা ব্যবসা। প্রায় দাঁড় করিয়েও ফেলেছে। মেলার খাতে বেশ খাটা-খাটনিও করে নরেন। গ্রামীণ মেলার জন্য সরকার এখন ভালোই অর্থসাহায্য করে। তাছাড়া মেলায় বড় বড় স্টল বসিয়ে আমদানির পথটাও সাবলীল রাখা আছে। মেলা-আয় যে বেশ লোভনীয় তা খতিয়ে জেনে নরেন হয়ে উঠেছে কর্মকর্তাদের একজন। তার স্যাঙাৎ জুটেছে বেশ ক'জন। বাবুকে যেমন ঘিরে থাকে পারিষদের দল। লক্ষ্য একটাই—মধু সন্ধান। পকেটের স্ফূর্তি।

নরেন ও তার চেলারা যে স্বার্থেই জুটুক মেলায়, স্থানীয় শিল্পীরা কিন্তু সম্বৎসর মুখিয়ে থাকে এমন একটা মঞ্চে পারফর্ম করার জন্য। দূর-দূরান্ত থেকে আসা মানুষজন যদি বায়না দেয় অনুষ্ঠানের। এমন যে একেবারেই ঘটে না তা নয়। কেউ কেউ দূরের গ্রামে নাচ-গান-লোকসঙ্গীত পরিবেশনের সুযোগ পায় বৈকি!

বৈশাখী এই কুসুমপুরের মেয়ে। এবার মাধ্যমিক দিয়েছে। তার বাবা কেদারবাবু সঙ্গীতের বিশেষ অনুরাগী। কলকাতায় থেকে গানের চর্চা করতেন একসময়। সে তাঁর বয়সকালের কথা। এখন থাকেন বাড়িতেই।

বৈশাখীও চেনে নরেনকে। দু-একবার দেখা হয়েছে। সে অভিজ্ঞতা আদৌ সুখকর নয়। বেয়াড়া ছেলেটার নজর খারাপ। দেখেই বুঝেছে। তাছাড়া নরেনের নামে তো অনেক কথাই কানাঘুষোয় শোনা যায় চতুর্দিকে। ওদের বাগানবাড়িটা এখনও আছে। ভূপতিবাবু ওখনে নাকি নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে সরকারি আমলা-নেতাদের ঢালাও মনোরঞ্জনের ব্যবস্থা করেন। বাপ করেন একরকম আর ব্যাটা মাঝেমধ্যে নানা অছিলায় আশপাশের গ্রামের মেয়েদের নিয়ে গিয়ে মৌজ-মস্তির আসর জমায়। বাগানবাড়িতে যাবার প্রস্তাব তো বৈশাখীকেও দিয়েছিল নরেন। বলেছিল, এসো না বাগানবাড়িতে একদিন, গান শোনা যাবে। দেখব কিছু করতে পারি কিনা তোমার জন্য। নতুন শিল্পীরা আমাদের মেলার অনুষ্ঠানে গান গাইতে আসুক আমি চাই। নামডাক হবে তাদের, চলে এসো একদিন।

বৈশাখী এমনিতে তেজী মেয়ে। বলেছিল—আমি কারুর বাগানবাড়িতে গান গাইতে যাই না। নরেন ভাবতে পারেনি বৈশাখী এভাবে মুখের উপর জবাব দেবে।

নরেনের চ্যালা কানু বলে, জবাবটা শুনলে বস্‌! তোমার মুখের উপর না করে গেল? কানুর কথায় মুখ চালায়নি নরেন। মনে মনে স্থির করে নিয়েছিল—এর জবাব সে বেশ তরিজুত করে দেবে। জুতসই জবাব।

এরমধ্যে বৈশাখী মেলা কমিটির কাছে দরখাস্ত করেছে গান গাইবে বলে। রতন বলেছে, সে শুনেছে যাদের চান্স হয়েছে তাদের থেকে নাকি নরেন ভালো টাকা নিয়েছে। সাবিত্রী বলেছেন, ওসবে না গিয়ে বাড়িতে যেমন গান গাইছে বৈশাখী তাই করলেই হয়। কিন্তু কেদারবাবু মেয়েকে বলেছেন—প্রকৃত শিল্পীর মর্যাদা ওদের দিতেই হবে। দেখাই যাক না কি বলে ওরা। বাবার কথায় দরখাস্ত পাঠিয়েছে বৈশাখী।

মেলার উদ্বোধন হয়ে গেছে এর মধ্যে। রতন অবশ্য মেলায় একটা দোকান দিয়েছে। ক'দিনে বেশ জমে উঠেছে মেলা। বাইরে থেকে এসেছে নানারকম স্টল। রতনের স্টলের পাশেই তৈরি হয়েছে একটা নতুন স্টল। এসেছে শহর থেকে। শহরের এক তরুণশিল্পী এনেছে তার হাতে আঁকা সুন্দর ছবি, নানা ভাস্কর্যের কাজ, মাটির-চিনা মাটির তৈরি হরেক মূর্তি। নানান ভাস্কর্য। শিল্পীর নাম রাহুল সেন। তার স্টলে লোকজনও ভিড় জমিয়েছে। নিজের স্টল ছেড়ে একবার রাহুলের স্টলেও ঢুঁ দিল রতন। রতনের থেকে দু-এক বছরের বড়ই হবে রাহুল। কিন্তু একেবারে দিলখোলা ছেলে সে।

রাহুল আর্ট কলেজের কৃতী ছাত্র। ওর ছবি ইতিমধ্যে একজিবিশনে দারুণভাবে প্রশংসিত। কিছু ছবি গেছে বিদেশেও। রাহুল শহরের লোক। মেলার সরকারি অধিকর্তা মিঃ রায়ের বিশেষ পরিচিত। তাঁর কথাতেই এখানে এসেছে। কিন্তু এই গাঁ-গঞ্জে এসে পড়েছে সমস্যায়। খাওয়া-দাওয়া করবে কোথায়? চিঁড়ে-মুড়ি শুকনো খাবারে এখনও চলছে কিন্তু বাকি দিনগুলো চালাবে কি করে? শুধু রাহুল নয়, সঙ্গী দুই সহকারীরও অবস্থা তথৈবচ। রতন অবস্থা অনুমান করে রাহুলকে বলে, তোমরা বরং আমার বাড়িতেই ক'দিন খাওয়া-দাওয়া করে নিও। প্রথমে রাহুল মানতে চায়নি এই ব্যবস্থা। কিন্তু নাছোড় রতনের কাছ থেকে নিস্তার কোথায়!

রাহুল ওদের তিনজনকে নিয়ে বাড়িতে আসে দুপুরে। সাবিত্রী তাদের জন্য খাবার তৈরির আয়োজনে ব্যস্ত হন। মাকে সাহায্য করে বৈশাখী। বৈশাখীর রূপে মোহিত হয় রাহুল। রতন পরিচয় করিয়ে দেয়। বলে—আমার বোন। ভালো গান গায়।

রাহুল বলে, তাহলে তো মেলার এই সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় তুমি নিশ্চয়ই গাইবে!

বৈশাখী সলজ্জভাবে বলে, ইচ্ছে তো আছে।

রতন বলে, ইচ্ছা থাকলেই তো শুধু হবে না! সিলেকশান কমিটি অডিসান নিয়ে লিস্ট টাঙাবে—কে কে চান্স পাবে?

রাহুল বলে, অডিসান দিয়েছ?

হ্যাঁ, দিয়েছি। কে জানে চান্স পাব কিনা!

রতন যেন আরও কিছু বোঝাতে চাইছিল। কথা না বাড়িয়েই।

সেদিন রতনের বাবার সঙ্গেও কথা হল রাহুলের। সঙ্গীতপ্রিয় মানুষটি। মা-ও আদ্যন্ত ভালো। আর বৈশাখীকে দেখে একেবারে বিমুগ্ধ সে। পরিবারের প্রত্যেকের সঙ্গে মিশেই তার অদ্ভুত ভালো লাগে। রাহুলকেও ভালো লাগে সকলের।

এরমধ্যে যথারীতি মেলার সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় কে কে গাইবে তার তালিকা প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে অতি অবশ্যই বৈশাখীর নাম নেই।

বৈশাখী খবরটা শুনে চমকে ওঠে। মুহূর্তে তার সুন্দর মুখটা ফিকে হয়ে যায়। চোখ জলে ভরে ওঠে। এজন্যে রতন দুষতে থাকে নরেনকে।

এদিকে রাহুলও বৈশাখীকে কাঁদতে দেখে অবাক হয়। বৈশাখীর গানের রেওয়াজ শুনেছে সে। চান্স ওর পাওয়াই উচিত ছিল। রাহুল সান্ত্বনা দিয়ে বৈশাখীকে বলে, এসবে তুমি মন খারাপ কোরো না। শিল্পীর জীবনে এসব তো রোজকার ঘটনা।

পরের দিন মেলার প্রধান কর্মকর্তা মিঃ রায় রাহুলের স্টলে এলেন। স্টলে জিজ্ঞেস করে জানলেন, পড়ে তখন স্টলের পেছনে দাঁড়িয়ে একটি ছবি আঁকছে ক্যানভাসে। মাঠের মধ্যে একটি নারী। দেখে ম' ক বাহবা জানালেন। রাহুল তাঁকে বলে, এখানে কি যোগ্য শিল্পীরা আপনাদের পৃষ্ঠপোষকতা পায়? কথায় কথায় রাহুল জানায়, এবারের সঙ্গীত প্রতিযোগিতার তালিকাতেই তো অনিয়ম।

অনিয়ম বিষয়ে কানাঘুষো দু-একটা অভিযোগ যে মি. রায়ের কাছে এসে পৌঁছোয়নি তা নয়। নরেনবাবু যে কী করছে না! নরেনকে এবার ডাকলেন মি. রায়—এবারকার সঙ্গীত প্রতিযোগিতার অডিসানের ফলটা নিয়ে আসুন তো!

নরেন বলে, ওসব তো ফাইনাল হয়ে গিয়েছে।

মি. রায় ফাইল নেড়েঘেঁটে দেখেন, বৈশাখী মিত্র সবচেয়ে বেশি নম্বর পেয়েছে অডিসানে। কিন্তু তালিকায় তার নামটাই তো নেই!

নরেন এবার চমকে ওঠে। নিজেকে বাঁচাতে বলে—ইস্ দারুণ একটা মিস্টেক হয়ে গেছে। আপনি কিছু ভাববেন না। আমি বৈশাখীকে চান্স দেবার জন্য বলছি। আজই লোক পাঠাচ্ছি ওদের বাড়িতে।

বৈশাখীর বাড়িতে লোক গেল চিঠি নিয়ে। প্রতিযোগিতায় বৈশাখীর চান্স পাবার খবর আছে তাতে। কেদারবাবু খুশি, রতনও তাই। খুশি মা। রাহুলও খবরটা শুনল। সেই-ই তো শুধু জানে আসল নেপথ্য। এদিকে বৈশাখী দারুণ উদ্যমে রেওয়াজ করে যাচ্ছে। আগামীকালই তো তাকে গাইতে হবে।

রাহুল না ভাঙলে কী হবে, রতন খুঁজে ঠিক বার করে নিয়েছে—রাহুল মি. রায়ের কাছে ঘটনাটা তুলে না ধরলে, বৈশাখী চান্স পেতো না।

বৈশাখী নিজেকে উজাড় করে গান গাইল প্রতিযোগিতার দিন। মি. রায় গান শুনে অবাক। একেই বাদ দিয়েছিল ওরা!

এদিকে নরেন চটে লাল। বৈশাখীকে ফাঁদে ফেলার সুযোগ খুঁজছে সে! রাহুলের ওপরও তার বেজায় রাগ! মি. রায়ের স্নেহভাজন না হলে, তাকেও দেখে নিত সে।

মেলা শেষ। রাহুল ফিরে গিয়েছে। বৈশাখীর মনটা ভালো নেই। তার মনে পড়ে রাহুলের কথা। কয়েকদিন যেন একটা স্বপ্নের ঘোরেই কেটে গেছে তার।

যাবার সময় ভুলে রাহুলের ঠিকানাটাও নিয়ে রাখা হয়নি।

সেদিন সন্ধ্যা হয়ে গেছে, বৈশাখী গিয়েছিল ওর এক বান্ধবীর বাড়িতে। ফিরতে ফিরতে দেরি হয়ে গেল। তখন গাছ-গাছালির ফাঁকে অন্ধকার নেমেছে। জায়গাটাও নির্জন। আসছে বৈশাখী। হঠাৎ সেই অন্ধকারের মধ্যে দু'জন বেরিয়ে আসে। চমকে ওঠে বৈশাখী। তাদের হতে ভোজালি, একজনের মুখ ঢাকা একটা কালো কাপড়ে। ওদের মধ্যে একজন চাপা গলায় বলে, একদম শব্দ করবি না। করলে ভোজালি দিয়ে টুটি ছিঁড়ে নেব। এ্যাই, নিয়ে চল এটাকে। ওরা নিমেষের মধ্যে বৈশাখীর মুখটা শক্ত কাপড় বেঁধে টেনে নিয়ে গিয়ে একটা জিপে তুলে উধাও হয়ে গেল।

বৈশাখী জানতে পারে ওকে ওরা তুলে এনেছে নরেনদের বাগানবাড়িতে। নদীর ধারেই এই নির্জন বাগানটা। ওরা বৈশাখীকে নিয়ে ওদিককার ঘরে রাখে। বৈশাখী দেখতে পায় নরেনকে।

বৈশাখী এবার বলে—আমাকে কেন তুমি আনলে এভাবে?

নরেন বলে—সোজা আঙুলে ঘি না উঠলে আঙুলটাকে বাঁকা করতে হয়। ভালো কথায় আসো নি—তাই এইভাবেই আনতে হল তোমায়। এবার তোমার তেজ কোথায় থাকে দেখব।

নরেন ওর চ্যালাদের বলে, ওকে ওঘরে আটকে রাখ। পরে এর ব্যবস্থা করতে হবে।

রাত্রি হয়ে গেছে। বৈশাখী বাড়ি ফেরেনি। চিন্তা করে কেদারবাবু। সাবিত্রী বলে—বান্ধবীর বাড়ি যাবে বলেছিল, ওখান থেকেও তো বের হয়ে এসেছে বৈশাখী। এখনও বাড়ি ফিরল না?

বৈশাখীর খোঁজে রতনও বের হয়েছিল দু-একজন বন্ধুকে নিয়ে। বেশ কয়েক জায়গায় গিয়েছিল, কিন্তু সেই তার কোনও খবরই মেলেনি। কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না বৈশাখীকে। কেদারবাবু বলে, আমার মনে বৈশাখীর কোনও বিপদ হয়েছে। ওরে রতন—থানায় চল। একটা রিপোর্ট লেখাতে হবে। সাবিত্রী দেবী বলেন, সে কি গো, মেয়েটাকে নিয়ে থানা-পুলিশ করবে? লোক-জানাজানি হলে তো আরও বিপদ হবে।

কেদারবাবু বলেন, বিপদের আর কি বাকি আছে। চল রতন। মনে হয় এসব সেই নরেনের-ই কীর্তি। এসব কথা এর আগেও তাঁর কানে এসেছে।

থানাতেই এসেছেন কেদার-রতন। থানার অফিসার শাস্ত্রীবাবু তখন বেশ আরাম করে নিদ্রা দিতে ব্যস্ত। এসময়ে কেদারদের আসতে দেখে সহকারী বলে, কাল সকালে আসবেন। বড়বাবু এখন বিজি।

কেদারবাবু বলেন, ডেকে দিন বড়বাবুকে।

থানার অফিসার বিরক্ত হয়ে উঠে আসেন। কেদারবাবুর মুখে ওঁর মেয়ে হারিয়ে যাবার কথা শুনে বলেন, দেখুন কোনও প্রতিবেশীর সঙ্গে ভেগেছে মনে হয়। যাবে কোথায়? ঠিক ঘরে ফিরে আসবে।

রতন বলে, না। ওকে তুলে নিয়ে গেছে নরেনেরই দলবল। ওদের বাগানবাড়িতে চলুন। ঠিক ওখানেই পাবেন বৈশাখীকে। হতেনাতে ধরতে পারবেন নরেনকে।

থানার বড়বাবু ভূপতিবাবুদের কাছে ভেজাল চালের বাবদে মোটা একটা ঘুষ পান। তাই নরেনের নাম শুনে বড়বাবু বলেন, গ্রামে আর কোনও লোক পেলেন না! নরেনবাবুদের নামে নালিশ করতে এসেছেন। এখন যান তো! কাল সকালে আসবেন। দেখুন গিয়ে মেয়ে হয়তো ফিরে এসেছে। আর নাহলে কাল সকালে আসবেন। দেখা যাবে তখন কী করা যায়!

থানা থেকে একরকম তাড়িয়েই দিল ওঁদের।

ওঁরা ফিরে আসেন—তখনও ঘরে ফেরেনি বৈশাখী।

গ্রামের দু-চারজন বৈশাখীর খবরটা পেয়ে এসে হাজির হয়েছে। ইতিমধ্যে সবাই জেনে গেছে—বৈশাখী বাড়ি ফেরেনি। কেউ কেউ বলে, মেলার সেই ছেলেটা —সেই যে শিল্পী ছোকরাটার সঙ্গে পালিয়ে যায়নি তো। দু'জনে বেশ মেলামেশা করত। কেউ বলে, কেদার! তখনই বলেছিলাম, মেয়েটাকে আর লেখাপড়া, গানবাজনা না শিখিয়ে বিয়ে দিয়ে দাও। তা তো শুনলে না, এখন দেখলে তো কী হল! ও মেয়ে ঘরে আর ফিরবে না। কেউ বলে, ঘরে ফিরলেও সমাজ তাকে কিভাবে মেনে নেবে সেটা ভেবে দেখতে হবে।

এসব কথা যেন কেদারবাবুর মনে ঝড় তোলে। রতন তখনও খুঁজে চলেছে বৈশাখীকে।

বাড়ির কথা ভাবছে বৈশাখী। তার সর্বনাশ যা হবার হয়ে গেছে। সে জানে গ্রামের লোক এসব খবর নিয়ে বেশ ঘোঁটই পাকাবে। ঘরে ফেরা তার হবে না। তবু এই নরেনের অত্যাচার সে মুখ বুঁজে মেনে নিতে পারবে না। তাকে বের হতেই হবে। এখান থেকে বের হয়ে সে পালাবে।

নরেন ওদিকে মদ খাচ্ছে। দলবল নিয়ে যেন আজ একটু বেশিই আনন্দে মেতেছে তারা। এই ফাঁকে বের হয় বৈশাখী। বাইরে অন্ধকার নেমেছে—অন্ধকারের রাত্রে বিন্দুর মতো জ্বলছে দু-চারটে ঝিঁ ঝিঁ পোকা। বৈশাখী চলেছে সাবধানে। ঠিক করেছে সে, এই বাগানের পাঁচিল টপকেই বের হয়ে যাবে। কিন্তু গাছের ঝরাপাতায় পা ফেলতে মচমচ শব্দ ওঠে। নরেনরা ওদিকে ছিল। সেই শব্দ শুনে ওরাও বের হয়ে আসে। মধু চিৎকার করে—বস্, মেয়েটা পালাচ্ছে।

নরেন বলে, ধর। ধর ওটাকে।

ওরা দল নিয়ে এগিয়ে আসে।

বৈশাখীও গ্রামের মেয়ে। সেও বুঝছে বিপদের গুরুত্ব। তাকে এদের হাত থেকে বাঁচতেই হবে।

বৈশাখীও এবার একটা দেবদারু গাছে উঠে ওদিককার পাঁচিল দিয়ে বাইরের ডাল থেকে লাফ দিয়ে পড়ে। এবার চোঁ- চোঁ দৌড় লাগায়।

মধুও তার দলবল নিয়ে ওর পিছনে লেগেছে। বৈশাখী আবছা চাঁদের আলোয় দেখতে পায় ওদেরকে। বৈশাখীকে পালাতেই হবে। সে এবার এসে পড়ে নদীর ধারে।

বর্ষার জল পেয়ে নদী এখন ফুলে ফেঁপে উঠেছে। পিছনেই ছুটে আসছে মধুর দল। বাঁচতে তাকে হবেই।

বৈশাখীর সামনে আর কোনও পথই নেই। সে লাফ দিয়েছে এই বর্ষার নদীতে। মধুর দলও এসে পড়ে—তার সামনেই বৈশাখী সেই নদীতে লাফ দিয়েছে।

দারুণ স্রোত তখন নদীতে। চারদিক ঘিরে রয়েছে রাতের অন্ধকার। নদীর স্রোত আর অন্ধকারে তারা বৈশাখীর ভেসে যাওয়াটা ঠিক ঠাহর করতে পারে না।

ওরা শূন্য হাতেই ফিরে যায়।

ততক্ষণে ভেসে গিয়েছে বৈশাখী—নদীর স্রোতকে খেয়ালও করেনি। এরপর থেকে তার জ্ঞান পুরোপুরি হারিয়ে যায়।

ভোরবেলায় নদীতে স্নান করে নদীর ধারে মায়ের মন্দিরে পুজো দিতে আসেন নাথবাবু। রোজ। এতকাল তিনি ছিলেন এখানকার পরমশ্রদ্ধেয় হেডমাস্টারমশাই। বহু গরিব ছেলেকে নিজে আশ্রয় দিয়েছিলেন—তাদের পড়াশুনা শিখিয়ে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিয়েছেন। এখন নাথবাবুর বয়স হলেও বিভিন্ন সেবামূলক কাজে যুক্ত। শহরের নানা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এখনও সমাজসেবার লক্ষ্যে অনাথ আশ্রমের কাজও করেন।

নাথবাবু সেদিন ভোরে নদীতে স্নান করতে এসেছেন। লোকজন তখনও বিশেষ আসেনি। দু'চারজন লোক পথে বের হয়েছে মাত্র। ওরা মন্দির থেকে বের হয়ে আসছে পুজো দিয়ে। অতঃপর নাথবাবুর ডাকে এগিয়ে আসে তারা। দেখে, ঘাটে এসে ঠেকেছে একটা মেয়ের জ্ঞানহীন দেহ। বোধহয় নৌকাডুবিই হয়ে থাকবে।

নরেনবাবুর ডাকে দু'চারজন দেহটাকে টেনে তোলে ডাঙায়—ওদের সাহায্যেই নাথবাবু দেহটাকে হাসপাতালে নিয়ে যান। প্রাণটুকুই রয়েছে কেবল। ডাক্তারবাবু বলেন, দেখি চেষ্টা করে যদি বাঁচাতে পারা যায়!

নাথবাবু বলেন, তাই দেখুন চেষ্টা করে। জ্ঞান না ফিরলে এর নাম-পরিচয় তো জানা যাবে না!

রাহুল বিয়ের কথা নিয়ে মাথা ঘামায় না। সে এখন ছবির কাজ নিয়েই ব্যস্ত। দেশে-বিদেশে তার ছবির কদর বাড়ছে। ছবির কাজ তো আছেই আর সেইসঙ্গে একটা অনাথ আশ্রমের কাজও চেপেছে তার ঘাড়ে। চাপিয়েছেন গিরি মহারাজ। কিন্তু এরই মাঝে সে কুসুমপুরের দিনগুলোর কথা মনে মনে আউড়ে নেয়।

এদিকে দিদিমা রাহুলকে বিয়ে দেবার ব্যাপারে জোর করতে থাকেন।

দিদিমা ব্যস্ত হচ্ছ কেন? ওসব পরে হবে'খন। দিদিমা কিন্তু নাছোড়। আর অপেক্ষা করা চলে না।

রাহুল এবার কলকাতার কাজ শেষ করে কুসুমপুরে যাবার কথা ভাবে। চোখের সামনে ভেসে ওঠে বৈশাখীর সেই ডাগর দুটি চোখের চাউনি। সবুজ ধানক্ষেত—গ্রাম-নদী-রঙিন স্মৃতিমাখা সুরে ভরা একটা জগৎ রাহুলকে যেন এখানে টেনে নিয়ে আসে।

সেই গ্রাম, নদী, মাঠ। মেঠো পথ ধরে রাহুল আসে কেদারবাবুর বাড়িতে। এই বাড়িতে আজ আর কোনও আনন্দ নেই, গানের গুঞ্জন ওঠে না।

রাহুল এগিয়ে আসে। ওর মনে হয় বাইরে কড়ানাড়ার শব্দ শুনে এসে দরজা খুলে হাসিমুখে দাঁড়াবে বৈশাখী। কিন্তু দরজা খুলে বের হয়ে আসেন কেদারবাবু। চোখ-মুখ ম্লান। গালে উসকো-খুসকো দাড়ি।

রাহুলকে দেখে বলেন, এতদিন পর এলে বাবা! এসো।

রাহুল বাড়িতে পা দিতে ওদিকে সাবিত্রী অসহায় কান্নায় ভেঙে পড়েন। এগিয়ে আসে রাহুল। রতনও আসে।

রাহুল অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করে, কি ব্যাপার রতন?

—রাহুলদা, বৈশাখী আর নেই। ক'মাস আগে গ্রাম থেকে তাকে রাতের অন্ধকারে কারা তুলে নিয়ে গেছে। কত খুঁজলাম, কোথাও তার কোনও খবর পেলাম না। কে জানে বেঁচে আছে কিনা। ওই শয়তানের দল তাকে শেষ করে দিয়েছে।

সেকি বৈশাখী নেই! যেন আর্তনাদ করে ওঠে রাহুল। আজ বড় আশা নিয়েই এসেছিল এখানে। সেদিন যে কথাটা বৈশাখীকে বলতে পারেনি, আজ সেই কথাটা বলতেই এসেছিল। কিন্তু এ যে পুরোপুরি বিরুদ্ধ পরিবেশ। বেদনাময়।

শূন্যহাতে সে ফিরে আসে কুসুমপুর থেকে। এদিকে দিদিমাকে আশ্বস্ত করেছিল এই বলে, তোমার নাতবউ আমি যদি নিয়ে আসি! দিদিমা আপত্তি করেনি। বলেছিল, তাড়াতাড়ি কর বাবা। কিন্তু কথা রাখতে পারল কই রাহুল। বৈশাখীই যে বেপাত্তা!

এখন ব্যথিতহৃদয় রাহুল আরও কাজের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দেয়। স্মৃতি ভোলবার চেষ্টা চালিয়ে যায়। সেদিনও স্টুডিওতে বসে কাজ করছিল। নতুন কয়েকটা ছবি করতে হবে। সামনে এগজিবিশন। এমন সময় এসে পড়েন মি. বকসি। নিউ ইয়র্কের ম্যানহাটনে বিরাট ব্যবসা। পৃথিবীর বেশ কয়েকটা দেশে এঁর তেলের ব্যবসা। আর্জেন্টিনা-নাইজেরিয়া মায় ইন্দোনেশিয়া-সুরাটেও ওঁর বিরাট ব্যবসা। তেলের রিফাইনারিও আছে কয়েকটা। কোটি কোটি ডলারের ব্যবসা।

ব্যবসায়ী মি. বকসি আবার ছবির বেশ বড় সংগ্রাহক। পৃথিবীর সেরা সব শিল্পীর আঁকা ছবি রয়েছে ওর বাড়িতে। রাহুলেরও বেশ কয়েকটা ছবি তিনি নিয়েছেন। এখন মি. বকসি ছবির ব্যবসা করতে আগ্রহী। আর এটা তাঁর অনেকদিনের ইচ্ছে। নামিদামী শিল্পীদের তিনি স্পনসর করেন। এখন এসেছেন রাহুলের ছবির একমাত্র বিদেশি এজেন্ট হতে।

অবশ্য তার জন্যে রাহুলকে তিনি নিউইয়র্ক নিয়ে যেতে চান। সেখানকার গ্যালারিতে ওর ছবির এগজিবিশন করাতে চান। নতুন ছবির জন্য ভালো দামও দেবেন। না না করে তার পরিমাণ পঞ্চাশ লাখের ওপর।

অনাথ আশ্রমের জন্যে টাকার দরকার। গিরি মহারাজের রোগ হয়েছে, তিনি এখন শয্যাশায়ী। শেষজীবনে তার চোখের সামনে তার হাতে গড়া আশ্রমটা উঠে যাবে টাকার অভাবে, এটা তিনি ভেবেই অস্থির। রাহুল অবশ্য তাঁকে আশ্বস্ত করে—অত চিন্তা কী আছে?

আশ্বস্ত করে তো বটে কিন্তু রাহুলেরও চিন্তার শেষ নেই। কিকরে এসব করবে সে?

রাহুল সেদিন মি. বকসিকে এনেছে তাদের এই সুন্দর পরিবেশের আশ্রমে। বকসিকে সারা আশ্রম ঘুরিয়ে দেখায়। মি. বকসি খুশি। বলেন, তোমাদের আশ্রমের জন্য কোম্পানির তরফ থেকে একটা ডোনেশানের ব্যবস্থা করা যায় কিনা দেখব। বোর্ড মিটিং-এ বলব যাতে তোমাদের আশ্রমের জন্যে দশ লাখ টাকা পেতে পারো। তবে রাহুল, তুমি আমেরিকা চল।

রাহুলের আমেরিকা যাওয়া সাব্যস্ত হয়। এদিকে প্রকৃতি ও নারী ছবিটা, যেখানে ছায়াপাত করেছে বৈশাখী, সেটার দিকে তাকিয়ে স্মৃতিভারাক্রান্ত হয় রাহুল। মি. বকসি ছবিটা চড়া দামে কিনতে চেয়েছিলেন, রাহুল তা বেচবে না বলে দিয়েছে। এদিকে রাহুলের আমেরিকা যাবার খবরে রাহুলের দিদিমার চোখে জল নামে। বলেন, সারাজীবন এইভাবে যাযাবরের মতোই কাটাবি।

অনিমেষ সেদিন বলে, দিদিমা, ও একটা বড় কাজে যাচ্ছে। ওকে যেতে দাও। তোমাকে দেখার জন্যে আমরা তো আছি।

অনিমেষ রাহুলের সঙ্গে অনাথ আশ্রমে দেখভাল করে।

দিদিমা বলেন, তোরা তো ব্যাটাছেলে, মেয়েদের দুঃখ কি বুঝবি তোরা?

অবশেষে রাহুল পাড়ি দিল আমেরিকা। অনেক কাজের মধ্যে নিজের ছবির প্রদর্শনীও করবে সে সেখানে। ব্যবস্থা করবেন বলেছেন মি. বকসি। আশ্রম এখন চলছে দিদিমার তদারকিতে। অনিমেশ তো সঙ্গে আছেই। আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা গিরিমহারাজ শরীরে আছেন, এইমাত্র। পরিশ্রম দেবার সামর্থ্য কোথায়!

এদিকে বৈশাখীর জ্ঞান ফেরে হাসপাতালে। কথা বলবার মতো সাধ্য নেই। অতীতের ঘটনাগুলো চোখের সামনে ভেসে ওঠে। নাথবাবুও মেয়েটাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন।

অন্যদিকে দীর্ঘদিন পার হয়ে গিয়েছে। ইতিমধ্যে বৈশাখীর অন্তর্ধান নিয়ে গ্রামে রসালো আলোচনা শুরু হয়েছে।

শিক্ষক মানুষ নাথবাবু। বৈশাখীর কাছ থেকে আদ্যোপান্ত সব শুনেছেন। শুনেছেন বৈশাখীর উপর যাবতীয় অত্যাচারের কথা। বৈশাখী এখন আর গ্রামে ফিরতে চায় না। এখানেই নিজের পায়ে দাঁড়াতে চায়। একেবারে সন্তানস্নেহে নাথবাবু বৈশাখীকে আশ্বস্ত করেন, ভেঙে পোড়ো না মা, আবার নতুন করে সব কিছু শুরু কর।

তাঁর গলায় শিশুসুলভ উপদেশ ও অনুপ্রেরণা।

বৈশাখী এখন সুস্থ। নাথবাবু তাকে নিজের বাড়িতেই এনেছেন। বৈশাখীও এই ছন্নছাড়া মানুষটার সংসারের ভার নিজের হাতেই তুলে নেয়।

নাথবাবু নিজের পড়াশোনা আর বেশ কয়েকটা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সঙ্গে যুক্ত। সেই সুবাদে অনিমেষও এখানে আসে। সেও শ্রদ্ধা করে নাথবাবুকে। নাথবাবুও ওদের আশ্রমের ব্যাপারে সাহায্য করেন।

রাহুলের অনুপস্থিতিতে অনিমেষ আশ্রম চালাচ্ছে। বকলমেই বলা ভালো। রাহুলও বেশ টাকা পাঠাচ্ছে—টাকা আসছে মি. বকসির প্রতিষ্ঠান থেকেও।

আমেরিকায় বেশ নামডাকও হয়েছে রাহুলের। কথায় কথায় এ খবর নাথবাবুকে বলে অনিমেষ। বলে এখন প্রাইমারি সেকশনটা বাড়াবার কথাও ভাবছে তারা। নাথবাবু অনিমেষকে বলেন, তোমাদের যদি গান শেখাবার কোনও ব্যবস্থা থাকে একজনকে দিতে পারি। মেয়েটি অনাথ। ভালো গায়। গান শেখানোর কাজে থাকলে ওর মনটাও ভালো থাকে।

অনিমেষ সম্মতি জানায়।

বৈশাখী ভাবতেও পারেনি যে এত সহজে তার একটা হিল্লে হয়ে যাবে।

বৈশাখী এসেছে আশ্রমে। সুন্দর ছায়া-ঘেরা আশ্রম। গিরিমহারাজ, যিনি এই আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা, এখন বয়স্ক এবং অসুস্থ, আশ্রমের দায় চাপিয়েছেন রাহুলের কাঁধে, তিনি বৈশাখীকে দেখে খুব খুশি। বৈশাখী তাঁকে প্রণাম করে দাঁড়াতেই তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত একবার তাকিয়ে নিয়ে তিনি বলেন, মা, এই অনাথ শিশুগুলোকে নিয়েই জীবন কাটিয়ে দিলাম। নিজের জন্য তো সবাই করে—এদের জন্যে কিছু করলে দেখবে সত্যিই আনন্দ পাবে।

গিরিমহারাজ পিসিমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেন বৈশাখীর। পিসিমাকে বলেন, বৈশাখী গান শেখাবে এখানকার ছেলেমেয়েদের।

বৈশাখীকে দেখে পিসিমাও খুশি। বলেন, আমার বাড়িতে যাবে মা! আমি তোমাকে নিয়ে যাবো।

আশ্রমের পিসিমা আসলে রাহুলের দিদিমা। একথা বৈশাখী জানতে পারে পিসিমার বাড়ি গিয়ে। সেখানে রাহুলের ছবি দেখে সে চমকে ওঠে। আশ্রমে মাঝে রাহুলের নামটাও যে সে শোনেনি তা নয়, কিন্তু কোনওমতেই অনুমান করতে পারেনি এ রাহুল তার একান্ত চেনা রাহুল।

বৈশাখী আজ যেন অথৈ জলে ভাসতে ভাসতে কূলের সন্ধান পেয়েছে। মুখে রা-কাড়েনি বৈশাখী।

শুধু মন দিয়ে আশ্রমের কাজ করে। সেবা করে গিরিমহারাজ ও পিসিমার। সে জানে আশ্রম ও আশ্রমিকদের কাজ করা মানে, রাহুলেরই কাজ করছে।

এরমাঝে একদিন রাহুলের স্টুডিও-তে কেয়ার টেকারকে বলে রাহুলের কাজ দেখতে গিয়েছিল বৈশাখী—হঠাৎ ইজেলে একটা পর্দাঢাকা ছবি দেখে এগিয়ে আসে। সামনে গিয়ে ছবিটার পর্দা তুলতেই চমকে ওঠে। তারই ছবি। পিছনে কুসুমপুরের সবুজ স্নিগ্ধ পরিবেশ। সব ছাপিয়ে বের হয়ে এসেছে সেই প্রকৃতির পরিবেশে বৈশাখীর ডাগর দুটো চোখের মহিমময় ছবি। চমকে ওঠে বৈশাখী। রাহুল তাকে এইভাবে ছবিতে প্রতিফলিত করে রেখেছে তা ভাবেনি। তার মনে হয়েছিল, রাহুল হয়তো বা ভুলে গিয়ে থাকবে। আজ তার ভুল ভাঙল। বৈশাখীর তাই সেদিনকার কথাগুলো মনে পড়ে যায়। মা-বাবা-দাদার কাছ থেকে দূরে থেকেও আজ এই প্রথমবার তার মনে সামান্য আনন্দ খেলে গেল।

অনিমেষ গিরিমহারাজের পরামর্শমতো আশ্রমের জমিজিরেত বাড়িয়েছে। রাহুলকে তারা এখান থেকে সব খবরাখবর জানায়। রাহুলও চায় এবারকার বাৎসরিক উৎসবটা ভালোভাবেই পালিত হোক। অনিমেষকেও সেই মর্মে বার্তা দিয়েছে।

কেজো মানুষ অনিমেষ। অনুষ্ঠানে গণ্যমান্যদের নেমন্তন্ন করেছে। ডেকেছে খবরের কাগজ, টিভির লোকজনকেও। একটা উৎসব উৎসব মেজাজ চারিদিকে। অনুষ্ঠানের নৃত্যগীতাদির দায়িত্ব কাঁধে নিয়েছে বৈশাখী।

নরেন ক'বছরে বাবার মতোই বেশ নেতাগোছের হয়ে উঠেছে। শহরেও তার এখন ব্যবসাপত্র ভালোই চলছে। এবার শহরের এম.এল.এ পদের জন্যও তৈরি হচ্ছে সে। এরজন্যে নরেনের লোকজনরাও তাদের প্রিয় দেশসেবক-সমাজদরদী নেতার জন্য প্রাণপণ লড়ছে। মাঝে অবশ্য তার বাগানবাড়িতে পুলিশ রেড করেছিল। বৈশাখীর তল্লাশে। কিন্তু প্রমাণাভাবে অভিযোগ থেকে বেকসুর খালাস পেয়ে গেছে নরেন।

এখন সে জানে শহরের মানুষের মন জয় করতে গেলে স্থানীয় বেশকিছু প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হতে হবে। এই শহরে এখন গিরিমহারাজের আশ্রমের খুবই নামডাক হয়েছে। এরা সত্যি ভালো কাজ করে। অনাথ আশ্রম ছাড়াও সকলের জন্য চিকিৎসালয়ও চালায়। তাই নরেনও ওই আশ্রমের সক্রিয় কর্মকর্তা অনিমেষবাবুদের কাছে আসে নিজের স্বার্থে। এদের প্রতিষ্ঠানে টাকাও দেয়, যাতে জনগণ জানতে পারে যে নরেনবাবুও জনকল্যাণমূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত।

নরেন অবশ্য অতীতের সেই গ্রামীণ মেলায় দেখা হওয়া একজন শিল্পীর কথা ভুলে গেছে। তাই রাহুলের নামও আর মনে নেই নরেনের। তারচেয়ে অনেকবেশি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার তাকে মনে রাখতে হয়। তার সামনে এখন ইলেকশন। ভোটে জিততে পারলে নরেন ছোটখাটো মন্ত্রীও হতে পারবে। নরেন সেই স্বপ্ন দেখতেই ব্যস্ত। শহরের পরিবেশে এবার নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে চায় সে। নরেনের কারখানার কাজ দেখাশোনার ভার এখন মধুর উপর।

অনিমেষের কাছেই মধু সেদিন এসেছে আশ্রমে। নরেনের দূত হয়ে। হঠাৎ বৈশাখীকে এখানে দেখে চমকে উঠেছে। বৈশাখীকে সে চিনতে ভুল করেনি। তার চেহারাটা আরও সুন্দর হয়েছে।

বৈশাখী তাহলে সেই রাত্রে নদীতে ডুবে মরেনি—কোনওমতে ওখান থেকে বের হয়ে এসে বেঁচে গেছে। আর সবচেয়ে বেশি বিপদের কথা এই—বৈশাখী এসে জুটেছে এই আশ্রমে। সে যে এখানে বেশ ভালোই আছে তাকে দেখেই বুঝেছে মধু। বৈশাখী এবার যদি পুলিশের কাছে মুখ খোলে, খবরের কাগজের লোকেদের কাছে তার অতীতের সেই অত্যাচারের কথা বলে ফেলে, নরেনের সঙ্গে মধুরও সমূহ বিপদ।

নরেনও মধুর মুখে বৈশাখীর এই আশ্রমে থাকার খবর শুনেছে। ভয়ে ভয়ে আছে, বৈশাখী যদি একবারের জন্য মুখ খোলে তাহলে নরেনের মন্ত্রী হওয়া দূর অস্ত। তার মানসিক যন্ত্রণা বাড়তে থাকে। মধু নরেনকে পরামর্শ দেয়, ওকে পুরো উড়িয়ে দিই বস্। বাঁশও থাকবে না—বাঁশিও বাজবে না।

নরেন জানে কখন কিভাবে কাজ হাসিল করতে হয়। সে বলে, মধু, এখন চুপচাপ বৈশাখীর উপর নজর রাখ। তারপর সাবধানে সময় বুঝে সেই কাজটা করতে হবে যাতে আর কোনওদিনই বৈশাখী মুখ খুলতে না পারে।

অবশেষে রাহুল দেশে ফিরছে। যেন বিশ্বজয় করেই দেশে ফিরছে। এয়ারপোর্টে এসেছে রাহুলের লোকজন—অনিমেষ, চন্দন সবাই। ওরাই সঙ্গে এনেছে বৈশাখীকেও। বৈশাখী প্রথমে এড়াবারই চেষ্টা করেছিল। কিন্তু পারেনি। রাহুলকে ফুলের স্তবক দিয়ে বরণ করার জন্যেই অনিমেষ ওকে নিয়ে এসেছে।

এয়ারপোর্টে বেশ ভিড়। আশ্রমের লোকজনদের মধ্যে বৈশাখীকে দেখে রাহুল চমকে ওঠে। বৈশাখী ওর হাতে পুষ্পস্তবক তুলে দিচ্ছে আশ্রমের পক্ষ থেকে। পাশে ক্যামেরার আলো ঝলসে ওঠে। অনিমেষই বলে, রাহুল, এই বৈশাখী। আমাদের আশ্রমের সঙ্গীতের শিক্ষিকা। ও আসার পর থেকে আশ্রমের চেহারাটাই বদলে গিয়েছে।

রাহুল একসঙ্গে অবাক, আবার খুব খুশিও। বৈশাখীকে নতুন করে ফিরে পেয়ে খুশিই হয় রাহুল। ঈশ্বরকে অজস্র ধন্যবাদ জানায়। রাহুলের দিদিমা খুশি। এতদিন পরে আবার ঘরের ছেলে ঘরে ফিরেছে।

দিদিমা রাহুলকে বলেন, তুই যা করিস তাতে আমি কোনও অমত করিনা। এবার তুই আমার একটা কথায় অমত করিস না রাহুল।

কি ব্যাপার বলো তো? রাহুল বলে।

দিদিমা বলেন, আমি আর ক'দিন। আমি চাই তোর বিয়ে-থা দিয়ে তোকে সংসারী করে তুলতে। মেয়েও আমি পছন্দ করে ফেলেছি। তোর যোগ্য মেয়ে—যে তোর আশ্রমের ভার নিতে পারবে।

রাহল বলে, তা মেয়েটি কে?

বৈশাখী। বড় দুঃখী, তবে বড় ভালো মেয়ে রে।

দিদিমা। এখন সামনে আশ্রমের বাৎসরিক উৎসব। এসব শেষ হোক, তারপর দেখা যাবে। উৎসবের আর ক'দিন বাকি। ওসব ভাবার সময় এখন নয়।

ওরা উৎসবের আয়োজন করতেই ব্যস্ত। সেদিন রাত্রেই রাহুল বৈশাখীকে জিজ্ঞেস করে, এখানে এলে কী করে?

বৈশাখী আগাগোড়া রাহুলকে তার কলঙ্কিত অতীত-কাহিনী শোনায়।

রাহুল বলে অনিমেষকে, কিভাবে নরেন একটা মেয়ের সর্বনাশ করে এখন জনহিতকর নেতা হতে চায়। অনিমেষ সব শুনে বলে, ওর কোনও সাহায্য আমরা নেব না। বরং আমাদের উৎসবটা হয়ে যাক। তারপর দরকার হয় পুলিশকেই জানাব সবকথা। এরকম একটা শয়তানের মুখোশটা আমরা খুলে দেব।

রাহুল বলে, ঠিক আছে। উৎসবটা মিটে যাক। তারপর সেই কাজটাই করতে হবে। খবরটা অবশ্য নরেনের কাছেও পৌঁছে যায়। নরেন ভেবেছিল আশ্রমের উৎসবের ক'টা দিন সে জনমানসে সমাজদরদী হিসাবে প্রচার পাবে। তারজন্যে হাজার পঞ্চাশ টাকাও দিতে এসেছিল। নরেন এখানে রাহুলকে দেখে ডবল অবাক হয়। এটা সেই গ্রামের মেলায় দেখা সেই-ই শিল্পীর মুখই। এবার ধূর্ত নরেনও বুঝতে পারে যে রাহুল-বৈশাখীর সম্পর্কটা আরও নিবিড় হয়েছে। তবু নরেন ওসব পরিচয়ে না গিয়ে বলে, অনিমেষবাবু, পঞ্চাশ হাজার টাকা উৎসবের জন্যে আপনাকে দিচ্ছি। আর অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান-এর পদের জন্যে যদি আমাকে বাছেন তাহলে আমার অমত নেই।

রাহুল বলে, অনিমেষ, ওঁকে বলে দে, ওঁর টাকার দরকার আমাদের নেই। আর অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যানের জন্যে নাথবাবু আছেন।

প্রত্যাখ্যাত নরেন অপমানে গটগট করে বেরিয়ে যায় আশ্রম থেকে।

কুসুমপুরের গ্রামের শান্ত জীবনে ওরা অনেকেই বৈশাখীকে ভুলেই গিয়েছিল। গ্রামে আসা খবরের কাগজ আর তা হতে দিল না। সেদিনকার কাগজে বড় করে রাহুলের মতো শিল্পীর দেশে ফেরার সংবাদ ছাপা হয়েছে, এয়ারপোর্টে বৈশাখী ওকে পুষ্পস্তবক দিয়ে সম্বর্ধনা জানাচ্ছে সেই ছবিটাও ছাপিয়েছে খবরের কাগজ।

রতন কাগজখানা হাতে নিয়েই দোকান থেকে ছুটে আসে। হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বলে, বাবা, মা—দেখ, বৈশাখী বেঁচে আছে। এই দেখো তার ছবি। কেদারবাবু চোখে চশমা দিয়ে দেখছেন ছবিটা। সাবিত্রীও চিনেছেন বৈশাখীকে। বলেন, ওমা, তাই তো রে—। মেয়েটা তাহলে ভালোই আছে। কেদারবাবু বলেন, ওরে রতন তুই আমাদের ওখানে নিয়ে চল বাবা। কতদিন পরে তার খবর পেলাম। গিয়ে বৈশাখীকে বলব—কেন? কেন? আমাদের জানায়নি ওর খবরাখবর।

এদিকে নরেনও নজর রেখেছে পরিস্থিতির উপর। এবার শেষ আঘাত তাকে হানতেই হবে।

মধু বলে, ওসবের জন্যে তুমি ভেবো না বস্। আমি ঠিক ম্যানেজ করে কাজ হাসিল করে নিতে জানি। ওদের উৎসবে লাশ ফেলার জন্যে কয়েকটা বোমার ব্যবস্থা করে দিও শুধু।

নরেন বলে, ওসব ব্যবস্থা হয়ে যাবে। কাজটা যেন ঠিকঠাক হয়।

উৎসবের জন্যে মঞ্চ সেজে উঠেছে। গুণিজন এসেছেন কলকাতা থেকে—অন্যত্র থেকেও বহু নামীদামী অতিথি এসে পড়েছেন আশ্রমের এই উৎসবে যোগ দিতে। এসেছেন সুদূর আমেরিকা থেকে মি.বকসি।

মঞ্চে অনুষ্ঠান শুরু হব হব। রতনও এসে পড়েছে। তবে তার ট্রেন লেট থাকার জন্যে সময়মতো এসে রাহুল-বৈশাখীদের সঙ্গে আগে দেখা করতে পারেনি। রতনও তার বন্ধুদের নিয়ে হলঘরে ঢুকেছে।

তখন মঞ্চে ঘোষক অনুষ্ঠান শুরুর কথা ঘোষণা করছে। প্রথমেই অতিথিদের পুষ্পস্তবক দিয়ে অভ্যর্থনা জানাবে আশ্রমের পক্ষ থেকে বৈশাখী। মঞ্চে রয়েছে অতিথিরা। রাহুল, মি. বকসি এদিক ওদিক সামলাচ্ছে। বৈশাখী পুষ্পস্তবক দিতে আসছে—

রাহুলও মঞ্চের নীচেই দ্বিতীয় সারিতে নরেনকে বসে থাকতে দেখে অবাক হয়।

মঞ্চে অনুষ্ঠান শুরু হয়ে গেছে। বৈশাখী এগিয়ে আসছে ফুলের তোড়া নিয়ে আর ঠিক এমন সময় ধুর রিভলভার বের হয়ে আসে। রাহুল চমকে ওঠে—মধু সময় নিয়ে ঠিক টিপ করেই বৈশাখীর দিকেই গুলি চালিয়েছে কিন্তু রাহুল পলকের মধ্যে বৈশাখীকে এক ধাক্কা মারে—বৈশাখী ছিটকে পড়ে মঞ্চে—গুলিটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়।

রতনও হলে ঢুকে নরেন-মধুদের দেখে। সেও তৈরি ছিল আগেভাগেই। মধুর উপর নজর রাখছিল। নরেন বৈশাখীকে দেখে। এবার মধুর রিভলভার নিয়ে বৈশাখীকে গুলি করতে যাবে কিন্তু একজন পুলিশ হাতেনাতে নরেনকে ধরে ফেলে।

হলের মধ্যে হৈ চৈ। টিভি ক্যামেরায় নরেন-মধুর সবকিছুই নিখুঁতভাবে ধরা। সমস্ত ঘটনাটাই মঞ্চে উপস্থিত মন্ত্রীদের সামনেই ঘটল। নরেনের অতীতের সেই ঘটনার কোনও সাক্ষ্য-প্রমাণ ছিল না, কিন্তু আজকের এই উৎসবে শয়তান নরেনের যাবতীয় প্রমাণ হাতেগরম আছে। আশ্রমের উৎসবে উপস্থিত পুলিশ হবু এম এল এ নরেনকে দলবল-সহ অ্যারেস্ট করে। জিপে তোলে।

রতন এবার ছুটে যায় বৈশাখীর দিকে। আজ কতদিন পর রতন তার হারানো বোনকে ফিরে পেয়েছে। আর রাহুল ফিরে পেয়েছে বৈশাখীকেও। বৈশাখী যেন জীবনের একটা কঠিন অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে নতুন করে বাঁচার পথ খুঁজে পেলো।

অঙ্গীকার

হিমাদ্রিবাবু গ্রামের আদর্শবান শিক্ষক। স্ত্রী অরুন্ধতী আর ছেলে সুমনকে নিয়েই তার সংসার। আদর্শবাদী যুবক হিমাদ্রি বিবেকানন্দ আর নেতাজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েই কলেজের পড়া শেষ করে গ্রামে ফিরে গ্রামের জমিদার ভবেশবাবুর সহযোগিতায় এই স্কুলের পত্তন করেন।

ভবেশবাবুর ছেলে বিবেক তাঁর প্রিয় ছাত্র। ভবেশবাবুর জমিদারিও চলে যায়। ততদিনে বাজারের পাশে বিরাট জায়গা নিয়ে স্কুলটা দাঁড়িয়ে গেছে। এখন জমিদারি চলে যাবার পর নতুন একটা শ্রেণী গজিয়েছে। ব্যবসায়ীশ্রেণী আর নেতা। তারাই সমাজের মাথা।

জমিদার ভবেশবাবু অবশ্য কলকাতায় ব্যবসাপত্র শুরু করে সেখানেই বেশির ভাগ সময় থাকেন। এখন কিরণবাবু এ অঞ্চলের বড় নেতা। পার্টনার রুদ্রনাথ ব্যবসাপত্র করে আর কিরণের তদারকিতে সরকারি বড় বড় কন্ট্রাক্ট পেয়ে ফুলেফেঁপে উঠেছে। রুদ্রনাথের নজর ওই স্কুলের জায়গা আর খেলার মাঠের দিকে। শহরের মাঝখানে ওই জায়গাগুলো দখল করে নিতে পারলে তার মালপত্রের গুদাম, অফিস, দোকান, শোরুম করতে পারবে।

রুদ্রনাথ, কিরণবাবুও স্কুল কমিটির মেম্বার। স্কুলের ওদিকে উদয়ের বাড়ি। রুদ্রনাথ চায় উদয়ের বাড়িটা দখল করতে। উদয়ের টাকার দরকার। কিছু টাকা তিনি উদয়কে দেন আর বলেন, এখানে থেকে কী করবি? কলকাতায় আমার ব্যবসার কাজ করবি। মাইনেও ভালো দেব। ওখানেই যা। থাকবার জায়গাও দেব। ছেলেপুলেদের মানুষ করতে পারবি।

অভাবী উদয়কে শহরে পাঠিয়ে রুদ্রনাথ কৌশলে ওর জায়গা দখল করে নেয় মিথ্যা দলিল করে। এবার স্কুলের মাঠের জায়গা দখল করে ওখানে তার সাম্রাজ্যের ভিত গড়তে চায়। রুদ্রনাথ গোপনে হিমাদ্রিবাবুকে অনেক টাকা দিতে চায়। যাতে কোনওপ্রকার গোলমাল না করেন তিনি। জায়গার দলিলে ট্রাস্টি বোর্ডের সভাপতি হিসাবে সই করে দেন। হিমাদ্রি রাজি হন না, উল্টে প্রতিবাদ সভা করেন। রুদ্রনাথ, কিরণের বদমতলবের কথা জানিয়ে দেন সকলকে।

হিমাদ্রির স্ত্রী স্বামীর এসব কাজে ভয় পান। প্রতিবাদী হিমাদ্রি বলেন—দেশে এখনও আইন আছে, শাসন আছে, অন্যায়ের প্রতিবাদ তাই করবই। রুদ্রনাথ চটে।

হিমাদ্রির এতদিনের রক্ষাকর্তা ভবেশবাবু কলকাতায়, তাঁদের সেই প্রতাপও নেই। বিবেকও কলেজে পড়ছে। কমিটিতে রুদ্রনাথের দলই ভারী। হিমাদ্রি একটা গরীব ছেলেকে স্কুলে চাকরি দিয়েছিলেন। সে এখন সহকারী প্রধান শিক্ষক। সে সুযোগ বুঝে রুদ্রনাথের দলে ভিড়ে যায়। খাতাপত্র এদিক ওদিক করে হিমাদ্রিকে তহবিল তছরুপের কেসে জড়িয়ে তাঁকে চরম অপমান করে। চাকরি থেকে বরখাস্ত করে।

হিমাদ্রিও সদরে তদ্বির করে কেসে জয়লাভ করেন। রুদ্রনাথের জালিয়াতি প্রমাণিত হয়। এমনদিনে রুদ্রনাথও হিমাদ্রিকে চরম আঘাত দেবার জন্য রাতের অন্ধকারে হিমাদ্রির বাড়ি থেকে তার স্ত্রী অরুন্ধতীকে তুলে নিয়ে চলে যায়। হিমাদ্রি সেই রাতে বাড়িতে ছিলেন না। ছোট্ট সুমনের হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায়। সে দেখে কারা তুলে নিয়ে যাচ্ছে তার মা'কে। বাধা দেবার চেষ্টাও করতে পারে না ছোট্ট সুমন।

মা তার হারিয়ে গেছে। হিমাদ্রিও স্পষ্ট বুঝেছেন তার এই চরম সর্বনাশ কারা করেছে। আসেন রুদ্রনাথের বাড়িতে। নেতা কিরণবাবুও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। অরুন্ধতীর কিডন্যাপের কথা

বলতেই এবার ওই রুদ্রনাথ আর কিরণ চটে ওঠে।

—কোনও প্রমাণ আছে? মানী লোকেদের নামে এত বড় বদনাম দাও। তুমিই চোর। স্কুলের এত টাকা লুটেছ। আজ আমাদের ফাঁসাবার জন্য এইসব করছ।

অগত্যা থানায় আসেন হিমাদ্রি। থানা রিপোর্টই নেয়না। ওখান থেকে এস.পি-র কাছে যান হিমাদ্রিবাবু, ছেলে সুমনকে নিয়ে।

সুমন বলে, রুদ্রবাবুর লোকই মাকে ধরে নিয়ে গেছে।

শেষ অবধি কেসও হয়। পুরনো চাকর নিধুর কাছে সুমনকে রেখে হিমাদ্রিবাবু স্ত্রীর খোঁজ করছেন।

ওই রুদ্রনাথের কলকাতায় ব্যবসা আছে, গুদাম আছে। সব লোকদেখানো, আসলে তার অন্ধকারের কারবারই বেশি—ডকের মাল সাফাই, বেআইনী মাল পাচার। কিরণবাবু এখন ছোটখাটো মন্ত্রী। এর সুবাদে চলে জায়গা বেদখল করে প্রোমোটিং-এর কাজ।

ওর গোপন ডেরাও আছে। সেখানে উদয়কে কাজ দেবার নাম করে তার জমি-জায়গাও সব মিথ্যা দলিল করে দখল করেছে। উদয় বাধ্য হয়েই চাকরি করে রুদ্রনাথের ওই কারবারে। মালিক রুদ্রনাথের বিশ্বস্ত লোক। এদিকটা সে দেখাশোনা করে। এখানেই রুদ্রনাথ এনে তুলেছে অরুন্ধতীকে। উদয় ওঁকে দেখে চমকে ওঠে। অরুন্ধতী বুঝেছেন শয়তান রুদ্রনাথ তার চরম সর্বনাশ করার জন্য এখানে এনেছে। অরুন্ধতী উদয়কে চেনেন। কিন্তু উদয় তাকে না চেনার ভানই করে। হতাশ অরুন্ধতী। উদয়ও বুঝেছে রুদ্রনাথ অরুন্ধতীর সর্বনাশ করতে চায়।

এবারে আড়ালে উদয় অরুন্ধতীর সঙ্গে দেখা করে। অরুন্ধতীও বলেন সব অত্যাচারের কথা। উদয় জানে রুদ্রনাথ কে। তার সর্বনাশ করেই থামেনি, শয়তানটা দেবতুল্য মাস্টারমশাইয়েরও সর্বনাশও করতে চায়। কিন্তু উদয়ও ঠিক করে এবার রুদ্রনাথের সব চাল ব্যর্থ করে দেবে। চরম সিদ্ধান্ত নেয় সে। রুদ্রনাথের মুখোশ এবার সে খুলে দেবে। অরুন্ধতীকে বাঁচাতে বলে,

—আপনি আমার মাস্টারমশাইয়ের স্ত্রী। কোনও ভয় নেই আপনার।

অরুন্ধতী বলেন, আমার চরম সর্বনাশ তো হয়েছে। আবার তুমি আমার জন্য তোমার সর্বনাশ ডেকে আনবে?

উদয় বলে, এ তো মানুষের ধর্ম। এটা করবই।

সে কৌশলে অরুন্ধতীকে নিয়ে কোনওমতে পালিয়ে আসে তার বস্তির ডেরায়।

উদয়ের স্ত্রী মারা গেছে। তার একমাত্র ছেলে শুভ রয়েছে আর মেয়ে সীমা। অরুন্ধতীকে পেয়ে তারাও খুশি।

ওদিকে রুদ্রনাথও জেনেছে অরুন্ধতী ওখানে নেই—পালিয়েছে। আর উদয়কেও ক'দিন কাজে আসতে দেখা যাচ্ছে না। তাই ওরাও উদয়ের খোঁজে আসে। কিন্তু উদয় তার আগেই ওই বস্তি ছেড়ে তার বাচ্চাদের নিয়ে চলে গেছে। মাণিকের দলবল গজরায়—যেখানে থাক, ওদের খুঁজে বের করতেই হবে। রুদ্রনাথ বলে,

—মেয়েটাকে তো চাই। ওরা পুলিশে গেলে বিপদ হবে।

মন্ত্রী কিরণবাবুও বলেন,

—সব থানায় নজর রাখা হচ্ছে। পেলেই ওকে ধরা হবে।

রুদ্রনাথ, কিরণ তবু ভাবনায় পড়ে। ওদিকে হিমাদ্রি পুলিশ সাহেবের কাছে গিয়েছিল ছেলে সুমনকে নিয়ে। তার কথামতোই কেস শুরু হয়েছে। সুমনই প্রধান সাক্ষী।

হিমাদ্রি এবার শেষ দেখেই ছাড়বেন। হঠাৎ দেখা যায় ছেলে সুমনকেই কারা যেন তুলে নিয়ে গেছে। চোট খাওয়া বাঘের মতো ক্ষেপে ওঠেন হিমাদ্রি। রুদ্রনাথ তাকে অন্যায়ভাবে বারবার আঘাত করছে। এবার হিমাদ্রিও ছাড়বেন না। অবশ্য পুলিশ হিমাদ্রির ছেলে হারানোর রিপোর্ট নিতে চায়না। হিমাদ্রি খবর পায় যে বনের ধারে কাঠগোলায় ছেলেকে আটকে রেখেছে ওই রুদ্রনাথ।

হিমাদ্রি গিয়ে চড়াও হন রুদ্রনাথ-কিরণবাবুদের মদের আসরে। পাহারাদারদের পরাস্ত করে কোনওমতে উদ্ধার করে আনেন ছেলেকে। তবু বাড়ি ফিরতে পারেন না। রুদ্রনাথও শেষ আঘাত হানার জন্য হিমাদ্রির শেষ সম্বল ওই বাড়িটাতে আগুন ধরিয়ে দেয়। বাড়ি পুড়ে ছাই। মামলার খরচ জোগাতে জমি জায়গা সমস্তই বিক্রি হয়ে গেছে। শেষ সম্বল বলতে তো ছিল বসতবাড়িটা তাও আর রইল না। পাড়ার লোকও বলে, মাস্টার আপনার স্ত্রী গেছেন, ঘরবাড়ি গেছে এখানে থাকলে আপনার জেদ হয়তো বজায় থাকবে কিন্তু ছেলের জীবন বজায় থাকবে কিনা কে জানে। ওর ভালোর জন্যই চলে যান এখান থেকে।

হিমাদ্রিও ভাবছেন কথাটা। অন্যায়ের প্রতিকার হয়নি এ যাবৎ। কিন্তু তা করতে নিজের কাছে তিনি অঙ্গীকারবদ্ধ। তবু ছেলের কথা ভেবেই গ্রাম ছেড়ে চলে যান।

ছেলেকে বোর্ডিং-এ রাখার ব্যবস্থা হল। হিমাদ্রি নিজে চলে এলেন কলকাতা, এক বন্ধুর চিলেকোঠার ঘরে।

ফাঁদে পড়ে উদয় রুদ্রনাথের কাজ করছে বটে কিন্তু নিজেও সে জানে রুদ্রনাথ তাকে ব্যবহার করছে। অরুন্ধতীকে সে মায়ের মতোই সম্মান করে। রুদ্রনাথের কবল থেকে বাঁচিয়ে উদয় চায়, অরুন্ধতীকে গ্রামে পৌঁছে দিতে। অরুন্ধতী বলেন,

—আমি একাই যেতে পারব।

উদয় বলে, রুদ্রনাথকে বিশ্বাস নেই। সে হন্যে হয়ে তোমায় খুঁজছে মা। হাতে পেলে ছাড়বে না। আমিই তোমায় রাতের অন্ধকারে গ্রামে পৌঁছে দেব।

ওঁরা লুকিয়ে গ্রামে পৌঁছন। অরুন্ধতী গেছেন অনেক আশা নিয়ে। গিয়ে দেখেন ঘরের চিহ্ন আর নেই—ধ্বংসস্তূপ। গ্রামের দু-একজন জানায় মাস্টারমশাই-সুমনের ওপর রুদ্রনাথের অত্যাচারের কথা, ওদের ঘর বাড়ি পুড়িয়ে ওদের দেশছাড়া করার কথা। এখন তারা যে কোথায় তা কেউ বলতে পারে না। হতাশ অরুন্ধতী কান্নায় ভেঙে পড়েন। আজ তাঁর যাবার কোনও জায়গা নেই। উদয়ই বলে,

—তোমার এই ছেলের ঘরও তো আছে মা। আমার ঘরেই মা হয়ে থাকবে। এর মধ্যে যেভাবে হোক সুমন আর মাস্টারমশাইকে আমি খুঁজে বের করবই।

অরুন্ধতীরা ফিরে আসেন উদয়ের বাড়িতে। সীমা ও শুভকে অরুন্ধতী নিজের কাছে টেনে নেন।

সুমন বড় হয়েছে। এখন স্কুল ছেড়ে কলেজে পড়ছে। সে এখন কলেজের পড়াশোনায়, স্পোর্টসে কৃতী ছাত্র। হিমাদ্রিও ওকে দেখতে আসেন। বলেন, তোকে সবকিছুতেই জয়ী হতে হবে বাবা। সুমন আর হিমাদ্রি এখন কলকাতার নেতা-মন্ত্রীদের পিছনে ঘুরছেন। প্রতিপক্ষ রুদ্রনাথ এখন কলকাতায় বড় ব্যবসায়ী, সমাজসেবক। তার দুটো রূপ। রাতে নেতা কিরণ-এর সঙ্গে ওঠাবসা; রুদ্রনাথের দল ডকে বেআইনি মালপত্র, অস্ত্র, আফিম পাচার করে। হোটেল করেছে। বিদেশি গুপ্তচরদের সঙ্গেও তার মোটা টাকার লেনদেন। তার বিরুদ্ধে একটা কেসও হাইকোর্টে রুজু করেছেন বটে হিমাদ্রি, কিন্তু সবই কেমন চলছে গদাইলস্করি চালে। নেতা-মন্ত্রীদের পেছনে ছুটেও কোনও সাহারা মিলছে না।

মন্ত্রী কিরণবাবুও দেখেছে হিমাদ্রিকে অন্য মন্ত্রীদের কাছে যাতায়াত করতে। সে কলকাঠি নাড়ে। মন্ত্রীরা এখন তাই হিমাদ্রিকে পাগলই ভাবে। হিমাদ্রির মুখে অযত্নে বেড়ে ওঠা দাড়ি চুলগুলো উস্কো-খুস্কো। বিচারের আশায় ঘোরেন, অরুন্ধতীর খোঁজ করেন। সুমন বাবাকে সাহস জোগায়।

—বাবা তুমি ভেঙে পড়ো না। কলেজের পড়া শেষ করে আমিই তোমার বাকি কাজ শেষ করব করবোই।

উদয় ডকে কাজ করে। অরুন্ধতী উদয়ের ছেলে-মেয়েকে মানুষ করেন। এখবরও একদিন পৌঁছে যায় রুদ্রনাথের কানে। মাণিকই জানায়—অরুন্ধতী উদয়ের বাড়িতে থাকেন। রুদ্রনাথ হাতে চাঁদ পায়। মাণিককে বলে—উদয়ের মেয়ে আর মাস্টারগিন্নি দুটোকেই তুলে আনবি। না হলে ওই মাস্টারের বউটাকে খতমই করে দিবি।

অপরাধীদের চোখকে ফাঁকি দেওয়া শক্ত। রুদ্রনাথের লোকজন বোমাবাজি করতে থাকে। গুলি চালায় উদয়ের উপর। আর অরুন্ধতী? একসময় হারিয়ে ছিলেন ছেলেকে—এবার হারিয়ে ফেললেন উদয়ের ছেলেমেয়েকে।

হাঙ্গামার খবর পেয়ে এস.পি এসেছে ফোর্স নিয়ে—বাধা দেয় রুদ্রনাথের দলকে। এদিকে অন্ধকারে দৌড়চ্ছেন অরুন্ধতী। গোলমালের মধ্যে শুভ-সীমাও হারিয়ে গেছে কোনও গলির মধ্যে। অরুন্ধতী ডাকছেন ওদের। সীমাকে মাণিকের দল ধরেছে। শুভ একটা পার্ক করা গাড়িতেই উঠে পড়ে। আর গাড়িটাও এ সময় স্টার্ট দেয়। অরুন্ধতী একা অন্ধকারে ছুটছেন, তরুণ অফিসারের হাতে পিস্তল। অরুন্ধতীকে দূর থেকে দেখে বলে—

—এসময় কেন বেরিয়েছেন? চলে যান—

সব কেমন হারিয়ে যায় অরুন্ধতীর। কোথায় যাবেন জানেন না। চোখের সামনে এস.পি ছেলেকে দেখেও চিনতে পারেন না। অন্ধকারে গঙ্গার ধারে এসেই ঝাঁপ দিতে যাবেন, এমন সময় একজন বৃদ্ধ তাঁকে আটকায়।

—একি করছিস মা? হেরে গিয়ে এভাবে নিজেকে শেষ করে দিবি? না তবু বাঁচতে হবে মা। জীবন সবকিছু কেড়ে নেয় আবার সবকিছু ফিরিয়ে দেয়। চল মা। নিজের জীবন অনেক দামি।

রাতের আঁধারে সীমাকে ধরেছে মাণিকের দল। মাণিক বলে, আরে এ তো পঞ্চাশ হাজার টাকার চেক। শালা উদয় তো খতম। মাস্টারের বউটাও ভেগেছে। নিয়ে চল এটাকেই। মেনকা মাসির হাতে তুলে দেওয়া যাবে।

সীমাকে বেচে পকেট ভর্তি টাকা নিয়ে চলে আসে মাণিক আর অন্যদিকে আহত শুভ পড়েছিল রুস্তমজীর গাড়িতে। গাড়ি থেকে নামতে গিয়ে রুস্তমজী শুভকে দেখতে পান। শুভ বলে, সাবজী আমাকে বাঁচান। ওই রুদ্রনাথ-এর দল আমার বাবাকে শেষ করেছে। আমার মা বোনকেও ধরে নিয়েছে। বাধা দিতে গেলাম, পারিনি। আমার কেউ নেই।

রুস্তমজী মায়ায় পড়ে যান। রুদ্রনাথের হাত থেকে ছেলেটাকে বাঁচাতে চান তিনি। তবে একেবারে নিজের প্রয়োজনে। রুদ্রনাথ ও রুস্তমজী যে পরস্পরের জাতশত্রু।

আশ্রয় মিলল শুভর। রুস্তমজীর কাছে। এদিকে হিমাদ্রির বয়স বেড়েছে। কিন্তু রুদ্রনাথের নাম শুনলে তার চোয়াল শক্ত হয়ে ওঠে। হাইকোর্টের কেসের কোনও সুরাহা আজও হল না। একমাত্র ছেলে সুমন পুলিশের এস.পি হয়েছে। কিন্তু এই বৃদ্ধ বয়সে অরুন্ধতীর জন্য বড্ড বেশি মন আনচান করে হিমাদ্রির।

এর মধ্যে আরেকটা কাণ্ড হয়েছে। অরুন্ধতীকে গঙ্গায় ঝাঁপ দেওয়া থেকে বাঁচিয়েছিল যে পুজারী, সে একজন পুলিশের বড়কর্তার মায়ের কাছে অরুন্ধতীকে থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছে। তিনি আসলে ভবেশবাবুরই স্ত্রী, আর তাঁদের ছেলে বিবেক—হিমাদ্রির ছাত্র, আজ পুলিশের চাকরি করে।

সুমন রেডলাইট এরিয়াতে রেড করেছে সেদিন। মেনকামাসির ঘরের এদিকে ওদিকে একগুচ্ছ মেয়ে তাকে দেখে এদিক ওদিকে পালাচ্ছে। সুমন একটি ঘরে গিয়ে হতভম্ব হয়ে যায়। দেখে দেওয়ালে টাঙানো তারই একটি ছবি। মা কি তাহলে এই নরকে...সুমন মাটিতে বসে পড়ে। আস্তে আস্তে পর্দা ওঠে। সীমার সন্ধান পায় সুমন। তার থেকে নিজের মায়ের হারিয়ে যাবার খবরও। সীমার কাছ থেকে হারিয়ে যাবার সময় অরুন্ধতীই নিজের ব্যাগটা সীমার হাতে ধরিয়ে দিয়েছিলেন যেখানে সুমনের ছবিটা ছিল। এসব যে রুদ্রনাথের চ্যালা মাণিকের কাজ তাও স্পষ্ট হয়। সুমন ক্রমে মাণিককে ধরে, জেনে যায় রুদ্রনাথের মেয়ে-ব্যবসা ও নারী পাচারের কাজের সন্ধান।

এরপর ঘটনা দ্রুত ঘটতে থাকে। মাণিককে হাজতে পুরে ফেরার পরই সুমন খবর পায়, সে খুন হয়ে গিয়েছে। এদিকে হিমাদ্রিবাবুকে সুমন বলে, বাবা, এবার একটা বড় কাজ আমাকে করতে হবে। আশীর্বাদ কর।

সদলবল সুমন সরাসরি রুদ্রনাথকে গ্রেফতার করে। কোর্টে তোলে। নারী-পাচার ও দেহব্যবসার ষড়যন্ত্রী অভিযোগে। রুদ্রনাথের দল ফুঁসতে থাকে। তারা হুঙ্কার ছাড়ে এস.পি.-কে দেখে নেবে। কিন্তু আদালতে সীমাকে এনে সুমন অভিযোগ প্রমাণ করে দেয়।

এবার সীমা আতান্তরে পড়ে। সে যাবে কোথায়? সুমন সীমাকে নিয়ে আসে হিমাদ্রির কাছে। হিমাদ্রি বলেন, তোমরা দু'জনেই এমন একটা অপরাধচক্রকে ধরলে। সারাজীবন পাশে পাশে চললে এমন অনেক কঠিন কাজ সহজে করতে পারবে।

সীমা আর সুমন এসেছিল গঙ্গার তীরের মন্দিরে। সেখানেই যেন তৈরি প্রেক্ষাপটে হাজির অরুন্ধতী এবং ভবেশের স্ত্রী। মিলনমেলা জমে উঠবার কথা ছিল আবার হঠাৎ বোমাবাজি ও গুলি চলল। কিরণবাবুর ভাড়া-করা গুণ্ডারা তুলে নিয়ে গেল সুমনকে। সঙ্গে সঙ্গে ভবেশের স্ত্রী ফোন করলেন ছেলেকে। বললেন—বিবেক-এর একটা বিহিত করতে হবে। ছুটে এল বিবেক। সীমার কাছ থেকে সব বুঝে নিয়ে রুদ্রনাথের গুদাম থেকে উদ্ধার করল সুমনকে। বলল, মাস্টারমশায়ের জন্য এটা আমাকে করতেই হত।

মন্ত্রী কিরণের জেল হল, রুদ্রনাথও ছাড়া পেলনা। ছাড়া পেলনা সুমন-সীমাও—তারা জড়ালো সংসারে। আর নিশ্চিন্ত মনে হিমাদ্রি ও অরুন্ধতী ছেলে-বউকে আদেশ দিলেন—আমাদের গাঁয়ে ফিরে যাবার ব্যবস্থা করে দাও।

অরণ্য মন

বিকেল হতেই নীল আকাশের রূপটা বদলে যেতে শুরু করেছে। টুকরো টুকরো কালো ছড়ানো ছিটানো মেঘগুলো যেন দল বাঁধতে শুরু করেছে। বিপাশা ঘরের বাইরে এসে বারান্দায় দাঁড়ায়। বন দপ্তরের ফরেস্ট অঞ্চলের কয়েকটা বিভিন্ন সাইজের কাঠের বাড়ি। মাটি থেকে কিছুটা উপরে পুরু তক্তার মেঝে আর দেওয়ালগুলোও কাঠের। বিপাশা নতুন বিয়ের পর তার স্বামী অসীমের সঙ্গে এসেছে তার বাসায়। অসীমের চাকুরী বনাঞ্চলে। পদ মর্যাদায় সে রেঞ্জ অফিসার। তার ক'মাসে পদোন্নতি হয়েছে—সুন্দর বনের বাঘনা রেঞ্জ অঞ্চলে।

এককালে বাংলার এই অঞ্চল ছিল গেঁও-সুন্দরী-সেগুন-হোগলা-গোলপাতা নানা জাতীয় অরণ্যে ভরা। এখানকার বনাঞ্চলে অধিকাংশ কাঠের বাড়ি। আর বনে ছিল হিংস্র নরখাদক রয়াল বেঙ্গল টাইগার। বর্তমানে সংখ্যায় একটু কম। এখানকার মানুষ বসবাসের জন্য বন কেটে ফাঁক করেছে। সঙ্গে কৃষি উৎপাদনও করেছে। চারদিকেই নোনা গাং, সেই বিষাক্ত নোনাজল থেকে নিজেদের ঘর-বাড়ি—ক্ষেত-খামার বাঁচাবার জন্য তৈরী করেছে ঘেরা বাঁধ।

দিনের বেলাতেও বনের ভেতর সূর্যের আলো খুব কম পৌঁছায়। দিনের বেলায় মনে হয় সন্ধ্যার অন্ধকার। পাশ দিয়েই বয়ে চলেছে বাঘনা নদী। এই অঞ্চল থেকে বাংলাদেশ বর্ডার একদম কাছেই। সেখানে রাতের অন্ধকারে জল পুলিশ-বি. এস. এফ-বি.ডি. আর-দের কড়া পাহারাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে অবাধে চলে চোরা কারবার। সময় বিশেষে কিছু মানুষরা বন্য জন্তুদের হার মানিয়ে নিজেদের হিংস্র রূপ ধারণ করতে দ্বিধা বোধ করে না।

বিপাশা বাইরের দিকে চেয়ে আছে। ওদিকে একটা মিষ্টি জলের ছোট পুকুর। তারপরে নারকেল-বটগাছগুলো মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে। বন বিভাগের এই ছোট্ট কলোনীর মানুষগুলোর সঙ্গে তার, বাঁধের ধারে, ক্ষেত্রে, দু-বেলা এই ঘর থেকে দেখা যায়। স্থানীয় কিছু লোক এই বন দপ্তরের কাজের সঙ্গে যুক্ত।

ওদিকে খালি জায়গা জুড়ে-নদীর ধারে—রহিম লস্করের মাছের আরত। দুদিকে মাছের জাল। মাঝি ভাইরা গাং থেকে মাছ ধরে আনে। খালি জায়গা বাঁশ দড়ি লাগিয়ে মাছগুলি কেটে হলুদ মাখিয়ে সুঁটকি করে পাঠায় রহিম নস্কর। ওখান থেকে ট্রলারে ডায়মন্ড হারবার-ক্যানিং-এর বাজারে চলে যায়। এসব জেনেছে এখানে এসে। কলকাতার শ্যামবাজারের দিকে তাদের ব্যবসা। বিপাশা কলকাতাতেই পড়াশোনা করেছে। মানুষ হয়েছে কলকাতাতেই। অনেক ইচ্ছে ছিল কলেজের পড়া শেষ করে ভালো একটা চাকুরী জুটিয়ে নিয়ে কলকাতাতেই থাকবে।

বিপাশা সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে আসে। ওদিকের ঘর থেকে কালীবাবু তখন বিকালের চা-পর্ব শেষ করে নদীর ধারে যাবার তোড়জোড় করছিল। ঘর থেকে পেছন পেছন কালীবাবুর স্ত্রী শিবানীদেবী বের হয়ে আসেন।

কালীবাবুর বয়স হয়েছে। এই বনে বাদারে বেশ কিছু ফরেস্ট অফিসে চাকুরী করছেন তিনি। শিবানীদেবীরও বয়স হয়েছে। তবু এই বনবাসেই শিবানীদেবী একটু বেশী স্বচ্ছন্দ বোধ করেন। তার ছেলে মেয়েরা বড় হয়। তারা বাড়িতে থেকে পড়াশোনা করে। বড় ছেলে চাকুরী করে কলকাতার একটা অফিসে। শিবানীদেবী এবার তার বড় ছেলের বিয়ে দেবার কথাও ভাবছেন। শিবানীদেবী বহুদিন এই প্রকৃতির মাঝে কাটাতে কাটাতে এই বনবাসের জীবনটাই মেনে নিয়েছেন।

শিবানীদেবী সুন্দর বনের বিভিন্ন বন চত্বরে ঘুরেছেন—দেখেছেন সুন্দরবন সত্যিই দেখতে সুন্দর। সুন্দর-বনের মাদকতা তাঁর হৃদয়কে স্পর্শ করেছে। সকালের সোনা রোদে এত রূপ এত রং যেন সারা বনাঞ্চলে চাদর বিছিয়ে দেয়। বিকালের অস্তরাগে বনের মাথায় আকাশ গেরুয়া, তারপর বেগুনী হয়ে ওঠে। বন নদীর বুকে খেলা শেষ করে সূর্য হারিয়ে যায় বনে। তারপর নামে রাতের অন্ধকার—শুরু হয় ঝিঁ ঝিঁ পোকার মত্ততা। জোয়ারভাটায় ফুলে ওঠে শান্ত গাং। বন চমকে ওঠে বাঘের গর্জনে। সন্ধ্যার পর সারা বনাঞ্চলে তখন নানা বন্য জন্তুদের শাসন চলে। শিবানী বলে, —মনে হয় ঝড় উঠবে। হ্যাঁরে ফুলি, বাবু কোথায় গেছে জানিস? ফুলি বলে—আমাদের বনে গেছে গো। নদীর ওপারে। মনে হয় ঝড়ের আগেই ফিরবে। হঠাৎ এই পরিবেশে শোনা যায় সুধীরের একতারার সুর। এই আদিম অরণ্য পরিবেশে যে জীবন স্তব্ধ-গম্ভীর-রহস্যে ভরা—সেই পরিবেশে সুধীর যেন এক ব্যতিক্রমী লোক। সুধীর গেয়ে ওঠে—ক

"মানব জীবন রইল পড়ে
আমায় বাউল করল বনে।"

ফুলি চাইল তার দিকে। দেখা যায় বাঁধের উপর দিয়ে এক তরুণ আপন মনে গাইতে গাইতে চলেছে। আকাশে ঝড়ের সংকেত। তবু সুধীরের কোনদিকেই হুঁশ নেই। ও চলেছে আপন খেয়ালে। তন্ময় হয়ে গাইতে গাইতে।

ফুলি এখানকার মেয়ে। ওদের বাড়ি বন কলোনীর ওদিকেই। ওর বাবা মদন-এর সামান্য জমিজমা আছে। তাতে চাষ করে বছরের খাওয়া জোটে না। মদন-এর সংসার চলে বন বিভাগে রেঞ্জ দপ্তরের কাজ করে। ফুলি এই বাংলোয় ঘরের কাজকর্ম করে দেয়। ফুলি বিপাশার জন্য নিজেই জাল নিয়ে গাং-এ খাবলা মেরে তাজা পারশে, ট্যাংরা মাছ ধরে আনে।

বিপাশা বলে—তুই জাল ফেলতে পারিস?

ফুলি বলে—পারি কিনা দেখবে এসো গাং-এর ধারে। বিপাশার প্রথম প্রথম ভয় করত এইখানে—ভয় অবশ্য এখনোও করে। তাই বলে ওদিকেই তো বন। সেদিন রাত্রে বাঘের গলাও শুনেছি। ছোট নদী পার হয়ে এপারেও আসে। ফুলি বলে—নদীর এপারে আসে না। আর বাঘ, কুমীর, সাপ নিয়েই তো এখানকার মানুষ ঘর করে। এসোনা বাঁধের উপরে। জোয়ার এসেছে। এখানে খাবলা মেরেই মাছ ধরবো। বিপাশার ভয় তবু যায় না। সে এই বনাঞ্চলের মধ্যে কি যেন একটা অজানা আতঙ্ক বোধ করে। তাই বলে তুই যা। এইখানকার মেয়েদের সত্যিই সাহসের অভাব নেই। হঠাৎ করে সুধীরকে দেখতে পেয়ে ফুলি আজ যেন অস্থির হয়ে ওঠে। সে দৌড়ে ছুটে যায় তার দিকে। বিপাশা বলে—এই ফুলি—ফুলির তখন দাঁড়াবার সময় নেই। সে দৌড়চ্ছে।

বিপাশা বলে—ছুঁড়ির কাণ্ড দেখ। সুধীর চলেছে আপন মনে গান গাইতে গাইতে। হঠাৎ পেছন থেকে কার ডাক শুনে চাইল সেই দিকে। দেখে ভেড়ির উপর দিয়ে দৌড়ে আসছে ফুলি। এলোমেলো ভাবে উড়ছে ওর চুল-শাড়ির আঁচল। হাঁপাতে হাঁপাতে সে সুধীরের সামনে এসে দাঁড়ায়। ফুলি জিজ্ঞাসা করে—কখন ফিরলে?

সুধীর বলে এই তো একটু আগে। রহিম আড়ৎদারের সঙ্গে গিয়েছিলাম যোগেশ কর্তার ওদিকে। ওখানকার বনবিভাগের মেলায় গিয়েছিলাম। বাউল গান হলো—ভরা জমিনে মনের সুখে গান গাইছিলাম। ওখানেই প্রসাদ পেয়ে গেলাম। থেকে যেতেও বলল। কেন জানিনা মন চাইছিল না তাইতো ফিরে এলাম।

ফুলি বলে—ঘরে ফিরতে মন চাইল তাহলে?

সুধীর বলে—কেন? আমি ঘর ছেড়ে গেছি বলে ঘরে ফিরতে নেই?

ফুলি বলে—ঘরে মন থাকে কোথায় তোমার—তাই তো যখন তখন পালিয়ে যাও।

সুধীর বলে—ফুলিরে আমি দুনিয়াটাকে দেখতে চাই। মানুষকে দেখতে চাই। গান গাইতে চাই। তাই মনে হয় যেন দুনিয়ার পথেই হারিয়ে যাই। এক জায়গায় মন থাকতে চায়না রে।

ফুলি বলে—তাই পালাও ঘর ছেড়ে—তুমি তোমার নিজের কথা ছাড়া কারও কথা ভাবো না—এমনকি তোমার মায়ের কথা ভাবলে না।

ফুলি নিজের কথা বলতে পারে না। তাই বলে আমার কথা সেও ভাবো না। হাসে সুধীর। হঠাৎ কোথা থেকে ধেয়ে আসে ঝড় নামের দৈত্যটা। নদীর বুকে তুফান তোলে ঝড়ের দাপট। তখন অন্ধকার নামছে। শুরু হয় মত্ত গর্জন। বাঁধের ওপর থেকে ঝড়ের দমকা হাওয়া যেন ওদের দুজনকে উড়িয়ে নিয়ে গাং-এ ফেলে দেবে। ফুলি জড়িয়ে ধরেছে সুধীরকে। সুধীর ওকে নিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ে টিলার উপর বসে পড়ল তখন ঝড়ের সঙ্গে শুরু হয়েছে বৃষ্টির দাপট। হঠাৎ সারা বনাঞ্চল—অশান্ত গাং-কে চমকে বিদ্যুৎ-এর ঝলক ওঠে। তারপরেই বিকট শব্দ—মেঘের গর্জন শোনা যায়। নিমেষের মধ্যে চারদিকের শান্তরূপটা বদলে যায়। ওদিকে আদিম অরণ্যে যেন একদল দানব এসে তছনছ শুরু করেছে। নদীর বুক ফুঁসছে। নোঙর করা নৌকাগুলি নিয়ে নদীর উন্মত্ত জল যেন লোফালুফি শুরু করেছে। সেই সঙ্গে মাঝে মাঝেই আকাশে বিদ্যুৎ-এর ঝলক। বিহ্বল নদী আর আদিম অরণ্যের ভয়ঙ্কর রূপে যেন একটা অদৃশ্য মহাশক্তিমান গর্জন করছে।

ফুলি-সুধীর দুজনে ভিজতে ভিজতে গিয়ে সামনের একটা ছোট ঘরে আশ্রয় নিলো। বন কলোনিতে তখন উদ্দাম ঝড় আছড়ে পড়ছে। কালীচরণ গার্ডের বাড়ি লবঙ্গ ছুটে গিয়ে নিজের ঘরে ঢুকে তখন জানলা দরজা বন্ধ করছে। কালীচরণ তখন বাড়িতেই ছিলো। সে তার দ্বিতীয় পক্ষের বৌয়ের সম্বন্ধে খুবই যত্নশীল আর সাবধানী। প্রথম বৌকে সে কিছুতেই সহ্য করতে পারতো না। কারণ সে ছিলো স্পষ্টবাদী। কালীচরণ যে মানুষ হিসেবে মোটেই ভালো নয় সেটা জানতে পেরেছিল। কালীচরণ অনেক চোরাকারবারীদের সঙ্গে আঁতাত করে টাকা নিয়ে ওদের মাল সাপ্লাই করতে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতো। শুধু তাই নয়, কালীচরণ মাইনের টাকা হাতে দিতো না। এমনকি সে তাকে জোর করতো তার দু-নম্বর কাজের হদিশ যেন তৃতীয় কোন ব্যক্তি না জানে। নদী পার হলেই বাংলাদেশ। দুই দেশেরই কিছু এলাকার লোক বেশ আঁতাত করে লাখ লাখ টাকার বিদেশী মালও আনা নেওয়া করতো। এমনকি হেরোইনের মতো নেশার মালও আনা নেওয়াও করতো বন-জঙ্গল নদীর মধ্যে দিয়ে। পুলিশ বি-এস-এফ রয়েছে। তাদের কড়া পাহাড়া এড়িয়ে নানা বেনিয়মে ওই সব মাল আনা-নেওয়া হতো। ওদেরই দু-একজন জাল টাকার কাজের সঙ্গে যুক্ত। ফলে কালীচরণের আমদানী ভালোই ছিল। কালীচরণ মদও খেত। ফরেস্টে এত গার্ড আছে, কলোনিতে তার মতো কেউ এত মদ খায়না। আর সেদিন গজেনবাবু বলছিল—তুমি নাকি দুনম্বরী অনেক কাজ করো।

গজেন দত্ত আরেকজন গার্ড। কমবয়সী নতুন এসেছে। তার থেকে কালীচরণের বয়স অনেকটা বেশী তাই—স্ত্রীর মুখে গজেনের নাম শুনে কালীচরণ ফুঁসে ওঠে—গজেনের দিকে তোমার নজর রয়েছে দেখছি। গজেনের দিকে চোখ তুলে চাইলে তোমার চোখ কানা করে দেব। লবঙ্গ বলে—তাই বলে নিজে দোষ করবে-মদ গিলবে-মুখ নোংরা করবে আর লোকে বললেই যত দোষ। কালীচরণ আজ চোরাকারবারী কাজ করে ভালো টাকা ছাড়াও এক বোতল বিলাতী মদ পেয়েছে। সে খোশমেজাজে মদ নিয়ে বসেছে। আর এই মেয়েটা কিনা কালীচরণের মেজাজটাই বিগড়ে দিতে চায়। কালীচরণ গর্জে ওঠে—তামবি। নাহলে দেব এই বোতলের একঘায়ে খালাশ করে। তারপর লাশটা খালে ফেলে দেব, কুমীর কামটে ভোগ করবে।

চুপ করে থাকে লবঙ্গ। তবে সে যে খুশী হয়নি তা বেশ বোঝা যায় মুখ চোখ দেখে। তাতে অবশ্য কালীচরণের কিছু আসে যায় না। কালীচরণের জীবনে এই বৌটাও যেন এক বাধা হয়ে ওঠে। লবঙ্গ বলে—এত টাকার আমাদের দরকার নেই গো।

কালীচরণের তখন নানা পথে কামাই হচ্ছে। তাই বলে—চুপ করে থাক। নাহলে তোর ঐ বনগাঁ-র বাপের ঘাড়ে ফেলে দিয়ে আসব।

মেয়েটা বড় গরীব ঘরের মেয়ে। এর বাবা বনগাঁর ওদিকে একটা বস্তিতে ছিটেবেড়ার ঘরে থাকত। সেই মেয়েটা দেখেছে গরীবির যন্ত্রণা। প্রথমে বরে ঘরে এসে সে ভেবেছিল এখানে শান্তি পাবে। শান্তি

তো পায়নি বরং ধীরে ধীরে কালীচরণের মাত্রা ছাড়াতে থাকে। তাদের ঝগড়াও চরমে ওঠে।

কালীচরণের প্রথম বৌটা একটা বিষাক্ত সাপের কামড়ে মারা যায়। কালীচরণ যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। তার কিছুদিন পরেই লবঙ্গকে ঘরে নিয়ে আসে কালীচরণ। সে সেজেগুজে একটু আদরে থাকতে চায়। কালীচরণ তাই এই দূর বনবাসেও তার জন্য রেডিও আনিয়েছে। এমনকি শাড়ি-লিপস্টিক-গন্ধ তেল এসবও আসে। কালীচরণ দেখেছে লবঙ্গকে—তার চরিত্রে রয়েছে অদ্ভুত এক কাঠিন্য-বুদ্ধিমতির ছাপ। তার স্বামী সম্পর্কে কে কি বলছে, করছে এসব খবর রাখার ধার ধারে না। কালীচরণও এমন শক্ত দেমাকী মেয়ে পেয়ে খুশী। কালীচরণ তাই যেন লবঙ্গকে সত্যিকারেই ভালোবাসে। অবশ্য এর মধ্যে কালীচরণের মুখে-চোখে বয়সেরও ছাপ পড়েছে। তার তুলনায় লবঙ্গর বয়স অনেক কম। অন্য গার্ডরা বলে কালীচরণ বৌদির পাশে তোমায় ঠিক মানায় না। কালীচরণও সেটা জানে। তাই এখন একটু ধীর স্থির থাকে। আর লবঙ্গর দিকে একটু বেশী নজর রাখে।

সন্ধ্যার মুখে তার মদ চাই। লবঙ্গর পাশে বসে মদ খেতে ভালোবাসে কালীচরণ। লবঙ্গও বাধা দেয় না। কালীচরণ বাড়ি ফেরার সঙ্গে সঙ্গেই ঝড়ের দাপট শুরু হয়েছে। লবঙ্গ তখন ছুটে গিয়ে ঘরের জানলাগুলো বন্ধ করছে। বাজ পড়ার বিকট শব্দ। লবঙ্গর ভয় লাগে বাজের শব্দ শুনে। এমন সময় ঘরে এসে দাঁড়ায় কালীচরণ। লবঙ্গ বলে—তুমি এসেছে? কি যে ভয় করছিল। নিমেষের মধ্যে লবঙ্গকে কাছে টেনে বলে কালীচরণ—ভয় কি। আমি তো আছি। বাইরে তখন ঝড়ের তাণ্ডব।

শিবানীর চিন্তা হয় বিপাশার জন্য। ফুলির সঙ্গেই বেরিয়েছিল। একা পড়ে গিয়েছিল বিপাশা। ফুলি বিপাশাকে তাদের বাড়ি পৌঁছে দিয়েই তার বাড়িতে চলে যাওয়ার জন্য পা বাড়ায়।

আজ বিপাশা দেখেছে যেন অন্য ফুলিকে। সেই ছেলেটার গান যেন তাকে জাদুর মতো টেনেছিল। সে দৌড়ে চলে গেছে নিজের সব কাজ ফেলে রেখে। আবার দুর্যোগে তাকে ভিজেই বাড়ি পৌঁছে দিয়ে গেছে। অসীম এখানকার রেঞ্জ অফিসার। এলাকায় বেশ সুনাম আছে তার। একজন দক্ষ বনঅধিকারিক। কর্মী মহলেও তার সুনাম আছে। ওদিকে বনের সামনের দিকে বেশ অনেকখানি জায়গা সংরক্ষণ করে ফরেষ্ট বিভাগ থেকে নারকেল চারা লাগিয়ে একটি প্রকল্প গড়তে চায় তারা। তাদের এই নোনামাটিতে যদি নারকেল ফলাতে হয় তাহলে উন্নত প্রকৃতির নারকেল গাছ লাগাতে হবে এবং বিরাট অঞ্চল জুড়ে লাগানো নারকেল গাছগুলি সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ প্রয়োজন। এই প্রকল্পের ফলে এলাকার রূপও বদলাবে আর এখানকার মানুষের কিছুটা অর্থের সুরাহাও হবে।

অসীম নিজে বনবিভাগের দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করে তারা এই প্রকৃতিকে সংস্কার করে কাজ শুরু করেছে। নির্বাচিত গাছ লাগানো অঞ্চলের কাছেই একটা ডিপ টিউবওয়েলও রয়েছে। সেই জল দিয়েই বিরাট এলাকায় নারকেল চারা লাগিয়ে জলসেচ করতে হয়। বনের লাগোয়া অঞ্চল। রাত্রের অন্ধকারে বাঘ আসে। অঞ্চলের লোকজন বলে—বাঁদরগুলো দল বেঁধে নামে আর কচি নারকেল গাছের পাতাগুলো ছিঁড়ে গাছ নষ্ট করে। তাই এই অঞ্চলেই একটা পাকাপোক্ত ঘর করে কয়েকজন গার্ডকে পাহারায় রেখেছে। তারপর লোকজন লাগিয়ে গাছগুলির পরীক্ষা করে নতুন কিছু চারা লাগিয়ে পাহারা দেওয়া হয়। সেদিন অসীম এসেছে নারকেল প্রকল্পের কাজে। আর তার কিছুক্ষণের মধ্যে ঝড় নামে। নিমেষের মধ্যে শান্ত ছোট নদীটাও ফুলে-ফেঁপে ওঠে। অসীম তার কয়েকজন সহকারী গার্ডের ঘরেই আশ্রয় নিয়েছে। মনে হয় দমকা হাওয়ার দাপট যেন ওদের বাড়িটাকে ছুঁড়ে ফেলে দেবে। করার কিছুই নেই। ওরা দেখছে বাইরে ঝড়ের তাণ্ডবলীলার সঙ্গে শুরু হয়েছে বৃষ্টির দাপট।

বিপাশা ছুটে এসে নিজের ঘরে ঢুকে ভিজে জামা শাড়ি পাল্টেছে। বাইরে তখন চলছে ঝড়ের গর্জন, সঙ্গে শোনা যাচ্ছে নদীতে জোয়ারের কলধ্বনি। দরজা বন্ধ করে বসে আছে বিপাশা। ভাবনা হয় অসীমের জন্য। কোথায় আছে। তা জানেনা বিপাশা। তার মনে পড়ে কলকাতার সেই দিনগুলোর কথা—এই অনন্য জগৎ সুন্দরের চাইতে বিস্বাদময় বলেই মনে হয়েছে প্রথম দিন থেকেই। কলকাতার বাঙালী বাড়ীতে জীবন কাটিয়ে বড় হয়েছে। দেখেছে ইট-কাঠ-কনক্রিটের জগৎকে। সেটাই ছিল তার জগৎ। স্কুল ছিল বাগবাজারে। তাদের বাড়ি থেকে বেশী দূরে নয়। বাগবাজারের জেটিতে দল বেঁধে

আড্ডা। তাতে ছিল নির্মল আনন্দ। বিকালে মাঝে মধ্যে দেশবন্ধু পার্কে যেত। গাছগাছালী ভরা মাঠ-লোকজনের ভিড়। সন্ধেবেলাতেও বন্ধু-বান্ধব মিলে খুব হৈ চৈ করত। তখন থেকেই বিপাশার পরিচয় হয় বিজনের সঙ্গে। সেই পার্কে ফুটবল খেলা হতো খুব ঘটা করে। পাড়ার ক্লাবের নামী প্লেয়ার ছিল বিজন। ফরোয়ার্ড লাইনে খেলত বিজন—পায়ে বল পেলে বিপরীতে থাকা টিম বিপদে পড়তো। ওর দুপা-ই সমান চলে। একবার পায়ে বল পেয়ে গেলে দু-তিন জনকে কাটিয়ে তিরের বেগে ছুটে যেত। ওর শটে গোল হতোই। সারা মাঠ দাপিয়ে বেড়াত। বিজনের খেলা দেখার জন্য ছেলেমেয়েরাও ভিড় করত। বিপাশাও থাকতো বিজনের খেলা থাকলে। সেই বিপাশাও মজেছিল বিজনের নামে।

বিজনদের ক্লাব সেদিন শিল্ড জিতেছে আর সে পেয়েছে বেস্ট প্লেয়ারের প্রাইজ। খেলা শেষে বের হয়েছে পার্ক থেকে। তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। বিজন খুশী মনে বের হয়ে আসছে—ওদিকে দু-তিন জন ছেলে কয়েকটা মেয়ের দলকে বিরক্ত করতে দেখে এগিয়ে যায়—মুখ চেনা কয়েকটা ছেলে বিপাশাদের দলটাকে ঘিরে ধরেছে। জায়গাটায় বিশেষ আলো নেই—আলো রয়েছে দূরে। গাছের ছায়ায় জায়গাটা অন্ধকার। ওদের মধ্যে একজন বলে—চলো না সিনেমায়। টকি-শো হাউসে দারুণ একটা ছবি লেগেছে—চলো। বিপাশা বলে—পথ ছাড়ো। বাড়ি যেতে হবে। একটা মস্তান মার্কা ছেলে বিপাশাকে দেখে বলে—আমি কাদু বলছি তোমাদের যেতে হবে। সবাই না যাও—বিপাশাকে দেখিয়ে বলে—তোমাকে যেতে হবে। অন্যজন বলে—ভালো কথায় না হলে তুলে নিয়ে যাব। বিপাশা ওদিকে বিজনকে আসতে দেখে বলে—দেখোনা এরা কখন থেকে জ্বালাতন করছে। বিপাশার বান্ধবী বলে—জোর করে সিনেমায় নিয়ে যাবে বলছে। বিজন এগিয়ে আসে—এবার সে ধরেছে কাদুকেই। বিজন বলে,—কি রে, বেশ মস্তানী শিখেছিস তো। কাদু বলে—ওরা বানিয়ে বানিয়ে বলছে। মাইরী—। বিজন সবার সামনে কাদুর গালে এক চড় মেরে বলে,—ওরা মিথ্যে কথা বলছে, আর তুই সত্যবাদী যুধিষ্ঠির। এত বড় সাহস, পাড়ার মেয়েদের পেছনে লাগছিস। কাদু গালে চড় খাবার পর তার সুর বদলে যায়। কাদু বলে আর এসব হবে না। বিজন বলে—কথাটা যেন মনে থাকে। আজ থাপ্পর মেরে ছেড়ে দিলাম। পরে যদি আবার দেখি হাসপাতালে পাঠিয়ে দেব। ছেলেগুলো পালিয়ে যায়। যাও ওরা আর বিরক্ত করবে না।

সেই প্রথম পরিচয়। এরপর বিপাশা দেখেছে বিজনকে। মাঝে মধ্যে দেখা হয়। বাগবাজারের এক গলিতে বিজন বিপাশার মুখোমুখি দেখা হতে বিজন বলে, এদিকে কোথায় থাকো? বিপাশা বলে, —বাগবাজার কালী মন্দিরের পাশে আমাদের বাড়ি।—রতনদের বাড়ির পাশে? জিজ্ঞাসা করে বিজন। বিপাশা বলে,—ওকে চেনো? ও তো আমার দাদা। এবার অবাক হয় বিজন,

—রতনের বোন তুমি? রতন তো আমাদের কলেজে পড়ে। ওতো আমার বন্ধু।

বিপাশা দাদার কাছে শুনেছে তার বন্ধু নাকি দারুণ ফুটবল প্লেয়ার। আর ক'দিন বাদেই দেখে বিজনকে তার দাদার সঙ্গে তাদের বাড়িতে আসতে। অবশ্য বিপাশা কিছুই বলেনি। তার দাদা পরিচয় করিয়ে দেয় বিপাশাকে। এই বিজন, আমার বন্ধু ও এখন নামী ফুটবল প্লেয়ার। আর শ্যামবাজারের মোড়ে ওদের দোকান—কল্পতরু স্টোর্স। বড়বাড়ির ছেলে বিজন।

সময় বসে থাকে না। সে তার নিজের মতো এগিয়ে চলে। শেষ হয়ে যায় দিন-মাস-বছরগুলো। বিপাশা এখন কলেজে পড়ছে। এখন বিজন নাকি কলেজের পড়া শেষ করে নিজেদের ব্যবসা দেখছে। বিপাশাও দেখেছে বড় রাস্তার ওপর সুন্দর সাজানো গোছানো দোকান। নানা কিছু পাওয়া যায় সেখানে—কসমেটিকস -সেন্ট -নানা ধরনের দেশী বিদেশী ইলেকট্রিক সামগ্রী, এছাড়াও আরও সব নানা জিনিস পাওয়া যায়। বিপাশা দেখেছে দোকানটা। এর মধ্যে বিজন বিপাশার সম্পর্ক একটা ঘনিষ্ঠ রূপ নিয়েছে। মাঝে মধ্যে কলেজ পালিয়ে বিপাশা বিজন দুজনে চলে যায় ভিকটোরিয়ার দিকে। না হয় নির্জন জায়গায় গঙ্গার ধারে বসে দুজনে ঘনিষ্ঠ হয়ে কোন এক স্বপ্ন দেখে। বিপাশার হাত বিজনের হাতে। বিজন বলে,—নিজের ব্যবসাটাকে দাঁড় করাই। কথা দিচ্ছি ঠিকমতো দাঁড়াতে পারলে তোমাকে ঘরে নিয়ে যাবো।

বিজন এখন তার ব্যবসার কাজে ব্যস্ত। পারিবারিক দোকান নিয়েই সে ভাগীদার হয়ে থাকতে চায় না। তাই নিজের ব্যবসা শুরু করেছে। দেশ-বিদেশ থেকে মাল এনে এখানকার বাজারে সাপ্লাই দেওয়ার ব্যবসা শুরু করেছে। তাই সে এখন ব্যস্ত। প্রায় তাকে দিল্লী যেতে হয়। বেশ কদিন দেখা মেলেনি বিজনের—তাই হঠাৎ এসে হাজির হয়। বিপাশাকে এগিয়ে আসতে দেখে বিজন দু-কান ধরে ক্ষমা চায়। বিপাশা বলে—খুব যে কাজে ব্যস্ত। দেখা করার এতটুকু সময় হয় না বুঝি। হাসে বিজন, বলে—এখন থেকেই শাসন শুরু করেছো দেখছি। হাসে বিপাশা। সে যেন বিজনকে নিয়ে এবার নতুন স্বপ্ন দেখছে।

এদিকে বিপাশার বাবা-মা মেয়ের বিয়ের কথা ভাবতে শুরু করেছে। মেয়ের বিয়ে দিয়ে ছেলের বিয়ের কথাও ভাবছে। বিপাশার মা বলে,—তাই ভালো। মেয়ের বিয়েটা এবার দিয়ে দাও। দেখোনা যদি ভালো ছেলে পাওয়া যায়। তবে ছেলে যদি সরকারী চাকরী করে তবে ভালো হয়।

বিপাশাকে এর মধ্যে বাড়িতে দু-একবার সেজে-গুজে বসতে হয়েছে কয়েকটা বয়স্ক দম্পতির সামনে। কিন্তু বিয়ের পাকা কথা তখনও হয়নি। তারা হয়তো পাওনা-গণ্ডা বেশী পাবেনা জেনেই পিছিয়ে গেছে। এর মধ্যে দু-একবার বিজনের সঙ্গে দেখা হয়েছে বিপাশার। বিপাশা বলে—বাবা-মা তো আমার দেখাশোনা শুরু করেছে। এবার—।

বিজন বলে—যেভাবে হোক এড়িয়ে যাও—আর কিছুদিন অপেক্ষা করো। বিজন তার ব্যবসার কথা নিয়ে ভাবছে। বিপাশা বলে—তুমি আমার দাদাকে জানাও। তুমি আমাকে বিয়ে করবে। বিজন বলে তাই বলব, তুমি ভেবো না। কিন্তু বিজন বোধহয় রতনকে তেমন কিছুই জানায়নি। রতনও পাত্রের সন্ধান করছিল। আর তার সহপাঠী তার এক ভাই-এর সন্ধান দেয়। ছেলেটা বন বিভাগে রেঞ্জ অফিসার। সরকারী চাকরী। তাই এইরকম পাত্রের সন্ধান পেয়ে বিপাশার বাবাও মেয়ের বিয়ে দিতে রাজী হয়ে যায়। বিপাশাও সব শুনেছে। সে একদিন দাদাকে জিজ্ঞাসা করে—হ্যাঁরে, তোর সেই ফুটবল প্লেয়ার বন্ধুটার কি খবর জানিস। রতন তখন বিয়ের কথা ভাবছে। সে বলে—ওর সঙ্গে আর আমার যোগাযোগ নেই। বিপাশা বলে—ওতো নাকি ব্যবসা শুরু করেছে। রতন বলে—ছাড় তো ওসব কথা। যতসব—। বিপাশা বুঝতে পারে দাদা যেন কেমন এড়িয়ে গেল তাকে।

ঝড় তখনও চলছে। তবে আগের মতো হাওয়ার দাপট আর নেই। বিপাশার বড়দা রতন অবশ্য এর মধ্যে জেনে নিয়েছে বিপাশার সঙ্গে বিজনের মেলামেশার খবরটা। বিজনকে রতন এখন আর পছন্দ করে না। রতনও চায় না বিপাশা বিজনের সঙ্গে যোগাযোগ করুক। তাই রতন যেন বিপাশাকে বিজনের জীবন থেকে সরিয়ে দেবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। রতনই উদ্যোগী হয়ে অসীমদের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করে। অসীম তখন সুন্দরবনের ফরেস্টে একজন কর্মী। অসীমের বাবাও চান বনবাসী ছেলেটাকে ঘর বন্দী করতে। তাই ওর বিয়ের প্রস্তাব আসতে ছেলের সম্মতি জানতে চান।

বিপাশা কদিন যোগাযোগ করার চেষ্টা করে বিজনের সঙ্গে। কিন্তু সেই সময় বিজনকে সে পায় না। বিজন তার ব্যবসার কাজ নিয়ে বের হয়ে গেছে। বিপাশা দেখছে বাড়িতে তার বিয়ের উদ্যোগ চলছে পুরোদমে। বিপাশা বুঝতে পারে এখন তার ভাগ্যকে মেনে নেওয়া ছাড়া আর উপায় নেই। পাথর চাপা বেদনা—কষ্ট স্বীকার করে বাবা মা-র খুশীর কথা ভেবে বিপাশা এই বিয়েকে মেনে নিয়েছিল। বিজনের আর কোনে খবর জানেনা।

বিয়ের পর বিপাশাকে নিয়ে এসেছিল তার এই অরণ্য-জগৎ-এর পরিবেশে। একটি মেয়ে যে কিনা কলকাতার মত পরিবেশে মানুষ হয়েছে, তাকে এইরকম অরণ্য জগৎ-এ কাটাতে হবে ভেবে বিপাশা সেদিন বিস্মিত হয়ে ওঠে।

ওরা ক্যানিং থেকে লঞ্চে এসে উঠেছে—শুরু হয় তাদের যাত্রা। বিপাশা দেখে কিছুদূর যাওয়ার পর শুধু জল আর জল। দিগন্ত প্রসারিত জলের বুক চিরে কেমন নেশার ঘোরে লঞ্চ ভেসে চলেছে। বিচিত্র সব মানুষের ভীড়। বাড়ি থেকে খাবার অসীমের সঙ্গেই ছিল। দুপুরের খাওয়া দাওয়া শেষ করে

খোলা আকাশের নীচে এসে দাঁড়ায়। চারিদিকে জল। প্রতীক্ষার অবসান ঘটে আরও কিছুক্ষণ পরে—দূরে দেখা মেলে সবুজ বনাঞ্চলের। ধীরে ধীরে লঞ্চটা বনাঞ্চলের দিকে এগিয়ে আসে। পড়ন্ত সূর্যের আলোয় বনাঞ্চল যেন কোন মায়াবী রূপ নিয়েছে। পাড়ে গাড়ী প্রস্তুতই ছিল। ছিল বন কলোনির কিছু লোকজন। তার মধ্যে কিছু মহিলাও উপস্থিত ছিল। সেখানে তারা নবদম্পতিকে অভিবাদন জানাতে এসেছিল। সেখান থেকে সোজা চলে আসে তাদের সেই কাঠের বাংলো ঘরে।

শিউরে ওঠে বিপাশা। নিয়তি তাকে এ কোথায় এনে ফেলল। এখানে আসার পর থেকে বিপাশা প্রচণ্ড ভয়ে দিন কাটাত। বনের দিক থেকে একটানা গর্জন আসছে। প্রথমে বিশ্বাস করতে পারেনি—যে এটা দূর থেকে ভেসে আসা একটানা বাঘের গর্জন।

ঘুম ভেঙে যায় বিপাশার—কিন্তু অসীম নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছে। চাঁদনী রাত। বিপাশা জানালার কাছে এসে দাঁড়ায়। বিপাশার চোখ চলে যায় বাইরের দিকে। ভরা চাঁদের আলো। হঠাৎ ওদিকে বনের ভিতর থেকে কি যেন একটা বেরিয়ে আসে। বিপাশা দেখে একটা বাঘ। দুটো চোখ তার জ্বলছে। বন থেকে বের হয়ে এগিয়ে আসছে সামনের দিকে। বিপাশা সঙ্গে সঙ্গে জানলা বন্ধ করে ঘরে এসে বিছানায় আছড়ে পড়ে জড়িয়ে ধরে অসীমকে। বিপাশার চোখে মুখে আতঙ্কের ছাপ। বাঘটা তখনও গর্জন করে চলেছে। ঘুম ভেঙে যায় অসীমের। অসীম বলে ও চলে যাবে। ভয় নেই। ওরা মাঝে মাঝে খাবারের সন্ধানে এদিকে আসে। আবার ফিরে যায়।

বিপাশা আজও সেই দিনগুলোকে ভুলতে পারেনি। সে আজ এই বনাঞ্চলের জীবনকে মেনে নিয়েছে বাধ্য হয়েই। বাইরে ঝড় থেমে এসেছে। বৃষ্টি তখনও পড়ে চলেছে। চারপাশ সব অন্ধকার। বিপাশা চঞ্চল হয়ে ওঠে। অসীম তখনও ফেরেনি। বন কলোনির আরও কয়েকজন আছে অসীমের সঙ্গে। তারা একসঙ্গে বেরিয়েছিল—দুর্যোগে কোথাও আটকে পড়েছে। চিন্তা হয় অসীমের জন্যে। ফুলি বসে রয়েছে। বাইরে থেকে কার যেন গর্জন শোনা যায়। ফুলি বলে—ভয় নেই দিদিমণি। ফুলি এবার সুধীর সম্বন্ধে জানায় - তাকে দেখে মনটা কেমন উদাস হয়ে গেল, ছুটে এলাম। তারপরেই শুরু হল ঝড় তুফান। ঘরে রয়েছে বুড়ি মা। ছোট একটা ঘর। ওদিকে বনের পাশে। সুধীর মাঝে মাঝে এমন বিচিত্র ধরনের কথা বলে তার মাথা মুণ্ডু কিছু বুঝতে পারে না ফুলি। তবু মুখ বুজে নিয়েই তার কথা শুনতে হয়। এবার থেমে ফুলি বলে, ঘরে চিড়ে, মুড়ি, মাছ, ভাত কি রয়েছে খেয়ে নিও। কাল সকালে আসবো। ফুলি বের হয়ে আসে। তখনও টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ে চলেছে। বৃষ্টি ভেজা পথও পিচ্ছিল হয়ে রয়েছে। এর মধ্যে এসে পড়ে অসীম। ফুলিও দেখেছে বনের দিক থেকে আসার সংকেত। ফুলি বলে,

—সাহেব ফিরছেন।

বিপাশা দেখছে ফুলিকে। দেখেছিল তার সেই গান শুনে নিমেষের মধ্যে ফুলিকে ছুটে যেতে। বিপাশা বলে—তোকে দেখে আমার মনটাও যেন ছুটে গিয়েছিল। ফুলি বলে—সুধীরের কথা বলছ তুমি? সুধীর বড় ভালো গান গায়গো। এই ওর দোষ। চাকরী বাকরী ঘর কিছুতেই তার মন বসে না। যাযাবরের মতো ঘুরে বেড়ায়। আর আসরে আসরে গান গেয়ে বেড়ায়। বিপাশা বলে, যে যা করে করুক। তবে সুধীরের সঙ্গে ফুলির সম্পর্কটা ঠিক কি তা ফুলি নিজেও জানে না। বিপাশার কথার জবাব সে নিজেও দিতে পারে না। ফুলির চোখের সামনে সুধীরের সহজ সরল হাসিমাখা মুখটাই কেমন যেন বার বার ভেসে ওঠে। বিড় বিড় করে ফুলি—ছেলেটা খুব ভালো গো।

এখানে সকালটা খুব সুন্দর। গাছ-গাছালির ডালের ফাঁক থেকে ভেসে আসা নাম না জানা হরেক পাখির কিচির মিচির গুঞ্জন। সকালের সোনালী রোদ জানালার গরাদ ভেঙে আছড়ে পড়ে কাঠের উপর কার্পেট পাতা মেঝেতে।

বিপাশার ঘুম ভাঙে। অসীম তখনও ঘুমিয়ে আছে। বিপাশা বাইরে বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। তখন কলোনির দু-একজন গার্ড উঠেছে। ওদিকে কয়েকজন মুসলমান পবিত্র নামাজ পড়ছেন। মেঘমুক্ত আকাশে তখন রং-এর খেলা শুরু হয়েছে। মিষ্টি হাওয়ায় নারকেল গাছগুলোর পাতা নাড়ার ঝির ঝির

শব্দ হয়। এখানকার সকালের প্রকৃতি খুবই স্নিগ্ধ। এর তুলনায় কলকাতার সকাল যেন একটু কঠিন-শক্ত। তবু বার বার মনে পড়ে কলকাতার কথা। অসীমকেও বলেছে—তোমার শহরে বদলী হয় না? অসীম বলে—আমি চাকরী করি বনবিভাগে। জানি তোমার কষ্ট হয়। এখানে তেমন বাজার দোকান সিনেমা হল এসব নেই। তবু এখানকার জীবনটাকে একটু ভালবাসার চেষ্টা কর। দেখবে তোমার ভাল লাগবে। বিপাশা তেমনটা করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু দেখেছে রাত্রের অন্ধকারে এখানে ঘুরে বেড়ায় হিংস্র বাঘ, নদীতে দেখেছে কুমীর, শুনেছে বনে বাস করা ভয়ঙ্কর সব সাপের কথা। এখানকার মানুষ সর্বক্ষণ মৃত্যুর সঙ্গে ঘর করে। তবু এখানকার মানুষ স্বপ্ন দেখে ঘর বাঁধার।

রহিম লস্কর এখানকার আড়ৎদার। তার দোকান রয়েছে এখানে। অঞ্চলের শেষ গঞ্জ। এই গঞ্জেই শেষ সপ্তাহে দুদিন হাট বসে। বর্ডারের পাশে একটু ফাঁকা জায়গা—দু-একটা কৃষ্ণচূড়া গাছ তাদের অস্তিত্ব বজায় রেখেছে এখানে। তার এদিকে কয়েকটা ছোট ছোট দোকান। তার মধ্যে রহিম লস্করের দোকানটা বড়। রহিম লস্কর এই এলাকার প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। এখানে তার বড় মাছের আড়ত। নিজেরই রয়েছে অনেক নৌকা-জাল। বেশ কিছু লোককে সে নৌকা জাল দিয়ে গাং-এ মাছ ধরতে পাঠায়। এছাড়াও এই এলাকার বহু লোকই মাছ ধরে তার আড়তে আনে। মাছের ব্যবসা ছাড়াও তার রয়েছে নিজের সাম্রাজ্য। রহিম লস্কর বেশ একজন শৌখিন লোক। পরনে পাজামা-কলকাতার পাঞ্জাবী পরে চোখে সুরমা-গায়ে আতর লাগিয়ে তার গদি ঘরে বসে থাকে। সারা এলাকার মানুষ রহিম লস্করকে তোষামোদ করে চলে। বাইরে থেকেও আসে অনেক ব্যবসায়ী। এসে মাল নামিয়ে অস্থায়ী দোকান খুলে বসে। বাইরের ব্যবসায়ীরা আসে নৌকা করে। এই সময়গুলোতে যেন একটা মেলার আয়োজন শুরু হয়। সপ্তাহে দুটো দিন তাদের নিঃস্তব্ধ জীবনে বাইরের ছোঁয়া আনে। রহিম লস্করের দোকানেও ভিড় জমে। রহিম একদিকে বসে টাকা-পয়সা নেয়।

সেদিন ফুলি এসেছে হাটে। সঙ্গে তার সেই সুধীর। সুধীর অবশ্য একতারা হাতে করেই এসেছে। ফুলির সারা দেহের উচ্ছল যৌবনের মত্ততা সহজেই সকলের চোখে পড়ে। ওদিকে রহিমের গদিতেও তখন খদ্দেরের ভীড়। ফুলি বলে—লস্কর সাহেব আছেন গো? কর্মচারীরা চেনে ফুলিকে। একজন বলে এখন ব্যস্ত উনি।

এখন দেখা হবে না। ফুলিকে দেখেছে লস্কর সাহেব। এই ভরা যৌবনের মেয়েদের একটু অন্য চোখে দেখে রহিম মিঞা। রহিমের ঘরে অবশ্য বিবি আছে। তবু রহিম সাহেবের নজর এদিক ওদিক ঘোরে। রহিম সাহেব কর্মচারীর উদ্দেশ্যে আওয়াজ দেয়—ওকে আসতে দে। ফুলি বিজয়ীদের মতো ওদের গদি ঘরে ঢোকে, সঙ্গে সুধীর। সুধীরই বলে, সেলাম মিঞা। রহিম চাইল। ফুলিকে দেখছে সে। দেখছে সুধীরকে। তরতাজা এক তরুণ জোয়ান। ফুলির সঙ্গে ওকে দেখে একটু অবাক হয় রহিম। ফুলি বলে,—মিঞা, এই সুধীর। এর কথাই বলছিলাম সেদিন। একে তুমি কোন কাজে নাও। রহিম সাহেব দেখছে সুধীরকে। বলে—এর কথাই বুঝি বলেছিল তুই? ফুলির কথা তো ফেলতে পারি না। তবে দেখি কিছু কাজ তো দিতে হবে। কি বলিস ফুলি? ফুলিও ঘাড় নাড়িয়ে বলে, —তাই তো এসেছি তোমার কাছে। রহিম বলে—ঠিক আছে। কাল তুই সকালে মাছের আড়তে আয়। দেখি কি করা যায় তার মধ্যে। ফুলিও খুশি হয়ে বলে—তাই যাবে। তাহলে চলি গো।

রহিমও ব্যস্ত। তা নাহলে ফুলির সঙ্গে একটু গল্প করত। তার সময় নেই তাই বলে, পরে একদিন আড়তে আয় ফুলি। ফুলি ঘাড় নেড়ে বের হয়ে যায় সুধীরকে নিয়ে। আজ ফুলির মনে খুশির সুর। ফুলি বলে—মন দিয়ে কাজ করবে। খাটতে হবে। এখন চলো যেতে হবে। হাটে এসেছে—বন কলোনী থেকে বিপাশা-শিবানী-কালীচরণ-ও বৌ লবঙ্গও। ওরা এসেছে একটা গাড়ী নিয়ে। ভেড়ীর উপর দিয়ে সামনে একটা পায়ে হাঁটা পথ। মাইল খানেক পথ হাঁটতে হবে। আর নদী পার হয়েছে নৌকা করে তারা। সঙ্গে গার্ড কালীও রয়েছে। বিপাশারও যেন নির্জনতা থেকে বেরিয়ে আসতে পারায় মনে খুশির বাতাস লাগে। এখানে প্রচুর লোকের ভিড়। দূর-দূরান্ত থেকে নৌকা করে লোক আসে—এই সপ্তাহের দুটো দিনে। এখান থেকে ক্যানিং যাওয়া যায়। বিপাশার মনে পড়ে ক্যানিং

থেকে শিয়ালদহগামী ট্রেনের কথা। ওটাই যেন মুক্তিপথ। সে এই দূর বনবাসে যেন বন্দী হয়ে আছে। ওরা হাটে ঘুরে দেখতে থাকে হরেক মালের হরেক দোকান। মানুষের কোলাহল। লবঙ্গ বলে—একটা গন্ধ তেল, সাবান, কয়েকটা জামা কিনতে হবে আমায়। ওদিকে ডাক্তারের চেম্বার। পাশেই নানা রং-এর চুড়ির দোকানে চুড়ি ঝুলছে। বিপাশা বলে,—সবাই আছে শুধু ফুলিটাই আসেনি আজ। কে জানে কি করছে সে। হঠাৎ লবঙ্গ বলে—ফুলির মনে রং লেগেছে গো দিদিমণি।

—মানে? বিপাশা কথার মানেটা ঠিক বুঝতে পারেনি। তাই বলে মানে? লবঙ্গ ওদেরকে আগেই দেখেছিল। এবার বলে—এই দ্যাখো, ওই যে শিরীষ গাছের নীচে রয়েছে তোমার ফুলি। সঙ্গে সেই ছোকরাটা। বিপাশা দেখে ফুলিকে। মাথায় লাগিয়েছে লাল কৃষ্ণচূড়ার একটা স্তবক। কালো চুলে যেন আগুনের আভা বাড়ছে, মুখে-চোখে খুশির আভাস। ওরা দুজনে সেই শিরীষ গাছের নীচে নেশায় আচ্ছন্ন। আর সুধীর তখন গান ধরেছে। বেশ দু-চারজন হাটে আসা লোক দাঁড়িয়ে পড়েছে ওদের গান শুনে, তারা ফুলিকে দেখে। শিবানী বলে—ছুঁড়ির লাজ শরমও নাই নাকিগো। বিপাশার মনে পড়ে সেদিন ওর গান শুনেই ফুলি দৌড়েছিল। ভাল গান গায়। ফুলির মুখেই শুনেছে সুধীরের কথা। তাই বিপাশা বলে—এই ছেলেটাই সুধীর না। লবঙ্গ বলে হ্যাঁ গো। বিপাশা দেখছে ওদেরকে। বিপাশারও মনে পড়ে অতীত জীবনের কথা। মনে পড়ে বিজনকে। তার সঙ্গে বিপাশাও এরকমভাবে গেয়ে উঠত-ভেসে যেত সুরের আঙিনায়। আজ তার সব হারিয়ে গেছে। তবু ফুলি হয়তো স্বপ্ন দেখে। শিবানী বলে—ডাকবো ছুঁড়িটাকে? বিপাশার মন চায়না ওদের ওই সময়ে বিরক্ত করতে। তাই বলে, —থাক। ওকে তোরা ডাকিস না। বিপাশা এদের সুখের এই মুহূর্তকে ভেঙে দিতে চায় না। বিপাশা বলে—ছেলেটা তো ভালোই। লবঙ্গ বলে—ছাই। অকর্মের ঢেঁকি। কাজ টাজ কিছুই করে না। ঘরে বসে খায় আর এখানে ওখানে পালায়। বিপাশা এসব প্রসঙ্গ এড়াবার জন্য বলে—চল ওদিকে। এখানে বড্ড ভীড়।

রহিম লস্করের আড়তে তখন মাছের নৌকার ভিড় শুরু হয়ে গিয়েছে। জেলেদের ভিড়। নোনা জলে পারসে-পমফ্রেট-গুরজালি-ভেটকি মাছ পাওয়া যায়। জেলেরা মাছ ধরতে বনের মধ্যেও যায়। আর কেউ যদি একটু বেখেয়ালী-বেহিসেবী হয় তাহলে মাঝে মাঝে তাদের দু-একজন বাঘের পেটেও যায়। তবুও তাদের মাছ ধরতে হয় জীবনের ঝুঁকি নিয়েই। সকাল হতেই মাছের নৌকাগুলো আড়তে আসতে থাকে। ঝুড়ি ঝুড়ি নানা সাইজের নানা জাতের রূপালী মাছ এনে জড়ো করতে থাকে। মাছের গাদা থেকে এক একটা জাতের মাছ সাইজ অনুযায়ী আলাদা করতে হয়।

রহিম লস্করের এই অঞ্চলে মোটামুটি একছত্র রাজ। জেলেদের ঠকাতে তিনি সিদ্ধহস্ত বটেই, মাছের ন্যায্য দাম রহিম মিঞা সহজে দেন না। জেলেরা অনেকেই সেকথা জানলেও প্রতিবাদ করে ওঠার সাহস পায় না। বাধ্য হয় তাদের ধরা মাছ এখানে জমা দিতে। রহিম লস্কর এই করে এখানকার মালিক হয়ে উঠেছে। এবার রহিম ওদিকে নদীর মধ্যেও আরো ভালো একটা চর আছে জেনেছে। ওখানে মাছ অনেক বেশী মেলে। রহিম স্বপ্ন দেখে সেখানে চাষাবাদ করে তার ওপর নিজের মালিকানা পত্তন করবে। ফুলি এসেছে সুধীরকে নিয়ে। রহিম লস্করও এর মধ্যে তার সেই নতুন আবাদি অঞ্চলে কিছু লোককে পাঠিয়েছে সেখানে। এর মধ্যে বাঁধ ঘেরার কাজও শেষ হয়েছে সেখানে। যারা সেখানে রয়েছে রহিম লস্কর তাদের নৌকা-জাল খরচাও দেয়। তারা মাছ ধরে আনে এখানে। কেউ কেউ এর মধ্যে সেখানে নোনাজলে চাষাবাদও শুরু করেছে। রহিম লস্কর মাঝে মাঝে লঞ্চ নিয়ে যায় সেখানে। এখন মাছ চালান দেবার জন্যে নিজেই একটা লঞ্চ কিনেছে। ফলে মাঝে মাঝে তার সেই চরের জমি জরিপেও যায় রহিম লস্কর। ওই জায়গা দেখভালের জন্য তাই এর মধ্যে এদিক থেকে বেশ কিছু অভাবী-দীন-দরিদ্র লোকেদের ওখানে চালান করেছে। আরও লোককে পাঠাতে চায়। আর সেখানে ফুলির মতো মেয়ে—সুধীরের মতো জোয়ানদের পাঠাতে পারলে আখেরে লাভ হবে রহিমের। ছেলেটা এমনিতেই তরতাজা তরুণ। আর ফুলির মতো মেয়েরা এলে তার সেবায় লাগতে পারবে।

অবশ্য রহিমের মনের কথা তারা কেউই ধরতে পারে না। রহিম লস্কর বেশ কিছুদিন থেকে একটা নতুন কারবার শুরু করেছে। এই অঞ্চলের অদূরেই বাংলাদেশ সীমান্ত বর্ডার। ওপারেই বাংলাদেশ। দুই দিকের সীমান্তরক্ষীরা এই বিরাট নদী আর বনাঞ্চলকে পাহারা দেয়। তবু তাদের পাহারা এড়িয়ে নানা ভাবেই এদেশে আসে লাখ লাখ টাকার বিদেশী মাল, চাল, গম, চিনি—ইলেকট্রনিক দ্রব্যাদি এমনকি বিদেশী অস্ত্র-শস্ত্রও। সব সময় কয়েকজন আছে—তাদের কাজ সে সব মাল নিরাপদে কলকাতায় তাদের ঠেকে পাঠিয়ে দেয়। ওদিক থেকে যেমন মাল আসে তেমনই এপার থেকেও যায় অনেক মাল। রহিম লস্করের কাছে কিছু লোক আসে কলকাতার—যারা এসব মাল কেনাবেচা করে। আবার মালের খবর নিতেও বেশ কিছু লোক কলকাতা থেকে এখানে আসে। প্রথম প্রথম সাহসে কুলোত না রহিমের মন। তারপর তার হাতে বেশ কিছু টাকা আসায় সাহসও বেড়ে যায়। সে এই চরের মধ্যেই গুদামও করেছে। মাল আসে এখানে। এখান থেকে মাল তার মাছের নৌকায় মাছের ঝুড়ির নীচে রেখে নানাভাবে চালান হয়ে আসে। আর এখান থেকে মাছের সঙ্গে চালান করে দেয় কলকাতায় সেসব মাল। এসব কাজের জন্য লোকজন মায় মেয়েদেরও দরকার। তাই তার নজর পড়েছে ফুলি আর সুধীরের দিকেও। ফুলি সুধীরকে নিয়ে আসতেই—রহিম লস্কর তার নিজের ঘরে এনে বসায়। দোকান থেকে চা-বিস্কুট চলে আসে এর মধ্যেই।

অসীমও জানে যে এই বনের মধ্যে—এই নদীর বুকে নৌকা করে এসে নানা দামী গাছ ওরা সাফাই করে রাতারাতি পাচার করে। এছাড়াও পাশেই বাংলাদেশ বর্ডার থেকে নানা বেআইনি জিনিসও এপার ওপার হয়। দু-একবার তাদের সঙ্গেই পাচারকারীদের লড়াইও হয়েছে। তাই বনবিভাগও কড়া নজর রাখে। ওরা ভুটভুটি নিয়ে পাহারা দেয় বনের মধ্যে। এটা ওদের রুটিন ডিউটি। তাছাড়া সুন্দরবনের ভিতরে আছে কিছু লোকেদের আড্ডা। এরা বনে লুটপাট, বন্যপশু মারার সঙ্গে সঙ্গে মাল পাচারকারীদের কাজও করে।

সেদিন অসীম পেটুলীর দিকে গেছে বনের গভীরে। হঠাৎ দেখে একটা বোটে কয়েকজন লোক একজন অসুস্থ লোককে নিয়ে বিপদে পড়েছে। এদিকে বোধহয় বেড়াতে এসেছিল। তারপরই অসুস্থ হয়ে পড়ে। বনের মধ্যে চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা নেই। আর নৌকায় এপারের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যেতেও অনেক সময় লাগবে। অসীম দেখে ভদ্রলোক বেশ জোরেই চেঁচাচ্ছে। অসীম তাদের কাছে যায়। সহকারীকে বলে,—আমার ফরেস্ট অফিসে নিয়ে চলো। তারপর চিকিৎসার ব্যবস্থা করা যাবে।

রহিম লস্কর মাঝে মধ্যে সেজেগুজে আড়তের কাজ সেরে বিকেলের দিকে বন অফিসে বেড়াতে আসে। অফিসে বসে গল্প-গুজব করে। রেঞ্জার সাহেবের বাড়িতে তাজা ইলিশ ভেটকিও পেশ করে। বনবিভাগকেও সে হাতে রাখে। বনাঞ্চলের লোকেরা ও বনকর্মীরাও এই প্রভাবশালী রহিম লস্করকে একটু সমীহ করে।

রহিম বলে—এখানে এই বনবাদারে কথা বলার লোক নেই। তাই তোমাদের এখানে এলে তবু দিল খুশ হয়।

সেদিন রহিম লস্কর এসেছে বন অফিসে, বনের দিক থেকে একটা ছোট বোট আসে। আর বোট থেকে অসীম গার্ডদের বলে—অফিসে আমাদের গেস্টরুমটা খুলে বিছানাপত্র ঠিকঠাক করে দাও। রহিম লস্করকে দেখে অসীম বলে—বনের মধ্যে একদল এসে বাঘের কবলে পড়েছিল। কাঁধে চোটও রয়েছে। তুলে এনেছি। ওকে এরা নিয়ে আসছে। দেখা যায় একজন তরুণকে গার্ডরা ধরাধরি করে বোট থেকে নামিয়ে নিয়ে আসছে। রহিম লস্করও দেখছে সেই আহত তরুণকে। তরুণটি চোখ বুজে পড়ে আছে—খুবই অসুস্থ। ওকে দেখে রহিম লস্কর ক্ষণিকের জন্য অবাক হয়। তবে সেই বিস্ময়কে প্রকাশ করে না। অসীম বলে,—কালীচরণ, তুমি ডাক্তারবাবুকে এখানে ডেকে আনো। ওর সেলাই হবে। আর খবর নাও ক্যানিং যাবার লঞ্চ কাল সকালে কখন ছাড়বে। ওকে ওখানেই পাঠিয়ে দেবে। এর মধ্যে কলোনিতেও খবরটা ছড়িয়ে পড়েছে। ওরা আহত তরুণকে তখন নিয়ে গিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিয়েছে।

ওদের নিস্তব্ধ জীবনে যেন একটা চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটেছে। বন কলোনিতে তখন বাঘের হিংস্রতা নিয়ে মেয়ে মহলে অনেক গল্পই শুরু হয়েছে। বিপাশাও রয়েছে সেখানে। সে এখানে এসে বেশ কয়েকবার খুব কাছ থেকেই বাঘের গর্জন শুনেছে। একদিনতো বাঘকে দেখেছিল ঘরের বাইরেই। আজ তার হিংস্রতার পরিচয় পেয়ে বিপাশা যেন আরও ভয়ার্ত হয়ে পড়ে। রহিম লস্কর কি ভেবে বলে—আজ চলি রেঞ্জার সাহেব। অসীম তো নতুন মেহমানকে নিয়েই ব্যস্ত। পরে এসে খবর নেব। অসুস্থ মেহমানের জন্য অসীমের এই দরদ দেখে খুশী হয়েছি। যদি কোন জরুরৎ পড়ে বান্দাকে তলব করবেন, এসে হাজির হবো। বনাঞ্চলে একজন মানুষ বিপদে পড়েছে—তার জন্য আমাদেরও কিছু করা দরকার। এর মধ্যে ডাক্তারও এসে পড়ে। ডাক্তার রহিম লস্করের মুখোমুখি হয়। রহিম লস্কর বলে—ডাক্তার, ছেলেটাকে সারিয়ে তোলেন। বেচারারা এই বনবাদারে বিপদে পড়েছে। ওর চিকিৎসার যেন কোন খামতি না হয়। জরুরৎ পড়লে আমার কাছে যাবে। ডাক্তার দেখছে আহত তরুণকে। তার জ্ঞান আছে তবে খুবই দুর্বল। তার কাঁধে ঘা-টা দেখে ডাক্তারের কেমন সন্দেহ হয়। ওরা বলছে বাঘের থাবার চোট কিন্তু তার মনে হয় এটা কোন ধরনের খোঁচা বা চাকুর চেরাই। এখন ঘা-টা বেড়ে গেছে। ডাক্তারবাবু ওকে ইঞ্জেকশন—ঔষধ পত্র দিয়ে বলে—খুবই দুর্বল। একটু সুস্থ না হলে ওকে অতটা পথ পেরিয়ে কোন হাসপাতালে পাঠানো যাবে না। এইখানে থেকেই চিকিৎসা করতে হবে। রহিম লস্কর বলে—তাই করো ডাক্তার। তুমি দুবেলা এসো। আর সেবা-যত্ন তার জন্য দেখি যদি কাউকে পাওয়া যায়। এর মধ্যে বনাঞ্চল থেকে অনেকেই এসে ভিড় জমিয়েছে। রয়েছে ফুলি। খবর সংগ্রহের জন্যে এখানে এসেছে ফুলি। ওদিকে সুধীরও রয়েছে। রহিম বলে,—এই সুধীর শোন। সুধীর ফুলির দিকে চাইল। ফুলি সাহস দেয়। বলে—যা, লস্করমশাই ডাকছেন যা। সুধীর এগিয়ে আসে। রহিম জানে কান টানলেই মাথা আসে। সুধীর থাকলে ফুলি থাকবেই। তাই বলে—সুধীর তুই কাল কাজ খুঁজছিলি, তোর কাজকর্ম জুটে গেছে। ক'দিন এই বাবুর দেখভাল করিস। বেশ শক্ত কাজ। আমি চল্লিশ টাকার বেশী কিন্তু দিতে পারব না। তাছাড়া ছেলেটাকে আমি রাখতে পারি যদি তুই বলিস।

ফুলি বলে—হ্যাঁ, হ্যাঁ, ও কাজ করবে। কি কাজ করতে হবে তা তো জানি না। আমি ডাক্তারবাবুর কাছ থেকে জেনে নিয়ে তোকে বলব। লস্করমশাই সুধীর কাজ করবে। তুমি ভেবোনা।

রহিম বলে, তাই কর। তারপর তোর ভালো কাজের ব্যবস্থা করবো। অসীম, রহিম লস্করকে এগিয়ে এসে দায়িত্ব তুলে নিতে দেখে খুশী হয়। বনকলোনির লোকেদের আর একটা কাজ বাড়লো।

ওদিকের সব ব্যবস্থা করে অসীম যখন বাইরে এলো তখন আকাশে বেগুনী রং ধরেছে। নদী বয়ে চলেছে শেষ সূর্য অস্তের দিকে। পাখির কলরব কমে এসেছে। বনে তখন অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। বিপাশা বলে,—লোকটা কে? কিভাবে গেল বনের মধ্যে। অসীম দিনভোর একটা ক্লান্তির মধ্যে কাটিয়ে এবার বাসায় ফিরে হাতমুখ ধুয়ে গাউন পরে চায়ের কাপ নিয়ে বসেছে। বিপাশার কথায় বলে—এখনও জানতে পারিনি। ভদ্রলোক বেশ অসুস্থ। একটা দল বেড়াতে এসে ওকে দেখতে পেয়ে ওদের বোটে তুলে এনেছিল। ব্যাগপত্রও সঙ্গে এনেছে। সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত ক'দিন এখানেই কাটাতে হবে ডাক্তারবাবুর নির্দেশমতো। ফুলি এখন কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়েছে সুধীরকে নিয়ে। ছেলেটা একটা কাজে অন্তত লেগে পড়েছে। রহিম লস্করের প্রতি তাই কৃতজ্ঞ ফুলি। সুধীরও বেশ দায়িত্ব নিয়ে কাজ করছে। আর হাত লাগিয়েছে ফুলিও। সে অসীমের বাংলো থেকে গরম জল, চা-জলখাবার আনে এই গেস্টরুমে। নিজের হাতে রোগীর গা ধুয়ে দেয়, মলম লাগায় আর ঔষধপত্রও খাওয়ায়। ফলে ক'দিন বিশ্রামের পরেই একটু সুস্থ বোধ করে রুগী। বিছানায় তখন উঠে বসেছে। অসীমও নিয়ম করেই আসে। আসে ডাক্তারবাবু। রহিম লস্কর এখানে এসে আড্ডা দেয়। রোগীর খবর নেয়। অসীম বলে—সুস্থ হয়ে উঠেছে আপনার রোগী। রহিম বলে—আল্লার মেহেরবানি। তাহলে ওকে আর হাসপাতালে পাঠিয়ে কাজ নেই। অসীমও তাই ভাবছে। হাসপাতাল এখান থেকে অনেক দূরে। রহিম বলে—একটু সুস্থ হলে আমার মাছ ধরার নৌকায় কাউকে সঙ্গে করে স্টেশনে পাঠিয়ে দেব। এখন ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাবে। অসীম বলে—তাই ভালো। আর বিজনও তাই ভাবছিল। বলছিল আর

ক'দিন পরেই সুস্থ হয়ে কলকাতায় ফিরে যাবে। রহিম লস্কর কথা বাড়ায় না। তবে বুঝেছে যে, অসীমবাবু ছেলেটার নাম জেনেছে। তার আর অন্য কিছু খবর সে জানতে পারেনি—সেটা বুঝে সে কিছুটা নিশ্চিন্ত হয় রহিম লস্কর।

শীতের প্রথম দিক। এখন আবাদী অঞ্চলের মাঠে মাঠে সোনালী রং-এর ধান। বছরে মাত্র একটা ফসল। তাই ঘরে তুলতে এখন ব্যস্ত সবাই। এবারে ভালো বর্ষা হয়েছে। রহিম লস্করের চরের বিস্তীর্ণ জায়গা জুড়ে ভালো ফলন হয়েছে। ধানকলের মতো প্রচুর লোক তার নেই। সময়মতো ধান না কাটলে গাং পার হয়ে আদিম অরণ্য থেকে আসা বুনো শুয়োর এসে সব ফসল আর মাঠ শেষ করে দেবে। তাই লস্কর মিঞার মনে এখন থেকেই ভয় রয়েছে। তাই চরে বেশ কিছু লোক পাঠিয়ে কাজ সারতে চায়। তার মধ্যে একটা বিপদও ঘটে গেছে। কয়েকদিন আগে বি-এস-এফ-এর নজর এড়িয়ে ওপার থেকে লাখ লাখ টাকার মাল আসার সময় পুলিশের সঙ্গে ওদের দলের সংঘর্ষ বেঁধে যায়। দু-তিনজন মারা গেছে। আর সেই দলে নাকি ছিল রহিমের কলকাতার এক মহাজন। সেও পুলিশের হাতে, রহিম লস্কর আহত হয়েছিল। মরা লাশগুলো চরেই পুঁতে দিয়েছে। আর আহত কয়েকজনকে সেই মহাজন নৌকায় করে ক্যানিং নিয়ে যায়। পথে নাকি এখানকার রেঞ্জ অফিসারের নজরে পড়ে। তিনিই তাকে এখানে তুলে আনেন। আর রহিম লস্করের নজরে পড়তেই রহিম চিনতে পারে তার কলকাতার আহত মহাজনকে। কিন্তু সে পরিচয় না দিয়ে নেহাতই মানবিকতার দোহাই দিয়ে তার সেবার ব্যবস্থা করে। তাই অসীমের উপর খুশীই হয়েছে।

বিজন ক'দিন যেন একটা ঘোরের মধ্যে ছিল। ক্রমশ জ্ঞান ফেরে তার, চোখ মেলে দেখে সে বনের মধ্যে একটা ভালো কাঠের ঘরে বিছানার ওপর শুয়ে। সামনে রয়েছে একটা মেয়ে আর একজন তরুণ। মেয়েটা বলে—উঠবেন না। ডাক্তার আরাম করতে বলেছে। বিজন বলে—আমি কোথায়? ফুলি এসেছিল তখন ঘর পরিষ্কার করতে। বিজনকে ফুলি বলে—তোমাকে বন থেকে রেঞ্জার সাহেব নিয়ে এসেছে। বিজন যেন স্বপ্ন দেখছে। ফুলি বলে—ডাক্তার ওষুধ দিয়েছে। সেরে উঠবে। বিজন ভেবে পায় না ঠিক কিভাবে সে এখানে এসেছে। ক্রমশঃ মনে পড়ে কলকাতার কথা। তার ব্যবসার ব্যাপারেই সে এসেছিল এদিকের চরখানিতে। ওর লোকজন বলে, অন্ধকারে পুলিশ বি-এস-এফ আর বি-ডি. আরদের পাহারা এড়িয়ে লাখ লাখ টাকার মাল এপারে আসে। সেদিন ওপারের মহাজনের সঙ্গে লেনদেন সেরে মাল নিয়ে ফিরে আসতেই জল পুলিশ তাদের তাড়া করে। ওরা লঞ্চের গতিবেগ বাড়িয়ে বনের মধ্যে ঢুকে পড়ে। পুলিশ তার লোকজনও গুলি চালায়। চোখের সামনে দু-দুটো লোক পুলিশের গুলি খেয়েছে। একজন গাং-এ ছিটকে পড়ে। ওরা লঞ্চটাকে ঘন জঙ্গলের মধ্যে নিয়ে চলে যায়। এর মধ্যেই একজনের পুলিশের বেয়নেটের খোঁচা লাগে। তবু কোনমতে পালিয়ে বনের মধ্যে ঢুকে পড়ে। পুলিশ আর ওদের পাত্তা পায়নি। তারপর কাকভোরে সেই চরের ওপর মৃতদেহগুলো পুঁতে দিয়েছিল। বিজনের তারপর আর কিছু মনে নেই।

বিজন এখন অনেকটা সুস্থ বোধ করছে, তবে খুব দুর্বল। আজ সে বের হয়েছে বেশ ক'দিন পরে। সুধীরও ক'দিন ধরে এই আহত ছেলেটাকে সেবা করেছিল মন দিয়ে। তাকে সুস্থ হতে দেখে খুশী হয় সুধীর। সেদিন বিজন বলে—বাইরে ওই গাছের তলায় একটু নিয়ে যাবে সুধীর। ঘরের চার দেওয়ালে আটকে পড়ে আছি। গাছের তলায় রেঞ্জ অফিস থেকে লোকজন বসার জন্য কয়েকটা কাঠের বেঞ্চ, মাথার ওপরে চালার মতো করে রেখেছে। পাশেই পুকুরের জলে শালুক ফুটে আছে। কয়েকটা বড় বড় কৃষ্ণচূড়ার গাছ জায়গাটাকে সুন্দর করে রেখেছে। সুধীর বিজনকে এনে সেখানেই বসিয়েছে। বিজন আজ বেশ কিছুদিন পরে যেন প্রকৃতিকে দেখছে। জায়গাটা বেশ মনোরম। পুকুরের এদিকে ওদের রেঞ্জ অফিস। পাশ দিয়ে নদী বয়ে গেছে। পাশেই গার্ডদের কোয়ার্টার। কোয়ার্টারের সামনে দিকটায় নানা ফুলগাছে ভরা। বাঁশ কেটে কঞ্চি দিয়ে ঘেরা জায়গাটা। বিপাশা সেদিন শিবানীদের কোয়ার্টার গিয়েছিল। বেলা হয়েছে। গাং-এ তখন জোয়ার এসেছে। দূর থেকেও জোয়ারের শব্দ শোনা যাচ্ছে। গেস্টরুমে যে একজন আহত লোক আছে সেটা শুনেছিল বিপাশা। অসীম তার

খোঁজখবর নিয়েছে। ডাক্তার আসছে। ফুলিও বলছিল গেস্টরুমের অসুস্থবাবুর কথা। বিপাশা শুনেছিল মাত্র। তার এখানে মন বসেনা। তাই এখানকার কোন খবরকেই সে এতটুকু গুরুত্ব দেয়না।

বিপাশা ফিরছে পুকুরের পাশ দিয়ে। হঠাৎই কথাটা কানে শুনে চমকে ওঠে। তাকে এখানে নাম ধরে কে ডাকবে? অবাক হয়ে চাইল সে। ওদিকে বেঞ্চে বসে তাদের গেস্টরুমের সেই তরুণ। ডাক শুনে তাকাতেই এক অদ্ভুত শিহরণ খেলে যায়। নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে বিপাশা, ওদিক থেকে ডাকছে তার বিজন। তবে সেই সুন্দর স্বাস্থ্য আর নেই। মুখ চোখ কেমন ম্লান। তবে চোখের চাহনি একই রকম রয়েছে। বিপাশা এই বনবাসে বিজনকে এইভাবে দেখবে তা কল্পনাও করেনি। ওর পা দুটো যেন মাটির সঙ্গে আটকে রয়েছে। শরীর মনে উঠছে এক বিচিত্র ঝড়। যে বিজন তার জীবন থেকে হারিয়ে গিয়েছিল, সেই বিজন যে এইভাবে আবার ফিরে আসবে সেটা বিজনকে চোখের সামনে দেখেও যেন কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছে না। বিপাশা এগিয়ে আসে। বিজনের মুখে পড়েছে গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে অস্তরাগের আলো। ওর চোখে মুখে কি একটা ব্যাকুলতা। বিপাশা এবার স্মিতহাস্যে বলে—তুমিই তাহলে গেস্টরুমে রয়েছে? তা এই বনে এলে কি করে?

বিজন তার এখানে আসার আসল কথাটা জানাতে চায়না। ওসব কথা ভাবলে এখন তার লজ্জা করে, ভয়ও হয়। বিজন ব্যবসায় নেমেছিল, ক্রমশঃ সে হয়ে উঠেছিল লোভী একটা মানুষ। তার চাই শুধু টাকা, টাকা আর প্রতিষ্ঠা। তাই টাকার পিছনে ছুটতে গিয়ে পথ হারিয়ে সে একটা অন্ধকার, আদিম-হিংস্র জগতে ঢুকে পড়েছিল। দিনের আলোতে নয়, রাতের অন্ধকারে সে লাখ লাখ টাকার মাল কেনা-বেচার মধ্যে দিয়ে নিজেকে এইভাবে বিপদের মধ্যে ঠেলে দিয়েছিল। বিপাশাকে এখানে আসার কথা বানিয়ে বলে—সুন্দরবনে বেড়াতে এসেছিলাম বন্ধুদের সঙ্গে, বাঘের মুখ থেকে জানে বেঁচে ফিরছি। অসুস্থ অবস্থায় অসীমবাবু আমাকে এখানে এনে তুলেছিল। বিপাশা দেখছে বিজনকে। তার মনেও যেন অতীতের সেই ভালো লাগার সুবাস আবার ফিরে আসে। বিপাশা বলে—তুমি এখানে এইভাবে রয়েছ, আর আমি জানতেও পারিনি। এসে পড়ে ফুলি, সুধীরও রয়েছে। বিজন বলে, এরা দুজনেই সেবাযত্ন করে আমাকে বাঁচিয়ে তুলেছে। ফুলি শুনছে বিজন-বিপাশার কথা। ফুলি জিজ্ঞাসা করে—বাবুতো কলকাতার লোক, তা দিদিমণি ওকে চেনো না কি গো?

বিজন বলে—আমরা এক পাড়াতেই থাকতাম। ফুলি অবাক হয়। বলে—আমাকে তো বলোনি। হাসে বিজন— কি করে জানবো যে উনি এখানেই থাকেন। আজ তো বের হয়েছি বলে দেখা হলো।

অসীম বনের রাউন্ড সেরে ফিরছে, বোট থেকে নেমে সে ওদিকের বাগানে বিজনদের দেখে এগিয়ে আসে। বিপাশাও রয়েছে সেখানে। অসীম সামনে এসে বলে—কেমন আছেন বিজনবাবু? বিজন বলে—ভালোই। অনেকদিন পরে বিপাশাকে এখানে দেখলাম—অসুখও এবার সেরে যাবে।

অসীম অবাক হয়—মানে?

হাসে বিজন—বিপাশা তো আমার পাড়ারই মেয়ে। ওর দাদা আমার ক্লাসমেট। শুনেছিলাম বিয়ের পর বিপাশা তার স্বামীর বাড়ী চলে গেছে। আজ এতদিন পরে এখানে আবিষ্কার করেছি ওকে। অসীম সহজভাবেই কথাটা নেয়। বিপাশা বলে—ও এখানে রয়েছে জানতাম না। আজ দেখা হলো। অসীম জানে বিপাশার নিঃসঙ্গতার কথা। সে নিজের কাজ নিয়েই ব্যস্ত। যখন তখন বের হয়ে যেতে হয় বনে বনে। অসীম বলে—ভালোই হলো। ক'দিন গল্প করার মতো একজন লোক তো পাওয়া গেল।

ঠাণ্ডা পড়েছে। বিপাশা যেন এসবকে আড়াল করতে চায়। সে বলে—ফুলি, সুধীর ওকে নিয়ে যাও। ওর ঘরে যাবার সময় হয়ে গেছে। অসীমকে বলে বিপাশা—চলো, ঠাণ্ডা শুরু হয়েছে। অসীমকে নিয়ে বিপাশা পুকুরের পাশ দিয়ে রাস্তা ধরে চলে যায়। বিজন দেখছে ওদেরকে। আজ বিজন যেন অসীমকে হিংসা করে। অসীমই যেন তার জীবন থেকে বিপাশাকে কেড়ে নিয়েছে। তার সেই লোভী-স্বার্থপর মনটা তাকে অস্থির করে তোলে। বিজন উঠে পড়ে। গেস্টরুমের বাইরের দিকে এগিয়ে যায়। সুধীরের সঙ্গে ফুলি এতক্ষণ ধরে সব ব্যাপারটাই মন দিয়ে দেখছিলো। সে যেন এই দিদিমনির বিষণ্ণ চোখে মুখের যন্ত্রণাটাকে দেখেছে। ফুলি এমনিতেই বুদ্ধিমতি। সে বুঝেছে যে তার

দিদিমণি সেই যন্ত্রণাটাকে প্রকাশ করতে চায়না। ফুলিও নিজের মনে যাচাই করে দেখেছে, যে সে সুধীরকে নিয়ে স্বপ্ন দেখে এটা যেমন তার কাছে একটা খুব নিজের ব্যাপার, গোপন ব্যাপার। প্রেমের জগতে গোপনীয়তার নানা প্রয়োজনীয়তা আছে। আর এই গোপনীয়তার চোখের ভাষা তাই প্রেমিক-প্রেমিকারাও সহজেই পড়তে পারে। ফুলির চোখকে ফাঁকি দিতে পারেনি বিপাশা।

বিপাশা বিকেলে আজ এসেছে সেই গাছের নীচে। বিজনও রয়েছে। এতদিন পরে দেখা হয়েছে দুজনের। অবশ্য অনেকগুলো দিন পার হয়ে গেছে। আজ বিপাশাও বদলে গেছে। প্রসঙ্গটা বিপাশা আজ বাংলোয় ফিরে ভেবেছে। সব কথাই হয়েছে অসীমের সঙ্গে যেন সহজভাবেই। অফিস চলে গেছে অসীম। বিপাশা দুপুরের খাওয়ার পর শরীরটাকে বিছানায় গড়িয়ে দেয়। চোখের সামনে ভেসে ওঠে অতীত দিনের রঙীন ছবি। আজ বিপাশার মনে পড়ে বিজনের সঙ্গে তাদের অন্তরঙ্গ কথা। বিজনের ওপর বিশ্বাস করেছিল বিপাশা। বিজন সেই বিশ্বাসের মর্যাদা রাখেনি। আজ নিজেও তার জন্য ঠকেছে আর বিপাশাকেও ঠকিয়েছে। তাই বিপাশা ভাবে ওর সঙ্গে মেলামেশার দরকার নেই। তবু অশান্ত মন চায় একজন সঙ্গী। তাই যেন বিপাশা এসেছে এই বাগানের ধারে, বিজনও বের হয়ে এসেছে। দুজনে আজ যেন কাছাকাছি আসতে চায়। তাদের স্মৃতিকে রোমন্থন করে অতৃপ্তিকে তৃপ্ত করতে চায়। ফুলিও ঠিক এতটাই ভেবেছিল। সে দেখেছে আজ দিদিমণিকে হাসতে। ওরা কথা বলছে, হাসছে দুজনে। বিজনও আজ যেন হালকা হতে চায়।

বিপাশা বলে—নিজেকে এইভাবে সরিয়ে নিয়ে গেলে কেন? বিজন বলে—তখন ব্যবসা নিয়ে রাজ্য জয়ের স্বপ্ন দেখেছিলাম বিপাশা। তবে সেই রাজ্য জয় তো আজও হয়নি। মনে হয় হেরে গেছি। তুমি জয়ী হয়েছে। বিপাশা আজ তার জীবনের শূণ্যতাকে আর ধরে রাখতে পারে না। বলে—আমিও হেরে গেছি। আমারও সব স্বপ্ন হারিয়ে গেছে। এখানকার এই বনবাসের জীবনে আমি হাঁফিয়ে উঠেছি। বড়নিঃসঙ্গ-একা। কানে আসে জোয়ারের মত্ত গর্জন। এখানকার জীবনে যেন শুধু নিঃসঙ্গতার হাতছানি। সবকিছু হারিয়ে মানুষ নিঃসঙ্গ হয়ে বাঁচতে পারেনা। সেই নিঃসঙ্গতার বেদনা ফুটে ওঠে বিপাশার চোখে মুখে। বিজনের তা চোখ এড়ায় না। শেষ পর্বে বিজন যেন আবার কিছু পাবার স্বপ্ন দেখে। বিজন বিপাশার হাতটা আগের মতোই নিবিড়ভাবে ধরে বলে—এখনও নতুন করে শুরু করা যায় বিপাশা। বিপাশার কাছে কথাটা যেন বিচিত্রভাবে বেজে ওঠে। ফুলি ওদিকে বাগানে কি করছিল। সে দেখছে এই ঘনিষ্ঠতা। তার মনেও যেন বিচিত্র কি সুর বাজে। সুধীর বাগানে জল নিয়ে যাচ্ছে। ফুলির ডাকে চাইল সুধীর। ফুলি এগিয়ে আসে। ওর চোখে ওর চোখে কি ধরনের বিচিত্র চাহনি। ফুল বলে—সবাইকে নতুন করে বাঁচতে হয় রে।

সুধীর অবাক হয়ে চেয়ে থাকে। ফুলির চোখের ভাষা পড়ার চেষ্টা করে সুধীর। তাকে কাছে টেনে ফুলি বলে—তুই মানুষ না গাধা রে। সুধীরের মনেও যেন জোয়ার ভরা নদীর মত্ততা জাগে। সে আবছা আলোয় গাছের আড়ালে আজ ফুলিকে কাছে টেনে নেয়। ফুলি খুশী।

রহিম লস্করের কাছে নানা খবরই আসে। পুলিশ সেদিনকার এনকাউন্টারের পর যে আসামীদের সন্ধান করছে তা জেনেছে। দু-একজনের সন্ধানও পেয়েছে। তবে তারা বিজন মহাজনের পরিচয় জানে না। তাই পুলিশ কিছু টের পায়নি। আর সন্দেহের বাইরে বলে ওরা বন দপ্তরের অফিসে নজর দেয়নি। বিজনকে এবার রহিম তার মাছের লঞ্চে করে এখান থেকে বের করে কলকাতায় পাঠিয়ে দিতে পারলে চিন্তার কিছু থাকে না। বিজনের খোঁজ পেলে পুলিশের হাত থেকে রহিম লস্করও রেহাই পাবে না। সেও বিপদে পড়বে আর এমন একটা কাঁচা টাকার ব্যবসা বন্ধ হয়ে যাবে। নিজের স্বার্থেই রহিম লস্কর দায়-দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিল মানবিকতার দোহাই দিয়ে। এদিকে তার চরে লোকজন পাঠাবার কাজও শুরু হয়েছে। রহিমের নজর রয়েছে ফুলির দিকে। সুধীরের কাজ পাওয়ার জন্য ফুলি আসে রহিমের কাছে। রহিম বলে—সেই বাবু কেমন আছে রে? ফুলি বলে—বাবু তো প্রায় সেরে উটেছে গো। আর ভালোই আছে। এই যে রেঞ্জার সাহেবের বৌ-এর সঙ্গে খুব চেনা জানা। দুজনের মধ্যে বেশ পুরনো পীরিত জমে উঠেছে গো।

কথা শুনে চমকে ওঠে রহিম লস্কর। খুব বিপদের কথাই। যদি বিজন কথার ছলে তাদের ব্যবসার কথা ফাঁস করে দেয়, তাহলে বিপদে পড়ে যাবে রহিম লস্কর। তাই যা করার তাকে আজকেই করতে হবে। রহিম লস্কর তার মনের চাঞ্চল্য গোপন করে বলে— যে যা করছে করুক। তুই তোর কাজ কর। সুধীরকে তোর হাতে তুলে দিচ্ছি। এবার ওকে নিয়ে চলে যা চরে। দুজনে ঘর বাঁধ, সুখে থাক। ফুলিও তাই ভাবছে, সে বলে—সুধীরকে বলবো, কথাটা আমিও ভেবেছি গো, তবে ওখানে বিপদে পড়বো না তো?

রহিমও খুশি হয়। মেয়েটা তাহলে রাজী হয়েছে। রহিম বলে—না না, বিপদ হবে কেন? ওখানে থাকা খাওয়ার টাকা আমি দেব, ওখানে কাজ পাবি দুজনে। ফুলিও তাদের নতুন ঘরের স্বপ্ন দেখছে সুধীরকে ঘিরে। সে বলে—যাবো গো। রহিমও বলে—তাই যা, নতুন জায়গায় ঘর বেঁধে দুজনে মিলে মন দিয়ে আমার কাজ করে যা।

বিজনও এবার নতুন করে ভাবনা-চিন্তা শুরু করেছে। এখন সে এই অন্ধকারের ব্যবসাপত্র করে বেশ দু-চার পয়সা কামিয়েছে। তার জীবন থেকে বিপাশা হারিয়ে গিয়েছিল হঠাৎ এখানে এক বিকালে আবার বিপাশাকে ফিরে পাবে ভাবতেও পারেনি বিজন। এবার নতুন করে ভাবনা-চিন্তা শুরু করেছে। সে চায় বিপাশাকে কোনমতে এখান থেকে বার করে, ওকে নিয়ে দূরে কোথাও চলে যাবে। আর অসীমের ঘরে ফেরা হবে না বিপাশার। তখন সেই অবস্থায় বিজনের কাছেই আসতে হবে বাধ্য হয়ে বিপাশাকে। বিজন এর মধ্যে পরিকল্পনা করে রেখেছে। এসব বদবুদ্ধিগুলো বিজনের মনে সহজেই আসে। সন্ধ্যার পর চাঁদনী রাতে জঙ্গলের রূপ বদলে যায়। নেমে আসে যেন আদিম অরণ্যের স্তব্ধতা। পাখিদের ডাক থেমে যায়। আজ বোধহয় পূর্ণিমা। নদীতে এসেছে জোয়ার। দু-একটা নৌকা পাড় বেয়ে চলছে। জঙ্গলে ছড়িয়ে পড়েছে পূর্ণিমা রাতের রূপালী আভা। বাতাসে জোয়ারের শব্দ। দমকা হাওয়ায় কাঁপন ধরে। তখন বিজনও এসে হাজির হয় অসীমের বাংলোয়। বিপাশাও রয়েছে। বিজন বলে—অসীমবাবু, ভাবছি এবার কলকাতায় ফিরবো। পাশেই বসে বিপাশা। তুমি তো অনেকদিন কলকাতায় যাওনি, বাপের বাড়ি যেতে ইচ্ছে করে না?

বিপাশার বন্দী মনও যেন খুশীর স্বপ্ন দেখে। তার মন চায় কলকাতায় তার ফেলে আসা জীবনে ফিরে যেতে। বিপাশা বলে—যেতে তো মন খুবই চায়। এই বনবাসে হাঁফিয়ে উঠছি। তবে যাওয়া আসা এখন আর নিজের উপর নির্ভর করে না।

অসীম শুনছে বিপাশার কথা। বিয়ের পর এখানে এসেছে বিপাশা। তাও বছর দুয়েক হয়ে গেল বিপাশা একটানা এখানেই রয়েছে। অসীমও বোঝে ওর মনের অবস্থা। একদিন দেখেছে আড়ালে চোখের জল ফেলতে। তার বন্দী জীবনের যন্ত্রণাটাকে দেখেছে অসীম। নিজে ছুটী পায়নি তাই কলকাতায় যাওয়া হয়নি আর। অসীমের মনে হয়, সে যেন বিপাশাকে তার নিজের স্বার্থেই এখানে বন্দী করে রেখেছে। অসীম কি ভেবে বলে—বিপাশা তুমি না হয় কিছুদিনের জন্য তোমার বাবার ওখানেও যাও বিজনবাবুর সঙ্গে। আমি গিয়ে নিয়ে আসবো।

কথাটা শুনে যেন বিপাশা বিশ্বাসই করতে পারেনি। সে বলে—সত্যি বলছো তুমি? অসীম বলে—হ্যাঁ, বিপাশা। তবু ক'দিন ঘুরে এলে মনটা ভালো হবে। তার মধ্যে হয়তো ক'দিনের ছুটি নিয়ে আমিও যাবো এখান থেকে।

বিজন এত সহজে কাজ হাসিল হবে ভাবতে পারেনি। বিজন বলে—বেশ তো, ছুটি যখন মঞ্জুর হয়েছে তাহলে কাল না হয় সকালেই যাওয়া যাক। প্রথমে এখান থেকে লঞ্চে তারপর কোন কলকাতাগামী ট্রেনে ঘণ্টা দুয়েক জার্নি। সন্ধ্যের আগেই বাগবাজারে পৌঁছে যাব! নো প্রবলেম। অসীম বলে—তাই যাও। ভোরের লঞ্চটাই ধরবে। বিপাশা তবু বলে তোমার অসুবিধা হবে। অসীম বলে—না না, আমার অসুবিধা হবে না। না হয় সুধীরই বাংলোর দেখ ভাল করবে। এখন তো কাজকর্ম শিখে গেছে ওরা। বিপাশা এবার যেন মুক্তির স্বপ্ন দেখছে। সে কলকাতায় ফিরছে সেই চেনা পরিবেশে, কিন্তু

সেটা কার জন্য, তাই ধন্যবাদ জানায় বিজনকে। ভাগ্যিস তুমি এসেছিলে বিজন। তাই আমারও ছুটি মিললো।

বিজন নিজের ঘরে ফেরে। কালই ভোরের লঞ্চে বের হয়ে সে আর কলকাতায় ফিরবে না। সোজা চলে যাবে বোম্বাই। সেখানে তার চেনা জানা আছে। বোম্বাই-এর গাঁয়ে তার এক ব্যবসায়ী বন্ধুর কাছে, সেখানে মাল আনা নেওয়ার জন্য হামেশাই যাতায়াত আছে বিজনের। বিজন আজ বেশ খুশি ভরা মন নিয়েই ফিরছে তার গেস্টরুমে। বিপাশাকে আজ আর ছাড়বে না। অসীমও খুশী হয় বিজনকে সাথী করে তার নিজের জায়গায় ফেরৎ পাঠাবে বলে। তখন রাত হয়ে গেছে। বন কলোনি নিঃস্তব্ধ। গেস্ট হাউসে বিজন ফিরেছে বেশ খুশী মনে। আর ঘরে ঢুকেই দেখে চেয়ারে লণ্ঠন রাখা রয়েছে আর ওদিকে চুপ করে বসে আছে রহিম লস্কর।

রহিম এর আগেই ফুলির মুখে শুনেছে বিজনের কেচ্ছা। রেঞ্জার সাহেবের স্ত্রীর সঙ্গে মেলামেশার কথা। আজ রহিম সাহেবও নিজে এসে দেখেছে দূর থেকে বিজনকে রেঞ্জার সাহেবের বাংলোয় বসে বেশ হাসি- ভরা মুখে কথা বলতে। রহিম লস্কর এটাকে মোটেই ভালো চোখে দেখেনি। আর তার কাছে খবর আছে যে পুলিশ বোধহয় এখানেও আসতে পারে আহত আসামী বিজনের সন্ধানে। তাই নিজেকে বাঁচাবার জন্য আজ তৈরী হয়ে এসেছে রহিম লস্কর। বিজন বলে—এতদিন এখানে আছে, প্রকাশ্যে রহিম লস্কর বিজনের সঙ্গে কথা বলেনি। এখানকার কেউ জানে না যে বিজনের সঙ্গে রহিম লস্করের কোন সম্পর্ক আছে। রহিম যে আজ এখানে এসেছে সেটা দেখে বিজনও বুঝেছে, বিশেষ দরকারেই এসেছে রহিম। —কি, বিশেষ কোন দরকার বলে মনে হচ্ছে? রহিম বলে—ভালোই আছেন দেখছি। বিজন বলে—আপনারাই তো সারিয়ে তুলেছেন আমাকে। ভাবছি কালই চলে যাবো. আর কষ্ট দেবো না আপনাদের। ভোরের লঞ্চেই বেরিয়ে যাবো। কক্ষনো না। আপনাকে যেতে হবে আজই। অবাক হয়ে বিজন বলে—মানে? কি বলছেন আপনি? বিজন তার নিজের স্বপ্নকে মাটি হতে দিতে চায় না। বিপাশা রাজি হয়েছে তার সঙ্গে বেরতে, এই সুযোগ সে ছাড়তে চায় না। জীবনে একবার হারিয়েছে বিপাশাকে, আর হারাতে চায় না। বিজন বলে, —আমি কাল ভোরেই যাব ঠিক করেছি। এবার রহিম বেশ চড়া সুরে বলে—বিজনবাবু পুলিশ মালুম পেয়ে গেছে, আপনি এখানে আছেন। আজ রাতেই শেষ বেলাতে রেড করতে পারে। আমি আপনাকে এখান থেকে পাচার করে দিতে চাই। আপনি ধরা পড়লে আমারও বিপদ হবে।

বিজন এবার বিদায়ের গুরুত্ব বুঝেছে। আজ মনে হয় বিজনের, অন্ধকার জগতের পথে যে পা বাড়িয়েছে তার আর ফেরার পথ নেই।

বিজনের স্বপ্ন যেন লহমার মধ্যে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেল। রহিম বলে—তৈরী হয়ে এখনই আমার সঙ্গে চলুন। লঞ্চ তৈরী রেখেছি। রাতের মধ্যেই ক্যানিং-এ পৌছে দেব। সেখানে থেকে সকালের ট্রেনে কলকাতা পৌছে যাবেন। পরে গেলে এর মধ্যে কেস্ জন্ডিস না হয়ে যায়। আমার লোক সঙ্গে থাকবে। ও ট্রেনে তুলে দিয়ে আসবে।

বিজন বলে—অসীমবাবুকে বলতে হবে না? রহিম বলে—যা বলার আমিই বলবো। আজই চলুন।

বের হয়ে পড়ে রহিম বিজনকে নিয়ে। বিজন চেয়ে দেখে বিপাশার বাংলোয় আলো নিভে গেছে। অন্ধকারে চোরের মতো বের হয়ে এল বন বাংলো থেকে। ওদিকে রহিমের আড়তের ঘরের লোকটা তৈরী ছিল। সে ছাড়া আরও দুজন ডাণ্ডাধারী লোকও রয়েছে। এইসব লোকদের দিয়েই রহিম তার অন্ধকারের ব্যবসা চালায়। বিজন লঞ্চে উঠতে লঞ্চটা ছেড়ে দেয়। অন্ধকারে নদীর উপর দিয়ে লঞ্চটা চলছে জঙ্গলের দিকে। রহিম বিজনকে গোপনভাবে পাচার করে দিতে চায়। রহিম লস্করের সব কাজই বেশ ছকে বাঁধা। এইভাবেই সে তার এখানকার সাম্রাজ্য চালায়।

ফরেস্টে ভিটেমাটি ছাড়া কিছু লোক থাকে। যাদের ঘর নেই, অন্ন নেই। তাদের রহিম লস্কর দাস করে রাখতে চায়, রহিম তাদের জমি জাগায় দেয়। ওরা সেখানে চাষাবাদ করে। সেই চরে, ওখানকার গাং-এ আছে প্রচুর মাছ। ওরা রহিমের নৌকা, জাল নিয়ে মাছ ধরে আড়তে চালান দেয়। ওদের

পরিশ্রমের ফলে রহিম আরও ফুলে ফেঁপে উঠছে। এরকম মানুষের অভাব হয়না রহিমের। তাদের মধ্যে রয়েছে ফুলি আর সুধীরের মত লোকও। ফুলি স্বপ্ন দেখে সুধীরকে নিয়ে নতুন করে ঘর বাঁধার। সুধীরকে যেন নিজের এলাকায় বন্দী করে রাখতে চায়। সুধীরের একতারায় সুর ওঠে। তাদের চলা শুরু হবে এবার। রহিম লস্কর বলে—হুঁশিয়ার হয়ে যাবি। দুর্গম বনের পথ। ফুলির চোখে রঙীন স্বপ্ন সুধীরকে ঘিরে। নৌকা ছাড়লো মাঝরাতে। ফুলির চোখে জল নামে। হাজার হোক এই মাটিতেই জন্মেছে সে। এতদিন এই মাটিই তাকে বড় করেছে, আশ্রয় দিয়েছে। আজ এই মাটি ছেড়ে চলে যাচ্ছে অন্য চরে। পিছনে পড়ে রইল পুণ্যভূমি। এরা এতটুকু সুখের আশায় অসীম দরিয়ায় হারিয়ে গেল। সুধীরের একতারায় সুর ওঠে—

"অকূল দরিয়ায় বুঝি কূল নাই রে—
আমায় ডুবাইলি রে—
আমায় ভাসাইলি রে"

নৌকাটা অন্ধকারে বুঝি হারিয়ে গেল।

সকাল হয় প্রতিদিনের মত বন কলোনিতে। ঘুম ভাঙতে শোনা যায় গাছে গাছে পাখিদের কলরব। নদীর জলে তখন রং-এর তুফান জাগে। আজ তার আগেই জেগে ওঠে বনকলোনি। অসীমও জেগে গেছে। কয়েকজন পুলিশ এদিক ওদিক কাউকে যেন খুঁজছে। কলোনির লোকজনও উঠে পড়েছে। কিন্তু পাখি তখন উড়ে গেছে। অসীম চিন্তা করছিল বিজনের কথা। বনের মধ্যে এমন ঘটনা প্রায়ই ঘটে। এইসব জলদস্যুর দল মাঝে মাঝে যাত্রীদের উপর হামলাও করে। অসীম ওকে টুরিস্ট ভেবেই এনেছিলো, কিন্তু আসলে যে ও স্মাগলিং গ্যাং-এর চিফ্, একজন সাংঘাতিক লোক, এসব খবর পুলিশের মুখে শুনে বলে, স্ট্রেইঞ্জ, আমি ওকে বিশ্বাস করেছিলাম। ও যে একজন আসামী জানতাম না। আর কি করে ও আপনাদের আসার খবর পেয়ে গেছে, তাই আজই কেটে পড়েছে। রহিম লস্করও এসে পড়ে। সেও নিপাট ভালোমানুষ সেজে বলে—রেঞ্জার সাহেব, দুনিয়ায় ইমান আর নেই, সব বেইমানে ভরে গেছে। এইভাবে আমাদের সকলের চোখে ধুলো দিয়ে পালালো। খোঁজ করুন দারোগাবাবু। ওকে ধরতেই হবে। পুলিশ ফিরে গেল। আবার এদিক ওদিক সন্ধান চালাবে। ফিরেছে লস্করও। কিন্তু ওরা জানেনা, বিজনের ট্রেন তখন শিয়ালদহ ঢুকেছে। সেও ফিরে গেছে কলকাতার জনজীবনের ভিড়ে।

বিপাশা শুনেছে ওদের কথা। অসীম বলে—সেই বিজনবাবু যে একজন স্মাগলার, পুলিশের আসামী তা তুমি জানতে না?

বিপাশাও ভেঙে পড়েছে। আজ মনে হয় সত্যি সে মানুষ চিনতে পারেনি। বিজনকে মনে হয় যে, সে যেন এই আদিম অরণ্যের মতোই। বাইরে ওর এত সুন্দর রূপ, আর অন্তরে ওর আদিম হিংস্রতা। রাতের অন্ধকারে বাইরের সুন্দর মুখোশটাকে ছিঁড়ে ফেলে বাঘের চেহারা নিয়ে যেন রক্তে নেশায় গর্জন করে ওঠে। আজ মনে হয় বিপাশার, সুযোগ পেলে সেই হিংস্র মানুষটা তাকেও গ্রাস করতো। তার বনবাস মুক্তির যে আলো তাকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিলো সেটাও যেন নিভে গেল। সে তার এত কাছের মানুষটাকেই চিনতে পারেনি। অসীম বলে—তাই তো দেখছি। আর আমি ভাবছি বন থেকে ছুটি নিতে হবে। দু-চার দিনের মধ্যে এখানকার নতুন রেঞ্জ অফিসারকে চার্জ বুঝিয়ে দিয়ে যেতে হবে।

আজ বিপাশার কাছে এই বনাঞ্চল, এই নদী, বিরাট সবুজে ঘেরা অরণ্য পরিবেশ এই বনবাসের জীবন তার কাছে সুন্দর বলেই মনে হল। এক অন্ধকার জগতের থেকে আলো ঝলমলে সুন্দর-এর স্বপ্নে বিভোর হয় বিপাশা। বিজনের কথা সে ভুলে নতুন করে বাঁচতে চায়। দিনের আলো নিভে আসছে। বিকালে গাং-এ জোয়ার আবার ভাটার টান। ফুলির নৌকাটাও নোঙর তুলে নতুন চরের দিকে পাড়ি দিয়েছে। ওরাও চলেছে নতুন ঘরের সন্ধানে।

আলোর পরশ

বিজন সেন নামটা শহরের ব্যবসায়ী মহলে—সাধারণ মানুষের কাছে খুবই পরিচিত। তিনি নিজের চেষ্টায় এই শহরতলির একদিকে বিশাল জায়গা নিয়ে তাঁর কারখানা গড়ে তুলেছেন। বিরাট কারখানা। ছোট থেকে নিজের চেষ্টাতেই ও কর্মনিষ্ঠায় আর নানা কৌশলে দিল্লিতেও মন্ত্রীমহলে যোগাযোগ করে, নানা পথে দেশ-বিদেশের, মায় সরকারি স্তরেও বড় বড় অর্ডার সংগ্রহ করে এখন সেই কারখানাকে বিরাট করে তুলেছেন। হাজার দুয়েক পরিবারের অন্ন-সংস্থানও হয় এখান থেকে।

মানুষ হিসাবে বিজনবাবু সজ্জন। আর পরোপকারীও। শহরের বহু স্কুল-কলেজ-সেবা প্রতিষ্ঠানকে ভালো টাকাই দেন। আর তিনি নিজেও সব সময় ব্যস্ত। ব্যবসার ব্যাপারে দিল্লি-মুম্বাই ছাড়া দেশের বাইরেও নানা দেশে গেছেন। সে সব জায়গায় তাঁর প্রতিষ্ঠানের মালপত্রও সরবরাহ করা হয়।

মি. সেনের পারিবারিক জীবনও বেশ সুখের। সকলেই তাই জানে। ছিলও। মি. সেনের প্রথম স্ত্রী একটি সন্তান সূর্যকে রেখে মারা যান। সূর্যপ্রকাশ তখন ছোট। তখন মি. সেনের ব্যবসা সবে চলতে শুরু করেছে। বাইরে নানা জায়গায় যেতে হচ্ছে। দিনরাত ব্যস্ত থাকতে হয় কারখানার কাজে। তখন টাকা আসতে শুরু হয়েছে। আর টাকার লোভেই মেতে উঠেছিলেন বিজন সেন। তাঁর চাই টাকা—প্রতিষ্ঠা।

এতদিন ওটার স্বাদ পাননি। পরিশ্রম করেছিলেন কারখানাকে গড়ার জন্য—কাজ পাবার জন্য। তখন ছিল তাঁদের খুব সাধারণ অবস্থা। একটি ছেলে আর স্ত্রী সাবিত্রীকে নিয়ে থাকতেন। সাবিত্রী দেখেছেন, বিজন সেন তখন টাকার জন্য, প্রতিষ্ঠার জন্য পাগল। দিনরাত খাটছেন। আর সেদিন বিজনকে টাকা দিয়ে কারখানা শুরু করার কাজে সাহায্য করেছিলেন তাঁরই বন্ধু বিকাশবাবু।

বিকাশবাবুরা বনেদি বড়লোক। বাংলার সীমান্তে পাহাড়-বন এলাকায় তাঁদের মহুয়া-পাইন-দামি সেগুন কাঠের জঙ্গল ছিল। তাঁরা ছিলেন ওই অঞ্চলের জমিদার। জমিদারি চলে যাবার আগেই বিকাশবাবুর বাবা ওই সব এলাকায় শিল্প-কারখানা, পাথর খাদান গড়েছিলেন।

বিকাশবাবু এত টাকা ও প্রতিষ্ঠার মালিক হয়েও তাঁর ছেলেবেলার বন্ধু ওই বিজনকে ভোলেননি। বিজনদের বাড়ি ছিল ওই পার্বত্য অঞ্চলে। ওঁরা দুজনে একসঙ্গে স্কুলে পড়েছেন। তখন থেকেই বন্ধুত্ব। বিজন ছাত্র হিসাবে ভালো। তাঁর বাবা তখন ওই শহর ছেড়ে কলকাতার এই শহরতলিতে এসে কিছু জায়গা কিনে ছোট একটা কারখানা চালু করেছিলেন। আর ছেলে বিজনকে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়াচ্ছিলেন। বিকাশও বিজনের সঙ্গে শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়াশোনা করেন। বিকাশবাবুদের কলকাতায় বাড়ি আছে। বিজন যেত সেখানে। আর তখনই তার পরিচয় হয় সাবিত্রীদের পরিবারের সঙ্গে।

সাবিত্রীর বাবা ছিলেন বিকাশবাবুদের কলকাতার এস্টেটের সরকার। সাবিত্রীও চিনতেন বিকাশবাবুকে, তাঁর বন্ধু বিজনকে। সেই সুবাদেই পরিচয়। বিকাশবাবুও দেখেছেন সাবিত্রীর সঙ্গে বিজনের ঘনিষ্ঠতা। বিজন তখন ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে বাবার কারখানার কাজ দেখছেন। বিজন দেখেছেন, টাকা পেলে তিনি কারখানাটাকে আরও বড় করতে পারেন। এর সম্ভাবনাও অনেক। কিন্তু তাঁদের টাকা নেই। সাবিত্রীও শোনেন বিজনের ওই স্বপ্ন দেখার কথা। বিকাশই সব শুনে বলেন, টাকা আমি দেব তোকে। তুই কারখানা বাড়া।

সাবিত্রীও খুশি হন। বিজনকে বলেন, এই তো, তোমার টাকার ব্যবস্থা হয়ে গেল।

বিজন বলেন, ঠিক আছে, তুই টাকা দে। তোর টাকা আর আমার পরিশ্রম। তুইও হবি কারখানার

অর্ধেকের মালিক।

বিকাশ বলেন, ওসব তুই যা করবি তাই হবে। এখন কারখানাটাকে নতুন করে গড়। সংসার কর। সাবিত্রীকে পাশে পেলে তোরও কাজের সুবিধা হবে।

বিজন মনে মনে চরম স্বার্থপর। তিনি চান নিজের কেরিয়ার আর কারখানাকে গড়ে তুলতে।

বিজন এবার টাকা পেয়ে দিনরাত পড়ে থাকেন কারখানার পিছনে। আর এখন তিনি নানা কৌশলে ব্যবসা করেন। এমনকি সাবিত্রীকেও নিয়ে যান হোটেলে। তাঁর পার্টিদের সামনে রেখে নানা চেষ্টায় অর্ডার বের করেন। সাবিত্রী স্বামীর এই লোভ-লালসাকে সমর্থন করেন না। বিকাশবাবুর কাছে সাবিত্রীকেই টাকার জন্যে যেতে হয়।

বিকাশবাবুর বাবা মারা গেছেন। বাইরের সব ব্যবসাপত্র তিনিই দেখতেন। এবার বিকাশকে কলকাতা ছেড়ে চলে আসতে হয় সেই পাহাড়ি এলাকার বাড়িতে। তবে সাবিত্রীকে তিনি স্নেহ করেন। বন্ধুর স্ত্রী। তাই টাকার ব্যবস্থাও করে যান।

সাবিত্রী মা হতে চলেছেন। এতেই বিজনের একটা চাপা রাগই জন্মে। সাবিত্রীও স্বামীর ব্যবসাতে ওইভাবে সহযোগিতা করতে চান না। একটা বড় অর্ডার ভেস্তে যায়। বিজন রেগে ওঠেন। সাবিত্রী অবাক হন। তাঁর স্বামী সংসার-সন্তান চান না। চান শুধু টাকা-প্রতিষ্ঠা। এত লোভী বিজন তা জানতেন না সাবিত্রী।

তাই এবার স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একটা অদৃশ্য দেওয়াল গড়ে ওঠে। এই সময় তাঁদের জীবনে সূর্য আসে। সাবিত্রী তাঁর সন্তান-সংসারকে নিয়েই বাঁচতে চান। কিন্তু বিজন চান এসব কাজের লোকের হাতে ছেড়ে দিয়ে সাবিত্রী তাঁর ব্যবসার প্রসারেই সহযোগিতা করুন।

সাবিত্রীও দেখেছেন, তাঁদের কোম্পানি ভালোই চলছে। সাবিত্রী বলেন, এবার বিকাশবাবুকে হয় পার্টনার করে নাও, নাহলে ওঁর টাকা ফেরত দাও। এত করেছেন তোমার জন্য।

দরদে যে ফেটে পড়লে! আর দরদ কেন হবে না, বিকাশকেই তো ভালোবাসতে। তুমি তো তারই রক্ষিতা—

ফুঁসে ওঠেন সাবিত্রী, এত নীচ তুমি!

ওঁদের দুজনের সম্পর্কটা এবার তিক্ততর হয়ে ওঠে। আর তাই নিয়েই বাধে তাঁদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সংঘাত। বিজন এখন বহু টাকার মালিক। বিরাট কারখানার মালিক। তিনি এবার বিকাশকেই চরম অপমান করেন।

টাকা দেবার কথা অস্বীকার করেন বিজন। বলেন, তুই যে টাকা দিয়েছিস তার প্রমাণ কি?

সাবিত্রী বলেন, হ্যাঁ, তুমিই টাকা নিয়েছ। ওঁর টাকা।

এবার বিকাশবাবুই সরে আসেন। দেখেছেন, তাঁর জন্য সাবিত্রীকেই চরম অপমানিত হতে হচ্ছে। সাবিত্রী বিজনের এরকম ব্যবহার ঠিক মেনে নিতে পারেন না। ঠিক করলেন, এই বাড়ি ছেড়ে চলে যাবেন তাঁর বাবার ওখানে। ছেলেকে নিয়ে। কিন্তু বিজন তাঁর ছেলে সূর্যকে ছাড়বেন না। চরম অপমান করে সাবিত্রীকেই বের করে দেন। সাবিত্রী সব হারিয়ে পথে নামেন।

বিজন ছোট্ট সূর্যকে নিয়ে বিপদে পড়েন। অবশ্য নার্স-আয়া এসব রাখেন। এখন তাঁর অনেক বড় কারখানা। টাকার অভাব নেই। তাই লোকের অভাব হয় না।

দিশার বাবা স্বদেশবাবু কাজ করেন একটা কোম্পানির অফিসে। বিজনের সেখানে মাল যায়। সেই সুবাদেই স্বদেশবাবুর সঙ্গে তাঁর পরিচয়। ওঁকে ঘুষ দিয়েই কোম্পানির অর্ডার পান। তাই বিজন যেতেন স্বদেশবাবুর বাড়িতে। সেখানেই তাঁর মেয়ে দিশার সঙ্গে পরিচয়। স্বদেশবাবুও জাঁদরেল মানুষ। তিনি দেখেছেন বিজনের মতো ছেলেকে যদি তাঁর মেয়ে বশ করতে পারে, একটা কাজের মতো কাজ হবে।

দিশাও বিজনের বাড়িতে আসা-যাওয়া শুরু করেন। বিজনেরও তাঁকে ভালো লাগে। আর তারপর নিয়েই আসেন তাঁর স্ত্রী হিসাবে দিশাকে তাঁর শূন্য বাড়িতে। তিনি অবশ্য জেনেই এসেছেন, তাঁর স্বামীর আগের পক্ষের স্ত্রীর সন্তান ওই সূর্য। সূর্যও আসল খবরটা জানে না। বিজন তাকে জানিয়েছেন যে

তাঁর স্ত্রী, সূর্যের মা তাকে জন্ম দেবার পরই মারা যান। দিশাও তাই শুনেছেন। আসল কথাটা বিজন এদের কাউকেই জানান না।

তবু তাঁর ঘরে প্রথমা স্ত্রীর একটা ছবি রেখেছেন। ছোট্ট সূর্য দেখে মায়ের ছবিটা। মা কেমন জানে না সে। দেখেছে নতুন মাকে। তাকে অকারণেই শাসন করে। বাবাও তাকে যেন দেখতে পারে না। মায়ের ছবিটার সামনে দাঁড়িয়ে কাঁদে ছোট ছেলেটা।

বিজনের কারখানা ভালোই চলছে। বিজন সূর্যের জন্য পড়াশোনার ভালো ব্যবস্থাই করেছেন। তার জন্য গাড়িও রয়েছে। ভালো স্কুলেই ভর্তি করেছেন তাকে। এটা তাঁর সামাজিক স্ট্যাটাসেরই পরিচয়। প্রাচুর্যের অভাব তিনি রাখেননি সূর্যের জন্য। অভাব শুধু অন্তরের প্রীতি-ভালোবাসার। সূর্য তা থেকে চিরবঞ্চিত। ছেলেটা দেখে, তার সৎমাও এখন তার নিজের ছেলেকে নিয়ে ব্যস্ত। বিজনবাবুর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী দিশারও একটা পুত্রসন্তান হয়েছে। দিশারও তাই সূর্যের দিকে চাইবার অবকাশ নেই। সূর্যও তাকে আদর করতে চায়। কিন্তু দিশার তাতে একটা সন্দেহ রয়েছে। তিনি সরিয়ে দেন সূর্যকে। আর ছোট্ট ছেলেটাও বুঝেছে, তার ওই দাদা তার মায়ের কাছে যেন শত্রু। তাই ছোট ছেলেটাও সূর্যকে দেখে সরে যায়।

সূর্যও বুঝেছে , মা-ছেলে এমনকি তার বাবাও তাকে অবজ্ঞা আর অবহেলাই করেন। তার মা নেই। এই কথাটা তার বারবার মনে পড়ে। এমনি একটা দুঃখকে বুকে চেপে সূর্য বড় হয়ে উঠেছে। এখন সে তরুণ। কলেজে পড়ে। বাইরে তার পরিচয় সে বড় শিল্পপতির ছেলে। চেহারাও সুন্দর। কলেজে তার বন্ধুবান্ধবও জুটতে দেরি হয় না।

সূর্য দেখেছে কলেজের এই নতুন পরিবেশকে। নতুন বন্ধুদের। ছেলেমেয়েরা একসঙ্গেই পড়ে কলেজে। ছোট থেকেই সূর্য দেখেছে অবজ্ঞা আর অবহেলাকে। তার প্রতিবাদ করার উপায় ছিল না বাড়িতে। কিন্তু এখন সে বড় হয়েছে। তার মনের অতলে জমা ক্রোধ যেন এবার প্রকাশ করতে চায় সে।

কলেজের সহপাঠীদের মধ্যে দেখেছে একদল ছেলে দেবেনের নেতৃত্বে রাজত্ব চালায়। দেবেনও শহরের কোন এক শিল্পপতির ছেলে। বেশ মস্তান ধরনের। কলেজেই তারা বন্ধুদের নিয়ে ড্রাগস্ নেয়। মেয়েদের পিছনে ঘোরে। কারণে-অকারণে ক্লাশ বয়কট, না হয় কোনো অধ্যাপককে তাদের পরীক্ষার হলে টোকাটুকি করতে না দেবার জন্য অপমান করে। এইবার সূর্য দেবেনদের দলের এই কাজের প্রতিবাদ করে। ফলে দেবেনের সঙ্গেই তার একটা বিদ্বেষের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সূর্য অবশ্য তাতে ভয় পায় না। সেই অবজ্ঞা-অবহেলার জ্বালাটা তার মনে আনে এক অদৃশ্য শক্তি। সে দেবেনের মতো মস্তানকে পদে পদে এবার বাধা দেয়।

কলেজে পড়ে মিতা। বেশ বুদ্ধিমতী। পড়াশোনাতেও ভালো। এছাড়াও ভালো গান গায়। কলেজের সোশ্যালে দেবেনের দল ওকে গাইতে দেবে না। বরং অপমান করে মিতাকে। দেবেনের এক প্রিয়া আছে এই কলেজে, তার গানই হবে। এবার মিতাও ভেঙে পড়ে অপমানে। ওকে সান্ত্বনা দেয় সূর্য। বলে, তুমিই গাইবে। তৈরি থাকো।

স্টেজ দেবেনের দখলে। সেই প্রিয়াকে গাইতে উঠিয়েছে। কিন্তু গাইতেই পারে না প্রিয়া। হলে শুরু হয় কোলাহল। আর এই অবসরে সূর্য স্টেজে তুলেছে মিতাকে। তার গানই দর্শকের মন জয় করে। দেবেনের দল মুখ বুজে এই অপমানটা মেনে নিতে বাধ্য হয়।

মিতা সূর্যের কাছে কৃতজ্ঞ। সূর্যেরও ভালো লাগে মিতাকে। খুব সাধারণ ঘরের মেয়ে। বাড়িতে মা-বাবা আর এক ভাই। বাবা সরকারি অফিসে চাকরি করতেন। বাবার পেনশনের টাকা আর মায়ের সামান্য টিউশনির টাকায় সংসার চলে। সূর্য এখানে এসে এদের সংসারের মায়া-মমতা-স্নেহভরা রূপখানাকে দেখে, যা তাদের সংসারে নেই। সূর্যের জীবনের এই দুঃখের কথাটাও জানে মিতা। জানে আরও সূর্যের মনের অতলের বেদনাটা।

এত কিছু সত্ত্বেও সূর্যের জীবন জুড়ে আছে নিঃসঙ্গতার হাহাকার। মিতা তাই সূর্যের জন্য মমত্ববোধ

করে। হয়তো প্রেমের সূচনা হয় এই মমত্ববোধ থেকেই। মিতাও তাই তার অজানতে সূর্যকে ভালোবাসে। সূর্যের নিঃসঙ্গ নিঃস্ব মনও মিতার সান্নিধ্যে এসে একটা স্বস্তি, তৃপ্তি পায়। সূর্যকে মিতা বলে, এবার তুমি তো বিজনেস ম্যানেজমেন্ট পড়তো যাচ্ছো, আমার পড়াশোনা আর হবে না। একটা চাকরির সন্ধান করতে হবে। সংসারের দায় তো আমাকেই নিতে হবে।

সূর্য চলে যাচ্ছে কলকাতার বাইরে দিল্লিতে বিজনেস ম্যানেজমেন্ট পড়তে। সে অবশ্য মিতাকে ছেড়ে যেতে চায় না। তাই বাবাকে বলে, কলকাতাতেই তো পড়া যায় বিজনেস ম্যানেজমেন্ট।

বিজন চান দিল্লিতেই পড়াশোনা করে আসুক ও। সেই সঙ্গে দিল্লির উপর তলাতেও পরিচিতি হবে তার। যার জন্য তাঁদের ব্যবসাতেও উন্নতি করা যেতে পারে। আর দিশাও চান সূর্যকে বাইরে পাঠাতে। দিশাই বলেন, কলকাতায় আবার পড়াশোনা হয় নাকি? এখানে তো হয় খালি ছাত্র আন্দোলন আর জঘন্য রাজনীতি। কেরিয়ার গড়তে হলে তোকে বাংলার বাইরেই যেতে হবে।

বিজন স্ত্রীর কথার অমান্য করতে পারেন না। তাই সূর্যকে যেতে হল দিল্লিতে। মিতা জানে যাদের কিছুই নেই তাদের দুঃখকেই মেনে নিতে হবে। চোখের জলে সে বিদায় দেয় সূর্যকে।

মিতাকে তার নিজের বাঁচার পথ নিজেকেই খুঁজে নিতে হবে। তাদের কাছে বেঁচে থাকাটাই বড় ব্যাপার। প্রেম-ভালোবাসা-স্বপ্নের কোনো ঠাঁই তাদের জীবনে নেই। তাই মিতাও এবার হন্যে হয়ে ঘুরছে একটা চাকরির জন্য। বাড়িতে অভাব। মিতা শেষ পর্যন্ত একটা অফিসে চাকরি পায়। এতেই সে তৃপ্ত। একটু বাঁচার পথ সে পেয়েছে।

বেশ বড় অফিস। তাদের নিজেদের বিরাট কারখানা আছে। মিতা হেড অফিসেই কাজ পেয়েছে। অবশ্য এর জন্য মিতার বাবা সদাশিববাবুও চেষ্টা করেছেন। তাঁদের অফিসের কর্তার সঙ্গে বিজনবাবুর বেশ ঘনিষ্ঠতা আছে। তাঁর সুপারিশেই মিতার চাকরিটা হয় বিজনবাবুর অফিসে।

মিতাও বুদ্ধিমতী। আর খুব কাজের মেয়ে। চাকরি করে সে নিষ্ঠার সঙ্গে। মন দিয়ে। কাজের নিষ্ঠার জন্য মিতা বড় সাহেব বিজনবাবুর চোখেও পড়ে। মিতাই মোটা টাকার একটা বিল-এর ভুল ধরে ফেলে আর কোম্পানির প্রায় পঁচিশ লাখ টাকা ওভার পেমেন্ট হতে হতে বেঁচে যায়। বিজনবাবুও পরে অনুসন্ধান করে দেখেন, ওই কর্মচারী এইভাবে কোম্পানির নামে জাল চালান করে কোম্পানির কাছে পেমেন্ট দাবি করে আর মিতাই সেটা ধরে ফেলে। হয়তো আরও বড় বিপদ ঘটাতো ওই কর্মচারী। শুধু মিতার জন্যই তা পারেনি। বিজনবাবুও মিতার এই কর্মনিষ্ঠায় খুশি হয়ে তাকে প্রমোশনই দেন। কারখানার ম্যানেজারের পি এ করে দেন।

এবার নাকি কারখানায় নতুন পার্সোনাল ম্যানেজার আসছেন। কারখানার সবাই ভীত-সন্ত্রস্ত। তরুণ এই ম্যানেজার নাকি খুবই কড়া। তাই নিয়ে কারখানাতে বেশ আলোচনা আতঙ্ক-এর পরিবেশ গড়ে ওঠে। মিতাও একটু ঘাবড়ে যায়। নতুন এই পার্সোনেল ম্যানেজার কেমন হবে কে জানে। তার জন্য নতুন একটা চেয়ারও তৈরি হয়েছে। চেম্বার সাজানোও হচ্ছে। বিজনবাবু নিজে এসে ওসব কাজের তদারকি করছেন।

কারখানার স্টাফরা নতুন ম্যানেজারকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য পার্টির আয়োজন করেছে। তাতে বড় সাহেবও আসবেন। আসবেন আরও অনেকে। মিতাকেও সেই অনুষ্ঠানে অংশ নিতে হবে। তাকে গান গাইতে হবে।

সুন্দর হলে সেই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। বিজনবাবুও এসেছেন, সঙ্গে তাঁদের নতুন ম্যানেজার। মিতা নতুন ম্যানেজারকে দেখে চমকে ওঠে। সে আর কেউ নয়—সূর্যপ্রতাপ। মিতা উদ্বোধনী সঙ্গীত গাইছে। অভ্যর্থনা জানাচ্ছে তাদের অন্যান্য স্টাফেরা। মিতার এই গানে ফুটে ওঠে আজ আনন্দ আর আন্তরিকতা। সূর্যও অবাক হয়েছে মিতাকে এখানে দেখে।

সূর্য দিল্লি থেকে মিতার ঠিকানাতে চিঠি দিয়েছিল। কিন্তু মিতা চাকরি পাবার পর সেই পুরনো বাড়ি ছেড়ে তাদের কারখানার কাছে একটা নতুন বাড়িতে উঠে এসেছিল। তাই সূর্যের সেই চিঠি মিতার কাছে পৌঁছায়নি। সেই চিঠি দিল্লিতে সূর্যের কাছে ফিরে গেছিল। সূর্যও নীরব বেদনায় ভেঙে পড়েছিল। মিতাও

তার জীবন থেকে হারিয়ে গেছে। সূর্যের জীবন থেকে তার সব থেকে আপনজন তার মা হারিয়ে গেছে। তারপর যে ছিল সে মিতা। সেও আবার হারিয়ে গেছে।

সূর্য পড়া শেষ করে কলকাতায় ফিরেছে প্রায় বছর তিনেক পর। দিশাও বসে নেই। তাঁর ছেলে সোমপ্রকাশ কলেজে পড়ছে। সোমপ্রকাশ মায়ের আদরে যেন একটা বাঁদরই তৈরি হয়েছে। তার বেশ কিছু বন্ধু-বান্ধব, বান্ধবীও জুটে গেছে। তাদের নিয়ে সোম বারে যায়, মদ গিলে ফেরে।

তার জীবনে মেয়েদের নিয়েই যেন খেলা শুরু করেছে সে এখন থেকেই। দিশা চান সোমও এবার কারখানা অফিসের কাজ দেখাশোনা করুক। আর সূর্য ফিরে এসেছে, বিজন তাকে তাঁদের কারখানার বিকল্প ম্যানেজার করেছে। দিশাও সেটা মন থেকে মেনে নিতে পারেননি। তাই দিশার চাপেই বিজনবাবু সোমপ্রকাশকে তাঁর অফিসের ক্যাশ ডিপার্টমেন্টে কাজ শেখার জন্য রেখেছেন একটা পদ দিয়ে।

সোমপ্রকাশ কাজের কাজ কতটা দেখে তা সেই জানে। সন্ধ্যার আগেই তাকে যেতে হয় বারে। বান্ধবীরাও আসে। তাই সোম নিজেই চলে যায়। ক্যাশের দায়িত্ব দিয়ে যায় তার সহকর্মী ম্যানেজার নিরাপদবাবুকে। নিরাপদকে সেই নিয়ন্ত্রণ করে, অবশ্য নিরাপদ যে মোটেই নিরাপদ লোক নয়, সেটা জানার মতো মানসিক অবস্থাও নেই সোমপ্রকাশের। বরং নিরাপদই সোমপ্রকাশকে চালায় তার নিজের স্বার্থসিদ্ধি করার জন্য।

সূর্য দেখেছে মিতাকে। সেই হারানো মিতাকে সে আবার ফিরে পেয়েছে। আজ তার মনেও খুশির সুর জাগে। দিশাও এসেছেন এই সভায়। রয়েছে সোমপ্রকাশও। দিশা দেখছেন সূর্যকে। মিতাই ওকে ফুলের তোড়া দিয়ে অভ্যর্থনা জানাতে সূর্য তা হাসিমুখে গ্রহণ করে। দিশার চোখ এড়ায় না সেটা।

সূর্য নতুন কাজের ভার নিয়েছে। মিতাই এখন তার সহকারী। সূর্যও খুশি, মিতাও। এবার সূর্য কারখানার শ্রমিকদের কল্যাণে কিছু কাজ করতে চায়। তাদের রেশন-স্বাস্থ্য কেন্দ্রের জন্য টাকা ধার্য করে। বাড়িতে ওদের এই সব কথার মধ্যে দিশাই বলেন, বেশ তো চলছিল, আবার এতগুলো টাকা কেন খরচ করবে কোম্পানির ওই লেবারদের জন্য? এসব পরামর্শ দিচ্ছে তোমাদের ওই মিতাই। মেয়েটা সূর্যপ্রকাশকে দিয়ে এত টাকার বরাদ্দ করে নিজেই বেশ কিছু টাকা মারতে চায়। ধড়িবাজ মেয়ে।

সূর্য চেনে মিতাকে। বলে সে, ওই মিতা যথেষ্ট সৎ এবং কাজের। লেবারদের জন্য কিছু করলে তারাও শ্রম দিয়ে পুষিয়ে দেবে। এতে কম খরচায় কোম্পানির প্রোডাকশন বাড়বে। বিজনবাবু বলেন, এখন বেশি প্রোডাকশনের দরকার। বাইরের এত অর্ডার আসছে। দিশা তুমি অমত কোরো না। সূর্যকে আমিই ওই দায়িত্ব দিয়েছি। দিশা বলেন, তোমার টাকা তুমি ওড়াবে তাতে বলার কি! তবে আমি-সোমও কোম্পানির ডিরেকটার। আমাদেরও কোম্পানির উপর ভাগ আছে, তাই জানালাম।

বিজনবাবু টাকাটা স্যাংশন করেন। এতে দিশা-সোমপ্রকাশ আরও জ্বলে ওঠে। তবে মুখে কিছু বলে না। এবার দিশাও বুঝছেন বিজন সূর্যের কর্মক্ষমতা, তার জন-প্রিয়তাকে বাড়াতে চান, যাতে সূর্যই এবার কারখানার এম ডি অর্থাৎ ম্যানেজিং ডিরেক্টার হতে পারে। বিজনবাবুরও বয়স হয়েছে, শরীর ভেঙে পড়েছে। তাঁর অবর্তমানে কোম্পানির সব ভার সূর্যের হাতে তুলে দিতে চান। দিশা-সোমপ্রকাশ সেটা চায় না। দিশা চান তাঁর ছেলে সোমই হবে এই কোম্পানির এম ডি। দিশা বলেন, সোম, তুই সূর্যের উপর নজর রাখ। ওকে এই কোম্পানি থেকে হটাতেই হবে। তুই নিরাপদবাবুকে আমার কাছে আসতে বল। তোর বাবা কাল দিল্লি যাবেন, এই সময় ও যেন আসে।

নিরাপদ কোম্পানির পুরনো দিনের লোক। সে বুঝেছে কোম্পানির মালিকের স্ত্রীর মনের কথা। সোমপ্রকাশকে নিরাপদ এর মধ্যে ম্যানেজ করে কোম্পানি থেকে টাকাপয়সা নানাভাবে সরাতে শুরু করেছে। সোমপ্রকাশ এম ডি হলে নিরাপদরই সুবিধা হবে। সূর্যপ্রকাশ কারখানা নিয়ে রয়েছে। কড়া ধাতের কাজ জানা ছেলে। এর মধ্যে সে নিরাপদবাবুর দু'একটা বিলের পেমেন্টও বন্ধ করে দিয়েছে। নিরাপদও তাই সূর্যকে এম ডি হিসাবে চায় না। নিরাপদ বলে, ম্যাডাম, আপনি ভাববেন না। সূর্যপ্রকাশের ব্যবস্থা আমি করছি। ও তো এখন ওই মেয়েটার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে!

সূর্যপ্রকাশ-মিতার মধ্যে এখন সুন্দর একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। অফিসের কাজের পর সূর্য মাঝে

মাঝে মিতাকে নিয়ে বাইরেও যায়। কখনও যায় দীঘার সমুদ্রতীরে। ঝাউবনে। না হয় নদীর ধারে। ওরা দুজনে এখন এক নতুন জগতের স্বপ্ন দেখে। সূর্যের নিঃস্ব-নিঃসঙ্গ জীবনে মিতা এনেছে পূর্ণতার স্বাদ। দুজনে এবার ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখে।

নিরাপদ এসব খবর রাখে। সোমপ্রকাশও এবার তার বন্ধুদের লাগিয়েছে ওই মিতার পিছনে। মিতার উপরও নজর পড়েছে সোমপ্রকাশের। আর সোমপ্রকাশও সুযোগ খুঁজছিল।

সেদিন খুব বৃষ্টি হচ্ছে। সূর্য অফিসে। সোমপ্রকাশ রয়েছে কারখানায়। মিতা বের হচ্ছে, বাড়ি ফিরবে। বৃষ্টিতে বাসও নেই। সোম বলে মিতাকে, চলুন আপনাকে বাড়িতে ছেড়ে দিয়ে যাবো।

মিতাকে গাড়িতে তুলেছে সে। আর এবার সোমপ্রকাশ তার নিজমূর্তি ধরে। জোর করে সে মিতাকে নিয়ে চলেছে একটা রিসর্টে। তার চরম সর্বনাশ করতেই উদ্যত সে। মিতা কোনোমতে রিসর্ট থেকে বের হয়ে ওই বৃষ্টির মধ্যেই পালায়। পিছু নিয়েছে সোমের মস্তান দল তাকে ধরার জন্য। এই সময় সূর্য এসে পড়ে গাড়ি নিয়ে। সে এবার মস্তানের দলকে মারধোর করে বাঁচায় মিতাকে। আর এসে পড়ে সোমপ্রকাশ। এবার মিতাই বলে, এই সেই শয়তান! এই আমাকে ধরে এনেছিল রিসর্টে আর সর্বনাশ করতে চেয়েছিল।

সূর্য অবাক হয়। সূর্য সিদ্ধান্ত নেয় মিতাকে সে বিয়ে করে সামাজিক স্বীকৃতি দেবে। তাই বাড়িতে বিজনবাবুকে কথাটা বলে মিতাকেই সে বিয়ে করবে। কিন্তু এবার দিশা বলে ওঠেন, ওই বাজে মেয়েটা হবে এ বাড়ির বৌ! ওর স্বভাব-চরিত্রেরও ঠিক-ঠিকানা নেই।

সূর্য এই কথা মানতে রাজি নয়। ওই মহিলাই এ বাড়িতে এসে তার ছেলেবেলায় দেখা সেই মায়ের ছবিটা, যেটা ছিল তার মায়ের একমাত্র স্মৃতি—সেই ছবিটাই কেড়ে নিয়েছিল। কেড়ে নিয়েছে তার কাছ থেকে তার স্নেহপ্রবণ বাবাকেও। কেড়ে নিয়েছে তার সব আপনজনকে। আজ সেই মহিলাই সূর্যের কাছ থেকে মিতাকেও সরিয়ে নিতে চায়। সূর্য বলে, তাকে আমি চিনি। ভালো মেয়ে। আর সে লোভী নয়।

দিশা বলেন, ভালো মেয়ে? সে তোমাকে ভালোবাসে না, তোমাকে বিয়ে করার নামে এই সম্পদের মালিক হতে চায়। সামান্য একটা ক্লার্ক—

বিজনও শুনেছে স্ত্রীর কথাগুলো। তিনিও স্বপ্ন দেখেছিলেন সূর্যের বিয়ে দেবেন তাঁর বন্ধু আর এক শিল্পপতির মেয়ের সঙ্গে। তাতে তাঁদের ব্যবসারও সুবিধা হবে। কিন্তু সূর্যের মুখে তারই অফিসের একটা সাধারণ মহিলাকর্মীকে বিয়ে করার কথা শুনে বেশ রেগেই উঠেছিলেন মনে মনে। তিনি তবু নীরবেই শুনেছিলেন সূর্যের কথা। আর সঙ্গে সঙ্গে দিশাকেও প্রতিবাদ করতে দেখে বিজনবাবুও সাহস পেয়ে বলেন, ঠিকই বলেছেন তোর মা!

সূর্য চটে ওঠে, মা! কে আমার মা? আমার মা নেই। একজন মেয়ে হয়ে আর একজন মেয়ের দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে যা বলছেন তা মিথ্যা। মিথ্যাবাদী উনি। আমি মিতাকেই বিয়ে করতে চাই। আমি জানি মিতাকে—তাকে আমি ভালোবাসি। সেও আমাকে ভালোবাসে। আমাদের ভালোবাসায় কোনো খাদ নেই।

দিশা এবার রেগে ওঠেন, তাঁকে মিথ্যাবাদী বলে চরম অপমান করেছে সূর্য। সোমপ্রকাশও ছিল। সেই এবার প্রতিবাদ করে বলে, আমার মাকে অপমান করার কোনো অধিকার তোমার নেই। আর তোমার যা ইচ্ছা করতেও পারো না। এ বাড়ির একটা মানসম্মান আছে, আইন-কানুন আছে।

সূর্যপ্রকাশ এবার বলে, বাড়ির মানসম্মান আমি নিচু করিনি সোম। মাতাল হয়ে মেয়েদের সঙ্গে ইতরামি করা এ বাড়ির শিক্ষা নয়। মেয়েদের জোর করে রিসর্টে তুলে নিয়ে গিয়ে অপমান করা, এটা আইন নয়। এ বাড়ির আইন ভেঙেছ তুমিই—আমি নই। তুমি যে মেয়েটাকে চরম অপমান-লাঞ্ছনা করতে গিয়েছিলে, আমিই তাকে যোগ্য সম্মান দিয়ে নিজের স্ত্রীর পরিচয় দিতে চাই। এতে দোষের কিছু দেখি না।

দিশা-সোমপ্রকাশই এবার বিপদে পড়েছে। সূর্য যে সোমপ্রকাশের এইসব স্বেচ্ছাচারিতার কথা

বিজনবাবুর কানে তুলবে তা ভাবেনি। বিজনবাবুও অবাক হন। বিজনবাবু সূর্যের সম্বন্ধে আড়ালে যা শুনেছেন তা ওর গুণের কথাই। সবাই সূর্যকে ভালোবাসে। আর সোমের নামে শুধু অভিযোগই শুনেছেন। স্টাফদের সঙ্গে তার সম্পর্ক ভালো নয়। এবার সোমের সম্বন্ধে এসব কথা শুনে অবাক হন বিজনবাবু। বলেন, এসব কি শুনছি সোম?

সোম বলে, মিথ্যা কথা বাবা। নিজের সেই নোংরামি ঢাকতে ও আমার নামে যা তা বলছে। একটু আগে ও মাকে মিথ্যাবাদী বলছিল, এখন দেখছি মিথ্যাবাদী ও নিজেই।

সূর্য বলে, সত্যি না মিথ্যা সে প্রমাণ আমি দিতে পারি, ও যাদের উপর অত্যাচার করেছে, সেই মেয়েরাই এসে বলবে ওসব কথা।

বিজনবাবু বলেন, তাই আনো ওদের। এসব সত্যি হলে আমি তাকে ক্ষমা করবো না, সে যেই হোক।

এবার বিপদে পড়ে সোম। হঠাৎ এমন সময় উত্তেজিত হয়ে ঢোকে নিরাপদবাবু। হাতে কিছু কাগজপত্র। সে এতদিন চেষ্টা করেছে দিশা আর সোমের কথামতো মিতাকে বিপদে ফেলতে। নিরাপদও চায় মিতাকে হটাতে। তাই বেশ একটা শক্ত অভিযোগই সে এবার গড়ে তুলেছে মিতার বিরুদ্ধে। তার জন্য কাগজপত্রও তৈরি করিয়েছে। নিরাপদ নিজেই একটা লাখ টাকার বিল করে একটা ভুয়ো পার্টির নামে। সেই পার্টির অর্ডার সংগ্রহ করেছে মিতা। নিরাপদ সুযোগ বুঝে অন্য কাগজের সঙ্গে এমনি একটা চিঠিও সই করিয়েছে মিতার। সেই-ই কোম্পানির হয়ে টাকাটা নিয়েছে। এই সঙ্গে মিতার নামে কাগজপত্র রসিদ সই করিয়ে সেই-ই কয়েক লাখ টাকা নিজেই আত্মসাৎ করেছে নিরাপদ। আর আজও সেই সব জাল-জোচ্চুরির খবর সে বড়সাহেবকে দেখিয়ে মিতাকে চোর সাব্যস্ত করেছে। নিরাপদ আর্তনাদ করে। সর্বনাশ হয়ে গেছে স্যার। দুনিয়ায় আর বিশ্বাস বলে কিছু নেই। একি হাল হল দুনিয়ার? দেখুন স্যার, ওই মিতা রায়ের কাণ্ড দেখুন স্যার! কোম্পানিকে ওরা এবার শেষ করে দেবে।

সূর্য অবাক হয়, কি বলছেন যাতা? মিতা রায় জাল করেছে?

আজ্ঞে হ্যাঁ। সাড়ে তিন লাখ টাকা। একেবারে হাতেনাতে ধরেছি। এই দেখুন তার প্রমাণ। যাবে কোথায়? দেখুন স্যার—

নিরাপদ এবার বিজনবাবুর কাছে সেইসব কাগজ, ভুয়ো বিল দেখান। ওসব দেখে এবার বিজনবাবু গর্জে ওঠেন, ওরা কি ভেবেছে! বেইমানের দল। ওকে পুলিশে দিন! এতবড় একটা চোর ওই মেয়েটা!

দিশাও এবার হাতে মোক্ষম অস্ত্র পেয়েছেন। সোমও। সূর্যও দেখছে কাগজগুলো। সে মিতার হাতের সই দেখেছে। কিন্তু মনে হয় সূর্যের এসব ষড়যন্ত্রই।

সোমপ্রকাশ বলে, কী! হাতেনাতে প্রমাণ মিলেছে তো? মেয়েটা চোর মিথ্যাবাদী। আর কার সঙ্গে টাকার জন্য কী করছে কে জানে! আরে বাবা, আজকালকার ওয়ার্কিং গার্লদের বিশ্বাস নেই। এখন যাও চুরির দায়ে জেল।

সূর্য বলে, না, এসব মিথ্যা কথা। এসব প্ল্যান করেই মিতাকে বিপদে ফেলার জন্য করা হয়েছে। মিতা এসব করেনি। করতে পারে না।

বিজন গর্জে ওঠেন, প্লিজ স্টপ, আই ওন্ট টলারেট অল্ দিস ননসেন্স।

বিজনই ফোন করেন পুলিশকে খবর দেবার জন্য। সূর্য তবু বলার চেষ্টা করে, এসবের একটা নিরপেক্ষ তদন্ত করুন বাবা। সব খবর না জেনে একজনের জীবন, তার মানমর্যাদা নিয়ে খেলা করা ঠিক হবে না। বিজনবাবু কোনো কথাই শোনেন না। তিনি পুলিশে খবর দেন।

মিতা ভাবতেও পারে না যে তার বিরুদ্ধে এমন একটা ষড়যন্ত্র হবে। সূর্যও এসে পড়ে। পুলিশও। তাদের হাতে ওসব প্রমাণ আর কোম্পানির এম ডি নিজে অভিযোগ করেছেন। মিতা বলে কাতর স্বরে, বিশ্বাস করুন স্যার। আমি এসবের কিছুই জানি না!

এসবে সই তো আপনার? এত টাকা কোথায় রেখেছেন?

মিতা বলে, আমি এসবের কিছুই জানি না।

সূর্য ওকে সমর্থন করে। বিজনবাবু চটে ওঠেন। তিনি এবার সূর্যকে তাঁর চেম্বারে ডেকে নিয়ে বলেন, বার বার তুমি আমাদের বিরুদ্ধে, এই কোম্পানির স্বার্থের বিরুদ্ধে কথা বলছ। তোমাকে সাবধান করছি।

সূর্য বলে, ও চোর নয়। চুরি করেছে অন্যরা। আর তারাই অসহায় মেয়েটাকে চোর সাজিয়েছে। এতবড় অন্যায়ের আমি প্রতিবাদ করবোই।

দিশাও হাজির হয়েছেন সেখানে। তিনি বলেন, কোম্পানির একজন মালিক তুমি, আর তুমিই কোম্পানির স্বার্থহানি করছ, জানো এর শাস্তি কী?

বাবা, ওরা কোম্পানির সর্বনাশ করার জন্যই এইসব করেছে। আমি নিজে এর তদন্ত করবো। সাবধান হোন সেইসব ষড়যন্ত্রকারীব বিরুদ্ধে। নাহলে তারাই একদিন চরম সর্বনাশ করবে কোম্পানির। এর পিছনে গভীর ষড়যন্ত্র আছে।

বিজনবাবু বলেন, আমি তোমাকে সাবধান করছি, এ নিয়ে তুমি কোনো কথাই বলবে না, মুখ খুলবে না।

অন্যায়ের প্রতিবাদ আমি করবোই। বলে সূর্যপ্রকাশ তেজোদৃপ্ত কণ্ঠে।

দিশাই বলেন, তাহলে ওসব করবে এ বাড়ির বাইরে গিয়ে, কোম্পানি তোমাকে বরখাস্তই করছে।

চমকে ওঠে সূর্য। সোমও রয়েছে। সূর্য শুধোয়, বাবা, এটা কি আপনার মত?

সোমপ্রকাশ বলে, কোম্পানির চারজন ম্যানেজিং ডিরেক্টরের মধ্যে দুজনের এই মত। উনি তাতে মত দিতে বাধ্য। ইউ আর স্যাকড়্। ইউ আর নোবডি, আন্ডারস্ট্যান্ড।

সূর্য অবাক হয়ে শোনে কথা। একদিকে তার নিজের কাজ-অফিস-প্রাচুর্য, অন্যদিকে তার প্রেম, তার ভালোবাসা। অসহায় অপমানিতা মিতার প্রেমই বড় হয়ে ওঠে তার কাছে। সূর্য মনস্থির করে ফেলেছে। বলে সে, তাহলে আমার কথাটাও শুনুন বাবা। আমি নিজেই এসব ছেড়ে চলে যাচ্ছি। তবে আপনাকেও সাবধান করছি, যে ষড়যন্ত্রের শিকারে পরিণত হয়েছে ওই অসহায় মেয়েটা, আপনি নিজেই একদিন সেই ষড়যন্ত্রের শিকার হবেন। সেদিন বুঝতে পারবেন আমি সত্যি কথাই বলেছিলাম। তখন অবশ্য আপনার করারও কিছু থাকবে না।

সূর্য বের হয়ে আসে। এই বড় বাড়ির এই প্রাচুর্যের প্রতি এতদিনের ব্যর্থ বেদনাটা আজ সোচ্চার হয়ে উঠেছে। সূর্য চলে আসে তার কলেজের বন্ধু অনিমেষের কাছে।

অনিমেষ বড়লোকের ছেলে। তার বাবা ছিলেন নামকরা অ্যাডভোকেট— হাইকোর্টের। বিরাট বড়লোক। অনিমেষ তাঁর একমাত্র সন্তান। অনিমেষ নিজেও অ্যাডভোকেট। বাবার সঙ্গে মক্কেলদের কেস, বড় বড় বেশ কয়েকটা কোম্পানির ল' অফিসার সে।

এই বড় বাড়িতে থাকে অনিমেষ তার স্ত্রীকে নিয়ে। সদ্য বিয়ে হয়েছে তাদের। তার স্ত্রীও একই কলেজে পড়তো। তাই সীমাও চেনে সূর্যকে। সূর্য তার সিদ্ধান্তের কথা জানায় অনিমেষকে। অনিমেষ জানে সূর্যের মনের অতলের জ্বালাটাকে। মিতার সঙ্গে তার প্রেমের ব্যাপারও জানে অনিমেষ। সীমাও। তারাও সব শুনে অবাক হয়। সীমা বলে, মিতাকে এইভাবে মিথ্যা ষড়যন্ত্রে জড়িয়ে বদনাম করছে ওরা। ও এসব করেনি।

সূর্য বলে, আমিও তাই বিশ্বাস করি। আমি তাই প্রতিবাদ করেছিলাম। আমার মা, সোমপ্রকাশই এসবের মূলে। বাবাকে ওরাই বাধ্য করিয়েছে এইসব করতে। তারই প্রতিবাদ করে আমি সব ছেড়ে চলে এসেছি।

সেকি! সীমাও অবাক হয়।

অনিমেষই বলে, ঠিক করেছিস সূর্য। জনসন কোম্পানিতে ওদের একটা এম বি এ-র দরকার। আজই কথা বলছি ওদের বড় সাহেবের সঙ্গে। ওখানেই কাজ কর। একটা কিছু তো করতে হবে।

কিন্তু মিতার কী হবে? বিনা অপরাধে ও জেলে বাস করবে? কিছু করা যায় না?

অনিমেষ বলে, দেখি চেষ্টা করে, তবে তুই যা বললি তাতে মনে হয় ওরা আটঘাট বেধেই নেমেছে এবং মিতাকে ফাঁসিয়েছে। ওরা নিশ্চয়ই তাদের কাজে কোনো ফাঁক রাখেননি।

তাহলে কি বিনা দোষে ওর সাজা হবে? শুধু আমাকে ভালোবাসার অপরাধে?

অনিমেষ বলে, আইন নিয়ে কাজ করতে গিয়ে দেখেছি, এখন প্রকৃত দোষীদের ধরার আইন কমই, তবে তাদের সাজা দেবার সাধ্য আইনের নেই। তবু দেখি চেষ্টা করে।

মিতার জীবনে এতবড় লাঞ্ছনা আর ঘটেনি। সদাশিব বাবুও অবাক। তাঁর মেয়ে নাকি কোম্পানির সাড়ে তিনলাখ টাকা চুরি করেছে। পুলিশও তাঁর বাড়িতে বাক্স-আলমারি সব সার্চ করে, যদি সেই টাকার সন্ধান পায়। পাড়ার লোকজনও জুটে গেছে। সদাশিববাবুর উঁচু মাথাও হেঁট হয়ে যায়। সদাশিববাবুও রেগে ওঠেন মিতার উপর। বলেন, শেষে তুই চুরি করলি? তুই চোর—

অশ্রুভেজা কণ্ঠে মিতা বলে, না বাবা এসব মিথ্যা ষড়যন্ত্র। বিশ্বাস করো বাবা, আমি এসব করিনি। এসব মিথ্যা কথা।

পুলিশ অবশ্য তাতে ভোলে না। ওরা তুলে নিয়ে যায় মিতাকে। পাড়াপড়শিরা বলে, কী সাংঘাতিক মেয়েরা বাবা! কোম্পানির এত টাকা হেরফের করেছে?

জেল হাজতে রয়েছে মিতা। সূর্য এসেছে তার বন্ধু অনিমেষকে নিয়ে। মিতাও বুঝেছে যে এই অপবাদ দিয়ে তাকে জেলে পুরেছে সূর্যের বাবা-মা-ভাই। সূর্যের জন্যই তার এই চরম শাস্তি। তাই সূর্যকে দেখে আজ মিতা বলে, দেখতে এসেছ, জেলে কেমন আছি?

না, তোমাকে ছাড়াতে এসেছি। সেই চেষ্টাই করবো।

মিতা বলে, পারবে আমার হারানো সুনাম ফিরিয়ে দিতে? পারবে আমার বাবার নিচু মাথাকে আবার উঁচু করতে? গরিব বলে কি আমাদের মানসম্মান নেই? তোমাদের হাতের খেলার পুতুল? তোমাদের সাহায্য চাই না। তুমি যাও, চলে যাও।

আমাকে ভুল বুঝো না মিতা। আমিও এই ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে ওই বাড়ি ছেড়ে। অফিস, ছেড়ে চলে এসেছি।

সূর্যও মিতার কথায় আজ অবাক হয়। মিতার মনে একটা বদ্ধ ধারণাই হয়েছে যে বড়লোকের ছেলেকে ভালোবাসার জন্যই তার ভাগ্যে জুটেছে এই কঠিনতম শাস্তি। অনিমেষও তাকে বোঝাবার চেষ্টা করে। বলে, তুমি ওকালতনামায় সই করে দাও। আমি দেখছি কী করা যায়? এই মিথ্যা ষড়যন্ত্রের জাল কেটে তোমাকে বের করবোই। যা সত্যি তা প্রকাশ পাবেই।

তাতে লাভ কী? ক্ষতি যা হবার হয়ে গেছে অনিমেষ। আমাকে আমার পথেই চলতে দাও। আমার জীবনে সবকিছু হারিয়ে গেছে। ফাটা আয়না জোড়া যায় না।

সূর্য দেখছে মিতাকে। বলে সে, আমার জন্য তোমার এই শাস্তি। আমাকে তার প্রায়শ্চিত্ত করতেই হবে।

তুমি কেন ভুগবে! তুমি তোমার জগতে ফিরে যাও। সেই প্রাচুর্য আর প্রতিষ্ঠার জগতে। ওটাই তোমার জগৎ। আমাকে অন্ধকারে হারিয়ে যেতে দাও। বিচারের প্রহসন আর নাই বা হল।

মিতা আজ ওদের ফিরিয়ে দেয়। হতাশ হয়ে ফিরে আসে সূর্য। যথাসময়ে বিচারও হয়ে গেল। মহামান্য আদালত তাকে দু'বছর কারাদণ্ডের আদেশ দিলেন।

সোমপ্রকাশ বলে, যাও এখন জেলে চাঁদবদনা! সেদিন খুব সতীপনা দেখিয়ে ছিলে।

নিরাপদ বলে, মেয়েছেলের আবার অভাব ছোটসাহেব! ভাত ছড়ালে কাকের অভাব হয় না। কত নেবেন?

দিশাই এখন নিজে অফিস-কারখানায় আসছেন। কাজকর্ম দেখছেন। বিজনবাবুর শরীর-স্বাস্থ্য ভালো যাচ্ছে না। সারা জীবন ধরে কঠোর পরিশ্রম করে আজ কারখানাকে প্রথম শ্রেণির কারখানায় পরিণত করেছেন। এবার তাঁর দেহ ভেঙে পড়েছে। আরও সূর্যও চলে গেছে এই বাড়ি ছেড়ে। সে আর আসে

না। বিজনবাবু দেখেছেন, সে অন্য একটা কোম্পানিতে কাজ নিয়েছে। আর একা সেই কোম্পানির কোয়ার্টারেই থাকে একটা কাজের লোককে নিয়ে।

দিশার প্রধান উপদেষ্টা এখন নিরাপদবাবু। বিজনবাবুর বাড়িতেও আসে নিরাপদবাবু। সাহেবের খবরাখবর নেয়। আর তার চেনা ডাক্তারদেরই নিয়ে আসে মোটা টাকা ভিজিট দিয়ে। দিশাও জানেন বিজনবাবুকে বাড়িতে আটক রাখতে হবে। সূর্য আইনত এই সব কিছুর অর্ধেকের মালিক। ওরা চেষ্টা করে সূর্যকে যাতে ত্যাজ্য পুত্র করেন বিজনবাবু।

দিশা তাই ডাক্তারবাবুকে বলেন, ওঁকে কমপ্লিট বেড রেস্ট নিতে বলুন। ব্যবসার কাজ নিয়ে মাথা ঘামিয়ে ওঁর প্রেশার, সুগারও বেড়েছে।

ডাক্তারও সেইমতো তাঁকে রেস্ট নেবার কথাই বলেন।

নিরাপদ এখন প্রমোশন পেয়ে হয়েছে কারখানার চিফ ফাইনান্স অফিসার। দিশা বিজনবাবুর চেম্বারেই বসছেন। বিজনবাবুর নামের বোর্ডটা তুলে সেখানে লাগানো হয়েছে দিশার নামের বোর্ড। আর সোমপ্রকাশ এখন তার নিজের চেম্বারে বসেই মদ্যপান করে। অফিসে দু'একজন নতুন মেয়েকেও চাকরি দিয়েছে। তার পি এ জুলির সঙ্গে চেম্বারে বসেই প্রেম প্রেম খেলা করে। আর নিরাপদ এখন সাপ্লায়ারদের কাছ থেকে দু'হাতে টাকা খাচ্ছে। তৈরি মালও ভুয়ো চালানে বাইরে বিক্রি করছে। আর কোম্পানিতে টাকাও এবার কম আসছে। ব্যাঙ্কের টাকাও কয়েক কিস্তি জমা পড়েনি। স্টাফদের প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকাও পুরো দেয়নি।

নিরাপদ একা খায় না, তার টাকার ভাগ দেয় দিশাকে। আর সোমপ্রকাশকে এনে দেয় দামি স্কচ। বিজনবাবু বাড়িতে বিছানায় শুয়ে খবর নেন কোম্পানির। নিরাপদ, দিশা তাঁকে মিথ্যা খবর দেয়।

সূর্য এখন যে কোম্পানিতে রয়েছে, তারাও এসব মাল তৈরি করে। দেখে সূর্য, ওই কোম্পানি এখন বাইরে থেকেও বহু তৈরি মাল সস্তা দরে কিনছে। সে সব মাল আসছে সূর্যদের কারখানায়। সূর্য সে সব মাল কিছু হাতে পায়। দেখে তাতে সই রয়েছে নিরাপদবাবু, না হয় সোমপ্রকাশের। তাদের কোম্পানির মাল, এভাবে বেআইনিভাবে বের হয়ে আসছে।

সূর্য এবার বুঝেছে তাদের কারখানায় এবার সরষের মধ্যেই ভূত ঢুকেছে। আর এসবের মূলে রয়েছে তার সৎমা, সোমপ্রকাশ আর সেই ধূর্ত নিরাপদবাবু। এসব সর্বনাশের ভয়ই করেছিল সূর্য। কিন্তু সে এসব প্রমাণ সংগ্রহ করে চলেছে। এছাড়া তার আর করার কিছুই নেই।

সূর্য এর মধ্যে দু-একবার জেলেও গেছে মিতার সঙ্গে দেখা করতে।

কোম্পানির মালের কোয়ালিটিও এবার খারাপ হয়েছে। শ্রমিকরাও এখন প্রতিবাদ করলে তাদের উপর নিরাপদবাবু, সোমপ্রকাশ নানাভাবে অত্যাচার করে। বরখাস্ত করে। আর এবার বিদেশ থেকে প্রচুর মাল ড্যামেজ-ডিসপুট বলে ফেরত আসে। ব্যাঙ্কও নোটিশ দিয়েছে টাকার জন্য। শ্রমিকদের প্রভিডেন্ট ফান্ড জমা না দেওয়ার জন্য কড়া চিঠিও এসেছে। সাসপেনশন অব ওয়ার্ক নোটিশ দিয়েছে সরকার। প্রচুর ট্যাক্সও বাকি পড়ে গেছে।

শ্রমিকরাও এবার বিরাট মিছিল করে এসে হাজির হয়েছে বিজনবাবুর বাড়িতে। তারা শ্লোগান দিচ্ছে। দিশা, সোমপ্রকাশ পুলিশ ডেকে ওদের ওপর লাঠিচার্জ করায়। এসে পড়েন বিজনবাবু নিজে। তিনিও অবাক হন এই ঘটনা দেখে। এবার শ্রমিক নেতা, কারখানার কিছু সৎ কর্মীরাই কারখানার এই শোচনীয় অবস্থার কথা জানান বিজনবাবুকে।

অসুস্থ বিজন সেন নিজে এসেছেন কারখানায় বেশ কিছুদিন পর। দেখেন কারখানার এই অবস্থা। অবাক হন তিনি। আর সোমপ্রকাশের চেম্বারে ঢুকে দেখেন সোমপ্রকাশ তখন মদের বোতল থেকে গ্লাসে মদ ঢেলে খাচ্ছে। জুলির সঙ্গে প্রেমের নাটক করছে। বিজনবাবু কোম্পানির শীর্ষমহলে এহেন অনাচার দেখে অবাক হন। এবার কাগজপত্র দেখে আরও ঘাবড়ে যান তিনি। প্রচুর টাকা সরে গেছে। কোম্পানির অবস্থা এখন শোচনীয়!

বিজনবাবু এবার বুঝেছেন যে সত্যিই তিনি বিপদে পড়েছেন। তাঁর জীবনভর চেষ্টায় গড়ে তোলা কারখানাকে এবার টিকিয়ে রাখতে পারবেন কিনা তাও জানেন না। শরীরও ভেঙে পড়েছে। বিজনবাবুও চটে উঠে স্ত্রীকে বলেন, এইভাবে নিজেদের সর্বনাশ ডেকে আনলে কেন? নিরাপদকে এতখানি বিশ্বাস করেছিলাম, এবার তারই ফল ভোগ করতে হবে।

সোমপ্রকাশও বাবার সামনে চুপ করে থাকে। বিজনবাবু বলেন, ওই নিরাপদকে আমি স্যাক করছি। ওর নামে পুলিশেই অভিযোগ দায়ের করবো। একা ওই একটা লোকের জন্যই কোম্পানির সর্বনাশ হতে চললো। এত লোকের রুজি-রুটি মারা পড়বে।

নিরাপদও বসে নেই। সে প্রথম থেকেই আটঘাঁট বেঁধে কাজ করেছে। তাই সব সইসাবুদও সোমপ্রাকাশকে দিয়ে করিয়েছে। নিজে থেকেছে ধরাছোঁয়ার বাইরে। সে প্রতিটি অন্যায় কাজে জড়িয়ে রেখেছে সোমপ্রকাশকে, না হয় ম্যানেজিং ডিরেক্টর দিশাকে। আর নিজেই এখন কোম্পানির কাজ ছেড়ে দিয়ে নিজের ব্যবসাপত্র চালু করেছে একেবারে ধোয়া তুলসীপাতা সেজে। উলটে সেই কেস করেছে যে কোম্পানি তাকে বিনাদোষে স্যাক করেছে। তার প্রাপ্য টাকা— প্রভিডেন্ট ফান্ড এসব দেয়নি।

এমনিতে তারা কর্মচারীদের প্রভিডেন্ড ফান্ডে গত তিন বছর কোনো টাকাই জমা দেয়নি।

বিজনবাবুও এবার বিপদেই পড়েছেন। সবাই এবার তাদের বকেয়া টাকার জন্য হুমকি দিচ্ছে।

মিতার জেল থেকে বের হবার দিন এগিয়ে আসছে। জেলখানায় মাঝে মাঝে আসে সূর্যপ্রকাশ। মিতার জন্য বই আনতো। মিতা বইগুলো নিত। মিতা জেলে এসে বেশ বদলে গেছে। জেলে বসে সেও এম.এ পরীক্ষা দেবার জন্য তৈরি হতে থাকে। সূর্য জেলেও তাকে উৎসাহ দেয়।

সূর্য মনে করে তার জন্যই বিনা অপরাধে মিতাকে এত বড় শাস্তিটা মেনে নিতে হয়েছে। এই ব্যাপারে তার নিজের দায়িত্বটুকুও সে অস্বীকার করতে পারে না। সূর্যপ্রকাশ বলে, জেল থেকে বের হয়ে আমার ওখানেই যাবে তুমি। আমরা ঘর বাঁধবো। মিতা, তোমাকে জীবনে সুখী দেখতে চাই।

সূর্যও মিতার মুক্ত হবার দিন গোনে। তার বাড়িতে একটা আলাদা ঘর রেখেছে মিতার জন্য। মুক্তি পাবার দিন অনেক আশা নিয়ে সূর্য শোনে জেলে এসে, মিতা রায় জেল থেকে আজ সকালেই বের হয়ে গেছে। সূর্য হতাশ হয়ে ফেরে। তার মনে হয় মিতা তাদের বাড়িতেই ফিরে গেছে। সেও গাড়ি নিয়ে ছোটে মিতার বাড়ির দিকে।

মিতা জেল থেকে বের হয়েছে। সে দেখেছে জেলে বসেই তার বাবা আসতেন মাঝে মাঝে। মিতার বাবা পেনশন পান সামান্যই। মিতার রোজগারেই তাদের সংসার, ভাইবোনদের লেখাপড়া এসব চলতো। সদাশিববাবুও মিতার চাকরি যেতে বিপদে পড়েছেন সবদিক থেকেই। এই পাড়াতে তিনি অনেক দিন ভাড়া আছেন। সম্মানের সঙ্গেই বাস করেছেন এখানে। এবার মিতাকে নিয়ে নানা কুৎসা কাহিনিও প্রচার হতে থাকে এখানে। পাড়ার ছেলেমেয়েরাও সদাশিবাবুর ছেলেমেয়েকে নানা বিশ্রী কথা বলে।

একদিকে অভাব— অন্যদিকে এই বদনাম সহ্য করে তবু সদাশিববাবু বাঁচার চেষ্টাই করেছিলেন। বৃদ্ধ বয়সে টুকটাক কাজের চেষ্টা করতেন—দু'একবার তবুও মেয়েকে দেখতে জেলেও আসেন।

কিন্তু তাঁর জীবনীশক্তি এই হতাশায় যেন ফুরিয়ে আসছে। সংসারে এসেছে নগ্ন দারিদ্র্য। শহরে আর থাকা যাবে না। তাই তিনি ভাবছেন এবার শূন্য হাতেই ফিরে যেতে হবে দেশের বাড়িতে অন্তহীন দারিদ্র্যের মাঝে। তা অবশ্য হয়নি। ক'দিন জ্বরে বিনা চিকিৎসাতেই তিনি মারা যান। তারপর তাঁর অসহায় স্ত্রী— ছেলেমেয়েকে নিয়ে এখানে আর থাকতে পারেননি, তিনি এই বাড়ি ছেড়ে ফিরে গেছেন দূর প্রত্যন্ত গ্রামে।

মিতা জেলে বসে শুনছিল তাদের সংসারের অভাব-অনটনের কথা। বাবার মৃত্যুসংবাদও জেলে বসেই পেয়েছিল। মিতার সবই হারিয়ে গেছে। তারপর সে আর মা-ভাইবোনদের কোনো-খবরও পায়নি। জেল থেকে ছাড়া পাবার আগেই সেও ভেবেছিল কলকাতা বড় শহর। এর মধ্যে জেলে

বসেই সে এম.এ পাশও করেছে। সূর্যই খবরটা আনে। মিতা বলে, আজ বাবা নেই, তিনি শুনলে সবচেয়ে বেশি খুশি হতেন।

মিতা ভেবেছে এবার জেল থেকে বের হয়ে কলকাতায় কোনো অফিসে চাকরির সন্ধান করতে হবে। তাকেই মা, অসহায় ভাইবোনদের দায়িত্ব নিতে হবে। সূর্যকে সে এখানে আসতে বার বার নিষেধ করেছে। বড়লোকের ছেলে। এখন অন্য বড় কোম্পানির পদস্থ অফিসার। তার মতো জেলফেরত দাগী মহিলার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক থাকাটা সূর্যের পক্ষেই অপমানের। তাছাড়া ওই ভদ্রবেশী মানুষগুলোর সম্বন্ধে মিতার মনে জন্মেছে চরম ঘৃণা। তাই সে সূর্যকে না জানিয়ে জেল থেকে চলে এসেছে তাদের পুরনো পাড়ায়।

কিন্তু মিতা তাদের পুরনো বাড়িতে এসে অবাক হয়। বাড়িটা এখন রং করা হয়েছে। বেল বাজাতে এক বয়স্ক মহিলা বের হয়ে আসে। মিতা বলে, আমার মা-ভাইবোন এখানে থাকে।

মহিলা বলে, ওমা! শুনেছিলাম বটে আগের ভাড়াটিয়ার একটি মেয়ে কী সব চুরির দায়ে জেলে রয়েছে। তা তুমি সেই মেয়ে? চমকে ওঠে মিতা। ভদ্রমহিলা আরও বলে, তোমার মা-ভাইবোনেরা তো মাসতিনেক আগে ভাড়া দিতে না পারায় উৎখাত হয়ে গেছে। আমরা নতুন ভাড়া এসেছি। এখানে ওরা থাকে না।

মহিলা যেন চুরির ভয়েই মুখের উপর দরজাটা দড়াম করে বন্ধ করে দিল।

মিতা নেমে আসে আবার পথে। আজ মা-ভাইবোনেরাও তার জীবন থেকে যেন হারিয়ে গেছে। এতবড় পৃথিবীতে সে আজ নিঃসঙ্গ—একা। জীবনটা মিতার অসহ্য হতাশার যন্ত্রণায় বিবর্ণ হয়ে ওঠে। সে জানে না কোথায় যাবে। এত বড় শহর— এত বড় বড় বাড়ি, কিন্তু তার জন্য কোথাও এতটুকু আশ্রয় নেই। এই মহানগর যেন তাকে আজ ঠাঁই দিতে অস্বীকার করছে।

ঘুরতে ঘুরতে এসেছে হাওয়া স্টেশনে। মিতার কোনো গন্তব্য ঠিকানাও নেই। সামনে দাঁড়িয়ে থাকা একটা ট্রেনে উঠে বসে। ক্রমশ ট্রেনের ভিড়ও বাড়তে থাকে। চলতে থাকে ট্রেনটা। নামারও আর উপায় নেই।

ট্রেনটা মহানগর ছাড়িয়ে ছুটে চলেছে গ্রাম— মাঠের বুক চিরে। মিতা দেখছে সবুজ শান্ত-ছায়াঘন গ্রাম— সবুজ-হলুদ ধানক্ষেত — আকাশে সাদা মেঘের আনাগোনা। মনটা যেন এই উদার সবুজ পৃথিবীতে এসে কেমন বদলে যায়।

সূর্যও এসেছে মিতাদের সেই আগের বাড়িতে মিতার সন্ধানে। সূর্যকে দেখে সেই বয়স্ক মহিলাই দরজা খুলে দেয়। সূর্য মিতার খবর নিতে এবার বুড়ি গর্জে ওঠে, এ তো দেখছি মেয়েটার পাঠানো গুণ্ডার দলেরই লোক! ওরে বাবা— গুণ্ডা! বাঁচাও— বাঁচাও—

ওর চিৎকারে পাড়ার লোকজনও ছুটে আসে। সূর্য ভাবতেও পারেনি যে মিতার মা-ভাইবোনরা এই বাড়ি ছেড়ে আগেই চলে গেছে। এবার জানতে পারে সে ব্যাপারটা।

পাড়ার উৎসাহী লোকরাও এহেন একজন গুণ্ডার সন্ধান পেয়ে এবার যেন ক্ষেপে ওঠে। কোনোমতে তাদের প্রকৃত ঘটনাটা বলে রেহাই পায় সূর্য।

ট্রেনটা ছুটে চলেছে। তখন বিকেল নামছে। বাইরের জগতের রূপটাও এখন বদলে গেছে। সবুজ আদিগন্তপ্রসারী ধানক্ষেত আর নেই। এখানে চারিদিকে শালবন আর ছোট-বড় পাহাড়। কোথাও নদীর বালুখেত বেয়ে চলেছে জলধারা। পাহাড় ঘেরা একটা সুন্দর উপত্যকার মধ্যে স্টেশনটা। ছোট স্টেশন। ওদিকে উপত্যকায় কিছু সবুজ-হলুদ ধানক্ষেত— গাছগাছালিও রয়েছে। কিছু বসতি। স্টেশনের নাম নিশ্চিন্তপুর।

মিতা কি ভেবে এখানেই নেমে পড়ে। ট্রেনটাও সিটি বাজিয়ে চলে যেতে সারা স্টেশনে যেন সন্ধ্যা নামে। ছোট স্টেশনের বাইরে একটা শাল-মহুয়া গাছের নীচে দু -তিনটে চা-বিস্কুট, অন্যান্য খাবারের দোকান। মিতার খেয়াল হয় কি যেন একটা ঘোরের বশে সে কলকাতা ছেড়ে বহু দূরে এই

অজানা-অচেনা জায়গায় এসে পড়েছে। ফেরার ট্রেনও এখন নেই। আর ফিরে যাবেই বা কোথায়! তাই এখানেই যদি কোনো আশ্রয় পায় তারই সন্ধান করতে হবে।

দোকানদাররা দেখছে মিতাকে। লোকজনও আর বিশেষ নেই। দোকানদারই বলে, আশ্রমে যাবেন তো দিদি?

মিতা চাইল। ওর মুখে আশ্রমের কথা শুনে বলে, এখানে আশ্রমও আছে? তা কাদের আশ্রম?

দোকানদার বলে, আপনি নতুন এখানে?

হ্যাঁ।

মিতার কথায় দোকানদার বলে, ওই নদীর ওদিকে রয়েছে মাতাজীর আশ্রম। সেখানে ছেলেমেয়েদের ইস্কুল-হাসপাতাল সব আছে। মাতাজীও মানুষ নয়— সাক্ষাৎ দেবী। তার দয়াতে এই নিশ্চিন্তপুর এলাকার মানুষ নিশ্চিন্তে আছে। আশ্রমে যাবেন তো?

ওদিক থেকে একটা ঘোড়ায় টানা টাঙা নিয়ে আসছে একটা মেয়ে। সেই টাঙাওয়ালীকে বলে দোকানদার, অ্যাই ফুলমতী, দিদিকো মাতাজীকা আশ্রমমে লে যাও।

নদীর ধারে ছোট সুন্দর পরিবেশে সবুজের সমারোহ। তার মাঝে গড়ে উঠেছে মাতাজীর আশ্রম। বহুদিন আগে মাতাজী এখানে এসে এই নির্জন উপত্যকায় একটা কুটির গড়ে রয়ে যান। সংসার তাঁকে ফিরিয়ে দিয়েছিল। সংসারের সেই জ্বালা ভোলার জন্য সাবিত্রী কলকাতা ছেড়ে চলে এসেছিলেন । এরই কাছে ছোট শহরে তাঁর বাবার বাড়ি। সাবিত্রী দেখেছিলেন অর্থ আর প্রতিষ্ঠার নেশা মানুষকে একেবারে বদলে দেয়। তাঁরও সবকিছু কেড়ে নিয়েছে এই সংসার।

সেদিন এখানের জমিদার বিকাশবাবুই তাঁকে এই উপত্যকায় বিশাল জায়গাটা দিয়েছিলেন আশ্রম করার জন্য। এই অঞ্চলে বিকাশবাবুদের প্রচুর সম্পত্তি। তাঁদের বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছে পাহাড়ের ওদিকে আরও বিস্তীর্ণ বন-পাহাড় অঞ্চলে।

মিতা এসে পড়েছে আশ্রমে। ওদিকে আরতির সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বলে উঠেছে। একপাশে বিশাল তিনতলা ছাত্রাবাস, মন্দির। মন্দিরের সামনে বিশাল নাটমন্দির। সবুজ মাঠ— ওদিকে বাগান। এখন মাঠে আশ্রমের ছাত্রছাত্রীদের ভিড়। শিক্ষক-শিক্ষিকারাও রয়েছেন। ওদিকে একটা উঁচু চেয়ারে বসে আছেন সৌম্যদর্শন গেরুয়া পোশাক পরা এক মহিলা।

প্রার্থনা সঙ্গীত চলেছে। সুন্দর এই পরিবেশে সুরটা যেন ধ্বনি- প্রতিধ্বনি তোলে। প্রার্থনা সঙ্গীতের পর ওরা যে যার ছাত্রাবাসে ফিরে যায়। মাতাজী তখন আশ্রমের কর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করছেন।

বিকাশবাবুও আসেন এই শান্তির পরিবেশে। এখন তাঁরও বয়স হয়েছে। সারা জীবন ধরে পরিশ্রম করে তিনি যে সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছেন, এখন তাঁর ছেলে সুশান্তই সে সব দেখাশোনা করে। সেও বাবার এই ব্যবসা আরও বাড়িয়েছে। আর বাবার চেয়েও হিসাবী। সুশান্তও দেখেছে যে তার বাবা কলকাতায় একটা বড় ফার্মে প্রচুর টাকাও দিয়েছেন। আইনত তিনি তার অর্ধেকের মালিক। তবে তাঁর বন্ধু বিজন সেন সেই টাকা শোধ করেননি। তাই বিকাশবাবুও ওদিকে আর নজর দেননি। এখানেই তিনি তাঁর সাম্রাজ্য গড়েছেন।

এবার বিকাশবাবু ছেলেকেই তাঁর বিষয়-আশয়ের ভার দিতে এ যুগের ছেলে সুশান্ত এবার তাদের কলকাতায় সেই কোম্পানির অংশীদার হিসাবে তাদের নোটিশ দেবার কথাও ভাবছে। বিকাশবাবু তবু বলেন, তোর তো অভাব নেই! ওদিকে বিজন যা করছে করুক।

সুশান্ত বলে, তোমার বন্ধুর এতবড় একটা দোষকে আমি ক্ষমা করতে পারি না বাবা।

বিকাশবাবু জিজ্ঞাসা করেন, কী দোষ?

সুশান্তও মাতাজীকে খুবই শ্রদ্ধা করে। সেও বিশ্বাস করে যে ওই দেবীর আশীর্বাদেই তাদের হাতের ধুলকুটো এখন সোনা হয়ে উঠেছে। তারাও আশ্রমের জন্য প্রচুর টাকা দেয়। সুশান্ত বলে, ওই মাসিমার উপর তিনি অন্যায় অত্যাচার করেছেন। তাঁর নিজের সন্তানও কেড়ে নিয়েছেন। সেই দেবীর

মতো স্ত্রীকে পথে বের করে দিয়েছেন। এখন তোমার টাকাতে কারখানা গড়ে রাজত্ব করছেন। তাই সেই রাজত্বে আমিও আমার পাওনা মিটিয়ে নিতে চাই।

বিকাশবাবু বলেন, এখন ওসব ভাবনা ছেড়ে নতুন অটোমেটিক মেশিন বসিয়ে কারখানার গুণমান বাড়া। টাকার তো অভাব নেই। আর বেশি লোভ নাই বা করলি।

বিকাশবাবু কোনোমতে থামিয়ে রেখেছেন সুশান্তকে। তবু সুশান্ত চায় তাদের টাকা ফিরিয়ে আনতে। তাই সে তার কলকাতার ম্যানেজারদের বিজনবাবু সম্বন্ধে খোঁজখবর নিতে বলে।

বিকাশবাবু আর ব্যবসাপত্র দেখেন না। তিনিও প্রায়ই নিজের গাড়ি নিয়ে চলে আসেন আশ্রমে। এই ছেলেমেয়েদের মধ্যে শিক্ষার আলো বিস্তারের কাজ আর হাসপাতালে আর্ত মানুষের সেবার কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেছেন।

ওসব বিষয় নিয়েই কথা হচ্ছে। এমন সময় মাতাজীর কাছে মিতা এসে প্রণাম করে। মাতাজী চাইলেন। দেখলেন মিতাকে। মুখে-চোখে নীরব যন্ত্রণার ছায়া। অন্তর্যামী ওই মহিলা যেন এক নজরে মিতার অন্তরের বেদনাটাকে দেখতে পান। বলেন তিনি, খুব যন্ত্রণা তোর, না রে মা?

মিতা অশ্রুভেজা কণ্ঠে বলে, হ্যাঁ মা। জীবনে সব আমার হারিয়ে গেছে। এতবড় পৃথিবীতে আমার কোনো আশ্রয় নেই।

সাবিত্রী দেবী বলেন, না-মা। যিনি সব নেন, তিনিই আবার সব ফিরিয়ে দেন।

আর আশ্রয়, তুমি এখানেই থাকবে। আশ্রমের কাজ করো, দেখবে সবহারাদের মাঝেই আবার শান্তির স্পর্শ, জীবনের সব আশা-স্বপ্নকে আবার ফিরে পাবে।

মিতা যেন ওঁর কথায় কী আশ্বাস পায়। বলে সে, তার অতীত জীবনের ইতিহাস। বিকাশবাবুও সব শুনেছিলেন। বলেন তিনি, আমাদের গার্লস স্কুলের শিক্ষিকার দরকার। ঠাকুর হয়তো তাই তোমাকে এনে দিয়েছেন।

সাবিত্রী দেবী ওদিকের এক সন্ন্যাসিনীকে বলেন, যোগমায়া, তুমি একে ছাত্রীনিবাসে থাকার ব্যবস্থা করো।

মিতা সেই যোগমায়া দিদির সঙ্গে চলে গেল ছাত্রীনিবাসের দিকে। সেও অবাক হয়েছে, আজ সেও জানতো না তার আশ্রয় হবে কোথায়। এখন মনে হয় কোনো অদৃশ্য হাতের ইঙ্গিতেই যেন এসব হয়ে চলেছে।

তার অবিশ্বাসী মনও আজ এই সুন্দর পরিবেশে এসে কেমন বদলে গেছে একদিনেই।

সূর্য হতাশ হয়ে ফিরে এসেছে তার ফ্ল্যাটে। মিতার কোনো খবরই সে পায় না। তবু বাঁচার তাগিদে মানুষকে কাজ করতে হয়। তাকে অফিসে বারে হতে হবে। হঠাৎ এমন সময় একটা গাড়ি এসে তার বাড়ির সামনে থামে। সূর্য ভাবে তার অফিসের গাড়ি এসেছে। সে তৈরি হয়ে বের হয়ে চমকে ওঠে, আপনি! অস্ফুট কণ্ঠে বলে সূর্য। তার বাড়ি খুঁজে খুঁজে এসেছেন স্বয়ং বিজন সেন।

আজ তিনি অন্য মানুষ। শরীর ক্লান্ত, অসুস্থ তিনি। এখন সম্পূর্ণ অসহায় জীর্ণ একটা মানুষ। সেদিনের সেই বলিষ্ঠ শক্ত মানুষটা আজ একেবারে বদলে গেছেন।

সূর্য বলে, একি চেহারা হয়েছে আপনার? আপনি খবর দিলে আমিই যেতাম।

বিজন দেখছেন সূর্যকে। সূর্যকে তিনি বঞ্চিত করেছেন সবকিছু থেকে।

বিজনবাবু বলেন, তোমার কাছে ক্ষমা চাইবার মুখও নেই সূর্য। সেদিন আমিও বিভ্রান্ত হয়েছিলাম। অবিচার করেছিলাম তোমার উপর। আজ আমার ভুল ভেঙেছে— ওই সোমপ্রকাশ, দিশার জন্যই আজ আমার সারা জীবনের অক্লান্ত পরিশ্রমে গড়ে তোলা কারখানা এবার উঠে যেতে বসেছে। নিরাপদ ওদের দুজনকে হাতে এনে মিতাকে মিথ্যা চোর অপবাদ দিয়ে জেলে পাঠাল। ওরাই কারখানার সর্বস্ব চুরি করে আজ কারখানাকে সিক করে তুলেছে। লাখ লাখ টাকার ট্যাক্স, প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা— ব্যাঙ্কের লোন ফেরত দেয়নি। তারপর এবার বিকাশের ছেলে সুশান্তও তাদের

কারখানার হিসাব বুঝে নিতে চায়। ওদের প্রাপ্য না পেলে ওরা কারখানা বন্ধ করে দেবে। আজ আমি দেউলিয়া হয়ে গেছি সূর্য—

সেকি! সূর্যও ভাবেনি যে সত্যিই এত শীঘ্র এতবড় সর্বনাশ ঘটবে। আজ অসহায় বিজনবাবুকে দেখে তারও কষ্ট হয়, তাই সে বলে, কিন্তু আমি কী করতে পারি?

আমার সম্বল নেই, শরীরও ভেঙে পড়েছে— যদি তুমি গিয়ে বিকাশবাবুকে ধরতে পারো, হয়তো এই সমস্যার কিছুটা সুরাহা হতে পারে। আমি সেদিন তাঁকেও শূন্য হাতে ফিরিয়ে দিয়েছি। আজ তাঁকে এসব কথা বলার মুখও আমার নেই। তিনি তোমাকে চেনেন, ভালোবাসেন। তুমি যদি তাঁর কাছে গিয়ে এসব কথা বলো—হয়তো তিনি ব্যবস্থা করবেন। যদি তুমি যাও!

সূর্য বলে, কোম্পানির বর্তমান অবস্থার কথা আমি জানি না। সোম তো এসব জানে। সে যদি যায়।

বিজনবাবু বলেন, তারা তো চায় এই কোম্পানিকে সিক করে তোমাকে, বিকাশবাবুদের বঞ্চিত করে নিরাপদের পছন্দমতো কোনো ব্যবসায়ীকে বিক্রি করে কিছু টাকা হাতিয়ে নিতে। তাকে আর আমি এতটুকু বিশ্বাস করি না। তাই তোমার কাছেই ছুটে এসেছি সূর্য, আমার শেষ আশা তুমিই। তুমি যদি না যাও— আমাকে সব হারানোর লজ্জায় আত্মহত্যাই করতে হবে। এই আমার পাপের যোগ্য শাস্তি।

সূর্য দেখছে ঐ অসহায় মানুষটাকে। বলে, আপনি ভাববেন না। আমি নিজে গিয়ে বিকাশবাবুকে সব কথা বলবো। তবে তার আগে আমার কোম্পানির প্রকৃত অবস্থাটা জানা দরকার। তাতে সমাধানের পথ বের হতে সুবিধাই হবে।

বিজনবাবু হাতের এটাচিটা দিয়ে বলেন, এতে সব কাগজপত্র, চিঠি সবই আছে। গত বছরের কোম্পানির ব্যালান্স সিট— পি. এফ অ্যাকাউন্ট রয়েছে। দেখবে আমার স্বপ্নকে ওই শয়তানের দল কিভাবে ছারখার করে দিয়েছে।

সূর্য সেদিন সন্ধ্যাবেলাতেই অফিস ফেরত চলে যায় অনিমেষের কাছে ওই সব কাগজপত্র নিয়ে। এই সমস্যার সমাধানে ওর আইনি পরামর্শও জরুরি। তারপর সব সমাধান পথের সন্ধান করে সূর্য যাবে সেই পাহাড়-বনের অঞ্চলে বিকাশবাবুর ওখানে। দেখবে শেষ চেষ্টা করে। যদি কিছু করা যায়।

বিকাশবাবু এখানে অন্য একটি বাড়িতে থাকেন। ব্যবসাপত্রের খোঁজখবরও রাখেন না। সুশান্তই এখন সব দেখাশোনা করে। সূর্যও কখনো এর আগে বিকাশবাবুর এই পার্বত্য অঞ্চলে আসেনি। তবু আজ প্রয়োজনে তাকে আসতে হয়েছে। শহরের কোনো একটা ছোট হোটেলে উঠেছে সে। পাহাড় ঘেরা সুন্দর উপত্যকার ছোট এই শহর।

মিতা এসেছে নিশ্চিন্তপুর আশ্রমে। এখানে এসে সে নতুন পরিবেশে নিজেকে খুঁজে পেয়েছে। আর কাজের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিয়েছে সে এসে ক'মাসের মধ্যেই। তার গানে— তার কাজের মধ্যে দিয়ে আশ্রমের প্রধান সাবিত্রী দেবীরও প্রিয়পাত্রী হয়ে উঠেছে। প্রার্থনা সভায় এখন মিতাকেই গান গাইতে হয়। তার কাজে আবার সুর এসেছে। এসেছে নতুন করে বাঁচার আশ্বাস।

সাবিত্রীও এখন মিতাকে দেখে খুশি হন। প্রথম যেদিন সে এসেছিল সব হারিয়ে, আজ সেই হতাশা তার জীবনে নেই। এই পরিবেশ যেন মিতাকে তার সুপ্ত আশা স্বপ্নকে জাগ্রত করে তুলেছে। বিকাশবাবুও আসেন রোজ আশ্রমে। বিকাশও মিতাকে দেখছেন। মিতাও বিকাশবাবুর মধ্যে যেন বাবার স্মৃতি ফিরে পেয়েছে। বিকাশবাবুও ছেলেমেয়েদের কাছে আপনজন।

সাবিত্রী জীবনে বহু কষ্ট, আঘাত নিয়েই এখানে এসেছিলেন। এখন এই আশ্রমই তাঁর সংসার— এরাই তাঁর আপনজন। সাবিত্রীও যেন এই ছেলেমেয়েদের মধ্যে তাঁর হারানো সন্তান সূর্যকে ফিরে পেয়েছেন। তবু মনে পড়ে তাঁর ছেলের কথা। এখন কোথায় আছে, কী করছে তাও জানা নেই। বিকাশবাবুও আর কলকাতা যান না। ওসব তাঁদের জীবন থেকে হারিয়ে গেছে। তবুও মন মানে না সাবিত্রীর। তিনি সব কিছুকে ভুলে এদের নিয়েই থাকতে চান।

সেদিন বিকাশবাবু আশ্রমে এসেছেন। আশ্রমের জমিতে একটা ছোট বাংলো তাঁর আছে। বিকাশবাবু সংসার ছেড়ে এই শান্তির পরিবেশেই থাকেন। সেখানেই এসে হাজির সূর্য বিকাশবাবুর সন্ধানে। বিকাশবাবু ক'দিন তাঁর অন্য উপত্যকার বাড়িতে রয়েছেন। তাই আশ্রমের গেস্ট হাউসে থাকতে হয়েছে সূর্যকে। বাবার সেই কারখানাকে বাঁচাতে হবে। গেস্ট হাউসের ব্যবস্থাও সুন্দর। অন্য আবাসিকদের মতো সূর্যও সন্ধ্যায় যায় মন্দিরে। দেখে আশ্রমের প্রতিষ্ঠাত্রী সেই সৌম্যদর্শন মহিলাকে। বয়স হয়েছে তবু তাঁর মুখে স্নেহের স্পর্শ। অন্যদের মতো সূর্যও প্রণাম করে তাঁকে।

সাবিত্রী শুধোন, নতুন এসেছো বাবা?

হ্যাঁ মা। বিকাশবাবুর সঙ্গে দেখা করতে হবে। তাই রয়েছি গেস্ট হাউসে। কাল ফিরলে দেখা করবো।

কোনো অসুবিধা হচ্ছে না তো বাবা? গরিবের সংসার আমাদের।

না-মা। বেশ ভালোই আছি।

ওদিকে তখন প্রার্থনা সঙ্গীতের আয়োজন হচ্ছে আশ্রমে। সন্ধ্যা বন্দনার সুর ওঠে। সুরটা যেন সূর্যের খুব চেনা। সেও সেই ছাত্রছাত্রীদের ভিড়ে এগিয়ে যায়। আর চমকে ওঠে। গাইছে যে মেয়েটি সে আর কেউ নয় মিতাই। ওই গান আগেও শুনেছে সূর্য মিতার গলায়। আজ এতদিন পর হারানো মিতাকে এসে খুঁজে পেয়েছে। অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সূর্য দূরে ভিড়ের মধ্যে। মিতা ফিরছে তার ছাত্রীনিবাসের দিকে।

পথটা নির্জন, হঠাৎ কার ডাকে চাইল মিতা, দেখে আবছা আলোয় এগিয়ে আসছে সূর্য— মিতা।

মিতাও সূর্যকে এখানে দেখে অবাক হয়। —তুমি! এখানে?

মিতা আমি অনেক খুঁজে তোমাকে পেয়েছি। ঈশ্বরই তোমাকে পাইয়ে দিয়েছেন। তোমাদের এম.ডি. মি বিজন সেন তাঁর অফিসের কাগজপত্র দেখে জানতে পেরেছেন যে তুমি নির্দোষ। ওই নিরাপদবাবু সোমপ্রকাশের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছিলে তুমি। ওদের বিরুদ্ধেই তিনিও আইনি ব্যবস্থা নিতে চেয়েছেন। আমি জানতাম তুমি নির্দোষ— আজ সেই সত্যটাই প্রকাশিত হয়েছে।

মিতা বলে, তাতে আমার কি হারানো সেই সুনাম, সেই দিনগুলো আর ফিরে পাব সূর্য! তবে ওসব জেনে আর লাভ কী। যা অতীত তা অতীতই থাক। তুমি ফিরে যাও।

সূর্য বলে, জানি আমাকে ভালোবেসেই তোমার এই কঠিন শাস্তি হয়েছে। আমাকে তোমার এইসব হারানো দুঃখকে ভুলিয়ে দিতে দাও মিতা। আমি ওসব ছেড়ে এসেছি। দুজনে আমরা নতুন করে বাঁচতে চাই। আমার উপর অভিমান করে আমার ভালোবাসাকে ব্যর্থ করে দিও না। নিজেকে কেন এই ভাবে বঞ্চিত রাখবে?

মিতা বলে, ওসব আর ভাবতে চাই না সূর্য। তুমি ফিরে যাও। আমার ব্যর্থ জীবনের বোঝা আমাকেই বইতে দাও।

তার কণ্ঠস্বর বেদনায় ভরে ওঠে। তবু সে দাঁড়ায় না, চলে যায়। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সূর্য।

ঘটনাটা দেখছেন আর একজন। তিনি সাবিত্রী দেবী। তিনি যখন-তখন আশ্রম পরিক্রমা করেন। তাঁর নজর থাকে সব দিকেই। তিনি পরিক্রমায় বেরিয়ে হঠাৎ ঐ ছেলেটিকে মিতার সঙ্গে কথা বলতে দেখে ওদের সম্পর্কটা আবিষ্কার করেন। সাবিত্রী দেবী মিতার জীবনের সব ঘটনা জানেন। মেয়েটার জীবনে এসেছিস একটি তরুণ। তারপর ওদের জীবনে আসে বিপর্যয়। ছেলেটি সত্যিই ভালোবাসে মিতাকে। বার বার সে মিতাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছে তার জীবনে। সে চায় ওরা ঘর বেঁধে শান্তি পেতে, কিন্তু মিতা যেন অভিমানী হয়ে আজও তাকে প্রত্যাখ্যান করে ফিরিয়ে দিতে চায়। নিজের ব্যর্থ জীবনের বোঝা বইতে চায়।

সাবিত্রী জানে এই যন্ত্রণার তীব্রতা। একদিন তাঁরও সব হারিয়ে গেছিল, নিজেও ভুল করেছেন। আজ সাবিত্রীও যেন অনুভব করেন এই বিষয়ে তাঁরও কিছু যেন করার আছে। তিনিও চান ওরা সুখী হোক, শান্তি পাক। রাত নামে। ব্যর্থ সূর্য ফিরে আসে গেস্ট হাউসে। তার জীবনেও নেমে এসেছে

এক অন্তহীন অন্ধকার।

তবু বিকাশবাবুর সঙ্গে দেখা করে সব ঘটনার কথা বলতে চায়।

বিকাশবাবু পরদিনই ফিরেছেন। সূর্যও এবার তাঁর কাছে হাজির হয়েছে। অনেকদিন পরে তিনি সূর্যকে দেখছেন। বিকাশবাবু বলেন, এসো, এসো। কলকাতার খবর কী বলো? কারখানা কেমন চলছে? বিজন কেমন আছে?

বিকাশবাবু এমনিতে নিপাট ভালো মানুষ। বিজনবাবু যে তাঁর সঙ্গে অতীতে খুব খারাপ ব্যবহার করেছেন, সে কথাও তিনি মনে রাখেননি। সস্নেহে তিনি কাছে টেনে নেন সূর্যকে। সূর্যই এবার সেইসব কাগজপত্র বের করে দেয় বিকাশবাবুকে। বিকাশবাবু বলেন, আর এসব তো প্রয়োজন নেই সূর্য।

আপনার না থাক— বাবার আছে। আজ কারখানা বিপন্ন— আর একমাত্র আপনিই পারেন এই বিপদ থেকে বাঁচাতে।

সে কী! এবার বিকাশবাবুও মন দিয়ে কাগজপত্রগুলো দেখতে থাকেন। সূর্যও বলে চলেছে এবার বাবার সেই ভুলের কথাগুলো— অতীতের সেই বেদনাদায়ক ঘটনাগুলো। বিকাশবাবু ব্যবসা-বাণিজ্যটা ভালোই বোঝেন। ওইসব কাগজপত্র দেখে বলেন, এ তো বিপদের কথা সূর্য, কোম্পানিকে এইভাবে চিট করছে ওই নিরাপদবাবু, ওর বিরুদ্ধে পুলিশি অ্যাকশন নিতে হবে। আর বেশ কিছু টাকা যদি ঢালা যায় তাহলে কোম্পানি এই অর্ডারের মাল নিতে পারবে। তবে এসব কাজের জন্য ওই সোমপ্রকাশ, মিসেস সেনকে সরাতে হবে। ওরা কেউ অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে থাকলে হবে না। তোমাকেই এসবের ভার নিতে হবে।

সূর্য বলে, আমি! আমি কি করে এই বিপদ থেকে বাঁচাবো কোম্পানিকে! আমার তো এত টাকা নেই। তাছাড়া আমার সৎমা, সোমপ্রকাশ এসব শর্ত নাও মেনে নিতে পারে।

বিকাশবাবুও কথাটা ভেবে বলেন, ওরা এটাকে মেনে নিতে নাও পারে। ঠিক আছে আমিই ফোনে কথা বলছি বিজনের সঙ্গে। তবে কোম্পানিকে বাঁচাতে গেলে এসব করতেই হবে। নইলে আমি জেনেশুনে অথৈজলে আর টাকা ফেলতে রাজি নই।

অসহায় বিজনবাবুও কলকাতায় বসে সূর্যের অপেক্ষায় ছিলেন। কিন্তু ফোন করেছেন বিকাশবাবু নিজেই। বলেন, আমি সব কাগজপত্র দেখেছি। সূর্যের সঙ্গে কথা হয়েছে। তুমি এখানে এলে তোমার সঙ্গে বিশদভাবে এ নিয়ে আলোচনা করে কোম্পানিকে বাঁচাবার জন্য ব্যবস্থা করা যেতে পারে। তবে এ নিয়ে কথা বলা দরকার।

বিজনবাবুও চান কোম্পানিকে বাঁচিয়ে রাখতে। তার জন্য যা করার তিনি করবেন। তাই ছুটে এসেছেন তিনি কলকাতা থেকে এই বন-পাহাড়ের দেশে। বিকাশবাবুর সঙ্গে দেখা করে তার সমাধান করতেই হবে।

বিকাশবাবুও এখন বুঝেছেন তাঁর ছেলে সুশান্তও চায় কলকাতার ঐ প্রতিষ্ঠানকে টিকিয়ে রাখতে। তাই বিকাশবাবুও সুশান্তকে তাঁর পরিকল্পনার কথা বলেন। তিনি সূর্যকেও সঙ্গে নিয়ে চলেছেন সুশান্তের কাছে। সূর্যও দেখে বিকাশবাবুর বিরাট প্রতিষ্ঠান। আর সুশান্ত পরিচিত হয় সূর্যের সঙ্গে। বিকাশবাবুও সব কথাই বলে রেখেছিলেন তার ছেলেকে। তাই সুশান্ত সূর্যের সঙ্গে বন্ধুর মতোই ব্যবহার করে। আর তার সঙ্গে কথা বলে খুশি হয় সুশান্তও।

সুশান্ত বলে, সূর্যবাবু, আপনাকেই এসবের ভার নিতে হবে। তবে আমি আপনার পাশে থাকবো। দুজনের মিলিত চেষ্টাতেই ওই কারখানা আবার সুনামের সঙ্গেই চলবে।

এমন দিনে এসে পড়েন বিজন সেনও। তিনি আজ তাঁর ব্যবসার জন্য বিকাশবাবুর কাছে বিশেষ ভাবে লজ্জিত। আজ বিজনবাবুরও চোখ খুলে গেছে। ওঁদের মধ্যে এবার আলোচনার সময় বিজনবাবুও বিকাশবাবুদের সব কথাই মেনে নেন। আজ তাঁর ক্ষমতা আর নেই, নেই অর্থবল। তবু তিনি তা শুধরে নিতে চান। চান তাঁর প্রতিষ্ঠানকে বাঁচিয়ে রাখতে। তাই বলেন, বিকাশ, তুমি যা ভালো বোঝ তাই করো। মিসেস সেন আর সোমপ্রকাশকে আমিই সরিয়ে দিতে চাই কোম্পানি থেকে। নিরাপদর নামে আমি

পুলিশে রির্পোট করেছি। ওরাও এবার তদন্ত শুরু করেছে। আমি চাই প্রতিষ্ঠানটা বাঁচুক।

ক'দিন ধরে বিকাশবাবু আশ্রমে আসছেন না। সাবিত্রী ভাবনায় পড়েন। বিকাশবাবুর খোঁজ নেবার জন্যই সাবিত্রী তাই এসে পড়েন ওই লেকের ধরে ওদিকের ছোট বাগানঘেরা বাংলোয়।

মাইজীকে এখানের সবাই শ্রদ্ধা করে। তাঁর এ বাড়িতে অবারিত দ্বার। তাই দারোয়ানও প্রণাম করে বলে, যান মাইজী— বড়সাহেব ড্রইংরুমেই আছেন। কিসব জরুরি মিটিং নিয়ে রয়েছেন ক'দিন। কয়েকজন সাবও এসেছে—

সাবিত্রীও জানেন বিকাশবাবুর নানা ব্যবসার কথা। তবু একবার খোঁজ নিয়েই চলে যাবেন মাইজী।

ড্রইংরুমে ঢুকেছেন তিনি। এঁকে দেখে বিজন সেন চমকে ওঠেন। সাবিত্রীও দেখছেন তাঁর ভূতপূর্ব স্বামীকে। আজ তার শরীর ভেঙে পড়েছে। চোখে-মুখে হতাশার ছায়া। সেই পুরুষকার,সেই তেজ আর নেই। সুশান্তের পাশে বসে সেই তরুণ। মাইজীকে দেখে এগিয়ে আসে সুশান্ত। বিকাশবাবুও উঠে পড়েন। সুশান্ত প্রণাম করে, সূর্যও। তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতেই সাবিত্রীও যেন চমকে ওঠেন। সারা দেহে যেন বিচিত্র সাড়া জাগে। বিকাশবাবু দেখছেন। বিজনবাবুই বলেন, সাবিত্রী, ওই সূর্য। আজ আমি আমার ভুল আর পাপের জন্য নিঃস্ব, সর্বস্বান্ত হয়ে গেছি। আজ আর কারো কাছে ক্ষমা চাইবার মুখও নেই।

সাবিত্রী দেখছেন সূর্যকে। তাঁরই সন্তান। সূর্যের মনে পড়ে ছেলেবেলার সেই ছবিটা। মায়ের সুন্দর মুখখানা। তবু সেই ছেলেবেলার দেখা আবছা ছবিটার সঙ্গে আজকেব সাবিত্রী দেবীর অনেক মিলই সে খুঁজে পায়। সূর্য এগিয়ে যায়। সাবিত্রী দেবী আজ এতদিন পর তাঁর হারানো ছেলেকে খুঁজে পেয়েছেন।

বিকাশবাবু বলেন, আজ সব ভুল বোঝাবুঝির পালা শেষ। আমাদের দিন তো শেষ হয়ে আসছে, সূর্য-সুশান্তদের হাতেই এবার সব তুলে দিই। আমাদের আগামী প্রজন্ম তবু সুখী হোক। নতুন করে বাঁচুক।

সাবিত্রী ভাবছেন সেই সন্ধ্যার কথা। মিতার চোখে জল— তার জীবনের বেদনার বঞ্চনার কাহিনিও জানেন তিনি। সাবিত্রী বলেন বিজনকে, এবার ওদের কথা ভাবো। ওদের নতুন করে সব পেয়ে বাঁচার পথে আর বাধা হয়ে দাঁড়িও না।

বিজন সেন আজ ক্লান্ত। পরাজিত। আজ তিনি দেখতে চান তাঁর কারখানা আবার সগৌরবে চলছে। তাঁর সন্তান যার উপর তিনি কঠিন অবিচার করেছিলেন তারা সুখী হয়েছে।

বিজন বলেন, তাই হবে বিকাশ। সাবিত্রী, আজ আমিও সকলকে সুখী দেখতে চাই, আমার দম্ভের দিন শেষ হয়েছে।

মিতা ভাবতে পারেনি মাইজী এসময় তাকে ডেকে পাঠাবেন। সে ক্লাশ থেকে সোজা এসেছে বিকাশবাবুর বাংলোতে। আজ বিজনবাবুকে দেখে মিতাও চমকে ওঠে। বিজনবাবুই বলেন মিতাকে, তোমার অনেক কিছুই কেড়ে নিয়েছিলাম মা— সেসব তো ফিরিয়ে দেবার সাধ্য আমার নেই। আজ তোমার কাছে তবু চাইছি— তুমি আমায় ফিরিয়ে দিও না। তুমিও এসো আমাদের সঙ্গে, সূর্যের পাশে থেকে তুমিও ওই প্রতিষ্ঠানকে বাঁচাও রাহুর গ্রাস থেকে। আমিও সব ভুল শুধরে নিয়ে নতুন করে বাঁচতে চাই।

বিকেল নেমেছে— সূর্য অস্ত গেছে পাহাড়ের আড়ালে। উপত্যকায় ঘরে ফেরা পাখিদের জমায়েত শুরু হয়েছে গাছে গাছে। দিনের শেষ তার রং-এর খেলাও ফুটিয়ে আনে। মন্দিরের সামনের মাঠে প্রার্থনার জন্য সমবেত হয়েছে ওরা। আজ মিতার কণ্ঠে উদ্ভাসিত খুশীর সুর, ঈশ্বর আজ ওর সব প্রার্থনা পূরণ করেছেন। আজ খুশীর সুর জাগে সাবিত্রী, বিকাশ, সূর্যের মনেও। আবার সেই হারানো খুশীর রেশ ফিরে পেয়েছে তারা— অন্ধকারের মাঝে আলোগুলো জ্বলছে। সেই আলোর পরশ তাদের অন্তর-মনেও।

অতলান্ত

বাসটা যখন এসে থামল পীরগঞ্জের হাটতলায় তখন সবে সকাল হয়েছে। পীরগঞ্জের ঘুম সদ্য ভেঙেছে রাতের জড়তা কাটিয়ে। পীরগঞ্জ এমন কিছু বড়-সড় জায়গা নয়, ময়নামতীর নদীর ধারে কিছু দোকানপাট, হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয়, পাট বেচা-কেনার আড়ত,দু-একটা টিনের বেড়া ঘেরা পাটগুদাম আর হাটতলা নিয়ে এর জীবন।

তাও হাটবাজারের দিন বেশ লোকজন, যাত্রী, দোকানী পশারীরা আসে।

এ অঞ্চলের বহু লোক যার যা কিছু হয় ক্ষেতে, কুমড়ো, কলা, বেগুন, লাউ-টাউ নিয়ে হাটে আসে।

কেনা-বেচা করে।

ময়নামতীর বাঁকে কিছু শালতি, নৌকো, ডিঙি এসে জমা হয়। দুপুরের দিকে হাট জমে ওঠে।

আবার বেলা পড়তে পড়তে ভিড় কমে আসে।

লোকজন যে যার বাড়ির দিকে হাঁটা দেয়।

হাটতলার চালাগুলো শূণ্য হয়ে আসে।

সন্ধ্যা নামার সঙ্গে সঙ্গে দু-চারটে এখানের বাধা দোকানদাররা টিকে থাকে, পানের দোকানে কেরোসিনের বাতি টিম টিম করে, অন্য লোকজন থাকে না।

ক্রমশঃ আঁধার নির্জনতর হয়ে ওঠে।

তখন হাটতলা যেন ক্লান্ত হয়ে ঝিমিয়ে পড়েছে।

ময়নামতীর বুকে দু-একটা ডিঙিতে মাছমারার দলও ঘুমিয়ে পড়ে।

হাটের এদিক-ওদিক ছিটিয়ে পড়ে থাকা শালপাতার ঠোঙা, এটা সেটার মালিকানা নিয়ে কুকুরের দল নিজেদের মধ্যে ঝগড়া বাঁধিয়ে বিকটস্বরে চীৎকার করে।

মাঠে কোথায় শেয়াল ডাকছে।

সেই দীর্ঘতান ডাকের সঙ্গে কুকুরগুলোর ডাকও মিশে যায়। হাটতলার বুকে ঘুম নামে। শেষ বাস তখন মথুরাপুর ছুঁয়ে হাটতলা পার হয়ে দক্ষিণ গোবিন্দপুরের দিকে চলে গেছে এই পীরগঞ্জকে পিছনে ফেলে। মথুরাপুর স্টেশন থেকে দক্ষিণ গোবিন্দপুরের গঞ্জ যাবার এই একটা পথ, অন্য একটা পথও আছে, সেটা ডায়মন্ডহারবার শহর এসে এই পীরগঞ্জের হাটতলায় মিশেছে।

এককথায় পীরগঞ্জ দূর আবাদ অঞ্চলের মধ্যে ছোটখাটো জনপদই এই জংশনের গৌরবাধিকার পেয়েছে।

আর পাশেই ময়নামতীর খালটা চলে গেছে এই এলাকার বেশ দূর অবধি,ওই খাল দিয়েই সেইসব এলাকার গ্রামের মানুষের যাতায়াত চলে ডিঙিও, শালতিতে।

বর্ষার সময় যেটুকু মেঠো রাস্তা টিকে আছে তাও দুর্গম হয়ে যায়। তখন ওই জলপথই ভরসা।

ওতে করে তারা পীরগঞ্জের হাটে এসে বাস ধরে ডায়মন্ডহারবার না হয় মথুরাপুরের দিকে যায়। আর ডায়মন্ডহারবারে তাদের মহকুমা আলাদত। এ অঞ্চলের মানুষের হাট-বাজার, কেনাকাটা আর মালি-মোকদ্দমার (টো বাদা অঞ্চলের মানুষ হামেশাই করে থাকে তুচ্ছ কারণ-অকারণেই) জন্য যাতায়াত করতেই হয়। তাই পীরগঞ্জ এত ভিতরে হলেও জমজমাটই থাকে।

যদুপতি এখানের হাটতলায় বেশ কিছুদিন আগে চায়ের দোকান দিয়েছিল।

জমজমাটও তেমন ছিল না।

এদিকে সংসারের দায়-দায়িত্বও রয়েছে।

যদুপতি তখন গঞ্জে আশু নস্করের ধান-পাটের আড়তে মুন্সীর চাকরী করতো। দেখেছে ক্রমশঃ হাটের গুরুত্ব বাড়ছে, কি খেয়ালবশে নস্করমশাইয়ের আড়তের পালে এক চিলতে খালি জায়গায় কাঠকুটো দিয়ে নস্করদের দু-একটা বাতিল নড়বড়ে বেঞ্চি লাগিয়ে চায়ের দোকান দিয়েছিল সামান্য পুঁজি ভেঙে।

ক্রমশঃ দোকান চালু হয়ে গেল বছরখানেকের মধ্যেই। যদুপতির দোকানের হাল বদলে গেল। আরও জায়গা নিয়েছে একেবারে বাসস্ট্যান্ডের সামনাসামনি।

সেখানে বড়মতো চালা তুলেছে, বেশ কিছু বেঞ্চ, টেবিল লাগিয়ে এখন চা ছাড়া একজন কারিগর রেখে চপ, বেগুনী, মুড়িও রাখছে, চা-তো আছেই।

বাস-স্ট্যান্ডের লাগোয়া, পিছনের ময়নামতীর নৌকোঘাট। ফলে বাস-নৌকোর যাত্রীরা ভিড় করে তার দোকানেই। সেদিন হাটবার গেছে। তামাম এলাকার দোকানদার খদ্দেররাও এসে ভিড় করে।

ময়নামতীর খালে ডিঙি শালতিতে করে বহু দূরের লোকজন চাষী-বাষীরাও আসে তাদের ক্ষেতের উৎপন্ন নানারকম শব্জী নিত্য ট্রাক নিয়ে আসে শহরের শব্জী মহাজনরা, এখানে দূর মফঃস্বলে সস্তায় মালপত্র কিনে ট্রাক বোঝাই করে নিয়ে যায়। যদুপতির হাটবারের দিন আর হুঁসগম্যি থাকে না। হাট বসে বেলা বারোটা নাগাদ।

তার আগে থেকেই লোকজন আসতে শুরু করে, দোকান-পশার সাজায় দোকানদাররা।

লোকজনও ভিড় করতে থাকে।

যদুপতির দোকানে চা মুড়ি চপের ফলাও কারবার জমে। কড়াই থেকে তোলার অবসর থাকে না। আর চা তৈরী করে চলে যদুপতির অন্য একজন। চায়ের দোকানের কর্মচারী বদন চা দিতে দিতে আগাম পয়সাই নেয়, কোন খদ্দের বলে, কি চা করেছিস রে বদনা?

বদন বেশ মেজাজ নিয়ে শোনায়, তিরিশ পয়সা চা পাচ্ছো এই ঢের, হাটে পঞ্চাশ পয়সা করে বিচছে দ্যাখোগা, আবার বলে কিনা কি চা? অর্থাৎ এই খেতে হয় খাও, সমালোচনা কেরো না।

যদুপতি ওদিকে তেলেভাজা, গরম জিলিপি, মুড়ি, চা সব বিভাগ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

এই চলে রাত অবধি।

সন্ধ্যার পর থেকে হাটে সারবন্দী কুপি, হ্যারিকেন জ্বলে। যদুপতি কিন্তু একটা ছোট হ্যাজাক কিনেছে, ওতে দোকান আলো হয়ে ওঠে। শহর-বাজারের ভাব আসে। ক্রমশঃ হাটের লোকজনের ভিড় কমে যায়।

শেষ বাসগুলো আকণ্ঠ বোঝাই করে নিয়ে যায় যাত্রীদের, ময়নামতীর খালের বুকে বাকী নৌকো, শালতিগুলোও হারিয়ে যায়।

আশপাশের লোকজন ফিরে যায় যে-যার গ্রামে। হাটতলার দোকানদার দু-চারজন টিকে থাকে মাত্র। সারা হাটের কলরব থেমে গিয়ে নামে অসীম নিঃস্বতা, মাঠ জুড়ে শব্জীর খোসাপত্র, এটাসেটা, এঁটো শালপাতা এইসবই।

যদুপতি দোকান বন্ধ করে ক্যাসকড়ি গুণে এবার খোস মেজাজে হাঁক পাড়ে—বদনা, দুধ দে এককাপ চা কর।

তখন উনুনের আঁচ নিভে নিভে আসছে। ক্লান্ত এরা। বদন বলে, রাত তো ঢের হয়েছে কত্তা। নিশুখুড়ো ভাত, মাছের ঝোল করছে।

গরম গরম খেয়ে শুয়ে পড়ো।

দিনভোর তো মইমল্লট গেছে।

যদুপতি ঈষৎ ক্ষুণ্ণা হয়ে বলে, ঠিক আছে, তাহলে ভাত বাড়তে বল।

টিউকলে হাত মুখ ধুয়ে আসছি।

এবার বিশ্রাম মেলে যদুপতির। দোকানের ওদিকে তক্তপোষে শুয়ে পড়ে খেয়েদেয়ে।

এতক্ষণ বুঝতে পারেনি, এবার মনে হচ্ছে বয়স হচ্ছে। দিনভোড় দৌড়ঝাঁপ করে হাত পা টনটন করছে। কাল থেকে দুদিন আবার একটু বিশ্রাম মিলবে।

হাট নেই, প্রতিদিনের কাজটা তত গায়ে বাজে না, তবে কষ্ট হয় হাটের দিন।

আর সেটা পুষিয়ে যায় রোজকারের টাকায়।

কষ্ট না করলে কষ্ট মেলে না।

ক্লান্ত যদুপতির চোখে ঘুম নামে।

ফাস্ট বাস আসে যখন তখন সকাল হয়ে যায়। ডায়মন্ডহারবার থেকে রাতভোর এই বাস ছাড়ে, পীরগঞ্জে এসে থামে, তখন ফর্সা হচ্ছে, সূর্য ওঠার পালা শুরু হয় এখানের মুক্ত উদার আকাশে।

সুমিতা এমনিতেই বেপরোয়া গোছের মেয়ে।

কলেজের স্পোর্টসেও তার নাম-ডাক আছে।

কলকাতাতেই বাড়ি তাদের। অবশ্য তাদের গ্রামের বাড়িতে বেশ জাঁকজমক করে দুর্গোপুজো হয় এখনও। জ্ঞাতি-গোষ্ঠীরাও আছে। কিন্তু সেখানে বছরে দু-একবার ছাড়া যাওয়া হয় না।

সুমিতা এবার পুজোর আগে দিল্লীতে গিয়েছিল ন্যাশনাল স্পোর্টসের ব্যাপারে, কথা ছিল ফিরে একসঙ্গে বাবা-মা-দিদিদের সঙ্গে তাদের দেশের বাড়ি সেই বাদা অঞ্চলর শীতলপুরে যাবে। কিন্তু দুদিন দেরি হতেই বিপদ হয়ে গেছে সুমিতার।

কলকাতার বাড়িতে ফিরে দেখে কাজের লোকটা মাত্র রয়েছে, আর সবাই গতকালই দেশের বাড়ি চলে গেছে।

বলে গেছে সুমিতা যেন চলে যায় সেখানে।

সুমিতাও বের হয় বিকেলেই দেশের বাড়ির উদ্দেশ্যে। পুরনো লোক মতি বলে, বৈকালে যাবে কি করে?

দুরের পথ, গঞ্জে নামতেই রাত হয়ে যাবে।

সুমিতা ভেবেছে সেটা। বলে সে, রাতে ডায়মন্ডহারবারে পিসিমার ওখানে থেকে ভোরের বাসে চলে যাবে। মতি বলে তাই কোরো। যা পথ ঘাটের হাল বেলাবেলিই পৌছবে কিন্তু।

মেয়েটি সেইসব ভেবেই ভোরের বাসে ডায়মন্ডহারবার থেকে উঠে পীরগঞ্জে যখন পৌছবে তখন সকাল হয় হয়। সুমিতার ভালো লাগে এই নির্জনতা।

তখনও গঞ্জের ঘুম ঠিক ভাঙেনি।

তবে বাস স্ট্যান্ডের সামনে বেশ কিছু লোক ভিড় করেছে, একটা চা তেলেভাজার দোকানে তারা হামলে পরছে। চা,চপ, মুড়ি, রসগোল্লা খাচ্ছে এই সাতসকালেই। সুমিতা দূর থেকে দেখছে ওদের।

তার বাসটা থেকে দু-একজন মাত্র নেমে কে কোথায় চলে গেছে। একাই দাঁড়িয়ে আছে সে এ পাশে, ওদিকের ডায়মন্ডহারবারগামী বাস বোধহয় আসবে।

তাই যাত্রীদের ভিড় জমেছে ওদিকের চায়ের দোকানে। যদুপতির বিশ্রাম নেই! কাল বেশ রাত অবধি হাটবারের বেচাকেনা মিটিয়ে শুতে দেরি হলেও আজ ভোরেই উঠতে হয়েছে।

অন্যদিন এত খদ্দের চাপ থাকে না।

বদনই ফাস্ট বাসের চাপ সামলে নেয়।

চা চপ বেঁচে সেই-ই আর কারিগর বানিয়ে দেয়। আজ সকালে ডায়মন্ডহারবার কোর্টে এখানের গোটা পাঁচেক জব্বর মামলার দিন পড়েছে।

সাক্ষী কলো জন ষটে হবে।

আর সাক্ষী মানেই মামলাদারের কাছে পরম খাতিরের লোক। তাদের জামাই আদরে তোয়াজ করে নিয়ে যেতে হবে, আপ্যায়নের বিন্দুমাত্র ত্রুটি ঘটলে কি বলতে কি বলে দেবে মামলায় জাহান্নামে চলে যাবে। তাই কাকডাকা ভোরেই তারা এসে যদুপতিকে হেঁকে ডেকে তুলিয়ে ফরমাইস করে, বেশ যুৎ করে চা করে আন।

সাক্ষীদের একজন বলে, খালিপেটে চা কি হে?

কাল হাটবার গেছে, নম্বরী মাল-ইয়ে রাজভোগ-টাজভোগ নাই?

মুড়ির সঙ্গে জমবে ভালো।

অন্যজন তৎক্ষণাৎ সায় দেয়। তা মন্দ হয় না গায়েন মশাই।

বৃন্দাবন গায়েনের মামলার সাক্ষী এরা।

বাধ্য হয়ে গায়েনমশাইকে বলতে হয়, তাই দাও যদুখুড়ো, একটা করে রাজভোগ আর মুড়ি, তার সঙ্গে দুটো করে গরম চপও দিও হে।

গায়েনের সাক্ষী-পার্টির পর এসে হাজির হয়।

নতুন গাঁয়েন দলুইমশাইয়ের সাক্ষীরা, দেবগঞ্জের দত্তবাবুর মামলাপার্টি, সুতরাং একযাত্রাতে পৃথক ফল হবে কেন?

ওদিকে যদুপতির রাজভোগ, লেডিকেনি শেষ হয়ে জিলিপিতে ঠেকেছে। তাও শেষ হতে দেখা যায় বাস আসছে দূরে।

গায়েনমশাই মবলক খরচে গজগজ করে। শালা বাস কোম্পনীও হয়েছে তেমনি। একটু আগে এলে এই টাকাগুলো বাঁচতো। কিন্তু কে কার কথা শোনে। বাস দুটো এসেছে, আর সাক্ষীপার্টিগুলো তখন হন্যে হয়ে উঠছে বাসে। বাসের ভিতর আর ঠাঁই নাই।

কন্ডাকটার ঠেসেঠুসে পুরেছে লোকজনদের।

বাকীরা এবার তরতরিয়ে ছাদেই উঠে পড়ে। বাসদুটো বেশ আকণ্ঠ বোঝাই করে এবার শহরের দিকে চলেছে হেলতে-দুলতে।

আজকের সকালের ট্রিপে ভালোই বাণিজ্য হয়েছে তাদের।

মেয়েটি এতক্ষণ ধরে ওদিকে দাঁড়িয়ে এইসব কর্ম দেখছিল। এবার জায়গাটার ভিড় শূণ্য হয়ে যেতে মেয়েটি ভাবছে, হাটতলা শূণ্য।

যেন ঝড় বয়ে গেছে।

যদুপতি এবার দোকানে বসে হাঁক্ পাড়ে, বদনা।

দুধ দে এক গেলাস চা বানা।

ওঃ সাতসকালে যেন ঝড় বয়ে গেলরে!

চা নিয়ে বসেছে যদুপতি। আজ একটু বিশ্রামই মিলবে এবার।

কালকের ঝড়তি-পড়তি মালও সাফ হয়ে গেছে।

মেজাজটাও খুশ হয়ে আছে। হঠাৎ করে ডাকে চাইল যদুপতি।

শুনছেন।

ওই ডাক শুনে একটু অবাক হয়। এখানে সময় এমনি একটি মেয়েকে দেখবে ভাবতে পারেনি। আর ওর পোশাক-আশাক দেখে বুঝেছে এই গ্রামগঞ্জে থাকার অভ্যাসও ওর নেই।

পরনে হালকা রঙের শাড়ি, জামা, কাঁধে একটা সুদৃশ্য ব্যাগ, পায়ে দামী স্লিপার।

চেহারাটায় শহরের ছাপ তো আছেই আর আছে একটা কমনীয় মাধুর্য যা সহজে চোখে পড়ে না।

যদুপতি অবাক হয়ে বলে, আমাকে ডাকছেন?

মেয়েটি এগিয়ে এসে বেঞ্চে বসল।

যদুপতি শুধোয়, চা দেব?

গরম চাপ-বেগুনিও আছে।

একেবারে টাটকা।

মেয়েটি একটু হেসে বলে, চাই দিন। চপও।

যদুপতি এহেন খদ্দেরকে নিজেই সার্ভ করে স্পেশাল চা তৈরী করিয়ে।

মেয়েটি চায়ে চুমুক দিয়ে বলে, সুন্দর চা করেছেন। বদনও এগিয়ে এসেছে এই ফাঁকে।

সে বলে, ইসপিশাল চা দিদিমণি।

মেয়েটি হাসল। ওর সহজ সুন্দর হাসিটায় যেন সৌন্দর্য আরও ফুটে ওঠে।

মেয়েটি যদুপতিকে বলে কণ্ঠিত স্বরে, একটু উপকার করতে হবে।

ওর কথার সুরে যদুপতি খুশি হয়ে বলে, বলুন। মেয়েটি বলে শীতলপুর যাব।

যদুপতি শোনায়, শীতলপুর, সেতো বেশ দূর।

ডিঙি ছাড়া তো হেঁটে যেতে পারবেন না মালপত্র নিয়ে। মেয়েটি বলে, একটা ডিঙি যদি ভাড়া করে দিতেন যা নেয় দেব।

যদুপতি কি ভাবছে। মেয়েটি ওকে ভাবিত দেখে বলে, ডিঙি মিলবে না।

যদুপতি জানায় না না। মিলবে না কেন? চেনা জানা কোন মাঝি হলে ভালো হয়। একা যাবেন তো। সুমিতা একথাটা ভাবেনি।

এবার যদুপতির কথাতে সেও বলে, তাই আপনাকেই বললাম ডিঙি দেখে দিতে। এখানকার লোক আপনি, সব চেনা-জানা আপনার। মানে, একাই বের হতে হল কিনা।

যদুপতি বলে, ঠিক আছে, আপনি চা-টা খান। বদনা,তুই নদীর ঘাটে যেয়ে দেখে আয় কার ডিঙি আছে, চেনা-জানা কেউ থাকলে ডেকে আনবি।

বলবি ভাড়া আছে, আমি ডেকেছি।

চায়ের দোকানের শ্রীমান বদন দিদিমণিকে সাহায্য করার মৌকা পেয়ে চলে গেল ঘাটের দিকে।

সুমিতা কিছুটা নিশ্চন্ত হয়ে এবার চা খাচ্ছে।

যাহোক একটা সুরাহা হবে, চায়ের দোকানের মালিককে দেখেশুনে ভদ্রলোক বলেই মনে হয়।

আর চপগুলো ভালোই করেছে, সুমিতা শহরে চপের এমন স্বাদ পায় না।

তাই আরও দুটো চপ নিয়ে বসল।

বদন ঘাটের দিক থেকে ফিরে এসে বলে, ডিঙি একটানা তো ছেলো গো, বংশী মাঝির ডিঙি, বংশী চেনা লোক এদের।

যদুপতি বলে, তাকে ডেনে আনলি না কেন?

বদন বলে, বললাম তো, তা উ দেখলাম অন্য ভাড়া ধরেছে আগেই।

সেকি। যদুপতি ক্ষুণ্ণ হয়। তবু শুধোয়, ঘাটে আর কোন ডিঙি নেই?

বদন জবাব দেয়, না। আর কুন শালোকেতে দেখলাম না।

সবাই মাল নে আগেই চলে গেছে।

বংশুই ছিল রাতভোর ঘাটে, ভোরের পয়লা বাসেই ভাড়া পেয়েছে।

ওইদিকে কোথায় যাবে বললে। যদুপতি কি ভেবে বলে মেয়েটিকে, অন্য ডিঙি তো নাই।

আর কি কখন আসবে তা ঠিকানাও নাই দিদিমণি। ঘাটেই চলেন, বংশীর চেনা মাঝি উদিকে গেলে ওই আপনাকে শীতলপুরে নামিয়ে দেবে।

সুমিতাও ভাবাছে কথাটা।

এইভাবেও যদি পাওয়া যায় যেতে হবে শীতলপুরে। পথের মধ্যে পড়ে থাকাও ঠিক হবে না।

কখন আবার ডিঙি পাবেন কে জানে।

তাই মেয়েটি যদুপতির কথায় বলে, তাই ভালো।

দেখুন যদি ওই মাঝিই নিয়ে যায় কোনরকমে।

যদুপতির এখানে নাম-ডাক আছে।

বংশুও তাকে ভালো করেই চেনে।

তাই যদুপতি বলে, হ্যাঁ, হ্যাঁ। বংশী ঠিক নিয়ে যাবে।

পরে বদনকে ধমকে ওঠে বেশ কড়া স্বরে।

এ্যাই বদনা, হাঁ করে দাঁইড়ে দেখছিস কি?

দিদিমণির মালটা নে ছুটে যা ঘাটে, বংশীরে দাঁড় করা। আমরা যাচ্ছি।
বদনও কিছু বকশিসের আশা করেছে নতুন দিদিমণির কাছে।
এসব কাজ করে এমন টুকটাক কিছু পায় সে।
তাই কিঞ্চিৎ-নগদ নারায়ণের আশায় বদনাও ছোটে ব্যাগটা ঘাড়ে করে ঘাটের বংশীর নৌকা ধরতে। সুমিত্রাও উঠে পড়েছে আধখাওয়া চায়ের গ্লাস নামিয়ে।
যদুপতি তাকে অভয় দেয়, শান্তিতে খান।
বংশী মাঝি আপনারে না নিয়ে যাবে না।
অনেক পথ, বেলা পড়ে যাবে।
ভালো করে খেয়ে নিন কিছু।
সুমিতার খিদেও নেই। বলে সে, না, না।
পথে যাহোক কিছু খেয়ে নেবো।
এখন চলি। অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।
যদুপতি বলে, না না। ধন্যবাদ দেবার কিছুই নেই
এতো কর্তব্যই । চলুন।
ওরা একসারে বেড়ার দোকান পার হয়ে খালের ঘাটের দিকে এগোল।
বংশীর বয়স হয়েছে। আগেকার মত সেই শক্তসামর্থ্য দেহটা আর নেই।
একদিন অতীতে বংশী তার ডিঙি নিয়ে বড় গাঙে যেতো, নিজেই মাছ ধরত।
ঝড়-তুফান উঠত গাঙে, আকাশ ছেয়ে নামত বৃষ্টির ধারা। উথালপাথাল গাঙে নৌকোটা মোচার খোলার মত দুলত সেই তুফানে।
সব মাঝিরাই ভয় পেতো তখন গাঙে যেতে।
কিন্তু বংশীর সেই ভয় ছিল না।
এই মেতে ওঠা গাঙে নৌকো বাওয়া ছিল তার কাছে সহজ, স্বাভাবিক ব্যাপারই।
হালের মোচড়ে নৌকোটা ঠেলে উঠত ঢেউয়ের মাথায়।
সে বের হয়ে আসত মাছ নিয়ে।
বংশী ছিল নাম-ডাকের মাঝি।
কিন্তু সেই দিনগুলো এখন স্বপ্নে পরিণত হয়েছে।
বয়স হয়েছে তার। চোখের ধারও কমেছে।
হাতে সেই জোরও নেই।
তাই বড় গাঙে আর নৌকো নিয়ে যায় না।
এখন আশ্রয় নিয়েছে এই ময়নামতির খালে।
এখানে স্রোত কম, ঢেউয়ের মাতনও নেই।
এই খালটাও বিস্তীর্ণ এলাকার বুক চিরে এদিকের বড় গাঙ থেকে ওদিকের নোনা গাঙে মিশেছে। তবু এর বুক ঠান্ডাই থাকে।
এই খালের ধাবের গ্রামগঞ্জের লোকজন, মালপত্র নিয়ে যাতায়াত করে কোনোরকমে দিন গুজরান করে।
সঙ্গী বলতে তারহ ছোট ছেলে পুটু।
বড় ছেলে কবে বড় গাঙে নৌকো বাইতে গিয়ে মারা গেছে।
অবশ্য অন্য নৌকো গিয়েছিল ছেলেটা, আর ঘরে ফেরেনি।
তারপর থেকে কেমন কমজোরী হয়ে গেছে বংশী। পুটুকে নিয়েই নৌকো বয়ে খালে।
কাল হাটবারের দিন নৌকোয় কিছু মালপত্র, সওয়ারী এনেছিল বংশী, ভেবেছিল হাট ভাঙার পর আবার যাত্রী পাবে।

কিন্তু রাতে তেমন কোনো সওয়ারী জোটেনি। তাই গাঙের ঘাটেই গেরাপি করে ছইয়ের মধ্যে বাপবেটায় শুয়েছিল।

ভোরের প্রথম বাস আসার শব্দ শুনেছিল বংশী। তার কিছু পরেই পুটুর ডাকে বাইরে আসে বংশী।

পুটু বলে, এক বাবু নৌকা ভাড়া নেবে গো বাবা। কোন বিদেশী যাত্রীই হবে বোধহয়।

এদের কাছে দু'পয়সা বেশীই মেলে।

তাই বংশী ছইয়ের বাইরে এসে নবাগত বাবুকে দেখছে হুঁকোটায় টান দিতে দিতে।

সমীর কলকাতার কোন সওদাগরি অফিসের মাঝের শ্রেণীর কর্মী। পড়াশোনাতেও ভালই, তাই ওই চাকরীটা পেয়েছিল। আর চাকরীর পর বিয়েটা হতেই বাঁধা হয়নি।

তার শ্বশুরমশাই ভুবনমোহন বাবুরা দূর আবাদ অঞ্চলের কোন লাটের জমিদার।

পূর্বপুরুষ অতীতে সেখানে বেশ জাঁকিয়ে বসবাস করেছেন, বিরাট বাড়ি, কাছারি, সেরেস্তা সবই আছে।

বহুব্যয়ে সেই আবাদের গ্রামে দিঘি, প্রাসাদ, বিরাট-নাটমন্দির, বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা সবই করেছিলেন, দুর্গোৎসবও হয় মহা সমারোহে।

সমীরের শ্বশুরমশাইরা কলকাতার কাছেই ঢাকুরিয়াতে বেশ বড় বাড়ি করেছেন। বেশির ভাগ সময় এখন শহরেই থেকে ব্যবসাপত্র দেখাশুনো করেন।

এই পরিবারের বহুজন এখন কলকাতা, দিল্লী, পাটনাতেও বসবাস করছেন, কৃতি পুরুষও তাঁরা।

তবু দুর্গোৎসবের সময় অনেকেই দেশের বাড়ি ওই দূর আবাদ অঞ্চলে আসেন ক'দিনের জন্য।

ক'দিন হৈ চৈ করে কেটে যায়।

ভুবনবাবুরও সপরিবারে আসেন।

সমীরেরও আসার কথা ছিল ওঁদের সঙ্গে।

কিন্তু হয়ে ওঠেনি তখন। তাই একাই আজ চলেছে সে সেই অচেনা কোন ম্যাপের বাইরের বসতি শীতলপুরের দিকে।

সমীর অফিসের কাজে আটকে পড়েছিল।

স্ত্রী সুরমা এর আগেই বাবা-মা-ভাই-বোনদের সঙ্গে তাদের দেশের বাড়িতে চলে গেছে।

সমীর আসতে চায়নি শ্বশুরবাড়ির এই হাঙ্গামা পুইয়ে।

কিন্তু চিঠির পর চিঠি দিয়েছে সুরমা এখান থেকে, পুজোর সময় আসতেই হবে এখানে।

কোন কথাই শুনবে না সে।

সমীরকে তাই বাধ্য হয়েই বের হতে হয়েছে।

চিঠিতে মোটামুটি পথনির্দেশ করে দিয়েছিলেন শ্বশুরমশাই নিজে। এও লিখেছিলেন, সমীর আগে খবর দিলে তিনি পীরগঞ্জের হাটতলায় লোক পাঠাবেন ঘরের নৌকো নিয়ে।

কিন্তু সমীরের এই ধাপধারা গোবিন্দপুরে আসার ইচ্ছে ছিল না।

নেহাৎ ছুটিটা মঞ্জুর হয়ে গেছে তাই বের হয়ে পড়েছে বিনা নোটিশেই ওই দূর আবাদের গ্রামের সন্ধানে। সকালে বাস থেকে নেমে সমীর ঘাটের দিকেই এসেছে। এখান থেকে ওই গাঙ ধরে যেতে হবে, সময় লাগবে প্রায় ছ'ঘন্টা।

জোয়ারভাটার হিসেবও আছে, তাতে সময়টাও বেড়ে যায়।

সমীর ঘাটে দেখে ডিঙি মাত্র দু-তিনটে রয়েছে। তাদের দুটোতে মাল বোঝাই, একটি ডিঙি খালি রয়েছে। মাঝিকে ডাকতে সে হুকোয় টান দিয়ে বলে নিরাসক্ত ভাবে, কোতায় যাওয়া হবেন বাবুর?

সমীর জানায়, শীতলপুর। কত নেবে?

বুড়ো মাঝি নিরাশক্ত কণ্ঠে বলে, সে তো যাতায়াতে দিন ভোর লেগে যাবেন।

তা দেবেন কুড়ি টাকা।

কুড়িটাকা! অবাক হয় সমীর।

বুড়ো মাঝি জানায়, মাগ্গি গন্ডার দিন বাবু, দিবারাত্রি শ্রম করে কি পাই? যা দিনকাল।

মাঝির কথা সবে শুরু হয়েছে, এবার চলতেই থাকবে। সমীর ওকে থামাবার জন্য বলে, পনেরো টাকা আর খোরাকী পাবে।

মাঝি একটু নিমরাজী হয়ে বাচ্চা ছেলেটাকে বলে, মাল তোল রে পুটু। তা বাবু, দুজনের খোরাকী দেবেন।

আর দুটো টাকা পুষিয়ে দেবেন।

বহুৎ দূর পথ বাবু।

সমীর ওকে ছাড়তে চায় না। বলে, ঠিক আছে। ময়নামতীর গাঙ বলতে ছোট্ট একটা নদীর মত, এদিকে এসে ভাটিতে গিয়ে বড় নদীতে মিশেছে, এদিকে, দূর গ্রাম-গঞ্জের দিক থেকে ওই বিস্তীর্ণ অঞ্চলের মাঠগড়ানি জল নিয়ে নদীটা পুষ্ট। এদিকে বড় নদীর দুদিকে যত এসেছে জোয়ারের সামান্য ঢল কিছু আসে।

মাঝি বলে, এখনও জোয়ারের ঠেল কিছু আছে বাবু। চলেন একটু জলদি যাওয়া যাবে।

ভাটি শুরু হলে দাঁড় বাইতে হবে।

সমীর দেখেছে নদীটাকে।

শরতের শুরু আকাশে মেঘের চিহ্ন নেই।

দু-চারটে সাদা মেঘের ইশারা বাতাসে ভেসে ভেসে যায় মাত্র। নদীর বুকে সোনালী আলো ছড়িয়ে পড়েছে।

শান্ত, সুন্দর, ছুটি ছুটি ভাব ফুটে ওঠে।

সমীর বলে, চা-টা খাব না?

মাঝি কিছু বলবার আগেই, তার সেই বাচ্চা ছেলেটা খরখর করে বলে, শালো যদুর দোকানের চা না মুত গো, তার চেয়ে নৌকো বেয়ে গিয়ে নশীপুর হাটতলার চা খাবেন, সরেস চা। চলেন, ইথানে উসবের দরকার নাই।

সমীরও বেশী বেলা করতে চায় না। অচেনা পথ। সমীর নৌকোয় উঠেছে, এবার ওদের যাত্রা শুরু হবে। হালে বসেছে বুড়ো মাঝি।

পুটু গেরাপি তুলে নৌকোয় উঠবে এমন সময় পিছনে যদুপতি আর কাকে দেখে চাইল ওরা।

যদুপতি চিৎকার করে, এই বংশী, বংশে-দাঁড়া দাঁড়া। বুড়ো মাঝির নাম বংশীই।

যদুপতির হাঁকডাকে বংশী চাইল।

শুধোয় সে, কেনে গো? ভাড়ায় যেছি যে।

যদুপতি আর মেয়েটি ততক্ষণে নদীর ধারে এসে পড়েছে বাঁধ টপকে।

মেয়েটিও দেখছে একখানা মাত্র ডিঙি, আর সেটাও ভাড়া হয়ে গেছে।

অন্য ডিঙি কখন আসবে আদৌ আসবে কিনা কে জানে।

তাই ভাবনায় পড়েছে সেও।

যদুপতি বলে সেকি রে! সাতসকালে ভাড়া ধরে ফেল্লি। ইদিকে শীতলপুরের ভাড়া ছিল।

এই দিদিমণি যেতেন, বদনকে তো তাই পাঠিয়েছিলাম। পুটু ছেলেটা এমনিতে বেশ হুঁশিয়ার, আর বংশী তার বুড়ো বাবার থেকেও একটু বেশী পাটোয়ারী বুদ্ধি ধরে।

পুটুও স্বীকার করে, তা বদনা বলেছিল গো, বাবা তো ত্যাখনই বাবুকে ডিঙিতে তুলেছেন। তাই-সমীর দেখছে ওই যদুপতি নামক গোলগাল মানুষটিকে আর তার সঙ্গের সেই আধুনিকা ছিমছাম মেয়েটাকে।

বংশী অসহায় ভাবে জানায়, বাবু তো ডিঙি ভাড়া করেছেন।

ঘাটে আর ডিঙি নেই। হাটবারও নয়।

ডিঙি আসবারও সম্ভাবনা কম।

তাই পুটুও কি ভেবে নেয়। দিদিমণিকে যদি তুলতে পারে ডিঙিতে তাহলে আরও বেশ কিছু ভাড়া পাবে।

তাই পুটু বলে, তা যদুখুড়ো, ডিঙি তো আর নাই। আমরা ওদিকেই যাচ্ছি, যদি বাবুর আপত্তি না থাকে ওনাকে নিতি পারি।

শীতলপুর নামিয়ে দোব।

সুমিতাও এছাড়া কোন উপায় খুঁজে পায় না। বুড়ো মাঝিকে দেখে সেও কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়েছে।

ডিঙিতে বসা তরুণটিকে সে দেখে।

যদুপতি বলে ওঠে সেই ভদ্রলোককে, তাই নে যান বাবু!

মানে একা মেয়েছেল এতদূর যাবে, তবু সঙ্গী পাবেন। আর অন্য ডিঙিও তো নেই।

পুটুই সমীরকে চুপ করে থাকতে দেখে এবার আগ বাড়িয়ে বলে, তাহলে তুলে নি বাবু? ডিঙিতে জায়গা ঢের রয়েছে কুন অসুবিধা হবে না। যদুপতিও সায় দেয়, না, না।

অসুবিধা হবে কেন। তোর ডিঙি বেশ বড়সড় রে বনশী, আর ছইও রয়েছে।

আরামসে যেতে পারবেন ওঁরা। রোদও লাগবে না। সুমিতা দেখছে ওই ডিঙির তরুণটিকে।

ওইই যেন এখন বাঁচাতে পারে ডিঙিতে আশ্রয় দিয়ে।

সমীরও কথাটা ভাবছে। ছিমছাম মেয়েটির চাহনিতে যেন একটা অনুরোধ ফুটে উঠেছে।

সমীর জিজ্ঞেস করে সুমিতাকে, কোথায় যাবেন আপনি?

উত্তরে সুমিতা বলে, শীতলপুর।

সমীর দেখছে মেয়েটিকে। ছিমছাম চোহারা, পিছনের বাচ্চাটার মাথায় এক ফোমের সুটকেশ!

মেয়েটি এবার এগিয়ে এসে বলে সহজভাবেই, ঘাটে আর নৌকো নেই। আপনার ডিঙিতে গেলে অসুবিধে হবে?

অবশ্য উই ক্যান শেয়ার দি ফেয়ার।

মেয়েটির কথার মধ্যে সাবলীল একটা ভঙ্গি আছে। বয়সও বেশী নয়।

একা কোন মেয়ে এমনি অচেনা পথে বের হতে সাহস পায় তা জানা ছিল না।

ওর কথায় সপ্রতিভ ভাবও ফুটে ওঠে।

এবার যদুপতি বলে, তাই নে যান বাবু।

দূরের পথ, একা মেয়েছেলে যাবেন, তবু একজন ব্যাটাছেলে সঙ্গে থাকবে, কিছুটা ভালই হবে ওনার পক্ষে। সুমিতা বলে, তাহলে উঠি? সমীর কি আর বলবে, সে যেন কলে পড়েছে। এতগুলো লোক তার দিকে চেয়ে আছে।

একজন অসহায় মেয়েকে বিপদের সময় সাহায্য না করা এটা পুরুষের লজ্জা।

তাই সে বাধ্য হয়ে কিছুটা হতাশ সুরে বলে, ঠিক আছে উঠুন।

আর কি করা যাবে।

ততক্ষণে সুটকেশ তুলেছে নৌকোয় বদন, সুমিতাও উঠেছে।

বদনকে দুটো টাকা দিয়ে বলে, অনেক ধন্যবাদ।

বংশী মাঝি বলে, ওরে পুটু, গেরাপি তোল বাপ। নে বেলা হয়ে গেল একটু জোরে বাপ।

বাবুদের বাড়িতে পেসাদ খেয়ে ফিরতে হবে কাল ভোরে। বংশী আগে থেকেই বাবুদের বাড়িতে পেসাদ খাবার নেমতন্নটা যেচে নিল।

নৌকো চলেছে। ছোট ডিঙি। তবু একটা ছাই মতো আছে।

নাহলে শরতের দিন, রোদের তাপ বাড়লে দাঁড়াবার ঠাঁই থাকত না।

নৌকোর পাটাতনে একটা ছেঁড়া খেজুরপাতার তালাই পাতা।

নদীর বুক চিরে নৌকোটা চলেছে দুলে দুলে।

দুদিকে উঁচু পাড়। দাঁড় টানছে পুটু।

এখনও জোয়ারের জল ঢুকে আছে নদীতে তাই নৌকোটা বেগেই চলেছে।

নদী নয় মাঝারি খালই বলা চলে।

ওদিকে দু-চারটে গাছ-গাছালি নুয়ে পড়েছে নদীর দিকে।

মাঝে মাঝে জাল টানছে নৌকো থেকে দু'চারজন জেলে।

সুমিতা জেদ করেই এসেছে। এমনিতে সে জেদী, পড়াশোনাতে ভালোই ছিল।

এম.এ.পাশ করে এখন আসানসোলে কোন মেয়েদের কলেজে অধ্যাপনা করে।

এখনও ডাকাবুকোই রয়ে গেছে।

সুমিতা নৌকোয় উঠে এবার গুছিয়ে বসেছে।

দেখছে সে সহযাত্রীকে।

সমীর চুপ করে বসে সিগ্রেট ধরিয়ে টানছে।

ছোট নৌকো, ওদিকে ছেলেটা সরল পুঁটিমাছের মত জেলজেলে বুক চিতিয়ে দাঁড় বাইছে।

ওপারে দেখা যায় সবুজ ধানক্ষেত, কোথাও ধানে এসেছে সোনা রং মঞ্জরী।

ক্ষেতে এসেছে সোনালী আভাস।

শুনছেন!

মেয়েটি ডাকছে সমীরকে।

সমীর বলে, আমাকে বলছেন?

হাসে সুমিতা, এখানে আর কেউ আছে যে তাকে বলব?

সমীর একটু অপ্রস্তুতের মধ্যে পড়ল।

সুমিতা শুধোয়, অনেক দূরের পথ না?

সমীর জানায় আমিও নতুন যাচ্ছি শীতলপুরে, এ পথে কখনও যাইনি।

তাই ঠিক জানি না পথ কতখানি।

সুমিতা কৌতুহলের সঙ্গে বলে, আত্মীয়ের বাড়ি যাচ্ছেন বুঝি!

সমীরের সুটকেশটায় ওর নাম ঠিকানা লেখা।

মেয়েটির চোখ পড়েছে সেই দিকে।

কি যেন দেখছে সে!

সুমিতা আবার জিজ্ঞেস করে, কলকাতায় থাকেন বুঝি!

সমীর ঘাড় নাড়ে।

নৌকোটা একটা বাঁকের মাথায় দুলে ওঠে, বুড়ো মাঝি হাতের মোচড়ে নৌকোটা বাঁকিয়ে অন্য নৌকোকে পথ দিতে সুমিতা টলে ওঠে।

আর্তনাদ করে ওঠে সে, ওমা!

ছিটকে ফেলে দেবে নাকি জেলে?

ছোট ডিঙি! সমীর ওর হাত ধরে ফেলেছে যাতে ও ছিটকে না পড়ে নদীতে। নরম নিটোল হাত, চমকে ওঠে সমীর চকিতের জন্য।

কোথায় পাখি ডাকছে। শান্ত পরিবেশ!

সমীর ধরতেই মেয়েটি চাইল।

তার চোখে কি শিহরণ জাগে।

সমীর হাতটা ছেড়ে দিয়ে বলে, নাঃ পড়লেও ডুববেন না।

এইতো ছোট খাল।

পুটু বেশ খুশি মনেই বেয়ে চলেছে, নিস্তরঙ্গ খালের জলে এই দাঁড়টা পড়ছে, তালে তালে, ছোট ডিঙিটা মসৃণ গতিতে এগিয়ে চলেছে জল কেটে। বুড়ো বংশীও একটু খুশি হয়েছে।

এক ক্ষেপেই ডবল ভাড়া পাবে সে।
হুকোর মাথায় বসানো কল্কেটার আগুন নিভে গেছে কখন।
আর তামাকও নেই। তামাকটুকুও পুড়ে গেছে কখন।
তবু অভ্যাসবসত হুকোটায় দু-একটা টান দিয়ে হাল ধরে বসে আছে সে।
দাঁড় টানছে পুটু।
বংশী বলে, সামনের নশীপুরের হাটে একটুন তামাক লিবি পুটু।
পুটু জানে বাবার নেশার খবর।
বলে সে, লোব।
হঠাৎ নবগত বাবুদের তাদের খালের সম্বন্ধে এমনি মন্তব্য করতে দেখে বলে পুটু।
না গো বাবু খাল্ ছোট হলে কি হবেন, খুব গভীর জল ইখানে।
মোহনার মুখ কিনা, তবে ওপরের দিকে তত গভীর নয় ই খাল।
সুমিতা বলে, তাই জলেই ফেলবি নাকি?
পুটু বলে সলজ্জ ভাবে, কি যে বলেন গো?
পুটু আবার দাঁড়ের দিকে নজর দেয়।
ছোট ছেলেটার হাতদুটো বেশ মজবুত।
যান্ত্রিক গতিতে দাঁড় টেনে চলেছে।
খালে দু-এক শালতি দেখা যায়, ধানের বস্তা, পাটের গাঁট না হয় অন্য মালপত্র নিয়ে যাচ্ছে। আরও কিছু শালতি দেখা যায়, চলেছে ওরা খাল ধরে।
আর পায়ে চলা রাস্তাটা গেছে খালের ধার দিয়ে। দুপাশে বাঁশ বন, নারকেল গাছের জটলা ঘেরা গ্রাম বসত, তার মধ্যে দিয়ে লোকজন চলেছে। শরতের মিষ্টি রোদ ছড়িয়ে পড়েছে, দেখা যায় দূরের মাঠ, বিলের নিশানা।
শান্ত সুন্দর পরিবেশ এই বিস্তীর্ণ উদার প্রকৃতির বুকে এসে সুমিতা যেন ক্রমশঃ সহজ হয়ে আসে।
ওর কণ্ঠে গুন-গুন করে সুর ওঠে।
সমীরের শহরেই দিন কাটে!
তার দিনগুলো দশটা পাঁচটার ছকে বাঁধা। বৈচিত্র্য তবু সরমার আসাটা।
কলকাতার ছোট্ট একটা ফ্ল্যাট নিয়ে ঘর বেঁধেছে সমীর।
কিন্তু তার মনের একটু অতৃপ্তি রয়ে গেছে।
মনে হয় কি যেন চেয়েছিল, পায়নি।
তার মনের অতলের সেই অতৃপ্তিটাও এখানে প্রকৃতির উদার রাজ্যে এসে যেন মিলিয়ে গেছে। কাশফুলের বনে শ্বেতশুভ্রতার হিল্লোল, দু-একটা পাখি ডাকছে নীরবতার মাঝে, একটা রঙিন মাছরাঙা শূণ্যপথে ঘুরতে ঘুরতে জলের বুকে এসে আছড়ে পড়ে মাছ মুখে নিয়ে উড়ে গেল। সমীরের ভাল লাগে এই বিচিত্র জগৎটাকে।
কানে আসে মিষ্টি একটি সুর। চাইল সে।
সুমিতার গানটা ভেসে ওঠে।
কাশফুল ফোটা, শান্ত সুন্দর জগতে যেন এসে পড়েছে সমীর।
দেখছে সে সুমিতাকে, যে এতক্ষণ ধরে চলেছে একই ডিঙিতে সমীরের সঙ্গে।
দু-একটা নেহাৎ দরকারী কথাবার্তা হয়েছে।
সুন্দরী ওই মেয়েটি পরিচয় সে জানে না। তবু কেমন অজানা বিচিত্র আবেশ জাগে তার মনে। মনে হয় মেয়েটি যেন তার খুবই চেনা।
সামনের তীরে দেখা যায় একটা জনপদ।
খালের বুকে ডিঙি, শালতি দেখা যায়।

লোকজনের কলরব ভেসে আসে।

ওরা চাইল সেইদিকে।

পুটু বলে, দাদাবাবু, দিদিমণি সামনে নশীপুরের হাটতলা। বেশ বড় গঞ্জ, আর জাগ্রত বুড়িমায়ের মন্দিরও আছে।

বহু লোকজন আসে ফি শনি-মঙ্গলবার।

হঠাৎ এক সময় পুটু বলে ওঠে, এখানেই চা-ফা খেয়ে নিতি পারেন।

নাহলে পরের হাট পড়বে অনেক দূরে।

সে ভোজের হাটতলা।

এমন সরেস খাবারও পাবেন না সিখানে।

অর্থাৎ পুটুও চায় নশীপুরের হাটতলাতেই বাবুরা যদি চা-টা খায়, তারও ভাল হয়।

সমীরেরও চায়ের তেষ্ট পেয়েছে।

সকালে চপ খেতে পায়নি।

বলে সে, তাহলে এখানেই ডিঙি রাখো একটু পুটু খুশি হয়ে বলে, ও বাপ, হাটতুর ঘাটেই ডিঙি রাখো গো একটুন।

বাবুরা চা-ফা খাবেন।

আমরাও জলপানি নে আসি, তোমার আবার তামাকু চাইতো।

তামাকের জন্যই বোধহয় বংশী হাতের মোচড়ে ডিঙিটাকে তীরে ভেড়ালো।

তবু অভ্যস্ত চাহনিতে আকাশ আর গাঙের দিকে চেয়ে বলে, দেরি করিসনি বাপু।

জোয়ারের ঠেল তালি কমতি পড়ে যাবে।

উজোনে টানতি পারবি না এতটা পথ।

পুটু বলে ওঠে, বোঝা গেল না।

এদের বলে সে, চলেন বাবু, দিদিমণি।

ওরা হাটতলার মধ্যে এসে পড়েছে।

এজায়গাটা পীরগঞ্জ হাটতলার মত তেমন জমজমাট নয়, আর বাস রাস্তাও নেই।

বাস এখানে আসে না।

পল্লীগ্রাম অঞ্চল।

হাটবার আজ, নাহলে লোক সমাগম অনেকই হয়েছে।

ওদিকে দু-চারটে মিষ্টির দোকানে স্রেফ বাতাসা, আর নকুলদানা বিক্রি হচ্ছে।

বহু মেয়ে-বৃদ্ধাদের ভিড় জমেছে ওদিকে।

ঢাক-ঢোলও বাজছে একটা বটগাছের নীচের মন্দিরে, চাতাল নাটমন্দিরে বহু লোকজন-মেয়ে-পুরুষের ভিড়।

সবাই ফুল, নকুলদানা, বাতাসা নিয়ে চলেছে ওই মন্দিরের দিকে। মহা সমারোহে পুজো পাঠও হচ্ছে। সেখানে।

ঘণ্টা বাজে, সমবেত কণ্ঠে জয়ধ্বনি ওঠে— জয় বুড়ি মা কি জয়।

সমীর, সুমিতা একদিকে দাঁড়িয়ে ওইসব সমারোহ ভিড় দেখছে।

হঠাৎ কার ডাকে চাইল ওরা।

পুজো দেবেন না দিদি?

নশীপুরে এসেছেন বুড়িমায়ের মন্দিরে পুজো দেবেন তো?

লোকটা লম্বা টিকটিকির মত দেখতে।

সারা দেহের মাংস যেন হাড়ের সঙ্গে লেগে গেছে। মুখটা লম্বা, ড্যাবডেবে দুটো চোখ, আর কপালে ধ্যাবড়া বেশ খানিকটা মেটে সিঁদুর লেপা।

সুমিতা বিস্ময়ে বলে, বুড়ি-মা!

ও বুড়িমায়ের নাম এই প্রথম শুনছে।

সেই লম্বাটে লোকটা বলে বিস্মিত কণ্ঠে, সেকি!

মায়ের জগৎজোড়া নাম, আর আপনারা শোনেননি? নিজেই নাক-কানে হাত দিয়ে ওদের অজ্ঞতার জন্য দেবীর কাছে মাপ চেয়ে বলে, যাকগে!

এসে যখন পড়েছেন জানবেন মা-ই আপনাদের এখানে এনেছেন।

খুবই জাগ্রত দেবী। এখানে দেখুন না ওই গাছে কত হাজার লোক, মেয়ে-পুরুষ মানত করে গেছে। আর কতজন আসে মনস্কামনা পূর্ণ হলে মানসিক শোধ করতে।

মা খুবই দয়ামতী।

গাছের ডালে ঝুলছে অসংখ্য ইটের টুকরো।

ডালে ডালে বাঁধা টুকরোগুলো ঝুলছে। সেই লোকটা বলে, চলুন। পুজো দেবেন। দেখবেন বছরের মধ্যে কোল জুড়ে খোকা আসবে।

বংশোধর তো চাই! কি বলেন দাদাবাবু?

সুমিতার মুখ চোখ লাল হয়ে ওঠে।

লোকটা তাই দেখে পরম উৎসাহে বলে, চলুন। লজ্জা কি দাদা।

সংসার করেছেন সংসারধর্ম তো পালন করতে হবে।

সুমিতা এবার মুখ নিচু করে।

সমীরই ব্যাপারটা এবার বুঝে পরিস্থিতিটাকে সহজ করার জন্য বলে, না, না।

আমরা পুজো দিতে আসিনি।

লোকটার মুখে বিরক্তি ফুটে ওঠে।

হতাশও হয়েছে সে। ভেবেছিল বিদেশি জব্বর খদ্দেরই পাকড়েছে, কিছু রোজগার হবে।

কিন্তু সমীরের সাফ জবাবে এবার বিরক্তিভরা কণ্ঠে লোকটা বলে,

পুজো দেবেন না?

যাহোক কিছু? পাঁচ টাকা, না'সিকে-

সমীর বলে, বললাম তো পুজো দেব না! চলুন,সুমিতাকে ডেকে নিয়েই সমীর সরে আসছে, ওদিক থেকে খদ্দের ভেগে যেতে দেখে লোকটা তখন গজগজ করে, ধম্ম-টম্ম রসাতলেই যাবে এবার। বাবুদের ওই বিটকেলি, ঘর করব, তবে কুন ঝামেলায় নাই।

যত্তোসব।

সমীর সুমিতা সরে আসছে।

লজ্জাও পেয়েছে সুমিতা।

লোকটা তাদের দুজনকে একত্রে দেখে এমনি একটা কিছু ভাবে তা চিন্তা করেনি সে। এগিয়ে আসে পুটু। সেইই তাদের এমনি অপ্রীতিকর পরিস্থিতি থেকে যেন উদ্ধার করে।

বলে সে, কোথায় ছিলেন দাদাবাবু, দিদিমিণি?

চলেন, কালুমামার দোকানে চা-টা খেয়ে নেবেন।

তাড়াতাড়ি যেতে হবে।

ওদের ওই লোকজনের ভিড় থেকে সে বের করে নিয়ে এল। এদিকের একটা চায়ের দোকানে, বেঞ্চিটা নিজেই গামছা দিয়ে ঝেড়ে ঝুড়ে স্যাফ করে বলে, বসুন। তারপরই পুটু গলা তুলে কোন কালীমামার উদ্দেশ্যে হাঁক দিয়ে বলে, ও কালীমামা,দাদাবাবুরা কি নেবেন চটপট দাও বাপু!

ভালো ভেজিটেল উস্‌পিশাল চপ আর মিষ্টি-ফিষ্টি কি চান দেখ।

দোকানটার তত ভিড়ভাট্টা নেই।

যত ভিড় ওই মন্দিরের দিকেই।

বেশ কিছু ছেলেমেয়ে বুড়োবুড়ির দল ওদিকেব পুকুরধারে গাছতলায় পুজোটুজো দিয়ে এবার জলযোগ করতে বসেছে।

রাশিকৃত মুড়ি জলে ভিজিয়ে চপ, লঙ্কা সহযোগে চিবুচ্ছে। ওটা তাদের নিজস্ব রীতি।

তাই দোকানে ভিড় একটু কমই।

ওদিকে পুটুও বসে গেছে দোকান থেকে গামছায় মুড়ি আর চপ নিয়ে।

সমীর দেখছে সুমিতাকে। সেই লম্বাটে লোকটার কথায় কেমন লজ্জাই পেয়েছিল সে। বিয়ে বংশধরের আগমন-টাগমনের কথায় ঘাবড়ে গিয়েছে মেয়েটি।

সমীর ওকে চুপ করে থাকতে দেখে বলে, চপ,মিষ্টি, চা কিছু নিন।

সুমিতা কিছুটা সহজ হয়ে উঠেছে। বলে সে, একটু আগেই পীরগঞ্জে ভরপেট খেয়ে বের হয়েছি।

আর ওইসব খেতে গিয়েই তো নৌকোটা আপনি দখল করে নিলেন।

সমীর হাসছে। বলে সে, একা দখল করতে পারলাম কই?

আপনি খেয়েদেয়ে সৈন্যসামন্ত নিয়ে এসে আমার নৌকোয় দিব্যি দখলদারী করলেন।

সুমিতা বলে, তাই নাকি! বলেন তো এখানেই নেমে যাই।

সেকি! সমীক অবাক হয়। বলে সে, রাগ করলেন? এমনি ঠাট্টা করছিলাম।

সুমিতা, সহজভাবে আয়ত চোখ মেলে বলে, তবু ভালো।

সমীর বলে, সাংঘাতিক মেয়ে তো আপনি?

এই অচেনা জায়গায় নেমে পড়বেন?

দেখলেন তো ওদের কথাবার্তা!..... আর কি জানেন? একবার যখন নৌকোয় উঠেছেন আপনাকে নিরাপদে পৌঁছে দেবার দায়িত্বও একটা এসে পড়েছে।

সুমিতা দেখছে ওকে।

বলে সে, যাক, শুনে নিশ্চিন্ত হলাম।

এর মধ্যে কালীমামা দু'জায়গায় চপ আর পেল্লায় সাইজের দুটো করে ছানার ড্যালা মত রাজভোগ পদ্মপাতায় রেখে বলে, সেবা করেন।

সুমিতা প্রতিবাদের চেষ্টা করে।

সমীর ততক্ষণে চপে কাপড় দিয়ে বলে, বাহ! চপটা কিন্তু দারুণ করেছে।

নিন খেয়ে নিন! এখনও অনেক দূরের পথ। আর কি মিলবে জানি না।

বোধহয় এই খেয়েই দিন কাটাতে হবে।

সুতরাং দ্বিধা না করে খেয়ে ফেলুন।

ঠান্ডা হয়ে যাবে চপটা।

ওহে কালীমামা, আরও দুটো গরম চপই দাও। কালীমামা এহেন ভাগ্যে পেয়ে খুশি হয়ে আরও চপ এনে হাজির করে।

সুমিতা খাচ্ছে। সমীর বলে, লজ্জা করবেন না।

খেয়ে নিন সবকিছু। মামা দাম তো ছাড়বে না।

পুটুর জলপানি সারা হয়ে গেছে।

এবার সে তাড়া দেয় দিদিমণিকে।

সমীর বলে হ্যাঁ।

কালীমামাকে সব দাম মিটিয়ে দিতে দিতে বলে সমীর, তুইতো খেলি রে পুটু, তোর বাপের জন্যে কিছু জলখাবার নে? মুড়ি চপটপ-

পুটু বাবুদের কাছে এতটা আশা করেনি।

অন্য লোকদের নিয়ে যায় নৌকোয় তারা নিজেরাই খায়দায়।

ওদের জন্য থাকে পান্তাভাত আর লবণ, কাঁচালঙ্কা। এ বাবু, দিদিমণি তাকেও খাইয়েছে, আবার তার বাপের জন্যও খাবার দিতে চাইছে।

বাপটাকে ভরসা নেই পুটুর।
একক্ষণ একলা রেখে আসতে চায়নি সে।
এর মধ্যে একবার দেখে এসেছে বাবাকে, যা দেখেছে তাতে ভাবনাতে পড়েছে সে।
তাই তাড়াতাড়ি ফিরতে চায় নৌকোয়।
তবু বাবুদের কথায় বলে পুটু, তাহলে বাপটার জন্যে মুড়ি চপ বেগুনি নিই।
তাই নে।
বংশীর ধাতটা ক্রমশঃ বদলে গেছে।
আগে এমন ছিল না।
সেই বলিষ্ঠ জোয়ানটা ক্রমশঃ তার বড় ছেলের মৃত্যুর পর থেকেই বদলে গেছে।
জীবনের সব সুর যেন বংশীর হারিয়ে গেছে। মাঝে মাঝে বুকের ভিতরে একটা যন্ত্রণা ঠেলে ওঠে।
সেই ব্যথাটাকে ভোলার জন্যই বংশী মদ ধরেছিল। সেই মদের অভ্যাসটা এখন তাকে পেয়ে বসেছে। নশীপুরের ঘাটে নৌকো ভিড়তে পুটু বাবুদের নিয়ে নেমে যেতে বংশী কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকার পর কেমন তেষ অনুভব করে।
মাল তার মজুতই থাকে।
কাল পীরগঞ্জ হাটে সে দু'হাঁড়ি ধেনো গোপনে এনে পাটাতনের নীচে রেখেছিল।
এবার একটা হাঁড়ি বের করে আয়েস করে তারিয়ে তারিয়ে খেতে থাকে।
জানে সে বাবুদের চা-টা খেয়ে ফিরতে কিছু দেরী হবে, এই ফাঁকে বংশীও কয়েক গ্লাস চোলাই গিলে নিতে পারবে।
এদিক ওদিকে দেখছে আর আরাম করে চুমুক দিচ্ছে বংশী।
তাজা পানীয়টা তার ঝিমিয়ে পড়া দেহের শিরাতন্ত্রীতে এক সাড়া আনে।
হঠাৎ ঘাটের ওদিকে ভেড়ির মাথায় দিদিমণির শাড়িটা দেখে চাইল।
পুটু ওদের নিয়ে, চা পর্ব সেরে ফিরছে এবার নৌকোতে।
বংশীর পুটুকেই ভয়। এখুনি মদের হাঁড়ি দেখলে ছেলেটা চেঁচামেচি শুরু করবে।
তাই হাঁড়িটাকে পাটাতনের নীচে যথাস্থানে চালান করে কোনমতে গিয়ে হালে বসল।
নেশাটা ঠিক তখনও জমেনি।
পুটু বলে, গেরাপি তুলছি বাপ।
তুমি শিরোলিতে বসে মুড়ি চপ খাতি খাতি হাল ধরো, আমি বাইছি।
পুটু এর মধ্যে সমীরদের নৌকোয় তুলে নোঙর উঠিয়ে, ডিঙি খালের জলে নিয়ে গিয়ে, বৈঠা নামিয়েছে।
বংশী হাল ধরে আছে।
ডিঙিটা নশীপুরের হাটতলা ছাড়িয়ে আবার খালের বুকে ভেসে চলেছে বৈঠার টানে।
সমীর ওই নশীপুরের হাটতলা থেকে বুড়ো বামুনের কথাগুলো শুনে অবধি গুম হয়ে রয়েছে।
সুমিতা দেখছে সেটা।
রোদের তাপ বাড়ছে। গায়ে মাথায় চিড়চিড়ে রোদ লাগছে।
সুমিতা এর মধ্যে শাড়ির আঁচলটা ঘোমটার মত মাথায় তুলে দিয়েছে রোদের জন্য।
সুমিতাও লক্ষ্য করেছে সমীরের ভাবান্তর।
হঠাৎ ওসব কথা শোনার পর সমীর চুপ করে গেছে। সুমিতাও বুঝেছে কারণটা।
সুমিতার মাথায় দুষ্ট বুদ্ধি গজিয়ে ওঠে।
তাই বলে। এ্যাই! শুনছেন।
চাইল সমীর। দেখছে সে ঘোমটা টানা সুমিতাকে। একটু অবাকও হয় সমীর।
সুমিতার দু'চোখে মিষ্টি চাহনির আবেশ।

সুমিতা বলে, চুপ করে আছেন যে?

এমনিই। সমীর ওকে এড়াবার চেষ্টা করে।

সুমিতাও তেমনি জেদী। শুধোয় সে হালকা স্বরে, বিয়ে থা করেননি বুঝি?

কেন?

সুমিতার সারা মুখে চোখে মিষ্টি হাসির ঔজ্জ্বল্য জাগে। সে বলে, দেখেই বুঝেছি।

মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা করেননি অথচ বলছেন কলকাতায় থাকেন।

আমি নৌকোয় উঠে আপনার অসুবিধেই করেছি। সমীর একটু বিরক্তি বোধ করে, ওই অজানা মেয়েটির এইসব কথায়।

মনে হয় ভুলই করেছে সে অচেনা মেয়েটিকে নৌকোয় তুলে।

এখন ইচ্ছে করলেই মেয়েটি তাকে বিপদে ফেলতে পারে। মেয়েটির যেচে এইসব কথা বলাটা তার ভালো লাগে না।

সমীর এড়াবার জন্যে বলে, কলকাতায় থাকলেই বুঝি মেয়েদের সঙ্গে বেলাল্লাপনা করতে হয়?

সুমিতা বলে, না। তা কেন হবে।

তবে সঙ্গে যাচ্ছি, একটু কথাবার্তাও তো বলতে পারেন। মনে হচ্ছে জোর করে আপনার নৌকোয় উঠেছি তাই রেগে আছেন এখনও।

সমীর বলে, না না রাগব কেন?

হঠাৎ কাদের কলরব শুনে চাইল ওরা।

বেশ বেলা হয়েছে।

এতক্ষণ জোয়ারের চাপে নৌকোটা ভালোই এসেছে। এবার ভাটার টান শুরু হতে নৌকোর গতিও কমেছে। বাচ্চা ছেলেটা রোদে ঘেমে নেয়ে দাঁড় টানার চেষ্টা করছে, দাঁড় জলে পড়ছে কিন্তু নৌকো এগোচ্ছে না। বরং পিছিয়ে চলেছে।

বুড়ো মাঝি হাল মারছে।

সেও ধনুকের মত বেঁকে গেছে।

কিন্তু দুজনের সমবেত চেষ্টাতেও নৌকো নড়ে না।

স্রোতের বিপরীতে নৌকোটা কাঁপছে থরথরিয়ে। বংশী বলে, বাবু, কোটালের গোণ এর ভাটি শুরু হয়েছেন, নৌকো ইজানে যাবে না এখন! যা টান গো। সমীর চটে ওঠে। আগে বলনি কেন?

মাঝি বলে, জলপথের মেজাজ বুঝে চলতে হবন বাবু। আগে কোথাও ঠাঁই দেখে গেরাপি করছি। কাছেই গুপিনাথপুরের হাটতলা, ঘণ্টা তিন চার জিরিয়ে রান্না খাওয়া করে নেন।

তারপর জোয়ার এলেই নৌকো ছাড়ব, সাঁঝ-বেলাবেলি না হয় একপ্রহর রাত পৌঁছে দেব শীতলপুর ঘাটে। বেগোন হই গেল পথের মধ্যিখানে।

দেরিতে হবেই, গোণ-বেগোনের ব্যাপার তো আছে। সমীরের শিরে যেন বাজ পড়েছে।

গর্জে ওঠে সে, দিনভোর এইখানে পড়ে থাকতে হবে?

এমন জানলে কে আসত এই ধাপধাড়া গোবিন্দপুরে? তখন বলোনি কেন?

এখন দেখছি মহা বিপদেই ফেললে।

সুমিতাও শুনেছে কথাটা।

সমীরের রাগ দেখে সেও যেন মজা পেয়েছে। তাই সে বলে ওঠে, তাহলে ভাটার টান শুরু হয়েছে, নৌকো নিয়ে আবার পীরগঞ্জের হাটতলাতেই ফিরে যান। শেষ বাস পেয়ে গেলে রাত ন'টা নাগাদ কলকাতায় পৌঁছে যাবেন।

দরকার কি ওই ধাপপাড়া গোবিন্দপুরে গিয়ে?

কি এমন রাজকাজ আছে সেখানে যে যেতেই হবে।

সমীর যেন পারলে তো তাই করত।

কিন্তু সঙ্গে ওই মহিলাটি জুটেছে।

সে বলে, আর আপনি?

আপনি কোথায় যাবেন।

সুমিতা বলে, যদি নিয়ে যান সঙ্গে করে আপনার সঙ্গেই যাব।

আমারও তাহলে উজানে গিয়ে দরকার নেই।

এ্যাঁ! চমকে ওঠে সমীর। মেয়েটি বলে কি!

কোন ভয়-ডরও নেই।

সুন্দরী মেয়েটা, বাইরে এমন শান্ত সুন্দর রূপ কিন্তু এমনি বেপরোয়া ওর মন সেটা ভাবেনি সমীর।

ওই মেয়েটির পরিচয়ও জানে না সে।

হয়তো সঙ্গেই যেতে পারে, সেই ভয়ে সমীর ফেরার কথা ভাবে না আর।

তাছাড়া, সরমা, তার স্ত্রীও অপেক্ষা করে থাকবে। শ্বশুরমশায়ও বারবার করে যেতে বলেছেন, এতদূর থেকে ফিরে যাওয়াটা ঠিক হবে না। ভাবছে সমীর।

কি, ভয় পেয়ে গেলেন নাকি? হাসছে সুমিতা।

ওর সুন্দর মুখখানা ঘামে টসটস হয়ে উঠেছে।

সমীর ওর কথায় বলে না।

এতদূর এসে ফিরে যাব না।

তাছাড়া আপনাকেও তো যেতে হবে শীতলপুর।

আমার জন্যেই যাচ্ছেন তাহলে?

কৌতুকের স্বরে প্রশ্ন করে সুমিতা।

বলে সে, শুনে খুশি হলাম, তবু আপনি আমার কথা ভাবেন।

বুঝলেন,এতবড় দুনিয়ায় আমার জন্যে ভাবার আর কেউ নেই। সবাই যে যার নিজের চিন্তা নিয়েই ব্যস্ত। একটু কাছে ঘেঁসেই বসার চেষ্টা করে সুমিতা। ছোট নৌকোর পরিসর, কাছে ঘেঁষে বসা মানেই গায়ে গা ঠেকে যাওয়া।

সমীর অপ্রস্তুত বোধ করে।

এমন সময় দেখা যায় ঘাটে মেয়েদের, ওরা চেয়ে দেখছে নৌকোয় এদের ঘনিষ্ঠ হয়ে বসা দুজনকে। একটি মেয়ে বলে, পুজোতে নতুন বরকণে বোধহয় জোড়ে শ্বশুরবাড়ি থেকে ফিরছে।

অন্য একটি মেয়ে বলে, দুটিতে কিন্তু মানিয়েছে বেশ।

ছোট, অপরিসর গাও। তীরের বৌ-ঝিদের কথাগুলো শোনা যায়।

সমীরের কানে আসে ওদের কথাগুলো।

ছেলের দল সাঁতরে তাদের নৌকোর কাছে এসে যেন নতুন বরকণেকে কৌতুহলী চাহনিতে দেখছে। পুজোর মুখ।

এখন পল্লীঅঞ্চলের মানুষের ঘরে ফেরার দিন।

সদ্য বিবাহিতা মেয়ের আসে জোড়ে বাবা-মায়ের কাছে। ছেলেরা ঘরে ফেরে সস্ত্রীক। মফঃস্বল অঞ্চলে তখন এই নিয়েই ওঠে খুশির সাড়া।

ছোট খালটা এমনিই যাত্রীদের ভিড়ে ভরে ওঠে।

আশপাশের গ্রামের বৌ-মেয়েরাও ঘরে ফেরা বর-বৌদের দেখে, ছেলেরা খালের ঘাটে স্নান করতে নেমেও সাঁতরে নৌকোর কাছে এসে বর-বৌ দেখে, মন্তব্য করে। এসব মন্তব্য, কথার টুকরো, ছেলেদের কলরব সমীরের কাছে বিশ্রী ঠেকে।

ধমকে ওঠে সে সন্তরবণরত কৌতূহলী ছেলেদের।

এ্যাই কি হচ্ছে?

সরে যাও বলছি।

হাসছে সুমিতা। সেও বেশ মজা পেয়েছে।
এ যেন তার কাছে উপভোগ্য বিষয়ই।
সমীরকে প্রথম থেকে দেখে আসছে।
কয়েকঘণ্টার পরিচয়ে মনে হয়েছে একটি সিরিয়াস টাইপের ভাল ছেলেই!
তাই চঞ্চল সুমিতাও এবার ওকে নিয়েই মজা করতে চায়।
সমীরের ধমকে হেসে ওঠে।
সমীর ওকে হাসতে দেখে একটু রেগেই ওঠে।
সুমিত এই ঘোমটা দিয়েই কণে-বৌ সেজে বসেই বিপদটা বাড়িয়েছে।
তাই সমীর বলে, হাসছেন?
সুমিতা অবাক হবার ভান করে বলে, কেন?
ওরা ওইসব আজে-বাজে কথা বলছে, আর চুপ করে সইবো?
সমীর কঠিন কণ্ঠে জানায়।
সুমিতা বলে, প্রতিবাদ করে লাভ কি?
ওরা দেখতে চায় দেখুক। দেখে চুপচাপ ফিরে যাবে।
সমীর কড়াস্বরে বলে, খুব ভালো লাগছে আপনার, না? দয়া করে ঘোমটাটা খুলে বসুন।
সুমিতা আরও আরষ্ঠতার ভান করে ঘোমটা দিয়ে বলে, রোদ লাগছে যে।
ছই-এর ভিতরে বসুন। সমীর ধমকাছে ওকে।
সুমিতা যেন মজা পায় ওর কথার স্বরে। বলে সে, সিন-সিনারি দেখতে দেখতে যাবো বলেই বাইরে বসেছি।
সমীর কি বলতে গিয়েও থেমে গেল।
নৌকোর গতিবেগ কমে এসেছে।
দাঁড় টেনেও এগোনো যায় না। হাঁপিয়ে উঠেছে পুটু।
হাল মারছে এবার বুড়ো বংশী। কিন্তু এগোচ্ছে না। যেন পিছিয়েই যাবে।
ভাটার টান এবার জোর শুরু হয়েছে।
বংশী বলে, বাবু, নৌকো নে উজানে যাওয়া যাবেনি। এখানেই গেরপি করি, ঘণ্টা তিনেক জিরিয়ে খা-দাওয়া করে নিন।
টান কমলে যাব আবার।
অর্থাৎ এখন আর যাওয়া যাবে না।
এখানেই এই গ্রামের নীচে পড়ে থাকতে হবে।
লোকজন বৌ-মেয়েরা কৌতূহলী চোখে দেখছে তাদের।
সেই পরিস্থিতিটাকে ভাবতেও পারে না সমীর।
তাই সমীর বলে, একেবারে দয়ে মজাবে তাই ভাবছি।
তবে এখানে নয়, যেভাবে হোক আরও খানিকটা নৌকো বেয়ে দূরের ওই বাগান মত দেখা যাচ্ছে ফাঁকায় ওখানেই চলো।
সমীর লোকালয় থেকে দূরে এদের কৌতূহল এড়াবার জন্য ওই বাগানের ধারে নৌকো বাঁধতে চায়।
সুমিতা অবাক হয়।
বলে সে, ওই মাঠের মধ্যে নৌকো বাঁধবেন!
সমীর বলে, হ্যাঁ ওইখানেই বাঁধবো। আপনার আপত্তি আছে?
সুমিতা হাল্কা স্বরে বলে, না না আপত্তি হবে কেন। আপনার নৌকো যেখানে খুশি বাঁধবেন।
তবে আমার খিদে পেয়েছে। মাঝ মাঠে কি কিছু পাওয়া যাবে?

পুটু বলে, সে ব্যবস্থা হয়ে যাবে দিদিমণি।
গাঁ তো আশপাশেই আছে। পয়সা দেবেন খাঁ করে সব কিনে কেটে আনব।
দিব্যি বেড়ে নিতি পারবেন।
সমীর বিরক্তিভাবে চাইল। সুমিতা হাসছে তখনও। জায়গাটা নিরিবিলিই।
একটা বাগানও রয়েছে।
আম-কাঁঠাল-বাঁশ গাছ-এর আশপাশে রয়েছে কলাগাছের সবুজ পরিবেশ।
ওদিকের জমিতে কিছু সব্জী চাষও হয়, বেগুন-পুঁই-কমড়ো গাছও রয়েছে।
তারপরেই বিস্তীর্ণ ধান মাঠ, আল পগারের উপর গজিয়েছে শরতের নিয়ে সাদা কাশফুলের বন। হাটবাজার একটু দূরে।
বুড়ো মাঝি বলে গাছতলায় উঠে বসেন দাদাবাবু,দিদিমণি। তা সেবা-টেবার কি হবেন? পুটু ততক্ষণে ছেঁড়া আলাইটা এনে পেতেছে আমতলায়।
নৌকো থেকে ওদের নামতে দেখে বাগানের একজন বুড়ো চাষী মাঠের কাজ ফেলে এগিয়ে আসে বুড়োর জায়গায় তারা আজ অতিথি।
বুড়ো চাষী এসে ওদের দেখে বলে, আসুন আসুন, তা মাঝি ভাটির মুখে উজোনে যাতি পারব নাতো। বৌমা ইখানে হাঁড়ি কড়া আছে। আমরা সদগোপ। জল টল বটি দিই, চাল-ডাল সেদ্ধ করে নেন, আনাজপত্তর, দুধ আছে।
চাষবাড়ি তো, নালে যুগলে রয়েছেন, এখন আপনাদের হাংনামা করতি হত না।
তা বাপের বাড়ি যেছেন পুজোয় কত্তাকে নে?
সুমিতা জবাব দিল না। আসছে সলজ্জভাবে।
সমীর মনে মনে চটে উঠেছে। বলে সে, ওসবের দরকার হবে না।
রান্না-বান্না করতে লাগবে না।
চাষী বলে তাই কি হয় বাবু, কচি মেয়েটার মুখ শুকিয়ে গেছে, খিদে তেষ্টা বলে কত্তা।
তা বৌমা আমি ওজাকে বলে গেছি, যা দরকার নে নিও।
আমার বাগানে এসে উপোস দেবে তা কি হয়।
সুমিতা বলে, ঠিক আছে।
বুড়ো চাষী ডাকতেই ভজহরি এসে পড়ে।
বুড়ো বলে, বৌমারা সেবা করবেন।
চাল,ডাল আনাজপত্তর দুধ, যা লাগে নে আয়। ওদিকে রাজুর দোকানে গে আমার নাম করে বলে নে আয়। চল আমার সাথে।
চলে গেল ওরা।
...সুমিতা যেন একবেলার জন্য এই ছায়াময় শান্ত পরিবেশে সংসার পেতেছে কি মমতায়।
এর মধ্যে পুটুকে পয়সা দিয়ে বলে, হাটতলা থেকে নুন, তেল, মাছ যদি পাস আনবি।
পুটু বলে, একত্রে বল্লে ভুলে যাব বৌঠান।
এর মধ্যে পুটুও এদের পরিচয়টা যেন জেনে ফেলেছে। তাই ওই নামেই ডাকে।
সুমিতা বলে, ঠিক আছে, লিখে দিচ্ছি।
নিজের ব্যাগ থেকে নোট বই লিখতে গিয়ে কলমটা পায় না। ওটা রয়েছে সুটকেশে।
সে সমীরকে বলে, কলমটা?
বলেই সমীরের বুক পকেট থেকে কলমটা তুলে ফর্দ লিখতে থাকে।
পুটু পয়সা-ফর্দ বুঝে নিয়ে বলে, আসছি বৌঠান। যাব আর আসব। বাপ রইল।
বুড়ো মাঝি বংশী এবার গাছতলার ইটপাতা অস্থায়ী উনুনে কাঠ-কুঠো দিয়ে আগুন জ্বেলেছে।
সুমিতাও পাকা গিন্নীর মত গাছ কোমর করে ভাতের হাঁড়ি চাপিয়েছে, বাগান মালিকের লোক এর মধ্যে সবই হাজির করেছে।

সব জোগার যন্তর করে বংশী এতক্ষণ পর একটু ছুটি পেয়েছে।
বাগানের কাজ করার লোক ভজহরির সঙ্গে এর মধ্যে তার আলাপও জমে উঠেছে।
দুজনে যেন খুবই চেনা জানা।
বংশী বলে, পুটু এলে যেন নৌকার দিকে নজর রাখে মাঠান।
আমি একটুন আসছি উদিক থেকে।
রান্নাবান্নার দেরি আছেন তো।
বৈকাল নাগাদ খেয়ে দেয়ে জোয়ারের টান লাগলেই লা ছাড়ব।
দেরি হবে না যাতি।
ওদের অভয় দিয়ে বংশী ভজহরির সঙ্গে গাছ গাছালি ঘেরা বাগানের ওদিকে চলে গেল।
সেখানে ভজহরির ডেরা।
শান্ত সুন্দর পরিবেশ, মাঝে মাঝে ছায়াঘন বাগানে দু-চারটে পাখির ডাক শোনা যায়। উনুনে ভাত চাপিয়ে সুমিতা এর মধ্যে ব্যাগ থেকে গামছা সাবান বের করে বলে, বড় গরম।
স্নান করবেন না?
সমীর ওদিকের গাছতলায় ছেঁড়া তালাই-এ বসে আছে। মেয়েটির এই ব্যাপারগুলো ভাল লাগেনি তার। ওর কথায় সমীর বলে, স্নান করবেন নাকি আপনি এই জলে?
সুমিতা বলে ঘামে ভিজে গেছি।
নদীর ঠাণ্ডা জলে স্নানই করে আসছি।
ভাতের হাঁড়ি চাপানো রইল দেখবেন।
সমীর শোনায়, ভাতের চিন্তা এখানেও?
হাসে সুমিতা, অন্নচিন্তা থাকবে না?
না। আমার খিদে নেই। সমীর জানায় চড়া স্বরেই।
সুমিতা শোনায়।
রাগ আপনার এখনও যায়নি দেখি।
কে আছে মশাই আপনার ওই শীতলপুরে যে পৌঁছোতে দেরি হচ্ছে বলে এত রাগছেন?
আমার কিন্তু খুব ভাল লাগছে। মনে হয় পথেই ঘর বেঁধেছি আমরা। বেশ তো আছি।
সমীর গুম হয়ে থাকে।
সুমিতা হাসতে হাসতে গিয়ে নদীতে নামল।
সমীর শুধোয় সাঁতার জানেন তো?
সুমিত বলে, ডুবে মরার সাধ আমার নেই।
আঃ মুখটা একটু ফেরান না।
একজন মহিলা স্নান করছে, এদিকে চেয়ে আছেন?
সমীর ওদিকে ঘুরে বসল বিরক্তি চেপে।
তবু মনে একটা সাড়া জাগে সমীরের।
পুরুষের মনের এই চিরন্তন কামনার কোন কারণ নেই। এ সহজাত।
মেয়েটির সম্বন্ধে ভাবছে সমীর।
কথাবার্তায় হাসিতে যেন একটি রহস্যময়ী সে।
ওকে চেনে না,তবু সহজভাবে মিশে গেছে।
সমীরের মনে পড়ে সরমার কথা। দুজনের বিয়ে হয়েছে, সরমা ধনীর দুলালী। বাপের একমাত্র মেয়ে। একটা অহঙ্কার রয়ে গেছে তার মনে।

তার তুলনায় সমীর গরীবই।

সেই বোধটাকে মন থেকে মুছে ফেলতে পারেনি সমীর। কোথায় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অদৃশ্য প্রাচীর গড়ে উঠেছে।

এক জায়গা! সমীরের মনে তাই শূণ্যতা রয়ে গেছে। দুজনে কোথায় দূরেই সরে আছে মনের দিক থেকে। তার তুলনায় এই মেয়েটি অনেক সহজ,সহজ পথের সব কষ্ট হাসিমুখে মেনে নিয়েছে। কাছে এসেছে। সমীরের বিদ্রোহী মন কোথায় যেন অনেক নরম হয়েছে।

চমকে ওঠে গানের সুর শুনে।

শান্ত ছায়া ঢাকা জগতে, ধানক্ষেতের শিহরণ লাগা বাতাসে বাগানের পদ্মবনে ওই সুর ছড়িয়ে পড়ে।

মিষ্টি গানের সুর ওঠে।

চাইল সমীর। সদ্য স্নান সেরে উঠেছে সুমিতা।

পরনে ধানি রং শাড়ি, মুখ চোখে স্নিগ্ধতার ছোঁয়া, মাথায় দীর্ঘচুল খুলে গামছা দিয়ে ঝাড়ছে। নিটোল অনাবৃত দুটো মোম রং হাত, সারা দেহ কাঁপছে সেই ছন্দে।

গুন-গুন সুরে গান গাইছে আপন খুশিতে মেয়েটি। সমীর এই বিচিত্র ছায়া নির্জন পরিবেশে এমনি একটি মনোরম মুহূর্তের স্বপ্নই যেন দেখছিল।

সে চেয়ে থাকে সুমিতার দিকে।

হঠাৎ চমকে ওঠে সুমিতা। এ্যাই রে! ভাতে জল নেই। হাঁ করে চেয়ে কি দেখছেন, জল দিন, এ্যাই। বেশ তো ড্যাপের ড্যালার মতো বসে আছেন।

সমীরও দৌড়ল। ভাত তখন চড় চড় করছে। সমীর জল ঢালছে হাঁড়িতে।

সুমিতা এসে পড়ে ততক্ষণে। ওর সদ্যস্নান দেহের সুরভি লাগে সমীরের নাকে।

সুমিতার চোখে কি বিচিত্র চাহনি ফুটে ওঠে।

সমীরকে সরিয়ে দিয়ে বলে হাসতে হাসতে সুমিতা, দেখি।

খুব কাজের লোক দেখছি। বিয়ে-থা করেননি বেঁচে গেছেন, নাহলে, বৌয়ের ধাতানি খেতে খেতে প্রাণ যেত।

এইটুকু সামান্য কাজই করতে পারেন না।

সুমিতা ভাতে জল দিয়ে নাড়তে থাকে।

সমীর বলে, মেয়েদের যা নমুনা দেখছি তাতে আর সখ নেই।

তাই নাকি। সুমিতা চাইল ওর দিকে।

ডাগর কালো চোখে কি ঝিলিক ওঠে।

বলে সুমিতা, সব মেয়েই ত্যমন নয় মশাই। অবশ্য পুরুষেরা সবাই এক ধাতেরই।

সমীর শুধোয়, কেন তাদের অপরাধটা কি?

সুমিতা বলে, তাদের চোখের নেশা কোনদিনই মিটবে না।

সমীর চমকে ওঠে। হাসছে সুমিতা।

ও যেন তাকে রসিকতাই করছে।

নির্মম রসিকতা।

পুটু এসে পড়ে, মাঠান। সব এনেছি। মাছও পেয়েছি, একেবারে কেটেকুটে এনেছি গো!

সুমিতা খুশি হয়। বলে সে, মাছের ঝোল চাপিয়ে দিচ্ছি এবার।

রান্না হয়ে এল। চান-টান করে নে।

পুটু শুধোয় এদিক ওদিক চেয়ে, বাপটা কোথায় গেল মাঠান। তাকে দেখছি না।

পুটু তার বাপকে চেনে। আর এই জায়গাটাকে চেনে সে।

এই খালের দুপাশের সব গ্রাম, এখানে কিছু লোকজন তার চেনা। এই খাল দিয়েই যাতায়াত করে তারা। এখানে ঘোষমশাইয়ের এই চাষবাড়ির ঘাটেও মালপত্র, সার, বীজধান এসব এনেছে তারা পীরগঞ্জের গুদাম থেকে।

ঘোষমশাইয়ের চাষবাস বেশ ভালই। এখানের মাহিন্দার ভজহরিকে চেনে পুটু। তাই এখানে এসে তখন দেখেছিল ভজহরিকে, ভজহরিও তাকে তার বাবাকে চেনে।

পুটু এতটা ভাবেনি তখন। দিদিমণি, দাদাবাবুদের মাল কিছু নামিয়ে নৌকোটাকে গেরাপি করেই পাশের গ্রামে গিয়েছিল রান্নার জন্য হাঁড়ি, চাল,ডাল, আলু, মাছ, মশলাপাতি আনতে। এবার খেয়াল হল তার।

তাই খবর নেয় দিদিমণির কাছে।

কিন্তু সেও তেমন কিছু পাত্তা দিতে পারেননি তার বাবার। ভাবনাতে পড়ে পুটু।

বলে সে, কোতা গেল তাহলে বাপটা?

সুমিতা মাছের ঝোলটা রাঁধতে ব্যস্ত। বেলা পড়ে আসছে।

এদিকে জোয়ারের ঠেলও এসে পড়বে, সকাল সকাল বের হতে পারলে ভাল হয়।

তাই পুটুর কথায় বলে সুমিতা, তোর বাপ হারাবে না। দেখ এদিক ওদিক কোথাও আছে।

আর দেখা হলে তাকেও ডেকে এনে চানটান করে নে। রান্না হয়ে গেছে।

এবার খেয়েদেয়ে মালপত্র তুলতে তুলতেই জোয়র এসে যাবে। পুটুও তা জানে! তাই বাবাকে খুঁজছে সে।

বংশী ঘোষমশাইয়ের চাষবাড়ির ঘাটে নৌকো লাগাবার কথাতে খুশিই হয়েছিল।

আরও খুশি হয়েছিল এখানে নৌকো লাগিয়ে তার পুরোনো মিত ভজহরিকে দেখে।

ভজহরিও রসিক ব্যক্তি। ঘোষমশাইয়ের এই মাঠের চাষ-বাড়িতেই থাকে।

দিনভোর এখানে মাঠে কাজ করে, লোকজনের কাজের তদারক করে, সন্ধের পর একাই এই চালাঘরে মদের সাজসরঞ্জাম নিয়ে বসে।

এ দ্রব্য সে নিজেই তৈরী করে।

তার মালের নামডাক আছে এদিকে।

তাই বংশী ভজহরিকে দেখে খুশি হয়।

কেমন আছিস ভজা?

ভজহরিও এগিয়ে এসে বলে, তাহলে দুপুরে থাকছ ইখানে?

বংশী বলে, থাকতেই হবে দেখছি। বেগোন পড়ে গেল। ভজহরি ঘোষমশাইয়ের ডাকে অতিথি সৎকারের ব্যাপারে এগিয়ে যায়।

বলে, বোস বংশী, ওদের ব্যবস্থা করেই আসছি। তারপর গলা নামিয়ে বলে ভজহরি, এক নম্বর মাল আছে রে।

বংশীর চোখ দুটো বেশ চকচকে হয়ে ওঠে।

তবু বলে সে, সওয়ারী নে যাচ্ছি যে।

খুবই যেন বিপদে পড়েছে সে সওয়ারী নিয়ে তার নৌকোয়।

ভজহরি বলে, তাতে কি! একটুন টেস করবে মাত্তর। এতদিন পর এলে এদিকে শুধু মুখে ছেড়ে দিই কি করে?

তা তুমি বাপু আমার বাগানের ওই কোণের ঘরে গে বসো, ওদিকের কাজসেরেই যাচ্ছি আমি।

বাগানের এদিকে ঘন কলা আর নারকেল সুপুরির বন গজিয়েছে। বাগানটায় রকমারি গাছগাছালির ভিড়।

ঘোষমশাই সখ করে এই বাগানটা করেছে, তার ওদিকেই বিস্তীর্ণ ক্ষেত।

এখনও ধান পাকেনি, তবু সবুজ ধানের দিগন্ত প্রসারী মাঠে শরতের পূর্ণতা লেগেছে।

হাওয়া কাঁপে ধানক্ষেতে।

বংশী ওদিকের ছোট ঘরটায় বেশ যুৎ করে বসেছে, ভজহরিও এসে হাজির হয়।

একটা ছোট টিনের কৌটো থেকে মুড়ি, মেয়োনেক চানাচুর বের করেছে একটা সানকিতে, পিঁয়াজ কাঁচালঙ্কাও রয়েছে।

এবার তার এক নম্বর মাল বের হয়।

বংশী একঢোঁক গিলে বলে, হ্যাঁ!

খাসা মাল বানাস ভজা।

এমন দ্রব্য সারা আবাদে মেলে না রে! আ হা-

সমীরের ভাল লাগে এই অবাধ মুক্তির স্বাদ।

এ তার কাছে নতুন । এর মধ্যে স্নান করেছে সে নদীতে। ঠান্ডা জলে স্নান করে তৃপ্তি পায়।

মনের জ্বালাটাও কমে গেছে।

সুমিতা এর মধ্যে গাছের ছায়ায় পুটুকে দিয়ে কলাপাতা কাটিয়ে এনে জায়গা করেছে।

খেতে দিয়েছে সমীরকে, সমীরের যে এত ক্ষিদে পেয়েছিল জানত না সমীর।

ভাত, আলুসেদ্ধ, আর মাছের ঝোল। সুমিতা গৃহিণীর মত খাবার দিয়েছে। সমীর খেয়ে চলেছে।

সমীরের মনে হয় জীবনের এই স্বাদ সে আগে পায়নি। সরমা তার স্ত্রী হয়ে এসেছে, কিন্তু ধনীর দুলালীর সঙ্গে তার মা জননীই মেয়ের সংসারে কাজ করার জন্য পুরনো কাজের মেয়েকেই সঙ্গে পাঠায়। বাড়ির কাজকর্ম, মায় রান্নাবান্নাও করে।

অফিসের সময় তার দেওয়া ভাতই নাকে মুখে গুঁজে দৌড়োয় সমীর।

সরমা কোনদিন এসে দাঁড়ায়, কোনদিন আসে না। কই খান! রান্না ভাল হয়নি বুঝি?

সমীরের চমক ভাঙে। সুমিতার ডাকে।

কি ভাবছেন? খান।

সুমিতার দিকে চাইল সমীর। বলে, না। এইতো খাচ্ছি। দুবার ভাত নিলাম, আর কত খাব?

আর রান্নাও চমৎকার হয়েছে।

বেলা পড়ে আসছে। সুমিতা বলে, পুটু খেয়ে নে আমার সঙ্গে।

পুটু বলে, বাপটা এখনও এলো নাই।

নদীর দিকে চেয়ে দেখছে সে।

ছেলেটা গাঙের ধাত চেনে। বলে সে, স্যার ভাটি হয়ে এসেছে, এবার জোয়ারের ঠেল আসবে।

খেয়েদেয়ে লা ছাড়তে হবে। সুমিতা বলে, তুই খেয়ে নে। তার মধ্যে লোকটা ঠিকই ফিরবে।

খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেছে পুটু আর সুমিতার।

একবেলার পথের সংসারের সময় ফুরিয়ে আসছে।

দুপুরের রোদ এবার সোনালী হয়ে আসছে বাগানের গাছগাছালির মাথায়, ধান ক্ষেতের বুকে। সমীর বলে কোথায় গেল বংশী।

এদিকে নৌকো ছাড়তে হবে।

কখন পৌছবো কে জানে? পথতো এখনো অনেক।

সুমিতা বলে, পুটু গেছে খুঁজতে ওর বাবাকে।

এসে পড়বে এখুনি।

সমীর শোনায়, দুজনেই কেটে পড়বে কিনা কে জানে।

অচেনা পথ, তারপর সন্ধ্যা নামবে।

পড়ে থাকতে হবে এই আম বাগানে।

সুমিতাও ঘাবড়ে যায়। বলে সে, সত্যিতো কোথায় গেল তারা।

হঠাৎ ওদিকে কলাবাগানের আড়ালে পুটুর চীৎকার আর কার অস্পষ্ট স্বরের গোঙান, জড়িত কণ্ঠের চীৎকার শুনে চাই,ওরা।

চমকে ওঠে সমীর ব্যাপারটা দেখে। সুমিতাও দেখছে বংশীকে।

বুড়ো লোকটার হাঁটার সাধ্য নেই।

টলছে, পুটু ধরে টেনে আনছে তাকে, মাঝে মাঝে লোকটা ছিটকে পড়ছে ভিজে মাটি, আগাছার বনের ওপরই।

পুটু ডাকছে, এ বাপ ! বাপ হে—

গজরাচ্ছে বংশী, চোপ শালার ব্যাটা শালা! কুন শালা তুর বাপ রে? ছেড়ে দে বলছি।

বংশী একজায়গায় ছিটকে পড়ে আবার ঝোপের উপর।

সুমিতা শুধোয়, কি ব্যাপার। কি হয়েছে ওর।

সমীর ব্যাপারটা বুঝেছে। আরও বুঝেছে তাদের দয়ে মজিয়েছে ওই বংশীচন্দর।

সুমিতার কথায় সমীর বলে, ব্যাটা সারা দুপুরভোর মদ গিলে বেটার মাতাল হয়ে পড়েছে।

দেখছেন না। বংশী কেমন টান টান হয়ে ঘাসের ওপর পড়ছে।

পুটু গর্জায়, তখনই জানতাম বাপটা ঠিক কুথায় জুটে গেছে।

এখন জোয়ার এল তো বাপটো লিশায় টর হই গেল। নৌকা বাইবে কে?

নদীতে জোয়ার শুরু হয়ে গেছে। তাদের নৌকোটা নড়ছে। কিন্তু চালানোর লোকই তখন বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছে।

সমীর বলে, এ জোয়রাও চলে যাবে,কতক্ষণে ওর হুঁশ ফিরবে কে জানে।

কি রে পুটু? পারবি যেতে?

পুটুও ভাবনায় পড়ছে। বলে সে, সামনেই দুটো খালের মুখ বাবু, নোনাপুরের বাওড়।

ওখানে স্রোত বড় খর। একা পারবিনি বাবু নৌকো সামলাতি।

তাহলে কি হবে?

সুমিতার মুখে ভাবনার ছায়া নামে।

অচেনা এই সুন্দর বাগানে বৈকালের ছায়া নামছে। দিনের আলো কমে আসে, ধান ক্ষেতে ফিকে হয়ে নামছে সন্ধের ছায়া।

এতক্ষণ সুন্দর লাগছিল জায়গাটা।

একটা দিন যেন স্মরণীয় হয়ে উঠেছিল ওদের কাছে।

এবার সেই খুশিটা পরিণত হয়ে ওঠে জমাট আতঙ্কের কালো বিবর্ণতায়।

হঠাৎ ওদিকের বাঁধ থেকে নামছে এখানের মালিক ঘোষমশাই, বলে সে, সেবা-টেবা হয়েছে মা জননী!

তাহলে জোয়ারও এসেছে নৌকো ছাড়বে?

ভাবলাম চলেই গেছ তা দেখা হয়ে গেল। ওকি! ঘোষমশাই দেখছে বংশীকে। বংশী তখন নেশার চোটে গড়াচ্ছে।

ওদিকে ভজহরিরও পাত্তা নেই। চাষী বলে, এ ব্যাটা ভজার কাণ্ড মা জননী, এতকরেও ওকে মদ ছাড়াতে পারলাম না।

আর ওই মাঝিটাও গিলেছে এমনি করে ওই ব্যাটার পাল্লায় পড়ে।

সমীর বলে, সর্বনাশ! এখন নৌকোই বা কে বাইবে। এদিকে সন্ধে হয়ে এল। অচেনা জায়গা। কি যে বিপদে পড়লাম এখন। চাষী দেখছে ওদের। কি ভেবে বলে সে, এত ভাবছেন কেন? জলে তো পড়ে নেই।

সমীর ঠিক নিরাপত্তার কোন আশ্বাস পায় না।

ঘোষমশাই বলে, গোবিন্দ ঘোষের ঘর, বৈঠকখানা, সবই আছে বাবা, মা জননীকে এক রাতের ঠাঁই দিতে পারব না?

একটু কষ্ট হবে হয়তো, তা কি আর করা যাবে। চলেন মা জননী, গরীবের ঘরেই আজকের রাতটা থাকবেন।

উ ব্যাটা আজ আর নৌকা বাইতি পারবেনি।

এ্যাই ছোঁড়া, দাদাবাবুদের জিনিসপত্র নে চল, আর শেষ জোয়ারের, নৌকা নে ওই যে টিনের চালের বাড়ি দেখেছিস ওখানে গিয়ে বাঁধবি, ভোরের জোয়ার এলে বাবুদের বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে শীতলপুর যাবি।

'ততক্ষণে ওই বুড়োটার হুঁশ ফিরবে।

এখন থাকুক শালারা এখানে পড়ে।

চলুন আপনারা আমার বাড়িতে। চলো বৌমা।

সমীর এবার সত্যি সত্যি ভাবনাতে পড়ে। এতক্ষণ পথে, নৌকোয় দুজনে একত্রে আসছিল, পথে কোন্ হাটের সেই মন্দিরে গিয়েছিল, দেখেছে সেই লম্বাটে পূজারী বামনের কাণ্ডটা। তাদের স্বামী-স্ত্রী ভেবে পুজো মানসিক সবকিছুর ব্যবস্থাই করেছিল।

এছাড়া ও দেখেছে নদীর ধারের গ্রামবসতের বৌ-ঝিদের চোখের কৌতূহলের চাহনি।

নতুন বর-কনে ধরে নিয়ে রসিকতাও করেছে তারা। এতক্ষণে তো পথেপথেই চলছিল এই পর্ব।

এমনকি ঘোষমশাইও তাদের ধরে নিয়েছে ওই হিসেবেই।

এতো বাইরে বাইরেই চলছিল কাণ্ডটা। মাঝিটা ঠিক থাকলে ওরা এতক্ষণে ডিঙি নিয়ে শীতলপুরের কাছাকাছি চলে যেত।

কিন্তু ব্যাটা মাঝিটাই সব গোলমাল করে দিয়েছে মদ গিলে।

তাকে নতুন কঠিন বিপদের মধ্যেই ফেলেছে।

এবার পথ ছেড়ে গিয়ে পড়বে গ্রামের বৌ-গিন্নীদের কড়া নজর আর অন্তঃপুরের মধ্যে।

সেখানে কি কাণ্ড ঘটবে কে জানে।

কথাটা ভাবতেও শিউরে ওঠে সমীর। চেনা জানা নেই একটি সুন্দরী তরুণী মেয়ের সঙ্গে এমনি এক বিচিত্র নাটকীয় ব্যাপারে জড়িয়ে পড়বে তা ভাবেনি।

বিকেল গড়িয়ে সন্ধে নামছে। অচেনা অজানা জায়গা। কোথায় যাবে জানে না। সুমিতাও এবার একটু বিপদেই পড়েছে।

এতক্ষণ বাইরে একটা নাটক চলছিল, এবার দুজনেই একটু ঝামেলায় পড়েছে।

তবু সুমিতা অনেক সহজ হতে পারে। সবকিছুই তার কাছে যেন একটা খেলাই। তাই এহেন সমস্যাকে সে যেভাবে হোক পার হবে।

নিজে মেয়ে হয়ে তবু সাহস রাখে কিন্তু সমীরকে এভাবে ঘাবড়ে যেতে দেখে সে যেন নিছক মজা আর আনন্দ পায়।

গোবিন্দ ঘোষ বলে, চলুন। নৌকো ভোরে ঘাটে নে যাবে ওরা।

গরীবের বাড়িতে কোন অসুবিধা হবে না।

তবু সমীর আমতা আমতা করে, আবার আপনাকে কষ্ট দোব?

এবার সুমিতা বলে, এত করে বলছেন, চলো না হয়। রাতভোর এখানে থাকা যাবে না বাপু। তাই চলো না?

এ্যাই গোবিন্দ খুশি হয়ে শোনায়, বৌমা ঠিক কথাই বলেছে। চলো।

গোবিন্দ ওর সুটকেশটা তুলে নিয়ে এগিয়ে চলেছে আর গজরাচ্ছে।

শালা ভজাকে কালই নেশা ছাড়লে লাথি মেরে খেদিয়ে দিব।

উঃ এমনি সব্বোনেশা নেশা করে কখনও।

গোবিন্দ চলেছে আগে আগে। সমীর অনিচ্ছাসত্ত্বেও চলেছে ওর পিছু পিছু।

সুমিতার সম্বন্ধে এবার তার ধারণাটা বদলাচ্ছে। চেনা-জানা নেই ওই লোকটার সামনে যেন কতকালের চেনা, একেবারে স্বামী-স্ত্রীর নিপুণ অভিনয়ের মত স্বরেই তুমি, এ্যাই।

উঃ কথাটা ভাবতেও বিস্মিত হয় সমীর।

বলে সে আড়ালে, এসব কি হচ্ছে বলুন তো? নাটক হচ্ছে নাকি?

সমীরের কথায় সুমিতা বলে গলা নামিয়ে, এখন ওদের সামনে আপনি-টাপনি খবরদার বলবেন না।

আদর করে ঘরে নিয়ে গিয়ে আশ্রয় দিচ্ছে, যদি জানতে পারে আসল ব্যাপারটা বিপদ হবে।

সমীর গজ গজ করে। তাই এই সব করতে হবে।

সুমিতা শোনায়, না করে উপায় কি?

সাংঘাতিক মেয়ে তো আপনি? সমীর ফুঁসে ওঠে।

বলে সে, যেতে হয় আপনি যান।

আমি ওসবে নেই।

সুমিতা চাইল ওর দিকে।

গোবিন্দ ঘোষও পেছন ফিরে ওদের অনেক পেছনে দেখে বলে, সাঁঝ হয়ে আসছে, মাঠের পথ। ত্যানারা বের হন, মানে সাপ-খোপ এর কথা বলছি।

সাপ! চমকে ওঠে সমীর।

গোবিন্দ বলে, ওই গোটরা, শামুক ভাঙা, আনা কেউটে দুচারটে বের হয় শিশিরে-

লাফ দিয়ে ওঠে সমীর।

সুমিতা বলে, ওসবের চেয়ে আমি নিশ্চয়ই বিপজ্জনক নই।

সমীর দেখে ওকে, সুমিতা বলে জোর গলায়, গোবিন্দকে যাচ্ছি। কই গো, পা চালিয়ে চল। কি হল তোমার?

সমীর নেহাৎ বিপদে পড়েই চলেছে।

এমন পরিস্থিতিতে পড়তে হবে কখনও স্বপ্নেও ভাবেনি সে। আল পথটা মাঠের মধ্যে দিয়ে গেছে।

শরতের সন্ধ্যা সবুজ ধানক্ষেতের বুকে কোথাও কার্তিকশাল ধনে লেগেছে সোনা রং, ধানের মঞ্জুরীগুলো পুরুষ্ট হয়ে উঠেছে।

আগামী শীতের হালকা কুয়াশার সতর নামছে গ্রামসীমার আকাশে। সমীরের মনের আকাশে ওমনি ধোঁয়াশা নেমেছে। এযেন কি এক বিপদের দিকে এগিয়ে চলেছে সে। এ কোন চক্রান্ত কিনা কে জানে।

সমীর বলে ওঠে কাতর কণ্ঠে, দয়া করে আমাকে রেহাই দিন।

বিশ্বাস করুন,আমিও বিবাহিত, শীতলপুরে আমার শ্বশুরবাড়ি। চৌধুরীদের বাড়ি।

সুমিতা অবাক হয়ে চাইল। বলে সে, কি বলছেন?

সমীর বলে, সত্যি বলছি। অসিত চৌধুরীর জামাই আমি, আমার স্ত্রী ওখানেই এসেছে তাই যাচ্ছিলাম, পথে এমনি ব্যাপার ঘটল।

সুমিতা দেখছে ওকে।

পুরুষের এমনি কাতর অনুনয় দেখে মেয়েটি যেন আরও মজাই পায় মনে মনে।

বলে সে, এত ঘাবড়াচ্ছেন কেন?

সমীর বলে, কেন বিপদে ফেললেন আমায়? আমি তো কোন দোষ করিনি, প্লিজ।

সুমিতা চাপা স্বরে ধমকে ওঠে থামুন। ন্যাকামি করবেন না।

সেকি! সমীর এবার বিপদের গুরুত্ব বোঝে।

সুমিতা বলে, ন্যাকামি না করে একটা রাত এমনি অভিনয় করে কোনমতে কাটিয়ে দিয়ে বের হতে হবে। বুঝলেন।

সমীর হাড়ে হাড়ে বুঝছে ব্যাপারটা। শুধোয় সে, আপনার ভয় করছে না?

সুমিতা হালকা স্বরে বলে, আপনার মত লোককে চিনেছি, তাই ভয় আমার করেনি।

সমীর শোনায়, ভাল মানুষ পেয়ে ঘাড়ে চেপেছেন?

সুমিতা বলে, মেয়েরা এমনি একটা নিরাপদ, মজবুত ঘাড়ই খোঁজে। মশাই। আর সেটা পেলে তখন চেপে বসার পথ খোঁজে।

সন্ধ্যাতারার ঝিলিক ওঠে সুমিতার কালো চোখের তারায়।

দিনের আলো মুছে এবার সন্ধ্যার আঁধার নামছে গ্রামের পথে, সমীর আর সুমিতা চলেছে। গ্রামের অনেকে দেখছে তাদের।

গোবিন্দ ঘোষের বাড়ির অবস্থা ভালই। সঙ্গতিপন্ন চাষী। বিরাট বাড়ি ওদিকে দোমহলা পাকা দালান।

ঘেরা উঠোনে এখনও দু'তিনটে ধানের গোলা রয়েছে। বার বাড়িতে একটা ট্রাকটর দাঁড়ানো।

গোবিন্দ ওদের নিয়ে যেতে বাড়ির গিন্নী, মেয়ে বৌরাও আসে।

গোবিন্দ বলে, শীতলপুরে চৌধুরী বাড়ির লোক গো। বিরাট লোক এরা। পথে নৌকার মাঝি গড়বড় করল। রাত্রিটা এখানে থেকে যাবেন।

গোবিন্দ ঘোষের স্ত্রী বলে সুমিতাকে, এসো মা। ওগো জামাইবাবাজীকে এখন বাইরের ঘরে বসাও। আমি জলখাবার পাঠাচ্ছি। আর তোমাকেও বলি, সারা দুপুর ওদের বাগানে ফেলে রাখলে?

ধন্যি আক্কেল তোমার। চল বাছা।

গোবিন্দ স্ত্রীর কথায় বলে, মাঝি ব্যাটাই তো গোল বাঁধালো, নাহলে ওনারা আসতেন এখানে?

সুমিতাকে নিয়ে ওরা ভিতরে বাড়িতে চলে গেল। সুমিতার বিচিত্র লাগে।

এতক্ষণ নিজেদের দুজনের মধ্যে একটা মনগড়া অভিনয় করছিল সে আর ওই সমীর। এখন বাড়ির এতগুলো বৌ-মেয়ে গিন্নীর সামনে সেই অভিনয় করা ছাড়া পথ নেই।

গিন্নী বলে, তা ক'বছর বিয়ে হয়েছে, এখনও ছেলেপুলে হল না?

জেরার মুখে চুপ করে থাকে সুমিতা।

গিন্নী বলে, আজকাল শহরের লেখাপড়া শেখা সমাজের ওই এক চল হয়েছে বাবা। ছেলেপুলে এলেই যেন বিপদ,আমার প্রথম খোকা হয়েছিল বিয়ের পরের বছরেই।

বড় বৌ হাসছে, বলে সে, মা, ওর পথের ধকল গেছে সারাদিন।

চল ভাই হাত-মুখ ধুয়ে চা-টা খাবে।

সুমিতা বলে, একটু আগে খেয়েছি। হাসে বড় বৌ, তাতে কি! আর তোমার কত্তারও যত্নের ত্রুটি হবে না ভাই। তার জন্য ভেব না।

হালকা সুরে সুমিতা বলে, ভাবতে বয়ে গেছে।

হাসছে বৌটি, তাই নাকি। একি মনের কথা না মুখেরই কথা গো?

সারা বাড়িতে যেন উৎসবের সুর ওঠে।

সমীর অবাক হয় দুর-দুরান্তের গ্রামের কোন অচেনা অজানা মানুষের আতথ্য আর হৃদয়ের উষ্ণতা দেখে। পথ থেকে দয়া করে তুলে এনে আশ্রয় দিয়েছে তাদের। কিন্তু মনে হয় এদের ব্যবহারে যেন কতদিনের চেনা-জানা।

সমীর বাইরের বৈঠকখানায় রয়েছে।

সুমিতাকে নিয়ে গেছে ভিতরের বাড়িতে।

কিছুক্ষণের জন্য হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে সমীর। মেয়েটা সামনে থাকলেই ঝামেলা হত।

বৈঠকখানার হ্যারিকেন জ্বলছে। গ্রামের দু'চারজন মানুষ এসে বসেছে। তামাক চলছে। এবার ধান পাটের হিসাব হচ্ছে, বড় গাঙে মাছ নাকি আসছে না তেমন।

ঘোষমশাই বলে, শহরের দু'চারটে খবরও। কোন মাতব্বর শুধোয় সমীরকে, জামাইবাবাজী,

কলকাতায় এখন মাটির তলে রেল চলবে? সমীরও এদের পাতাল রেলের কাহিনী বলতে শুরু করে।

ঘোষমশাই শোনায়, রেল চলুক, এবার কালীঘাটে গিয়ে মাকে দর্শন করে বাপু পাতাল রেলেই চেপে আসব।

রাত্রি নামছে। ক্রমশঃ আসর ফাঁকা হতে থাকে। বাড়ির ভিতর থেকে খবর আসে, খাবার জায়গা হয়েছে। গোবিন্দ বলে সমীরকে, চল বাবাজী, খাওয়া-দাওয়া করে নেবে।

বাড়ির ভিতরে পুরনো আমলের বারান্দা দেওয়া চারতলা ঘরে। সেখানে কম্বলের আসন পেতে জায়গা করা হয়েছে।

গোবিন্দ, তার দুই ছেলে আর সমীর বসেছে। ঘরের পুকুরের মাছ, ঘরের গরুর টাটকা দুধ, শব্জী সবকিছুই ঘরের, আয়োজনের ত্রুটি নেই।

গোবিন্দ বলে, বোস বাবাজী।

অবাক হয় সমীর, এত! ওই বিরাট মাছের মাথা, এত দুধ।

গোবিন্দ, খাবার বয়েস। বসো ঠিক খেতে পারবে। আর এখানের জলে যা খাবে ঠিক হজম হয়ে যাবে বাবাজী। এ বাড়ির রেওয়াজ সাবেকী ধরনেরই। আগে পুরুষদের খাওয়া হবে তারপর বৌ, গিন্নী, মেয়েরা খেতে বসবে।

সমীরদের খাওয়া-দাওয়ার পর ওরা এসে বৈঠকখানায় বসেছে। বেশ কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়েছে সমীর। মনে হয় রাত্রিবেলায় তার শোবার ব্যবস্থা হবে বার বাড়ির এই বৈঠকখানাতেই।

আর মেয়েটা থাকবে বাড়ির ভিতরে এ বাড়ির গিন্নীর কাছেই। কিছুটা নিশ্চিন্ত হয় সমীর।

রাতটা ভালোয় ভালোয় কেটে গেলে ভোরেই নৌকোয় উঠেই চলে যাবে এখান থেকে।

মনটা কিছুটা হালকাই বোধ হয়।

হঠাৎ গোবিন্দের কথাতেই চাইল সমীর।

গোবিন্দ বলে সমীরকে, চল বাবাজী, রাত হয়েছে। সারাদিন পথের ধকল গেছে। শুয়ে পড়বে চল।

সমীর বলে, এইখানেই একটা রাত কাটিয়ে দেব। ফরাস তো পাতাই আছে। একটা বালিশ হলেই চলে যাবে।

গোবিন্দ বলে, সেকি কথা বাবাজী।

গিন্নীও এসেছে। সেই বলে, না না বাবা বাড়ির ভিতরেই চল।

এক রাতের মত মেয়ে জামাইকে ঠাঁই দিতে পারব না? কি যে বল? সমীর এবার যেন চরম বিপদে পড়েছে।

এবার বাড়ির ভিতরে অন্তঃপুরের মেয়েদের সামনে হাজির হতে হবে তাকে।

প্রতিবাদও টেকে না। যেন বলির পাঁঠার মত কাঁপতে কাঁপতে চলেছে সে।

বাড়ির মধ্যে দু'একজন বৌও দেখছে তাকে।

কে মন্তব্য করে খাসা জামাই বাপু।

সমীরের হাত পা কাঁপছে। ওদিকের একটা ঘরে ওকে নিয়ে গিয়ে পুরলো, সমীরের মনে হয় যেন দোতলা থেকে লাফই দেবে সে। ঘরটায় আর কেউ তখনও আসেনি। একাই ভাবছে সমীর। রাত্রি নামে।

সমীরকে দোতলার এদিককার ঘরে শুতে দিয়েছে। দিব্যি খাট পাতা, গদিও তেমনি আরামের। সমীরের মনে পড়ে সরমার কথা।

কোথায় তার সঙ্গে দেখা হবে তা নয় পথের মধ্যে কার বাড়িতে রাত কাটাতে হচ্ছে।

শান্ত রাত্রি। মেঘমুক্ত আকাশে চাঁদ উঠেছে।

জানালা দিয়ে দেখা যায় নদীর বিস্তার।

ধানক্ষেত থেকে চাঁদের আলো পড়েছে।

কোথায় শিয়াল ডাকছে।

হঠাৎ দরজা খোলার শব্দে চাইল সমীর।

ঘরে মৃদু হ্যারিকেনের আলো জ্বলছে।

বাইরের বারান্দায় কাদের পায়ের শব্দ, মৃদু হাসির সাড়া জাগে।

সুমিতা ভাবেনি যে তাকে এমনি এক কঠিন সমস্যায় পড়তে হবে।

রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর বড় বৌ বলে সুমিতাকে, শুয়ে পড়গে ভাই, কত্তা তো বোধহয় এতক্ষণ তোমাকে না দেখে হাঁফিয়ে উঠেছে। সুমিতা চমকে ওঠে। কি যেন বলতে চায় সে। মেজ বৌ এমনিতে হাসিখুশি। সে বলে, চল ভাই, তোমার কত্তার ঘরেই পৌছে দিই গে। এতক্ষণ দর্শন না পেয়ে ভাববে বোধহয় তার গিন্নীটিকে আমরাই নাপাত্তা করে দিয়েছি।

সুমিতাকে জোর করে যেন টেনে ওরা এঘরে ঢুকিয়েছে। বাইরে তখনও ওদের হাসির চাপা শব্দ ওঠে।

সুমিতা ঢুকেছে ঘরে। দরজাটা বন্ধ করে সে।

সমীর আবছা আলোয় দেখছে ওকে।

এর মধ্যে লাল একটা শাড়ি পড়েছে, চোখে মুখে সলজ্জ আভা। তুমি, আপনি!

চাইল সুমিতা। বাইরের দিকে ইশারা করে সে— সমীরকে চুপ করতে বলে।

ওরা বাইরে বোধহয় অপেক্ষা করছে স্বামী-স্ত্রীর আলাপ শোনার জন্য। এ সময় যদি আসল ব্যাপারটা ধরা পড়ে যায় বিপদই হবে।

সুমিতা ইশারায় সমীরকে চুপ করে থাকতে বলে। গলা তুলে শোনায় বাইরের কৌতূহলী বৌদের, দেরি হয়ে গেল।

ওঁরা ছাড়ছিল না। উঃ বাবা! যা ঘুম আসছে না। আঃ সরো বাপু! শুতে দাও!

পথরে ধকলে ঘুম জড়িয়ে আসছে চোখে।

এখন জ্বালাতন করো না বাপু!

এ্যাই-

সমীর অবাক হয়ে শুনছে সুমিতার কথাগুলো। ঘরের ওকোণে দাঁড়িয়ে সুমিতা, এদিকে বসে আছে বিস্মিত হতচকিত সমীর।

আর সুমিতা ওই কোণে দাঁড়িয়ে কি কমনীয় ব্যাকুলতা এনে অভিনয় করে চলেছে।

বাইরের কৌতূহলী বৌ-ঝিয়ের দলের পায়ের শব্দ মিলিয়ে যায়।

সুমিতা সাবধানে দরজা খুলে ওদের চলে যেতে দেখে এবার ঘরে ফিরে আসে।

সমীর ততক্ষণে উঠে পড়েছে।

সুমিতা সুধোয় কি হল?

সমীর এতক্ষণ ধরে সবকিছু সহ্য করছিল। এবার বলে সে, বাইরে যাচ্ছি।

ওখানেই রাত কাটাব।

সুমিতা বলে এতক্ষণ সহ্য করেছ, বাকীটুকুও সইতে হবে।

বাইরে গেলে ওরা সবকিছু বুঝতে পারবে।

বুঝক চাপাস্বরে প্রতিবাদ করে।

সুমিতা বলে, অপমানের আর কিছু বাকী থাকবে না। তোমার চেয়ে অপমান আমারই বেশি বাজবে।

সমীর শোনায়, তোমার মত মেয়ের অপমান হওয়াই উচিত। ছিঃ ছিঃ।

সুমিতা এবার রুখে উঠেছে। রাগও হয় তার। চাপাস্বরে বলে, ওদের বোঝাব যে তুমিই আমাকে মিথ্যে কথা বলে ঘরের বাইরে ফুঁসলে এনে আমার ধর্ম নষ্ট করতে চাও। তুমি একটা শয়তান।

তাহলে ব্যাপারটা কি হবে বুঝেছো?

চমকে ওঠে সমীর, এ্যাই। এসব কি বলছ।

সুমিতার চোখে জল এসে গেছে। সমীর বিপদের গুরুত্ব বুঝতে পেরেছে এবার।

ওই কথা যদি জানায় সুমিতা, তাকে আর আস্ত রাখবে না ওরা।

সমীর এবার স্বরে বলে, চুপ করো।

সত্যি, আমারই ভুল হয়ে গেছে। প্লিজ!

চুপ করেছে সুমিতা।

এবার সত্যিই বিপদে পড়েছে সমীর। বন্দী অবস্থায় যেন কাঁপছে সে।

সুমিতাই এরমধ্যে খাট থেকে বালিশ আর একটা চাদর নিয়ে জানালার সামনে মেঝেতে পেতে বলে, আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ুন খাটের ওপর। সমীর বাধ্য প্রাণীর মত তাই করে। রাত্রি কত জানে না। ঘুম আসে না সমীরের।

সে অবাক হয়েছে ওপাশের মেঝেতে নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছে মেয়েটি।

খোলা জানলা দিয়ে একফালি শেষ চাঁদের আলো এসে পড়েছে মেয়েটির মুখে। খোঁপাটা ভেঙে পড়েছে।

নিটোল হাতটি আলতো করে মেঝেতে ছড়ানো।

গায়ে চাদর ঢাকা। কি পরম বিশ্বাসে সে ঘুমুচ্ছে। ওই মুখখানা যেন সমীরের খুব চেনা।

এমনি কোন নিভৃত নির্জন রাতে সে দেখেছে ওই মুখ, তার মনে জেগে আছে সেই স্মৃতিটা।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল জানে না।

বাইরের দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ শুনে জেগে উঠেছে সুমিতা। ওরা ডাকছে।

খেয়াল হয় তার, এবার বেরুতে হবে।

সুমিতা উঠে চাদর বালিশ বিছানায় তুলে রেখে ডাকছে সমীরকে।

এ্যাই! ওঠো।

জোয়ারের সময় হয়েছে। যেতে হবে না?

কি ঘুম রে বাবা। এ্যাই।

ওর ডাকে ঘুম ভেঙে যায় সমীরের। কি যেন স্বপ্ন দেখছিল সে। বিড় বিড় করে।

সুমিতা ডাকে— এ্যাই।

সমীরের খেয়াল হয় এবার পথের মাঝে কার বাড়িতে রাত্রির জন্য আশ্রয় নিয়েছিল।

এবার বের হতে হবে রাত্রি ভোরে।

রাতটা কখন ফুরিয়ে গেছে।

গোবিন্দ ঘোষের ঘুম ভাঙে ভোরেই। এ তার পুরোনো অভ্যাস। গিন্নী, বৌরাও উঠেছে। চা-ও তৈরী।

গিন্নী বলে, এক রাতের জন্য এসেছিলে বাছা, ফেরার পথে দুজনে এসে একটা দিন থাকবে কিন্তু।

ওরা ঘাট অবধি এগিয়ে দিতে আসে আলো নিয়ে। তখন ভোর হয়ে আসছে।

পাখিরা কলরব করে।

বংশী মাঝির নেশা ছুটে গেছে। পুটুও হাত মুখ ধুয়ে তৈরী।

লজ্জায় বুড়ো মাঝি কথা বলতে পারে না। গোবিন্দ মোড়ল বলে, পথে আর ঝামেলা কোরোনা বাপু। একদিনের পথ দু-দিন লাগিয়ে দিলে। বংশী বলে, অপরাধ লেবেন না মা জননী, ভেম হয়ে গেছিলো।

আরে পুটু, গেরাপি তুলে এবার জলদি চল। ভর জোয়ার পাই বেশি আর দেরি হবেনি। হঠাৎ আবছা আলো-আঁধারিতে কার ডাক শুনে চাইল ওরা।

পুটু গেরাপি তুলে নৌকা ছাড়বে।

এমন সময় ভেড়ির দিক থেকে ডাকটা ভেসে আসে। জয় গুরু ও বাবা ভবপারের কাণ্ডারী, ডিঙিখানা বাঁধো না বাবা। রতনপুরের হাটে একটুন নামাই দিবা এখোঁড়াকে? প্রাতঃ পেন্নাম ঘোষমশায়। জয় গুরু।

ঘোষমশাইয়ের চেনা লোকটা। পরনে গেরুয়া একটা আলখাল্লা, মাথার একটা পল্ল বাঁধা। হাতে একতারা। লোকটার একটা পা খোঁড়া মত।

ঘোষমশাই বলে, সাতসকালে তুমি কোত্থেকে হে বাবাজী?

বাউলই বোধহয়। লোকটা বলে, পাখখালির যাত্রা তো সাতসকালেই বাপধন তাহলে নৌকোয় উঠি বাবু?

মা জননী?

সুমিতার মনটা বেশ খুশিই। বলে সে এদিকেই রতনপুর পড়বে তো?

শীতলপুর যাচ্ছি কিন্তু।

বাউল বলে, সব পথই এক জননী। জয় গুরু।

পুটু ঈশৎ প্রতিবাদ করতে সমীর বলে, রাতভোর ফেলে রাখলি আঘাটায়, আবার কথা! চলতো। বাউলও উঠে পড়েছে ততক্ষণে ডিঙিতে। নির্জন শান্ত জগৎ।

তখনও আকাশের পূর্বদিকে রঙ খেলে চলেছে। বিস্তীর্ণ দিগন্তের বুক পাখিদের কলরব ওঠে, সূর্য উঠছে।

বাউল স্তব্ধ হয়ে বসে আছে।

সারা মন দিয়ে যেন একটি পরম লগ্নের মাধুর্যকে সে অনুভব করছে।

একতারার রিন-রিন সুর ওঠে। চুপ করে বসে আছে সমীর।

সুমিতা দেখছে এই অপরূপ জগতকে। বলে সুমিতা, রাগ করেছেন না?

সমীর চাইল ওর দিকে। দুদিনের পরিচয়। তবু এই দুদিনেই দুজন দুজনের অনেক কাছাকাছি এসেছে, দুজনের মাঝে পরস্পর একটা বিশ্বাস নির্ভর, অদৃশ্য এক মানবিক সম্পর্ক ও গড়ে যার পরিচিতি সমাজে না থাকলেও মনের জগতে তা স্মরণীয় হয়ে উঠেছে।

সমীর বলে রাগ করব কেন?

বেলা দশটা নাগাদ পৌঁছে যাব শীতলপুরে।

সুমিতা বলে, খুব বোঝা হয়েছি, না?

চাইল সমীর। সুমিতা বলে, কাল থেকে একটা দিন-রাত আপনাকে খুব জ্বালাতন করেছি, দু'দিনের পথের পরিচয় পথেই ফুরিয়ে যাবে। আর হয়তো দেখাও হবে না কোনদিন।

সমীরের মনেও জাগে অমনি বিষণ্ণতার সুর। তাই বলে সে, তবু দিন-রাত্রিকে ভুলব না কোনদিনই।

মনে হয় পথে চলতে চলতে অপনক কিছু কুড়িয়ে পেয়েছি। নৌকোটা মন্থর গতিতে চলেছে খালের বুকে। টলটলে জোয়ারের পুরো ঠেল রয়েছে। হঠাৎ সুরেলা কণ্ঠ বেজে ওঠে, বেজে ওঠে একতারার রিন-রিন সুর ঃ

ওরে পথের মাঝে
পরশ পাথর
মন ছুঁলে সোনা হয়,
মনের মানুষ, কাছেই আপছ
চিনে নিতে হয়।
ও ভোলামন-চিনলি না তুই

একতারার সুরে মিশেছে পথচলতি বাউলের সুরেলা উদাও কণ্ঠস্বর বৈঠার ছন্দবদ্ধ শব্দ ওঠে, মিশেছে পথিক পাখির সুর, কাশবন কাঁপে শুভ্রতার আবেশে। তার মাঝে ওই সুরটা সমীর-সুমিতার মনে কি বিষণ্ণতার আভাস আনে। মন যেন পরশপাথরই। সে চায় সবকিছুকে তার স্পর্শ দিয়ে স্বর্ণশুদ্ধি করে নিতে। পথের বাঁকে তাই অচিন মানুষটিও আপন হয়, হারিয়ে আবার পথের বাঁকেই।

সুমিতাও হারিয়ে যাবে সমীরের জীবন থেকে একই রকম ভাবে।

সুমিতা দেখছে সমীরকে।

বাউলের সুর ওঠে, তন্ময় হয়ে গেয়ে চলেছে সে জীবনের এক পরম বেদনার গান। যা এদের দুজনের জীবনের পরতে পরম সত্য এক বেদনাময় স্মৃতিতে পরিণত হতে চলেছে।

সমীর আজ নিজেকে একজনের কাছে প্রকাশ করতে চায়। বলে সে, সুমিতা।

সুমিতা চাইল ওর দিকে।

সকালের সিঁদুর রোদ ক্রমশঃ গিনি গলা রং নিচ্ছে। ঘুম ভেঙেছে সুন্দর পৃথিবীর। সুমিতা বলে? কি?

সমীর বলে, জীবনে যা চেয়েছি তা পাইনি।

কেন? অনেক তো পেয়েছেন।

সমীর বলে, যা পেয়েছি তা ভুল করেই চেয়েছিলাম। সুমিতা, তাই মনের অতলের সেই শূণ্যতাটা রয়েই গেছে। তাই হাহাকার জাগে সারা মনে।

সুমিতা শুনছে ওর কথাগুলো।

বাউলের সুরে চিরন্তন সেই বেদনাই ফুটে ওঠে।

সুমিতা বলে, এসব ভেবে আর লাভ কি সমীরবাবু,সবকিছু মেনে নিয়েই মানুষকে বাঁচতে হয়।

চুপ করে থাকে সমীর।

দাঁড় পড়ছে তালে তালে। পুটু এবার নতুন উদ্যমে দাঁড় টানছে। হালের মাথায় বসে আছে বুড়ো বংশী।

কালকের ভুলের জন্য ও চুপ করে আছে অপরাধীর মত। তার প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য জোরে জোরে নৌকো বাইছে সে।

বাউল গান থামিয়ে দেখছে চারদিকে।

বলে, ও মাঝি তামু-টামুক আছে?

সমীর চুপ করে বসেছিল। বাউলের কথায় একটা সিগারেট এগিয়ে দেয় তাকে, খুশি হল বাউল। সিগরেট! তালে বাবু ফয়ের বক্‌সোটা দেন। ফয়ের বক্‌সো? অবাক হয় সমীর কথাটা শুনে। পুটুই শুধরে দেয়, দেশলাই গো।

হাসছে সমীর। পুটু এবার দাঁড় টানতে টানতে পিছনের দিকে বাঁকের মাথায় টিনের ঘরবাড়ি দেখে বলে, রতনপুরের হাটতলা এসে গেছে বাবু, সামনেই হাটতলা। ইখানে চা-টা খেয়ে নেন। তারপর এক দমে নে যাবো শীতলপুরের ঘাটে। জলখাকি বেলাতেই পৌঁছে দেব।

বাউল বলে, তা পারবি। তালে রতনপুরের ঘাটে ডিঙি একটুন বাঁধ বাবা। আমিও নামব। রতনপুরের হাটতলায় এসেছে ওরা। বাউলও নেমে গেছে।

সমীর বলে, চল সুমিতা। চা-টা খেয়ে নেওয়া যাক। সুমিতা নামছে।

কাল এ সময়ে তারা ছিল নশীপুরের হাটে। তখন সমীরের মনেও ছিল কি উৎসাহ? আজ তার লেশমাত্র নেই। যাত্রা শেষ হয়ে আসছে তার। কি আসন্ন বিদায়ের বেদনায় যেন তার মন বিষণ্ণতায় ভরে গেছে।

হাটতলার চায়ের দোকানে বসে সুমিতা বলে, কি হয়েছে আপনার?

কেন? সমীর চাইল ওর দিকে।

সুমিতার ডাগর চোখে কি মায়াময় চাহনি।

সমীর বলে, কই কিছু না তো।

হাসে সুমিতা, এত চুপচাপ কেন? কথা নেই, হাসি নেই?

সমীরও জানে কারণটা। আর কিছুক্ষণ পরই তার এই স্বপ্নের জগৎ ফুরিয়ে যাবে। তাই বলে, ভাল লাগছে না।

তাই নাকি! সুমিতা কলকলিয়ে ওঠে। দেখছে সে সমীরকে। আমারও খারাপ লাগছে, সত্যি!

দুজনে দেখা হল, পরিচয় হল, কিন্তু পথের পরিচয় পথেই হারিয়ে যাবে।

কি এর দাম বলুন তো?

বাউলের কথাটাই সত্যি, সব হারিয়ে যায়।

ওরা ফিরছে গাঙের দিকে। ছায়াঘন নির্জন পথে দাঁড়িয়ে সমীর। সুমিতা।

সুমিতা ওর ডাক শুনে চাইল। সমীরের মনের অতলের ব্যাকুলতা ওর চোখে ফুটে ওঠে। কি যেন জানাতে চায় সমীর ওকে।

সেই স্তব্ধতার ভাষায় ফুটে উঠেছে তার মনের স্বপ্নরেশ। সুমিতা তা বোঝে। কিন্তু এর কোন সার্থকতাও নেই, থাকতে পারে না। তবু কেমন এড়িয়ে যায় সে। বলে সুমিতা, নৌকোয় ওরা ডাকছে চলুন।

চুপ করে এসে নৌকোয় উঠল তারা।

বংশী মাঝি আর পুটু দুজনে এবার চা চপ খেয়ে চাঙা হয়ে নৌকে বাইছে।

দূর দিগন্তে দেখা যায় কোন গ্রামসীমা।

গাছগাছালির মাথা ছাড়িয়ে উঠেছে একটা মন্দির চূড়া। দুচারটে পাকা দালানও দেখা যায়।

বংশী বলে, সামনের বাঁকে শীতলপুর বাবু, এবার এসে গেছি।

ওইসব দালান, মন্দির-টন্দির দেখছেন সব চৌধুরীবাড়ির এলাকা।

মস্ত লোক ওনারা! অ পুটু! জোরে বা বাপধন। ঢের দেরি হয়ে গেছে এনাদের।

কাল যে কি দুম্মতি হয়েছেলো। তা তু একটুন বলবি তো! কত কষ্ট হল এনাদের।

সবই যেন পুটুর জন্যই ঘটেছিল এমনি ভাব দেখায় বংশী।

পুটু বাপকে চেনে তাই কথা বলে না।

সুমিতাও চেয়ে আছে সামনের গ্রামসীমার দিকে। সেইই শুধোয়, চৌধুরী বাড়িতে যাবেন তো?

সমীর ঘাড় নাড়ে। সে প্রশ্ন করে তুমি । তুমি কোথায় যাবে।

সুমিতা বলে, শীতলপুর তো যাই আগে তারপর ভাবা যাবে কোথায় যাব।

সমীর অবাক হয়। ও যেন অনিশ্চিতের পথেই বের হয়েছে।

বলে, কোথায় যাবে তারও ঠিকানা নেই?

হাসছে সুমিতা। বলে, ভয় নেই। আপনাকে ডিস্টার্ব করব না।

যেখানে হোক চলে যাব। আমার জন্য ভাববেন না। অবাক হয়ে চেয়ে থাকে সমীর ওর দিকে।

এত অনিশ্চয়তার মাঝেও মেয়েটা কেমন নিশ্চিন্ত। কোন ভাবনা চিন্তাই নেই।

পথ চেয়েই ছিল সরমা। জানে সমীর ঠিক আসবেই। দোতলার জানলা দিয়ে নদীটা দেখা যায়। নৌকোর ওপরে সমীরকে দেখেই চিনতে পারে সে। খবরটা হাওয়ায় ছড়িয়ে পড়ে।

চৌধুরী মশাই, সরমার বাবা খবর পেয়ে কাছারি থেকে বের হয়ে আসেন ঘাটের দিকে জামাইকে অভ্যর্থনা করার জন্য।

বিরাট বাড়ির গায়েই ঘাট বাঁধানো।

বাড়ির খিরকির মতই নদীটা। বাড়ি থেকে সরমা, ওর মা, পিসীমা,কাকীমারাও এসেছে।

সরমার বাবার লোকজনও এসেছে।

নৌকোটা ভিড়তেই সমীব অবাক হয়। সুমিতা নেমে গিয়ে চৌধুরী মশায় আর তার শ্বাশুড়ীকে প্রণাম করতে মা ওকে জড়িয়ে ধরে বলে, কি করে এলি দস্যি মেয়ে?

সমীরও প্রণাম করে চৌধুরী মশায়কে।

তিনি বলেন, সুমিতাকেও সঙ্গে করে এনেছ বাবাজী, ভালই করেছ।

আমিই ওকে লিখেছিলাম কলকাতায় এসে তোমার সঙ্গে দেখা করে দুজনে যেন একত্রে চলে আসে।

ওতো আমাদের সঙ্গে আসতে পারেনি।

ভাবছি ওর জন্যে। আমার ভাইঝি।

তা হ্যাঁরে সুমিতা, বিয়ের সময় তো আসিসনি, সমীরকে চিনতে অসুবিধে হয়নি তো?

সুমিতা কলকলিয়ে বলে, অসুবিধে হবে কেন? দিব্যি চলে এলাম। যা পথ।

সমীরদা না থাকলে সত্যিই বিপদে পড়তাম কাকাবাবু। কাকীমা বলে, বাড়িতে চল, যা ধকল গেছে পথে। ওরা বাড়ির দিকে চলে গেল।

সমীর দেখছে সুমিতাকে, বিচিত্র মেয়েটা তাহলে তার সঙ্গে জেনে শুনেই রীতিমত অভিনয় করে এসেছে, আর সমীর বোকার মত তাকে অনেক কিছুই বলে ফেলেছে, যেগুলো ঘুনাক্ষরে প্রকাশ পেলে বিপদই ঘটবে।

সরমাকে চেনে সমীর। তাই একটু ঘাবড়েই গেছে। সুমিতাকে আর দেখা যায় না।

এতবড় বাড়িতে কোথায় যেন হারিয়ে গেছে মেয়েটা, সকলের সঙ্গে কথা বলতে বলতে ওদিকের মহলে গেছে।

সমীর এসেছে সরমার ঘরে। হাত মুখ ধুয়ে একটু তরতাজা হতে সরমা বলে, তুমি বোস।

চা-খাবার পাঠাতে বলে দিই গে।

সমীর জানলার বাইরে চেয়ে দেখছে, সবুজ মাঠের বুক চিরে ময়নামতীর খালটা চলে গেছে। ওই পথ ধরে এসেছে তারা।

হঠাৎ করে হাসির শব্দে চাইল সমীর।

একটু চমকে উঠেছে সুমিতাকে দেখে। তুমি।

সুমিতা বলে, কি হল, ঘাবড়ে গেলেন যে মশাই। ভাবখানা যেন একদমই চেনেন না।

সমীর বলে,তুমি চিনেছিলে তা তো বলনি? সুমিতাও বলে, চিনব না?

সুটকেশে যা জম্পেশ করে নাম খোদাই করেছেন ওটা দেখে পীরগঞ্জেই চিনেছিলাম, তাই তো ভরসা করে নৌকোয় উঠেছিলাম। কিন্তু তোমার পরিচয়টা তো দাওনি?

সুমিতা বলে, একটু টেস্ট করে দেখলাম সরমাদি কেমন মালটিকে পেয়েছে। তাই একটু বাজিয়েছিলাম মাত্র।

অবাক হয় সমীর, ডেঞ্জারেস মেয়ে তো তুমি? হাসছে সুমিতা, শ্যালিকারা একটু ডেঞ্জারাস হয় মশাই।

তা এখন সেই মনের হাহাকার—টাহাকারগুলো আছে না গেছে?

তাহলে অবশ্য সরোদিকে বলতে হবে যাতে ওসব— বাধা দেয় সমীর, এ্যাই। মানে প্লিজ-

হাসছে সুমিতা।

ঘরে খাবার নিয়ে ঢুকছে সরমা।

সুমিতাকে দেখে বলে সে, তোকেই খুঁজেছিলাম, নে চা খাবার এনেছি।

সুমিতা খুশি ভরা স্বরে বলে ধন্যবাদ।

ওর হাসি তখনও সুন্দর মুখের থেকে মিলিয়ে যায়নি।

সরমা সুমিতাকে হাসতে দেখে শুধোয়, এত হাসির কি হল রে?

সুমিতা বলে, ছোড়দি! তুই খুব লাকি রে? কেন? সরমা তার সৌভাগ্যের কারণটা জানতে চায়

সুমিতা বলে, তোর বর, আমাদের সমীরদা একটি রিয়েল হাঁদারাম রে।

মেয়ে দেখলে যা নার্ভাস হয় না।

হাসছে সুমিতা, সরমাও। সমীর চুপ করে খেয়ে চলেছে।

তার জীবনে একটা অদৃশ্য শূণ্যতাকে নিয়ে এমনি নির্মম রসিকতা করবে সুমিতা তা ভাবতে পারেনি।

সরমা বলে, বোস, চা আনছি।

সরমা চলে গেছে। ঘরে নেমেছে স্তব্ধতা।

সমীর জানালার বাইরে বিস্তীর্ণ দিগন্তের দিকে চেয়ে আছে।

সমীরদা।

হঠাৎ সুমিতার ডাকে চাইল সমীর।

এ যেন অন্য সুমিতা। বলে সে আমাকে ভুল বুঝবেন না সমীরদা, জীবনের এই শূণ্যতা, না পাওয়ার যন্ত্রণাকে আমিও বুঝি।

কিন্তু অনেক নির্মম সত্য আছে যাকে প্রকাশ করা যায় না।

চুপ করে মেনে নিয়েই চলতে হয়।

সমীর দেখছে ওকে।

ওকে যেন সেই আরাজ্বলা দিগন্তে কোথায় হারিয়ে এসেছে সমীর।

জীবনের ক্ষণিক মাধুর্যভরা মুহূর্তগুলো এমনি করেই হারিয়ে যায়।

বনভূমি

১

পতিতপাবন প্রথম এই রাণীগঞ্জে এসে জায়গাটাকে দেখে খুশী হয়। এর আগে সে শহরেই কাটিয়েছে। মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে আর পাঁচটা সাধারণ ছেলের মতই মধ্যবিত্ত পরিবারে কষ্টেসৃষ্টে মানুষ হয়েছে। ওর বাবার শহরে একটা বেসরকারী ফার্মে চাকুরী। দুই ছেলে আর স্ত্রীকে নিয়ে তার সংসার। নিশিকান্তবাবু সামান্য চাকরী করে তবু বড় ছেলেটাকে মানুষ করেছিলেন। নিশিকান্তবাবু পতিত পাবনের বাবা। পতিতের বড় দাদা সুমিত ডাক্তারী পাশ করে আর এক বড়লোকের একমাত্র মেয়েকে বিয়ে করে চলে যায় কলকাতায়।

সেখানেই থেকে যায়। ক্রমশঃ নামও করে। পায় অর্থ প্রতিষ্ঠা। স্ত্রীও তার ডাক্তার। দুজনে মিলে একটা বড় নার্সিংহোমও করেছে। এসবই অবশ্য শোনা কথা। কারণ সুমিত কলকাতায় গিয়ে সেখানের ইদুঁর দৌড়ে সামিল হয়ে অন্য কোনদিকে চাইবার সময়ও পায়নি। তাই ওদের খবরও নেবার সময় নেই সুমিতের। পতিত এম এ পড়ছে। বাংলা সাহিত্যের প্রতি তার গভীর শ্রদ্ধা। রবীন্দ্রনাথ তার প্রিয়। রবীন্দ্রনাথের কাব্য সাহিত্য নিয়েই তার সময় কাটে।

মফস্বল শহর। শহরের একদিকে প্রবাহিত হয়েছে গঙ্গা। অন্যদিকে দিগন্তপ্রসারী আমবাগান। মাঝে মাঝে ক্ষেত জঙ্গল। প্রকৃতির স্পর্শ মুছে যায়নি এতদিন। কিন্তু এবার ওই সবুজকে আর বাঁচানো যাবে না। এখানকার মানুষজন ওইসব সবুজ দামী আম কাঁঠাল লিচু গাছগুলোকে কেটে গড়ে তুলেছে তাদের বসত বাড়ি ছোট কারখানা।

এখানে এখন আর পাখীদের কলরব ওঠে না। ওঠে মদ্যপ জড়িত কণ্ঠের খিস্তী। শান্ত পরিবেশে মানুষের আদিম হিংস্রতার ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে। এদিকে ওদিকে বসে পুতিগন্ধময় দিশী মদের ঠেক। আর সাট্টাজুয়ার আসর। এমনি দিনে পতিতের বাবাও মারা যান। মা তখন অসুস্থ। পতিত আশা করেছিল তার চরম বিপদে বড় দাদা সুমিত খবর পেয়ে ছুটে আসবে। কিন্তু আসেনি। দাদা নাকি খুবই ব্যস্ত। বাবার শ্রাদ্ধের জন্য কিছু টাকা পাঠিয়েছিল। পতিত তখন এম এ পাশ করে একটা স্কুলে শিক্ষকতা করছে। সে টাকাটা নিতে চায়নি। মা বলেছিলেন— দাদা কষ্ট পাবে ওটা নে।

মায়ের কথায় টাকাটা নিয়েছিল পতিত। বাবার শেষ কাজটা সেই করে। তার কিছুদিন পর মাও চলে গেলেন। মায়ের শরীর মন আগেই ভেঙে গিয়েছিল। পতিত তবু সেবা যত্ন করে টিকিয়ে রেখেছিল মাকে। কিন্তু বেশীদিন তিনি থাকেননি। পতিতকে মুক্তি দিয়ে চলে গেলেন।

তারপর পতিত একা, তার দিন কাটে পড়াশোনা নিয়ে আর ছাত্রদের পড়িয়ে। যে জায়গার সবুজ মায়ায় সে আটকে ছিল সেই সবুজ পরিবেশটাই আর নেই। সে দেখে তাদের বাড়ির সামনের বাগানের সুন্দর গাছগুলো কেটে সেখানে গড়ে তুলেছে কারা একটা প্লাস্টিকের কারখানা। গাড়ি গাড়ি নোংরা প্লাস্টিক আসে। সেগুলো ফার্নেসে গলানো হয়। সারা এলাকার বাতাসে ওই বিষ ধোঁয়া ভরে ওঠে।

গাছগুলোও শুকিয়ে বিবর্ণ হয়ে যায়— মানুষজনও অসুস্থ হয়ে পড়ে। এই পরিবেশ দূষণ নিয়ে এলাকার মানুষও সরব হয়। তাদের নেতৃত্ব দেয় পতিতপাবন। সারা এলাকায় ঘুরে জনমত সংগ্রহ করে এলাকার মানুষদের নিয়ে মিটিং মিছিলও করে। এসব অত্যাচার বন্ধ করতে চায়।

এমনি দিনে ওই কারখানার মালিক নিজে আসে পতিতের বাড়িতে এক রাতে। ওরা আসে রাতের

অন্ধকারেই তাদের গোপন প্রস্তাব দিতে। পতিতকে ওরা বেশ ভালো টাকাই দেবে। দরকার পড়লে পতিতকে কারখানায় একটা চাকরীও দেবে। পতিত যেন এসব আন্দোলন থেকে সরে আসে। ওদের নিরাপদে ব্যবসা চলতে দিলে লাভ হবে পতিতেরই।

পতিতপাবন ওদের কথায় বলে,— "টাকা নিয়ে এতবড় অন্যায়কে প্রশয় দিতে পারবো না। সব সবুজ গাছকে আপনারা শেষ করেছেন, এলাকার বাতাসও বিষে ভরে দিয়েছেন। মানুষের বাঁচার অধিকারকেও অস্বীকার করতে চান। একাজ আমি সমর্থন করবো না।"

মালিক বলে, আমার কথাগুলো শুনলে ভালই করতেন।

পতিত ওদের কথা শোনেনি। পতিত দেখে এই আন্দোলনের বেশ কয়েকজন নেতা এবার সরে পড়েছে। এবার বেশ একাই পড়ে যায় পতিত। তবু সে আন্দোলন চালাতে থাকে। আর এমন দিনে জেলার স্কুল কর্তৃপক্ষ তাকে বদলি করে দেয় দুখানা জেলা পার করে একেবারে পুরুলিয়ার কোন বনপার্বত্য অঞ্চলের একটা স্কুলে।

অবশ্য তাকে প্রমোশন দিয়ে সেই স্কুলের প্রধান শিক্ষকই করা হয়েছে। পতিত প্রথমে ভেবেছিল আপত্তি জানাবে।

তবু জায়গাটা কেমন হবে দেখার জন্যই সে প্রথম এসেছিল রূপগঞ্জের এই পার্বত্য অঞ্চলে। পুরুলিয়া শহর থেকে বাসে করে দুঘণ্টা আসার পর পড়ে এই জায়গাটা। বনপাহাড় দিয়ে ঘেরা। সবুজ গহন বনভূমি তার মাঝে একটু সবুজ উপত্যকার এই রূপগঞ্জ। এলাকাটা যেন একটা ছবির মতন। চারপাশে উঠে গেছে পাহাড়, পাহাড়ের গা বনে ঢাকা। উপত্যকার এদিকে শুরু হয়েছে বেশ গভীর বন। বড় বড় শাল পিয়ালের মহুয়া সেগুন গাছে ভরা। ওদের বুকে লতা পলাশ আসাড় লতার ঘন জঙ্গল। নীচের বনভূমিতেও সবুজ স্পর্শে ভরে গেছে। তখন বনে ফুটেছে লতা পলাশ লাল গোল গোল ফুলের রং বাহার। ল্যাট্যার্জী ফুলের চাপা মিষ্টি গন্ধ ছড়ায় বাতাসে। বড় বড় কুসুম গাছগুলো নতুন ভায়োলেট রং-এর পাতায় সেজে উঠেছে। এই বনের গভীরে আছে হাতি— বাঘ— হরিণ ইত্যাদি।

২

ছোট পাহাড়ী নদীটা বনের বুক চিরে চলে গেছে— সামান্য পায়ের পাতা ডোবা জল। পাখীদের কলরব ওঠে। পতিতের নিঃসঙ্গ মন এখানে এসে যেন অদৃশ্য কোন সঙ্গীকে খুঁজে পায়। গ্রামটাও বেশ বড়। পাকা রাস্তাটা গ্রামের বুক চিরে চলে গেছে। এদিকে বনে গাছগাছালি শাল মহুয়ার ছায়া ঘেরা বনবিভাগের অফিস। বনকর্মীদের কোয়ার্টারগুলো গড়ে উঠেছে একটা পুকুরের চারপাশে।

স্কুলের এলাকার মধ্যেও বেশ কয়েকটা প্রাচীন শাল মহুয়ার গাছ রয়েছে। শীত শেষ হয়ে আসছে। হালকা গরম রয়েছে। এখানে গ্রীষ্মকালটা রূপ নিয়েই আসে। তেতে ওঠে লাল পাথুরে মাটি। তেতে ওঠে পাহাড়। বাতাসে তখন অগ্নিবন্যা বয়। শীত শেষ বসন্তের শুরু। মহুয়া গাছের সব পাতা ঝরে গেছে ডালে ডালে এসেছে গোছা গোছা মহুয়া ফুল। সন্ধ্যার শুরু হতে ওদের কুঁড়িগুলো ফুটে ওঠে, রাতভোর বাতাসে ছড়ায় মদির সুবাস।

তারপর রাত শেষে তাদেরও পালা শেষ। ঝরে পড়ে মাটির বুকে এক রাতের অভিসার শেষে। বন থেকে আসে ভালুকের দল। তলায় বিছানো ফুল খেয়ে খুশীতে মাতোয়ারা তারা। নেচে কুঁদে ফিরে যায় বনে। বাকী ফুল কুড়িয়ে আনে আদিবাসী মেয়েরা। পতিত এই অরণ্য ঘেরা বনজগতে এসে যেন নতুন করে নিজেকে খুঁজে পায়। গ্রামের হাতুঁড়ে ডাক্তার ওকে নিয়ে যায় স্কুলের ম্যানেজমেন্ট কমিটির সভাপতি নিরাপদ ঘোষের ওখানে। বিরাট কাঠগোলা— করাত ক লের মালিক নিরাপদবাবু। বাজারে ওর ধানচালের আড়ত। আরও অনেক কিছু বিক্রীর এজেন্সী রয়েছে তার। নিরাপদ তখন কাঠগোলায় অফিসে বসে এখানের রেঞ্জার অলোকবাবুর সঙ্গে দরাদরি করছিল। অলক সেন

সেখানের ফরেস্ট রেঞ্জ অফিসার। বেশ কয়েক বছর ধরে বেশ জমিয়ে বসেছেন। মাস মাইনেতে তার হাত পড়ে না। মাইনে ছাড়াও বেশ কিছু টাকা মাসে মাসে তার এবং স্ত্রীর অ্যাকাউন্টে জমা পড়ে। আর বেশ কিছুটা সে ঘরেই রাখে সেবার অলোকবাবুর কোয়ার্টারে ডাকাতি হয়। ওর কোয়ার্টার বনের ধারে। তার অফিসে অলকবাবুর সঙ্গে নিরাপদ ঘোষের একটা অলিখিত চুক্তি হয়ে যায়।

রাতের অন্ধকারে নিরাপদর লোকজন বনের গভীরে ঢুকে পড়ে বড় শাল-সেগুন গাছ কয়েকটা সাফ করেছে। কয়েক লাখ টাকার গাছই হবে। নিরাপদবাবুর লোকরা এসব কাজে বেশ নিপুণ। তারা যন্ত্রচালিত হাত করাত-ট্রাক লোকজন নিয়ে বনের গভীরে যায় রাতের অন্ধকারে। কুড়ুল তারা ব্যবহার করে কম। কারণ রাতের স্তব্ধতার মাঝে কুড়ুলের শব্দ অনেক দূরে শোনা যায়। সেবার ওই গাছ কাটার জন্য অলকবাবু প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা পেয়েছিল। কিন্তু তার পরদিনই রাতে তার বাড়িতে ডাকাতি হয়ে যায়। টাকা পয়সার জন্য ডাকাতরা অলকবাবুর আলমারী বাক্স ভাঙেনি। অলকবাবুর শোবার ঘরেই তোষক লেপ বালিশগুলোকে ছিড়ে কুটে রাখে। অলকবাবু নাকি ওই সবের মধ্যেই দুনম্বরী টাকাগুলো রাখতেন। আর ডাকাতরা সেই খবর নিয়েই হানা দেয় এবং ওর যথাসর্বস্ব লুঠ করে নিয়ে যায়।

অবশ্য অলকবাবু তাতেও দমেনি। এই বনাঞ্চলে আছে প্রচুর দামী গাছ আর নিরাপদবাবুর মতো নিরাপদ লোক থাকতে তার প্রণামীর অভাব হয় না। সেই ক্ষতি তার পুষিয়ে দিয়েছে নিরাপদ। এবার নতুন করে গাছ কাটার প্ল্যান হচ্ছিল। নিরাপদ খবর পেয়েছে এই বনের একদিকে বেশ কিছু রোজউড গাছ আছে। রোজউড খুবই দামী। এর থেকে থালা, গেলাস, বাটি তৈরী হয়। ওইসব পাত্র নাকি সবসময় বিষকে শোধিত করে দিতে পারে। তাই চড়াদামে বিক্রী হয়। ওদের আলোচনা থেমে যায় গুপীনাথকে দেখে। এই দুর্গম অঞ্চলে চিকিৎসার জন্য সকলকে ডাকতে হয় গুপীনাথকে। নিরাপদ দেখে গুপীনাথের সঙ্গে এসেছে একজন তরুণ। গুপীনথই বলে নিরাপদবাবু ইন পতিতপাবন বাবু। আমাদের স্কুলের নতুন হেডমাস্টার হয়ে এসেছেন। ওকে তাই প্রেসিডেন্টের সাথে পরিচয় করাতে নিয়ে এলাম। পতিতপাবন নমস্কার করে নিরাপদকে। নিরাপদবাবু এমনিতে সৌখিন লোক। টাকার অভাব নেই। আর গ্রহরত্নে বিশ্বাস করেন। তাই দশটা আঙুলে নানা সাইজের দামী হীরে নীলা মুক্তো ইত্যাদি বাসানো অংটিও রয়েছে। তার বিদ্যে প্রাইমারী ক্লাশ অবধি। তবে এখন পঞ্চায়েতের প্রধান স্থানীয় স্কুলের চেয়ারম্যান— রূপগঞ্জের বড় ব্যবসাদার। তাই ইংরেজীটাই মাঝে মাঝে প্রয়োগ করেন। বড় বড় মুন্সিয়ানাও দু একটা ভুল বাক্য বললেও সেগুলোকে আজও কেউ ভুল বলেনা। তেমনি নিরাপদবাবুর ইংরেজীও বলে, গুড মরনিং। কে আছিস টু কাপ গুডটি এনে দে ডাক্তারবাবুকে। উইথ বিসকিট। এরা আবার ইংরেজীও বোঝে না। ওরে চা বিস্কুট আন্ তারপর নিরাপদ বলে।

— তাহলে মাস্টার এসে লেগে যাও। এই স্কুলকে আরও বিগ করো। ছেলেরা যেন ভালভাবে পাশ করে। আগেকার মাস্টার ইংলিশ ভালো জানতো না। ভেরি ব্যাড-তুমি—

— আমি চেষ্টা করবো স্যার। পতিত বলে।

— গুড। বিদ্যাদান বলে কথা। ভেরি গ্রেট কাজ। বোডিং এ থাকবো। কোন অসুবিধা হলে কাম টু মি।

পতিত বলে,

—অনেক ধন্যবাদ স্যার। আজ চলি।

—গুডনাইট! নিরাপদবাবু ভর দুপুরকেই রাত্রিতে পরিণত করে দেয়। পতিত বের হয়ে আসে। সেও বুঝেছে বাবুকে।

গুপীনাথ বলে,

— মাস্টার। নিরাপদবাবু খুব উপকারী লোক। তোমার কাজকর্ম দিয়ে ওকে খুশী করতে পারলে ব্যস্। তোমার আর ভাবনা থাকবে না। পতিতের এই জায়গাটা ভাল লেগেছে। বিশেষ করে এই অরণ্য এই স্কুলের কোয়ার্টার। ওদিকেই তার শেষপ্রান্ত তার ছোট মাটির ঘরগুলো বেশ সাফ সুতরো। তাদের

দেওয়ালটা আবার রং করা। দু একটা ছবিও এঁকেছে তাতে। পতিত বলে,

— থাকা তো যাবে ডাক্তারবাবু। কিন্তু ঘরের কাজকর্ম, ঘর সাফ করা, কাপড় কাচা, বাসন মাজা।

গুপী ডাক্তার বলে,

—ওর জন্য ভাবতে হবে না। ওসব কাজের জন্য ওই বসতি থেকেই একটা কাউকে ডেকে এনে দোব। নো প্রবলেম।

মেয়েটার নাম ফুলমতি। ওর বাবাটা ছিল আদীবাসী পাড়ার ডাকাবুকো— গ্রামের মানুষের জমি ভাগে চাষ করতো। কিন্তু অন্যায় সে সইতে পারে না। তাই তার পৈত্রিক নামটাও লোক ভুলে গিয়ে অবুঝ বলেই ডাকতো সবাই। অবুঝ বলতো—

তুমরা বুঝতে লারি হে। সাত শেলি ধান লিই জমির মালিক দশ শালি লিখে রাখে—তারপর সুদ। ধান উঠলে তখন গলায় গামছা দিয়ে সব আদায় করবে। ধান মাপছে তা শুধু একজায়গাতেই বিড় বিড় করে পনেরো পনেরো পনেরো এই করে তিনবার ওই ধান হুড়িয়ে লিলে বুঝতে পার না। আমি পারি তাই আমার সাথে কাজিয়া বাঁধে। উটা চোর। আমাদের ঠকায়।

তেজী যৌবন ছেলেটাকে গ্রামের অনেকেই সইতে পারে না। নিরাপদের কাঠগোলাতে কাঠ কাটতে গিয়ে সেবার তো ওর চুরি করে কেটে আনা সেগুনগাছই ধরিয়ে দিয়েছিল রেঞ্জার অফিসারকে। কড়া রেঞ্জার অফিসারও মামলা শুরু করে দেয়। সেই মামলায় সাক্ষীও দেয় অবুঝ। তখন অবুঝের বিয়ে থা হয়েছে। ওই ফুলমতি তখন সবে হয়েছে। অবুঝের সংসার বলতে ওর স্ত্রী আর ছোট মেয়েটা। ওর বৌ বলে অবুঝকে, দরকার কি তুমার চুরি করার কথা বলে।

অবুঝ বলে,

—উর পাপের টাকা লিই নাই— চোরকে ধরাই না দিলে দেশের ভালো হবেক নাই। চুরি করবেক আর ওর বড় বড় কথা।

সেবার নিরাপদ অনেক কাঠ খড় পুড়িয়ে সদরের নেতাদেরও নাকি মোটা টাকা.প্রণামী দিয়ে ছাড়া পায়। তার কিছুদিন পরই ডাকাতির ঘটনা রটে পাশের গ্রামে। আর সেই দলে নাকি অবুঝও ছিল। গ্রামসমিতির লোক কথাটা শুনে চমকে ওঠে। অবুঝ এমনিতেই ডাকাবুকো। ভালো লাঠি তরোয়াল খেলতে পারে। সাহসীও, তাই হয়তো সে রাতের অন্ধকারে এসব কাজও করে।

থানার পুলিশ অফিসারও তাকে এ্যারেষ্ট করে আনে। অবুঝ বলে, — বোঙার কিরা দারোগা বাবু— ইসব কাজ আমি করি নাই। মিছামিছি ধরছেন আমাকে।

পুলিশ ওসব কথা শোনেনা। তার ঘর চালা ঘরও খোঁজ হলো। পুলিশ গামছা পরে নামলো তার বাড়ির লাগোয়া জলটাতে। সেখানেও কিছু মেলে না। তবু ধরে নিয়ে যায় পুলিশ তাকে।

ফুলমতী তখন ছোট্ট। ওর মা কান্নায় ভেঙে পড়ে। প্রতিবেশীদের অনেকেই ধন্ধে পড়েছে। কে জানে ব্যাপারটা সত্যি না মিথ্যে, তাই তারাও বিশেষ গা করে না। অবুঝকে পুলিশ ধরে নিয়ে যায়— আর ডাকাতির কেসটা ভালই জমে উঠছে। সেই রাতে ডাকাতরা সেই বাড়ির মালিককে বেশ মারধোরও করেছিল। লোকটা হাসপাতালে ভর্তি হয়। আর মারা যায়। তাই পুলিশও তার বিরুদ্ধে খুনের চার্জও দিয়েছিল। তাই অবুঝের সাত বছর জেল হয়।

অবুঝ নেই। ওর বৌটার শরীর ভালো নয়। ঘুসঘুসে জ্বরে ভুগতো। অবুঝ জেলে যাবার পর— খাবারও ঠিকমতো জুটতো না তাদের। একদিন তাই মারা যায় বৌটা। ফুলমতী তখন বছর পাঁচেকের। এই সংসারে একা। ওর সামান্য জমিজমা ঘর বাড়িও প্রায় বেদখল হয়ে গেছে। সেদিন ওই বসতির বাগদি বুড়িই মেয়েটাকে ওর ঘরে নিয়ে যায়। বাগদি তাকে খেতে দেয় আর তার ঘরে রাখে। আর ফুলমতীও এখন নিজেই বুঝেছে যে তাকে এই দুনিয়ায় লড়াই করে বাঁচতে হবে। মেয়েটা তবু বেশ হাসিখুশী । বাগদি বুড়ি তাকে সাধ্যমত মানুষ করেছে।

৩

অযত্নে পড়ে থাকা অরণ্যের শাল গাছ যেমন প্রকৃতির সাহায্যে আপনি থেকেই বেড়ে ওঠে, তাতে আসে ফুল পাতা, আনন্দে বাতাসে মাথা নাড়ে, ফুলমতীও তেমন করেই প্রকৃতিতে নিজেই বেড়ে উঠেছে। বেশ চটুল মেয়েটা নাচগানও শিখেছে বাগদী বুড়ির কাছে। করম-মারাং বুরুর উৎসবে নাচে গায়। ফুলমতীকে গ্রামের পাঠশালাতেও পাঠিয়েছিল বুড়ি। মেয়েটা দেখতে মন্দ নয়। বেশ চঞ্চল আর দামাল। কিন্তু পাঠশালার ওই সীমিত গণ্ডির মধ্যে তার মন বসে না। ফুলমতী চলে যায় বনে। মউল কুড়ায়। গাছে উঠে পাখীর ছানা ধরে। আর একটা গুণও তার সহজাত। পাখী জন্তু-জানোয়ারদের ডাক শুনে সে ঠিক নানা পাখীর ডাক ডাকতে পারে। কুকুরের ডাকও ডাকতে পারে।

মেয়েটা যেন নিজের দুঃখকে ভোলার জন্যই এই ভাবে থাকে তবু মনে পড়ে তার বাবার কথা। ওর বাবা নাকি আর ক'বছর পরই ফিরে আসবে। কিন্তু একদিন ওদের পাড়াতে রাতের বেলায় আসে পুলিশের গাড়ি। সারা বসতি ঘিরে ফেলে। সার্চ করতে থাকে তারা। কাকে খুঁজছে। কি খুঁজছে তা কেউ জানেনা। শেষে জানা যায়। অবুঝ নাকি আরও ক'জন আতঙ্কবাদী আদিবাসীদের সঙ্গে জেল ভেঙে পালিয়েছে ক'দিন আগে। পুলিশ তার খোঁজেই এসেছিল। ফুলমতি তবু স্বপ্ন দেখেছিল তার বাবা ঠিক তার কাছে আসবেই। তাই রাতে জেগে থাকতো, যেত নির্জন বনে। কিন্তু বাবা আর আসেনি। ততদিনে বেশ কয়েকটা বছরও কেটে গেছে। এখন ফুলমতি ঘরের কাজকর্মও করে। বুড়িরও বয়স হয়েছে। খাটতে পারে না, তাই ফুলমতি গাঁয়ের দুতিনটে বাড়িতে কাজ নিয়েছে। সেই খেটে কিছু টাকা আনে। বনে যায়, কাঠ শালপাতা তুলে আনে। বাগদি বুড়ি ঘরে বসে শালপাতার থালা বাটি বানায়। মহাজনের আড়তে তা দিয়েও কিছু টাকা পায়।

গুপী ডাক্তারও চেনে মেয়েটাকে। গ্রামের অনেকেই তার দুর্ভাগ্যের জন্য ফুলিকে একটু বেশী স্নেহ করে। গুপী বলে বাগদীকে, এই বুড়ি ফুলির জন্য একটা ভালো কাজের ঠিক করেছি। তোদের বাড়ির কাছেই থাকবে। ওই যে হেডমাস্টারের ঘরের কাজকর্ম করে দেবে। দুজনের খাবার জল খাবার সব পাবি। মাসে দুশো টাকা বেতন আর জামা কাপড়। নতুন মাস্টারও বেশ ভালো লোক রে। ফুলি এর মধ্যে দেখেছে নতুন মাস্টারকে। সে বলে—

—তুমার সঙ্গে ঘুরছিল সেই তো।

— হ্যারে, চল সব কথাবার্তা পাকা করে দিই। ওখানে কাজে লাগ, মন দিয়ে কাজ করবি। তোর মাইনেও বেড়ে যাবে। মাস ফুরোলেই কড়কড়ে তিনশো টাকা।

বাগদি বুড়ি বলে—

— হ্যাগো ডাক্তার বলি মাইয়াটা কি খেটে খেটেই মরবেক। আমি আর ক'দিন বাপটা তো পালালেক— একটা জাত-বিজাতের ছেলেকে দেখে ওর বিয়ে-থা দাও। তবু একটা হিল্যে হবেক। তা নয় ভালো চাকরী করে হবেক?

গুপী ডাক্তার বলে—

হবে হবে তাও হবে। আগে ডাগর-ডোগর হোক। এখন কম বয়সে বিয়ে দিতে গেলে পুলিশ থেকে জেলে পুরে দেবে।

জেলকে ওদের খুব ভয়। অবুঝটাও জেলে হারিয়ে গেল। বুড়ি বলে—

— তাহলে কাজ নেই। ফুলি যা ডাক্তারবাবুর সঙ্গে। ঘরের ধারে কাজ দিনরাত দেখতে পাবো।

পতিতও মেয়েটাকে আসতে দেখে ডাক্তারকে বলে,

—ও ডাক্তারবাবু একি পারবে? ছোট মেয়ে।

গুপী ডাক্তার বলে—

—মাস্টার তুমি তো রবি ঠাকুরের খুব ভক্ত। কালতো বনের মধ্যে দাঁড়িয়ে রবি ঠাকুরের ওই কৃষ্ণ বন্দনা শুনিয়ে অরণ্যের জয়গান গাইলে। এসব পারবে, তুমি মেয়েটাকে কাজে নাও।

সেই থেকে ফুলমতি পতিতবাবুর বাসাতেই কাজ করছে। পতিতবাবু এক বিচিত্র ধরনের মানুষ। সকালেই সে বনে চলে যায়। এই সবুজ বনভূমি গাছপালা সব যেন এই প্রকৃতিকে সাজিয়ে রেখেছে। বড় বড় শাল সেগুন গাছগুলো আকাশে ঠেলে উঠেছে সূর্যের আলোর প্রত্যাশায়। মৃত্তিকার বুকের স্নেহরসে তাদের জন্ম--- লালিত পালিত সূর্যের রশ্মি কণায় ধরিত্রীকে স্নিগ্ধ করে, করে সুজলা সুফলা। মানুষের আদিম কালের বন্ধু ওরা। মানুষের কাছে তাদের প্রত্যাশা কিছুই নেই। শুধু দিয়েই যায় নির্মল বাতাস--- ডেকে আনে সজল মেঘের দলকে। তাদের বারি বর্ষণে ধরণী হয়ে ওঠে ফলবতী। আকাশে বাতাসে ভরে ওঠে শাল মঞ্জুরী মহুয়া কুরছি ফলের সুবাস।

৪

পতিত এই অরণ্যে এসে যেন মুক্তি পায়। সেও যেন ফিরে গেছে সেই উপনিষদের যুগে। এই আরণ্যক পরিবেশেই জন্ম নিয়েছিল বেদ উপনিষদের সূত্র। কিন্তু বেশ হতাশই হয়েছে পতিত। মাঝে মাঝে রাতে ওর ঘুম ভেঙে যায়। আদিবাসী পাড়ায় রাতের চাঁদজাগা ফিকে অন্ধকারে ভেসে আসে ওদের গানের সুর। মানেটা ঠিক বোঝেনা--- তবে মনে হয় এও যেন সেই অরণ্য বন্দনার গানই। ধামসা-মাদল-বাঁশীর সুর ওঠে।

কখনও স্তব্ধ রাত্রিতে ঘুম ভেঙে যায় পতিতের। অন্ধকারে দূর বন থেকে ভেসে আসে একটানা ঠক্ ঠক্ শব্দ। কোন চোরা দল বনের কোন বনপতিকে হত্যা করছে তিলেতিলে।

রাতের স্তব্ধতা ভেদ করে ওঠে ট্রাকের শব্দ। বনে যেন লুন্ঠন পর্ব চলেছে রাতভোর। সকালের সব শুনশান। পতিত বনের গভীরে যায়--- কোনদিন খোঁজও পায় না। কোথায় গাছ কাটা হয়েছে। তবে বনের নরম মাটিতে দেখা যায় ভারী ট্রাকের চাকার দাগ। ঝোপ ঝাড় ভেঙে কারা লুন্ঠনপর্ব চালিয়েছে রাতভোর সকালে সব শুনশান। আবার কোনদিন দেখে তারই দেখা সেই বড় সেগুন গাছটাও আর নেই। পড়ে আছে ওর কাণ্ডের কিছুটা। যেন মুণ্ডহীন একটা ধড়ই পড়ে আছে।

সন্ধ্যার পর বাজারের অনেকে গুপী ডাক্তারের ওখানে আসে। গুপীরও তখন রোগীর ভিড় থাকে না। তাই খোস গল্পের আসরও বসে। পতিতবাবুও আসেন। তিনি বলেন—

—ডাক্তারবাবু এমন সুন্দর বন। এত বড় গাছ, রাতের অন্ধকারে এইভাবে যদি চোরাকাটাই হয় এ বনও তো থাকবে না। সব ফাঁকা হয়ে যাবে। মরুভূমি হয়ে যাবে এই সোনা ফসলের জমি।

গুপী ডাক্তারও জানে ব্যাপারটা। সে বলে,

—মাস্টার। মাস্টারী করছ তাই করো, রাতের অন্ধকারে এখানে কি হয় জানতে চেও না।

পতিতের কাছে এটা প্রশ্ন হয়েই থেকে যায়। ফুলমতি ক'মাসেই এখন পতিতবাবুর সংসারের হাল ধরেছে। রান্নাবান্না করে, পতিতবাবুর জন্য ঘন ঘন চাও তৈরী করে। ফুলি বলে—

-- বাবু এত চা খেও না। আর দিন রাত বনে বনে কেন ঘোরো, বনে সাপ বনবিড়াল--- ভালুক তো আছেই মাঝে মাঝে দু-একটা বাঘও আসে।

পতিত বলে—

— বনে এসব তো থাকবেই রে। তবে যেভাবে রাতেরবেলায় এখন গাছ লুট হয় তাতে বনই আর থাকবে না।

অবশ্য প্রশ্নটা জেগেছে ফুলি ছাড়াও ডুংরীর অন্য মেয়েদের মনেও। শাল গাছ তাদের কাছে অত্যন্ত পবিত্র গাছ, এর পাতায় গরু ছাগলের পেট ভরে। এর পাতা তুলে থালা বাটি তৈরী করে বসতির মানুষের ভাত জোটে। এই গাছের গোড়া থেকে আবার নতুন শালগাছ বের হয়। ঘন করে তোলে জঙ্গলকে। শালগাছের গোড়ায় বর্ষার সময় জন্মায় রাশিরাশি কুড়াল ছাতু। ছোট গোল আলুর মত দেখতে এই পুষ্টিকর খাদ্য আদিবাসীদের খিদে মেটায়।

— তারাও দেখছে বনে লুঠ পর্ব চলেছে। পাতা তুলতেও দেয় না বনরক্ষীর দল, আর গাছই সাবাড় হয়।

ফুলি বলে,

— আর বলবেন না বাবু। ওই নিরাপদ ঘোষের করাত কলেই সব গাছ যায়। পোড়ার মুখো ওই বনবাবু অলক না ফলক কি যেন নাম, সে তো খালি ঘুসই খায় আর গাছ কাটতে দেয় রাতেরবেলায়। বনসাফ হয়ে গেলে এই ডুংরীর সবাইকেই না খেয়ে মরতে হবেক।

পতিতবাবুও এমনি একটা সন্দেহ করেছিল। ওই ফুলির মুখে এসব কথা শুনে বলে,

—তা ডুংরীর লোক, গ্রামের লোক এসবের জন্য বাধা দেয় না কেন?

ফুলি হাসে। বলে,

—তুমি কি গো। এত লেখাপড়া শিখেছো। আর এটা বোঝনি, ঘোষ মশায়ের অনেক চ্যালা আর পুলিশও ওর হাতে। ও যা খুশী তাই করে এখন। টাকা দিয়ে বনবাবুকে কিনে রেখেছে ও। আমার বাবাতো এনিয়ে গায়ের লোকদের নে মিছিল মিটিং করতো— বাধা দিত। তাকে পুলিশ ডাকাতির জন্যই মিছামিছি কয়েদ করে রাখলো। বাবাতো নিরুদ্দেশ হই গেল। কে কথা বলবেক! তাই সবাই চুপ করেই থাকে। তবু ওই করাত বলে, কাঠগোলায় কিছু লোক তো কাজ করে দিন চালায়।

পতিতবাবু ভাবছে কথাটা। সে মাঝে মাঝে সদর শহরে যায়। এই জেলার দপ্তরে তার দু-একজন বন্ধুও ভাল পোস্টেই কাজ করে। পতিত অবশ্য এসব কথা এখানে কাউকে জানায়নি। এবার পতিত নিজেই ওই চোরা কাটাহ-এর কাজ বন্ধ করবে।

৫

শীতের শুরু এখনও হয়নি। বর্ষার মেঘগুলো উপত্যকার আকাশ থেকে বিদেয় নিয়েছে। পতিত সেদিন বনের মধ্যে ঘুরছে। ওদিকে বনগড়ানি জলজমে কিছুটা জায়গায় জল জমে রয়েছে। বনের পশুদের ওখানে জলখাবার জায়গা। নরম মাটিতে দেখা যায় বন্যশুয়োর, ভালুকের পায়ের ছাপ। বন্যশুয়োরের দল ধারালো দাঁত দিয়ে নরম মাটি খুঁড়ছে কোন কন্দমূলের সন্ধানে। দেখা যায় হরিণের পায়ের ছাপ। সেই জলটায় একটা লোককে কি করতে দেখে পতিত বলে,—

এই কি খুঁজছিস ওখানে? ওই জলের মধ্যে কি?

লোকটা পতিতকে চেনে। পতিতও তার মুখ চেনে। এর আগে ডুংরীতে করম পরবের নাচের আসরে দেখছে ওকে তন্ময় হয়ে বাঁশী বাজাতে। পতিতের ডাকে জলা থেকে উঠে আসে তরুণটি। ডাঙায় পড়ে আছে একটা ঝুড়িতে পদ্মগাছের মূল, তখনও তাদের গায়ের কাছা শুকোয়নি। এর আগে পতিত ঐ ছেলেটাকে নাচগানের আসরে দেখেছে। খুব সুন্দর বাঁশী বাজায় ছেলেটা। ছেলেটাই বলে,—

— আমাকে চিনতে পারলেন গো মাস্টার মশাই। আমি বসন, ওই নিচু ডুংরীতে থাকি।

পতিত বলে,

—এখানে কি করছিলে? মাঝে মাঝে দেখি বনে ঘুরে বেড়াও।

—সবুজ বনের মধ্যিখানে তলাটা ফাঁকা পড়ে রইছে। তাই ভাবলাম গাঁয়ের পুকুর থেকে পদ্মফুলের গোড়া এনে ইখানে লাগিয়ে দিই। এই সবুজ বনের মধ্যিখানে পুকুরে গোলাপী পদ্মফুল ফুটলে যা সোন্দার দেখাবেক। তাই পদ্মের গোড়া পুতছি গো।

পতিত অবাক হয়ে দেখছে বসনকে। বনকে সুন্দর করে তেলার কাজটাও সে করতে চায়। বসন বলে—

গাঁ বসতিতে শান্তি নাই বাবু। এই সবুজ ফুল ফলে ভরা শান্তির রাজ্য শীতকালে ওর এক চেহারা। আবার গাছে গাছে আসে শালের মঞ্জুরী,ফুটবেক মৌল, কুচি গোলশাল, লতা, পলাশ কত ফুল। বর্ষার কালো মেঘ আছড়ে পড়বেক ইখানে সারা বন তখন চান করে সুন্দরী হয়ে উঠবেক। কত পাখীর গান কত সুর আমিও ওদের সুরে পাতার নাতার ছন্দে বাঁশী বাজাই।

পতিত দেখছে বসনকে। শুনছে ওর কথা। বসন বলে—

— তাই বনকে আর রাখবেন নাই বাবু। ওই বনবাবু আর ঘোষ মশায় দুজনে মিলে বনকে সাফ না করে ছাড়বেক নাই। কেউ কি ওদের থামাবেক নাই গো? এমন সুন্দর বন শেষ হই যাবেক?

এটা যেন পতিতের মনের কথা। অথচ পতিত জানে সরকার এই বন পাহাড় নদীর সৌন্দর্যকে তুলে ধরার জন্য অনেক টাকা খরচ করে বনবিভাগ থেকে বাংলো অতিথি নিবাস গড়ে তুলেছে। এই নিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েতে আলোচনাও হয়ে গেছে।

অনেকেই আশা করে এতে বনরক্ষার কাজও ভালো হবে। বনের কিছু বনটিয়া, হরিণ, ভাল্লুক হাতি চিতা এমনকি বাঘও দু-একটা যদি থাকে তারাও নিরাপদে থাকতে পারে।

শোনা যায় বুনো হাতির পালও এই অঞ্চলের বনে থাকে। মাঝে মাঝে ধান পাকার সময় গ্রাম বসতিতেও চলে আসে মুখ বদলাতে। গ্রামের আদিবাসীরা ঘরেই হাড়ি হাড়ি ধেনো মদ তৈরী করে। হাতির পাল সেই খবর পেয়েও এসে হানা দেয়। বাঘের উৎপাতও হয় মাঝে মাঝে। আর ভালুক তো প্রচুর আছে। মাঝে মাঝে লোকালয়েও হানা দিয়ে ভালুক গ্রামের মানুষকেও ঘায়েল করেছে। এই আদিবাসী বসতিতেই কমাস আগে একটা ভালুক রাজাকেই আক্রমণ করেছিল।

রাজু এমনিতে বেশ চালু ছেলে। এর মধ্যে শহরেও সে এক মহাজনের কাছে কাজ করেছে। অবশ্য রাজু ছিল নিরাপদ ঘোষের লোক। ছেলেটা বনে বনে ঘুরতো। আর ওর হাতের লক্ষ্যও ছিল অব্যর্থ। দুতিনটে হরিণ, নেকড়ে অবধি সে শিকার করেছে তার গাদা বন্দুক দিয়ে। আর সেসব চামড়া শিং বিক্রী করে রাজু নিরাপদ ঘোষকেই। নিরাপদ ঘোষের শহরে বড় ফরেষ্ট কন্ট্রাকটর বিক্রম সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ আছে। পুলিশের নজর এড়িয়ে সে বড় বড় গাছ রাতারাতি কেটে তার কাঠগোলায় আনে। এর আগে এক কড়া অফিসার ওর কাঠগোলাতে রেড করেছে। দু-একবার ধরা পড়তে পড়তে বেঁচে গেছে নিরাপদ। তারপর অবশ্য একটা রফা হয়েছে। তবু ওদের বিশ্বাস করে না নিরাপদ। তাই বড় বড় গাছ সে রাতারাতি পাচার করে দেয় শহরে বিক্রমবাবুর কাঠগোলায়। বিক্রমবাবু নামকরা লোক। শহরের নেতারা তার হাতে। সরকারি অফিসারদের সঙ্গেও তার মেলামেশা। শহরের নামী জনদরদী সমাজসেবী। তাই এসব সামলেও নিতে পারেন বিক্রমবাবু।

এই করেই বিক্রমবাবুর সাথে নিরাপদের একটা ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে। সেই বিক্রমবাবুই এবার ওই সব বন বিভাগের নতুন বাংলো, গেস্ট হাউস, নদীর ধারে বনের মধ্যে ওয়াচটাওয়ার তৈরী করেছে। সেই বিক্রমবাবুর কাছে নিরাপদবাবুর সংগৃহীত ওইসব মাল পাঠায়। ক্রমশঃ বিক্রমই বলে, এদিকের বনে তো মাঝে মাঝে এসব হাতি বাঘ আসে। ওই রাজুকে আমার কাছে দাও। ওকে আমি আমার তরাই অঞ্চলের তালসারি বনের ধারে চা বাগানে রাখবো। ওর সাহস্ আছে। হাতের টিপও খুব। ওকে দিয়ে আরও বড় কাজ করবো।

রাজও স্বপ্ন দেখতো সে দাঁতাল হাতি, বড় বাঘই মারবে। একটা শিংওয়ালা গন্ডার মারতে পারলে তার শৃঙ্গের দামই কয়েক লাখ টাকা। রাজুর ভাগ্যই বদলে যাবে। সে আদিবাসী সমাজের অন্য ছেলেদের মতো মাঠে কাজ করেনা। মদ খেয়ে ঘুমোয় আর রাতে বনে গিয়ে একটা হরিণ মারতে পারলে কম করে হাজার টাকা পায়। সে একটু সেজেগুজে প্যান্ট শার্ট পরে ঘোরে আর তার নজর ওই ফুলমতির দিকে।

ফুলমতিও চেনে রাজুকে। তাদের পরবে নাচ গানে ফুলমতির আসা চাই। এখন মেয়েটা বেশ বড়সড় হয়েছে। পতিত মাস্টারের ওখানের কথা ফুলমতির ভালই লেগেছে।

পতিত ওর বাড়িতেই এনে রেখেছে রাঙ্গিকেও। রাঙ্গিই এখানে বাসনপত্র মাজে, ফুলমতি রান্না করে। পতিত মাস্টারই ওকে বলে—

—এই পড়াশোনাও কর। রাতেই রান্নার কাজ এগিয়ে রাখবি। সকালে রাঙ্গি মাসী চা করবে। তুই ইস্কুলে যাবি। এসে রান্না করবি। পতিত ওদের কথাও ভাবে। ফুলি সেজেগুজে নাচের আসরে যায় তার ভালো লাগে ঐ ছেলেটাকে। ছেলেটা বাঁশী বাজায় দারুণ। আর এমনিতে বেশ হাসি খুশী। তারপর জমি জায়গাও কিছু আছে। আদিবাসীদের মধ্যে অবস্থা ভালোই— সেও ইস্কুলে পড়াশোনা

করেছে। তারপর এখন ওই গান আর বনে বনে ঘুরেই তার দিন কেটে যায়। তবে নাচের আসরে সবাই বলে—

—বসন তুই বাঁশী ধর। তু বাঁশী না ধরলে ফুলি লাচবে নাই রে।

— কে মদের হাঁড়ির গায়ে ফুটো করে সেই হাঁড়ি থেকে মদ তার গলায় ঢালছে। কৌশলটা ভালই। মাটির হাঁড়ির গায়ে ছিদ্রটাকে একজন আঙুল টিপে মুখটা বন্ধ করে রাখে। পিয়াসীর দল সার-বন্দী বসেছে। হাঁ করে। সেই লোকটা এবার তাদের মুখের কাছে এসে আঙুলের টিপটা খুলে দিতে তার থেকে বেগে মদ বেরোতে থাকে। ওরা ওদের উৎসবে মদ খেতে বাধা নেই। ওইটাই যেন ওদের খাদ্য এবং পানীয়। ছেলেটা মন্তব্য করে।

— ই কেষ্টর বাঁশী না শুনলে রাধা নাচবেক নাইরে। তেমন ফুলিও বসনের বাঁশী ফুলিও লাচবেক নাই।

ফুলমতি ধমকে ওঠে,

—থামবি। দিব মুখে কিল। সবাই হেসে ওঠে। রাজু এসব নাচগানে থাকে না। সে যেন এদের থেকে স্বতন্ত্রই। সে মদ খায় মাত্র।

ওদের নাচগান শুরু হয়। বসনের বাঁশীর সুর ওঠে। বাজছে ধামসা মাদল। ওদের কণ্ঠে ভেসে ওঠে আদিবাসী গানের সুর। রাজু চলেছে তখন নিজের কাজে। একটা হরিণ মারতে পারলে হাটে মাংসটাও লুকিয়ে ভালো দামে বিক্রী হবে। আর শিং, চামড়ার দাম তো অনেক। গাদা বন্ধুকটা নিয়ে জঙ্গলে ঢোকে রাজু। সেদিন রাত হয়ে গেছে। এদের নাচগান থেমে আসছে। রাজুও সেদিন খালি হাতেই ফিরছে বন থেকে। তার চোখে মদের নেশা। নেশা করে শিকার করতে আসা ঠিক হয়নি। একটা বুনো শুয়োর দেখতে পেয়ে গুলিও করেছিল। কিন্তু গুলিটা বোধ হয় লাগেনি। বুনো শুয়োরটা পালাচ্ছে বনবাদাড় ভেদ করে। বন্দুকে আর গুলি না ভরেই ফিরে আসছিল সে।

বন ছাড়িয়ে বসতির কাছে এসেই পড়েছে— দেখে মহুয়া গাছের নীচে দু-তিনটে ভালুক ঘুরছে একটা মদ্দা ও বেশ বড় সাইজের। সেই ভালুকটা হঠাৎ তেড়ে এসে রাজুর মুখেই তার ধারালো নখ বের করা থাবাটা বসিয়েছে। রাজু অতর্কিত আঘাতে ছিটকে পড়ে। বন্দুকটা পড়েছে দূরে। ভালুকটা আবার তাকে আক্রমণ করতে আসছে আর আর্তনাদ করছে রাজু। এর মধ্যে ফুলমতি আসছিল নাচের আসর থেকে। আবছা আলোয় দেখছে ফুলমতি ব্যাপারটা—ভালুকটা ফেড়ে ফেলেছে রাজুকে। ভালুক এমনিতে খুবই হিংস্র প্রাণী। ওরা মাংস খায় না তবে রক্ত খায়। রক্তের স্বাদ পেয়ে ভালুকটা আবার আক্রমণ করে রাজুকে।

ফুলমতিই ছুটে আসে। সেও আশপাশের লোকজনদের চীৎকার করে ডাকে।

—শীগগির আয় ভালুক।

ফুলমতি হাতের কাছে বন্দুকটা পেয়ে ভালুকটার মাথায় দু-চার ঘা দিতে ভালুকটাও যন্ত্রণায় কাতর হয়ে এবার রাজুকে ছেড়ে দিয়ে বনের দিকে পালায়। ততক্ষণে লোকজন জুটে গেছে সেখানে। তারা আহত রক্তাক্ত রাজুকে নিয়ে যায় গ্রামের হাসপাতালে। ভালুকের থাবায় রাজুর মুখটা একদিকে গভীর ক্ষত হয়েছে। গ্রামের হাসপাতাল থেকে ভোরেই ওকে পাঠায় জেলার হাসপাতালে। প্রায় চার পাঁচ মাস রাজু ওখানে থেকে গ্রামে ফিরে আসে। তখন আর তাকে চেনা যায়না। মুখের একদিকে গভীর ক্ষতের দাগ, চামড়াটা কুঁকড়ে গেছে, একটা চোখ যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসছে।

৬

গ্রাম বসতিতে এসব সাধারণ ঘটনাই— এখানের মানুষ এসব কিছুকে সহজে মেনে নিয়েই দিন কাটায়। আবার কাজ শুরু করে। কিন্তু এই ছ'মাসের মধ্যে একটা পরিবর্তন ঘটে গেছে এই গ্রাম বসতিতে। ঘটনাটা ঘটে গেছে অত্যন্ত সহজ ভাবেই। পতিত মাস্টারও ভাবছিল কথাটা। রাঙ্গি বুড়ির

শরীরটা ভালো যাচ্ছে না। বুড়ি ভুগছে তবে পতিতবাবু তার চিকিৎসার ত্রুটি করেনি। গুপী ডাক্তারও আসে মাঝে মাঝে বুড়িকে দেখতে। রাঙ্গি বলে— মাস্টার, আমার তো বয়স হইছে। ফুটিটাও ডাগর হইছে। ওর কথাটা এবার ভাবো। হুট করে যদি মরে যাই, মেয়েটার কি হবেক? গুপী ডাক্তারকে বলে বুড়ি,

— ও ডাক্তার। বললা মেয়েটার বিয়া দিবা। তা হল কই গো।

পতিত বলে—

—ডাক্তারবাবু পাত্র একটা দেখুন। আমি তো এদের ব্যাপার স্যাপার ঠিক বুঝিনা। বিয়ের খরচ যা লাগে দোব। কারণ আমারই কন্যাদায়। গুপী বলে— তাহলে দেখি।

তারপরই গুপী বলে রাঙ্গিকে একটা ভালো ছেলেতো আছে বসতিতে।

বুড়ি বলে,

— কে রাজু! সে তো মদো মাতাল। রাত চোরা গো। ঘায়েল হয়ে পড়াইছে হাসপাতালে। শুনি মুখ চোখও কেমন বদলে গেছে।

ডাক্তার বলে, — না না। বসন্ত ওই লাল ডুংরীর বসন।

রাঙ্গি বুড়িও খুশী হয়। সে বলে, হুঁ, পিলেটা ভালো বটে। তবে বড্ড 'গড়'।

বসন এমনিতে একটু ভাবুক গোছের। অন্য ছেলেদের মত এত কায়িক পরিশ্রম করে না। বনে বনে ঘোরে। বাঁশী বাজায়। তবে অন্য কোন দোষ নাই। জমি-জায়গাও কিছু আছে।

গুপী ডাক্তার বলে—

-- আরে বিয়ে থা করলে সংসারের জোয়াল কাঁধে চাপালে উধর সিধে হয়ে যাবে। তা তোমার নাতনীর মত আছে তো? কি বলো ফুলমতী? রাঙ্গি বলে,

—উর সাথে তো নাচে গায়। ভাব ভালোবাসাও রইছে বলে মনে হয়। ওদের বিয়েই দিয়ে দাও।

ফুলমতি অবশ্য এখন নিজেই প্রায় স্বাধীন। সে এই কাজের ফাঁকে বনে যায় বসতির অন্যদের সঙ্গে। শালপাতা তুলে আনে।

গ্রামের মেয়েরাও বন থেকে শালপাতা আনে। বনরক্ষীরা দু-একজন অবশ্য বাধা দেবার চেষ্টাও করে। কেউ বলে,

— টাকা দিতে হবেক। ফি বোঝা পাঁচ টাকা।

ফুলি ফুঁসে ওঠে,

— গোটা গাছটা যখন চুরি করে কেউ নিয়ে যায় তখন কুথায় থাকো হে মরদ, আমরা তো গাছের পাতা নিচ্ছি টাকা চাইছ?

ফুলি বলে, যা- যা এখান থেকে। কি করছিস?

কোন বনরক্ষী বলে,

— তোমাদের দেখছি।

—ঘরে তুদের মা বুন নাই নাকি গ!

মুখরা তেজি মেয়েটাকে গার্ডরাও সমীহ করে। ফুলি বন থেকে শালপাতা এনে তা দিয়ে থালা বাটি তৈরী করে নিয়ে যায় নিরাপদবাবুর আড়তে। সে ওইসব কেনে হাজার হিসাবে। তার ওখানেই মেসিন বসিয়েছে। এসব থালাবাটি সুন্দর রূপ দিয়ে চড়া দামে শহরে বেচে সে। নিরাপদও বিলক্ষণ চেনে ফুলিকে। চোখের সামনে মেয়েটা বড় হয়ে উঠেছে চাঁদের কলার মত। এখন ওর দেহে ভরা পূর্ণিমার জোয়ার।

নিরাপদ ফুলিকে একটু বেশী ভালোবাসে। ওর পাতার দাম ভালই দেয়। বলে,— যা বুড়ির চিকিৎসা করবি।

বাড়তি টাকা তো দিলে, শোধ দেব কি করে?

নিরাপদ ওর নিটোল দেহে হাত বুলিয়ে বলে,

—এমনি দিলাম। পারলে দিবি না পারলে কথা নাই। তবে তোর দলের সব পাতা যেন আমার আড়তে আসে।

—আসবে গ। ফুলি জানায়।

নিরাপদ ওর গালে হাত বুলিয়ে বলে, লক্ষ্মী মেয়ে।

সেই পাড়া কাঁপানো দামাল মেয়েটার বিয়ের কথাই হয়ে গেল। গ্রামের লোকও খুশী হয়। গুপী ডাক্তার বলে,

—পতিতবাবুর মেয়ের বিয়ে তোমরা যাবে কিন্তু।

বসনের সঙ্গে বিয়েটা বেশ ধুমধাম করেই দেয় পতিতবাবু। আদিবাসীদের সে পেট ভরে ভাত মাংস সন্দেশ খাইয়েছে। ফুলিকে তার নতুন ঘরে পাঠিয়েছে বেশ ভালমত দিয়ে থুয়ে। আর একদিন আদিবাসী বসতির সমাজকে ভরপেট মদ মাংসও খাইয়েছিল।

পতিতবাবুর ওই বসনের উপর একটা দুর্বলতা ছিল। বসনও মনপ্রাণ দিয়ে অরণ্যকে ভালবাসে। বনের সে যেন অতন্দ্র প্রহরী। বসনের মনে হয় ওই গাছগুলো যেন প্রাণময়। ওরা নিজেদের মধ্যে কথা বলে। ওদের ডালে ডালে নামে খুশীর জোয়ার, তাই শুরু হয় পাতার নাচন হাওয়ার দোলায়। ফুলের মঞ্জুরীতে ওদের আনন্দের প্রকাশ। বাতাসে ওঠে বসনের বাঁশীর সুর। বসন দেখে এক একটা গাছে থেকে যেন দেব বালক দেব কন্যার দল বের হয়ে ওই নির্জনে বনের প্রাঙ্গণে তাদের উৎসব শুরু করেছে। এর মধ্যে পতিতবাবুর উপরেও বসনের শ্রদ্ধা বেড়েছে। বসন দেখেছে এই বনবাবু অলক সেনকে। লোকটা নিরাপদকে দিয়ে বড় বড় গাছ অনেক সাফ করাচ্ছে। এখন সেই অলকবাবুর নামে সরকারী অফিসে নাকি অনেক অভিযোগ জমা পড়েছে তার নানা বেআইনী কাজের জন্য। তাই তাকে এবার বদলি করা হচ্ছে।

৭

অলকবাবুও সত্যিই এবার বিপদে পড়ে। এই বন অফিসে সে ভালই ছিল নিরাপদের জন্য। মাসকাবারে তার মাইনেতে হাত পড়তো না। নিরাপদবাবু বনে লুঠপাঠ করে তার একটা অংশ তাকে দিত সেটাও কম নয়। এখন এই রেঞ্জ অফিসারের গুরুত্ব বাড়ছে। এখন এই রেঞ্জ অফিসে লাখ লাখ টাকা খরচ করে তৈরী হচ্ছে বন বাংলো, গেস্ট-হাউস। বাইরে থেকে ট্যুরিস্টের দল আসবে, এখানে থাকবে তারা। এত বড় কাজ শুরু হয়েছে। আর এসবের কন্ট্রাক্ট পেয়েছে ওই বিজন সরকার।

অলকবাবুও ভেবেছিল ওই লাখ টাকার কাজ থেকেও সে ভালো টাকাই ম্যানেজ করবে। আর ট্যুরিস্টরা আসতে শুরু করলে তার আমদানীও বাড়বে। কিন্তু অদৃশ্য হাতের কারসাজিতে তাকে এসময়ই বদলি হতে হলো। পতিতবাবুই সদরে ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ করে এখানের রেঞ্জ অফিসার ওই অলকবাবুর সম্বন্ধে বেশ কড়া অভিযোগ করেন। গ্রামেরও বেশ কয়েকজন অভিযোগ করেছিল। তারপরই ডি-এফ ও সাহেব নিজেই তদন্ত করে অনেক কিছু বেআইনী কাজের খবর পান। তারপরই এই বদলী অর্ডার দিয়েছেন। আর এখানে পাঠাচ্ছেন একজন তরুণ সৎ সাহসী অফিসার মিঃ রায়-কে। নিরাপদবাবু এরমধ্যে তার প্রিয় রেঞ্জ অফিসারের বদলির খবর পেয়ে গেছেন। তাকে খবর দিয়েছে বিক্রমই। শহরের বনবিভাগে তার যাতায়াত আছে। সে আরও উপর মহলের লোক। তাই বিক্রমও খবরটা জেনে যায় যে পতিতবাবুদের অভিযোগের ভিত্তিতেই তদন্ত হয়েছে। তাছাড়া নিরাপদের উপরও বনবিভাগের সাহেবদের তির রয়েছে। আর প্রথমেই তাই বদলি করা হয়েছে অলকবাবুকে। নিরাপদ একটা চিন্তায় পড়ে। এতদিন ধরে এই অলকবাবুকে হাতে এনে সে এখানের বনে রাজ্যপাট চালিয়েছে। এবার নতুন রেঞ্জ অফিসার এলে তাকে হাতে আনতে সময় লাগবে। তাই অফিসে বসে আছে নিরাপদ। অলকবাবু ঢুকতে দেখে চাইল। আজ সে নখদন্তহীন একটা বৃদ্ধ বাঘ। চেয়ারের মর্যাদা তার নেই। সে এখন বিতাড়িত। তাই

নিরাপদবাবু আগের মত আন্তরিকতা আর দেখায় না। দেখাবার প্রয়োজনও নেই। অলক বলে নিরাপদবাবু দেখলেন তো কর্তাদের বিচার। এতদিন ধরে এখানের সব আগলে রাখলাম, আর বনদপ্তরে এতবড় কর্মযজ্ঞ শুরু হলো আমাকেই বদলি করে দিল কিনা নাহারা বন অফিসে। একেবারে সামান্য ঝুপি বন, নো গাছপালা, কি করে চলবে বলুন তো।

নিরাপদ বলে—

—বেশ তো কামিয়েছেন মশাই। তাইতে দুপুরুষ বসে খাবেন।

— কি যে বলেন?

— ওরে চা দে বনবাবুকে। নিরাপদবাবু চা খাওয়াতে অরাজী হয় না।

অলক বলে—

— চা খেতে আসিনি নিরাপদবাবু, আজই নতুন অফিসারকে চার্জ বুঝিয়ে চলে যেতে হবে। তাই দেখা করতে এলাম— মানে আর তো মাসকাবারি দিতে হবে না— তবু এমাসের টাকাটা যদি দিতেন।

ওই ঘুষের টাকাটা যেন ওর ন্যায্য পাওনা। তাই আদায় করতে এসেছে। নিরাপদ ওর দৌলতে অনেক টাকাই রোজগার করেছে। তাই এবার খামটা ওকে দিতে অলকবাবু বলেন—

— তাহলে চলি। নমস্কার।

অলক বের হয়ে যায়। নিবাপদ গজ গজ কবে।

—ব্যাটা মাক্ষীচুষ হ্যাঙলামো। ইতর।

সামনে সরকার ঢুকছিল। ওইসব সম্ভাষণ শুনে চমকে ওঠে। তাই দেখে নিরাপদ ওকে অভয় দেয়।

— তোমাকে নয়, ওই ব্যাটা ল্যাজখসা রেঞ্জ অফিসারকে বলছি। যাবার আগে ছোঁ মেরে মাল নিয়ে গেল।

বেয়ারা চা নিয়ে ঢোকে। রেঞ্জার সাহেবকে না দেখতে পেয়ে ইতঃস্তত করে। নিরাপদ ওর হাত থেকে চায়ের কাপটা নিয়ে বলে—

—ও ব্যাটাকে আর চা খাওয়াতে হবে না। আমায় দে। ও ব্যাটা তো ফৌত। নতুন কে আসে দেখি। শান্তিতে ব্যবসাও করতে দেবে না। এমন হয়েছে সরকার। নিরাপদ এবার সাবধানে পা ফেলতে চায়। বেশ বুঝছে যে এবার বনের এই সম্পদ তাকে লুঠ করার কাজে আরও বেশী সাবধান হতে হবে।

অবশ্য নিরাপদ খুবই গভীর জলের মাছ। বাইরে তার মুখোসটা একেবারে আলাদা। পতিতবাবু এখন স্কুলের হাল বদলে দিয়েছেন। নিয়মিত ক্লাশ করেন। তার সহকারী শিক্ষকরাও এখন সত্যিকার একজন কাজের লোক পেয়ে তারাও মন দিয়ে শিক্ষকতা করেন।

পতিত চায় বনের লাগোয়া এইসব অঞ্চলের মানুষের মনে গাছগাছালি এই অরণ্য সম্বন্ধে আগ্রহের সৃষ্টি করতে। তাই তার স্কুলে বর্ষার সময় বেশ ঘটা করে বনমহোৎসব পালিত হয়। সদর থেকে কর্তারাও আসেন। সুন্দর মঞ্চে সেদিন স্কুলের চেয়ারম্যান নিরাপদবাবুও গলায় মালা পরে এই বনভূমিকে রক্ষা করার জন্য জনগণকে ছেলেদের আহ্বান জানান। ছেলেদের নাচগানের মধ্যে দিয়ে স্কুলের বিস্তীর্ণ মাঠে শাল সেগুন আমলকী মেহগিনি এই সব গাছও লাগানো হয়। সেদিন আদিবাসীদের নাচ-গানও হয়।

৮

বসন এখন ঘর বেঁধেছে। নিচু ডুংরিতে বসনের ঘরেই গেছে ফুলমতি। রাঙ্গি বুড়িও রয়েছে সেখানে। বসন পতিতের স্কুলের নাচগানে যোগ দেয়। ফুলমতি নতুন ঘর বেঁধেছে। এতদিন সে লোকের দুয়ারে ঘুরে বেড়িয়েছে দুমুঠো ভাত যোগাড় করার জন্য। এখন তার নিজের ঘর হয়েছে। তবে বসনের সেউ উড়ু উড়ু, ভাবটা এখনও যায়নি। ফুলমতি অবশ্য তার সেই বন থেকে পাতা তুলে এনে থালাবাটি তৈরী করার কাজটা বন্ধ করেনি।

পতিতবাবু ওদের কিছু টাকা দিতে চান কিন্তু স্বাধীনচেতা ফুলির সেই টাকা নিতে বাধে। সে বরং বসনকেই চাপ দেয়।

—কি গো কাজকর্ম কিছু করো এবার। একটা সমর্থ মরদ, বনে বনে শুধু ঘুরবে আর বাঁশী বাজিয়ে দিন কাটাবে। ই কি কথা গো। নিজে খাটবে লাই নুকে কত কথা বলে।

বসনকে এসব কথা শুধু ফুলমতি একাই বলে না। আদিবাসী ছেলেদের অনেকেই বলে ওসব কথা। এর মধ্যে রাজুও ফিরে এসেছে হাসপাতাল থেকে। সেদিন ফুলমতি ফিরছে বন থেকে। মাথায় পাতার বোঝা। হঠাৎ কাদরের চরে রাজুকে দেখে দাঁড়ায়। সেই তরতাজা তরুণটা আজ বদলে গেছে। মুখটাই বিকৃত হয়ে গেছে। ভালুকের হাত থেকে সেদিন নিজে অনেক ঝুঁকি নিয়ে ফুলমতিই তাকে বাঁচিয়েছিল। একদিন ফুলির মনে হয়তো রাজুর জন্য একটা জায়গাও ছিল। আজ ফুলি অন্যের স্ত্রী। তবে ফুলি বলে,

— কেমন আছো গো?

রাজু দেখছে গ্রামের লোকের তার প্রতি একটা অনুকম্পাই রয়েছে। রাজু আজ ফুলির কথাতেও সেই অনুকম্পার সুরটাকে ফুটে উঠতে দেখেছে। রাজুর তা ভালোলাগে না। সে বলে—

— ভালই আছি। এ ব্যাপারটাকে কোনরকম গুরুত্ব না দিয়েই বলে, আজ ফুলির কথাতেও সেই অনুকম্পার সুরটাকে ফুটে উঠতে দেখেছে। রাজুর তা ভালোলাগে না। সে বলে—

—ভালই আছি। এ ব্যাপারটাকে কোনরকম গুরুত্ব না দিয়েই বলে, দেখি সদরের বনবিভাগের সাহেব, এই বনের ঠিকাদার বিক্রমবাবু বলেছে এখানের বনে নতুন বাংলো হলে সেখানে একটা সরকারী কাজ দিবেক। সরকারী কাজে মাইনেও ভালো।

রাজু যেন এখনও প্রমাণ করতে চায় সে ওই বসনের থেকে কোন অংশে কম নয়। তাই রাজু বলে—

—বসন তো বিয়ে করলা তুমাকে। তা কাজকম্ম কি করছে?

— ওর কথা বলো না। এখন তো বলছে কাজ কাম করবেক। দেখি কাজ কুথায় পাই!

নিরাপদ ঘোষ জানে কখন কাকে তার কোন্ কাজে দরকার হবে।

তাই সকলের সঙ্গেই সে ব্যবহার ভালো রাখতে চায়। আর পতিত মাস্টারকে হাতে আনার চেষ্টাও চালাচ্ছে সে। জানে নিরাপদ ওই ফুলিকে তার দরকার হতে পারে। তাই ফুলিকে একটু বেশী টাকাই দেয়। সেদিনও বলে নিরাপদ, ফুলি আরও পাতা দে। তোরও তো পয়সার দরকার ঘর সংসার করছিস। আর বসন তো কাজই করে না। একা আর কত টানবি।

ফুলি বলে—

—নাগো, উ বলেছে কাজকম্ম করবেক ইবার। তা কাজ তো তেমন কিছু পাচ্ছে না। মরদ কাজ করতে চায়গো।

নিরাপদ জানে বসনকে হাতে পেলে তারও কিছুটা সুবিধা হবে। বসনটা বনে বনে আর নজরদারি করে ঘুরবে না। তাই বসনকে তার কাজেই লাগাতে চায় নিরাপদ। ফুলমতি বলে—

— কাজ করবে বসন?

— হ্যা গো। ইবার ওর মন বদলেছে।

খুব ভালো কথা। তাহলে নিয়ে আয় বসনকে। ওকে আমি করাতকলে মেসিনের কাজ শিখতে লাগিয়ে দেব। দুচার মাস দেখলেই ওর হুঁশ বুদ্ধি আছে — ও ঠিক করাত কলের কাজ শিখে যাবে। তখন কত করে রোজ পাবি জানিস? পুরো একশো টাকা বরং তার থেকেও বেশী। ফুলিরও এহেন লোভনীয় প্রস্তাবটা মনে ধরে।

ফুলি বলে—

উকে কালই আনব বাবু। কাজে লাগিয়ে দাও করাত কলে।

বসনের সময় কাটে বনে। এখন বসন্তকাল। শাল বনে এসেছে নতুন পাতা। ডালে ডালে এসেছে

মঞ্জুরী। দক্ষিণা বাতাসে সুরক ওঠে বনে— মাঝে মাঝে এখন কাল বৈশাখী হয়। পরদিন ভোরে বৃষ্টি স্নাত বনে আসে বসন। ভিজে লালমাটিতে ওঠে সোদাঁ গন্ধ। বাতাসে ওঠে মহুয়া ফুলের সুবাস। হাওয়ার তালে তালে ডালপালা যেন নাচছে, গাইছে বনে সেই দেব বালক-বালিকার দল। বসনের বাঁশীর সুর ওঠে। আর সন্ধ্যাটা কাটবে পতিতের কাছে। সেদিন ঘরে ফিরছে বসন। ফুলমতি তার পথ চেয়েছিল। ওকে দেখে বলে—

— তোমার কাজের ঠিক হয়েছে। ঘোষ মশায় তুমাকে ওর করাত কা.ল মেকানিকের কাজ শিখতে দেবে। করাতকলে যন্ত্রপাতি মেরামত করার কাজ গো— কাজ শিখতে পারলে কম করে একশো টাকা রোজ।

—তাই নাকি! অবাক হয় বসন।

ওই টাকা পেলে তাদের সংসার ভালই চলবে। বসন এবার ফুলির জন্যই কাজই করবে। তাই বলে, ভালই হলো। তাই করবো রে। ফুলিও খুশী হয়।

বসনকে এনেছে ফুলি ঘোষ মশায়ের করাতকলে। ফুলমতি বসনকে নিয়ে এসেছে কাঠগোলায় করাতকলে। ওখানে তখন পুরোদমে কাজ চালু হয়েছে। বসন অবশ্য কাঠগোলার পাশ দিয়ে যাতায়াত করেছে। কিন্তু কোনদিন ভিতরে ঢুকি দেখেনি। আজ এখানে সে চাকরী করতে এসেছে। দেখে সারা মাঠে গাদা করা আছে বিভিন্ন সাইজের শাল সেগুন গামার কাঠের বড় বড় গুঁড়িগুলো। কত গাছকে সে নিঃশেষ করা হয়েছে তা জানেনা বসন। মনে হয় ঘোষমশাই বনকেই সাবাড় করে দেবে। তার চেনা সেই বিশাল গাছগুলো আজ প্রাণহীন হয়ে টুকরো অবস্থাতে পড়ে আছে। এ যেন গাছেদের কবরস্থান।

ওদিকে তীক্ষ্ণ শব্দে করাতকলে কাজ চলেছে। বসন দেখে সেই গাছগুলোকে কুলিরা তুলে দিচ্ছে চৌকির উপর। আর ধারালো দাঁত বের করা করাতটা তীক্ষ্ণ শব্দে গাছগুলোর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে চিরে ফালাফালা করে দিচ্ছে।

বসনের চোখের উপর ভেসে ওঠে সেই বনের সুন্দর সবুজ ফুল ভরা গাছগুলো। ওরা যেন এক একটা দেববালক, দেবকন্যা। তাদের এই নিষ্ঠুর নিরাপদবাবু নির্দয়ভাবে তুলে এনে ওই ধারালো করাত দিয়ে ফাড়ছে। বসনের কানে ভেসে আসে বনের সেই দেব বালক, দেব কন্যাদের নাচগানের সুর। সেই সুরটা চাপা পড়ে গেছে করাতকলের ধারালো করাত ঘোরার শব্দে। সেই শব্দে ছাপিয়ে ওঠে বন্দী দেব বালক, কন্যাদের আর্তনাদ, ওদের নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করছে ওই ঘাতক হিংস্র নিরাপদ ঘোষ।

বসনের কানে বাজে সেই আর্তনাদ। অস্থির চঞ্চল হয়ে ওঠে বসন। তার সারা মনে ঝড় ওঠে। সে আজ যে ওই লোভী ঘোষ মশায়ের নতুন ভয়ঙ্কর রূপটাকে চিনেছে তাকে ঘৃণা করে। বসন পালাতে চায় এই পরিবেশ থেকে। ওর চোখে মুখে ঘৃণা আর আতঙ্কের ছায়া। পালাচ্ছে বসন। ওদিকে দাঁড়িয়ে আছে ফুলমতি আর নিরাপদ। ঘোষমশাই বসনকে পালাতে দেখে বলেন—

এই বসন চলে যাচ্ছিস যে, কাজ শিখবি নাই?

বসন বলে,

— না না তুমার ইখানে কাজ করবো লাই। তুমি মানুষ লও, লোভী শয়তান খুনে। তোমার ইখানে কাজ করবো নাই। করবো নাই।

ফুলমতিও ডাকে,

—শোন এই মরদ শোন।

বসন দাঁড়ায় না। ও আজ সুন্দর গাছগুলোকে এইভাবে হত্যা করতে দেখে পাগলই হয়ে গেছে। এ বাড়ির দিকেও যায় না। চলে এসেছে বনের মধ্যে একদিকটাতে। এখনও বড় বড় গাছ কিছুটা রয়েছে। শান্ত বনভূমিতে তখনও সূর্যের আলো মায়াজালে ছড়ানো। হাওয়ায় কাঁপছে গাছের পাতা। বাতাসে ওঠে চাপা একটা বনজ সুবাস। বসন সেই গাছগুলোর কাছে এসে পরম মমতায় তাদের গায়ে হাত বুলোয়। দেখছে তাদের সেই পল্লবসজ্জিত রূপ। শোনে পাখীদের কলরব। বিড়বিড় করে বসন

সেই গাছগুলোর গায়ে হাত বুলোয়, কথা বলে আপন মনে।

—তোমরা বেঁচে থাকো। দেবতা গো। ফুলে ফল সেজে থাকো। তোদের যেন কেউ শেষ করতে না পারে। বসন আজ যেন তার চোখের সামনে একটা সর্বনাশই প্রত্যক্ষ করতে পারে।

৯

ফুলমতিও হতাশ হয়েছে। ভেবেছিল বসন করাতকলে কাজ করবে। তাদের সংসারও এবার সুখে শান্তিতে ভরে উঠবে। কিন্তু বসন যে এইভাবে একটা পাগলামি করে চাকরী ছেড়ে পালিয়ে আসবে তা ভাবেনি। এদিকে সংসার তো চালাতে হবে। ফুলি তাই বনে এসেছে পাতা তুলতে গ্রামের মেয়েদের সাথে। ললিতা বলে—

— কিরে ফুলি, বসন তাহলে করাতকলে কাজ লিলেক।

অন্যজন বলে—

—ঘোষ মশাই ডেকে কাজ দিলেক বসনকে— ভালো ট্যাকা মাইনে। ফুলি বলে—

— পোড়া কপাল আমার। মরদটা ওই কাজও করল নাইরে। পালালেক। মেয়েরাও অবাক হয়। বলে, সত্যি, হদ্দ কুঁড়ে তোর ওই মরদটা। তার চেয়ে রাজু ঢের ভালো রে। শুনলাম নাকি ওই নতুন বনবাংলোর চৌকিদার হবেক।

ফুলমতি তবু বসনকে নিয়েই ঘর বাঁধতে চায়। সেদিন সন্ধ্যাবেলায় ফুলি রাঙ্গি পাতা কুড়াচ্ছে। বসন ঘরে ফিরেছে। সে দেখেছে রাজুকে। এখন বনের মধ্যে নদীর ধারে, পাহাড়ের নীচে গড়ে উঠেছে সুন্দর বনবাংলো। বাগানও করা হয়েছে। বসনের মন চায় এমন কোন কাজ করতে। বাগান সাজাতে। তাই সে বলে পতিতকে,

—মাস্টার। বনের চাকরী যদি পাই করবো।

পতিতও জানতো বসন বনকে ভালোবাসে। বনবিভাগে যদি ওর কাজ হয় ভালই হবে। কিন্তু পতিত জানে সেখানে চলছে নেতাদের হাতের খেলা। আর বনবিভাগের ঠিকাদার বিক্রমবাবুই এসব কাজ করেছে। তার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে নিরাপদবাবুর সাথে । এসব কাজের নির্দেশ আছে সদর থেকে।

তবু পতিত নিজে আসে নতুন ফরেস্ট অফিসারের কাছে। অলকবাবুর জায়গায় নতুন ফরেস্ট অফিসার হয়ে এসেছেন একজন তরুণ। সদ্য ফরেস্ট সার্ভিস পাশ করা যুবক। নাম তার অসিত রায়। তিনি এখানে এসে এবার নিজের মত করে গার্ডদের কাজ করানোর চেষ্টা করেন। এবার তাদের প্রতিদিনই বনের এক একটা সেক্টরে গার্ড দিতে পাঠান। পঞ্চানন হরষিতরা এতদিন এই বনে কাজ করছে। অলকবাবুর সময় ওরা বনে না গিয়ে এদিক ওদিক ঘুরেই ডিউটি দিত। আর নিরাপদবাবুকে খবর দিত কোথায় ভাল গাছ আছে। নিরাপদ তার জন্য ওদের টাকাও দিত। আর ওরা তাই রাতের অন্ধকারে বনের দিকে যেত না।

পতিত বলে বসনকে—

দেখি মিঃ রায়কে বলে, তিনি যদি কিছু করতে পারেন। সেই মত পতিত এসেছিল নতুন রেঞ্জ অফিসে মিঃ রায়ের অফিসে। মিঃ রায় এই বনের রেঞ্জ অফিসে জয়েন করার পর সারা বনে ঘুরছেন। আর সেই সুবাদেই পরিচিত হয়েছিলেন পতিতবাবুর সঙ্গে। বসনকেও দেখেছেন। তার কাছে এই বনের গভীরে কোথায় কি সরস গাছ আছে সেই খবরও পেয়েছেন। বসনই বলে—

নিচু পাহাড়ের বনে রয়েছে হাতির ঠিকানা। কাছেই নদী— ওর বনও ওখানে বেশ গভীর। বাঁশবন— আর রয়েছে পাহাড়ের গা জুড়ে বুনো কলাগাছের জঙ্গল। হাতিরা ওইখানেই থাকে। সেই সব দলও ঘুরে বেড়ায় বনের একটা বিশাল এলাকায়। মধুচুয়া ঝর্ণার পাশের পাহাড়ে কোন গুহায় নাকি বাঘও দেখা যায়। তবে ওরা বড় একটা এদিককার জঙ্গলে আসে না। মাঝে মাঝে গ্রামের দিকে

আসে। বনের ধারে চরতে আসা গুরু, বাছুর ধরে। মানুষকেও জখম করে। হরিণদলের চরণভূমি ওই মারাং বুরুর বনাঞ্চলে। তবে অন্যবন থেকে মাঝে মাঝে বুনো কুকুরের দল এসে পড়লে তখন জঙ্গলের অস্থিরতা বাড়ে। হিংস্র কুকুরগুলো দল বেঁধে হরিণগুলোকে আক্রমণ করে। আর এসবের মধ্যে চলে ওই চোরা গাছ পাচারকারীদের উপদ্রপ। মাঝে মাঝে চোরা শিকারীর দলও বনে ঢুকে হাতির দাঁত, বাঘ, হরিণের চামড়ার জন্য ওসবও মারে।

১০

মিঃ রায় অবশ্য এর মধ্যে নিরাপদ ঘোষের কারবারের খবর পেয়েছেন। ওই লোকটা এই অঞ্চলের অঘোষিত সম্রাট। তার দলই এসব কাজ করে। তাই মিঃ রায় এবার গার্ডদের রাতেও বনে পাহারা দেবার ব্যবস্থা করেছেন। বন থেকে বের হবার পথে গেট বসিয়ে কড়া নজরদারিরও ব্যবস্থা করা হয়েছে।

অবশ্য নিবারণ হরষিত এত মতো গার্ডরা এর আগে নিরাপদবাবুকে সেবা করেছে। এখনও এখানের সব খবরই তারাই পৌছে দেয় নিরাপদর কাছে। নতুন রেঞ্জ অফিসার আসার পর নিরাপদ হাওয়া বোঝার জন্য চুপচাপই রয়েছে। মিঃ রায় পতিতবাবুকে দেখছেন একটা বন পাগল লোক। সেই বলে—

—মিঃ রায় এই বনকে এই সুন্দর প্রকৃতির রাজ্যকে বাঁচাতেই হবে। নিরাপদবাবুর মত লোকেরা এই বনকে শেষ করতে চায়।

বসন বলে—

—বড় বড় সেরা গাছের দিকে ওর নজর। প্রায়ই ওসব গাছ কাটে গো। আর ওর গুরু ওই বিক্রম বাবু।

মিঃ রায় শুনছেন ওর কথা। বসন বনে—

—ওই লোকটাই বনে গাছ কাটে,আবার দাঁতের জন্য হাতি মারে। চামড়ার জন্য বাঘ হরিণ এসবও মারে। ওই করতে গিয়েই রাজু মরতে মরতে বেঁচে গেছিল। ওইসব দামী মাল নিরাপদবাবু যোগান দেয় বিক্রমবাবুর আড়তে।

পতিতবাবু বলে—

— সেখান থেকে বিদেশেও চালান হয়ে যায় এসব লাখ লাখ টাকা মিঃ রায় বলেন—

— এবার আমি কড়া নজর রাখছি। আর আশা করি আপনাদের সাহায্য সহযোগিতাও পাবো।

পতিত বলে—

—নিশ্চয়ই পাবেন। আমরা বনে নজর রাখছি।

মিঃ রায় বিক্রম সরকারকেও দেখছেন। সদরে ওর বড় ব্যবসা। নামকরা লোক। আর ওদের ভরসাতেই এদিকে নিরপাদবাবুও সাহসী হয়ে উঠেছে। সেদিন পতিতবাবু এসেছে মিঃ রায়ের কাছে ওই বসনের কাজের ব্যাপারে। মিঃ রায় পতিতবাবুর কথা শুনে বলেন—

— আমিও চাই এইসব লোক বনের কাজে আসুক। আমি সদরে চেষ্টা করছি যদি বসনের ওই নতুন বাংলোয় কাজটা হয়।

কিন্তু মিঃ রায় সদরে এসে এ নিয়ে ডিএফ. ও সাহেবের সাথে কথা বলতে ডি.এফ. ও সাহেব বলেন—

—আমি ফাইলটা কি অবস্থায় আছে দেখছি। একজন কাজের লোক পেলে ভালই হবে। আমিও চাই স্থানীয় মানুষের সহযোগিতা। ওটা পেলে বনরক্ষা করা সহজেই হবে।

কিন্তু বিক্রম সরকারও করিতকর্মা লোক। সেও কাজ করে আঁটঘাট বেঁধে। নতুন বাংলোয় সে তার লোকেদের রাখতে চায়। যাতে বনের গতিপথের সহ খবরই সে পায়। নিরাপদবাবুও তাই চায় আর

সেটা করতেই নিরাপদ সেই রাজু সোরেনের নামটাই পাঠিয়েছে বিক্রমের কাছে। বিক্রমও রাজুকে চেনে। লোকটার মুখের একদিকটা নষ্ট হয়ে গেলেও তার সাহস আর হাতের টিপ যায়নি। এই ক'দিন আগে সে একটা বড় দাতাঁল হাতি মেরে প্রায় পনেরো কেজি ওজনের দুটো দাঁত এনে দিয়েছে বিক্রম-বাবুকে। বিক্রম সেগুলো কোন বিদেশীকে বিক্রী করেছে প্রায় চার লাখ টাকায়। একটা গন্ডারের শিং এর অর্ডার আছে। রাজু এখনও কোন গন্ডারকে তাকমত পায়নি।

বিক্রম এহেন কাজের লোক রাজুকেই ওই নতুন বন বাংলোর চৌকিদার করে রাখতে চায় আর সে বড়বাবুকে রাজুর সই করা একটা চাকরীর দরখাস্ত দিয়ে সেটাকে পাশ করিয়ে এলাকার ডি.এফ. ও. সাহেবের সই করা নিয়োগপত্রও দিয়ে দিয়েছে ক'দিন আগেই।

এবার ডি.এফ.ও. সাহেব সেই ফাইল আনিয়ে দেখেন যে চৌকিদারের নিয়োগপত্র আগেই সই করা হয়ে গেছে। বড়বাবু বলেন,— স্যার। সেই লোককে তো চিঠিও পাঠানো হয়ে গেছে। সেও ওই গ্রামের লোক। আর কাজের লোক রাজু সোরেন।

মিঃ রায় খবরটা শুনে হতাশই হন। বসনের চাকরী হলো না। মিঃ রায় ফিরে এসে বলেন পতিতকে।

—মাস্টারমশাই একটু আগে থেকে চেষ্টা করতে হতো। ওই বিক্রমবাবুই আগে থেকে ওই চেনাজানা ভালুকের চোট খাওয়া রাজুকেই চৌকিদারীর কাজে বহাল করে ফেলেছে।

বসন তবু ভেঙে পড়ে না। ফুলমতি বলে—

—আমার বরাতটাই এমনি গো।

বসন বলে—

ওসব ভেবে মন খারাপ করোনা। আমি এবার চাষ-বাষই করবো। দেখবি নিজের জমি ছাড়াও আরও দু-পাঁচ জমি বিঘে ভাগে দিয়ে চাষবাষ করবো। এতকাল যা করেছে আমার বাপ-দাদারা, আমি তাই করবো।

বসন এখন নিজেই চাষবাষ শুরু করেছে তার জমিতে। শক্ত হাতে লাঙলের ফলা চেপে ধরে, অহল্যা মাটির বুকে চিরে সে হাল চালাচ্ছে। ফল্যার দুদিকে ঠেলে ওঠে নরম মাটি— বাতাসে ওঠে মাটির বুকের মিষ্টি সোদা গন্ধ। বসন বলে—

—এই মাটিতে বীজধান পুঁতবো। তারপর আসবে দামাল বর্ষা। কালো মেঘের দল পাহাড়ের সীমা টপকে আসে উপত্যকার আকাশ জুড়ে। ওই বনস্পতির দল যেন বনের পাতা জুটিয়ে তাদেব অভ্যর্থনা জানায়। কালো মেঘের দল তাদের বুকের সঞ্চিত সব জল সম্পদ এই উপত্যকাই ঢেলে দেয়।

মাঠে চাষ লেগেছে— বসনের সময় নেই। ফুলমতিও এবার নতুন উদ্যমে মাঠে কাজ করছে। বীজতলা থেকে বীজধান তুলে তৈরী করা জমিতে পুঁতেছে ধানের গুচ্ছ। ওই কয়েক গোছা চারা থেকে তৈরী হবে ঝাড়বন্দী ধানগাছ। সবুজ পুরুষ্ট ধানের গাছে আসবে ধানের মঞ্জুরী ওরা মাটির থেকে রস আহরণ করে শিশির কণা থেকেও আহরণ করে রস। প্রকৃতির দানে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে ধানের ক্ষেত। এই মাটি সুজলা-সুফলা হয়েছে ওই বনভূমির স্নিগ্ধ ছায়ায় আর অফুরাণ দাক্ষিণ্যে।

কিন্তু এই মাটিতে ফসল হয় একবার। সেচের জল নেই। সেচ পেলে এই মাটিতে সোনা ফলতো। বনের এত জল নদী পথে বয়ে চলে যায়। সেই জল যদি আনানো যেত। হয়তো সারা বছর তারা চাষ করতে পারতো। কিন্তু সে উদ্যোগের গল্পই শোনে এরা। কাজের কাজ কিছুই হয়নি। তাই এদের অভাবও ঘোচেনি। তাই বনে যেতে হয় কাঠ পাতার সন্ধানে। সেদিন বসন ক্ষেতে কাজ করছে— নদীর জল তুলে কিছু কুমড়ো গাছ লাগাচ্ছে— তাতে জল দিচ্ছে। বন থেকে কাঠ পাতা নিয়ে আসছে ফুলি অন্যদের সঙ্গে। হঠাৎ নদীর ধারেই ফুলি যেন অচৈতন্য হয়ে পড়ে। পাশে ছিল একটা মেয়ে সে তখন তাকে ধরে ফেলে।

ওদের চীৎকারে ছুটে আসে বসনও সে বলে—

—ফুলি কেমন যেন ফিট হয়ে ছেল গো। মুখ চোখে জল দিতে জ্ঞান ফিরল্ক।

১১

বসন ফুলির পাতার বোঝা নিয়ে, ফুলিকে নিয়ে বাড়ি ফেরে। ওকে নিয়ে যায় গুপী ডাক্তারের কাছে। গুপী ডাক্তার ফুলিকে কি সব কথা জিজ্ঞাসা করে ওকে পরীক্ষা করে বলে—

—ওতো মা হতে চলেছে রে বসন।

—তাই নাকি! বসনও যেন নতুন এক স্বপ্ন দেখে।

স্বপ্ন দেখে ফুলমতিও। ফুলি বলে—

—ওমা ইখন তো আরও কাজ করতে হবেক। আরও টাকা চাই। যে ঘরে আসছে তাকে সুখে রাখতে হবে।

বসনও ভাবছে কথাটা।

মিঃ রায় এখানে এসে বুঝেছে এই নিরাপদবাবুর অবদানের কথা। বসন বলে—

—ফুলি তুই আর কাজে যাবি না। যা করার আমিই করবো। ফুলি হাসে। সে বলে—

—তাই কি হয়! এখন নতুন পাতার সময়। মহাজনকে যত বেশী পাতা দিতে পারবো তত বেশী পয়সা। আমি পাতা তুলতে যাবো। যে আসছে তাকে সুখে রাখতে হবেক। একটা গাই গরু কিনবো, দুধেল গাই। ধান এলে একটা ছোট মড়াই হবে উঠানে। ঘর সংসার সাজাতে হবেক নাই?

তাই মহাজনের সেই পাতা তোলার কাজটা করে ফুলি। সেদিনও বনে এসেছে পাতা তুলতে। ফুলির মনে খুশীর সুর। এই সময় বনে এসেছে খোদ ঘোষমশাই। তার সরকারও সঙ্গে রয়েছে। ঘোষমশায়ের দেহখানা একটু মেদবহুল। ওটা বনের মধ্যে দিয়ে সর্টকার্ট করে অন্য গ্রামে চলেছে। হঠাৎ বনের মধ্যে একটি ফেউ ডেকে ওঠে। ফেউ-এর ডাক মানে বিপদের কারণ। ফেউ একধরনের ছোট শিয়াল। ওরা বনের বাঘের আশপাশের ঘোরে আর মাঝে মাঝে ডাক ছাড়ে। ফেউ এর ডাক মানে বাঘ আছে ধারে কাছে। সরকার বলে—

—ঘোষমশায়ও ডাকটা শোনে। এবার আরও কাছে। সরকারের শীর্ণ দেহ সে দৌড় লাগিয়েছে। পালাচ্ছে— পিছনে বাঘ। ঘোষমহাশয়ও প্রাণপ্রণে দৌড়তে গিয়ে ছিটকে পড়ে। সে ভীত আতঙ্কিত। হঠাৎ কার হাসির শব্দে— চাইল ঘোষমশায়।

— কি গো ঘোষ মশায়। ফেউ-এর ডাক শুনেই ছিটকে পড়লে। বাঘ-এর ডাক শুনলে কি হতো গো?

এবার ঘোষমশাই ফুলমতিকে সামনে দেখে বলে—

—তাহলে বাঘ না। ফেউ ডেকেছিস তুই। একেবারে আসল ফেউ-এর মতো।

ফুলমতি বলে—

—শুধু ফেউ ওর ডাক কেনে গো। বাঘের ডাকও ডাকতে পারি।

—থাক্ থাক্। আর ওসব ডাকাডাকিতে কাজ নাই।

—তাহলে কোকিলের ডাকই শোন। বুকটা জুড়াবেক।

ফুলি তখন কোকিলের ডাক ডেকে চলেছে। ঘোষমশায় বলে,

—দুষ্ট মেয়ে কোথাকার। চলি।

ঘোষমশায়কে অক্ষত দেখে সরকারও বের হয়ে আসে গাছের আড়াল থেকে। নিরাপদ শুধোয়—

— ওখানে কি করছিলে? বুঝেছি বাঘের কথা ভেবে গাছের মগডালে উঠেছিলে। ভীতু কোথাকার।

১২

সেদিন মিঃ রায় তার বন অফিসে বসে কাজ করছেন। তিনি বনের বেশ কিছু এলাকায় আরও অরণ্য গড়ে তোলার জন্য বিস্তীর্ণ অঞ্চলে শাল সেগুন এসব গাছের প্ল্যানটেশন করছেন। বসনের একটা

কাজও হয়েছে। সে বন থেকে বুনো আম, শাল সেগুনের ফল মহুয়ার পাকা ফল কুড়িয়ে আনে। মিঃ রায় এখন বেশ কিছুটা জমিতে নার্সারীর মতো করে সেখানে ওই সব চারা তৈরী করে গ্রামের আশেপাশে আর বনের জায়গাতে নতুন চারা পুঁতেছেন। সেসব কাজের হিসাব দেখছেন মিঃ রায়। হঠাৎ করে কার গলার আওয়াজ শুনে চাইলেন।

—আই কামিং স্যার।

উত্তরের অপেক্ষা না করে লোকটা অফিসে ঢুকে ওর সঙ্গে আসা লোকটাকে বলে—

—এই ওসব স্যারের পায়ের কাছে নামা। তারপর ঐ ভদ্রলোক বলেন—

আই-এম নিরাপদ ঘোষ স্যার। এখানের স'মিল ওনার। আপনাদের দয়ায় করে খাচ্ছি স্যার। পুওর ম্যান—

মিঃ রায় নিরাপদর নামটা শুনে ওর দিকে চাইলেন। বহুগুণে বিভূষিত ঐ স্বনামধন্য লোকটিকে এখন এইভাবে দেখবেন ভাবেননি। মিঃ রায় বলেন—

—এসব কি?

—নতুন এসেছেন স্যার। আগেই আসা উচিত ছিল। ভেরি সরি আসতে পারিনি। তাই জমির কিছু আনাজপত্র, পুকুরের মাছ— ঘরের গরুর দুধের খাঁটি সন্দেশ।

মিঃ রায় বিলাতী স্কচের বোতলটা তুলে দেখিয়ে বলেন—

এটাও কি হোম মেড?

হাসে নিরাপদ নো স্যার। ওটা পিওর স্কচ। আর একটা মোটা খাম ওর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে—

—আগেকার রেঞ্জ অফিসারকে যা মাসিক প্রণামী দিতাম তাই আছে স্যার, টেন থাউজেন্ড।

মিঃ রায় দেখছেন ঐ লোকটাকে। ওর সম্বন্ধে শুনেছিলাম অনেক কিছু। এবার নিজেও এর সাহস দেখে মনে মনে রেগে উঠছেন মিঃ রায়। তিনি বলেন—

—নিরাপদবাবু আপনি ঐ টাকা, ওসব জিনিস নিয়ে এখান থেকে মানে মানে বিদায় হন।

— কি বলছেন স্যার!

মিঃ রায় কঠিন কণ্ঠে বলেন— ঠিকই বলছি। দয়া করে এসব নিয়ে চলে যান। নাহলে আমি গার্ডদের ডেকে আপনাকে আমার অফিস থেকে বের করে দিতে বাধ্য হবো।

নিরাপদবাবু ভেবেছে চাপ দিয়ে দর বাড়াতে চায় এই বনবাবু। তাই নিরাপদ বলে—

—ঠিক আছে। ওটা নয় পনেরো হাজার—

—যাবেন না ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করতে হবে?

নিরাপদ এবার বুঝেছে যে এখানে চিঁড়ে ভিজবে না। তাই বলে— ঠিক আছে স্যার। আমি যাচ্ছি। এই বধুয়া নিয়ে চল ওসব। এর মধ্যে পতিতও এসেছিল। সে নিরাপদকে ওইসব মালপত্র নিয়ে ঢুকতে দেখে, কথা বলতে দেখে বাইরে অপেক্ষা করছিল। পতিতবাবুও বাইরে থেকে দেখছে সব— শুনছে নিরাপদবাবুর কথা।

নিরাপদকে দেখে গোমড়া মুখটা হাড়ির মত গোল করে বের হয়ে গেল সব মালপত্র নিয়ে। পতিত অফিসে ঢুকতেই মিঃ রায় বলেন—

—আসুন পতিতবাবু দেখলেন ওই নিরাপদবাবুর কাণ্ড! এই করে সে বনের দখল নিয়েছিল। এবার ওর সেই লুঠপর্ব বন্ধ করবই।

পতিত বলে—

—এরা সবাই গোখরা সাপের ল্যাজ— পা দিয়েছেন মিঃ রায়।

—বনে জঙ্গলে ঘুরি। এমন অনেক সাপ — ম্যানইটার বাঘ পাগলা হাতির মুখোমুখি হবার অভিজ্ঞতা আমার আছে।

মিঃ রায় বলেন—

—বনবাংলোর কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। ডি.এফ.ও সাহেবও পর্যটন মন্ত্রীকে এনে এবার

উদ্বোধন করার কথা বলেছিলেন। উদ্বোধন হয়ে গেলে বেশ কিছু ট্যুরিস্টও আসবে।

পতিত বলে—

—ভালই হবে। তবু বাইরের লোকজন এলে এখানের মানুষদেরও সুবিধা হবে। আর বন তদারকের কাজটাও করবে তারা। কারণ তারা তো বনের মধ্যে যাতায়াত করবে। নতুন পথঘাটও তৈরী হবে।

মিঃ রায় বলেন—

—দেখা যাক কি হয়।

রাজু এর মধ্যেই ওই বনবাংলোর চৌকিদারীর কাজটা পেয়ে গেছে। অবশ্য বাংলো চালু হলে তার কাজও শুরু হবে। তখন ডুংরী ছেড়ে ওকে এই বনবাংলোর লাগোয়া একটা ঘরে থাকতে হবে। রাজু এর মধ্যেই বসতিতে বেশ ডাট নিয়েই ঘোরে। সেই যেন সরকারী অফিসার। এখন আর সে শিকারে যায় না। তবে বনের মধ্যে হাতি গন্ডারের ঠিকানার খবরটা সে বিক্রমবাবুকে ঠিকমত দেয়। আর বিক্রমের লোকরা মাঝে মাঝে দুতিনটে বন্য প্রাণীকে শেষ করে। দিন কয়েক হৈ চৈ পড়ে। বনবিভাগ থানা অফিসাররা বনে যাতায়াত করে। আবার চুপচাপ হয়ে যায়।

১৩

নিরাপদ ঘোষ চুপ করার লোক নয়। সেদিন সে ফরেস্ট অফিস থেকে অপমানিত হয়ে আসার পর এই চ্যালেঞ্জটাকে সেও নিয়েছে। ওই বনবাবুর নাকের উপর সে তার অপারেশেন চালাবে।

মিঃ রায় কড়া লোক। কিন্তু তার গার্ডদের মধ্যে পঞ্চানন হরষিতদের মত লোকও রয়েছে। নিরাপদ তাদের কিনে রেখেছে সামান্য টাকার বিনিময়ে। তাই আগে থেকে কোন্‌দিকে গার্ড থাকবে কোন্‌দিকে থাকবে না সে খবরটা পেয়ে যায়। আর নিরাপদও এবার ভেবেচিন্তেই কাজে নামতে চায়। সেদিন বসন মাঠে কাজ করছে। সোনা ধান পেকেছে মাঠে। মাঠে মাঠে ধান কাটতে নেমেছে আরও অনেক। ওদিকে জঙ্গলের ধারে মাঠে গাঁয়ের গরু-ছাগলের দল নিয়ে গেছে রাখলারা। হঠাৎ স্তব্ধ বনের দিক থেকে ভেসে আসে বাঘের ডাক। একটা চাপা গর্জন উঠেছে। সকলেই উৎকর্ণ হয়ে ওঠে। একজন বলে—

— বাঘের ডাক তো রে। আবার বাঘ এসেছে বনে— মাঝে মাঝে গভীর বন থেকে লোকালয়ের দিকে চলে আসে দু-একটা বাঘ, হাতি। দিন কয়েক উৎপাত করে আবার চলে যায়।

সেই ক'দিন তবু সাবধান সন্ত্রস্ত হয়ে চলা-ফেরা করে মানুষ।

ডাকটা শোনা যায়, আর বন থেকে বুধন দৌড়ে বের হয়ে আসে, ভীত ত্রস্ত সে। চীৎকার করে।

—বাঘ। বাঘ আসছে রে।

বুধন হাঁপাচ্ছে। ওদিকে কয়েকজন মাঠে ধান কাটছিল। তাদের আনা খাবার জলের ঘটিটা গলায় ঢেলে একটু সুস্থ হয়ে বলে—

—ইয়া ঝিঙফুল ছাপ ছোপ মারা বাঘটা—খালের ধারের বনে দেখেই দৌড়েছি আরে বাপ।

বাঘের ডাকটাও আরও স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। এবার বুধনই বলে সকলকে,

— হাঁ করে দেখছিস কি? পালা গরু পাল নিয়ে গায়ের দিকে। এখন যদি বাঘ গরু ছাগল চোট করে।

গরুগুলোও ওই ডাক শুনে উৎকর্ণ হয়ে ওঠে। তারাও জানে বিপদের কারণ হতে পারে ডাকটা। এবার গরুগুলোই ল্যাজ তুলে হাম্বা হাম্বা স্বর তুলে দৌড়তে থাকে গাঁয়ের দিকে। সারা মাঠে গাঁয়ে বসতিতে খবরটা ছাড়িয়ে পড়ে। বসন বাড়ি ফিরে ফুলিকে বলে—

—আর বনে যাব না। একটা বাঘ ঘুরছে বনে।

—তাই নাকি।

—হ্যা। ইয়া ঝিঙেফুল বাঘ। বুধনকে শ্যাষ করতো। কুনমতে বেঁচে ফিরেছে।

ফরেষ্ট অফিসেও খবরটা ছড়িয়ে যায়। মিঃ রায় গর্ডাদের বলেন—

— নজর রাখো যেন ওটা বন ছেড়ে গ্রাম বসতির দিকে না আসতে পারে।

মিঃ রায় পরদিন বনে গেছেন। অবশ্য বনবিভাগের লোক এসে খবর দেয় তিননম্বর কুপের একটা বড় সেগুন গাছ কাল রাতেই কারা কেটে নিয়ে গেছে।

—সে কি! বনে বাঘ এসেছে। তবু চোরা কাটাই চলেছে।

মিঃ রায় দু-তিন জন গার্ড নিয়ে রাইফেল হাতে সেই এলাকাটা ঘুরে দেখেন বড় সেগুন গাছটা আর নেই। তার ডালগুলো পড়ে আছে। পুরে গাছটাই কেটে নিয়ে গেছে চোরাকাটাই এর দল।

এবার মিঃ রায় তার গার্ডদের কড়া হুমকি দেন।

— আর্মস নিয়েই আপনারা বনে যাবেন। যেভাবে হোক এই চোর কাটাই বন্ধ করতেই হবে।

সেদিন পতিতও এসেছে। সেও শোনে গাছকাটার এই খবরটা। পতিত বলে—

— বনের বাঘও তাহলে ওই নিরাপদ বাবুর পোষা। মিঃ রায় বলেন,

— ওই যে কাটছে তার কোন প্রমাণ নাই।

পতিত বলে—

— ওর করাতকলে ভোর থেকেই কাঠ চোরাই শুরু হয়েছে।

— গাছ কাটা হয়ে গেলে ওর করাতকলে এলে তখন তো ধরার উপায় থাকে না।

অনুমান অমিও করেছি। কিন্তু প্রমাণ স্বাক্ষী এসব তো চাই।

পতিত বলে—

— দেখি চেষ্টা করে প্রমাণ দিতে পারি কিনা। তবে আপনারাও সাবধানে থাকুন।

মিঃ রায় বলেন,— আমিও রাতে পাহারার ব্যবস্থা করছি।

বসন সেদিন ঘুমোচ্ছে। রাত হয়ে গেছে। এখন বাঘের ভয়ে ডুংরীর মানুষও সন্ত্রস্ত। তারা সন্ধ্যার পর খাওয়া সেরে আলো নিভিয়ে ঘরে ঢুকে পড়ে। গ্রামও নিশুতি হয়ে যায়। পতিতবাবু তবু সাবধানী নজর রাখে। ওর ঘর থেকে নিরাপদর করাতকলটা দেখে যায়। তবে রাতের অন্ধকারে সব কেমন নিঝুম হয়ে যায়।

১৪

ঘরে ঘুমোচ্ছে বসন। এখন দিনভোর সে মাঠে কাজ করে। তারও চোখে ফুলির সেই ঘরের স্বপ্ন। তাদের ঘরে আসছে নতুন এক অতিথি। তাকে মানুষ করবে বসন। তাই সেও এখন মাঠে পরিশ্রম করে ফসল ফলাতে চায়। ক্লান্ত হয়ে ঘুমোচ্ছে বসন। বাঘের ডাকটা ভেসে আসছে স্তব্ধ রাত্রির বুকে। কাছেই বনেই ডাকছে বাঘটা। বসন জেগে ওঠে, রাতের অন্ধকারে তার ঘুম ভেঙে যায়। দেখে পাশের বিছানাটা খালি, ফুলিও নেই। উঠে পড়ে বসন। লম্ফ জ্বালে, ম্লান আলোয় দেখে ফুলি নেই দরজাটা খোলা। বেরিয়ে আসে বসন। খোলা উঠানের পর দেখা যায় রাতের আদিম অরণ্যকে। এদিক ওদিক খোঁজে, কোথাও নেই ফুলি। বাঘের ডাকটাই ভেসে আসে। ফুলি নেই। চমকে ওঠে বসন। তাহলে ফুলি হয়তো বের হয়েছিল। আর ধূর্ত বাঘটা ধারে কাছেই ছিল। ফুলিকে তুলে নিয়ে গেছে বনে। বসনের সারা শরীরের রক্ত মাথায় ওঠে। তাহলে ঐ বাঘটাই শেষ করেছে ফুলিকে। চালের বাতায় গোঁজা ছিল বসনের ধারালো টাঙ্গিটা। বসন একটানে সেটাকে বের করে ওই টাঙ্গিটা নিয়েই চলেছে বনের দিকে। ওই বাঘটাকে আজ সে শেষ করবে। হন হন করে বসন চলেছে বনের মধ্যে দিয়ে। বাঘের ডাক লক্ষ্য করে এগিয়ে যায়। পতিতবাবুও নজর রেখেছিল। মিঃ রায় ও বেশ কিছুদিন থেকে দ্যাখেন বনে বাঘ এসেছে অথচ বনের মধ্যে একদল লোক রাতের অন্ধকারে চুরি করে গাছ কাটাই করে চলেছে। বনে গার্ডরাও তাদের সন্ধান পায় না। তখন মিঃ রায় নিজেই বনে যান জিপ নিয়ে।

সেদিন রাতে মিঃ রায় বাংলোয় রয়েছেন। পতিতবাবু হঠাৎ হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসে। মিঃ রায় তার দিকে চাইলেন। পতিতবাবু বলে—

—মিঃ রায়, আমি দেখলাম নিরাপদবাবুর লোকজন নিয়ে ট্রাকে করে বনের দিকে গেলেন। মনে হয় ওদের মতলব ভালো নয়। ওরা বোধহয় গাছ কাটতেই বনে গেছে।

মিঃ রায় অবাক হন— এত রাতে বনে গেল কেন? পতিত বলে,— আপনি চলুন মিঃ রায়, তাহলেই বুঝতে পারবেন। মিঃ রায় —আপনি সাবধানে যান, আমিও গার্ডদের নিয়ে বনে যাচ্ছি। দেখতে হবে নিরাপদবাবু কি করছে?

পতিতবাবু বনের দিকে এগিয়ে যায়। নিরাপদ বনে এসেছে তার নিজের কাজে। বনে এখন বাঘের ভয়ে লোকজন গার্ডরাও বিশেষ আসে না। আর এই সুযোগে নিরাপদবাবুও বনে ঢুকে বনের গাছ কেটে সাফ করে। আজ তাই করতে এসেছে। বনের মধ্যে তখন বাঘের ডাক শোনা যায়।

বাঘটা বেশ গর্জন করে চলেছে। নিরাপদও তার লোকজনের কোন ভয় ডর নেই। ওর লোকজন তখন বেশ বড় একটা সেগুন গাছ কাটতে শুরু করেছে। নিরাপদ তাড়া দেয়,

— হাত চালিয়ে কাঠ— একটা গাছ কাটতে রাত কাবার করবি নাকি— নে নে জলদি কর।

ওদের কুড়ুল চলছে। ওদিকে বাঘটাও থেকে থেকে টানা হুঙ্কারে সারা বনাঞ্চলকে কাঁপিয়ে তুলেছে। বসনও সেই গর্জন শুনছে। আজ ওর মনে ভয় ডর নেই। সেই বাঘটা হয়তো ফুলিকে শেষ করে মত্ত উল্লাসে গর্জন করছে। ওটাকে আজ ছাড়বেনা বসন। ওর আদিম রক্তে যেন হিংস্রতা এসেছে। টাঙ্গীটা শক্ত হাতে ধরে সেও এগিয়ে চলেছে বনের মধ্যে দিয়ে। বিরাট জঙ্গল ভেদ করে চলেছে বসন— গর্জনটা আরও সোচ্চার হয়। বসনও তৈরী। হঠাৎ চোখে পড়ে আবছা জ্যোৎস্নার আলোয় ওদিকে নিরাপদরা বনের মধ্যে গাছ কাটছে। এদিকে বাঘের গর্জন বেড়ে উঠেছে—বাঘটা কাছেই আছে। বসন ঠিক করেছে আগে বাঘটাকেই সে কোপ মারবে— তাকে মেরে তারপর বাধা দেবে নিরাপদবাবুদের। পতিতও এসেছে বনের মধ্যে। ওদিকে শুনতে পায় মাঝে মধ্যে কুড়ুলের খুটখাট শব্দ। সেই শব্দ লক্ষ্য করে এগিয়ে চলেছে পতিত, আরও অবাক হয়ে বনের মধ্যে বাঘের ডাকটা শোনা যায় অথচ বাঘের গর্জনেও ওদের ভয় নেই। ওরা অবাধে গাছ কেটে চলেছে। পতিতও এগিয়ে চলেছে। তারও ব্যাপারটা বিচিত্র বোধ হয়।

এদিকে এগিয়ে চলেছে বসন— বাঘের গর্জনটা উঠেছে ঝোঁপের ওদিক থেকে। খুব কাছেই। বসনও শক্ত হাতে টাঙ্গিটা ধরে। এবার এক লাফে এগিয়ে গিয়ে ঝোঁপ লক্ষ্য করে টাঙ্গিটা চালায়। চমকে ওঠে বসন— টাঙ্গিটা বাঘের গায়ে নয়, লেগেছে একটা বড় মাটির জালায়। মাটির বড় জালাটা চুরমার হয়ে গেছে টাঙ্গির আঘাতে। আর ওদিকে বাঘ নয় ছিটকে পড়েছে একটা মেয়ে। বনের গাছ গাছালির ফাঁক দিয়ে এসে পড়েছে আবছা আলো। সেই আলোতে দেখা যায় মেয়েটা আর কেউ নয়,

—তারই স্ত্রী সেই ফুলমতি। বসন বিস্ময়ভরে বলে,

—তুই! তার মানে রাতে ঘর থেকে এসে বনে ঢুকে জালার মধ্যে মুখ রেখে বাঘের ডাকে লোককে ভয় দেখাস আর সেই সুযোগে নিরাপদবাবু লোকজন নিয়ে বনের গাছ কাঠে। ফুলি বলে—

—হ্যাঁগো পেটের দায়ে টাকার জন্যেই এই কাজ করি গো।

এদিকে পতিতও এসে পড়ছে। নিরাপদবাবুও সব দেখে চমকে উঠেছে। বড় গাছটা তখনও কুড়ুলের ঘা খেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। নিরাপদবাবু এবার গর্জে ওঠে।

—খবরদার এক পাও এগোবে না— এগুলে কুড়ুলের কোপে তোকেও শেষ করে দেবো। এসব কথা বাইরে বললে এখানেই তোকে শেষ করে দেবো। চলে যা এখান থেকে।

এবার এগিয়ে আসে বসন, হাতে সেই টাঙ্গিটা। ও যেন বনের মধ্যে মাটি ফুঁড়ে উঠেছে। নিরীহ বসনও এতদিন পর যেন আজ বদলে গেছে। গর্জে ওঠে সে—

— গাছে কোপ দিবে নাই, তোমার লোক গাছে আর একখানা কোপ বসালে আমিও টাঙ্গির এক কোপে তোমার গর্দানটা নামিয়ে দিবো।

নিরাপদোকে লক্ষ্য করে বসন টাঙ্গিটা তুলে ধরেছে। নিরাপদ আজ সত্যি বিপদে পড়েছে। পালাবার পথও নেই। টাঙ্গি নিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে আছে বসন। এর মধ্যে মিঃ রায়ও এসে পড়েন গার্ডদের নিয়ে। ওদের মুখে পড়েছে জ্যোৎস্নার আবছা আলো। মিঃ রায় বলেন—

—নিরাপদবাবু। এতদিন পর আপনাকে হাতে নাতে ধরেছি। এইভাবে বনকে শেষ করে আজ শেষে ধরা পড়ে গেছেন। এবার যাতে উচিত শাস্তি পান তার ব্যবস্থাই করবো।

আজ এতদিন পর অপরাধীকে হাতে নাতে ধরতে পেরেছেন মিঃ রায়। আজ পতিত বলে—

— মিঃ রায় আমরা কৃতজ্ঞ আপনার সাহায্যে এই কাজ করতে পেরেছি।

ওরা খুশি, খুশি হয়েছে বসনও, সে ফুলিকে বলে—

—তুই মা হতে চলেছিস— মা হয়ে বসুমতিকে বুক থেকে তার সন্তান এই গাছ কাটলে কি মানুষ বাঁচবে!

জয় পরাজয়

ট্রেনটা ছুটে চলেছে শিলিগুড়ি স্টেশন ছাড়িয়ে। একদিকে মাথা তুলেছে আকাশ ছোঁয়া হিমালয়ের নানা শাখা-প্রশাখার মত পাহাড়গুলো। তাদের বুকে ঘন চা বাগান। সবুজ-হলুদ পাতার রাশ নিয়ে গাছগুলো মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। মাঝে মাঝে চা গাছের মাঝে মাথা তুলেছে শিশু গাছের সবুজ ছায়া। চা গাছগুলোকে ওরা ছায়া দেয়। ওদের পাতাগুলো যেন প্রাণবন্ত করে তোলে এই শিশুগাছের ছায়ার স্নিগ্ধতা।

অমল দেখছে নতুন এই জগতটাকে। চাকার শব্দ তুলে তিস্তা নদী পার হচ্ছে ট্রেনটা। দেখা যায় উঁচু পর্বতের বুক চিরে গভীর খাদের সৃষ্টি করে বের হয়ে এসেছে জলধারা। দুরন্ত গতিতে তিস্তা, পাহাড়ের কঠিন রক থেকে বাঁধন মুক্ত হয়ে এবার সমতলে এসে নদীটি যেন মুক্তির আশ্বাস পেয়েছে এইখানে।

একদিকে উঁচু লাল সেগুন বনে ঢাকা পাহাড়, অন্যদিকে অবাধ মুক্ত প্রান্তর অমল দেখছে এই বিচিত্র জগতটাকে। উত্তর চব্বিশ পরগনার আবাদে তার গ্রামের বাড়ি। কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এগ্রিকালচার নিয়ে পড়াশোনা করে এবার চাকরী পেয়েছে। একটা নামী চা বাগানে সহকারী ম্যানেজারের চাকরী। তাই জীবিকার সন্ধানে তাকে আসতে হয়েছে তার পরিচিত সবকিছুকে ছেড়ে এই দুর্গম বনে-পাহাড়ে।

ট্রেনটা ছুটে চলেছে। পাহাড় শুরু হয়েছে সবুজ থরে থরে গজিয়ে ওঠে চা বাগানের গাছগুলোর গা বেয়ে। মাঝে মাঝে বনঢাকা পরিবেশে দু'একটা স্টেশনে ট্রেনটা থামছে, আবার স্টেশনের মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছে। যাত্রীদের অনেকেই এখানের মানুষ। তারা কেউ বিড়ি টানছে— কলরব করছে। অমল সকালের মিঠে রোদ— আলো স্পর্শে বসে আছে। সকালের রোদও মিষ্টি লাগে।

ওরা স্টেশনে এসে পড়েছে। ওপাশে একটা উঁচু টিলা। তার নীচেই স্টেশনটা। প্লাটফর্মটা কাঁচা। প্রাচীন আমলের বিশাল শাল-গামার গাছ অতীতের স্মৃতি ধরে রেখেছে। অমল স্টেশনে নেমেছে। নেমেছে আরও বেশ কিছু যাত্রী। তাদের মধ্যে আদিবাসী, নেপালী, সাঁওতালীও আছে। অমলকে এখান থেকে পাহাড়ের মধ্যে আরও মাইল খানের যেতে হবে। অবশ্য কথা ছিল, ওদের বাগানের গাড়ি আসবে তাকে নিতে। কিন্তু স্টেশনের বাইরে এসে দেখে কোন গাড়ি আসেনি।

এদিকে ওদিকে ছড়ানো দু একটা চায়ের দোকান। আর স্টেশনের বাইরে তখন একটা জায়গাতে দু'চারজন সমান্য আনাজপত্র আর সুটকি মাছের ঝুড়ি নিয়ে বসে আছে। এইটাই বোধহয় ওদের বাজার। চায়ের দোকানে বেঞ্চে বসেছে অমল। এককাপ চা খেয়ে তারপর ভাবা যাবে কি করে যাবে তাদের চা বাগানে। এমন সময় যেন ঈশ্বর প্রেরিত দূতের মতই একজন ওকে দেখে শুধোয়।

— স্যার, আপনি কি টুং টি এস্টেটে যাবেন?

অমল লোকটার দিকে চাইল। মাঝবয়সী একটা অতি সাধারণ লোক, গালের দাড়িগুলো দিনকয়েক না কামানোর ফলে আগাছার মত বেড়ে উঠেছে। একটা ব্যাগে কিছু মাছ, ফুলকপির পাতাগুলো দেখা যাচ্ছে, পালংশাক, বেগুন।

অমল বলে— হ্যাঁ।

— আপনিই তাহলে নতুন এ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার?

লোকটার কথায় অমল ঘাড় নাড়তে সে বলে,

— আমি বিপিন ঘোষ। ওই বাগানের গুদামবাবু। আমি আপনাকে নিতে এসেছি। তবে গাড়ির একটা টায়ার ফেটে গেছে। ওদিকে একটা দোকানে সারাতে দিয়েছি। মনে হয় এতক্ষণে ঠিক হয়ে গেছে। আপনি চা খান। আমি টুকটাক বাজার করে নিই। ওদিকে কোনকিছুই মেলে না। একেবারে ভূটানের গা ঘেঁষা মুলুক। পাণ্ডব বর্জিত দেশ মশাই। তাই এদিকে এলে কিছু কেনাকাটা করে নিই।

অমল ওকে দেখে যেন ভরসা পেয়েছে। বলে, — ঠিক আছে। আপনি কেনাকাটা করে নিন।

বিপিনবাবু বলে— আপনিও চা বিস্কুট—দরকারী ওষুধ— সিগারেট মোটামুটি যা দরকার নিয়ে নিন। তেল-সবান-টাবানও।

এতদিন অমল হোস্টেলে ছিল। তাই বাধ্য হয়েই স্বাবলম্বী হয়েছে। বাড়িতে যেত দু-চারদিনের জন্য। তারপর আবার সেই হোস্টেলে ফিরত। তাই নিজের কাজগুলো নিজের হাতেই করতে পারে। তবে পড়াশোনাটা মন দিয়েই করেছে। তাই পরীক্ষায় ভালো ফল করতে এই নামীদামী চা কোম্পানি ক্যাম্পাস থেকেই রিক্রুট করেছে। অমল বলে,

— তাহলে চলুন, আমিও টুকটাক কেনাকাটাগুলো সেরে নিই।

টুং টি এস্টেট এদিকের সবচেয়ে বড় এবং প্রাচীন আভিজাত্যময় চা বাগান। এতক্ষণে ওরা গাড়িতে করে চা বাগানের দিকে এসেছে। স্টেশনের সীমা ছাড়িয়ে ওরা ছোট পাহাড়ের মাথায় এসে উঠেছে। ওখান থেকে দেখা যায় অনেক নীচে রেল লাইনটা চলে গেছে বনের বুক চিরে। ওরা চলেছে আলিপুর দুয়ার পার হয়ে আসামের দিকে। রাস্তার বুকে মসৃণ শব্দ তুলে বড় বড় পণ্যবাহী ট্রাক ছুটে চলেছে।

ওরা এবার সভ্যজগত ছাড়িয়ে আদিম অরণ্য পর্বতের দিকে চলেছে। বিপিনবাবু বলে,— আগে এসব অঞ্চল ছিল গহন বনে ঢাকা। শাল, সেগুন বড় বড় গাছের জটলা। আর বনভূমির মাঝে ছিল ঘন লতাপাতার ঝোপ। আর বাঁশবন। হাতি-বাঘ-বাইসন-ভালুক-সাপ কি ছিল না এসব বনে। ইংরেজরা এসব অঞ্চলে বন কেটে চা বাগান শুরু করলো। ছোটনাগপুর-সাঁওতাল পরগণা থেকে লোভ দেখিয়ে হাজার হাজার আদিবাসী কুলিদের ধরে এনে বন কেটে চা বাগান গড়লো। তখন এখানটা ছিল মৃত্যুপুরী। একদিকে বাঘ চিতাবাঘ-হাতির আক্রমণ, অন্যদিকে শুরু হলো কালাজ্বর-ম্যালেরিয়া। কত লোককে যে ওই ইংরেজদের চাকরী করতে গিয়ে মরতে হয়েছিল তার হিসাব নেই। সেই ইংরেজরাই ভারতীয় চা, বিশেষ করে দার্জিলিং-এর চা বিদেশের বাজারে বিক্রী করে কোটি কোটি টাকার মুনাফা করতে লাগলো। টুং টি চা বাগানও ছিল তেমনি এক ম্যাকমিলান সাহেবের চা বাগান। ওই সাহেবের আসাম তরাই অঞ্চলে ছিল বাইশটা বড় বড় চা বাগান। কলকাতায় তার অফিস। তার ব্যবসা ছিল সার পৃথিবী জুড়ে। স্বাধীনতার পর ম্যাকসাহেব বুঝেছিলেন এদেশে আর শ্রমিকদের দাবিয়ে ব্যবসা করা যাবে না। তাই তিনি শ্রীলঙ্কায় তার চা সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিল, আর এখানের ব্যবসা লিজ দিয়েছিলেন। সেই ম্যাকসাহেব চলে যাবার পরও এই টুং টি এস্টেটের নাম এখনও সবাই জানে। আর এদের তৈরী চা এখনও আন্তর্জাতিক বাজারে তার চাহিদা বাড়িয়েই রয়েছে।

অমল শুনছে বিপিনবাবুর কথা। বিপিন বলে,

— কোম্পানির ম্যানেজার মিস্টার কোচারও খুব কাজের লোক। আর এই অঞ্চলে আর কয়েকটা চা বাগান আছে। তবে টুং টি এস্টেটেই তাদের ম্যানেজার— ডিরেক্টরের বাংলো। এটাই তাদের আসল হেড অফিস। তাই জায়গাটা বন পাহাড়ের মধ্যে হলেও বেশ জমজমাট। সপ্তাহে মঙ্গল, শনিবার হাটও বসে।

— তবে আগেকার সাহেবদের সেই দিন আর নেই মশায়!

হাজার হোক, তারা ছিল রাজার জাত। ওদের দিল ছিল। আজকাল এরা মক্ষীচুষ মশাই। একটু এদিক ওদিক করবেন, তার উপায় নেই!

বিস্তীর্ণ চা বাগান এলাকা। বাগানের ওই সবুজের বুকে মানুষরা পাতা তুলছে। তাদের গানের বিচিত্র সুর ওঠে। এদের গাড়িটা চলেছে। কোথাও বা জনমানবহীন চা বাগান। আবার শুরু হয়েছে বাঁশবন।

বড় বড় বাঁশগুলোতে রং ধরেছে। দিনের বেলাতে আলোও ঢুকতে পারে না। জায়গাটায় অন্ধকার নেমেছে সকালেই। অমল বলে,

— এত বাঁশবন কেন?

বিপিনবাবু বলেন— এসব আমাদের বাগানের লাগানো বাঁশবন। বাগানের কাজেও বাঁশও নানা কাজে লাগে। তাই চা গাছের সঙ্গে এটাও লাগাতে হয়। ওদিকের পাহাড়গুলো যেন একেবারে ঘাড়ের ওপর এসে পড়বে। ওদিক বাগানের পাশেই বয়ে চলেছে একটা পাহাড়ী নদী। নদীতে বালুচর নেই। আছে পাথুরে খাদ। তারই বুক চিরে কলকল শব্দ তুলে নদীটা বয়ে চলেছে। ওদিকে পাহাড়গুলো মাথা তুলে উঠে আঠে। দু দশটা ঘর বসতিও রয়েছে। আর পাহাড়ের গায়ে ধাপ কেটে উঠে গেছে ধানক্ষেত। শীতের শুরু। সবুজ ধানক্ষেতে লেগেছে সোনালী আভা। তার পেছনেই সেই আকাশ ছোঁয়া পাহাড়। বিপিন বলে,

—ওদিকে পূতঃ নদী, তার ওদিকেই শুরু হয়েছে ভুটান। ওই যে দূরে সবুজ বাগান দেখছেন ওইসব ভুটান এলাকা।

ওদের গাড়িটা এসে থামে বাগানের অফিস-কারখানা এলাকায়। ওদিকে বেশ খানিকটা জায়গায় বাংলো-কটেজ টাইপের বাড়িগুলো। অনেকখানি জায়গা জুড়ে স্টাফ কোয়ার্টাস।

অমল প্রথম দেখে ম্যানেজার রবি কোচারকে। একজন শক্ত সমর্থ ভদ্রলোক। পরনে হাফসার্টের উপর হাফ সোয়েটার। জিনস্, পায়ে হান্টিং সু, হাতে একটা লাঠি। ওদিকে নতুন প্ল্যানটেশন করা হচ্ছে। লেবাররা কাজ করছে। ওদের সঙ্গে কথা বলছেন মিস্টার কোচার। বিপিনবাবুর ইশারাতে গাড়িটা দাঁড়ায়। বিপিনবাবু বলেন,

— ওই তো ম্যানেজার কোচার সাহেব!

অমলও কি ভেবে নেমে এগিয়ে যায়। মিস্টার কোচার পরীক্ষা করছেন ছোট ছোট চা চারাগুলোকে। সবে সকালের রোদ এসে পড়েছে। লেবাররা ছোট চারাগুলোকে সার বেঁধে লাগাচ্ছে।

— গুড মর্নিং স্যার!

কোচার সাহেব অপরিচিত তরুণটির দিকে চাইলেন। পেছনে বিপিনবাবু। বিপিন দেখেন সাহেব অমলের দিকে তাকিয়ে আছে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে। বিপিন বলে,

— আমাদের নতুন অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার স্যার। সবে এসেছেন বাগানে। কোচার এবার সহাস্য মুখে হাত বাড়িয়ে দেন অমলের দিকে।

— ওয়েলকাম টু টুং টি এস্টেট। আই অ্যাম্ রবি কোচার।

অমলও নিজের পরিচয় দেয়। অমল দেখে ওই লেবাররা গাছগুলোকে কঞ্চির ঠেকা দিয়ে দাঁড় করাচ্ছে। বলে অমল,

— না, না, ওইসা নেহি, এইসা করো। বলে অমল নিজেই সাবলীল ভঙ্গিতে মাটিতে বসে কয়েকটা ছোট কঞ্চির ঠেকনা দিয়ে চারাগাছগুলোকে সূর্যের দিকে মুখ করে বসিয়ে দিয়ে বলে,

— হর ডাল কো সূরয কি তরফ ঘুমা দেনা। তব সূরয্ কি কিরণে জাদা লাগেগা, অর জলদি বড়া হোগা!

রবি কোচার দেখছে নবাগত তরুণকে। আর ওকে অতি সহজেই কুলিদের মত মাটিতে বসে পড়ে নিপুণভাবে ওই কাজ করতে দেখে খুশিই হয়। ও ঠিকই বলেছে। সূর্যের আলোই গাছগুলোকে প্রাণশক্তি যোগায়। আরও অবাক হয় কোচার, অমল এক খাবলা মাটি তোলে ওই গাছের গোড়া থেকে। মাটি নিয়ে ওকে দেখে কোচার বলেন,

— সয়েল টেস্ট করকে দেখা। মালুম ক্যালসিয়াম থোড়া কমতি হ্যায়। তব রিপ্ল্যানটেশন করনা হোগা।

রবি কোচারও অভিজ্ঞ লোক। ইংরেজ আমল থেকে তিনি ম্যানেজারি করছেন। মাটি গাছপালার সম্বন্ধে তারও জ্ঞান কম নয়। সেও ভেবেছিল, একবার সয়েল টেস্ট করে তারপর প্রয়োজনমত সার দিতে

হবে। আজ সেই প্রয়োজনটা যে এই নবাগত সদ্য পাশ করা তরুণও ধরে ফেলবে, এটা দেখে তিনি খুশিই হন। প্রথম নজরেই তার ভালো লাগে অমলকে। তাই কোচার বলেন,

— তুমি এর আগে কোন চা বাগানে কাজ করেছ নাকি?

অমল বলে,

— না স্যার। তবে মাটি দেখে আমার মনে হলো।

কোচার বলেন— তুমি অফিসে চলো। আমিও ফিরছি। ওখানে কথা হবে। তারপর কোচার বিপিনবাবুকে বলেন,

—গুদামবাবু, বড়বাবুকে বলে ওর বাংলোর ব্যবস্থা করে দিন। এখন বিশ্রাম করুন মিস্টার রায়। বিকালে অফিসে এলে কথা হবে। বাই—

কোচার জিপে উঠে বাগানের অন্য সেকশনে চলে গেলেন।

প্রথম নজরেই অমলের বাংলোটা পছন্দ হয়ে যায়। বাবুপাড়ার ওদিকে একটা মাঠ। ফুটবল মাঠ হিসাবেই ওটা ব্যবহার করা হয়। তার ওদিকেই সুন্দর বাংলোটা। পাঁচিল ঘেরা বাংলোটার সামনে বেশকিছু ফুলের গাছ। পূর্বদিকে মুখ বাংলোটার। ওদিকে একটা সবুজ লজ মত। অতীতে টেনিস খেলতো হয়তো বিদেশীরা।

বাংলোর বয়-বেয়ারা এসে পড়ে। বিপিন বলে,— এরাই আপনার সব কাজ করে দেবে। এই বাবুয়া এ আপনার বেয়ারা বাই। খুব কাজের ছেলে। তবে বাবুয়াটা নাম্বার ওয়ান ফাঁকিবাজ। ব্যাটা মজনুই—

ওদিকে বাবুয়াটা হাসছে খিক্ খিক্ করে।

বিপিন বলে— স্যার তাহলে আপনি স্নান খাওয়াদাওয়া করে রেস্ট নিন। লাঞ্চের পরের শিফটে আমি আসবো। অফিসে যাবেন।

টুং টি এস্টেটের এলাকাও অনেকখানি। অতীতের সেই ম্যাকসাহেব নিজের হাতে এই বাগানটা সাজিয়েছিলেন। এইটাই ছিল তার আসাম—তরাই দার্জিলিং অঞ্চলে ছড়ানো সব চা বাগানের হেড অফিস। তাই তাদের এই ছোট পাহাড়ের সবটাই জুড়ে তিনি তার পছন্দমত একটা সুন্দর বাংলো গড়িয়েছিলেন ওই পাহাড়ের ওপর। আজও সেই বাংলোটা রয়েছে। আর ওখানে থাকেন এই বাগানের ডন মিস্টার আওজা। অমলের অবশ্য তার সাথে যোগাযোগ হবার কথা নয়। তিনি অনেক উপরের লোক। অমলের বস ওই রবি কোচার। অমলের তাকে ভালোই লেগেছে।

প্রায় দুহাজার একর এলাকা জুড়ে এই চা বাগান। তারপরই ভুটানের ঘন অরণ্যবেষ্টিত চা বাগান। ভারতবর্ষের শেষ সীমান্তে রয়েছে অমল। এই প্রত্যন্ত বন পাহাড়ের মধ্যে তবু চা বাগানের বাইরে ছোট বাজারও আছে। দুই শনিবার কুলিদের হপ্তা পেমেন্ট হয়। সেদিন ওখানে বেশ জমিয়ে হাট বসে। বাগানে সেদিন কাজ হয় এক বেলা। কারখানার কাজও বন্ধ। সবাই তখন ব্যস্ত। গাছগাছালির ছায়াঘেরা মাঠটাতে তখন এদিক ওদিক আনাজপত্র নিয়ে বসেছে লোকজন।

অমল বিকালে এসেছে অফিসে। এখানেই পরিচয় হয় বড়বাবু গোবিন্দবাবুর সঙ্গে। অন্যসব বাবুরাও রয়েছেন অফিসে। বেশ অনেকটা জায়গা নিয়ে অফিস। ওদিকে গুদাম। একপাশে ম্যানেজারের চেম্বার। তারই পাশে আরও দুজন সহকারী ম্যানেজারের চেম্বার। পাশে অমলের চেম্বার। সহকর্মীদের সঙ্গেও পরিচয় হয় অমলের। ওদিকে বিস্তীর্ণ উঠানে অনেকখানি এলাকা জুড়ে চৌবাচ্চা মত। বেলা দুপুর অবধি বাগান থেকে তোলা সব চা গাছের পাতাগুলোকে ওইসব ভ্যাটে পচানো হচ্ছে। বাতাসে ওঠে চা পচা পচা গন্ধ। সন্ধ্যার পর ওদিকে কারখানায় সেই পচা পাতা প্রসেস করে চা পাতা তৈরী করা হয়। তাই কারখানার কাজ শুরু হয় রাত্রি ন'টার পর থেকে। চলে ভোর অবধি। ওই প্রডাকশনের উপরই চা বাগানের পরমায়ু নির্ভর করে।

বিকাল নামছে। বড়বাবু-গোবিন্দবাবু এই বাগানের বেশ কয়েক বছর রয়েছে। সে জানে চা বাগানের নানা হাল হকিকৎ। বড়বাবু বলেন অমলকে, — স্যার আপনি তো নৈহাটির লোক। আমার বাড়িও হালিশহরে। চাটুজ্যে পাড়ায়।

অমলও অবাক হয়— তাই নাকি!

কথায় কথায় অমলের এক কাকা যে গোবিন্দবাবুর ভাই-এর নিবিড় বন্ধু সেটাও বের হয়ে পড়তে গোবিন্দবাবু বলে,

—তাহলে অতীনের ভাইপো? অতীন তো আমার ভাই-এর মত।

এসে পড়ে লালাজী বড়বাবুর চেম্বারে। বেঁটে খাটো লোকটা। গোলগাল মুখ। কপালে রক্তচন্দনের বড় টিপ। বড়বাবুর সামনে একটা প্যাকেট রেখে বলে,

—নমস্তে বড়বাবু। ভোলে বাবার পূজা করলাম, তাই প্রসাদ নিয়ে এলাম। লালাজী দেখছে অমলকে। বিপিনবাবুও এসে পড়ে বড়বাবুর এখানে একটা কাজে। বিপিনই বলে,

—লালাজী, ইনিই নতুন সেকেন্ড ম্যানেজার।

লালাজী নমস্কার করে— রাম রাম সাব। টুং টি এস্টেটে হামি ছোটা মোটা সাপ্লায়ার আছে। ইখানে এই হাটতলায় উধারে হামারা গদি আর শহরের বাজারে ছোটা মোটা বিজনেস আছে। একদিন আসেন হামার গদিতে। বাগিচা মন্দির ভি আছে।

অমল দেখছে লোকটাকে। বলে,

—এখানে তো রইলাম, যাবো একদিন।

অফিসের ডেস্কওয়ার্কও করতে হয় অমলকে। এখানের বাগানের সব কর্মচারী— মায় শ্রমিকদের কোম্পানি থেকে কাকে কখন রেশন দেওয়া হয়। বিপিনবাবু অমলকে রেশন বিলির সপ্তাহের হিসাবের খাতাপত্র দেখিয়ে বলে,

—এই কাজটার দায়িত্ব আপনার।

এছাড়াও সকাল থেকেই অমলকে বের হতে হয় বাগানে। বাগানের একটা এরিয়ার চা গাছগুলোর সার দেওয়া— ওষুধ স্প্রে করা, এসব কাজের তদারকি করতে হয়।

এর মধ্যে অফিসে এসে বিভিন্ন শিফটের সুপার ভাইসাররা সেলাম জানিয়ে যায় তাদের নতুন ম্যানেজারকে। মিস্টার কোচারের ঘরে গেছে অমল। কোচার বলেন, মিস্টার রায়, তাহলে বাগানের সব কাজ বুঝে নিয়েছেন। কাল থেকেই কাজ চালু করে দিন। এখানের মূলধন ওই চা গাছগুলো। দীর্ঘ পঞ্চাশ-ষাট বছর ধরে ওরা কোম্পানিকে অর্থ যুগিয়ে আসছে। আজও যোগাবে। ওদের দিকে নজর রাখবেন। আর লেবাররাই রোদ বৃষ্টিতে কাজ করে বাগানের প্রডাকশন বাড়িয়েছে। ওদের সঙ্গে বন্ধুর মত মিশবেন।

সন্ধ্যা নামছে। অফিসের ছুটির পর অমল তার সহকর্মী আর এক সহকারী ম্যানেজার মিস্টার শর্মার কথায় চাইল। শর্মাও বয়সে অমলের চেয়ে দুতিন বছরের বড়। ইউ পির বাসিন্দা। শর্মা বলে,

—মিস্টার রায়, একা বাংলোয় গিয়ে কি করবেন! চলুন আমার গরীব খানায়। তারপর বাংলোয় যাবেন।

বাংলোটা হাটতলার ওদিকে একটা মাঠের পাশে। পেছনেই শুরু হয়েছে চা গাছের সার। শর্মার এখানে এসে জুটেছে আরও একজন সহকারী ম্যানেজার। মাঝবয়সী ভদ্রলোক মিস্টার সরখেল। মিস্টার সরখেল বলে,

—মিস্টার রায় নতুন এসেছে আমাদের বাগানে। আজ তাই একটু সেলিব্রেট করতে হবে।

অমল এসেছে এদের ড্রইংরুমে। শর্মার বাংলোয় তিনি একাই থাকেন। তবে তার বাংলোয় দেখা যায় একটা মেয়েকে। সেই ঘরের কাজ করে। মাঝবয়সী, কোন পাহাড়ী সম্প্রদায়ের হবে।

সারখেল বলেন,

— কি অমল ভায়া, জায়গাটা কেমন লাগছে?

অমল বলে— ভালো।

হাসে সরখেল— ভালো মানে,নিদারুণ ভালো। এখানে ইংরেজরা সবরকম ইয়েটিয়ের ব্যাপারই খুঁজে পেয়েছিল। ওদের ক্লাবে চলতো মদের ফোয়ারা আর নাচের ইয়ারা। এখানে সব পাবে হে!

তাই তো শর্মা তার ঘরের বৌকে এখানে আনে না। এখানে ওসবের অভাব নেই। নাও, চিয়ার্স—

এর মধ্যে মেয়েটা নীরবে ট্রেতে করে মদের গ্লাস, মদের বোতল, জলের মগ— মায় প্লেটে বাদাম, ছোলাভাজা, পাঁপড় ইত্যাদি নিয়ে এসেছে। অমল বুঝেছে এদের এই সেলিব্রেশন প্রায়ই হয়। সরখেল বলে,

— না, লালাজী অন্য মালে ভেজাল দিলেও আমাদের মালে ভেজাল দেয় না। মদটা ব্যাটা পিওরই দেয়!

শর্মা বলে— এ সপ্তাহের পাওনা দুটো বোতল আজও দেয়নি ব্যাটা!

সরখেল বলে— অমল ভায়া, ব্যাটার রেশনের বিলের লাখ লাখ টাকার বিল তোমার হাতে। ওকে বলো, ঠিকঠাক প্রণামী-ট্রণামী না দিলে বিল পেমেন্টই হবে না।

অমলও বুঝেছে এদের এই মদ্যপানেরও খরচা আসে লালাজীর ফাণ্ড থেকে। আর লালাজী এসব নিশ্চয়ই বিনা স্বার্থে দেয় না।

শর্মা ততক্ষণে গ্লাসে মদ ঢেলে এগিয়ে দেয় অমলের দিকে। সরখেল তার গ্লাসটা তুলে নিয়ে জয়ধ্বনি দেয়,

— চিয়ার্স ফর নিউ কামিং অমল ভায়া।

অমল এসব খায় না। কলেজের বন্ধুরা যে দুচারজন আড়ালে আবডালে এসব খেত না তা নয়। তবে অমল এর থেকে বঞ্চিত। আর এমনিতেই সে আদর্শবান। বলে,

—এসব তো আমার চলে না মিস্টার শর্মা।

সরখেল এর মধ্যে গ্লাসে লম্বা একটা চুমুক দিয়েছে। বলে সে,

—আরে আমিও আগে এসব খেতাম না। এখন খেতে হয়।

শর্মা বলে, আরে এসব না খেলে এই বন পাহাড়ে ঠাণ্ডায় থাকবে কি করে?

সরখেল বলে— আরে সব সিনিয়র ম্যানেজাররাও দ্যাখো গে ক্লাবে গিয়ে বোতল কে বোতল সাবাড় করছে। মায় তাদের গিন্নীরাও সফ্‌ট ড্রিঙ্কসের নাম করে হুইস্কির গ্লাসে চুমুক দিচ্ছে। আর জুয়া খেলছে। অমল দেখছে ওদের। অমল বলে,

— আমি এক কাপ লিকার চা-ই খাব।

ওর কথার মধ্যে একটা কাঠিন্যই ফুটে ওঠে। সেই মেয়েটিও দেখছিল অমলকে বাইরে থেকে। এবার সে ভিতরে এসে বলে,

—সাবজী, তুম বৈঠো। হামি চা আনছি।

ওদিকে রাত নামছে। চাঁদের আলো ছড়িয়ে পড়েছে চা বাগানের সবুজ পাতায়। বাতাসে ওঠে চা পাতার— চা ফুলের মিশ্রিত গন্ধ। সাদা সাদা ফুলগুলো চা গাছে ফুটে উঠেছে।

অমল ফিরছে বাংলোর দিকে। ওদিকে বাবুপাড়ায় তখনও দুচারটে বাড়িতে আলো জ্বলছে। টিভির শব্দ ভেসে আসে। দু এক জায়গায় ছেলেমেয়েদের পড়ার শব্দও শোনা যায়। একটা বাড়ির সামনে বিপিনকে দেখে চাইল অমল। বিপিন বলে,

— এত রাতে এদিকে স্যার?

অমল বলে— মিস্টার শর্মা, সরখেলের ওখানে গেছিলাম।

বিপিনবাবু ওদের নাম শুনে একটু কৌতুহলী ভঙ্গিতে দেখছে অমলকে। তারপর ভালো করে দেখে নিশ্চিন্ত হয়েই বলে,

—রাতের বেলায় হুটহাট বাগানে বের হবেন না। নতুন এসেছেন। রাত্রিবেলা চিতা-হায়না বুনো হাতি এসব বের হয়।

অমলও বুঝেছে সেটা। বিপিন বলে,

— ওই আমার বাসা। আজ রাত হয়েছে। পরে একদিন আসতে হবে। তারপর নিজেই বলে,

—চলুন, আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।

অমলকে নিয়ে বিপিনবাবু ফিরছে ওর বাংলোর দিকে। বিপিন বলে, — স্যার, ওই শর্মা-সরখেল সাহেবদের সঙ্গে কাজের জন্যই মেলামেশা যা করতে হয় করবেন। এখানের পরিবেশ হয়তো আপনার ভালো ঠেকবে না,তবু থাকতে তো হবে!

অমলও বুঝেছে মাঝবয়সী বিপিনবাবুও যেন কি ইঙ্গিত দিতে চায় ওদের সম্বন্ধে।

ওরা চলেছে। বাঁদিকে একটা কুলিদের বস্তি। ওখান থেকে মাদল বাঁশির সুর ওঠে। ভেসে আসে গানের সুর। বিচিত্র সুরটা স্তব্ধতার মাঝে এক বৈচিত্র্য আনে। অমল বলে, এখানে তো দেখছি দুটো কুলি বস্তি আছে। একটা এদিকে, অন্যটা ওই পাহাড়ের গায়ে।

বিপিন বলে, হ্যাঁ স্যার। এরা ছোটনাগপুরের আদিবাসী সম্প্রদায়। হো-মুণ্ডা, সাঁওতালও কিছু আছে। এদের পূর্ব পুরুষদেরই ইংরেজরা প্রথম এনে চা বাগানের পত্তন করে। এরা তাদেরই বংশধর। চা বাগানের কাজেই রয়ে গেছে। আর পাহাড়ের ওদিকে যারা, তারা এখানেরই পাহাড়ী সম্প্রদায়। এই দুই সম্প্রদায় একত্রে কাজ করলেও এদের কুলি লাইন আলাদা। এদের সংস্কৃতিও আলাদা।

এখানে পরিবেশটা বেশ মনোরম। ভিজে বাতাসের আর্দ্রতা গাছের পাতায়। বাগানের ক্যামেলিয়া ফুলগুলো শিশিরে ভিজে গেছে। নানা পাখির কলরবে ভোরের আকাশ ভরে ওঠে।

সকাল সাতটার মধ্যেই তৈরী হয়ে বের হয়ে পড়েছে অমল। এর মধ্যে ওইসব বস্তি থেকে কুলিরাও সেজেগুজে চটের বস্তা আর ছাতা নিয়ে বের হয়ে পড়েছে। সঙ্গে টিফিন। অফিসে হাজিরা দিয়ে ওরা বিস্তীর্ণ বাগানের এক এক অঞ্চলের চা বাগানে নেমে পড়ে। আর নিপুণ দুই আঙুলের চাপে ওদের হাতে উঠে আসে মোমের মত চা পাতা। চায়ের দুটো পাতা আর কুঁড়ি। আর চটের থলে ভরতি করে ওরা আনে চা পাতাগুলো। দু হাতে যন্ত্রের মত পাতা তোলে আর মুখে গান। ওদের গানের সুর ছড়িয়ে পড়ে আকাশে বাতাসে।

সকালের আলো ছড়িয়ে পড়ছে চা বাগানে। বাতাসে ওঠে গানের সুর। অমল দেখছে গাছগুলোকে। ওদিকে অফিস থেকে লোকজন এসে ওইখানেই বাঁশের ঠেকনা দিয়ে দাঁড়িপাল্লা খাটিয়েছে। ওই কুলিদের সংগৃহীত পাতার বস্তা সেখানে ওজন করে ওদের স্লিপ দেওয়া হয়। তাতে কুলির নাম নাম্বার আর সংগৃহীত পাতার ওজন লেখা থাকবে।

ফুলমতিয়া সবে যৌবনে পা দিয়েছে। সারা দেহে নেমেছে তার নবাগত যৌবনের ঢল। পান পাতার মত মুখ, ডাগর রহস্যময় চাহনি ভরা দুটো চোখ তার রূপকে যেন সোচ্চার করে তুলেছে।

ওদিকে পাতা তুলছে তরতাজা জোয়ান নবীন। নবীনের নজর ফুলমতির দিকে। অবশ্য ফুলমতির দিকে সারা লেবার কলোনির ছেলেরই নজর। আর ফুলমতি তাদের আমলই দিতে চায় না। নবীনকেও তার ভালো লাগে। নবীন বেশ সাহসী। ফুলমতির বাবা কাজ করতো এই বাগানে। মা-টা আগেই এই বাগান ছেড়ে একজন সর্দারের সঙ্গে ভেগে গেছে। তাই ফুলমতি তার ঠাকমা সুখিয়ার কাছেই মানুষ। সুখিয়াও ছেলে মারা যাবার পর এখন ওই নাতনী ফুলমতিকেই নিয়ে থাকে। সুখিয়ার বয়স হয়েছে, তবুও সে পাতা তুলতে আসে।

অমল এর মধ্যে কুলি মহলেও বেশ পরিচিত হয়ে উঠেছে। কুলিরাও দেখেছে ওই শর্মা, সরখেলের মত এ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজারদের। কুলিদের থেকে কমিশন আদায় করে। কুলি মেয়েদের দিকেও নজরের কথা জানে কুলিরা। ওদের কষ্টের উপার্জন দিতেও টাল বাহানা করে। কেউ অসুস্থ হলে তাকে কোম্পানির হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য লিখতে ওদের যেন হাত কাঁপে।

কিন্তু এর মধ্যে কুলিরা দেখেছে অমল সাহেবকে। তরুণ ওই সাহেব কুলি-মজুরদের জন্য ভাবে। তাদের কারখানার দোকান থেকে রেশন বিলির সময়ও নিজে গিয়ে তদারকি করে। আগে ওই দোকান থেকে কুলিরা ঠিকঠাক মাল পেত না। ওই শর্মা, সরখেলরা মিলে লালাজীর লোকদের দিয়ে বহু মাল সরিয়ে কালো বাজারে বিক্রী করে কুলিদের বঞ্চিত করে এসেছে। আর লালাজীও মোটা টাকা লাভ করে ওদের কিছু টাকা প্রণামী দিয়েছে আর মদের খরচা জুগিয়েছে। কোচারের কাছেও এনিয়ে অভিযোগ গেছে, কিন্তু তিনি এসব বন্ধ করার অর্ডারই দিয়েছেন মাত্র। আর যাদের ওপর বন্ধ করার

ভার ছিল, সেই শর্মা আর সরখেল কিছুই করেনি। উল্টে যে শ্রমিকরা প্রতিবাদ করেছিল, তাদেরই নানাভাবে শাসানো হয়েছে। কাউকে অন্য বাগানে বদলি করা হয়েছে। ফলে তারা চুপ করে গেছিল। অমল এর মধ্যে কুলিদের মহলেও পরিচিতি লাভ করেছে। সুখিয়া অন্য কুলিরা পাতা ওজনের পর ওখানেই বসে জলযোগ সারছে। ঘর থেকে বানিয়ে এনেছে রুটি আর স্কোয়াশের তরকারী। সেই লতানো গাছটা এই আবহাওয়াতে প্রচুর জন্মায়। আর ফলও দেয় প্রচুর। অমল মটর বাইক রেখে ওদিকের গাছগুলোতে সার দেওয়াচ্ছিল। কোথাও কোথাও ফাংগশ হয়, তার জন্য স্প্রে-করতে হয়। অমল নিখুঁতভাবে এসব কাজ করে। ওদিকে ফুলমতিয়াও নবীনের সঙ্গে বসে জলযোগ সারছে। নবীনেরও ঘরে বুড়ি মা। সে রোজ ভোরে ছেলের খাবার করতে পারে না। নবীন তাই গত রাতের বাসি রুটি আর সব্জী নিয়ে আসে। ফুলমতি বলে,

— আমাদের টাটকা সব্জী দিই!

নবীন বলে— তোমার কি থাকবে?

হাসে ফুলমতি। এসে পড়ে অমল। ও দেখেছে ওদের দুজনকে এর মধ্যে বাগানে, কখনও ঝোরার ধারে, কখনও শালবনিয়ার হাটে ঘনিষ্ঠ হয়ে ঘুরতে। আজ ওদের দেখে অমল এগিয়ে আসে।

ওদিকে রোদে পিঠ করে বসে সুখিয়া রুটি সব্জী খাওয়ার পর ওদের ঘরের তৈরী সবুজ চায়ের লিকার দেওয়া ঘরে তৈরী মদের বোতলে চুমুক দিতে যাবে। অমলের কথায় চাইল, কিরে মাসী, তোর ফুলমতিয়া ওই নবীনকে রুটি-সব্জী খাওয়াচ্ছে, আমি কি দোষ করলাম!

বহু কুলি কামারই বসেছিল। তারা সবাই হো হো করে হেসে ওঠে। ফুলমতির মুখও লজ্জায় রাঙা হয়ে ওঠে। সুখিয়া বুড়ি হাতের বোতলটা দেখিয়ে বলে,

— তু আমার কাছে আ, আমি তুকে লাল বেরান্ডি খাওয়াব।

অমল ওদের মতই একটা চুমুক লাগিয়ে ওদের পাশে বসে বলে,

—তুকে মনে লাগছে নাই আর।

বুড়ি বলে,

—তাহলে ছুড়িয়া কাউকে খুঁজে দিব!

অমল বলে— সে পরে হবে। ইখন তুই কেমন আছিস বল? বুড়ির ক'দিন আগেই জ্বর হয়েছিল। বুড়ি বলে,

— এখন ভালো আছি। আমাদের ধাওড়ার মদনের খুব কাশি-জ্বর। উকে ছুটি দেয় নাই। নাগ হয়ে গেলে তো রোজ পাবে নাই! খাবে কি উরা? সরখেল সাহেব তো নাগ করেছে উকে।

— তাই নাকি! অবাক হয় অমল। বলে সে,

— আজ বিকেলে ওর ছেলেটাকে পাঠাবি অফিসে। আমি দেখি কি করতে পারি?

ফুলমতিও এগিয়ে আসে। সেও বলে,

—একটা কিছু করো সাহেব। সরখেল সাহেব তো কুন কথাই শুনবে না। কুলি কামাররাও বলে অমলকে— কিছু করো সাহেব! নালে-নাগ হয়ে গেলে রোজ পাবে না।

ওদের ভরসা এখন অমলই। তবু অমল বলে,

— তোতারাম কি বলেছে?

তোতারাম সহায় এই বাগানের শ্রমিক নেতা। তোতারামও এই বাগানেরই একজন কর্মচারী। তবে সে বাগানের কাজ তেমন করে না। শর্মা ওকে ব্যবস্থা করে রেখেছে। তাকে কোন ডিউটিই করতে হয় না। কারখানার ওদিকে একটা চালা ঘরে কোনরকমে শ্রমিক কল্যাণ অফিস করে সেইখানেই বসে থাকে তার অনুগত দুচারজনকে নিয়ে। তোতারাম শ্রমিকদের কাছ থেকে মাসে মাসে ভালো টাকাই সমিতির চাঁদা হিসাবে আদায় করে। তার পরিমাণও কয়েক হাজার টাকা। আর সে টাকা লাগে শ্রমিক কল্যাণের কাজে। শ্রমিকদের সহায়তার কাজেই ব্যবহৃত হয়। অবশ্য তাতে শ্রমিকদের কি হয় জানা যায়নি, তবে তোতারামের যে বাজারে একটা ভালো দোকান ব্যবসা গড়ে উঠেছে না খেটে, বাগানে কাজ না করেই

ভালো টাকা মাইনে, সস্তায় রেশন পেয়ে বেশ তেলে জলে ফুলে ফেঁপে উঠেছে তা দেখা যায়। সুখিয়া তোতারামের নাম শুনে বলে,

— উ হারামীকা বাচ্চা কি করবে? তুমি কিছু করতে পারো তো করো সাব! অমল উঠে পড়ে। ওকে বাগানের অন্য সেকশনের কাজ দেখতে যেতে হবে। শীতের মুখে এখন বাগানের প্রডাকশন কমে যায়। এসময় এদিকে বেশ ঠাণ্ডা পড়ে। গাছে তেমন পাতাও আসে না। তাই কর্তৃপক্ষ এসময় গাছগুলোর ডালপালা ছেটে প্রচিং করে। গাছের গোড়ায় সার, কীটনাশক স্প্রে করে। যাতে শীতের শেষে গাছগুলো আবার সতেজ হয়ে বছরের ক-টা মাস প্রচুর পাতা দিতে পারে।

মিস্টার কোচার দেখেছেন অমলকে। বেশ মন দিয়ে কাজ করে। আর এর মধ্যে শ্রমিকদের সঙ্গে সহজভাবে মিশে তাদের জন্য উপকার করে শ্রমিকদের এক শ্রেণীর মধ্যে বিশ্বাস ফিরিয়ে এনেছে। এর আগে কোচারকেও নানা সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়েছে। লালাজীর রেশন নিয়ে নানারকম অভিযোগ ছিল। তার জন্য শ্রমিকরা ওকে দু'একবার ঘেরাও করেছে। কোচারও তার সহকারী এই শর্মা-সরখেলদের দিয়ে তদন্তও করিয়েছিল। দু এক সপ্তাহ চলেছে। তারপর সেই অভিযোগ উঠে গেছে। শ্রমিকদের ছুটি নিয়েও নানা অভিযোগ ছিল। আর শ্রমিক নেতা তোতারামও এনিয়ে মিটিং-মিছিল মায় ধর্মঘটও করেছে বাগানে।

এখন ক'মাস আর ওসব নেই। কোচার দেখেছেন এই ড্রাই সিজনেও তাদের চা বাগানের প্রডাকশন এবার রেকর্ড করেছে। কোচার বলেন,

—অমলজী, আমাদের এজেন্ট মিস্টার আহুজা তোমার সঙ্গে দেখা করতে চান। আজ ইভিনিং-এ উনি প্ল্যানটার্স ক্লাবে আসবেন। যদি তুমি যাও ভালো হয়। আমিও থাকবো।

অমল একটু অবাক হয়। আহুজা এদের বিগ বস। এদিকের তরাই অঞ্চলের এদের আট-নটা বড় বড় চা বাগান আছে। আহুজা সেসব বাগানের চিফ বস। ওই পাহাড়ের উপর বিশাল বাংলোতে তিনি থাকেন। মাঝে মাঝে গাড়ির কনভয় নিয়ে দূর-দূরান্তের বাগানগুলো ইনস্পেকশন করে যান।

অমল বলে— হঠাৎ তিনি আমার সাথে দেখা করতে চান?

— অমল, তিনি কাজের লোক। হয়তো যোগ্য ব্যক্তিকেই তিনি সম্মান দিতে চান!

পরক্ষণেই ফোনটা বেজে ওঠে। কোচার ফোনটা তুলে কথা বলে ফোন রেখে বলেন,

—মিস্টার আহুজাই ফোন করেছিলেন। আজই জরুরী কাজে উনি লন্ডন যাচ্ছেন দশদিনের জন্য। তাই আজকের অ্যাপয়েন্টমেন্ট ক্যানসেল করতে চান। তিনি ফিরে এসে তারপর দেখা করবেন।

অমল যেন কিছুটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। আট দশদিন তবু সময় পাবে নিজেকে মানসিকভাবে তৈরী করার।

খবরটা এর মধ্যে চা বাগানের কর্মী মহলে ছড়িয়ে পড়ে। বিশেষ করে শর্মা—সরখেলও দেখেছে তারা চেষ্টা করেও ওই অমলকে তাদের বশে আনতে পারেনি। কিছুদিন আগে থেকেই শর্মা-সরখেলদের আমদানীও কমেছে। লালাজী বলে,

—আমার নসীব ভি খারাপ হয়ে গেল! এখন এই কুলি-কামারদের পুরা রেশন দিতে হচ্ছে। কুছ গড়বড় হলেই বাধা দিচ্ছে ওরা। অমলজী রেশন দেবার সময় দাঁড়িয়ে থাকে, সব আমদানী চৌপাট হয়ে যাচ্ছে।

সেটা বুঝেছে সরখেল আর শর্মা। ওরাও এতদিন তোতারামকে দিয়ে শ্রমিকদের বোনাস-ছুটি মায় কোয়ার্টার এসব এলট করিয়েছে ভালো টাকার বিনিময়ে। তার ভাগ পেয়েছে তোতারামও। এবার তাদের আমদানীও বন্ধ হবার উপক্রম। এখন মিস্টার কোচার অমলকে পেয়ে শ্রমিকদের পাশে পেয়েছেন। তাই তিনিও এবার এসব বেআইনী কাজগুলোকে কঠিন হাতে বন্ধ করতে পেরেছেন। তোতারাম বলে,

— লেবারদের ভি এখন ওই অমল সাব আনসান সামঝাচ্ছে। সব ব্যাটাই সেয়ানা হয়ে গেছে। লালাজী বলে — তাই তো দেখলো। শর্মজী কুছ করেন। শুনলো ওই মস্টার আহুজাও ভি ইখন নাকি অমল সাবকো নতুন করে প্রমোশন দিবে।

তোতারাম বলে,

— তাই তো শুনলো। তব্ তো পুরা কাম চৌপট হয়ে যাবে। সরখেলও ভেবেছে কথাটা। বলে সে,

—একটা কিছু তো করতেই হবে। দেখা যাক ভেবে চিন্তে কি করা যায়। ওই শর্মা-সরখেল-লালাজী-তোতারামের দল যেন এক সূত্রে বাঁধা। তাই তাদের স্বার্থে ঘা পড়তে ওরা সকলেই আজ সমবেত ভাবে ভাবছে কি করে এই বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়।

বড়বাবু গোবিন্দরাম বেশ হিসাবী করিতকর্মা লোক। সে জানে কখন কোন্ নৌকায় উঠতে হয়। আর কখন দু নৌকায় পা দিয়ে টাল সামলে দরিয়ায় পাড়ি দিতে হয়। এতদিন গোবিন্দরাম ওই শর্মা-সরখেলদের সঙ্গে থেকে চাকরী বজায় রেখেছেন। গোবিন্দরাম জানে ওদের আমদানীর পথগুলো। সব বিল পাশ করে ম্যানেজার তারই রেকমেন্‌ডেশনের পর। তাই গোবিন্দবাবুও ওদের কথামত কাজ করে শর্মা-লালাজীদের সুবিধা করে দিয়েছে। আর নিজেও ভালো টাকাই পেয়েছে।

অমলকে দেখে বড়বাবু প্রথমে তেমন গুরুত্ব দেয়নি। কিন্তু ক্রমশঃ দেখেছে অমল নিজের যোগ্যতার জোরে বাগানে একটা পজিশন করে নিয়েছে। বাগানের প্রডাকশন বাড়িয়েছে। শ্রমিকদেরও এতদিন নানা সমস্যা ছিল। শ্রমিক নেতা তোতারাম প্রায়ই শ্রমিকদের নিয়ে কাজ নষ্ট করে মিটিং মিছিল করতো। আর শ্রমিকদের অনেক কিছু পাইয়ে দেবার কথা বলে চা বাগানে ধর্মঘটও করিয়েছে। বলা হয়,

উচ্চতম কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের উপর অবিচার করছে। আর তোতারামই আভাস দেয় সে এসব আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেবে। তার জন্য শ্রমিকদের সমস্ত দাবি মেনে তাকেও বেশ কিছু টাকা দিতে হবে।

মালিকরা একটা রফায় এসেছে, তোতারামই পেয়েছে বেশী টাকা। তার সাম্রাজ্য বেড়েছে। আর শ্রমিকরা পূর্ব শর্ত মেনে নিয়েই আবার কাজ চালু করেছে। আবার লালাজী অর্ধেক মাল দিয়ে পুরো বিল আদায় করেছে। গোবিন্দবাবু হাওয়া বুঝতে পারে। দেখেছে ক্রমশঃ অমলই তার পালে সব হাওয়া টানছে। তাই গোবিন্দবাবুও এবার অমলকে বিশেষভাবে খাতির করতে শুরু করে।

বড়বাবু গোবিন্দরাম সেদিন অমলকে বলে,

—স্যার, একদিন আমার বাসায় পায়ের ধুলো দিতে হবে যে! অমল ওই বয়স্ক ভদ্রলোককে এভাবে কথা বলতে দেখে নিজেই লজ্জা বোধ করে। বলে সে,

—এসব কি বলছেন বড়বাবু, নিশ্চয়ই যাবো!

বড়বাবু বলে,— কাল রবিবার। আমার মেয়ের জন্মদিন। যদি সন্ধ্যায় আমার বাড়িতে আসেন!

অমলও সেইমত গেছে বড়বাবুর বাসায়। বাবুবাগানের ওদিকে একটা ঝোরার ধারে বড়বাবুর বাংলো। পিছনে কিছু গাছগাছালির ভিড়। তার মধ্যে দিয়ে বয়ে চলেছে ঝোরাটা। গোবিন্দবাবুর মেয়ে বিপাশা মালবাজার কলেজ হোস্টেলে থেকে পড়াশোনা করছে। এবার বি.এ. পরীক্ষা দিয়ে বাবার এখানেই এসেছে। বিপাশাও দেখেছে অমলকে। ছোট জায়গায় ম্যানেজার-এ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজারদের সকলেই চেনে। বিপাশাও এর আগে অমলকে দেখেছে। মটর বাইক নিয়ে বাগানে ঘোরাফেরা করে।

অমলও বিপাশাকে দেখেছে আগে। তবে ও যে বড়বাবুর মেয়ে তা জানা ছিল না। গোবিন্দবাবুই বলে, এই বিপাশা, আমার মেয়ে। এবার বি.এ. পরীক্ষা দিয়েছে। বিপাশাও নমস্কার জানায় অমলকে। অমল ওর আনা উপহারটা বিপাশাকে দিয়ে বলে— শুভ জন্মদিন!

বিপাশার দু'একজন কলেজের বান্ধবীও এসেছে। আর দেখে অমল অন্য একটা মেয়েকে। বান্ধবীরা বলে,

— উমা, তোকে গাইতে হবে আজ। তুই শুরু কর।

শান্ত ওই মেয়েটা চোখ তুলে বলে,

— আমি কেন? বিপাশার জন্মদিন। ওই শুরু করুক আগে।

শেষ অবধি উমাকেই গাইতে হয়। অমল অবাক হয়ে শুনছে ওর গান। সুন্দর গলা আর তেমন ওর সুর জ্ঞান। ওর গলায় রবীন্দ্রসঙ্গীত যেন সার্থকরূপ নিয়ে প্রতিভাত হয়। তারপর অনেকেই

গাইল। বিপাশাও। কিন্তু অমলের মনে হয় উমার গানটা যেন ওরা স্পর্শও করতে পারেনি।

বিপাশা বলে, অমলবাবু, আপনি গাইবেন না? হাসে অমল। বলে,

—কলেজে চাষবাসই শিখেছি। গানতো শিখিনি? বিপাশা বলে, ওটাও শিখতে হবে।

গোবিন্দবাবু দেখছে ওদের। ওর চোখ মুখে যেন একটা স্বপ্নের আভাস। গোবিন্দবাবু বলেন,

অমলবাবু, বিপাশাতো এখন এখানেই আছে। চলে আসুন সন্ধ্যার পর। গানটানও শেখা হবে একা একা বাংলোয় থাকেন। অমল শুনছে ওর কথা। ওদিকে খাবার আয়োজন করা হয়েছে। তাই এ প্রসঙ্গ আপাতত চাপা রেখে ওরা খেতেই বসে যায়।

রাত হয়েছে। অতিথিরা চলে গেছে। অমলও বের হবে। গোবিন্দবাবু বলে বিপাশাকে,

অমল বাবাজীকে একটু এগিয়ে দিয়ে আয়।

বিপাশাও যেন তৈরী ছিল। সেও এগিয়ে আসে। অমলই বলে, আমি তো বাইক এনেছি, ঠিক চলে যাবো। তোমাকে আর কষ্ট করতে হবে না। গুড নাইট।

অমল ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তার বাইকে উঠেছে।

চাঁদনী রাত। আকাশে তারা ঝলমল করছে। সেই আলোর আভা পড়েছে চা বাগানে। রাতের ভিজে বাতাসে চা ফুলের সুবাস ওঠে। হঠাৎ অমল দেখে নির্জন পথ দিয়ে চলেছে উমা। সেই মেয়েটির গান অমলের মনে একটা বিচিত্র সাড়া তুলেছে। অমল বাইকটা থামায় ওর কাছে। সচকিত হয়ে চাইল উমা।

অমল বলে— এই নির্জন রাতে একা বাগানের মধ্যে দিয়ে বাড়ি ফিরছেন? শান্ত মেয়েটা বলে— আমার অভ্যেস আছে।

অমল বলে, কোথায় থাকেন?

—নমো পাড়ায়, বাবু বাসায়। জবাব দেয় মেয়েটা।

অমল চেনে ওই বাবু কলোনি। চা বাগানের আর একদিকে ওই কলোনি। অমল বলে,

আমি ওদিকেই যাবো। চলো, তোমায় নামিয়ে দিয়ে যাবো। একা একা এতটা পথ যাওয়া ঠিক নয়। শুনেছি বাগানে দু'একটা চিতাও রাতে বের হয়। ওঠো—

উমা কি বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু অমলের কণ্ঠস্বর যেন একটা কঠিন ব্যক্তিত্বেই ফুটে উঠেছে যাকে অগ্রাহ্য করতে পারে না উমা। সে বাইকের পিছনে এসে বসে। অমল বাইকটা স্টার্ট করে এগিয়ে চলে। ওর সারা মনে যেন বিচিত্র সেই সুরটা ওঠে। গায়ে লাগে উমার নরম হাতের স্পর্শ। ওর কাঁধটা ধরে পিছনে বসে আছে উমা। ওই সামান্য স্পর্শটুকু যেন অমলের সারা মনে কি বিচিত্র সুর তোলে।

রাতে এখানে বেশ ঠাণ্ডা পড়ে। তার সাথে নামে কুয়াশা। চাঁদের ম্লান আলো পড়েছে বাগানে। সবুজের রাজ্যে ওরা যেন হারিয়ে গেছে। মাঝে মাঝে কুলিদের কলোনি থেকে ভেসে আসে মাদল বাঁশির বিচিত্র সুর। উমা চুপ করে বসে আছে। বাগানের এদিকে ওদের কলোনির কাছে এসে গেছে অমলের বাইক। বাবুপাড়ায় রাতের স্তব্ধতা নেমেছে। উমাই বলে, — ওই বাঁদিকের কোয়ার্টারের সামনে দাঁড়ান।

বিপিন তখনও জেগে আছে। স্তব্ধতা ভঙ্গ করে বাইকের শব্দ কানে আসতে বাইরের আলোটা জ্বেলে বারান্দায় আসে বিপিন। অমলকে দেখে অবাক হয় বিপিন।

—স্যার, আপনি?

উমা ততক্ষণে বাইক থেকে নেমেছে। সেই বলে,

—আমার বাবা।

অমলও অবাক হয়— তাহলে বিপিনবাবুর মেয়ে তুমি?

বিপিন বলে— গরীবের বাড়িতে এলেন? ভিতরে আসবেন না? উমাও চাইল ওর দিকে। অমল বলে,

— আজ রাত হয়ে গেছে বিপিনবাবু। বাড়িতো দেখে গেলাম, পরে একদিন আসবো। চলি—

অমল বের হয়ে গেল। বিপিন বলে উমাকে,

— খুব ভালো ছেলে রে!

উমা বলে— সত্যি! উনি নিজেই আমাকে একা পথে আসতে দেখে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে গেলেন। নাহলে সত্যি এত রাত হবে ভাবিনি। পথে ভয়ও করছিল।

অমল তার বাংলোয় ফিরেছে। তখন তার বেয়ারা আর বয় দুজনেই বেশ আরামে কম্বল মুড়ি দিয়ে সুখনিদ্রা দিচ্ছে। বেশ ডাকাডাকি করেই তাদের ঘুম ভাঙিয়ে তার ঘরে ঢোকে অমল।

তার মনে তখনও উমার সেই সুরটা বাজছে। চোকের সামনে ভেসে ওঠে শান্ত ডাগর কালো চোখের চাহনি। বিপাশার চড়া মেক আপ—সেই রূপ যেন অমলের মনে কোন রেখাপাত করতে পারেনি। বার বার ভেসে ওঠে সব ছাপিয়ে উমার সেই নীরব চাহনি। এতদিন এখানে এসেছে অমল, সে তার কাজের ভাবনা, নিজের পড়াশোনা, বাগানের নানা কাজের প্রোগ্রাম নিয়েই ব্যস্ত ছিল। আজ তার মনে নতুন আর এক অনুভূতিও জেগে উঠেছে। এটাকে সে মন থেকে মুছে ফেলতে চায় না।

বড়বাবু গোবিন্দলাল মনে মনে হিসাব করেছে যে কোন মতে অমলকে হাতে আনতে পারলে তারই সুবিধা হবে। কারণ গোবিন্দবাবু জেনেছে যে এজেন্ট মিস্টার আহুজা নিজেই ওই অমলের সম্বন্ধে খোঁজ খবর নিয়েছেন আর তাকেও দেখা করতে বলেছেন। অর্থাৎ অমলের ভাগ্য যে বদলাবে সেটা অনুমান করে নিয়েছেন গোবিন্দবাবু। তাই গিন্নীকে বলে,

— তোমার মেয়েকে বলো, অমলবাবুর সঙ্গে মেলামেশাটা একটু রাখুক। লালাজী এবার বিপদে পড়েছে। ওদিকে শর্মা আর সরখেলের সামনেও অমল যেন একটা প্রশ্নই এনেছে। সরখেল ভেবেছিল এবার সে নিজেই পাশের বাগানে ম্যানেজার পদে প্রমোশন পাবে। আর শর্মাও সেই চেষ্টাই করছে। তার জন্য ইতিমধ্যে সে দরবারও করেছে কোচারের কাছে। মিসেস কোচারের দেশের লোক শর্মা। তাই শর্মা মিসেস কোচারকেই ধরেছে। মিসেস কোচার বলে,

-- দেখি তোমাদের সাহেবকে বলবো!

শর্মা অবশ্য এসব কথা সরখেলকে বলেনি। বরং শর্মাজীই সরখেলকে না জানিয়ে এবার তোতারামের কাছ থেকে মাসিক কমিশনই নিয়ে নিয়েছে। ওদের চা কারখানায় মাসে যা প্রডাকশন হয় তার বেশ কিছুটা সঠিক মানের নয় বলে রিজেক্ট করে ফেলা হয়। সেসব চা নষ্ট করে ফেলার কথা। ওটাকে মাটিতে পুঁতে দেওয়া হয়, আর পরে ওটাকেই সার হিসাবে ব্যবহার করা হয়। ওই সারটা যা হয় তার পরিমাণও কম নয়। তবে মিঃ শর্মা-সরখেলরা ওই শ্রমিক নেতা তোতারামের সাহায্যে বেশ ভালো মানের চা-ই রিজেক্ট করিয়ে গোপনে ট্রাকবন্দী করে বাজারে বিক্রী করে।

অমল এসব জানে না। কারণ প্রডাকশনের সময় সে থাকতো না। শর্মা আর সরখেল ছিল কারখানার দায়িত্বে। মিঃ কোচারের কাছে অমল শুনেছে কারখানার প্রডাকশন ঠিকমত হচ্ছে না। মেশিন গড়বড় করছে। মেশিন ঠিকমত কাজ না করার জন্য চা পাতাও ঠিকমত তৈরী হচ্ছে না। অমল নিজেই তাই এসেছে কারখানায়। মিস্টার কোচারও এসেছে। তারা মেশিন চালিয়ে দেখে মেশিনে ঠিকমত কাজই হচ্ছে। তাই কোচার বলেন,

— মেশিন তো ঠিকঠাকই চলছে তাহলে এত মাল রিজেক্ট হল কেন? অমলের মনেও প্রশ্নটা জাগে!

অমল সেদিন গোবিন্দবাবুর সঙ্গে ওর বাসায় গেছে। বড়বাবুকেও অমলের দরকার। কারণ, বাগানের অনেক কিছু খবরই রাখে বড়বাবু। অবশ্য বড়বাবু গোবিন্দরাম জানে অনেক কিছুই। তার স্বার্থের বাইরে গিয়ে কোন কোথাই সে বলে না। ইদানীং গোবিন্দবাবু অমলকে বাগানের অন্তরালের রাজনীতির ব্যাপারে দু একটা টোপ দেয় মাত্র। শর্মা সরখেলের সঙ্গে বড়বাবু কাজের ব্যাপারে যেটুকু মেশার দরকার, তাই মেশে। ওদেরকে তার বাংলোয় আসার আমন্ত্রণ বিশেষ জানায়নি। গোবিন্দরাম জানে ওদের স্বভাবের কথা। দু'একটা মহিলা ঘটিত ব্যাপারে ওরা মাঝে মাঝে জড়িয়েও পড়েছে। গোবিন্দরাম বলে,

— ওদের ওখানে যাবেন না অমলবাবু। ওরা সন্ধ্যার পর শুনেছি বাংলোয় মদের আসর বসায়।

মেয়েছেলের আনাগোনাও হয়। অমল চুপ করেই থাকে। গোবিন্দবাবু বলে,

—ওই শর্মা তো চায় আমাদের তিন নম্বর চা বাগানের ম্যানেজার পোস্টকে দখল নিতে। শুনেছি সুখলালও ধরেছে এই ব্যাপারে। আর ওরা দুজনেই আপনার সঙ্গে হেসে কথা বলে বটে, তবে জানবেন, ওরাই আপনার এগেনস্ট মশাই!

এর মধ্যে বিপাশা চা এনেছে। গোবিন্দরামও যেন এই সুযোগটার অপেক্ষাতেই ছিল। সে বলে,

— তোমরা কথা বলো। আমি সন্ধ্যা আহ্নিকটা সেরে নিই। আর হ্যাঁ,আজ রাতে এখানেই খেয়ে যাবেন। বিপাশা আজ মালবাজার থেকে চিকেন-ইলিশ মাছ এনেছে। নিজের রান্না করেছে।

অবশ্য বিপাশা রান্নার কিছুই জানে না। ও সেজেগুজে থাকতেই বেশি ভালোবাসে। রান্নার কাজ করে ওর মা। অমল বলে,

— বাংলোতে বলে আসিনি। বিপাশা বলে— আপনার বেয়ারাতো রোজই রাঁধছে। আপনি আজ না হয় এখানেই খেলেন।

অমল এখানের পরিবেশটাকে যেন ঠিকমত মেনে নিতে পারে না। দু'একদিন এর মধ্যে অমল বিপিনের বাড়িতেও গেছে। দেখেছে বিপিনবাবুর সংসার। সবকিছুকে মেনে নিয়েই বিপিনবাবু আছেন। উমার ওখানে গেলে সন্ধেবেলায় উমা গান নিয়ে বসে। অমলও জমে যায়। বড়বাবুর অন্যপথেও আয় আছে। তাই ওর সংসারের চেহারাটা অন্যরকম। বিপিনবাবুর সেই দু'নম্বরী রোজগার নেই। তবু তার অন্তর আছে। উমা নিজেও রান্না করে খাইয়েছে তাকে। আর অমলও তৃপ্তি ভরে সেই সবরকম খাবরই খেয়েছে। আজ গোবিন্দবাবুর এখানে দুলর্ভ ইলিশ মাছ, চিকেনের কারীও তেমন রুচিকর মনে হয় না। বড়বাবু বলে,

—বিপাশা আমার দারুণ রাঁধে!

অমল কোনমতে বলে— তা সত্যিই!

বিপাশা বলে,

—আমরা লেডিজ ক্লাব থেকে এই রবিবার গরুমারা ফরেস্টে পিকনিকের আয়োজন করেছি। আপনাকেও যেতে হবে কিন্তু।

বড়বাবুই বলেন — রবিবার তো ছুটি। চলে যান অমলবাবু। ওদিকে নতুন একটা রিসর্ট হয়েছে। ভেরি বিউটিফুল।

কথায় কথায় রাত হয়ে যায়। অমল বের হয়েছে। স্তব্ধ চারদিক। চাঁদের অলোও নেই। বেশ কুয়াশা রয়েছে চারিদিক। দেখে কারখানা ওদিক থেকে একটা ট্রাক আসছে। ওদিকে আলোয় দেখে অমল, ট্রাকে এসে উঠলো তোতারাম। ও বাইরেই ছিল। ট্রাকটা এত রাত্রে কারখানা থেকে বের হয়ে যাচ্ছে। তাতে রয়েছে বেশ কিছু বস্তা। সাধারণত চা যায় বড় বড় প্লাইউডের পেটিতে, বস্তায় নয়।

ট্রাকটা বের হয়ে গেল। অমল কি ভেবে ওই ট্রাকের পিছু পিছু চলতে থাকে হেডলাইট নিভিয়ে। ঠিক কোথায় যাচ্ছে ওরা তা জানা দরকার। চা বাগানের দীর্ঘ নির্জনপথ পার হয়ে ট্রাকটা এসেছে শহরের কাছে। ওদিকে একটা গুদামের কাছে এসে ট্রাকটা থেমেছে। দূর থেকে দেখছে অমল। গুদামের বাইরে আলোটা জ্বলে ওঠে। দেখা যায় তোতারাম গুদামের মধ্যেই ওই গাড়ি থেকে বেশ কিছু বস্তা নামানো করাচ্ছে তার লোকজনদের দিয়ে। অমল ব্যাপারটা দেখে এগোয় না। ফিরে আসে তার বাগানের বাংলোতে। সেই রাতেই অমল মিস্টার কোচারের বাংলোয়। কোচারই সব শুনে গাড়ি নিয়ে অমলের সঙ্গে বের হয়ে যায় দু-তিনজন সিকিউরিটিকে নিয়ে। তোতারামও যথারীতি ট্রাক বোঝাই তথাকথিত চা-এর বস্তাগুলো গুদামে নামিয়েছে। পার্টিও এসে গেছে। আজ রাতেই এই ক'দিনের আনা সব মালই পাচার করে দেবে। টাকা পয়সার লেনদেন হলেই মাল ট্রাকে চলে যাবে শিলিগুড়ি হয়ে কলকাতার দিকে।

এমন সময় হঠাৎ পুলিশ এসে তার গুদাম ঘিরে ফেলে। আর তোতারাম দেখে গুদামের দরজা দিয়ে ঢুকছে থানা অফিসার, পুলিশ নিয়ে সঙ্গে মিস্টার কোচার আর অমল। সারা গুদামে রয়েছে শুধু চায়ের

বস্তা। কোম্পানির নাম লেখা বস্তাগুলোতেই ওরা তথকথিত বাতিল বলে ভালো চা-ই পুরে এইভাবে পাচার করেছে। প্রায় দেড়শো বস্তা চা-ই এই দফায় আটক করে। এর আগে এইভাবে কত পরিমাণ চা ওরা পাচার করেছে কে জানে! পুলিশ তোতারামকেও এ্যারেস্ট করে আর দুজন শহরের মহাজনকেও চা সমেত থানায় নিয়ে যায়। গুদাম সিল করে পুলিশ পাহারা দেয়।

সকাল হতেই বাগানের খবরটা ছড়িয়ে পড়ে। বড়বাবুও ছুটে আসে অফিসে। সরখেল সেই রাতে একটু বেশী মাত্রায় মদ্যপান করেছিল। তবু জরুরী ফোন পেয়ে এসেছে অফিসে। শর্মাও এসেছে। শর্মা বলে,

—এইভাবে ওরা একটা চেন গড়েছিল।

মিস্টার কোচার বলেন,

—কারখানায় ডিউটি ছিল যার তিনি তো এসব দেখেননি। ভালো ভালো চা কে বাতিল করা হলো?

শর্মা বলে— এসব কথা মিস্টার সরখেলই বলতে পারেন। কাল উনিই চার্জে ছিলেন।

এবার বড়বাবুও বিপদে পড়েছে। এতদিন ধরে মিস্টার শর্মা, সরখেল, তোতারামদের চক্রের কাজকে সে সমর্থন করেছে। অবশ্য তার বিনিময়ে সেও অনেক কিছুই পেয়েছে। বেশ চলছিল তাদের দিন। অমল এসে পড়ে তাদের সেই সুখের সাম্রাজ্যে কাঁটা হয়ে উঠেছে।

গোবিন্দরাম এবার বুঝেছে অমলের পালেই হাওয়া লেগেছে। এখন কোচার অমলকে পুরোপুরি নির্ভর করেন। তাকেই এখন বাগান পরিচালনার বিভাগে এনেছেন। শর্মা আর সরখেলও এখন ভাবনায় পড়েছে। তারাও চেষ্টা করছে তোতারামকে জামিনে ছাড়িয়ে আনতে। যাতে তোতারাম পুলিশের সামনে মুখ না খোলে।

লালাজীও এবার বিপদে পড়েছে। এতদিন ধরে সে এই বাগানে রেশনের মাল ছাড়াও কোম্পানির চাহিদামত অন্যসব মালের যোগান দিয়েছে। সরখেল সাহেব ছিল ওইসব মাল কেনা, তার দাম মেটাবার চার্জে। লালাজী কোম্পানিকে তার চাহিদার অর্ধেক মাল দিয়েছে। তাও অনেক নিচু মানের। তার সাপ্লাই দেওয়া পচা চাল-গম নিয়ে দু একবার আন্দোলনও হয়েছে। তোতারামই সেই আন্দোলনকে ধামাচাপা দিয়েছে। লালাজী এইভাবে অর্ধেক বাজে মাল সাপ্লাই দিয়ে পুরো টাকাই পেয়ে গেছে সরখেলের জন্য। অবশ্য তার জন্য মিঃ সরখেল, বড়বাবু আর গুদামবাবুকে ভালো টাকাই প্রণামী নিয়মিত দিয়েছে সে।

এবার অমল সেই মালের সাপ্লাই-এর সময় নিজে দাঁড়িয়ে থেকে মাল চেক করে নেয় মালের পরিমাণ আর গুণমানও ঠিক নয়। সে পুরো মালই ফেরৎ দেয়। লালাজীও চটে ওঠে। এখন আর সরখেল সাহেবের হাতে নেই। লালাজীর মালও আসে না উলটে তোতারাম এবার শ্রমিকদের নিয়ে মিটিং মিছিল করে কোম্পানী তাদের রেশন দেয়নি বলে সোচ্চার হয়। কোচারও সব শুনে বললেন,

—মিস্টার সরকার, আমরা বাইরে থেকে নিজেরাই মাল দেখেশুনে পারচেজ করবো। তারই ব্যবস্থা করুন।

মালবাজারে আরও বড় বড় মহাজনও তৈরী হয়ে আছে। তারাই এবার এসে পড়ে আর তারাই ঠিকমত মালও সাপ্লাই করছে।

সেদিন রেশন দেওয়া হচ্ছে। শ্রমিকরাও দেখে যে তাদের পুরো মালই দেওয়া হচ্ছে আর চাল-গম-ডালও উৎকৃষ্ঠ মানের। ওরাও খুশি। তোতারামের দল অবশ্য প্রচার করছিল যে তার মালই নেয় না। কিন্তু ওইভাবে মাল দিতে দেখে কুলিরা নিজেরাই এগিয়ে আসে।

তোতারাম- সরখেলরা এবার প্রমাদ গণে। আর লালাজীও এবার বুঝেছে যে তার এতদিনের লুটপাটের ব্যবসা এবার চৌপাট হয়ে যাবে। চটে ওঠে লালাজী। রাতে ওরা সরখেলের বাংলোতেই জরুরী মিটিং-এ বসে। লালাজী বলে,

—সরখেলজী, কুছ করো। না তো হামি খুদ এসটেপ নিবে। হামার কারবার বন্ধ হয়ে যাবে। হামি ভি খামোস থাকবে না।

গোবিন্দরাম বিপদে পড়েছে এবার। এতদিন অমলকে নিয়ে সেও স্বপ্ন দেখেছিল। কোনমতে বিপাশার সঙ্গে বিয়েটা দিতে পারলে সে কন্যাদায় থেকে উদ্ধার পেতো। বসে বসে সে এখানে রাজত্ব করে এসেছে, সেটাও যেন আর থাকবে না। অমল আসার পর তারও সমস্যা বেড়েছে।

কোচার দেখেছেন অমল এর মধ্যে এতদিন ধরে চলে আসা বহু অনিয়মকে নিয়মের মধ্যে এনেছে। ফলে বহু লোকের স্বার্থ হানি হয়েছে। তারাও হয়তো চুপ করে থাকবে না। তাই কোচার বলেন,

— অমল একজন সিকিউরিটির লোককে দিচ্ছি তোমার সঙ্গে।

অমল বলে— না, না। ওসবের দরকার হবে না স্যার।

তবু কোচার বলেন,

—তুমি একটু সাবধানে থাকবে। সাবধানে চলাফেরা করবে।

বিপাশার ব্যাপারে এবার গোবিন্দবাবু অমলের সঙ্গে কথা বলতে চায়। এখন গোবিন্দবাবু অমলকে অনেকটা আপন করে নিয়েছে। গোবিন্দবাবুরও আমদানী কমেছে। তবু গোবিন্দবাবু ভেবে নিয়েছে মেয়ের বিয়ে দিতে পারলে তার অনেক বড় কাজই হবে। আর নিশ্চিন্তে চাকরী করতে পারবে তাই সে এখন শর্মা-সরখেলদের থেকে অমলকেই বেশী গুরুত্ব দেয়।

এর মধ্যে অমল সেদিন এসেছে গোবিন্দবাবুর বাড়িতে। গোবিন্দবাবু চা খেতে খেতে বলে কথাটা অমলকে,

-- আমি বাবাজী তাহলে তোমাদের ইয়ে মানে শুভ কাজের ব্যাপারটা সেরে ফেলতে চাই। বাগানের সবাই জানে তোমাদের ব্যাপারটা। তাই— অমল অবাক হয়— কিসের ব্যাপার?

এবার গোবিন্দবাবু বলেন,

— শুভ কাজের ব্যাপারটা। মানে তোমার সঙ্গে বিপাশার বিয়ের ব্যাপারটা। চমকে ওঠে অমল। এখানে আসে সে কাজের ব্যাপারেই। এসব কথা কোনদিনই ভাবেনি। অবশ্য দেখেছে বড়বাবুই বিপাশাকে এগিয়ে দিয়েছে। সে তাতে গুরুত্ব দেয়নি। আজ বুঝেছে অমল এটা গোবিন্দবাবুরই মতলব। গোবিন্দবাবু বলে,

—হ্যাঁ বাবাজী, বিপাশা সবদিক দিয়েই তোমার যোগ্য।

বিপাশার যোগ্যতার কথা— তার প্রসঙ্গে কোন কথাই অমল এতদিন ভাবেনি। তাই বলে,

— না-না, তা বলছি না। তবে আমি প্রমোশন না পাওয়া অবধি বিয়ের কথাই ভাবছি না।

গোবিন্দবাবু বলেন— ওটা হয়ে যাবে। কথায় বলে স্ত্রী ভাগ্যে ধন। বিয়ে থা করো। দ্যাখো তোমার ভাগ্য ঠিক বদলাবে। অমল স্ত্রীর ভাগ্য নিয়ে বেসাতি করতে চায় না। তাই বলে,

— এ ব্যাপারে আমাকে একটু ভেবেই যা করার করতে হবে।

তারপর উঠে পড়ে সে। এই স্বার্থপর লোকটাকে এতদিন তবু সহ্য করেছিল অমল। আজ যেন ওর সান্নিধ্য অমলের কাছে অসহনীয় হয়ে ওঠে। তাই বের হয়ে যায় সে।

বিপাশা সব কথাই শুনেছে আড়াল থেকে। সে ভেবেছিল অমল সাগ্রহে এই প্রস্তাবে সম্মতি দেবে। কিন্তু তার কাছে বিপাশা যে মোটেই প্রয়োজনীয় কিছু নয় সেটা যেন অমল নীরবেই জানিয়ে গেছে। বিপাশাও রেগে উঠেছে। সেই এবার বলে,

— বাবা, কেন এসব কথা ওকে বলে অপমানিত হতে গেলে!

গোবিন্দবাবুও রেগে গেছে অমলের এই জবাবে। এবার সেও বুঝেছে অমলকে হাতে আনা যাবে না। বরং গোবিন্দবাবুরও বেশ কিছু বেআইনী কাজের কথা ওসব ভুয়ো বিল পাশ করিয়ে দেবার ব্যাপারেই হয়তো অমলও এবার উঠে পড়ে লাগবে।

গোবিন্দবাবু বলে,

— নিজেকে যেন তালেবর মনে করে ওই ছেলেটা। ওর ডানা গজিয়েছে। ও জানে না যে ও ভীমরুলের চাকেই ঘা দিয়েছে।

বিপিনবাবু এই বাগানের পুরানো কর্মচারী। দেখেছে বিপিনবাবু এই বাগানে একটা অশুভ শক্তিই

তাদের চক্র গড়ে তুলেছে। নানাভাবে তারা বাগানের প্রচুর টাকা আত্মসাৎ করে বাগানকেই বিপন্ন করছে। নীরব দর্শকের মত এতদিন এসব দেখে এসেছে বিপিনবাবু। দেখেছে বিপিন চা শিল্পে আগে অনেক টাকা ছিল। দার্জিলিং-তরাই-অসমের চায়ের বাজার ছিল সারা পৃথিবীতে। তাদের তৈরী গ্রিন টি রাশিয়া-আফগানিস্থান-এর বাজারে একচেটিয়া ব্যবসা করতো।

ক্রমশঃ এই ব্যবসাতে অনেক অসাধু লোক এসে ভিড় করে নানাভাবে চুরি শুরু করেছে। চায়ের গুণগত মান নষ্ট করেছে সস্তায় মাল তৈরী করতে গিয়ে। ফলে বিশ্বের বাজারে এর চাহিদা কমেছে। এইভাবে চললে ক্রমশঃ এই চা শিল্পে নেমে আসবে সংকট। অনেক বাগান বন্ধ হয়ে যাবে। লাখ লাখ শ্রমিক বেকার হয়ে যাবে। এই বাগানেও সেই চক্রের থাবা পড়েছে। তবু অমল এসে এই বাগানের হাল ফিরিয়েছে। আর তাই করতে গিয়ে বিপিন দেখেছে অমলের শত্রু সংখ্যাও বেড়েছে।

অমলও বিপিনবাবুকে অন্য চোখে দেখে। সে মাঝে মাঝে আসে বিপিনবাবুর বাড়িতে উমার গান শুনতে। অমল দেখেছে এই সংসারের একটা নীরব প্রশান্তিকে। উমা এখানের স্কুলে পড়ায়। কাজটা অমলই দিয়েছে। উমা জানে তার যোগ্যতা কতটুকু। তাই সে এই চাকরী পেয়েই খুশী। সে বামন হয়ে চাঁদ ধরার স্বপ্ন দেখে না।

ওরাও জানে যে অমলের বিয়ে হবে বড়বাবুর মেয়ের সঙ্গেই। আর উমা নীরবে এটা যেন মেনেই নিয়েছে। তাই অমল এ বাড়িতে এলে উমা তার সঙ্গে একটা নীরব দূরত্বতেই সংযত হয়ে কথা বলে। অতিথি আপ্যায়নের ত্রুটিও করে না।

বিপিন সেদিন এসেছে অমলের বাংলোতে। অমল তার লেখাপড়ার কাজে ব্যস্ত। বিপিন বলে,

—স্যার, একটা কথা বলতাম।

চাইল অমল। বিপিন বলে,

—লালাজী-সরখেল সাহেবরা লোক ভালো নয়। ওদের আপনি চটিয়েছেন।

অমল বলে— না চটালে তো বাগানকেই ওরা সাফ করে দিত।

বিপিন বলে,

—একটু সাবধানে থাকবেন। ওদের মধ্যে কিঁ সব কথাবার্তা হচ্ছিল।

অমল বলে,

—ঠিক আছে। আর কিছু বলবেন?

বিপিন বলে— না স্যার।

অমল বলে,

—ঠিক আছে। ও নিয়ে আপনি ভাববেন না।

বিপিন বের হয়ে আসে।

এর ক'দিন পরই অমল ফিরছে মালবাজার থেকে। তখন রাত হয়ে গেছে। স্তব্ধতা নেমেছে বাগানে। দুদিকে ঘন সবুজ চা বাগান। বাইক নিয়ে আসছে সরু রাস্তা দিয়ে। হঠাৎ ঝোপের ভেতর থেকে দুজন লোক বের হয়ে এসে অমলের বাইকের কাছে এসে পড়ে। একজন এর মধ্যে লাঠি চালিয়েছে। লাঠিটা পড়েছে অমলের মাথায়। মাথায় হেলমেট ছিল তাই রক্ষে। তবে কাঁধের প্রচণ্ড আঘাতে ওর হাত টলে যায়। ফলে ছিটকে পড়ে সে। তবে এর মধ্যেই অমল লাফ দিয়ে উঠে সামনের লোকটাকে একটা ঘুসি মারতে সে ছিটকে পড়ে। আর তার হাতের রডটা তুলে সামনের লোকটার কোমরে সজোরে আঘাত করতে সে পাশের বাগানের মধ্যে পড়ে যায়। অন্যজনকে পিঠে একটা ঘা মারে। অমল এদিক ওদিক দেখে তার মোটর বাইক তুলে স্টার্ট দিয়ে বের হয়ে এল।

বাংলোয় এসে বুঝতে পারে কাঁধের আঘাতটা বেশ জোরেই লেগেছে। হাতটা ফুলে গেছে। আর হঠাৎ বাইক থেকে পড়ে গিয়ে হাঁটু-হাতও ছড়ে গেছে। ডাক্তারকেই ফোন করে অমল।

আর তারপরই খবরটা ছড়িয়ে পড়ে বাগানে। মিস্টার কোচারও আসেন অমলের বাংলোয়।

ডাক্তার তখন দেখছে অমলকে। বলেন তিনি,

— না, ফ্যাকচার হয়নি, তবে নাকে চোট লেগেছে। ওষুধ দিয়েছি। হাঁটু সাফ করে ওষুধ দিয়ে ব্যান্ডেজ করে দিয়েছি। দু-চারদিন রেস্ট নিন। সেরে যাবে। ওষুধপত্র দিয়ে ডাক্তার চলে যায়।

কোচার বলেন,

—আমিও এমন একটা কিছু হবে ভেবেই তোমাকে সিকিউরিটি নিতে বলেছি।

অমল বলে,

— তার দরকার হবে না স্যার। লোকদুটোকে যা মেরেছি, তাদেরও চোট ভালোই লেগেছে।

কোচার বলেন— কারা এসব করছে তা বুঝেছি। দেখি কি করা যায়।

শর্মা — সরখেলরাও এসেছে সহানুভূতি জানাতে। তাদের লোক যে অমলকে চোট করতে পারেনি, এতে তারাও খুশি হয়নি। তবু বলে,— অমল, আমরাও তদন্ত করছি। এসব কারা করেছে তা বের করবোই। মনে হয় তোতারামের লোকই এসব করেছে।

অফিসেও এনিয়ে নানারকম আলোচনা হয়। বড়বাবু মালবাবু খুশি হলেও মুখে অন্য কথা বলে।

— বাগানে এসব কি হচ্ছে?

বিপিন খবরটা শোনে মাত্র।

অমল বিছানায় শুয়ে আছে। হঠাৎ উর্মীকে ঢুকতে দেখে চাইল। জানলা দিয়ে এক ফালি রোদ এসে পড়েছে উর্মীর মুখে। উর্মী এগিয়ে এসে অমলের কপালে হাত রেখে বলে,

—একি! গা এত গরম! জ্বর এসেছে।

অমল উঠে বসতে যাবে, উর্মী বাধা দেয়,

—শুয়ে থাকুন। ডাক্তার ওষুধপত্র কি দিয়েছেন? ঠিকমত খাচ্ছেন তো? বেয়ারাও এসে পড়েছে। সে বলে,

— সাহেব সকাল থেকে চা ছাড়া আর কিছুই খাননি। উর্মী অবাক হয়। বলে বেয়ারাকে,

— তুমি টোস্ট আর দুধ গরম করে আনো।

অমল বলে— খিদে নেই একেবারে।

উর্মী বলে,— শুয়ে থাকুন তো! পরে দেখবো খিদে আছে কি নাই! অমল এতদিন দিনরাত বাগানে ঘুরেছে। কাজ করেছে নানা বিভাগে। রাত জেগে কারখানাতেও প্রডাকশন করেছে। ক'দিন এই বিশ্রাম নিয়ে ক্রমশঃ সুস্থ হয়ে ওঠে সে। এই ক'দিন সে দেখেছে চা বাগানকে তার বাংলোর ঘর থেকে। দেখেছে একটা মেয়ের নিঃস্বার্থ সেবা।

সেদিন উর্মী অমলের হাঁটুর ক্ষত দেখে বলে,

— যাক্, সেরে এসেছে। ওষুধটা লাগিয়ে দিই।

হঠাৎ গোবিন্দবাবুকে আসতে দেখে চাইল অমল। গোবিন্দবাবু দেখে উর্মীকে অমলের ঘরে সেবায়ত অবস্থায়। উর্মীকে অমল বলে— উর্মী, বড়বাবু এসেছেন! ওর জন্য চা—

গোবিন্দবাবু উর্মীকে এখানে দেখে চমকে উঠেছে। সে, অমল আহত হবার পর নতুন আশা নিয়ে আসা যাওয়া শুরু করেছে এখানে যাতে অমল তাকে কোনভাবেই সন্দেহ না করে। আর অমলের মতও সে এবার আদায় করবে। কিন্তু উমাকে এখানে দেখে এবার গোবিন্দরাম বুঝেছে যে তার আগেই বিপিন এখানে তার মেয়েকে পাঠিয়ে কাজ হাসিল করার চেষ্টাই পাকা হয়েছে। গোবিন্দবাবুর মনে হয়, ভালো একটা শিকার তার হাত ফসকে বের হয়ে গেল। আর তার জন্য গোবিন্দবাবুর রাগ হয় বিপাশার ওপরই। মেয়েটা নিজে এগিয়ে আসেনি। সেই সুযোগ নিয়ে সামান্য এক কেরাণী ওই বিপিনের মেয়েটা এখানে এসে জুটেছে।

বড়বাবু রাগে গজগজ করতে করতে বাড়ি ফেরে। আজ বিপাশার সঙ্গে তার একটা বোঝাপোড়া করতে হবে। কিন্তু বিপাশাকে বাসায় দেখতে পায় না। কাজের লোকটা বলে,

— দিদি বের হয় প্রায়ই।

গর্জে ওঠে গোবিন্দরাম— যায় কোথায় সে? দেখি, ফিরে আসুক এবার। দেখাচ্ছি তাকে—

মিস্টার কোচারও বসে নেই। মিস্টার আহুজা লন্ডন থেকে ফিরেছেন। তবে তার আগেই হেড অফিসে থেকে এবার বাগানের কয়েকজন স্টাফের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগের কথা পেড়েছে। আর তাদের উপর শাস্তির নোটিশও এসেছে কনফিডেনশিয়াল খামে। শর্মাকে বদলি করা হয়েছে অন্য বাগানে। আর সরখেলের বদলি করার অর্ডার এসেছে। সরখেল চালাক লোক। সে বেগতিক দেখে দু'মাসের দীর্ঘ ছুটি নিয়ে কলকাতায় চলে গেছে। শর্মা ভাবতেই পারেনি, তাকে রাতারাতি বদলি করে দেওয়া হবে। এই বাগান ছেড়ে চলে যেতে হবে তাকে। আর এতদিন এই বাগানে লুটপাট করেছে। তাই যাবার আগেও সে এখান থেকে খালি হাতে যাবে না। বিপাশার সঙ্গে তার মেলামেশাটা আগে থেকেই। অবশ্য এটাকে চাপা দিয়েছিল শর্মা। কারণ, তার জীবনে মেয়েদের প্রয়োজনটা ক্ষণিকের। তবু বিপাশা এই লোকটার দিকে বেশী ঝুঁকেছিল। তার পয়সার জন্য। অমল তাকে সেই ক্লাব-শহরের বিলাসের জীবনের সন্ধান দিতে পারবে না জেনেই বিপাশাও ওর দিকে এগোয়নি। এসব কথা গোবিন্দবাবুকে জানায় নি। জানলে, গোবিন্দবাবু মেয়েকে নিশ্চয়ই বাধা দিত। কারণ শর্মার ব্যাপারটা সে জানতো।

তাই শর্মার বদলির অর্ডার আসতে বড়বাবুও খুশি হয়। সরখেল বসে গেছে। শর্মা চলে যাচ্ছে। বড়বাবুর মনে হয় তাকে আর বাঁচবার জন্য কেউ থাকবে না। বড়বাবু তবুও স্বপ্ন দেখে বিপাশা চেষ্টা করলে অমলের জীবন থেকে উর্মীকে হটিয়ে নিজের ঠাঁই করে নিতে পারবে।

কিন্তু বিপাশা আর ফেরে না। সেই রাতের গাড়িতেই শর্মার সঙ্গে বিপাশা চলে গেছে বহু দূর আসামের সেই চা বাগানে বড়বাবুকে পিছনে ফেলে। আর বড়বাবুও যখন খবরটা পেল তখন বিপাশা-শর্মা ট্রেনে গৌহাটি ছাড়িয়ে ছুটে চলেছে ডিগবয়ের দিকে।

গোবিন্দবাবুর মনে হয় জীবনে এতবড় আঘাত সে আগে পায়নি। বিপাশা যে এইভাবে ওই শয়তান শর্মার সঙ্গে দেশান্তরী হবে তা ভাবতেও পারেনি কোনদিন। আজ গোবিন্দবাবুর রাগটা পড়ে শর্মা-সরখেলের উপর। নিজের উপরও। বড়বাবুও কিছু বেআইনী কাজে মদত দিয়েছে। আর তারা কোম্পানিকে যেমন প্রতারণা করেছে, তেমন ভাবেই প্রতারিত করছে গোবিন্দবাবুকে। তারা গোবিন্দবাবুর মেয়েরও সর্বনাশ করেছে। ওই শয়তানদের সহযোগিতার মূল্যই দিতে হচ্ছে তাকে।

মিস্টার আহুজা ফিরে এসেছেন। তিনি মিস্টার কোচার আর অমলকে ডেকে পাঠিয়েছেন তার বাংলোয়। পাহাড়ের উপর সুন্দর বাংলো। পাহাড়ের গা বেয়ে রাস্তাটা দিয়ে গাড়িতে করে আসছে মিঃ কোচারের সঙ্গে। অমল বলে,

— আমাকে ডাকলেন কেন মিস্টার আহুজা?

ব্যাপারটা জানে কোচারও। বাগানে নানা গোলমালের পর শান্তি নেমেছে। এর মধ্যে তোতারামের সেই শ্রমিকরা আন্দোলনও থামিয়েছে। মিস্টার কোচার বলে,

—চলো, গিয়েই শুনবো কি বলেন তিনি।

সুন্দর ড্রইংরুমে বসেছে ওরা। জানালা দিয়ে দেখা চা বাগান আর ওদিকেই আকাশ ছোঁয়া পাহাড়। মেঘগুলো ওই পাহাড়ের ওদিক থেকে ভিড় করে আসছে। মিস্টার আহুজা বলেন,

—মিস্টার কোচার, আমাকে কলকাতায় গিয়ে হেড অফিসের চার্জ নিতে হবে। তাই এখানের চা বাগানের চার্জ তোমাকেই নিতে হবে। তুমিই হবে এখানের এজেন্ট।

মিস্টার কোচারও ভাবতে পারেনি যে তার ভাগ্যে এমন লোভনীয় পদ, এই সুন্দর বাংলো জুটবে। মিস্টার আহুজা বলেন,

— মিস্টার সরকার, তোমাকে মিস্টার কোচারের চার্জ নিতে হবে। অমল ভাবতেই পারেনি যে সে এতবড় একটা বাগানের চার্জ পাবে। আহুজা বলেন,

— আমি তোমার এতদিনের সব কাজকর্ম দেখেছি। আমার বিশ্বাস যে তুমি ঠিক এই দায়িত্ব নিতে পারবে। মিস্টার কোচার তো কাছেই থাকলেন। এনি প্রবলেম কাম টু মি।

অমল বলে— ধন্যবাদ স্যার। আমি চেষ্টা করবো এই বাগানকে ঠিকমত চালাতে।

আহুজা বলেন,

—আমি জানি তুমি পারবে। বেষ্ট অব্ দি লাক!

কথাটা বাগানে ছড়িয়ে পড়ে। আজ এতদিন পর এই বাগানের দিন ফিরেছে। এখন তাদের প্রডাকশনও ঠিকমত হচ্ছে আর তাদের চা এখন বাজারে চড়া দাম পাচ্ছে গুণগত মানের জন্য। প্রডাকশনও বেড়েছে।

বাগানের স্টাফরাও খবরটা পেয়ে গেছে। এই ক'বছরেই অমল এখন শ্রমিকদের মহলে সুনাম অর্জন করেছে। দেখেছে তারা এই তরুণকে শ্রমিকদের সুখ-দুঃখে ভাগীদার হয়ে কাজ করেছে। এদেরকে ওই তোতারামের মত শয়তান নেতার হাত থেকে উদ্ধার করেছে। এখন এরা পুরো রেশন পায়। বিনা পয়সায় চিকিৎসা পায়। জল-বিদ্যুৎ পায় বাসায়।

এরাও তাই খুশি হয়ে শ্রমিকদের ধাওড়ায় নাচগানের আয়োজন করেছে।' নতুন ম্যানেজারের আপ্যায়নের জন্য। আর সবচেয়ে খুশী হয় বিপিন। বিপিনও খবরটা শুনেছে। অমল এবার ম্যানেজারের বাংলোয় যাচ্ছে। এসেছে আরও কয়েকজন নতুন সহকারী ম্যানেজার ওই শর্মা-সরখেল-অমলের জায়গায়।

অমলও আজ মনস্থির করে ফেলেছে। এখন সে উঠে এসেছে ম্যানেজারের বাংলোয়। সুন্দর বাগান ঘেরা বড় বাংলোতে এনেছে কলকাতা থেকে তার মা-বৌদিকে। বিপিনও এসেছে উর্মীকে নিয়ে। উর্মীও এগিয়ে এসে প্রণাম করে অমলের মা বৌদিকে। ডাগর দুচোখে একটা শান্তশ্রী।

— তুমি তাহলে উর্মী!

অমলের বৌদি বলে— মা, অমল ওকে চিনতে ভুল করেনি। মা বলে,

— তাই তো তোমাকে নিতে এসেছি মা আমার ঘরে। যাবে তো? বিপিনবাবু, আপনার অমত নেই তো?

বিপিন যেন কথাটা বিশ্বাসই করতে পারে না। তাই বিড়বিড় করে বিপিন,— কি বলছেন মা? সামান্য কেরানীর মেয়ে হবে এতবড় চা বাগানের ম্যানেজারের বৌ।

অমলের মা বলে— উমাও তো সাধারণ মেয়ে নয় বিপিনবাবু! সেই যোগ্যতা ওর আছে।

বাগানে খবরটা ছড়িয়ে পড়ে। সকলেই খুশি হয়। বড়বাবুও শোনে খবরটা। আজ মনে হয় গোবিন্দরামের কোম্পানি তাকেও বদলির অর্ডার দিয়ে এখান থেকে সরিয়ে দিলে সে খুশীই হতো। নিজের এতবড় দুর্ভাগ্যকে এইভাবে মেনে নিতে তার কষ্ট হয়।

সন্ধ্যা নামছে। কুলি ধাওড়ায় মাদল-বাঁশির সুর ওঠে। চা বাগানে ওঠে খুশীর সুর।

স্বপ্নের ঠিকানা

অর্ক বাবা-মা'র উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শুনে জেগে ওঠে। বাংলোর ওদিকের ঘরে শুয়ে ছিল সে। রাত অবধি পড়াশোনা করেছে। সামনেই বি. এ. ফাইনাল পরীক্ষা। তার বাবা চান, অর্ক পাশ করে বিজনেস ম্যানেজমেন্ট পড়ুক।

অর্কর বাবা বিমলবাবু ইঞ্জিনিয়ার। কলকাতার বনেদি বংশের মানুষ তিনি। উত্তর কলকাতায় নামী পরিবার ওঁরা। বিমলবাবুর বাবাও ছোটোখাটো একজন শিল্পপতি। তবে বিমলবাবু পারিবারিক কারখানার কাজে না গিয়ে নিজের যোগ্যতায় একটা বড় কোম্পানিতে অ্যাসস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারের চাকরি করছেন, আর কোম্পানির বাংলোতেই রয়েছেন। অর্ক যখন ছোট, বিমলবাবু তখন কলকাতায় পারিবারিক কারখানাতেই কাজ করতেন। থাকতেন কলকাতার তাঁদের সাবেকি বাড়ির যৌথ পরিবারে। অর্কর সঙ্গীও অনেক ছিল। সে তার খুড়তুতো ভাইবোনদের সঙ্গে লেখাপড়া করত, খেলাধুলো করত। বিমলবাবুর স্ত্রী অঞ্জলির এই যৌথ পরিবারে থাকার ইচ্ছে ছিল না। অঞ্জলি লেখাপড়া জানা আধুনিকা মহিলা। তিনি তাঁর স্বামীকে বললেন, "এই হাটের মধ্যে বাস করা যায় না, তুমি অন্য কোথাও চাকরির চেষ্টা করো। বাইরের কোনও কারখানায় চাকরি পেলে আমরা সেখানে গিয়ে বাংলোয় থাকতে পারব, অর্কর পড়াশোনার সুবিধে হবে, তা ছাড়া কী-ই বা দেয় তোমাকে?"

কথাটা এবার ভাবছেন বিমলবাবুও। এত দিন তাঁর নিজের চাহিদাও ছিল অনেক কম। এখন তাঁর স্ত্রী-পুত্র রয়েছে। অর্ককে তিনি নিজের মনের মতো করে মানুষ করে তুলবেন। এত বড় এই বাড়িতে অঞ্জলির কোনও স্বাধীনতাই নেই। এখানে শাশুড়ি সাবিত্রীদেবী আর কাকিমাও আছেন দু'জন। এই যৌথ পরিবারে অঞ্জলি নিজের যোগ্যতা প্রমাণের কোনও রাস্তায় খুঁজে পান না। ওঁদের নির্দেশ মেনেই চলতে হয়। আর বিমলবাবু যা হাতখরচ দেন, তা নিয়েই খুশি থাকতে হয় অঞ্জলিকে, যেটা অঞ্জলি মেনে নিতে পারেন না। তাই তিনি চান, তাঁর স্বামী অন্যত্র চাকরি নিয়ে এই বিরাট সংসার ছেড়ে, নিজের আলাদা সংসার গড়ে তুলুন। বিমলবাবুও ভাবেন, তাঁদের নিজেদের এই কারখানায় যথাযথ মাইনে তিনি পান না। বাবা-দাদারা যা দেন, তা এমন কিছু বেশি নয়। তাই অঞ্জলির ঘর ছেড়ে যাওয়ার কথাটা নিয়ে এখন ভাবছেন তিনি।

সুযোগও এসে যায়। কল্যাণীর একটা বড় কারখানা থেকেই ডাক আসে। মাইনেও ভাল দেবে, আর তাঁর থাকার জন্য কারখানার কাছেই আছে সুন্দর বাংলো।

অঞ্জলি বললেন, "চলো, এক রবিবার দেখেই আসি কারখানাটা। আর কর্তাদের সঙ্গে কথাও বলবে। যদি পছন্দ হয়, ওখানেই কাজ নেবে।" অঞ্জলিই বিমলবাবুকে নিয়ে আসেন কল্যাণীতে। তাঁর উদ্দেশ্য বাংলোটা দেখা। সেইসঙ্গে তিনি দেখবেন এখানকার পরিবেশও। অঞ্জলি চান কলকাতার ওই বন্দিশালা থেকে মুক্তি পেতে। তিনি স্বাধীনভাবে গড়ে তুলবেন তাঁর নিজের সংসার। বিমলবাবু আর অঞ্জলির পছন্দ হয় বাংলোটা। বিমলবাবু দেখেছেন, এই কারখানায় তাঁর স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ আছে। মাইনেও ভাল। অন্য সব সুযোগসুবিধেও আছে। তাই বিমলবাবু রাজি হয়ে যান। আর অঞ্জলিও স্বামীর এই সুমতি দেখে খুশি হন।

খুশি হতে পারে না অর্ক। সে স্কুলে পড়ছে। বাড়িতে খুড়তুতো ভাইবোনদের সঙ্গে তার একটা পারিবারিক মেলবন্ধন গড়ে উঠেছে। স্কুলের পরিবেশও ভালই। আর দাদু নির্মলবাবু ও ঠাকুরমা

সাবিত্রীকে ছেড়ে যেতে তার মন চায় না। সকলকে নিয়ে, সকলের সঙ্গে সে বাঁচতে চায়। কিন্তু আজকের সভ্যতার ধারাটাই বোধ হয় এরকম। এখানে সকলেই নিঃসঙ্গ। নিজেদের মনের অতলে অনেক পাওয়ার স্বপ্নটাই মানুষকে একমুখী, নিঃসঙ্গ করে তুলেছে। বিমলবাবু আর অঞ্জলিও সব কিছু পেতে চান। আর সেজন্য অর্ককে যেতে হল কলকাতার এই যৌথ পরিবারের পরিবেশ ছেড়ে নিঃসঙ্গ এলাকায়।

অবশ্য নির্মলবাবু বলেছিলেন, "বিমল তোমরা যাচ্ছ যাও। তবে অর্ক না হয় আমাদের কাছে থেকেই স্কুলের পরীক্ষাটা দিক।" অঞ্জলি বলেছিলেন, "ওখানকার স্কুলে কথা বলেছি বাবা। স্কুল কর্তৃপক্ষ অঙ্কের মার্কস্ দেখে ওখানকার সেমেস্টার মেনেই ওকে ভর্তি নিতে রাজি হয়েছেন। পরে হয়তো এই সুযোগ না-ও আসতে পারে। তাই অর্ককে নিয়ে যেতে চাই।" নির্মলবাবু চুপ করে যান। তিনি প্রাচীনপন্থী। তবে আজকের এই সভ্যতাকে মেনে নিয়েছেন। তাই অঞ্জলির কথায় আর প্রতিবাদ করলেন না। কলকাতা ছেড়ে এই নির্জন বাংলোয় এসেছে অর্ক। বাংলোটা বেশ খানিকটা এলাকা নিয়ে। চার দিকে এর সীমা-প্রাচীর। তবে বাংলোর ওই সীমা-প্রাচীর যেন বাংলোর মানুষগুলোকে বাইরের জগৎ থেকে আলাদা করে দিয়েছে। নতুন স্কুলে গিয়েছে অর্ক। সেখানে অপরিচিত মুখের ভিড়। অর্ক দেখেছে, এই মুখগুলোয় তার কলকাতার বন্ধুদের মুখের মতো অভিব্যক্তি নেই। ওরা বিচিত্র চাউনিতে দেখছে অর্ককে। বাবার গাড়িতে প্রথম দিন স্কুলে এসেছে অর্ক। গাড়ি থেকে তাকে নামতে দেখেছে অনেক ছাত্র। তাই বোধ হয় ওই সাধারণ ছেলেরা কেমন যেন এড়িয়ে যায় অর্ককে। তবু অর্ক তাদের সঙ্গে মিশতে চায়। তবে ওদের দিক থেকে তেমন সাড়া মেলে না।

অর্ককে পড়াতে বাংলোতেই আসেন টিউটর। দু'জন টিউটর তার সকাল-সন্ধেটা যেন কেড়ে নিয়েছেন। তবু বিকেলে স্কুল থেকে ফিরে তাদের বাংলোর সামনের মাঠে বেশ কিছু ছেলেকে দেখে অর্ক বাংলো থেকে বের হয়ে আসে। সেও ওদের দলে ভিড়ে হইচই করে ফুটবল খেলে।

বিমলবাবু কারখানা থেকে বাংলোয় ফেরেন ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত হয়ে। কারখানার অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার তিনি।

বিমলবাবু দ্যাখেন, অঞ্জলি নেই। বাড়ির কাজের লোক বলল, "স্যার, আমি চা-জলখাবার আনছি। মেমসাহেব ক্লাবে গিয়েছেন।"

বিমলবাবু বোঝেন, অঞ্জলি এখানে এসে যেন একটু বেশি স্বাধীন হয়ে উঠেছেন। ক্লাব থেকে যখন বাড়ি ফেরেন, তখন রাত ন'টা বেজে যায়, রাতের অন্ধকার নামে। কলকাতার বাড়িতে অঞ্জলি এত রাত অবধি বাইরে থাকতেন না। এখানে এসে অঞ্জলি কেমন যেন বদলে গিয়েছেন, "এত রাত অবধি ক্লাবে কী হয়?" অঞ্জলি বললেন, "রামি খেলি। আজ কত জিতেছি জানো? সেভেন্টি টু রুপিজ, বাহাত্তর টাকা! মিসেস রায় তো তিনশো টাকা হেরে গিয়েছেন!"

বিমলবাবু অবাক হলেন, " সে কী! ক্লাবে জুয়া খেলাও হয় নাকি! এরপর তো এক-আধ পেগ হুইস্কিও খাবে!"

অঞ্জলি বললেন, "ছেলেরা খেলে দোষ হয় না, মেয়েদের বেলাতেই যত দোষ! ভয় নেই,ওটা ধরব না। নিশ্চিন্তে থাকতে পারো।"

অর্কও দ্যাখে, রাতে ডিনারের সময় মা থাকেন না। মা তখন ক্লাবে তাস খেলছেন। কাজের লোক খাইয়ে দেয়।

বিমলবাবু বললেন, "অর্ক, খেয়েদেয়ে একটু পড়াশোনা করে শুয়ে পড়ো। গুড নাইট। " অর্ক মাকে সঙ্গী হিসেবে পায় না। তার সন্ধেটা খুবই বিশ্রীভাবে কাটে। একা-একা। বাবারও সময় নেই। তবু বিকেলে মাঠে খেলার মধ্যে দিয়ে সময় কেটে যায়।

কিন্তু সেদিন অঞ্জলি আবিষ্কার করলেন, অর্ক ওই মাঠে কিছু বস্তিবাসী, কিছু খুবই সাধারণ বাড়ির ছেলেদের সঙ্গে ফুটবল খেলছে। অঞ্জলি ব্যাপারটা দেখে চমকে উঠলেন। এটা তিনি একবারেই পছন্দ করেন না।

সেদিন বিকেলে বাড়ি ফিরেছে অর্ক। অঞ্জলি বললেন, "ওই মোস্ট অর্ডিনারি ঘরের ছেলেদের সঙ্গে খেলবে না মাঠে।"

অর্ক অবাক হল। ওরাও যে আলাদা নয়, তা মনে হয়েছে অর্কর। অর্কও সহজভাবেই মিশেছে ওদের সঙ্গে। অর্ক বলল, "কেন, ওরা কি আলাদা?"

তবুও ওই সাধারণ ছেলেদের কাছে যাওয়াটা বন্ধ করে দিয়েছেন ওর মা, আভিজাত্যের দোহাই দিয়ে। সব কেমন যেন বিশ্রী লাগে অর্কর। স্কুলে পড়াশোনা, বাংলোর বাগানে একা-একা ঘোরা— এই নিঃসঙ্গ জীবনে অর্কর ভাবনাচিন্তাগুলোও কেমন যেন বদলে যায়। মা যেন তাকে আটকে রেখেছেন এই বাংলোর দেওয়ালের মধ্যে।

২

নতুন কারখানায় কাজ করছেন বিমলবাবু। এখানে কাজের পরিধিও অনেক। সম্প্রতি তিনি প্রোমোশন পেয়ে প্রোডাকশন ম্যানেজার হয়েছেন। তাঁকে সহযোগিতা করে তাঁর পি এ জুঁই চ্যাটার্জি। মেয়েটি বেশ ভদ্র ও সাবধানি। এই পোস্টে সে চার বছর ধরে কাজ করছে। বিমলবাবু আসার আগে থেকেই সে এখানে কাজ করছে। তার নজর সব দিকেই। সুন্দর, হাসিখুশি মেয়ে। সাপ্লায়াররাও হাত করার চেষ্টা করে, যাতে তারা নিরাপদে তাদের মাল সাপ্লাই করতে পারে। কিন্তু ওই মহিলাকে বাগে আনতে পারেনি।

জুঁইই সব মাল নিজে চেক করে নেয়। সেদিন এক সাপ্লায়ার বিল পাশ করতে এসেছে স্টোরে। আড়াই লক্ষ টাকার বিল। জুঁই সেদিন অফিসে আসেনি। বিমলবাবুও ব্যস্ত। একটা মেশিন ব্রেক ডাউন হয়ে গিয়েছে। সেটা সারিয়ে তোলা হচ্ছে। বিমলবাবু সেখানেই রয়েছেন। সাপ্লায়ার ভবতোষবাবু বিমলবাবুর অফিসে এসে ধরনা দিয়ে বসে আছেন। তাঁর বিলটা আজ সই করে দিতে হবে। তাঁকেও আজ বড় পেমেন্ট করতে হবে। বিমলবাবুর হাতে এখন অনেক কাজ। তিনি নিজেও হাত লাগিয়েছেন কাজে।

বিমলবাবু বললেন, "আজ সই করা হবে না। এই মেশিন নিয়ে এখন ব্যস্ত। সারাই হতে-হতে সন্ধে হয়ে যাবে। কাল ফার্স্ট আওয়ারে এসে পেমেন্ট নেবেন।"

পরদিন ফার্স্ট আওয়ারে বিমলবাবু অফিসে এসেছেন। দেখলেন, ভবতোষবাবুও এসে হাজির। জুঁইও এসে পড়েছে।

বিমলবাবু বললেন, "মিস চ্যাটার্জি, ওঁর একটা বিল আছে। একটু ভেরিফাই করে দিন।"

জুঁই বিলটা হাতে নিয়েই চমকে উঠল। স্টোর ডিপার্টমেন্টের কাগজপত্রগুলো দেখে তার সন্দেহ হল। ফাইল দেখল, এই বিল আগেই পেমেন্ট হয়ে গিয়েছে। ভবতোষবাবু কাগজপত্র জাল করে আবার পেমেন্ট নিতে এসেছেন। স্টোর থেকেও সেই রিপোর্টই পাওয়া গেল। চমকে উঠলেন বিমলবাবু। বললেন, "সে কী! এভাবে কোম্পানিকে চিট করে ডাবল পেমেন্ট নিতে এসেছেন!"

জুঁই বলল, "ওঁর সব বিল আমি চেক করব। এর আগেও হয়তো এই কাজ করেছেন, তাই ওঁর কারেন্ট বিলও পেমেন্ট হবে না।"

এবার ভবতোষবাবু বললেন, "ঠিক বুঝতে পারছি না। পেমেন্ট হয়ে গিয়েছে! আমার লোকরাই হয়তো ভুল করেছে!"

বিমলবাবুও এবার জুঁইয়ের উপর নির্ভরশীল হয়ে উঠেছেন। আজ এত বড় সর্বনাশের হাত থেকে জুঁইই তাঁকে বাঁচিয়েছে।

সৌদি আরবের দু'টো বড় কোম্পানি এবার অনেক যন্ত্রের অর্ডার দিতে চায়। তাদের কয়েকটা তেল শোধনাগারের জন্য যন্ত্রপাতি তৈরি করাতে চায়। এখন তারা নামী কোম্পানির পরিকাঠামো, তাদের অভিজ্ঞতা ইত্যাদির সম্পর্কে অনেক খোঁজখবর নিতে চায়। কারখানার ডিরেক্টররাও চান যে,

ওই অর্ডার তাঁদের কারখানায় আসুক। তাঁরা তাই বিমলবাবুকেই দায়িত্ব দিলেন প্রোজেক্ট রিপোর্ট তৈরি করার।

৩

কারখানার কাজের পর বিমলবাবু নিজের বাংলোয় নিয়ে আসেন জুঁইকে। অর্ক উচ্চ মাধ্যমিক দেবে। জুঁই এম. এ. পাশ করেছে আগেই। তারপর এই চাকরিতে এসেছে। তার আগে একটা স্কুলে শিক্ষকতাও করেছে কিছুদিন। তার সেই শিক্ষকতার স্বভাবটাও এখনও কিছুটা রয়েছে।

জুঁই অর্ককে বলল, "ইংরেজিতে কী-কী প্রশ্ন আসতে পারে?"

অর্ক বলল, "যে প্রশ্নগুলো আসতে পারে, সেগুলোর উত্তর তৈরি করে পড়ছি।"

জুঁই বলল, "শুধু পড়লেই হবে না, লেখার অভ্যেসও করো। আর উত্তর দিতে হবে টু দ্য পয়েন্ট।"

বিমলবাবু বললেন, "দরকার হলে ওঁকে দেখিয়ে নেবে। মিস চ্যাটার্জি তো সাত নম্বর কোয়ার্টারে থাকেন। ওখানে চলে যাবে।"

জুঁই বলল, "তা হলে চলে এসো ছুটির দিনে।"

অঞ্জলিও এম. এ. পড়েছেন । তিনিও শুনলেন জুঁইয়ের কথাগুলো। ওই সুন্দরী মেয়েটাকে কেমন যেন ভাল লাগে না অঞ্জলির। বিমলবাবুর মুখে এর আগেও জুঁইয়ের কথা শুনেছেন অঞ্জলি। ক'দিন ধরে রাত দশটা অবধি ওঁরা বাংলোয় বসে কাজ করেছেন।

অঞ্জলিও এর আগে এই সময় যেতেন ক্লাবে। সেখানে অন্য মেয়েদের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে, তাস খেলে সময় কেটে যেত। ফিরতেন রাতে। বিমলবাবু দেখলেন, অঞ্জলি ক'দিন আর ক্লাবে যায় না।

সেদিন বিমলবাবু জুঁইকে নিয়ে মন দিয়ে কাজ করছেন। জুঁইও খরচের হিসেব করছে। বিমলবাবু তাকে কিছু নির্দেশ দিচ্ছেন। অঞ্জলি দেখলেন ওঁদের। দু'জনে যেন তন্ময় হয়ে কাজে ডুবে রয়েছেন। অর্কও শুনতে পায় পাশের ঘর থেকে জুঁই আর বিমলবাবুর গলার আওয়াজ। বাবা-মাকে একসঙ্গে বসে কখনও গল্প করতে দেখেনি অর্ক। বাবা সকালেই কারখানায় চলে যান। দুপুরে লাঞ্চ করতে আসেন। স্নান করে খেয়েদেয়ে বের হয়ে যান। আবার সন্ধের সময় ফেরেন। মা তখন ক্লাবে। তাঁদের দু'জনের জীবনে যেন নিভৃত মুহূর্ত বলে কিছু নেই, নেই হাসির সুর। অঞ্জলি দেখছেন ক্লাবের মিসেস মুখার্জিকে। তাঁর স্বামী মিঃ মুখার্জিও এই কারখানারই ইঞ্জিনিয়ার। তিনি দ্বিতীয়বার অন্য একটি মহিলার প্রেমে হাবুডুবু খেয়ে মিসেস মুখার্জিকে ত্যাগ করে অন্যত্র ঘর বেঁধেছেন। অঞ্জলিও তাই সাবধান হতে চান।

বিমলবাবু বললেন, "অঞ্জলি, আজ রাতে জুঁই ডিনার খেয়ে যাবে। আজ একটু বেশি রাত অবধি কাজ করলেই কাগজগুলো তৈরি হয়ে যাবে। কালই সাবমিট করব।"

জুঁই বলল, "আমি ফিরে গিয়ে ক্যান্টিনেই খেয়ে নেব।"

অঞ্জলিও তাই চান। কিন্তু বিমলবাবু বললেন, " না, না, আমরা খাব আর তুমি বসে থাকবে,তা হয় না। এখানেই খাবে। অঞ্জলি, তুমি নিজে সেই স্পেশ্যাল চিলি চিকেনটা বানাও।"

অঞ্জলি না বলতে পারেন না। ওই মেয়েটার জন্য তাঁকে রান্না করতে হবে! কিন্তু করার কিছু নেই। অঞ্জলি মুখ বুজে কিচেনে গিয়ে ঢুকলেন। সেদিন অঞ্জলি মার্কেটিং করতে গিয়েছেন। এখানকার বাজার ওই এলাকার মানুষের মিলনক্ষেত্র। অঞ্জলি হঠাৎ একটা ডাক শুনে তাকালেন। তাঁর কলেজের বন্ধু সন্দীপ। দোকানের বাইরে বের হচ্ছেন তিনি, হঠাৎ দেখা হয়ে গেল ওই বন্ধুর সঙ্গে। কলেজে দু'জনের মধ্যে বেশ কিছুটা ঘনিষ্ঠতাও গড়ে উঠেছিল। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডি পার হওয়ার পর অঞ্জলির বিয়ে হয়ে যায়। অঞ্জলি সেই পুরনো বাড়ির বন্দিশালায় আটকে পড়েন। তারপর কলকাতা থেকে চলে আসেন কল্যাণীর এই বাংলোয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই দিনগুলোও হারিয়ে যায় অঞ্জলির মন থেকে।

কিন্তু সময় বসে থাকে না। অঞ্জলির জীবনে যেমন পরিবর্তন এসেছে, তেমনই এসেছে সন্দীপের জীবনেও। এখন সন্দীপ এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হয়ে এসেছেন, আর তাঁর জীবনবৃত্তের পরিধির মধ্যে হঠাৎ এসেছেন অঞ্জলি। সন্দীপ বললেন, "তুমি এখানে?" সন্দীপ দেখছেন অঞ্জলিকে। এখন অঞ্জলি বিবাহিতা। তবু অতীতের কিছু স্মৃতি এখনও তাঁর মনে রয়ে গিয়েছে। সন্দীপ বললেন, "এখানকার ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক হয়ে এসেছি। রয়েছি ইউনিভার্সিটির কোয়ার্টারে। তুমি এখানে?"

অঞ্জলি বললেন, "আমার স্বামী এখানকার স্টিল ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানির প্রোডাকশন ম্যানেজার। তাই এখানে উঠেছি। তিন নম্বর কোয়ার্টারে আমরা থাকি। কত দিন পরে দেখা হল...!"

সন্দীপ বললেন, "পৃথিবীটা সত্যিই খুব ছোট অঞ্জলি। দেখা আমাদের হবেই, তা আমিও জানতাম। যাক, শেষে দেখা হল! তা, এম. এ. করে কিছু করছ না? একেবারে বাধ্য হাউজ ওয়াইফ হয়েই রইলে! মেয়েরা অবশ্য এই অধিকার পেলে আর কাজকর্ম করতে চায় না।" অঞ্জলি সন্দীপকে বললেন, "তেমন চাকরি আর পেলাম কই? তাই বাড়িতে বসে হাতা-খুন্তি নিয়েই ব্যস্ত থাকতে হয়েছে।"

সন্দীপ বললেন, "সে কী! তুমি তো ইংরেজিতে এম. এ. করেছ, ছাত্রী হিসেবেও ভাল!"

"এম. এ-তে হাই সেকেন্ড ক্লাস পেয়েছি," অঞ্জলি বললেন।

সন্দীপ বললেন, "চাকরি করবে? একটা মেয়েদের স্কুলে ইংরেজি শিক্ষিকার দরকার। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছেই এই স্কুল।" অঞ্জলি যেন হাতে চাঁদ পেলেন। তাঁর সেই বিদ্রোহী মনও এতে সাড়া দিল।

সন্দীপ বললেন, "কালই একটা দরখাস্ত, আর তার সঙ্গে সার্টিফিকেটের জেরক্স কপি দিয়ে যাও। কাল সন্ধেয় আমি বাড়িতে থাকব। তখন এসো, দেখা হবে। তারপর দেখি, তোমার জন্য কিছু করা যায় কি না।"

অঞ্জলি এবার তাঁর মনকে তৈরি করছেন।

তিনিও এবার অর্থনৈতিক স্বাধীনতা পেতে চান। বিমলবাবুর পায়ের নীচে তিনি আর থাকবেন না। ইউনিভার্সিটির ক্যাম্পাসে এসে অঞ্জলি ঠিক খুঁজে বের করেছেন সন্দীপের কোয়ার্টার। সুন্দর একটা দু'কামরার ঘর। সন্দীপও যেন ওঁর জন্যই অপেক্ষা করছিলেন। সন্দীপ বললেন, "এসো। কাগজপত্র সব এনেছ? দাঁড়াও, চা দিতে বলি। ব্যাচেলরস কোয়ার্টার, বুঝতেই তো পারছ।" সন্দীপ কাগজপত্র নিয়ে বললেন,"এই আমার ফোন নম্বর। দিনসাতেক পর খবর নিও। আর তোমার ফোন নম্বরটা দাও। এর মধ্যে কোনও খবর হলে আমি জানিয়ে দেব।"

অঞ্জলি ওঁর ফোন নম্বর দিলেন।

৪

বিমলবাবু কারখানায় ওয়ার্কার, স্টাফ, বোর্ড অফ ডিরেক্টর আর বিদেশি সেই প্রতিনিধিদের সামনে তাঁদের কারখানার বিভিন বিষয় নিখুঁত ভাবে পেশ করছেন। প্রতিটি পয়েন্ট তাঁরা মন দিয়ে নোট করছেন। বিমলবাবু তাঁদের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন। বিদেশি প্রতিনিধিরা খুশি হলেন তাঁর জবাবে। তাঁরাই বললেন, "তা হলে কালই আমরা কনট্র্যাক্ট সই করতে চাই, যাতে আপনারা কাজ শুরু করতে পারেন। তিন মাসের মধ্যে মাল সাপ্লাই দিতে হবে।" ম্যানেজিং ডিরেক্টর বললেন, "তার জন্য ভাববেন না। আমরা তার মধ্যেই আপনাদের সাপ্লাই দিতে শুরু করব। কী, মিঃ রায়?" বিমলবাবু সায় দিয়ে বললেন, "ইয়েস স্যার।" জুঁই অপেক্ষা করছিল অফিসে। বিমলবাবু বললেন জুঁইকে, "তোমার প্রোজেক্ট রিপোর্টের জন্যই কোম্পানি এত বড় অর্ডারটা পেয়ে গেল। চার কোটি টাকার অর্ডার। আর মাল ঠিকমতো সাপ্লাই দিতে পারলে আরব থেকে আরও দু'-তিনটে বড় অর্ডার আসবেই। জুঁই, এসব সম্ভব হয়েছে তোমার অক্লান্ত পরিশ্রমের জন্য। কাল আমার বাড়িতে পার্টি, তোমাকে কিন্তু অবশ্যই আসতে হবে।"

"পার্টি?" অবাক হল জুঁই।

"হ্যাঁ, আমার ছেলে অর্ক উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করেছে, সে জন্য পার্টি দিচ্ছি।"

অর্ক এসব পার্টি, হইচই বিশেষ পছন্দ করে না। অঞ্জলিও বিমলবাবুর মুখে শুনেছেন যে, জুঁই আসবে। আর ওঁদের কোম্পানিও জুঁইয়ের জন্যই এই অর্ডারটা পেয়েছে।

বিমলবাবুকে জুঁইয়ের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতে দেখে অঞ্জলি বললেন, "তা হলে কোম্পানিই পার্টি দিক। তুমি কেন পার্টি দেবে?"

৫

মিসেস দাশের স্বামীও কাজ করেন ওই কারখানায়। মিসেস দাশ চেনেন জুঁইকে। মিঃ দাশের আশা ছিল, তিনিই প্রোডাকশন ম্যানেজারের পোস্টে প্রোমোশন পাবেন। কিন্তু তা হয়নি। এই পোস্টে প্রোমোশন পেয়েছেন বিমলবাবু। তাই বিমলবাবুর উপর তাঁর একটা চাপা রাগ ছিল। মিসেস দাশ বললেন অঞ্জলিকে, "জুঁই চ্যাটার্জি ভীষণ খেলোয়াড় মেয়ে। আমার স্বামীর পিছনেও লেগেছিল। আমি ঘরের লোককে এমন শাসানি দিয়েছি, উনি আর ওদিকে নজর দেন না। তুমিও এই মেয়েটাকে পাত্তা দিও না, মাথায় চড়ে বসবে।"

এবার অঞ্জলি দেখছেন, তাই হতে চলেছে। বিমলবাবু কেমন যেন জুঁইয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে চলেছেন। নিজের মনের আগুনে নিজেই জ্বলছেন অঞ্জলি। তাই তিনি নির্ভরশীল হয়ে পড়েছেন সন্দীপের উপর। সন্দীপই তাঁর জীবনের পট পরিবর্তন ঘটিয়েছেন। সেদিন অঞ্জলি গিয়ে হাজির হলেন সন্দীপের বাড়ি। সন্দীপ ওঁর ড্রয়ার থেকে চিঠিখানা বের করে দিলেন অঞ্জলিকে। তারপর বললেন, "এই নাও তোমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার। ইন্টারভিউয়ের পরদিন আমাকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল কথাটা। কিন্তু চিঠি না পাওয়া পর্যন্ত আমিও ভরসা করতে পারিনি। কালই জয়েন করো ওই স্কুলে।"

অঞ্জলি যেন বিশ্বাসই করতে পারে না কথাটা। চিঠিখানা পড়ে তিনি খুশিতে লাফিয়ে উঠলেন। "সত্যি, আজ তুমি আমাকে বাঁচার নতুন পথ দেখিয়েছ সন্দীপ। আমি স্বাধীনতা পেতে চলেছি, এটা ভাবতেও আশ্চর্য লাগছে।" বিমলবাবুকে কিছুই বলেননি অঞ্জলি। আজ রাতে পার্টি। অঞ্জলিরও ইচ্ছে ছিল, সন্দীপকে আনবেন বাড়িতে। কিন্তু আজ পার্টিতে বিমলবাবুর কয়েকজন সহকর্মী আসবেন। তাঁদের সামনে সন্দীপকে আনতে চান না অঞ্জলি। সন্দীপের ব্যাপারটা তিনি গোপন রাখতে চান।

অঞ্জলি বাড়িতে কাজকর্ম দেখছেন। ওদিকে বসার ঘরে অতিথিরা এসেছেন। বেয়ারা হুইস্কির সঙ্গে চিনেবাদাম, কাজু পরিবেশন করছে। অর্ক এই সব কিছুরই বাইরে রয়েছে। এখানে তার তেমন কোনও বন্ধুও নেই। বাবার সহকর্মীর মেয়েরা এসেছে। তারাও নিজেদের মধ্যেই ব্যস্ত। জুঁই যেন এই বাড়িরই একজন। সেই সব কিছুর তদবির করছেন।

কাজুবাদাম দরকার। জুঁই হাঁক পাড়লেন, "বউদি, এখানে চিনেবাদাম, কাজুবাদাম, চিপ্‌স,ফ্রাই পাঠিয়ে দিন। ডিনারের আর কত দেরি?" যেন হুকুমই করলেন অঞ্জলিকে। অঞ্জলির মনের ভিতরের জ্বালাটা বেড়ে উঠল।

রাত বারোটা। মফস্‌সল শহর। চার দিক নিঝুম। অর্ক খেয়েদেয়ে তার ঘরে শুয়েছে। হঠাৎ কানে মা'র তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর। বিমলবাবু আজ একটু ঘোরের মধ্যে আছেন। তাঁর জন্য কোম্পানির নাম হয়েছে। বিমলবাবু খুশি। হঠাৎ অঞ্জলির এই চিৎকারে তাঁর মনমেজাজও বিগড়ে যায়।

বিমলবাবুও দেখেছেন, অঞ্জলির এই পরিবর্তন। এত দিন তিনিও সহ্য করেছিলেন। আজ অঞ্জলির ইঙ্গিতপূর্ণ কথায় তিনি চটে উঠলেন। অঞ্জলির রাগ জুঁইয়ের উপর। এই বাড়ির স্ত্রী যেন, এমন হাবভাব ওই মেয়েটির! তখন চুপচাপ ছিলেন অঞ্জলি। এখনও তিনি খাননি। জুঁইয়ের উপর তাঁর রাগটা এবার ভয়ানকভাবে ফুটে উঠেছে।

বিমলবাবু কিন্তু এ সব কথা শোনার জন্য আদৌ তৈরি ছিলেন না। জুঁইয়ের কাছে তিনি ঋণী। এবার তিনি প্রোডাকশন ম্যানেজার থেকে ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার হতে চলেছেন। জুঁই তাঁকে অনেক

দিয়েছে, আর সেই জুঁই সম্পর্কে অঞ্জলির মুখে ওই সব কথা শুনে বিমলবাবু বললেন, "জুঁই চ্যাটার্জিকে আমার কেরিয়ার তৈরি করার জন্য দরকার। তার সঙ্গে সম্পর্কটা রাখতেই হবে।"

অঞ্জলিও গজরাচ্ছেন, "কী সম্পর্ক, তা কি আমি জানি না? সারা জীবনই বঞ্চিত করেছ আমাকে। নিজের স্বার্থে এখন কি নিজের স্ত্রীকেও অবজ্ঞা করতে চাও?"

অর্ক শুনছে পাশের ঘর থেকে বাবা-মা'র ওই কথাগুলো। মা মাঝে-মাঝে গজরাতেন। আজ তিনি প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠেছেন। বাবাও চিৎকার করছেন, "যদি তাই ভেবে থাকো, তা হলে যা খুশি করতে পার।"

অঞ্জলিও সমান তালে গলা তুলে চিৎকার করছেন, "তুমি যদি সেটাই চাও, তাই হবে।"

৬

অঞ্জলি স্কুলের চাকরিতে জয়েন করেছেন। স্কুলটা শহরের অন্য প্রান্তে। এদিকটায় গাছগাছালি রয়েছে। শহরে সীমানা ছাড়িয়ে গ্রামের সীমানা শুরু হয়েছে। পাশেই স্কুলের বেশ কিছু কোয়ার্টারও রয়েছে। এতদিন পর অঞ্জলি আবার পড়াশোনার কথা ভাবছেন। প্রথম দিনটা ভালই কাটল। স্কুলের শিক্ষিকাদের সঙ্গেও পরিচয় হয়েছে। পাশের ওই সব কোয়ার্টারে থাকেন শিক্ষিকারা। কেউ-কেউ থাকেন শহরে অন্যত্র।

সেদিন স্কুল থেকে অঞ্জলি ফিরছেন সন্দীপের বাড়ি হয়ে। সন্দীপ বললেন, "স্কুলের কাজ কেমন লাগছে?"

"ভালই, তবে পড়াশোনা তো অনেক দিন ছেড়ে দিয়েছি, এবার ওটা শুরু করতে হবে। না হলে ঠিকমতো পড়ানো যাবে না।"

সন্দীপও ইংরেজির অধ্যাপক। তিনি বললেন, "বইপত্র আমার কাছেই রয়েছে। আবার পড়াশোনা শুরু করো। কাজে ফাঁকি দিও না।" অঞ্জলি বললেন, "সংসারের হিসেবে রেখে কাজকর্ম সেরে পড়াশোনার সময়ই হয় না। তবু কাজ তো করতে.হবে। দাও কিছু বই।" বইপত্র নিয়ে বাড়ির পথে রওনা দেন অঞ্জলি। বাংলোয় একা রয়েছে অর্ক। সে তখন সবে কলেজ থেকে ফিরেছে। মা বাড়ি নেই। বেয়ারাই চা-জলখাবার আনে। সেও জানে না, মেমসাহেব কোথায় গিয়েছেন। তবে আজ সকাল দশটার সময়ই বের হয়ে গিয়েছেন তিনি।

"এখনও ফেরেননি মা!" অর্ক অবাক হয়। অর্ক দেখছে, বাবা-মা কারওই ঘরের কথা, অর্কর কথা ভাবার সময় নেই। মা কোথায় যান, সে জানে না। বাবা তাঁর কাজ নিয়েই ব্যস্ত। বাবার ফোন আসে বিকেলে, "অর্ক, মা বাড়ি নেই?"

"না।"

বিমলবাবু বলেন, "অর্ক, আজ অফিসের জরুরি কাজে আমাকে কলকাতা যেতে হয়েছে। রাতে অফিসের গেস্ট হাউজেই থাকতে হবে। কাল সকালে ফিরে আসব।"

বাবাও আসবেন না। বাবা এখন মাঝে-মাঝেই অফিসের গেস্ট হাউজে রাত কাটান! মা কখন ফিরবেন, কে জানে! অর্ক বাড়িতে একা। টিভিও তার দেখতে ভাল লাগছে না।

রাত নামছে। মা'র তখনও দেখা নেই। অঞ্জলি ফিরলেন রাত আটটায়। অর্ক তাকিয়ে দেখল মাত্র। কেমন যেন খুশিই দেখাচ্ছিল মাকে। মা জিজ্ঞেস করলেন, "তোর বাবা আসেননি?"

অর্ক এবার খবরটা জানাতে অঞ্জলি তীব্র কণ্ঠে বলে উঠলেন, "অফিসের কাজে না ওই জুঁইয়ের সঙ্গে আছে?"

তখনই জুঁইয়ের হস্টেলে ফোন করলেন অঞ্জলি, আর খবর পেলেন,জুঁই কলকাতায় গিয়েছে। অঞ্জলি রাগে ফেটে পড়লেন, "এই সব কাণ্ড চলছে আমার চোখের আড়ালে! অনেক সহ্য করেছি, আর সইব না। একটা হেস্তনেস্ত করবই।"

৭

সেই বিদেশি কোম্পানির অর্ডার পাওয়ার পর বিমলবাবু প্রোমোশন পেয়ে ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার হয়েছেন। তাঁর কর্তব্য আর দায়িত্বও বেড়েছে অনেক। তাঁকে কলকাতার অফিসেও আসতে হয় প্রায়ই। রাত্রিবাসও করতে হয়, জরুরি মিটিং-এর জন্য। জুঁইকেও আসতে হয় কলকাতায়। তাকেও দরকার হয় বিমলবাবুর। সেদিনও এসেছিলেন ওঁরা। কাজ সেরে কারখানায় ফিরেছেন। সেখানে জরুরি কাজে আটকে পড়েছিলেন। এত বড় অর্ডারের কাজ চলছে দিনরাত, তিনটে শিফ্‌টে।

বিমলবাবু বাড়ি ফিরলেন বিকেলে। অর্ক একাই বাংলোয় রয়েছে। অঞ্জলি নেই। অর্ক আজও দ্যাখে, মা বের হয়েছেন তার কলেজ যাওয়ার আগেই। এখনও ফেরেননি।

বিমলবাবুও সব শুনে বিরক্ত হলেন। বললেন, "প্রায়ই বাড়ি ফিরে ওরা দেখা পাই না। কী এত কাজ যে, দিনরাত বাড়ির বাইরে থাকতে হবে! তা হলে একেবারেই বের হয়ে যাক।"

"সেটা হলে তো তোমারই খুব সুবিধে হয়, না?" তাকিয়ে দেখলেন বিমলবাবু। দেখলেন, অঞ্জলি ফিরেছেন। আজ অঞ্জলির স্কুলে কীসের জন্য যেন হাফ ছুটি হয়ে গিয়েছে।

অঞ্জলি এর মধ্যে মানসীর সঙ্গে বেশ আলাপ-পরিচয় গড়ে তুলেছেন। মানসীও এই স্কুলের একজন শিক্ষিকা। তিনি থাকেন পাশের কোয়ার্টারের দোতলায়। একটা ঘর খালিই রয়েছে। ছোটখাটো কোয়ার্টার। তবে বেশ ছিমছাম। সামনে একটু বাগান।

অঞ্জলি গিয়েছেন মানসীর কোয়ার্টারে। মানসী বললেন, "নীচের ঘরটা খালিই রয়েছে।"

মানসী একাই থাকেন। অঞ্জলি বললেন, "একা থাকতে কষ্ট হয় না?"

হাসলেন মানসী। বললেন, "দুনিয়ায় মানুষমাত্রই তো একা।"

অঞ্জলির মনে হয়, কথাটা সত্যি। তাঁর সংসারে স্বামী-ছেলেও আছেন। কিন্তু কে কার জন্য এখন চিন্তা করে। নিজেকে নিয়েই সকলের ভাবনা। এবার তিনি প্রস্তুত।

বাড়ি ফিরেছেন অঞ্জলি। কথায়-কথায় রাত হয়ে গিয়েছে। বাড়ি ফিরে তিনি শুনতে পেলেন বিমলবাবুর কথাগুলো। অঞ্জলির বাইরে যাওয়া নিয়ে ওই কঠিন মন্তব্য করেছেন বিমলবাবু। অঞ্জলিও এবার জবাব দেওয়ার জন্য তৈরি হয়েই ঢুকেছেন। এই বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার কথাটা অঞ্জলি শুনলেন বিমলবাবুর মুখে। তাঁর মনে হয়েছে, বিমলবাবুও তাই চান। জুঁইকে যে তাঁর দরকার, সেই কথাটা বিমলবাবু নিজের মুখেই বলেছেন এর আগেও। এবার অঞ্জলির কথায় বিমলবাবুও চটে উঠলেন। কাল রাতে প্রচুর খাটতে হয়েছে। সারাদিন কেটেছে কারখানার কাজের মধ্যে। স্নান-খাওয়াও ঠিকমতো হয়নি। বাড়িতেও শান্তি নেই। অঞ্জলি সারাদিন কোথায় থাকেন, কে জানে?

বিমলবাবু বললেন, "এই বাড়ির প্রতি তোমার যে কোনও কর্তব্য আছে, তা তো মনে হয় না। কী কর সারাদিন? সংসারের কাজকর্ম তো সবই দেখাশোনা করে কাজের লোক।"

"কাজের লোকদের নিয়েই থাকো এবার। তোমার জুঁই, যার সঙ্গে লুকিয়েচুরিয়ে কলকাতায় মিথ্যে অজুহাত দিয়ে রাত কাটাতে যাও, তাকেই নিয়ে এসো। আমাকে আমার মতো চলতে দাও।"

অর্ক শুনছে ওঁদের কথাবার্তা। চমকে ওঠে অর্ক। এরকম করে তার জীবন থেকে মা সরে যাবেন, ভাবতেও পারে না সে!

বিমলবাবুই বলেন, "আমি না হয় দোষ করেছি, কিন্তু অর্ক তোমার ছেলে, সে তো কোনও দোষ করেনি। তার কথাও তো ভাববে?"

"সব দায়-দায়িত্ব একা আমারই নয়, তোমারও আছে। আমি তাকে মানুষ করে দিয়েছি, সে এখন কলেজে পড়ে। নিজের ভালমন্দ সে বুঝবে। এবার তোমার দায়িত্ব। আমি সারাজীবন কারও বোঝা বইতে রাজি নই। আমার নিজেরও ব্যক্তিস্বাধীনতা আছে। কালই এই বাড়ি ছেড়ে চলে যাব। তোমার গলগ্রহ হয়ে আর থাকব না।" কথাগুলো বিমলবাবুর মুখের উপর ছুঁড়ে দিয়ে অঞ্জলি নিজের ঘরে চলে গেলেন।

বিমলবাবু কী যেন বলার চেষ্টা করলেন, কিন্তু তাঁর কোনও কথায় কান দিলেন না অঞ্জলি। রাত নামছে। অর্কর জীবনেও যেন এক অন্ধকারের আবরণ নেমে এসেছে। বাবা-মা দু'জনে আজ দু'পথে। মা অনের রাত অবধি তাঁর জিনিসপত্র প্যাক করছেন। এই সংসারে অঞ্জলি ছিলেন অনেক দিনই। এবার তাঁর চলে যাওয়ার পালা। সারারাত কিছু খাননি। এই বাড়িতে আর অন্নগ্রহণ করবেন না তিনি। সকাল হয়েছে। অঞ্জলি এর মধ্যেই তৈরি হয়ে নিয়েছেন। একটা রিকশাও ডেনে এনেছেন। বিমলবাবু দেখছেন ব্যাপারটা। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "কোথায় যাবে?"

"সে খবরে তোমার আর দরকার নেই," অঞ্জলি উত্তর দিলেন।

অর্কও দেখছে মাকে। মা তাঁর বাক্স দু'টো তুলে নেন রিকশায়। এর মধ্যে গাড়ি নিয়ে এসে পড়েন সন্দীপ। কাল রাতে অঞ্জলিই জানিয়েছিলেন তাঁর এই বাড়ি ছাড়ার সিদ্ধান্তের কথা। সন্দীপ বললেন, "এত তাড়াতাড়ি এত বড় সিদ্ধান্ত কেন নিচ্ছ?"

"আর থাকতে চাই না। যত থাকব,ততই অশান্তি বাড়বে সন্দীপ। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে চিড় ধরলে, তা আর জোড়া লাগে না। আমি আমার মতো থাকতে চাই। তার জন্য একটা বাসাও ঠিক করেছি স্কুল কোয়ার্টারে। ওখানেই চলে যাব। কাল সকালে যদি একবার আসতে পার, ভাল হয়।"

সন্দীপ সাহায্য করতেই এসেছেন। অর্ক চেনে সন্দীপকে। ইউনির্ভাসিটির অধ্যাপক। ওদিকেই থাকেন। হঠাৎ তাঁকে দেখে বিমলবাবুও একটু অবাক হন। তাঁর মনে হল, অঞ্জলি বোধ হয় ওই সন্দীপের প্রেমেই পড়েছেন। সন্দীপের কথা একদিন বিমলবাবুকে বলেছিলেন অঞ্জলি। এবার বিমলবাবুও বুঝেছেন ব্যাপারটা। তাই তিনি চুপ করে গেলেন।

অর্কও দেখল, তার মা সন্দীপের গাড়িতে উঠেই চলে গেলেন। যাওয়ার সময় অঞ্জলি ছেলের দিকে তাকালেন। অঞ্জলি বললেন, "সাবধানে থাকিস।"

অর্ক জবাব দেয় না। অর্কর চোখে জল আসে। তবু সে নীরবই থাকে। সে ভাবে, এভাবে বিনা দোষে তাকে ফেলে যিনি চলে যান, তাঁর জন্য চোখের জল ফেলবে না।

৮

বাংলোটা কেমন যেন শূন্য হয়ে গিয়েছে। মা'র চলে যাওয়াটা বাবা যেন সহজভাবেই মেনে নিলেন। তিনি স্নান করে, ব্রেকফাস্ট সেরে অফিসের গাড়িতে বের হয়ে গেলন। অর্ক দ্যাখে নীরব দর্শকের মতো।

বাবা চলে যাওয়ার পর সে একা রয়েছে বাড়িতে। কেন জানে না, তার সর্বশক্তি যেন ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছে। নিজের ঘরে এসে নিভৃতে, অঝোরে কান্নায় ভেঙে পড়ল সে। বেয়ারা এসে বলল, "কলেজ যাবেন না ছোটোসাব?"

অর্ক উঠে পড়ল। তার ভেঙে পড়লে চলবে ন। সব ভাঙনের মাঝখানে সে নতুন করে বাঁচার চেষ্টাই করবে। এই অবিচারের জবাব দেবে সে। স্নান সেরে, ব্রেকফাস্ট করে অর্ক কলেজে গেল। অন্য তরুণদের মন যেমন এসব আঘাত সহ্য করতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে, তারও হবে। জুঁই নিজের কানে শুনেছে সব কথাই। জুঁইও ভাবেনি, এরকম কিছু একটা ঘটে যাবে। তবে তারও মনে হয়েছিল যে, অঞ্জলি এই যুগের হিসেবমতোই চলবেন। জুঁইয়ের এই বাড়িতে আসাটা যে অঞ্জলি পছন্দ করতেন না, সেটা জানত জুঁই।

বিমলবাবু জুঁইকে বেশি স্বীকৃতি দিয়েছেন, তাঁর স্ত্রীর চেয়েও। সেজন্য অঞ্জলিও ঘর ছেড়ে চলে গিয়েছেন।

জুঁই বলল, "তা হলে এখন সংসার চালাচ্ছে বেয়ারার দল। অর্ক কী বলে?"

অর্কর মনের অবস্থা নিরীক্ষণ করার মতো সময় নেই বিমলবাবুর। তাই তিনি বললেন, "অর্ক চুপচাপই থাকে। বেচারা!"

জুঁই বলল, "ছেলেটার কথাও ওর মা ভাবলেন না! এতে নিজের মা কেন, মেয়েরা সকলে ওর কাছে শ্রদ্ধা হারাবে। আজকের সমাজে বিপদের তো এটাই সূচনা।"

বিমলবাবুও ভাবছেন কথাটা।

অর্ক শূণ্য বাড়িতে একাই রয়েছে। বিকেল গড়িয়ে সন্ধে নামে। একটি মেয়ের কণ্ঠস্বর শুনে মা ফিরেছেন ভেবে অর্ক অনেক আশা নিয়েই বের হয়ে এল। দেখল, গাড়ি থেকে নামছে তার মা নন, জুঁই চ্যাটার্জি।

জুঁই পরম উৎসাহে বাংলোয় ঢুকল। অর্ককে দেখে সে জিজ্ঞেস করল, "অর্ক, কেমন আছ?" আজ সকালেই অর্কর মা এই বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছেন। অর্কর ভাল থাকার কথা নয়। সব জেনেশুনেও জুঁই এই প্রশ্ন করতে, অর্ক বিস্মিতই হল। জবাব দেওয়ার প্রয়োজনও বোধ করল না। নীরবে তার ঘরে চলে গেল অর্ক।

বিমলবাবু দেখলেন অর্কর এই অভদ্র আচরণ। ও যেন জুঁইকে তেমন পাত্তা দিতে চায় না। বিমলবাবু এতে খুশি হলেন না। তবে জুঁই এই ব্যাপারটা গুরুত্ব না দিয়ে ড্রয়িংরুমে ঢুকে, ড্রয়িংরুমের ওই আগোছালো ব্যাপারাটা দেখে হাঁক পাড়লেন, "বেয়ারা, বেয়ারা?"

বেয়ারাও সারা বিকেল তার গ্রামের বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে ফিরছে। জুঁইয়ের ডাক শুনে সে এগিয়ে এল।

জুঁই বলল, "এসব কী! ড্রয়িংরুম, সাহেবের বেডরুম সাফা করা নেই কেন? সব সাফ করো।" জুঁই ঢুকল অর্কর ঘরে। সারা ঘর যেন তছনছ হয়ে আছে! জামা, প্যান্ট, জুতো, সব এদিক ওদিক ছড়ানো! মেঝেয় নোংরা! জুঁই বলল, "অর্ক, এই নোংরা ঘরে রয়েছ? নিজের জিনিসপত্র তো ঠিকমতো রাখবে! এ সব ঠিকঠাক করো। বেয়ারা এসে মেঝেটা মুছে দিয়ে যাবে।"

বিমলবাবু এর মধ্যে ড্রেস চেঞ্জ করে ড্রয়িংরুমে এসে দেখলেন, জুঁই নিজেই তাঁর জন্য কফি আর পেস্ট্রি রেখে দিয়েছে। অর্ককে চা আর খাবার দিয়ে এসেছে। বিমলবাবু দেখছেন,সংসারের কাজ অনেক। আর এর জন্য চাই একজন মেয়ে, যে খবরদারি করে বয়-বেয়ারাদের দিয়ে এসব করাবে।

জুঁইও দেখছে এঁদের সংসারের অবস্থা। বিমলবাবু সংসারের কোনও খবরই রাখেন না। জুঁই বলল, "এসব পুরোপুরি না হোক, কিছু তো দেখতে হবে।" তারপর জুঁই ডাকল অর্ককে।

অর্ক এলে জুঁই বলল, "তুমি এ সব দেখবে, না হলে বয়-বেয়ারা তো সব লুটপাট করে নেবে। বাবা তো অফিস নিয়েই ব্যস্ত। কী-কী লাগবে, রোজ সকালে ফর্দ করে দেবে, বাজারপত্র দেখে নেবে।"

অর্ককে যেন জুঁইকে এই বাড়ির কর্ত্রীর মতোই হুকুম দিচ্ছে।

অর্ক বলল, "আমার নিজের পড়াশোনা আছে, কলেজ আছে।"

"তবু তার মধ্যেই এসব দেখতে হবে। তোমার বাবার তো সময় নেই!" তারপর অর্ককে কোনও জবাব দিতে না দিয়েই বলল, "যাও, পড়াশোনা করো। তবে এদিকটাও নজর রাখবে।"

অর্ক চুপ করে থেকে সরে এল।

অর্কর এবার মায়ের কথা মনে হল। মা এসব কাজ তাকে কোনও দিন করতে দেননি। আর বাবাও জুঁইয়ের কথার উপর কোনও কথা বললেন না। এতে অর্ক মনে -মনে ক্ষুব্ধ হল। সেদিনও লাঞ্চের সময় খেতে বসে বিমলবাবু হঠাৎ আর্তনাদ করে উঠলেন। নুন কমে হলে নুন মেখে তরকারি খাওয়া যায়। এত দিন তাই করে এসেছেন। আজ চিকেন কারি মুখে দিয়ে তিনি আর্তনাদ করে উঠলেন। ঝালে আগুন হয়ে আছে চিকেন কারি। মুখে হুসহাস আওয়াজ করতে লাগলেন বিমলবাবু। তারপর খাবার ফেলে উঠে পড়লেন।

বিমলবাবু সেদিন তাঁর অফিসের চেম্বারে ক্যান্টিন থেকে খাবার আনিয়েছেন। জুঁই অবাক হল, "এ কী! ক্যান্টিনের এই অখাদ্য খাচ্ছেন?" বিমলবাবু বললেন, "বাড়িতে যা রান্না করে, তা খেলে মারা পড়তে হবে।"

জুঁই শোনে কথাটা। ওই কর্মব্যস্ত, গোবেচারা মানুষটির জন্য জুঁই চিন্তিত হয়ে পড়ে।

বিমলবাবু বললেন, "ওদের কিছু বলো না জুঁই। যেমন চলছে, চলুক। এ ছাড়া তো করারও কিছু নেই।" ওঁর কণ্ঠে যেন একটা অসহায় ভাব ফুটে ওঠে।

জুঁই বলল, 'এত খাটতে হয়, আর এভাবে বাঁচতে হবে। একটা পথ বের করতেই হবে। এভাবে বাঁচা যায় না!"

বিমলবাবু ও সেটা এবার পদে-পদে অনুভব করছেন।

সেই রাতে জুঁই নিজে রান্না করল, ফ্রায়েড রাইস আর চিলি চিকেন। বিমলবাবু তৃপ্তিভরে খেলেন। অর্কও দেখল বাবার এই তৃপ্তি। বিমলবাবু বললেন, "জুঁই, অনেক দিন পর আজ তৃপ্তি করে খেলাম।"

বিমলবাবুও আজ নতুন করে ভাবছেন কথাটা। তাঁর মন আজ আরও অনেক কিছু পেতে চায়, নতুন করে ঘর বাঁধতে চায়। তাই এবার জুঁইকেও কথাটা জানাতে চান বিমলবাবু। ওকে তাঁর পাশে পেতে চান। তিনি দেখেছেন যে, জুঁইয়ের জন্যই তাঁর উন্নতি। দু'জনে তাই নতুন করে ঘর বাঁধতে চান।

অর্কও এবার এসব ব্যাপার নিয়ে ভাবনাচিন্তা শুরু করেছে। জুঁই এই বাড়িতে এলে বিমলবাবুর মনে কী উচ্ছ্বাসই না জাগে! দু'জনেই তখন কাছাকাছি থাকতে চান। সেই জগতে ঠাঁই নেই অর্কর। অর্কর জীবনে নিঃসঙ্গতা যেন ক্রমশ বাড়ছে। সে একা, অসহায় বোধ করে। মায়ের কথা মনে পড়ে বারবার।

৯

অঞ্জলি এই বাড়ি থেকে চলে গিয়ে কোয়ার্টারেই রয়েছেন। অর্ক হঠাৎ দেখল একটা দোকানে তার মাকে। অনেক দিন পর দেখা পেয়েছে মা'র। অর্ক ভিড় ঠেলে সেখানে পৌঁছনোর আগেই অঞ্জলি দোকানে টিভির অর্ডার দিয়ে চলে গেলেন। অর্ক দোকানে ঢুকে মা'র দেখা পেল না। দোকানদারকে জিজ্ঞেস করল, "ওই যে ভদ্রমহিলা এসেছিলেন, তাঁকে চেনেন? কোথায় থাকেন তিনি?"

ভদ্রলোক তাঁর ক্যাশমেমো দেখে বললেন, "একটা কালার টিভির অর্ডার দিয়েছেন। ওঁর নাম অঞ্জলি রায়। থাকেন এখানার গার্লর্স হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের কোয়ার্টারে।"

কোয়ার্টারের নম্বরও তিনি দিয়ে দেন অর্ককে। অর্ক বের হয়ে আসে। তার খুব ইচ্ছে করে মা'র সঙ্গে দেখা করতে।

প্রথমে অর্কর রাগ হয়েছিল মা'র উপর, তাকে ছেড়ে চলে আসার জন্য এখন বাবার উপর সহানুভূতিটা কমে এসেছে। অর্ক দেখেছে, জুঁই চ্যাটার্জির সঙ্গে বাবার সম্পর্কটা আরও নিবিড় হয়ে উঠেছে। জুঁই এখন রোজই তাদের বাড়িতে আসে, আর বয়-বেয়ারাদের ধমক দিয়ে কাজ করায়। এই সংসারের সব ব্যাপারেই নাক গলায় জুঁই। অর্ককে বলল, "পড়াশোনা ঠিকমতো করছ তো, নাকি কলেজে গিয়ে আড্ডাই দাও?"

অর্ক চুপ করে থাকে। জুঁই চ্যাটার্জির এই শাসন তার ভাল লাগে না। সব সময় মনে পড়ে মাকে। অর্কর মনে হয়, মায়ের কাছেই চলে যাবে সে। মা চলে যেতে অর্ক মুষড়ে পড়েছিল।

পড়াশোনাতেও মন দিতে পারেনি। ফলে কলেজের পরীক্ষায় তার রেজাল্ট মোটেই ভাল হয়নি। তাই এবার মার্কশিটটাও বাবাকে দেখায়নি। বিমলবাবুরও অবশ্য সেটা দেখার কথা মনে ছিল না।

জুঁই এখন প্রায়ই এই বাংলোয় আসে। বিমলবাবুও তাকে নিয়েই ঘর বাঁধতে চান। তাই তিনি ডির্ভোসও চেয়েছেন অঞ্জলির কাছে। বিমলবাবু ভেবেছিলেন, হয়তো বাধা দেবেন অঞ্জলি। তাঁর কাছে আদালতের নোটিসও গিয়েছে। কিন্তু তিনি এই ডির্ভোসের ব্যাপারে কোনও আপত্তি করেননি। অঞ্জলিও বিমলবাবুর কাছ থেকে মুক্তি পেতে চান। জুঁইও সেটা জানতে পেরেছে। তার মনে জেগেছে নতুন করে ঘর বাঁধার স্বপ্ন।

জুঁই অর্কর ঘরে সেদিন ওই মার্কশিটটা দেখে, নিয়ে আসে বিমলবাবুর কাছে।

বিমলবাবুও মার্কশিট দেখে এবার চমকে উঠলেন। এরকম ফল করবে অর্ক, তা কেউ ভাবেননি। বিমলবাবু হাঁক পাড়লেন, "অর্ক!" সবে বাড়ি ঢুকেছে অর্ক। আর ঢুকেই সে বিমলবাবু আর জুঁইয়ের সমবেত তোপের মুখে পড়ে যায়। বিমলবাবুর হাতে সেই মার্কশিট। অর্কও বুঝেছে, এ সব কাজ এই জুঁই চ্যাটার্জির। সে-ই বাবাকে তার মার্কশিট এনে দিয়েছে। বিমলবাবু গর্জে উঠলেন, "কলেজের রেজাল্ট এরকম হয়েছে। কী করা হয় সারাদিন?"

অর্ক চুপ করে থাকে, আর ততই গর্জন বাড়ে বিমলবাবুর। মার্কশিটটা অর্কর মুখের উপর ছুড়ে দিয়ে বিমলবাবু বললেন, "এখান থেকে দূরে, অন্য কোথায় তোমার পড়ার ব্যবস্থা করছি।" জুঁই বললেন, "অর্ক, নিজের কেরিয়ারের কথা তো ভাববে! পড়াশোনা না করলে জীবনে কিছুই করতে পারবে না। তাই তোমাকে কলকাতার কোনও কলেজে গিয়েই পড়তে হবে।"

অর্ক বলল, "আমার জন্য আপনার না ভাবলেও চলবে। আমাকে আমার মতোই থাকতে দিন। আমাদের মধ্যে আপনি কেন আসছেন?"

বিমলবাবু গর্জে উঠলেন, "কী বললে?"

"ঠিকই বলেছি। এসব কথা বলার ওঁর কোনও অধিকার নেই।"

অর্কর কথায় জুঁই চমকে ওঠে। সত্যিই সে যেন বেশি বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে। কিন্তু অর্ককে সাবধান করেন বিমলবাবু। আজ বিমলবাবু কঠিন ভাষায় জানিয়ে দেন, "ভবিষ্যতে এই বাড়িতে ওর কথা মেনেই চলতে হবে। ও-ই হবে এই বাড়ির নতুন কর্ত্রী।"

জুঁই খুশিই হল। চমকে ওঠে অর্ক। বিমলবাবু বললেন, "যদি তাতে তোমার সায় না থাকে, এই বাড়ি থেকে চলে যেতে পার তোমার মা'র কাছেই। আমি একটু শান্তি পেতে চাই।"

অর্ক কথাটা শোনে মাত্র। বাবা যে তাকে এই কথা একদিন বলবেন, এমন একটা অনুমানও করে এসেছে অর্ক। আজ সেই কথাই জানিয়েছেন তার বাবা। নিজেদের স্বার্থের জন্য এঁরা সন্তানদের কথাও ভাবেন না।

অর্ক তখন মনস্থির করে ফেলেছে। সে মায়ের কাছেই চলে যাবে। মা তাকে ফেরাতে পারবেন না। এই বাড়িতে ওই জুঁই চ্যাটার্জি আসুক, অর্ক বাধা দিতে আর এখানে থাকবে না। রাতে ডিনার খায়নি। নিজের ঘরেই বসেছিল। সে শুনল ডাইনিংরুমে বিমলবাবু আর জুঁইয়ের কণ্ঠস্বর। বেয়ারা ডাকতে এল। অর্ক বলল, "আমার শরীর ভাল নেই। আজ রাতে খাব না।" বেয়ারা ফিরে গেল। আর কেউ তাকে বিরক্ত করতে আসেননি। ওঁদের খাওয়াদাওয়া হয়ে গিয়েছে। জুঁই চলে গিয়েছে। বিমলবাবু গাড়িতেই তাকে পৌঁছে দিতে বলেছেন। বিমলবাবু শুয়ে পড়েছেন। রাত নামছে। বাংলোয় বয়-বেয়ারারা কাজ শেষ করে শোওয়ার আয়োজন করছে। বৃষ্টি তখন একটু কমেছে। অর্ক বের হয়ে এল। মা'র কাছে চলেছে সে।

অঞ্জলিও এখন তাঁর নতুন জীবনে মানিয়ে নিয়েছেন। এই সমাজে বাস করতে গেলে অনেক কিছুই মানিয়ে নিতে হয়। অঞ্জলিও তাঁর কোয়ার্টারে এসে এই নীতিকেই মেনে চলেছেন। সন্দীপও এখানে আসেন। দু'জনের মধ্যে অতীতের সেই হারানো সম্পর্কটা আবার নতুন করে গড়ে উঠেছে।

. বৃষ্টির রাত। চলেছে অর্ক। ঠিকানাটা সে ভোলেনি। সেদিন দোকানের সেই সেল্‌সম্যান তাকে মায়ের ঠিকানা দিয়েছিলেন। আজ ফিরে পাবে তার মাকে। এগিয়ে আসছে অর্ক তার নতুন আশ্রয়ের দিকে।

ঘরে তখন আলো জ্বলছে। সন্দীপ আজ এসেছেন অঞ্জলির কাছে। অঞ্জলি যেন তাঁরই পথ চেয়ে ছিলেন। আজ সন্দীপ অঞ্জলির শূন্য জীবন আবার নতুন আলোয় সঞ্জীবিত করার আশ্বাস নিয়েই এসেছেন। এখন আইনগত আর কোনও বাধা নেই অঞ্জলিরও। তিনি একটা ঘর ভেঙে, আবার নতুন ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখছেন। সন্দীপও সেই স্বপ্নকে সত্যি করতে চান। এক মধুর আবেশে দু'জনে ঘনিষ্ঠ হয়েছেন এই নিভৃত রাতের নিস্তব্ধতায়।

ঘরে আলো জ্বলছে। বাইরে বৃষ্টির দাপট। জানলাটা খোলা। ওঁরা খেয়াল করেননি। জানলার

ওদিকে এসে দাঁড়িয়েছে অর্ক। সন্দীপবাবুকে মায়ের ঘরে এই নির্জন রাতের অন্ধকারে এভাবে দেখে সে চমকে ওঠে। অর্কর সারা মনে ঝড় ওঠে। মায়ের কাছে সে আশ্রয়ের জন্য এসেছিল, কিন্তু আজ সেখানে তার জন্য কোনও জায়গা নেই। সমাজে প্রত্যেকে নিজের সুখস্বপ্ন নিয়েই মগ্ন হয়ে আছে। অপরের জন্য কেউই ভাবে না।

বাইরে হাওয়া বইছে, তার সঙ্গে চলছে অবিরাম বৃষ্টি। অর্ক কাঁপছে বাইরে দাঁড়িয়ে। এত বড় পৃথিবীতে তার জন্য আর কোথাও কোনও আশ্রয় নেই। এঁরা আগামী প্রজন্মকে এরকম দুর্যোগের অন্ধকারে ঠেলে দিয়ে নিজেদের সুখ আর চাওয়া-পাওয়ার স্বপ্ন নিয়েই মেতে আছেন।

সরে এল অর্ক। বাবা হারিয়ে গিয়েছেন তার জীবন থেকে। মা-ও। তার অপরাধ কী, জানে না অর্ক। এই সমাজ যেন তার সব কিছু কেড়ে নিয়ে তাকে এই দুর্যোগের অন্ধকারে ফেলে দিয়েছে। কিছু জায়গা আছে, যেখানে নিরাশ্রয়ের আশ্রয় মেলে। অর্ক ওই বৃষ্টির মধ্যে ভিজে চপচপে গায়ে স্টেশনে এসে আশ্রয় নিয়েছে। কয়েকটা অনাথ শিশু দু'-তিনটে বেঞ্চ দখল করে শোওয়ার আয়োজন করছে।

ট্রেনটা এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। দু'-চারজন যারা ছিল, তারাও চলে গেল। প্ল্যাটফর্মে নেমে এল নিস্তব্ধতা। বেঞ্চের ওদিকে দু'টো ছেলে ঠান্ডায় কোথা থেকে একটা কাঁথা বের করল, তারপর চাপা দিল দু'জনে। ঘুমিয়েও পড়ল। এদিকে-ওদিকে বাস্তুহারাদের ভিড়। তারা ঘুমিয়ে আছে এই শীত, বৃষ্টির মধ্যেও।

জেগে আছে অর্ক। আজ সে যেন ওদের দলেরই একজন হয়ে গিয়েছে। তারই বয়সি একটা ছেলে ফুকফুক করে বিড়ি টানছে, আর দেখছে অর্ককে।

ছেলেটা জিজ্ঞেস করল, "পথে নেমেছ ক'দিন? বাবা-মা মারা গিয়েছে, না সৎমা তাড়িয়ে দিয়েছে? আমার বাপটা চেয়েছিল ঘরে থাকি, খেটেখুটে দু'পয়সা এনে দিই। তা সৎমা বলে, 'সোমত্ত ছেলে ঘরে বসে খাবে কী? যাক, বের হয়ে নিজের জোগাড় করে নিক।' তাই ইস্টিশনের চায়ের দোকানে কাজ করি। বড্ড খাটুনি। তা, কাজ করবে গুপিদার দোকানে? এই চা দেওয়া, কাপ-ডিশ ধোওয়া। খোরাকি আর দিনে পাঁচ টাকা পাবে এথানে। চলে তো? নাও, ধরাও।" ছেলেটা ওর দিকে একটা বিড়ি এগিয়ে দিল। বলল, "যা ঠান্ডা পড়েছে, বিড়িই ভাল লাগবে।"

অর্ক বলল, "এসব খাই না।"

ছেলেটা বলল, "আরে, প্রথম-প্রথম আমিও খেতাম না, তারপর বাঁচার লড়াইয়ে লাথি খেতে-খেতে এসব ধরেছি। কী এত ভাবছ? কথাটা ভেবে দ্যাখো। যদি মন চায়, তা হলে চলে আসবে। ওই দোকানের সামনের ঘরটায় থাকি।"

ছেলেটা উঠে গিয়ে ঘরটায় ঢুকে, কম্বল চাপা দিয়ে শুয়ে পড়ল।

ঘুমন্ত স্টেশন জেগে ওঠে। ঘন্টা বাজে। কলকাতা যাওয়ার প্রথম ট্রেন আসছে। ট্রেন আসার ঘন্টা শুনে অর্ক এগিয়ে গেল টিকিট কাউন্টারের দিকে। অর্ক বলল, "কলকাতার একটা টিকিট।"

পকেটে ওর দু'-তিনখানা দশ টাকার নোট রয়ে গিয়েছে ভাগ্যচক্রে। এটাই তার সম্বল। তা থেকে সে টিকিট কাটল।

১০

উত্তর কলকাতার সেই বড় বাড়িটার ঘুম সবে ভেঙেছে। নির্মলবাবু সকালে পার্কে একটু বেড়ানো অভ্যেস। আজ বৃষ্টির দাপও আর নেই। নির্মলবাবু এখন স্বামী-স্ত্রীতে এই বাড়িতে রয়েছেন। নীচের তলায় একটি পরিবারকে ভাড়াটে হিসেবে এনেছেন। তাঁর বাল্যবন্ধু সমীরবাবু পদস্থ সরকারি কর্মচারী। সমীরবাবুরাও এই পাড়াতেই থাকতেন। তাঁদের বাড়িতে অনেক শরিক। সমীরবাবু সরকারি চাকরি নিয়ে

পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ওড়িশার অনেক শহরেই ঘুরেছেন। তাঁর একমাত্র মেয়ে বনানীও ভাল ছাত্রী। এখন ইংরেজিতে অনার্স নিয়ে পড়ছে। বিভিন্ন শহরে ঘুর-ঘুরে সে মানুষ হয়েছে। বনানীও চেনে নির্মলবাবু এবং তাঁর স্ত্রী সাবিত্রীকে। ওঁদের দু'ছেলেই বাইরে। ছোট ছেলে মুম্বইয়ে ফ্ল্যাট কিনে সেখানেই থিতু হয়েছেন। আর বড় ছেলে বিমলবাবু তো কলকাতার কাছেই এক কারখানার পদস্থ কর্মচারী, সেখানেই বাংলোয় থাকেন।

বিমলবাবু কলকাতায় কমই আসেন। বাবা-মা'র টাকার অভাব নেই। নিজেদের কারখানা এখন লিজ দিয়েছেন নির্মলবাবু। ছেলেরা তো কারখানা দেখল না। তবু নিজের হাতে তৈরি কারখানা বিক্রি করে দিতে পারেননি। তাঁরই এক বন্ধুর একটা কারখানা আছে। তাঁকেই এই কারখানা চালানোর দায়িত্ব দিয়েছেন। তার জন্য মাসে যা পান, বুড়োবুড়ি দু'জনের পক্ষে তা অনেক বেশিই। নিঃসঙ্গতা কাটানোর জন্যই সমীরবাবু এখানে ফিরে আসার পর তাঁকে ভাড়াটে হিসেবে এনেছেন। এই বাড়িতে আগামী প্রজন্ম বলতে এখন একমাত্র বনানী। সাবিত্রীর দুঃখ, ছেলেরা তাঁদের খবর রাখে না। তাঁদের টাকার দরকার নেই, তবু এই বয়সে সাহচর্যের তো দরকার! কিন্তু তা হয়নি। অবশ্য ফোনে তাঁরা ছেলেদের খোঁজখবর নেন। সেই সুবাদে বিমলবাবুর সব খবরই পান। অঞ্জলি চলে যাওয়ার পর সাবিত্রীর চাপেই নির্মলবাবু একদিন সস্ত্রীক তাঁদের বাংলোয় এসেছিলেন। কিন্তু বিমলবাবু কেমন যেন অখুশি হয়েছিলেন। অর্কর সেটা নজর এড়ায়নি। দাদু-ঠাকুরমার সে ছিল একান্ত অনুরক্ত। সাবিত্রীও নাতিকে ভালবাসতেন। তাই বলেছিলেন, "বিমল বাড়িতেই চল বাবা। অর্ক একা-একা পড়ে থাকবে এখানে! ওর মা তো চলে গেল!"

বিমলবাবু বলেছিলেন, "ওর জন্য তোমাদের ভাবতে হবে না। আমারও তো একটা কর্তব্য আছে সন্তানের উপর!"

নির্মলবাবু চুপ করে গিয়েছিলেন। চুপচাপ ফিরে এসেছিলেন তাঁরা।

এর পরই তাঁদের সব স্নেহ উপচে পড়েছিল বনানীর উপর।

সমীরবাবু নির্মলবাবুর সঙ্গে মাঠে বেড়াতে যান। সমীরবাবুও শুনেছেন বিমলবাবুর কথা। বিমলবাবু জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন এই বয়সেই, কিন্তু শান্তি পাননি। আজকের সমাজে এই বস্তুটির দেখা পাওয়া যায় না। তাই যা ঘটবে, তাকে মেনে নিয়েই চলতে হবে। এ ছাড়া আর কিছু করার নেই। সেটা বিশ্বাস করেন নির্মলবাবুও।

সেদিন সকালে প্রাতঃভ্রমণ সেরে ফিরছেন, হঠাৎ বাড়ির কাছে কাকে দেখে চমকে উঠলেন নির্মলবাবু। গত রাতের অনিদ্রা, দুশ্চিন্তায় বিবর্ণ মুখ। চুলগুলো উসকোখুসকো, প্যান্ট-শার্টে কাদা-জলের ছিটের দাগ। এক রাতেই অর্কর চেহারায় পরিবর্তন এসেছে, মন ও বেদনায় কুঁকড়ে উঠেছে। মা-বাবা, সবচেয়ে প্রয়োজনীয় এই দু'জন মানুষই তার জীবন থেকে হারিয়ে গিয়েছেন। গতকাল বিকেলে সে টিফিন করেছিল,তারপর আর কিছু খায়নি। খেতে ইচ্ছেও করেনি। একটার পর-একটা আঘাত তাকে অস্থির করে তুলেছিল। নির্মলবাবু বয়সের সঙ্গে-সঙ্গে দৃষ্টিও কমে আসছে। বছর খানেক পর তিনি দেখছেন অর্ককে। তাঁদের ভাবনার জগতেও অর্কর অস্তিত্ব রাখতে দেননি নির্মলবাবু। তাই হঠাৎ ওই এলোমেলো চেহারার অসহায় ছেলেটাকে দেখে প্রথমে চিনতে পারেননি। অর্ক প্রণাম করতে নির্মলবাবু বললেন, "কে তুমি? ঠিক চিনতে পারলাম না তো!"

অর্ক চমকে উঠল। আজ তাঁরাও অর্ককে সহজে চিনতে চান না! তবু সে বলল, "দাদু, আমি অর্ক।"

"অর্ক!" এবার নির্মলবাবু যেন চমকে ওঠেন, "এ কী হাল হয়েছে তোমার! সব খবর ভাল তো?"

"ভালই," অর্ক জবাব দিল।

"চলো, চলো। ঘরে চলো। কত দিন পরে এসেছ এই বাড়িতে!" নির্মলবাবু এবার খুশি হয়েছেন। সমীরবাবু বললেন, "এই আপনার নাতি অর্ক? বিমলের ছেলে, ওখানেই থাকে?" সমীরবাবুও খুশি। বললেন, "বেশ, বেশ।"

অর্ক সমীরবাবুকে প্রণাম করল।

সব ব্যাপারটাই বনানী দেখছে তাদের বারান্দা থেকে। ওই ময়লা জামা-প্যান্ট পরা এলোমেলো চেহারার ছেলেটির মধ্যেও ফুটে উঠেছে তারুণ্যের বিদ্রোহ। সেটা এই প্রজন্মের মেয়ে বনানীর চোখও এড়ায় না।

বনানীও প্রতিবাদী চরিত্রের মেয়ে। আজকের প্রজন্ম তাদের অতীত প্রজন্মের লোভ, স্বার্থপরতা ঠিক মেনে নিতে পারে না। তাই এদের নিয়ে এই সমাজের মধ্যেই যেন সূচনা হয়েছে একটা নীরব বিদ্রোহের।

সাবিত্রীও ভাবতে পারেনি, বিমলবাবুর জীবনে এরকম বিচিত্র ঘটনা ঘটবে। চাকরি, কেরিয়ার এই সমাজে জীবনের চেয়েও বড়। তাই জীবন বাজি রেখে মানুষ এর পিছনেই ঘুরছে। চাকরির উন্নতির জন্য বিমলবাবুর দরকার জুঁইকে। তাই জুঁইকেই এনেছেন বিমলবাবু তাঁর ঘরে, আর বের হতে হয়েছে অঞ্জলিকে। অঞ্জলিও তাঁর কেরিয়ার তৈরি করার জন্য মেনে নিয়েছেন সন্দীপকে। তাই অর্কর ঠাঁই সেখানেও হয়নি। আজ তার বাবা-মা থেকেও না থাকারই মতো। অর্ক আজ নিঃসঙ্গ, একা। সমাজ তাকে ঠাঁই দেয়নি। কোনও দোষই তার নেই। যে সমাজ বিনা বিচারে তাকে এত বড় শাস্তি দিল, সেই সমাজকে যদি আঘাত করে অর্ক, সেটা কি অন্যায় হবে? এর উত্তর স্বার্থপর সমাজ কোনও দিন দেবে না। তবু অর্করা আঘাত দেবেই। নির্মলবাবু চুপ করে শুনছেন অর্কর মুখের কথা। নির্মলবাবুও বোঝেন, তরুণ অর্ক ব্যাপারটাকে নীরবে মেনে নিতে পারেনি।

সাবিত্রীর চোখে জল। তিনি বললেন, "দিনদিন এসব কী হচ্ছে গো? আমাদের কালে কত দুঃখ-কষ্ট, অপমান সয়ে সংসার আঁকড়ে ধরেছি। আর এরা এত সহজে সব ভেঙে চুরমার করে দিল! এরা আবার নিজেদের বলে সভ্য, শিক্ষিত! এরাই আবার স্কুল-কলেজের শিক্ষক, এরাই হাজার-হাজার লোকের রুটিরুজির ঠাঁই ওই সব কলকারখানার কর্তাব্যক্তি! এরাই সমাজের নামীদামি মানুষ! অর্ক, তুই এখানেই থাকবি। দরকার হয়, এই কারখানার তুই-ই হবি একমাত্র মালিক। যে ছেলেরা মা-বাবাকে, এমনকি নিজের ছেলেকেও দ্যাখে না. তারা অমানুষ। তাদের জন্য আমাদের ভাবার কিছু নেই।"

নির্মলবাবু বললেন, "অর্ক, তুমি এখানে থেকেই পড়াশোনা করবে, পরীক্ষা দেবে। আমিই ওখানে গিয়ে তোমার বইপত্র নিয়ে আসব।" ওঁরা ছাড়া আর-একজন অর্কর সব কথাই শুনেছে, সে বনানী। তারও কৌতূহল এই নবাগত তরুণটিকে নিয়ে। বনানী এই বাড়িতে এসে সাবিত্রীর কাছেই বেশি সময় থাকে। এই সংসারে অনেক টুকিটাকি কাজও করে। কাজের লোক ঠাকুরমার অর্থাৎ সাবিত্রীর পুজোর ঘরে কাজ করতে পারে না। ওই কাজ দেখতে হয় বনানীকে। সাবিত্রীর পান আর বিশেষ ধরনের জরদাও এনে দেয় বনানী। বনানী ঠাকুরমার কাছে আসতে গিয়ে ওঁদের সব কথা শোনে। বনানীও চমকে ওঠে অর্কর জীবনকাহিনী শুনে। বনানীর মা-বাবা আছেন। তাঁদের অফুরান স্নেহচ্ছায়ায় মানুষ হয়েছে বনানী। জীবনের এত বড় সর্বনাশের আঘাত তাকে সইতে হয়নি। সে অনেক কিছু পেয়েছে। অর্কর তুলনায় সে অনেক ভাগ্যবান। তাই আজ অর্কর প্রতি এই সমবেদনা বনানীর মনে নতুন এক আবেশ আনে।

সরে এল বনানী। ওদের মাঝখানে এখন যাওয়া ঠিক হবে না, এটা সে বুঝেছে। তবে অর্কর জীবনের এই বেদনাটা বনানীকেও আবিষ্ট করেছে। সভ্য,শিক্ষিত সমাজের এই রূপটা মেনে নিতে পারে না সে।

অর্কর মনে হল, হয়তো আজকের সমাজে সব কিছু মানিয়ে নিয়ে চলার শিক্ষাই তাকে নিতে হবে। বিদ্রোহ করে সব কিছু নিমেষের মধ্যে বদলানো যাবে না। একে ধীরে-ধীরে বদলানোর চেষ্টা করতে হবে আগামী প্রজন্মকে। তার জন্য চাই প্রস্তুতি। তাই সব কিছু মানিয়ে নিয়েই লড়াই চালিয়ে যাওয়া দরকার।

কাল যেন অর্কর দেহ-মনের উপর দিয়ে একটা প্রচণ্ড ঝড় বয়ে গিয়েছিল। আজ এই বাড়িতে

এসে দাদু, ঠাকুরমা কাছে যেন সে নিজেকে আবার ফিরে পায়। নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দ্যাখে। স্নান, খাওয়ার পর অর্ক ঘুমিয়ে পড়ে। সারারাত তার ঘুম হয়নি।

হঠাৎ ঘুমটা ভেঙে গেল। কানে এল একটা মিষ্টি সুর। ঘুমচোখে দেখল, ছাদের ওদিকে একটি মেয়ে। ওই সুরটা অর্কর মনে একটা বিচিত্র অনুভূতি জাগিয়েছে। সে উঠে পড়ল। ঘরের বাইরে বেশ কিছুটা খোলা ছাদ। সেখানে ঠাকুরমার বাগান। টবে নানা ফুলগাছ লাগিয়েছেন তিনি। শীতের দিনে কয়েকটা টবে বেশ কয়েকটা ডালিয়া, গাঁদা ফুটে আছে। মেয়েটি ওই সব গাছের পরিচর্যাও করছে, আর গান গাইছে আপন মনে। হঠাৎ পায়ের শব্দে তাকাল বনানী। দেখল, সামনে অর্ক। এই বাড়িতে এরকম কেউ থাকতে পারে, তা জানা ছিল না অর্কর। বনানী বলল, "তুমিই অর্ক! তোমার কথা শুনেছি ঠাকুরমার কাছে। আমাকে এখানে দেখে অবাক হচ্ছ তো? তা অবাক হওয়ারই কথা। আমি বনানী, এক তলায় থাকি।"

অর্ক দেখছে মেয়েটাকে। ওই এই বেপরোয়াভাব আর ওভাবে কথা বলা, কেমন যেন বিরক্তিই আনে অর্কর মনে। তার মনে পড়ে জুঁই চ্যাটার্জির কথা, তার মা'র কথাও। দু'জন মহিলা তার জীবনে এনেছে শুধু দুঃখ আর যন্ত্রণা। তার সব আশা, স্বপ্নকে ব্যর্থ করে দিয়েছেন। এই মেয়েটাকে দেখে তার মনের ঝড়টা যেন আবার জেগে উঠেছে।

অর্ক বলল, "নীচের তলায় ভাড়া থাক, তবে ছাদে এসে এসব করছ কেন? গানও গাইছ। এই ছাদে তোমাদের আসা-যাওয়ার ব্যাপারে কোনও বিধিনিষেধ নেই?"

বনানী একটু অবাক হল অর্কর কথায়। বনানী দেখেছে, এ-পাড়ার এবং কলেজেরও অনেক ছেলে তার দিকে এগিয়ে আসতে চায়। বনানী অবশ্য সাড়া দেয়নি। এখন বনানী দেখল, এই প্রথম তরুণ তার সান্নিধ্য পেতে আগ্রহী নয়। ওর মনের অতলের সেই জ্বালা, যার উৎপত্তি নিজেদের নিদারুণ অবজ্ঞা আর অবহেলা থেকে, সেই জ্বালাভরা মনই তাকে জীবনের এই সুর থেকে দূরে সরিয়া রাখতে চায়। বনানী এটা বুঝেছে। তাই তার রাগ হয়নি। বনানী বলল, "জীবনে দুঃখ, বিপদ যেমন অযাচিতভাবে আসে, তেমনই সরেও যায়। তাকে মেনে নিতে হয়। মানিয়ে নিতে হয় সুস্থভাবে বাঁচার জন্য।"

আজকের সমাজে বহু বেদনার মাঝখানেও মানুষ নতুন আশা নিয়ে বেঁচে আছে এই মানিয়ে চলার জন্যই। পরিবেশকে মানিয়ে নিতে না পারলে, তাকে প্রকৃতিই বিনষ্ট করে দেয়। মানুষকেও সমাজে বাঁচতে গেলে সব কিছু মানিয়ে নিতে হয়।

বনানী বলল,"যাই, ঠাকুরমার পান সাজতে হবে। জরদাও আনতে হবে।"

চলে যায় বনানী। অর্ক এত দিন এভাবে চিন্তাভাবনা করেনি। সে শুধু বিদ্রোহ করতেই চেয়েছিল। নতুনভাবে বাঁচার কথাটা ভাবেনি। এবার তাই অন্যভাবে ভাবতে শুরু করল। নির্মলবাবুও নতুনভাবে ভাবছেন সব কিছু। তাঁর কারখানা লিজ দিয়েছিলেন, কাজ দেখার কেউ ছিল না বলেই। তাই তিনি পরদিনই গাড়িতে করে অর্ককে নিয়ে আসেন তাঁর কারখানায়। পৈতৃক আমলের কারখানা। সে সময় এদিকে লোকবসতি ছিল না। তখন শহরতলিতে অনেকটা জায়গা নিয়েই এই কারখানার পত্তন করা হয়েছিল। নির্মলবাবু বললেন অর্ককে,"এই কারখানা তোমার। আমি থাকব না, তুমি হবে মালিক। সে ভাবেই কাগজপত্র তৈরি করে দেব। কাল থেকে কারখানায় আসবে। সব কিছু বুঝে নিয়ে এবার তোমার কারখানা গড়ে তোলো নতুন করে। বাঁচার লড়াইয়ে সামিল হতে হবে। বাধাবিপত্তি জয় করে এগিয়ে যাওয়ার নামই তো জীবন।"

অর্ক দেখছে এই কারখানাকে। বহু মানুষের রুজিরুটির জোগাড় হয় এখানে। তাকে এই কাজের ভার নিতেই হবে। সে হার মানবে না। অর্কও নতুন করে বাঁচতে চায়। তার বাবা-মা, এমনকি জুঁই চ্যাটার্জিকেও দেখিয়ে দিতে চায় যে, সে-ও অনেক কিছুই করতে পারে।

অর্ক বলল, "তাই হবে দাদু। আমি সব কিছু মানিয়ে নিয়ে চলার চেষ্টাই করব।

নির্মলবাবু খুশি হন। তাঁর ছেলেদের কাছে এই আশ্বাস তিনি পাননি। এই আশ্বাস তাঁকে দিয়েছে নতুন এই প্রজন্মের সদ্য জাগরিত যৌবন।

ফেরার পথেই অর্ক বুঝতে পারল, তার শরীরটা ভাল নেই। দু'-তিনদিন আগে সারারাত বৃষ্টিতে

ভিজেছিল। ওই শীতের রাতে বৃষ্টিতে ভেজার জন্যই এবার অসুস্থ হয়ে পড়েছে সে। জ্বরটা বেড়ে চলেছে। বাড়ি ফিরল যখন, তখন বেশ জ্বর। নির্মলবাবু উত্তেজিত বোধ করলেন। সাবিত্রীও ভাবনায় পড়লেন। বললেন, "ছেলেটা অসুস্থ হয়ে পড়ল। রাতভর ভিজেছে ওই ঠান্ডায়। এখন যে কী করি!"

সাবিত্রী ঘাবড়ে যান। অর্কর জ্বর কমে না। ডাক্তার ওষুধপত্র দিয়েছেন। তিনদিন কেটে গিয়েছে। এবার নির্মলবাবু বললেন,"ওর বাবাকে খবর দিই।"

সাবিত্রী বললেন, "না। বিমল এসে কী করবে? অর্করও মত নেই। যা করার আমি আর বনানীই করছি। জ্বরটা আজ কম। দেখা যাক আজকের দিনটা। না হলে বড় ডাক্তারকেই কল দিতে হবে।"

ক'দিন বনানীও রয়েছে ঠাকুরমার সঙ্গে, অর্কর ঘরে। ঠাকুরমার বয়স হয়েছে। বনানীই সময়মতো ওষুধগুলো খাওয়াচ্ছে। অর্ক অর্ধচেতন অবস্থায় রয়েছে। তার মনে পড়ে অঞ্জলির কথা। মা চলে গেলেন। বাড়িতে বাবা আর জুঁই চ্যাটার্জিও তাকে মানতে পারছেন না। অর্ক বেরিয়ে এল ঘর ছেড়ে। তবু মা'র উপর আস্থা ছিল। কিন্তু সেখানেও তার ঠাঁই নেই। অঞ্জলি নিজের মতো করে বাঁচতে চান, সন্দীপকে অবলম্বন করে।

হঠাৎ কপালে ঠান্ডা কোমল স্পর্শে চমকে ওঠে অর্ক। কেমন যেন পরম শান্তি জাগে তার মনে। সব যন্ত্রণা ভুলে যায় সে। চোখ মেলে হয়তো দেখবে, মা-ই ফিরে এসেছেন তার জীবনের সব সুর আর আনন্দ নিয়ে। কিন্তু চোখ খুলে সে চমকে ওঠে। দ্যাখে, সেদিন ছাদে দাঁড়িয়ে থাকা সেই বনানীর ডাগর চোখের ব্যাকুল চাউনি। কিন্তু আজ কঠিন কথা বলতে পারল না অর্ক। মনে পড়ে গেল দাদুর কথা। জীবনের সব দুঃখ আর না পাওয়ার যন্ত্রণা যেমন সহজভাবে মেনে নিতে হয়, তেমনই এই কঠিন জীবনে এতটুকু পাওয়াকেও স্বীকৃতি দিতে হয়। মানিয়ে নিতে হয় নতুন করে বাঁচার জন্য।

আজ অর্কর মনে হল, পৃথিবী নিষ্ঠুর নয়, এখনও সব দুঃখ-কষ্টের মধ্যে বাঁচার আশ্বাস আছে। স্বপ্ন নিয়ে আজও বাঁচে মানুষ এই সমস্যা-জর্জরিত সমাজে। অর্কও ওই ডাগর কালো দু'চোখের ব্যাকুল চাউনির মধ্যে যেন আবার নতুন করে বাঁচার আশ্বাস পায়।

আশ্রয়

ধানু মাহিন্দার গোয়ালের বাইরে এসে বলে— মাঠান— এঁড়ে বাছুর হয়েছে 'গ'। সদুঠাকরুণও দেখে নধর বাচ্চাটাকে। তার সখের গরু পিয়ালীর এই প্রথম বাচ্চা। ভালো জাতের গরু; তাই বাচ্চাটাও বেশ বড়সড় হয়েছে। কালো গায়ের রং— চোখদুটোও সুন্দর। কম্পিত পায়ে ওঠার চেষ্টা করছে, পিয়ালী আদর করে ওর গা চাটছে, বাচ্চাটা যেন অপরিসীম খিদে তেষ্টা নিয়েই জন্মেছে, তাই কম্পিত পায়ে ওঠার চেষ্টা করে, চেষ্টা করে বাঁটে মুখ দিয়ে দুধ খাবার জন্য।

ধানু বলে— প্যাটের জ্বালা দেখেছো ঠাকুরণ শালোর!

সদুঠাকরুণ বলে— এতো দুনিয়ার সবারই জ্বালা রে! দে— বাঁটটা ধরিয়ে দে। মায়ের দুধ খাক।

গোপগায়ের মুখুয্যেদের সেজতরফের বড় দুই ছেলে কাজের জন্য শহরে থাকে, শনিবার বাড়ি আসে, ছেলেদের ইচ্ছা শহরেও বাড়ি ঘর করবে, রোজকারপত্র ভালোই করে। আর বাড়ির অবস্থা এক কালে বেশ ভালোই ছিল। জমিদারীর ছ আনির শরিকান ছিল তারা। ধান সাজা-মহল-বনমহল সবই কিছু কিছু ছিল। কিন্তু জমিদারী চলে যাবার পর জমিদারীর নাম গন্ধও মিটে যায়, তবু সৌদামিনী ঠাকুরুণ স্বামী মারা যাবার পর নিজেই জমিজায়গা বাগান পুকুর সব বজায় রেখেছেন। দুই ছেলেও ভালোভাবে, লেখাপড়া শিখে এখন একজন ব্যাঙ্কের অফিসার, বড়টি কলেজের অধ্যাপক। স্বচ্ছল পরিবার। সৌদামিনী অবশ্য দাপটের সঙ্গেই গ্রামের তার রাজ্যপাট পরিচালনা করে। গ্রামের কত জনে তার কাছে দায়ে অদায়ে আসে: ধান, টাকার দরকার তাদের। সদুঠাকরুণ-এর সংসারের স্বাচ্ছল্যই রয়েছে, আর দোষেগুণে সৌদামিনী ঠাকরুণ গড়া। তাই লোককে মুখের উপর কড়া কথা শোনালেও বিপদ আপদে লোকদের সাহায্য করে; ধান, টাকাও দেয়।

সদুঠাকুরুণ বাড়িতেই মুনিষ, মাহিন্দার রেখে চাষ করায়। নিজের বাড়িতেই হাল, ফাল আছে, আছে দু জোড়া চাষের বলদ, গোয়ালে বেশ কয়েকটা দুধেল গাই। চাষের খড়ও হয় প্রচুর। খড়-ধানের ভূষি-কলাই এসব চাষের থেকেই আসে। খোল কিছু কিনতে হয়। তাই গরু বাছুরের খাবার অভাব হয় না, সদুঠাকরুণ বলেন— মা ভগবতীর অংশ ওরা। অবলা জীব— ওদের খাবারের যেন ত্রুটি না হয়।

ধানু ব্যাটা খুদেই গরুবাছুরদের খেতে দেয়। মাঠে চরাতে নিয়ে যায় গরুগুলোকে। সদুঠাকরুণও নিজে গরু বাছুরদের তদারক করে। বৈকালে মাঠ থেকে গরুবাছুর গুলো ফিরলে বার বাড়িতে সব গুলোই একবার যায়, ঠাকরুণ ওদের নিজের হাতে খোল খেতে দেয়, সব গরুগুলোই চেনে ঠাকরুণকে।

প্রবীর এ বাড়ির ছোট ছেলে—কলেজে পড়ে। বাড়িতে স্কুটার আছে— দশ কিলোমিটার দূরে মাঝারি শহরে কলেজ। সে ওতেই যাতায়াত করে। প্রবীর বলে গরুবাছুরগুলো মায়ের সৈন্যবাহিনী ওদের রেশন আগে চাই।

এই পরিবেশে ভোলানাথ বড় হয়ে ওঠে, ভোলানাথ অর্থাৎ সেই পিয়ালীর কালো এঁড়ে বাচ্চাটা। ভরপেট দুধ খায় আর দাপিয়ে বেড়ায় নধর কালো বাচ্চাটা। কাদের ইনচার্জ এই খুদিরাম রাগলে বলে— মাঠান, ভোলাকে সামলানো দায় গো। যা ছোটে— এঁড়ে বাচ্চাটার নামকরণ করেছে ক্ষুদিরামই। সদুঠাকরুণ বলে — ঠিকমত খেতে টেতে দিস তো।

ক্ষুদিরাম বলে— শক না দিলে শালো টুঁসিয়ে দেয় গো— মহা শয়তান। না দিলে অন্য গরুকে

মেরে হুটিয়ে মশমশিয়ে খেয়ে ফেলে তারটাই।

বামুনের ঘরের এঁড়ে— খায়দায় আর গায়ে গতরে পুরুষ্ট হয়ে ওঠে। দুবছরেই বেশ জবরদস্ত হয়ে ওঠে ভোলানাথ। ধানু মাহিন্দার বলে— ব্যাটাকে খাসি করে দিই মাঠান—যা বলদ হবে একখানা।

প্রবীর বলে তা মন্দ হবে না।

কিন্তু বাধা দেয় সদুঠাকুরুণ— না। ও যেমন আছে তেমনিই থাকুক। ধানু বলে— এঁড়ে গরু কোন কাজে লাগবে ঠাকরুণ। বদল করলে এর দাম হবে পাঁচ হাজার টাকা।

ঠাকরুণ রাজী নয়। নধর কালো এঁড়েটার ডাগর কালো চোখ যেন কি মায়া ফুটে ওঠে। ঠাকরুণ বৈকালে বাইরের বাড়িতে বসে— ও ব্যাটা ঠিক সকলের আগে এসে ঠাকরুণের হাত থেকে খোল খাবে, সদুঠাকরুণ ওর গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে, ভোলানাথও ওর হাত চেটে কৃতজ্ঞতা জানায়। যেন কত শান্ত ভদ্র সে।

অবশ্য শান্ত-ভদ্র মোটেই নয় ওই এঁড়েটা। এর মধ্যে পালে গিয়ে এর তার গরুর সঙ্গে মারপিট করে, খুদে রাখাল গরুগুলোকে মাঠে ছেড়ে বাগানের ছায়ঘন তেঁতুল গাছের নীচে গামছা পেতে ঘুমোতো এতদিন। এখন ওই ভোলানাথ তার ঘুম কেড়ে নিয়েছে। পাল ছেড়ে মাঠে কার ফসলে গিয়ে মুখ দেবে দৌড়— খুদে ছোটে ওকে ফিরিয়ে আনতে। ভোলানাথও ছোটে, দুপুর রোদে খুদের কালঘাম ছুটিয়ে কয়েক ঘা পাচন বাড়ি খেয়ে পালে ফিরে আসে ভোলানাথ। খুদে গর্জায়, শালো এঁড়েকে পিটিয়ে লাশ করে দোব। শালো হারামী—

ভোলানাথ নির্বিকার।

সেদিন সদুঠাকরুণের বড় ছেলে সুবীর — মেজ ছেলে অধীরও কিসের ছুটিতে বাড়ি এসেছে। ধানু মাহিন্দার ভেবেছিল বলদ করে কাজে লাগাবে এঁড়েটাকে— তা হয় নি। বড়বাবু-মেজবাবুকেও কথাটা জানায় ধানু— ঠাকরুণ তা করতে দেবে না। শালো এঁড়েই থাকবে আর জ্বালাবে। তার চেয়ে আবদুল পাইকের ভালো দাম দিতে চায়, দিয়ে দেন ওটাকে। না হলে ব্যাটা দিনকে দিন যা হচ্ছে তাতে বিপদ না বাধায়।

অবশ্য ভোলানাথ এখন দু'একজনকে ঈষৎ গুঁতোনিও দিয়েছে। মেজবাবুকেই সেদিন লালজামা পরা দেখে তেড়ে এসেছিল। তাই মেজবাবু অধীরও বলে তাই ভাল।

ধানু জানে আবদুল পাইকের নামকরা গরুর ব্যাপারী, সে ক'দিন থেকেই ধানুকে ধরেছে কই এঁড়েটাকে যদি বিক্রী করাতে পারে ঠাকরুণকে দিয়ে ভালো লাভ হবে তার। আর ধানুকেও পঞ্চাশ টাকা নগদ দেবে— এক জোড়া গামছাও।

তাই ধানুই সেদিন আবদুল পাইকেরকে বড়বাবুর সামনে এনে হাজির করে, আবদুল বলে— আজ্ঞে সাতশো টাকা দিব— এঁড়ে গরুটাকে দিয়ে দিন। আপনাদের ঘরে ওকে তো কোন কাম হবে না।

বড়বাবু অর্থাৎ সুবীর বলে— পুরা হাজার করো— আবদুল জানে ওটাকে খাসি করে বলদ বানিয়ে সে আরামসে পাথরবাড়ির হাটে চার পাঁচহাজারে বেচবে। তবু কাঁদুনী গায়— আর একশো টাকা দিব বড়বাবু। গরীব মানুষ।

মেজবাবু বলে ওতেই দাও বড়দা, আপদ বিদেয় হোক।

আবদুলও খুশি, ধানুও ভাবে পঞ্চাশ টাকা তার কমিশন আর দুটো গামছাও পাবে। কিন্তু বাদ সাধলো সদুঠাকরুণই বলে সে সুবীরকে— ওই তোমাকে ওই ব্যাটা কসাই-এর হাতে দেবনা। ও ঘরেই থাকুক— বড়-মেজ ছেলে বলে— সে কি!

ঠাকরুণ বলে— তোদের এত অভাব যে ঘরের এঁড়েকেও বেচতে হবে? এঁড়ে গরু বেচব না।

ভোলানাথও যেন ব্যাপারটা জানতে পেরে এবার ঠাকরুণের গা ঘেঁসে এসে দাঁড়িয়ে ওই আবদুল আর ধানুকে নিরীখ করছে। অবলা প্রাণীও বুঝেছে ওদের মতলব। তাকে এই বিপদে রক্ষা করতে পারে এই ঠাকরুণই। তাই ওর দিকে চায় নীরব কালো চোখের মমতা ভরা চাহনি মেলে। সদুঠাকরুণ বলে— আবদুল, ভোলাকে বিচবো না। তুমি যাও।

মেজবাবু অধীর বলে— মায়ের পোষ্যপুত্র উনি। থাকুক— আর মস্তানি করুক। ব্যাটা এঁড়ে মহা শয়তান।

রয়ে গেল ভোলানাথ বহাল তবিয়তে। খায় দায়— ইচ্ছামত পালে যায় আর খুদেকে দৌড় করায় দিন ভোর। বৈকালে নিরীহ ভালো মানুষের মত ঠাকরুণের কাছে এসে খোল খায়। খুদে বলে— মাঠান, আমাকে ক্ষ্যামা দ্যান। আমি আর গরু চরাতে পারবো না। উ শালা খচ্চর এঁড়েকে সামলানো মহা দায় গো।

গিন্নীমা বলে— দ্যাখতো কত শান্ত।

খুদে বলে — ওর গুনের সীমা নাই— শালাকে তাড়াতেও পারলাম না বোদ করাব কিন্তু।

গিন্নীমা বলে— না, না ভোলা কিছুই করবে না।

ভোলানাথ আরামসে আছে সদুঠারুণের ছত্রছায়ায়। আর ইদানীং পালে গিয়ে ঈষৎ প্রেমচর্চাও শুরু করেছে। প্রেমিকারও অভাব নাই— খুদে রাখাল গর্জায়— শালো সুব্বা!

বেশ চলছিল, বর্ষা নেমেছে। মাঠে মাঠে চাষের কাজ শুরু হয়েছে। লাঙল দিয়ে মাটি তৈরী করে ধান পোতার কাজ চলেছে, এসময় চাষের বদল, চাষীর সময় নেই। মাসখানেক মাত্র সময়, এর মধ্যে ধান পোঁতার কাজ, চাষের কাজ সব শেষ করতে হবে।

সতু ঘোষ ছোটখাটো চাষী। নিজের সামান্য কিছু জমি আর কিছু অন্যের জমি ভাগে চাষ করে কোনমতে সংসার চালায়। একজোড়া বলদ দিয়ে নিজের হালে চাষ করে খেটে খুটে। সেই সতু ঘোষের একটা বলদ হঠাৎ সাপে কেটে মারা যায়। সামনে বর্ষা আসছে, চাষ করবে কি করে। একটা বলদের দাম নিদেন পক্ষে তিনচার হাজার টাকা, কোথায় পাবে এত টাকা। সতু ঘোষের চাষই হবে না। মুখের অন্ন চলে যাবে গরুর অভাবে।

শেষ অবধি সতু ঘোষ এসে ধর্না দেয় সদুঠাকরুণের কাছে। মাঠান খুড়িমা, আপনার ওই এঁড়েটাকে দিন ওটাকে হাল বশ করে কোনমতে চাষটা তুলি, না হলে সবগুলি উপোস দিয়ে মরতে হবে। এঁড়েটার জন্য পাইকের সে দর দিয়েছিল আটশো টাকা তাই দোব মা ঠাকরুণ। বাঁচান আমাকে।

ওর কান্নাকাটিতে ঠাকরুণ বলে— দাম তোকে দিতে হবে না সতু। তুই নিয়ে যা এঁড়েটাকে, তবে বলদ ফলদ করাবি না। খেতে টেতে ঠিকমত দিবি— যা যদি তোর কাজে লাগে নিয়ে যা। গাঁ ঘরেই থাকবে দেখতেও পাবো।

সতু ঘোষ তো যেন হাতে চাঁদ পায়, বিনাপয়সায় এঁড়েটা পাবে ভাবতেই পারেনা। ধানু বলে— সতু, এমন দাঁও মারলে মাগনা— কিছু দাও।

সতু ঘোষ অবশ্য ধানুকে বঞ্চিত করে না, গোপনে কিছু দিয়ে ভোলানাথকে এনে তার গোয়ালে তোলে।

ভোলানাথ অবশ্য খুব খুশি নয়— এই ঠাঁই বদলে, দু'একবার মাথা নেড়ে প্রতিবাদ করতে ধানুর লাঠি খেয়ে থামলো। ধানু বলে— নে যা সতু, শালা এঁড়ের এবার তেল মারতো।

ভোলানাথকে নিয়ে সতু ঘোষ লাঙলে যুতে বালি মাটিতে হালটানার মহড়া শুরু করে। ভোলানাথ ভাবেনি তার এহেন অবস্থা করবে ওই ঘোষের পো। লাঙল টানবে কি ভোলানাথ লাঙল নিয়ে ধপ্ করে মাটিতে বসে পড়ে, না নড়ন চড়ন। পাচন পেটা করেও তুলতে পারেনা ওকে ভূমিশয্যা থেকে। সতু ঘোষও ছাড়ার পাত্র নয়, হালবশ করতে পারলে তার কাজে লাগবে এঁড়েটা। সতু ঘোষ বেশ ঝাড় থেকে গুডুম বেগুন লতা একরাশ এনে ভোলানাথের তলপেটে এবার বেধে দেয়। ওই লতার সর্বাঙ্গে কাঁটা। ভোলানাথ লাঙল নিয়ে ভূমিশয্যা নিয়েই এবার বুঝতে পারে এই কর্ম আর চলবে না। কারণ চাপ পড়তেই পেটের নরম চামড়ায় এই লতার কাঁটা বিধতে থাকে জ্বালার চোটে নিজেই ধড়মড়িয়ে উঠে পড়ে ভোলানাথ। সতুর পাচন বাড়ি খেয়ে এবার মাথা নিচু করে লাঙল টানতে থাকে। সতুও খুব খুশী। বলে শালা এঁড়ে লাঙল টানবি না? তোর ঘাড় টানবে।

ক্রমশ ক'দিনেই সতু ওকে লাঙল টানায়, গাড়ি টানায় ভোলানাথ মার খায়— মাথা নিচু করে লাঙল

টানে। তাগদও আছে। দিনে দুবিঘে জমিতে চাষ দিয়ে দেয়। চাষীরা বলে— না সতু। তুই জিতে গেছিস। দারুণ জোড়া হয়েছে তোর বদলের সঙ্গে।

সতুও নিশ্চিন্ত হয়। তার চাষের কাজ আর আটকাবেনা।

সেদিন বৈকালে সতু ঘোষ বেলা অবধি লাঙল দিয়ে বেশ কিছু জমি চাষ করে বাড়ি ফিরছে। ভোলানাথকে বেধেছে বাইরের গাছতলায়, খেতে দিয়ে নিজে চান করে খেয়ে দেয়ে এসেছে বৈকালে গরু-বলদগুলোকে দেখতে। ভোলানাথ এতদিন ধরে বহু অপমান আঘাত নীরবে সহ্য করেছে। আজ সতু কাছে আসতেই এঁড়েটা একটানে গোঁজ সমেত ছিটকে তুলে সামনে সতুকে দেখে ওকে সটান দুই শিং দিয়ে এক ঝটকায় মাথায় তুলে নেয়, সতু ঘোষ এমন পরিস্থিতির জন্য তৈরী ছিল না। ভোলানাথ এতদিন ধরে সতুর রকমারি অত্যাচার পাচন বাড়ি সব সহ্য করেছে, আজ তারই জবাব দিতে চায় সে। সতু চিৎকার করে— কে শোনে কার কথা। ভোলানাথ শিং দিয়ে সতুকে তুলে একটা পাক দিয়ে নিখুত ডিস্‌কাস ছোড়ার ভঙ্গীতে মাথা ঝাড়তেই সতু ঘোষ শূণ্য পথে একটা চক্কর খেয়ে নতুন পুকুরের কাঁকুড়ে কঠিন মাটিতে কাটা কলা গাছের মত আছড়ে পড়ে আর্তনাদ করে— ছুটে আসে সতুর মা। চীৎকার করছে বুড়ি— ওগো মেরে ফেলল গো।

সতু উঠতে যাবে, ভোলানাথ আর এক গুতোয় সতুকে উঁচু পাড় থেকে ফুটবলের মত গড়িয়ে একেবারে পুকুরের জলে ফেলে এবার বিজয়ী বীরের মত দাড়ি-গোঁজ সমেত সিধে চলে আসে ঘোষ পাড়া থেকে সদুঠাকরুণের বার বাড়িতে।

সদু ঠাকরুণ দেখে ভোলানাথকে, গায়ে জলকাদা—ক'দিন হাল টেনে নধর গতরও একটু সেকেছে, গলায় দড়ি-গোঁজ, এসে বেশ জোর করে ডাক দেয়— আঁ—

ঠাকরুণের কাছে এসে নিরীহ ভালোমানুষের মত দাঁড়িয়ে ডাগর চোখ মেলে চাইল। খোল খেতে দেয়, খায় না ভোলানাথ। ডাক পাড়ে— আঁ। অর্থাৎ ঠাকরুণের উপর অভিমানই হয়েছে তার। তাকে এইভাবে বিদায় করতে, ঠাকরুণ বলে— খা-খা ভোলা।

এমন সময় সারা গ্রামে বিদ্যুৎ গতিতে খবরটা ছড়িয়ে পড়ে, ঠাকরুণের এঁড়েগরু সতু ঘোষকে খুন করতে করতে রেখে এসেছে। বেচারাকে আধমরা করে ছেড়েছে, কে জানে হাত পা কোমর সতু ঘোষের আছে না গেছে।

সতু ঘোষের মা তো পাড়া মাথায় করে এসে হাজির, ঠাকরুণই সে তার ছেলেকে খুন করার জন্য এঁড়ে গরুকে বলেছিল সারা গাঁয়ের লোককে সেই কথাটা জানাতে চায়। প্রবীর বলে মাকে,— এখন খুনের দায়ে না পড়ো ওই এঁড়ে গরুর জন্য, দ্যাখোগে সতুকে কি করেছে তোমার ভোলানাথ।

সত্যিই কাহিল অবস্থা সতুর, ঠাকরুণই তিনচার'শ টাকা খরচ করে সতুকে খাড়া করে আর সতু ঘোষ বলে— চাষ না হয় না হোক, ওই খুনে এঁড়েগরুকে আর নেবনা।

ভোলানাথ আবার সদুঠাকরুণের গোয়ালেই বিরাজমান হলো।

খুদে রাখালও রীতিমতো সমীহ করে ভোলানাথকে পালে যায়। এখন দশাসাই চেহারা— নধর দেহ। স্বাধীন ভাবেই বিচরণ করে এর তার ফসলে মুখ দেয়, তাই নিয়েও নালিশ তো আছেই; সেদিন ভটচায মশায় শিবপুজো করে আতপচাল নিয়ে ফিরছে, কোথায় ছিল ভোলানাথ সটান এসে চালের পুটুলিতে মুখ দেয়। ভটচায মশায় ছাতার বাঁট দিয়ে ঘা মারতেই ভোলানাথ একটু মৃদু প্রতিবাদে মাথা নাড়ে আর তারই ধাক্কায় শীর্ণ ভটচায মশায় ছিটকে পড়ে সার গাদায়। সর্বাঙ্গে গোময় লিপ্ত হয়ে ভটচায দৌড়াচ্ছে প্রাণভয়ে। এই নিয়েও বেশ আলোচনা হয়। ভটচায বলে— ওই খুনে এঁড়েকে গ্রাম ছাড়া করতেই হবে।

অনেকেই সেটা সমর্থন করে। শেষ অবধি কোনরকমে সামাল দেয় ঠাকরুণ, বলে— ওটাকে এবার বেঁধে রাখ খুদে।

প্রবীর বলে— তার চেয়ে বিদেয় কর না কেন। আবদুল এখনও পাঁচশো দিতে চায়।

ঠাকরুণ বলে— ও থাকবে, কসাই-এর হাতে ভোলাকে তুলে দেবনা। অবশ্য ছেলেরাও এবার

মৃদু প্রতিবাদ তোলে, মেজবাবু জানায় এবার কিছু করলে ওটাকে তাড়াবোই।

বর্ষার শেষ, ভোলানাথ রয়েছে বহাল তবিয়তে, এখন স্বাধীন সে। মাঝে মাঝে পালে যায়— ফেরে কোনদিন, ফেরে রাতে এদিক ওদিকে ঘুরে, খুদে সবদিন ওকে বাধতেও পারেনা।

সেদিন রাতের বেলায় বৃষ্টি নেমেছে। ভোলানাথ ফেরে নি। প্রবীর বলে— কার ফসল খাবে—সকালে সে এসে কথা শোনাবে।

বড়বৌমা বলে— এতো নিত্যই ঘটে, শুকনো ঝামেলা শুরু হবে এঁড়েকে নিয়ে। তবু বিদেয় করবে না মা।

ঠাকরুণও বুঝেছে বাড়ির অন্যসকলেই চায় ভোলানাথ বিদেয় হোক। কিন্তু যাবে কোথায়? ঠাকরুণ চুপ করেই থাকে।

রাতে সারা গ্রাম নিশুতি। রাতের অন্ধকারে মদন আর গুপীনাথ পাশের গ্রামের বনেদী চোর। তারা তক্কে তক্কে ছিল ঠাকরুণের বাড়িতে ঘা মারার জন্য। সোনাদানা-কানাকড়ি মজুত থাকে ঠাকরুণের ঘরে। সেদিন প্রবীরও নাই, শহরে গেছে, বাড়িতে রয়েছে সদুঠাকরুণ আর বড় বৌমা—মেজবৌমা, মেয়েদের পুরী, নীচের ঘরে ধানু ধেনো গিলে ঘুমুচ্ছে। এমনি রাতে হানা দেয় গুপীনাথ আর মদন। পাইপ বেয়ে ছাদে উঠে দোতলার ঘরে নেমে এসেছে। মুখ চোখে কালো কাপড় জড়ানো— হাতে উদ্যত ছুরি। সদুঠাকরুণ আর তার দুই বৌমাদের ঘরে আটকে আলমারী সিন্ধুক খুলে সোনা দানা -টাকা বেশ কয়েক হাজার টাকার মাল পুটুলি বেঁধে নেমে যাচ্ছে বিনা বাধায়।

পাইপ বেয়ে নামতে যাবে নীচে, আগে গুপীনাথ তারপর আসছে মদন, খুব খুশি ওরা বিনা বাধায় এমন দমকা রোজকার হবে ভাবতেও পারেনি। হঠাৎই কাজটা ঘটে যায়।

ভোলানাথ সেদিন আহার বিহার সেরে রাতে বাড়ি ফিরে দেখে গোয়াল ঘর বন্ধ, ও এসে বাইরের রকেই বসে জাবর কাটছিল, হঠাৎ পাইপ বেয়ে দুই মূর্তিকে নামতে দেখে কি খেয়াল বশে এগিয়ে যায়। কালো রং আঁধার মিশে গেছে, সামনেই পেয়েছে পুটুলি সমেত মদনকে— এক ঝটকায় ওকে শিং এ তুলে এক চক্কর দিয়ে আছড়ে ফেলেছে সান বাঁধানো রকের উপর। বেকায়দায় পড়ে মদনার মাথাটাই বেল ফাটা হয়ে ফেটে যায়, গুপী লাফাতে যাবে— তাবপর গুপীকে এক জাম্পেশ গুতোয় ছিটকে ফেলেছে পথের ধারে একটা খেজুর গাছের উপর আর গুপী অজস্র খেজুর কাঁটার উপর সজোরে পড়ার ফলে ওই তীক্ষ্ণধার খেজুর কাঁটার উপর শরশয্যায় শায়িত ভীষ্মের মত— কন্টক শয্যায় গেঁথে গিয়ে তীক্ষ্ণ আর্তনাদ করছে— ওরে বাপরে — গেলাম রে, মলাম রে।

ততক্ষণে সদুঠাকরুণ চীৎকার করে— চোর — চোর—

পাড়াসুদ্ধ লোক জেগে ওঠে— তারপর দেখা যায় মদন আর গুপীর ওই বেহাল অবস্থা। ভোলানাথকে কোনমতে সামলায় ধানু, মাল সমেত চোরও ধরা পড়ে যায়।

চুরির খবর পেয়ে শহর থেকে ছেলেরাও এসে পড়ে। খুব বাঁচিয়েছে ভোলানাথ তাদের। সুতরাং ভোলানাথকে বিদায় করার প্রসঙ্গটা চাপা পড়ে গেল। ভোলানাথ এখন গাঁয়ে বেশ দাপটের সঙ্গেই ঘোরে। গ্রামের লোকদের ফল ফসলও খায়, কিন্তু সদুঠাকরুণের কাছে অনেকেরই টিকি বাঁধা, তাই খুব বেশি ঘাঁটাতে সাহস করে না তাকে। দুচার ঘা মার দিয়ে আড়ালে তারা ভোলানাথকে আপ্যায়িত করে। অবশ্য তাতে ভোলানাথের কিছু যায় আসে না। ওই বিশাল দেহে দুচার ঘা সঠিক আঘাত তেমন কোন সাড়া জাগাতে পারে না।

অবশ্য এর আগে একদিন নামো পাড়ার গোবিন্দের বীজধান খেয়ে ফেলতে গোবিন্দ বেশ রেগে ভোলানাথকে ধরে মাইল খানেক দূরের খোঁয়াড়েই পুরে দেয়। ভোলানাথ তখন বেশ শান্তই। তারপর রাতে ভোলানাথ গুঁতো মেরে খোয়াড়ের বেড়া ভেঙ্গে বন্দী অন্য গরুদের মুক্তি দিয়ে নিজেও মুক্ত হয়ে স্বস্থানে ফিরে আসে। তারপর থেকে খোঁয়াড়ওয়ালাও আর ভোলানাথকে খোঁয়াড়ে নেয়না— সুতরাং ভোলানাথ এখন মুক্ত বিহঙ্গের মতই বিচরণ করে। গায়ের লোক ওকে নিয়ে অস্থির। তবু কিছু করার নেই।

কিন্তু ভোলানাথ যেখানেই থাকুক বৈকালে ঠাকরুণের কাছে আসবেই ওর হাতের খোল খাবে— ঠাকরুণও ভোলানাথের গলায় গায়ে হাত বুলোয়, বলে সদুঠাকরুণ— একটু শান্ত হ' ভোলা। এসব কি করিস লোকে তোকে এত শাসন করে, তবু বদলাবি না?

ভোলানাথ ডাগর চোখ মেলে দেখে সদুঠাকরুণকে। মাথা নেড়ে জানায় এবার থেকে শান্তই হবে। কিন্তু বাইরে এসেই আবার নিজমূর্তি ধরে। গ্রামের লোকও অতিষ্ট হয়ে উঠেছে।

সদুঠাকরুণ এতদিন সুস্থ দেহে দাপটের সঙ্গে গ্রামে বাস করেছে। হঠাৎ তার শরীরটা ভেঙ্গে পড়ে। বেশ কিছুদিন ধরেই সে অসুস্থ, শয্যাশায়ী। ছেলেরা শহরেও নিয়ে যায় বড় ডাক্তার দেখাতে। তিনি দেখে শুনে ওষুধ দেন। সদুঠাকরুণ শহরে ওই গিঞ্জির মধ্যে থাকতে পারে না। চিরকাল এই খোলা মেলা গ্রামেই থেকেছে সকলের সঙ্গে সুখ-দুঃখের সাথী হয়ে। তাই শহর থেকে গ্রামেই আসে সে। চিকিৎসা তবু চলছে কিন্তু ক্রমশ সদুঠাকরুণের অসুখ বেড়েই চলেছে।

ছেলের বৌ-ছেলেরা মায়ের সেবা যত্ন, চিকিৎসার কোন ত্রুটিই করে না। কিন্তু ভটচায মশায়, বলে আড়ালে টিকি নিভে পিদীপের তেল ফুরিয়ে আসছে গো, সলতে ওসকালে আর কি হবে?

গ্রামের মেয়েরা লোকজন অনেকেই এই প্রবীণকে দেখতে আসে, সকলেই এই বৃদ্ধার কাছে কোন না কোন প্রকারে ঋণী, তাই তার জন্য চিন্তিতও।

ভোলানাথ বৈকালে তার এতদিনের অভ্যাসমত এদিক ওদিক ঘুরে ঘুরে বার বাড়িতে এসে বারান্দার সামনে দাঁড়ায়। এতকাল এই সময় ওখানে বসে গরু-বাছুরগুলোকে দেখতো, খোল খাওয়াতো সদুঠাকরুণ, আজ বারান্দায় কেউ নেই ভোলানাথ এদিক ওদিকে দেখে, বাতাসে মুখতুলে কি যেন শোঁকার চেষ্টা করে, তারপর দু একবার ডাক দেয় আঁক— আঁও— আঁক।

কোন সাড়া নেই, কিছুক্ষণ ওখানে দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক চেয়ে বের হয়ে যায় ধীর পদে, ধানু মাহিন্দ্রার বলে শালা খোলের লোভে এসেছিল।

ভোলানাথ ক'দিন আসে আবার ফিরে যায়। চুপচাপ বসে থাকে গোয়ালের বাইরে আর সেই দস্যিপনাও নেই। কারো ধানে জমির ফসলেও মুখ দেয় না।' গোয়ালেই খড়জাব যা পায়, তাই খায়।

ঠাকরুণ ক'দিন নেই শহরে গেছিল চিকিৎসার র্জন্য। সেদিন বসে আছে। ভোলানাথ গোয়ালের সামনে ঝিমুচ্ছে হঠাৎ কিসের শব্দে তার চমক ভাঙ্গে ট্যাক্সিতে করে সদর শহর থেকে সদুঠাকরুণকে নিয়ে ফিরছে ওরা। ধরে ধরে নামাচ্ছে হঠাৎ লোকগুলো সচকিত হয়ে ওঠে ওরে বাপরে ষাঁড়টা গুতিয়ে দেবে নাকি আঁক! ছুটে আসে ভোলানাথ।

ভীত ত্রস্ত লোকগুলোকে বলে সদুঠাকরুণ।

ও কিছু করবে না। আয় ভোলা।

ভোলা আর এগোয় না। থেমে গেছে নিরীহ প্রাণীর মত, মাথাটা বাড়িয়ে দেয় ঠাকরুণের দিকে, ঠাকরুণ দেখছে ভোলাকে— ওর কালো ডাগর চোখে কি বিষণ্ণতা মাখানো ওই অবলা প্রাণীও যেন বুঝেছে আসন্ন কোন বিপদের কথা, তাই স্তব্ধ হয়ে গেছে।

বিনা বাধায়, ওরা সদুঠাকুরণকে ভিতরে নিয়ে এল।

সদুঠাকরুণও বুঝেছে তার দিন ফুরিয়ে আসছে, এতকাল নানা চেষ্টায় সংসারকে বাঁচিয়ে ছেলেদের মানুষ করেছে, তাদের ঘর সংসার করে দিয়েছে আজ এই সংসারে তারও প্রয়োজন আর নেই।

বারান্দায় শুয়ে আছে সদুঠাকরুণ—বিকাল নামছে, সারা বাড়িতে একটা ত্রস্তভাব। সবাই যেন নিচুস্বরে কথা বলে, ছেলে বউরাও বুঝেছে তাদের মা আর সারবেন না।

সদুঠাকরুণ হঠাৎ সেই ডাকটা শুনেছে, বাইরের বাড়িতে এসেছে ভোলানাথ; বলে ঠাকরুণ ওটাকে এখান আন, আর চাট্টি খোল ভুষি দে একটা ডালায়।

মেজছেলে বলে ওই হতচ্ছাড়া ষাঁড় কি করবে ঐখানে?

সুধীর বলে— ডাক ডাক ধানু।

ধানু ভোলাকে নিয়ে আসে, সদুঠাকরুণ বিছানায় কোনমতে উঠে বসে আয়, আয় ভোলা খা—

ভোলা শান্ত নিরীহ প্রাণীর মতো এগিয়ে আশে সদুঠাকরুণ কাছে। খোলভূসির ডালাটা দেখছে আর দেখছে শয্যাশায়ী অসুস্থ সদুঠাকরুণকে, অবলা প্রাণী ও যেন বুঝেছে এবার তার একান্ত আপনজনই যেন তাকে ছেড়ে চলে যাবে।

খা!

খায় না ভোলা, ঠাকরুণের হাতে জিব দিয়ে আদর করে আর বড় ডাগর কালো চোখে গড়িয়ে পড়ে অশ্রু, নীরব অশ্রু, ওর কান্নায় কোন ভাষা নেই শুধু— চোখের জলই পড়ে। ঠাকরুণও দেখছে ওকে, দেখছে এবাড়ির বড় বৌ সবিতা।

সদুঠাকরুণের হাতে আদরের ছোঁয়া রেখে খোলে ভূষিতে মুখ না দিয়ে বের হয়ে গিয়ে গোয়ালবাড়ির সামনে ঝাঁকড়া তেতুল গাছের নীচে গিয়ে বসল ভোলানাথ।

সদুঠাকরুণ বলে— বড় বৌমা, আমি না থাকলে ভোলাকে দেখো, ওকে যেন এবাড়ি থেকে ওরা না তাড়ায়।

সবিতা বলে— এসব কথা কেন ভাবছেন মা। আপনি ভালো হয়ে উঠবেন ভোলাও থাকবে এখানেই।

সেই রাতেই সদুঠাকরুণ মারা যায়। সারা গ্রামের মানুষ ভেঙ্গে পড়েছে। গ্রামের এক প্রবীণা মমতাময়ী নারী চলে গেলেন, তার সংস্কারের আয়োজনও ঠিকমত করতে হবে।

সারা গ্রামের লোকই শোকে ভেঙ্গে পড়ে।

জমায়েত হয়েছে বহু মানুষ সদুঠাকরুণের বাড়িতে, বাইরে নানা আলোচনা হচ্ছে। এর মধ্যে দেখা যায় গোয়ালের বাইরে স্তব্ধ স্থানুর মত বসে আছে ভোলানাথ। ওর ওপর রাগ এই গ্রামের বহু মানুষের। সতু ঘোষ ল্যাংড়া হয়ে গেছে, ভটচায মশায়কে গোবরগাদায় ফেলেছিল, নামোপাড়ার গোবিন্দের একদিন তাড়া করে শিং-এ গামছা জড়িয়ে বস্ত্রহরণই করেছিল, খোয়াড়ওয়ালার সম্পদ লোকসান করেছিল সেই রাতে, আর ক্ষেতের ফসল নষ্ট করেনি গ্রামে হেন জন কেউ নেই। সতু ঘোষ বলে— ঠাকুরণের শেষ কাজ চুকে যাক তারপর শালাকে পিটিয়ে গাঁ ছাড়া করব।

ভটচায্ বলে তাই কর। ও পাপ আর কেন?

ভোলানাথ নীরবে কাদের কথা যেন শুনছে আর চেয়ে আছে বড় বাড়ির দরজার দিকে।

সদুঠাকরুণের শেষ যাত্রা শুরু হয়। লোকজন চলেছে শ্মশানে। চিতা সাজানো হয়েছে ছোট্ট নদীর ধারে। সদুঠাকরুণ নশ্বর দেহ জ্বলছে চিতার আগুনে।

নদীর ওপারে দাঁড়িয়ে আছে স্তব্ধ স্থানুর মত ভোলানাথ। সকলের অলক্ষ্যে সেও এদের পিছু পিছু এসেছে শ্মশান ঘাটে, নীরবে চেয়ে আছে ঐ লেলিহান চিতার দিকে ওখানে সদুঠাকরুণের দেহটা পুড়ে ছাই হয়ে গেল। হরিধ্বনি ওঠে।

সন্ধ্যা নামছে। দিনশেষের আবছা অন্ধকারে ওরা জল ঢেলে চিতার আগুন নিভিয়ে ঘরে ফিরছে শ্মশান যাত্রীর দল, স্তব্ধ নির্জনতা নামে শূন্য শ্মশানে, ভোলানাথ এতক্ষণ ঠায় দাঁড়িয়েছিল, এবার সেও অন্ধকারে চলতে শুরু করে তার এতদিনের চেনা কুসুমপুরের দিকে নয়— ওখানে তার আপনজন আর নেই। ভোলানাথ চলেছে সামনে অজানা দিগন্তের পানে, আজ তার আশ্রয়টুকুও হারিয়ে গেছে।

পরদিন গায়ের সকলেই অবাক হয়, তাদের বিতাড়নপর্বের প্রস্তুতিও শুরু হয়েছে ল্যাংড়া সতু ঘোষের নেতৃত্বে। কিন্তু ভোলানাথ আর গাঁয়ে ফেরেনি। এখান থেকে সেও ত চিরকালের জন্য হারিয়ে গেছে। এরপর তাঁকে গ্রামে আর কেউ কোনদিনই দেখেনি তবু সেই ভোলানাথের কথা অনেকেই বলে।

অনুভব

ভি আই পি রোড দিয়ে একটা গাড়ি চলেছে— দামি বিদেশি ঝকঝকে গাড়ি। পথ দিয়ে দেখা যায় মোটর বাইকে চলেছে দুটি মস্তান মতো চেহারার তরুণ। পেছনের সিটে বসা ছেলেটি এই গাড়িটা দেখিয়ে বলে— চাবুক একখানা মাল মাইরি, একেবারে ফাটাফাটি। ওরা গাড়িটাকে একবার ফাস্ট করে বিরক্ত করছে, কখনও ওভারটেক করছে কখনও পাশ দিয়ে যাচ্ছে।

দামি গাড়িটা চালাচ্ছে একটি তরুণী। সে এই ঘটনায় বেশ বিরক্তই হয়। তার পরনে জিন্স শার্ট।

মোটর বাইকটা এই গাড়িটাকে ওভারটেক করে একেবারে সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে যায়। মেয়েটি ব্রেক কষেছে। গাড়িটা একেবারে মোটর বাইকের সামনে গিয়ে থেমে যায়। ছেলে দুটি নেমে যায়, বাইক যে চালাচ্ছিল সেই বলে, আমাকে ধাক্কা মারলেন কেন?

মেয়েটি বলে— উল্টে আপনারাই তো তখন থেকে জ্বালাতন করছেন। অন্যায় করেছ তোমরাই,গাড়ি থামালে কেন? অন্য ছেলেটি বলে ওঠে, তোমাকে দেখে পাগল হয়ে গেছি, মেয়েটি চটে ওঠে, ইউ রাস্কেল। ছেলেটাও চটে উঠে বলে— ধাক্কা মারবে আবার গালাগাল দেবে। ইনসাল্ট করবে— মেয়েটি গর্জে ওঠে— তোমরাই আমাকে ইনসাল্ট করছ। ইতিমধ্যে এদিক ওদিক থেকে কিছু পথচারী চলে আসায় ওই ছেলেদুটো মেয়েটিকে শাসিয়ে চলে যায়।

মেয়েটি ভাবছে— এবার সে ওদের খবর নিয়ে থানাতেই যাবে, রিপোর্ট করবে। থানাতেই যায় ঝিলিক। থানার অফিসার ঝিলিকের ওপর ওই দুটো মস্তানের অত্যাচারের কাহিনী শুনছে সমবেদনার সঙ্গে। হঠাৎ ফোনটা বেজে ওঠে। ফোনটা পেয়ে দারোগাবাবু যেন কি ভাবলেন। তারপর ঝিলিককে বললেন— আপনি একটু বাইরে অপেক্ষা করুন — জরুরী একটা কথা সেরে আপনার কথা শুনবো।

ঝিলিক বের হয়ে আসে— বাইরে একটা বেঞ্চে বসে। হঠাৎ দেখে সেই পথের দেখা মস্তান দুটো এসে ঢুকছে থানাতেই। ঝিলিক অবাক হয়। মস্তান দুটো ঝিলিককে দেখেছে, কিন্তু ওর দিকে নজর না দিয়ে তারা সামনে অফিসারের ঘরে ঢুকে গেল।

ঝিলিক বাইরে থেকে দেখে থানার ওসি ওদের সঙ্গে বেশ হেসেই কথা বলছে— তারা ওসির যেন বেশ পরিচিত বলে মনে হচ্ছে। ছেলেদুটো বের হয়ে এসে এবার ঝিলিককে দেখে বলে— নালিশ তো আমরাও করেছি, ঠিক আছে তুমিও কর, তবে সাবধানে থাকবে। ওরা বের হয়ে গিয়ে বাইকে ওঠে।

ঝিলিক আবার এসেছে ওসির কাছে। ঝিলিক এবার এই ব্যাপারে কথা বলতেই ওসি-ও উগ্র সুরে কথা বলে।

সে বলে— প্রমাণ সাক্ষী না হলে আপনার কথা শোনা যাবে না। একটা জি.ডি করে যেতে পারেন।

ঝিলিক বলে — তদন্ত করলেই স্থানীয় লোকেদের কাছে এর সত্যতা জানতে পারবেন। আপনি চলুন আমার সাথে— ওসিও তা করবে না, সে এখন ফেঁসে গেছে— ঝিলিকও ছাড়বে না। এমনি সময় একটা ভদ্রলোক ওসির ঘরে ঢুকলেন— তিনি মেয়েটির সব অভিযোগই শুনেছেন, শুনেছেন ওসির কথাও। শেষ অবধি তিনিই বলেন অফিসারকে— আপনি ওর অভিযোগের এফ আই আর নিন— এতবড় একটা অন্যায় হয়েছে ওর ওপর তার বিচার হবে না? মেয়েটা তার স্বপক্ষে ওই ভদ্রলোককে সওয়াল করতে দেখে ওর দিকে চাইল। যেন সত্যিকারের একজন সাহায্যকারিকে পেয়েছে ঝিলিক। ওসি তবু রিপোর্ট নিতে চায় না। এমনকি সেই ভদ্রলোকের কথাও শুনতে চায় না— শেষে ভদ্রলোক তার কার্ড বের করে ওসিকে বলেন,

—আমি একজন এ্যাডভোকেট। আমি আপনাকে বলছি— ওনার এফ আই আর নিতে আপনি বাধ্য। এ কেসের তদন্ত করতে হবে আপনাকে। আর আমিও চাই দোষীরা শাস্তি পাক। আপনি কেস্ না নিলেও আমিই ওকে দিয়ে কোর্টে কেস্ করাবো আর সেই কেস্ আমিই লড়বো ওর হয়ে।

এবার ঝিলিকও অবাক হয় ভদ্রলোকের পরিচয় শুনে আর খুশি হয় যে ভদ্রলোক তার ওপর অত্যাচারে প্রতিবাদের জন্য লড়বেন।

ওসির চেহারাটাই বদলে যেতে থাকে।

ঝিলিক ভদ্রলোকের সঙ্গে বের হয়ে আসে। ঝিলিক বেশ হালকা মন নিয়েই বের হয়েছিল কলেজের সোশালে নাচ গানের জন্য। পথে এই বিপদ। ঝিলিক ভদ্রালোকের কাছে কৃতজ্ঞ।

ভদ্রলোক বলে — আমাকে আবার কোর্টে যেতে হবে।

ঝিলিক বলে— আমিও তো ওই পথেই যাবো— চলুন আপনাকে কোর্টে নামিয়ে দিয়ে কলেজে যাবো। গাড়িতে চলুন।

গাড়িতে উঠেছে সেই উকিলবাবু। ঝিলিক তার অচেনা হয়েও আদতে তিনি অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছেন— ঝিলিক তাই তার কাছে সত্যিই কৃতজ্ঞ।

ভদ্রলোকের পরিচয় জেনেছে ঝিলিক। তার নাম অনিমেষ রায়। হাইকোর্টের নামি উকিল।

ঝিলিক বলে— পুলিশ তদন্ত শুরু করলে আপনার সাহায্য তো দরকার হবে। আপনার ঠিকানা—

অনিমেষ পকেট থেকে একটা কার্ড দেয়। তিনিও বলেন— তোমার ঠিকানা?

ঝিলিক এবার অনিমেষকে তার বাড়ির ঠিকানা— বাবার নাম বলতে চমকে ওঠে অনিমেষ। অনিমেষ চেনে ওই মেয়েটির বাবাকে।

অনিমেষ বলে— তোমার বাবা মিঃ দীপ সেন-এর ওপর মহলে বেশ নাম ডাক। ওনার একটা ফোনেই তো... ঝিলিক বলে— বাবাকে আমি এসবে জড়াতে চাই না। আমার ওপর অত্যাচারের প্রতিবাদ আমি নিজেই করবো। বাবাকে এসব কথা আমি জানাতে চাই না। তাই আপনার সাহায্যটাই আমি নেবো— আর আপনি আমার কেস্টা লড়বেন তো?

অনিমেষ বলে— সিওর। তোমার এই প্রতিবাদ মানসিকতাকে আমি শ্রদ্ধা করি। তাই লড়বো কেস্টা। পরে ফোন কোর, উকিলবাবুকে নামিয়ে ঝিলিক চলে যায় তার কলেজে। এমনিতে তার আজ অনেক দেরি হয়ে গেছে— ওদিকে প্রোগ্রামও শুরুর মুখে। তাই কলেজে পৌঁছতেই তার কলেজের বন্ধুরা বলে— এতো দেরি? তোর জন্য রিহার্সাল আটকে আছে।

ঝিলিক বলে— নে শুরু কর।

ওরা ঝিলিকের অপেক্ষায় নাচ গানের রিহার্সাল আরম্ভ করতে পারছিল না— এখন ঝিলিক এসে পৌঁছতে ওরা নাচ গানের রিহার্সাল আরম্ভ করে। কিন্তু ঝিলিক আজ রিহার্সালে মনসংযোগ করতে পারে না। বারবার চোখের সামনে ভেসে ওঠে সেই মস্তানদুটোর মুখ। তাল কেটে যায় নাচে। বারবার ভুল হচ্ছে দেখে, ঝিলিক নিজেই বলে— শরীরটা আজ ভাল নেই রে।

দলের সেক্রেটারি বলে— কলেজে সেদিন মিঃ রিঙ্গোদের প্রোগ্রাম। সেখানে হলভর্তি লোকের সামনে প্রোগ্রাম করতে হবে।

ঝিলিক অবাক হয়— মিঃ রিঙ্গোর মত শিল্পীকে পেলে আমাদের সোশ্যালে?

হেমন্ত বলে— টাকাও ভালোই দিয়েছি। আগের ইউনিয়নকে হারিয়ে এবার আমরা এসেছি— তাই একটা কিছুতো করতেই হবে— যাতে কলেজ ইউনিয়নকে দখলে রাখতে পারি।

অসীম বলে— হলের সব ক-টা টিকিটই বিক্রি হয়ে গেছে, ফাটাফাটি হবে।

ঝিলিক বলে— বিবেকের দল তো পেছনে পড়ে রয়েছে। যদি কোন গোলমাল করে হলের বাইরে?

হেমন্ত বলে— তার জন্য বেশ কড়া পাহারার ব্যবস্থাও রেখেছি। ট্যা-ফুঁ কেউ করলে সবকটাকে জব্দ করে দেবে ওরা।

ঝিলিক বলে— ওরা তো এলাকার মস্তান শুনেছি।

হেমন্ত বলে— যে পুজোর যে মন্ত্র। বিবেকদের ট্যা-ফুঁ করতে দেব না।

বিবেক কলেজের বিরোধী ছাত্রদলের নেতা। ওদের হারিয়ে ভোটে জিতে এবার সেই সিটে। হেমন্তর দল ইউনিয়ন দখল করেছে। তাই বিবেকরা সুযোগ খুঁজছে রিঙ্গোর ফাংশানে ব্যাঘাত ঘটাবার জন্য। জনপ্রিয়শিল্পী অনুষ্ঠানে না এলে হেমন্তরা বিপদে পড়বে। তাই বিবেক রিঙ্গোর কাছে গিয়ে বলে— আপনি সেদিন অনুষ্ঠানে যাবেন না।

রিঙ্গো টপ নাচিয়ে। প্রতিভাবান শিল্পী।

বিবেক তাকে শাসিয়ে বলে— গেলে আপনারই বিপদ হবে। আপনার পা -খানাই আর আস্ত থাকবে না। অবশ্য আপনি যদি ফাংশান বানচাল করতে পারেন তার জন্য উল্টে কিছু টাকা পাবেন আপনি। এবার যা ভালো বোঝেন করুন। আমার শেষ কথা জানিয়ে গেলাম।

রিঙ্গো বলে— আপনার কথা আমার মনে থাকবে।

কলেজের অনুষ্ঠান। দেখা যায় ছেলেরা ভিড় সামলাচ্ছে— আর বাইরে কড়া পাহারার ব্যবস্থাও রয়েছে। ছেলে মেয়েদের মধ্যে বেশ উৎসাহ-উত্তেজনা রয়েছে— সবাই রিঙ্গোর নাচ দেখার জন্য উদগ্রীব হয়ে রয়েছে।

রিঙ্গো মঞ্চে অনুষ্ঠান করতে উঠেছে। চিৎকার-সিটি-হাততালি দেয় উৎসাহী ছেলে মেয়েরা। রিঙ্গোর অনুষ্ঠান শুরু হয় সিটি দিয়ে। হঠাৎ নাচের শুরুতেই রিঙ্গো নাচতে গিয়ে না পিছলে মঞ্চে আছড়ে পড়ে। হই-হই শব্দ ওঠে। রিঙ্গো পড়ে আছে, আর উঠতে পারছে না— তার পা-টাই বোধহয় ভেঙ্গে গেছে। পর্দা পড়ে যায়। রিঙ্গোকে তুলে নিয়ে আসা হয়— রিঙ্গো কাতরাচ্ছে।

উদ্যোক্তরা বলে— ওকে হাসপাতালে নিয়ে চলো। সিওর পা-ই ভেঙ্গেছে। রিঙ্গোকে গাড়িতে তুলে দিয়েছে ওরা। বিবেকের দল এগিয়ে আসে। রিঙ্গো এবার হাসতে হাসতে উঠে বসে।

বিবেক বলে— অভিনয়টা দারুণ করেন। আপনার টাকাটা— বিবেক একটা খাম দেয়— ওকে।

রিঙ্গো বলে— থ্যাঙ্কস্। চলি—

ওদিকে হলে তখন তুমুল হট্টোগোল-হই হই হচ্ছে। মঞ্চে ড্রপসিন ফেলা। ওপারে গণ্ডগোল।

একজন বলে— কি হবে হেমন্ত?

একজন তখন সেই সুদর্শন তিলককে টেনেটুনে ধরে এনেছে।

ছেলেটা বলে— হেমন্ত, এই তিলক। দারুণ নাচে গায়। তিলক নেমে পড়— প্রেস্টিজের ব্যাপার আমাদের।

তিলক বলে— ওরে বাবা। এই স্টেজে নাচ— গান। মারবি নাকি?

ঝিলিক দেখছে ওকে।

হেমন্ত বলে— এখন ওকি নাচ-গান করতে পারবে?

ছেলেটা বলে— এ্যানাউন্স কর।

মাইকে ঘোষণা হয়— আপনারা শান্ত হোন। এবার মঞ্চে আসবেন ডান্সার অ্যান্ড সিঙ্গার মিঃ তিলক। বিগ্ হ্যান্ড ফর মিঃ তিলক।

পর্দা সরে যায়। বাজনা বেজে ওঠে। তিলক দেখছে এই জনতাকে। দেখছে মঞ্চের পাশে ঝিলিককে। কি ভেবে সাহসে ভর করে তিলক গান শুরু করে। তার কণ্ঠস্বর ভালোই, বেশ জোরালো। সুরটা ক্রমশ হলের অশান্ত জনতাকে যেন হাতের মুঠোয় আনছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই হলে সিটি-নাচ গানের উত্তেজনা তৈরি হয়। তিলকের নাচ-গান ওদের মন্ত্র-মুগ্ধ করেছে। ঝিলিক দেখছে ওকে। সেও মুগ্ধ তিলকের নাচ-গানে। তুমুল হাততালির মধ্যে তিলকের অনুষ্ঠান শেষ হয়। হলে তখন শুধুই তিলকের প্রশংসা।

বিবেক হতাশ। ভেবেছিল রিঙ্গো চলে যেতে ঝামেলা হবে। কিন্তু তারপরেই সব সামলে দিয়েছে ওই ছেলেটা।

ওদিকে তিলকের অনুষ্ঠানের পর ঝিলিকও আসে তার সঙ্গে গ্রিনরুমে। আজ ঝিলিকও দেখছে তিলক তাদের মান বাঁচিয়েছে।

হেমন্ত তার ব্যাগ থেকে পাঁচশো টাকার নোট বের বের করে বলে— তিলক এটা তুমি রাখো।

তিলক নেবে না। হেমন্ত বলে— এটা তোমার গানের জন্যে সামান্য সম্মাননা, নাও।

সেই ছেলেটা, যে ওকে নিয়ে এসেছিল সেই ফালতু বলে — নাও গুরু নাও। ভালবেসে কিছু দিলে কেউ না বলতে নেই।

ঝিলিকই এগিয়ে বলে— আমি তো সল্টলেকে যাবো— চলো তোমাদের নামিয়ে দিয়ে যাবো।

তিলক, ফালতুকে নিয়ে আসছে ঝিলিকের গাড়ি। পথে একটা রুটির দোকানে গাড়ি দাঁড় করিয়ে তিলক দোকান থেকে রুটি-তরকারী কিনে নেয়।

ফালতু বলে— বস্তির অনেকেই রাতে প্রায় খায়না। ছেলে বুড়ো না খেয়েই থাকে। তাই পাঁচশো টাকা পেয়ে গুরু বস্তিতে ওদের খাওয়াবে।

আর সেটা দেখে ঝিলিকও। রাতের অন্ধকারে তিলক বস্তির ছেলে বুড়োদের খাওয়াচ্ছে। এসে পড়ে এক বুড়ি। সেই বলে,— দিনভোর তোদের দুটোর পাত্তা নেই। খাওয়া-দাওয়াও করিসনি। আর কত রাত জেগে তোদের জন্যে বসে থাকবেন মুখপোড়া?

এই বুড়ি ফালতুর মা। বস্তির ওদিকেই থাকে। আর তিলকও বুড়িকে মা বলে ডাকে। ঝিলিক দেখছে বৃদ্ধ মহিলাকে। বুড়ি ঝিলিককে বলে— দিনরাত পরের বাজনা নিয়েই পড়ে আছে। এই হতভাগাকে নিয়ে আমার হাড় মাস ভাজা ভাজা হয়ে গেল। ওর সঙ্গে মিশেছে এই ফালতুটা। এক রামে রক্ষা নেই— সুগ্রীব দোসর।

তিলক তখন বস্তির কয়েকজনকে চিকিৎসার জন্য টাকা দিচ্ছে। তার রোজগারের টাকা থেকে। ঝিলিক বাড়ি ফিরবে। তিলক বলে — ফালতু, রাত হয়ে গেছে। ওঁকে পৌছে দিয়ে আয়।

ফালতুও হুকুম তামিল করবার জন্য যেন প্রস্তুতই ছিল।

ঝিলিক বাড়ি ফিরছে। দারোয়ান সেলাম ঠুকে গেট খুলে দেয়। ঝিলিক ভেতরে আসে।

ঝিলিক জিজ্ঞাসা করে — মা এসেছে? বেয়ারা বলে— না আজ ওনাদের পার্টি আছে, ফিরতে দেরি হবে। আপনার ডিনার ঘরে রেডি আছে।

ঝিলিক এসেই ঘরে ঢোকে। সে নিসঙ্গ, একা। কেউ তার পাশে নেই। সে পোশাক ছেড়ে, এক গ্লাস জল খেয়ে শুয়ে পড়ে। বেয়ারা বলে — মেমসাহেব ডিনার।

— থাক। খেয়ে এসেছি।

বেয়ারা চলে যায়। বিচিত্র জীবন এদের। কেউ কারো কথা ভাবে না। যে যার নিজের খেয়ালেই চলে।

দেখা যায় ক্লাবে তখন দীপবাবু কয়েকজন ব্যবসায়ী বন্ধুর মদের ঠেকে ব্যবসার কথা বলছেন।

ওঁদের একটা টেবিলে কয়েকজন মহিলাকেও দেখা যায়। ড্রিঙ্কস্-এর গ্লাস হাতে তারা টাকা দিয়ে ক্লাবে তাসের জুয়া খেলছে, একজন বলে— মিসেস সেন, উই উইন— টাকাগুলো তুলছে মিসেস সেন।

ওদিকে ঝিলিক তখনও জেগে আছে, একটা ম্যাগাজিনে ছবি দেখছে। গাড়ির শব্দ শোনা যায়।

জানালা দিয়ে দেখে মিঃ সেন আর মিসেস সেন ঘরে ফিরছে। মিঃ সেন টলছে, ওকে সামলাচ্ছে মিসেস সেন। ওরা আসছে।

ঝিলিক ওদের দেখে বিরক্ত হয়। ঘরের আলো নিভিয়ে দেখছে ওদের। তার মুখ চোখে বিরক্তির ছাপ।

মিলনবাবু এই এলাকার মুকুটহীন সম্রাট। এখানকার বড়, নেতা। বিরাট বাড়ি, বাড়িতে মন্দির।

সকালে নিত্য মা কালীর প্রণাম সেরে — শক্তি সঞ্চয় করে এলাকার সব মানুষকে নিয়ে খেলা করে। মুখে মিষ্টি বুলি— দেশ সেবার জন্য নিবেদিত প্রাণ। বড় ঠিকাদার—সরকারি মহলে মন্ত্রীদের সাথে ওঠা বসা। তাই বড় বড় কনট্রাক্টগুলো পেতে তার কোন অসুবিধা হয় না। তার ছেলে অর্জুনও এখন এই ঠিকাদারীর ব্যবসায়ে হাত পাকিয়েছে, সেও বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন, প্রোমোটারির কারবারে নেমেছে।

তাদের এই লাইনে যত টাকা আছে, তেমনিই আছে বিবাদ। এই সেদিন বাইরে থেকে দু-একটা পার্টি টেন্ডার পাশ করিয়ে জলের দরে মাল কিনে ব্যবসা করে চলে গেল। মিলনবাবু চটে ওঠে— এইসব পার্টিকে হাতে আনতে হবে। আর তাই ডাক পড়ে সেই তিলকের। মিলনবাবুর একরকম হাতের পুতুল এই তিলক। এর আগে তিলক এইসব এলাকায় মস্তানি করে বেড়াতো। এইভাবেই একসময় এই তিলক নজরে পড়ে পুলিশের। মিলনবাবুই তখন পুলিশের হাত থেকে বাঁচিয়ে আনে। হাতে বেশ কিছু টাকাও দেয়। বলে এখন থেকে আমার কথামত চলবি। আমার হয়ে দলের কাজ করবি। টাকাও পাবি আর তা না হলে পুলিশে তুলে নিয়ে যাবে।

সেই থেকে তিলক মিলনবাবুর কাজের লোক হয়ে ওঠে।

মিলনবাবু বলে— তিলক টেন্ডার যেন ওরা জমা দিতে না পারে। রাখ এটা । কাজ হলে আরও পাবি।

তিলককে টাকা দেয় মিলনবাবু। অর্জুন বাবার এই তিলক প্রীতিকে ভালো মনে দেখে না।

অর্জুন বলে আমার দলের ছেলেরাই এই সব পারে, তাই বাইরের বস্তির ছেলেটাকে মাথায় না তোলাই ভালো।

মিলন বলে— রাজনীতি করতে হলে এদেরকেই হাতে রাখা দরকার। আমাকে ভোটে দাঁড়াতে হবে তাই—

অর্জুন বলে— তাই পথের খড়কুটোকে মাথায় তুলতে হবে! মিলনবাবুর থানার লোকেদের সঙ্গে যথেষ্ট জানা শোনা। অর্জুনও জানে তার বাবার এলেম। কথায় কথায় অর্জুনই সেদিনের বাইকের ঘটনাটা বলে। মেয়েটা যে থানায় ডায়েরি করেছে তাও জানায় অর্জুন। মিলনবাবুই বলে— এখনই কিছু করার দরকার নেই। তবু খোঁজ খবর নে মেয়েটার।

তিলক ওই বস্তিতেই বড় হয়েছে। শান্তা বুড়ি কয়েকটা ফ্ল্যাটে কাজ করে দিন চালায়। তার স্বামীটা আগেই মারা গেছে, তিলক আর ফালতুকে ঠিকঠাক খেতে পরতে দেবার সাথে পড়াশোনা করাতো ওদেরকে।

শান্তা বুড়ির ছেলের নাম ছিল ফেলু—অবশ্য সেই নামটা এখন দাঁড়িয়েছে ফালতুতেই।

তিলকের পূর্ব পরিচয় বলতে— তার মা কল্যাণীর স্বামী ওকে ছেড়ে চলে গেছে অন্য একজন মেয়ের সঙ্গে। সেই থেকে পেট চালাবার জন্যে কলকাতায় বাবুদের বাড়িতে কাজ করত। সেদিন বাড়ি ফিরবে বলে স্টেশনে এসেছিল। দেখা যায় একটা ট্রেন যাচ্ছে নৈহাটির দিকে— ট্রেনটা প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে যাচ্ছে একটা বাচ্চা দৌড়চ্ছে, মা মা বলে সেই বাচ্চাটার কি কান্না! ট্রেনটা স্টেশন ছেড়ে চলে গেল। পরিত্যক্ত অসহায় শিশুটির কান্না ভেসে ওঠে স্টেশনে। লোকজন এসে জুটেছে, দেখছে সবাই, অসহায় ছ-সাত বছরের শিশুটিকে। সে বলে— মা আমাকে ফেলে চলে গেল। মা চলে গেল— সেদিন ঘটনাটা সবাই দেখেছে কিন্তু কেউ এগিয়ে আসেনি। সেই শান্তাই তখন ওকে এখানে নিয়ে এসে তার ছেলে ফেলুর সঙ্গে মানুষ করে।

সেই ছেলেটার কি একটা নাম ছিল ছেলেবেলায় সেই নাম ভুলে গেছে। ছেলেটা বেশ সতেজ— ভালো গান গায়। ঈশ্বরদত্ত কণ্ঠ। ক্রমশ জীবন যুদ্ধের লড়াই -এ সামিল হয়। দেখেছে গায়ের জোর আর থানাই তার মুলুক। ক্রমশ এই এলাকায় তিলক একটি পরিচিত নাম হয়ে ওঠে। ভোটের সময় অনেকেই ফায়দা লুঠতে বা অন্যান্য কাজেও কাজে লাগায় এই তিলককে। তারা বলে— তিলক তোর হবে। তুই অনেক দূর যাবি। তিলক সেই থেকেই এই শান্তাবুড়িকেই মা বলে ডাকে।

মিলনবাবুর নির্দেশেই তিলক ও তার দলবল টেন্ডার জমা দেওয়ার দিন বিশ্বাসবাবুর চেম্বারের বাইরে

তৈরি হয়ে থাকে। দু-তিনজন বাইরের ব্যবসায়ী আসছে গাড়ি নিয়ে, তারা একটা বড় সরকারি কন্ট্রাক্ট পাওয়ার জন্যে টেন্ডার জমা দিতে আসছে। পথেই রয়েছে তিলকের দল। ওরা সামনে আসতেই ওদেরকে বাধা দেয় তিলকের দল। ওরা বাধা সরাবার চেষ্টা করলে ফালতু গর্জে ওঠে, ওদের ব্যাগ ধরে টানতে চায়। কিন্তু ওরাও সরে যেতে নারাজ। তিলক বলে— যা বলছি তাই শোন,ফিরে যাও না হলে— ব্যবসায়ী দুজন প্রতিবাদ জানায়। আমরা পুলিশে যাবো। এদের মধ্যে ক্রমশ বচসার সূত্রপাত শুরু হয়ে যায়। সেই থেকে বোমা ফাটে গুলিও চলে। দোকান পাট বন্ধ হয়ে যায়। সেই সময় ওই পথ দিয়ে যাচ্ছিল ঝিলিক, সে দেখে বোমা ছুঁড়ছে তিলক— গুলি চালাচ্ছে। আর ভীত সেই ব্যবসায়ীর দল পালাচ্ছে। পালাচ্ছে পথ চলতি অন্য লোকজনও।

ঝিলিক যেন নিজের চোখকে বিশ্বাস করেত পারে না। এই ছেলেটাই কলেজে সেদিনের সেই সোশ্যালের অনুষ্ঠানে কি দারুণ গানই না গেয়েছিল। সে সত্যি একজন গুণী শিল্পী। কিন্তু সেই তিলককেই যে আজ এইভাবে ভিন্ন রূপে আবিষ্কার করবে ভাবেনি ঝিলিক।

ঝিলিক সেদিন নিজের থেকেই আলাপ করেছিল এই ছেলেটার সঙ্গে। ছেলেটা গানের সাথে সাথে ভালো নাচেও। ঝিলিকের ভালো লেগেছিল এই ছেলেটাকে।

সুখবরটা পৌঁছে যায় মিলনবাবুর কাছে। মিলনবাবু অর্জুনকে নিয়ে টেন্ডার জমা দিতে এসেছে। লোকে বোমাগুলির শব্দে আতঙ্কিত। পুলিশ আসে ঘটনাস্থলে অনেকক্ষণ পর। তখন তিলকরা কাজ হাসিল করে চলে গেছে। মিলনবাবু খুশি। টেন্ডার জমা দিতে আর কেউ আসেনি। আর এসব হয়েছে তিলকের জন্যই, তাই এদিকের কাজ সেরে মিলবাবুই বলে— অর্জুন তুই আমাদের উকিলবাবুর কাছে যা। কি বলে তিনি আমাকে জানা।

ঝিলিক এসেছে উকিল অনিমেষবাবুর কাছে। সেই ঘটনায় অনিমেষবাবুও এবার কেশ চালু করেছে। তিনি বলেন— ঝিলিক, তোমার কেস্ লড়তে তোমার বাবাকে দরকার হতে পারে। তারও জানা দরকার। মাকে ওসব কথা বলেছে তো— ঝিলিকের মুখ চেয়ে কঠিন হয়ে যায় বাবা মায়ের কথা শুনে। সে বলে— ওদের এসব কথা জানার দরকার নেই। তাছাড়া সময়ও নেই।

— সেকি! তাদের মেয়ের প্রবলেম। তাছাড়া ওঁরাই তো তোমার অভিভাবক।

ঝিলিক বলে— আমি গ্রাজুয়েশন করছি— আমি এখন এ্যাডাল্ট। নিজেই নিজের অভিভাবক। আমার মা বাবা আছেন বটে। তাদের অনেক অনেক টাকা। কিন্তু আমার জন্য দেবার মত এতটুকু সময়, এতটুকু স্নেহ নেই। আমি তাদের কাছে এগোবার চেষ্টা করেছি কিন্তু তার বদলে প্রত্যাখানই শুধু পেয়েছি। জানেন অনিমেষবাবু, ছেলেবেলার একটা ঘটনা—

ঝিলিকের চোখের সামনে ভেসে ওঠে ছোটবেলার ছবিটা। ছোট ঝিলিক নাচ গানের একটা মেডেল পেয়েছে। ছোট মেয়েটা সেই মেডেল দেখাবার জন্য বসে আছে।

আয়া বলে— সাহেব মেম বাইরে গেছে— আজ তাদের ক্লাবে পার্টি আছে। ওদের ফিরতে দেরি হবে। তুমি শুয়ে পড় বেবি।

কিন্তু ঝিলিক শোয় না।

বাবা-মা পার্টি থেকে ফেরে অনেক রাত্রে। ঝিলিক মেডেলটা দেখিয়ে বলে ড্যাডি-মামি, আমার স্কুলের কমপিটিশনে ফার্স্ট হয়ে এটা পেয়েছি। এই দেখ মেডেলটা। ওর বাবা তখন নেশার ঘোরে ছুঁড়ে ফেলে বলে— একটা টিনের চাকা পেয়ে তাই দেখাবার জন্যে এত রাত অবধি জেগে আছো? নন্‌সেন্স! হতাশ ঝিলিক মেডেলটা মাটি থেকে তুলে নেয়।

ঝিলিকের মাও বলে— কাল সকালে তোমার স্কুল্। আর এত রাত পর্যন্ত জেগে আছো। এই নিয়ে?

আয়াকে ডেকে মা বলে— নিয়ে যাও ওকে, টেক কেয়ার। ওরা নিজেদের ঘরে চলে যায়। ঝিলিকের চোখে জল নামে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়ে সে নিজেই জানে না।

—আজকের ঝিলিক বলে অনিমেষবাবু পদে পদে আমাকে অপমানিত হতে হয়েছে ওদের কাছে—শুধুমাত্র সন্তানের এতটুকু অধিকার ৮।২৮৩ গিয়ে। ওদের সমাজ, ওদের জগৎ একেবারে অন্যরকম। সেখানে সন্তানের জন্যে কোন চিন্তা-ভাবনা, দায়-দায়িত্ব কোন কিছুই নেই। ওরাই এখন নিজেদের সমাজসেবক হিসেবে পরিচয় পাবার স্বপ্ন দেখে। কর্মব্যস্ত স্বার্থপর এই মানুষ দুটোকে আমি ঘৃণা করি।

অনিমেষবাবু এই প্রতিবাদী মেয়েটার দিকে চেয়ে বলেন— তবু ওরাই তোমার বা বাবা।

— বাবা মা যদি সন্তানের জন্যে কোন কর্তব্য কর্ম না করে তার সন্তানকে এতটুকু স্নেহ মায়া না দিতে চায়, তাহলে বলতে পারেন সেই সন্তানটি কি নিয়ে বাঁচবে? সে কি করবে? তাই আমি ওদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করছি। আই হেট দেম। আপনি ভেবেছেন— ওরা আমাকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবে? কিন্তু ওরা তা দেবে না। আমি নিঃসঙ্গ একা— অনিমেষবাবু দেখছেন ঝিলিককে। উনি যেন এই একাকিনি নিঃসঙ্গ মেয়েটার জীবনের বেদনাটাকে বুঝছেন। একটা সুন্দর সদ্য যৌবনা নিঃসঙ্গ বেদনা তাঁকেও যেন স্পর্শ করেছে। অনিমেষই জিজ্ঞাসা করেন— একা একা কি করো তুমি? ঝিলিক বলে— জাহান্নামে যাবার পথগুলো খুঁজে ফিরি। অবাক হয় অনিমেষ— সেকি! মরার পথ খোঁজ? হতাশ ঝিলিক বলে কলকাতায় বাস করেন তার বাইরের রূপটাই দেখেছেন। তার আড়ালে এর অন্যরূপটা যে কি সাংঘাতিক তা জানেন না। চলুন না একবার না হয় আমার সঙ্গে— সেই জগতের অনেক কিছুই অনের খবরই আপনি জানতে পারবেন। সেসব আপনার ওকালতিতেও সাহায্য করবে।

অনিমেষ এই বিচিত্র মেয়েটির কথায় অবাক হয়। অনিমেষ বলে— ঠিক আছে যাবো তোমার সঙ্গে। তোমাদের সেই জগৎকে দেখবো।

ঝিলিক ওকে নিয়ে বরে হয়ে যায় তার গাড়িতে। রাতের কলকাতা। নির্জন পথ—ওরা এসেছে একটা নাইট ক্লাবে।

প্রচুর গাড়ির ভিড়। বিভিন্ন রকমের বাজনার শব্দ। অনিমেষ নামছে ঝিলিকের সঙ্গে, যাবে নাইট ক্লাবে। একজন তরুণী মেয়ে তখন নাচছে। পরনে তার প্রায় অর্ধনগ্ন পোশাক। হইহই করে ছেলেমেয়ের দল। ঝিলিক এই মহলে পরিচিত। বেশ কয়েকজন ছেলে এগিয়ে আসে। — কাম হেয়ার ঝিলিক। ঝিলিক এগিয়ে যায়।

অনিমেষ এসব সাংঘাতিক দৃশ্য সহ্য করতে পারে না। একটা ছেলে ঝিলিকের দিকে গ্লাস এগিয়ে দিয়ে বলে— চিয়ার আপ।

ঝিলিক তাকে সরিয়ে দিতে ওদিকে চলে যায় ছেলেটি। চারদিকে যেন কেমন এক যান্ত্রিক উল্লাস, উগ্র যৌনতা, বেহিসেবী জীবন-যাপন। এসব দৃশ্য অনিমেষকে অস্থির করে তোলে।

অনিমেষ বলে চলো ঝিলিক এখান থেকে।

ঝিলিক বলে কোলকাতার রাতের চেহারাটা কতো সুন্দর সেটা দেখুন। চলুন ওদিকে— একটা প্রায় অন্ধকার ঘর। বোধহয় লাইট অফ করা আছে। কয়েকজন মরার মতো প্রায় অর্ধ অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে আছে। কেউ বিড়বিড় করছে নেশার ঘোরে।

একটা ছেলে ঝিলিককে দেখে বলে— টেক এ ট্যাবলেট। না হয় পিওর মাল আছে সিরিঞ্জে।

ঝিলিক তাকেও সরিয়ে দেয়। অনিমেশ দেখছে ড্রাগ-আসক্ত এই তরুণ-তরুণীগুলোকে।

অনিমেষবাবুকে নিয়ে ফিরছে ঝিলিক। অনিমেষ আজ এখানে এসে এই শহরের আগামী সমাজের একটা যন্ত্রণা হতাশাময় অন্ধকারকেই দেখেছে।

ঝিলিক বলে— এরা সবাই বেশ ধনী ঘরের ছেলে মেয়ে। এরা তার বাবা মা-এর কাছ থেকে স্নেহ মমতা ভালোবাসা কিছুই পায়নি। দিশাহীন এদের জীবন। এদের মধ্যে অনেকেই এই না পাওয়ার যন্ত্রণায় অন্ধকারেই হারিয়ে গেছে।

অনিমেষ বলে কার ওপর রাগ অভিমান করে এরা নিজের সর্বনাশ করছে? ঝিলিক বলে — নিজের ওপরই যত রাগ। একটা অসহ্য যন্ত্রণা তিলে তিলে শেস করে দেয় আমাদের। তবু আমি

এখনও নিজেকে এই অন্ধকারে জড়াইনি। তবে কতদিন নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারবো জানি না।

অনিমেষ যেন ঝিলিকের বেদনাটা মর্মে মর্মে অনুভব করে। তাই অনিমেষ বলে— না না ঝিলিক। তোমাকে এইভাবে হারিয়ে যেতে দেবো না।

— সত্যি? চাইল ঝিলিক, তার ডাগর চোখ দুখানা মেলে। অনিমেষ ওর হাতটা হাতে নিয়ে বলে, কথা দিচ্ছি ঝিলিক। তোমাকে এভাবে অন্ধকারে হারিয়ে যেতে দেবো না। ঝিলিকের মনে যেন কি এক বিচিত্র আনন্দের সুর ওঠে।

অনিমেষ একজন নামী উকিল। ওকালতি করে। তাই বলে অন্যান্যদের মতো সাধারণ মানুষকে শোষণ করা নয়, নিজের যুক্তি তর্ক, আইনের বেড়াজালের মধ্যে দিয়ে। তার হৃদয় আছে— আছে কাব্যজ্ঞান। সামাজিক দায়বদ্ধতাকে সে মেনে চলে। সাংসারিক মানুষ হিসেবে সংসারের প্রতি কর্তব্যগুলোকে মনপ্রাণ দিয়ে পালন করে। অন্যায়ের প্রতিবাদও করতে জানে। তাই সেদিন ঝিলিকের ওপর অন্যায় অবিচারের প্রতিবাদে সে সামিল হয়েছিল। উকিল হিসেবে সংসারের সব দায়-দায়িত্ব, কর্তব্য পালন করে। তার স্ত্রী সাবিত্রী মধ্যবিত্ত ঘরের মহিলা। আর রয়েছে তার একমাত্র মেয়ে সুজাতা। সুজাতা কলেজে পড়ে। অনিমেষবাবুর সংসারে সাবিত্রী গৃহস্থালির কাজ, পুজো এসব নিয়েই থাকে। সুজাতাই বাবার দেখাশোনা করে।

রাত অবধি চেম্বারে মক্কেল— জুনিয়ারদের নিয়ে নানা কাজের ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা করে। সুজাতা এসে বাবাকে বলে বাবা ওঠো। অনেক রাত হয়ে গেছে।

বাবার দিকেই সুজাতার বেশি নজর।

কয়েকদিন ধরে দেখছে সুজাতা, বাবা কোর্ট থেকে ফিরতে দেরি করছে। অনিমেষের বাড়িতে ঝিলিক ইদানিং আসে। অনিমেষকে নিয়ে বের হয়ে যায়। মেয়েটা যেন কাজের চেয়ে অনিমেষের সান্নিধ্য বেশি পছন্দ করে।

জেদি মেয়েটা কোনদিন অনিমেষকে নিয়ে যায় ক্যাসিনোর হলে। কোনদিন বা গ্র্যান্ডের বল রুমে।

অনিমেষও দেখে ঝিলিকের এইসব বিচিত্র জীবনচর্চাকে। ঝিলিক তাকে কোনদিন বা নিয়ে যায় ড্রাগ আসক্তদের বিচিত্র জীবনে। যে অন্ধকার জগতে ঝিলিককে হারিয়ে যেতে দিতে চায় না অনিমেষ। তাকে ওই জগৎ থেকে ছিনিয়ে আনবেই অনিমেষ। ঝিলিক হাসে। বলে— তুমি কেন এইসব নরকে আসো? এখন ঝিলিক যেন অনিমেষের অনেক কাছের হয়ে পড়েছে।

অনিমেষ বলে— তোমার জীবনের নিঃসঙ্গতাকে দূর করতে। আমি চাই তুমি এই অন্ধকারে হারিয়ে যাবে না। তাই তোমাকে সঙ্গ দিতে চাই—

ঝিলিক বলে — সত্যিই তুমি খুব ভালো। কত ভাব এই নিঃস্ব নিঃসঙ্গ মেয়েটার জন্য। আমার জন্যে বাড়ির কারোও কোন মাথাব্যাথা নেই। অথচ তুমি—

অনিমেষ বলে— এটা আমার কর্তব্য। তুমি ভেবোনা ঝিলিক, সেদিন যে গুন্ডারা তোমার গায়ে হাত তুলেছিল তাদেরকে আমি শাস্তি দেবো—

ঝিলিকের চোখের সামনে ভেসে ওঠে সেই দিনের ঘটনাটা। সে একা গাড়ি নিয়ে যাচ্ছিল। দুটো মস্তান মত ছেলে বাইক নিয়ে তাকে বিরক্ত করে— জোর করে গাড়ি থামিয়ে তাকে দুটো বাজে কথা বলা থেকে ঝিলিকের গালে চড়ও মেরেছিল এদের মধ্যে একজন। প্রত্যুত্তরে ঝিলিকও পথের পাথর ছুঁড়ে মারতে গেলে এক বুড়ি এসে তাকে বাধা দিয়ে শান্ত করেছিল। এই ঘটনায় পথচলতি মানুষ জড়ো হয়ে গেলে ওই মস্তান দুজন বাইক নিয়ে চম্পট দেয়। তারপরেই লোকাল থানায় গিয়ে অনিমেষের সাথে তার আলাপ হয়। অনিমেষের কথা শুনতে শুনতে সেই ছবিগুলো ভেসে ওঠে আজ। অনিমেষ বলে— তবে দু একজন সাক্ষীর দরকার। তাই ওই জায়গায় গিয়ে খোঁজ খবর নিতে হবে।

ঝিলিক বলে— ঠিক আছে। কালই যাবো। দু-একজনকে ঠিক খুঁজে পাওয়া যাবে।

অনিমেষ সেদিন ঝিলিককে নিয়ে ব্যস্ত। ওরা খুঁজে খুঁজে সেই জায়গা থেকে সেই বুড়ি —আরও

দু-একজনকে যোগাড় করেছে। তারা সাক্ষী দেবে।

বুড়ি বলে, আমি যা দেখেছি তাই বলব বাবা। ওদিকে দু-একজন ছিল পথের ধারে চায়ের দোকানে। সেই দোকানদারও বলে, আমিও বলবো সত্যি কথা।

ঝিলিক নিশ্চিন্ত হয়। ঝিলিক অনিমেষকে নিয়ে আসে একটা হোটেলে। এই হোটেলে ঝিলিকের একটা রুম বুক করা আছে। কোন কোন রাতে ঝিলিক বাড়ি ফেরে না। এখানেই থেকে যায়।

অনিমেষ সব শুনে বলে— না না, এটা ঠিক নয়। যতরাতই হোক বাড়ি ফিরবে। বাবা মা ভাববেন।

— আমার জন্যে কেউ ভাবে না।

অনিমেষ ঝিলিকের হাত ধরে বলে— এখন থেকে আমি তো ভাবছি তোমার জন্যে।

ঝিলিক খুশি হয়। যেন একজন নিজের আপনজনকে পেয়েছে। অনিমেষ ঝিলিকের কাছে আসে। রাত বাড়ছে। অনিমেষ বলে— চলো বাড়ি ফিরতে হবে।

ঝিলিক বলে— বাড়ির জন্যই তো সারাদিন ভাবো। আমার জন্যে কতটা ভাবো তাই দেখছি।

সুজাতা দেখে বাবা কয়েকদিন ধরেই রাত করে বাড়ি ফিরছে। সাতটার পর চেম্বারে ওর জুনিয়াররা আসে। বেশ কয়েকদিন ধরে তারাও তাদের স্যারকে আর চেম্বারে দেখতে পাচ্ছে না। সুজাতা তাদেরকে বলে, বাবা এখনও ফেরেনি?

এক জুনিয়ার বলে—স্যার ক'দিন ধরে এক ভদ্রমহিলার কেস্ নিয়ে ব্যস্ত। আজও ওনার সঙ্গে বের হয়েছেন।

সুজাতা দেখে রাত বাড়ছে। বাবার দেখা নেই। হঠাৎ গাড়ির শব্দে চাইল সুজাতা। দেখে একটি মেয়ে ওঁকে ছেড়ে দিয়ে গেল।

সুজাতাই গম্ভীর মুখে দরজা খুলে দেয়।

অনিমেষ বলে— এক ভদ্রলোকের কেস্ নিয়ে খুব ঝামেলা চলছে। আজও সিটিং ছিল।

সুজাতা শুনছে বাবার কথাগুলো। বাবা এক ভদ্রলোকের কথা বলছে কিন্তু সুজাতা দেখেছে আজ একটা মেয়েকেই। সুজাতাকে তার বাবা আজ কেন জানে না মিথ্যা কথাই বলছে। তাই সুজাতা চুপ করে থাকে।

সাবিত্রীদেবী বলে— কত রাত হয়েছে সে খেয়াল আছে? যাও পোশাক বদলে এসো, আমি খাবার গরম করে আনছি।

অনিমেষও এবার কথাটা ভাবছে। এই বিষয়ে চিন্তা করলেই এখন নিজেরই খারাপ লাগে। তাই অনিমেষ ঠিক করেছে সে ঝিলিককে এত পাত্তা দেবে না। তাই সে চেম্বারে আসার আগেই বের হয়ে আসে। ঝিলিক এসে ফিরে যায়। ঝিলিক সেদিন ফোন করে অনিমেষের বাড়িতে। অনিমেষ তখন বাথরুমে, সুজাতা ফোন ধরে। সুজাতা শোনে ঝিলিকের কথাগুলো— অনিমেষ বাবুকে একটু দিন না। বলুন ঝিলিক। সুজাতা ওর নামটা শুনেছে। সত্যি মেয়েটা যেন বিদ্যুতের ঝিলিকের মতই। মেয়েটার চেহারাটা ভেসে ওঠে সুজাতার চোখের সামনে। সুন্দরী-উজ্জ্বলযৌবনা-মেয়েটা এসেছিল গাড়ি চালিয়ে, গাড়ি স্টার্ট করে হাসিমুখে তার বাবাকে হাত নেড়ে চলে যায়। ওর দেহে মনের উচ্ছলতা নজরে পড়েছিল সুজাতারও।

সুজাতা বলে— উনি এখন বাথরুমে।

ঝিলিক সহজভাবে বলে— ওঁকে বলবেন, উনি যেন আমাকে রিং ব্যাক করেন।

সুজাতা ওর আদেশ শুনে মনে মনে চটে ওঠে, ফোনটা নামিয়ে রাখে। বাবা ফোনের রিংটা শুনেছিল। অনিমেষ বের হয়ে এসে বলে— কে ফোন করেছিল? কি নাম বললো?

অনিমেষের চোখেমুখে অদ্ভুত এক ব্যাকুলতা সুজাতার চোখ এড়ায় না।

সুজাতা বলে— নাম বললো ঝিলিক সেন। কে উনি? অনিমেষ যেন কিছু চাপা দিতে চায়। তাই কণ্ঠস্বর সহজ করে বলে— আমার এক ক্ল্যায়েন্ট।

সুজাতাকে বেশি বলতে হয় না। অনিমেষ বলে— ঠিক আছে ওকে আমি ফোন করবো।

সুজাতা শুনছে বাবার কথাগুলো।

ঝিলিক তার নিঃসঙ্গ জীবনে কাউকে পাশে পেতে চায়। সে জীবনে কোনদিন ভালোবাসা বা স্নেহের স্পর্শ পায়নি। তার শূন্য জীবন-পাত্র অপূর্ণই রয়ে গেছে। অনিমেষ তার অপূর্ণ জীবনে শীতল বাষ্পের মতো। ক'দিন অনিমেষ-কে কাছে পায়নি ঝিলিক।

সেদিন ঝিলিক বাড়ি ফিরছে, এদিকে পথটা বেশ নির্জন। সেই নেতা মিলনবাবুর ছেলে উঠতি মস্তান অর্জুন এখন কোর্টের শমন পেয়ে বিপদে পড়েছে। অর্জুন এইভাবে অনেক মেয়েকেই জ্বালাতন করে, দু একজনকে টাকা দিয়ে হোটেলে রাতও কাটিয়েছে। অর্জুন তাই ভেবেই সেদিন ওই মেয়েটার পেছনে লেগেছিল। কিন্তু এই ঝিলিক যে তাদের দলের নয়, মেয়েটা প্রত্যুত্তরে এরকমভাবে প্রতিবাদ করবে তা বুঝতে পারেনি অর্জুন। তাই সেও তার চ্যালা গজুকে নিয়ে তক্কে তক্কে ছিল।

আজ দেখছে ঝিলিক হোটেল থেকে বের হয়ে এই নির্জন পথে বাড়ি ফিরছে। অর্জুন গজুও তৈরি ছিল, ঝিলিকের গাড়িটা সামনে আসতেই ওরা ওর পথা আটকায়।

ঝিলিকও দেখছে সেই মস্তান দুটোকে।

অর্জুন এর মধ্যে খবর পেয়েছে যে ঝিলিক সেই উকিলের সঙ্গে সেই ঘটনাস্থলে গিয়ে কয়েকজন সাক্ষীকে যোগাড় করেছে।

তাই অর্জুন বলে— ঠিক চিনতে পেরেছ তাহলে? সেদিন ছেড়ে দিয়েছিলাম। আজ আর ছেড়ে দেব না। গজু তুলে নিয়ে চল এটাকে। আজ ওরা মোটরবাইক নয়, একটা বড় গাড়ি এনেছে। সঙ্গে এনেছে বেশ কয়েকজন মস্তানকে।

সেই গুন্ডার দলও ঘিরে ফেলেছে ঝিলিককে।

ঝিলিকেরও আসন্ন বিপদের গুরুত্ব বুঝতে দেরি হয় না। ঝিলিক তবু প্রতিবাদ করে— পথ আটকে কেন? পথ ছাড়ো— অর্জুন হাসে। সে বলে— সেদিন পথ আটকে যা করতে পারিনি, আজ তাই করবো।

ঝিলিক এবার সত্যিই বিপদে পড়েছে।

ঝিলিক চিৎকার করে— হেল্প! হেল্প মি!

অর্জুন ওর মুখটা চেপে ধরেছে— এবার ওরা ওকে গাড়িতে তুলতে যাবে।

অন্ধকারে এসে পড়ে তিলক। তিলক বাধা দিতে গেলেই প্রায় অন্ধকার রাস্তাতেই তিলকের সঙ্গে অ্যাকসন হয় অর্জুনের দলের ছেলেদের সাথে। কিন্তু ওরা পারে না, ওরা তিলকের কাছে মার খেয়ে বিধ্বস্তত হয়ে ঝিলিককে ছেড়ে পালিয়ে যায়।

রাস্তার আলোয় ঝিলিক দেখতে পায় তার উদ্ধারকারি সেই তিলক-ফালতুদের।

তিলকও অবাক হয়— ম্যাডাম আপনি এখানে!

ঝিলিকও দেখছে তিলকদের।

ঝিলিক বলে— তিলক তুমি এসে পড়েছিলে, না হলে ওই শয়তানের দল আজ আমার যে কি সর্বনাশ করতে কে জানে!

অর্জুনের দল লোডশেডিং-এর মধ্যেই ঝিলিককে আক্রমণ চালিয়েছিল। তিলক ফালতু রাস্তার ধারে আরাম করছিল লোডশেডিং-এ। এটা তাদেরই বস্তি এলাকা। তাই ওরা একটা মেয়ের চিৎকার শুনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। তারপর আচমকাই এক নজর দেখে চিনতে পেরেছিল তিলক অর্জুনকে।

এই উঠতি মস্তান নেতার ছেলেটাকে তিলক পছন্দ করে না। প্রমোটারের এই ছেলেটা তার বাবার জোর আর টাকার অহংকারে মানুষকে মানুষ বলেই মনে করে না। তিলককে অর্জুন সেই চোখেই দেখে। সেই থেকেই তিলকের রাগ বড়লোক এই ছেলেটার ওপর। আর আজ তাকে একটা মেয়ের সর্বনাশ করতে দেখে এগিয়ে এসেছিল তিলক তাকে উচিত শিক্ষা দিতে।

অর্জুনও দেখেছে তিলককে। অর্জুন ভাবতেই পারেনি যে তার বাবার পোষা গুন্ডা এই তিলক তার ওপরেই ঝাঁপিয়ে পড়বে।

ওরা তাড়া খেয়ে পালাবার সময় আলো জ্বলে ওঠে।

এরমধ্যে ধস্তাধস্তি ধাক্কার ফলে ঝিলিকের হাতটাও কেটে গেছে। এসে পড়ে শান্তা বুড়ি। সেই ঝিলিককে ঘরে নিয়ে গিয়ে ওষুধ লাগিয়ে দেয়।

আজ ঝিলিক দেখে তার বিপদের সময় অযাচিত ভাবে এই ছেলেটা এগিয়ে এসেছে। তার মান ইজ্জৎ বাঁচাতে।

শান্তা বুড়িই জানায় তিলকের পরিচয়। ছেলেটার বাবা আগেই মারা গেছে, মাও তাকে ফেলে চলে গিয়েছে ট্রেনে কোথাও, আর ফেরেনি। সেদিন এই শান্তা বুড়িই সেই তিলককে এনে নিজের ছেলের মতো মানুষ করে।

ঝিলিক আজ তিলকের কাছে কৃতজ্ঞ। সেই রাতে বাড়ি ফিরে ঝিলিক দেখে তখনও তার বাবা মা ফেরেনি।

আয়াই এগিয়ে এসে ঝিলিকের হাতে ব্যান্ডেজ দেখে কি হয়েছে জানতে চায়।

ঝিলিক তাকেও এড়িয়ে কিছু না জানিয়ে বলে, ও কিছু নয়। তুমি শুয়ে পড়। পরের দিন ঝিলিক অসুস্থ হয়ে পড়ে, প্রচন্ড জ্বর আসে তার। আয়া এসে ঝিলিককে বলে— আমি সাহেব-মেমসাহেবকে খবর দিয়েছি, ওরা পরে এসে দেখে যাবেন। ডাক্তার ডাকতে হবে। তুমি উঠবে না, শুয়ে থাকো।

আয়া গেছে ড্রইং রুমে। তখন মিঃ সেন একজন বড় পার্টিকে নিয়ে বের হবে। ওদিকে মিসেস্ সেনের জরুরী মিটিং আছে, নারীকল্যাণ সমিতির প্রচুর লোকজন আসবে।

তাই তারা খুব ব্যস্ত। আয়ার মুখে ঝিলিকের অসুস্থতার খবর পেয়ে মিঃ সেন বলে-- এখন তো টাইম নেই, বেরতে হবে। মিসেস সেন বলে— আমারও জরুরি মিটিং। আই অ্যাম অল রেডি লেট। আয়া, তুমিই দরকার হলে ডাক্তারবাবুকে ফোন করে ডেকে এনো।

ওরা বের হয়ে যায়। মেয়ের জন্য কোন ভাবনাই তাদের নেই। তারা তাদের নিজস্ব কাজ নিয়েই ব্যস্ত থাকে।

ঝিলিক আয়ার মুখে সব শুনে বলে— কেন গিয়েছিলে ওদের কাছে আমার কথা বলতে? আমার কাউকে চাই না।

সে ফোন করে অনিমেষের বাড়িতে। তখন দশটা বাজে। অনিমেষ কোর্টে বের হয়ে গেছে। ফোনটা ধরে সুজাতা। ঝিলিকের এই কণ্ঠস্বর সুজাতার চেনা।

ঝিলিক বলে— অনিমেষবাবু আছেন। ওনাকে একটু দিন না।

সুজাতা জানায়— তিনি কোর্টে বের হয়ে গেছেন। তারপর সে ফোনটা নামিয়ে রাখে।

হতাশ হয় ঝিলিক। তার পাশে কেউ নেই, সে একা।

শান্তা বুড়িই তিলককে বলে— তুই একবার যা মেয়েটার খবর নিয়ে আয়।

তিলক তখন বস্তির ছেলেদের পড়াচ্ছে। ফালতুও রয়েছে।

তিলক বলে— ওদের টাকার অভাব নেই মাসি। ওদের জন্য বহু লোক আছে। আমাদের মত বস্তির ছেলেদের সাহায্য ওদের দরকার নেই।

ফালতু বলে— মেয়েটার বড় ভালো গুরু।

— থাক। ধমকে ওঠে তিলক। সে বলে— বড়লোক মেয়েদের কোনটা যে আসল রূপ, তা বোঝাই ভার।

তবু শান্তা বুড়ি বলে— যা হোক, তুই একবার যা খবর নিয়ে আয়। না হলে অমঙ্গল হবে। মাসিমা বলে ডাকলো মেয়েটা, ওরে, সেই ডাকে যে কি পেয়েছি তা তোরা বুঝবি না। মানুষের মন ভালোবাসার কাঙাল, তুই যা।

ঝিলিক ভাবেনি যে তিলক আসবে তার খোঁজ খবর নিতে।

সে অবাক হয়। আবার খুশিও হয় তিলককে দেখে— তুমি!

তিলক এত দামি আসবাব, সাজানো ঘর দেখেনি কখনো। তাই বসতে ইতঃস্তত করে।

ঝিলিক বলে— কি হলো? বোস।

তিলক বসে। ঝিলিক এর মধ্যে জেনেছে তার আক্রমণকারি কোন বড়লোক নেতার ছেলে। বড়লোকদের সম্বন্ধে ঝিলিকের মনে একটা চাপা ঘৃণাই আছে।

ঝিলিক দেখেছে তার বাবা মা কে, তাদের কাছে অর্থই সব। আর এক বড়লোকের ছেলে টাকার দর্পে তারই সর্বনাশ করতে চেয়েছিল। আর সেই সর্বনাশ থেকে বাঁচাতে নিঃস্বার্থ ভাবে এগিয়ে এসেছিল পরিচয়হিন বস্তির এক যুবক।

তিলক বলে— মাসিমাই পাঠালেন তোমার খবর নিতে। ঝিলিকের মনে পড়ে, সেই রাতের এক স্নেহময়ী মুখ। বস্তির হতদরিদ্র এক মহিলা, তাকে স্নেহভরে পাশে বসিয়ে তার হাতে ওষুধ লাগিয়ে দিয়েছিল। ঠিক যেন মায়ের মত। আর এক মা যার কাছে নিজের সন্তানের জন্য কোন দরদ কোন সময় নেই।

ঝিলিক বলে— ভদ্রমহিলা খুব ভালো।

তিলক বলে— সত্যিই। না হলে আমিও তো অন্ধকারে হারিয়ে যেতাম। ঝিলিক দেখছে ওকে। সে বলে— তিলক অন্ধকারে হারিয়ে তুমি যাবে না। তুমি এই অন্ধকার থেকে ঠিক বের হয়ে আসবে। নতুন পরিচয় নিয়ে বাঁচবে—

— কি আলতু ফালতু বলছেন ম্যাডাম?

ঝিলিক বলে— তুমি মারদাঙ্গা মস্তানি না করে, এত ভালো গান গাও, গানের চর্চা কর, বড় শিল্পী হবে।

তিলক হাসছে। সে বলে— বামন হয়ে চাঁদ ধরার স্বপ্ন দেখি না ম্যাডাম।

ঝিলিক অবাক হয়— কেন? স্বপ্ন সত্যি হয় না?

না ম্যাডাম! এই অন্ধকার জগতে -এ যে একবার পা দেয়, সে আর আলোর জগতে ফিরতে পারে না। আমাদের মা, বাবা, ঘর, আপনজন বলতে কেউ নেই, আমাদের ভালোভাবে বেঁচে থাকারও অধিকার নেই।

— কেন নেই, নিশ্চয়ই আছে তিলক।

— সে তো খুব শক্ত কাজ।

— বাঁচতে তোমাকে হবে তিলক। তোমার সেই বাঁচার লড়াই-এ আমি তোমার পাশে থাকবো।

ঝিলিক উঠে যায়। কাঠের পাল্লা খুলে একটা গীটার বার করে আনে।

গীটারটা নিয়ে এসে ঝিলিক বলে— এটা রাখো। এখন থেকে গান বাজনার চর্চা করা চাই। তার জন্যে মাস্টার দেখ যে তোমাকে তালিম দেবেন।

তিলক গীটার হাতে সুর তোলে।

তিলক বলে— মাসিও তো তাই চায় ম্যাডাম। কিন্তু—

ঝিলিক বলে— তুমি নিজেকে তৈরি কর তিলক। এভাবে তোমাকে নষ্ট হয়ে যেতে দেব না। তুমি সত্যিকারের শিল্পীই হবে—

তিলকের মনেও যেন কোন এক আশাপূরণের স্বপ্ন উঁকি মারে।

অনিমেষের কয়েকদিন কাজ নিয়েই কেটেছে। কয়েকদিন দেখা হয়নি ঝিলিকের সঙ্গে। মেয়েটার কাছে শুনেছিল সে যে ফোন করেছিল। তাই অনিমেষ আজ কোর্ট থেকে বের হয়ে সোজা আসে ঝিলিকের বাড়িতে।

ঝিলিক বাড়িতেই রয়েছে। অনিমেষ বলে— কি ব্যাপার? শুনলাম জ্বর। হাতে কি হয়েছে?

ঝিলিক বলে— যাক, তবু আসার সময় হল তোমার।

অনিমেষ ওর অভিমানভরা কণ্ঠস্বর শুনে বলে— জান তো আমার প্রফেশনটা, এত মামলা, এত কাজ।

— তোমরা সবাই একরকম। তোমরা কাজটাকেই বেশি ভালোবাস না? তাহলে এলে কেন কাজ ফেলে? যাও কাজই করতে যাও।

অনিমেষ ওর কথায় হেসে ফেলে— রাগ করেছে ঝিলিক। ঝিলিকের বিছানাতেই বসে আছে অনিমেষ।

অনিমেষ বলে— রাগ করনা আমার ওপর। ঠিক আছে, ক'দিন না আসার জন্যে ক্ষমা চাইছি।

—এখন থেকে তাহলে রোজ আসবে?

— ঠিক আছে । অনিমেশ ওকে সন্ত্বনা দিতে চেষ্টা করে।

এবার ঝিলিকও ছোট্ট মেয়ের মত অনিমেষের বুকে মুখ রেখে বলে— জানো? সেই শয়তানগুলো আবার আমাকে অ্যাটাক করেছিল।

—সেকি! অনিমেষ ঝিলিকের এই কথাতে যত না অবাক হয়েছে তার চেয়ে বেশি অবাক হয়েছে ওর বুকে ঝিলিকের মাথা রাখায়।

ঝিলিক বলে এবার ওদের কোর্টে তুলে ওই ছেলে দুটোকে জেলে পাঠিয়ে দাও।

অনিমেষ ঝিলিকের এই ঘনিষ্ঠতাকে দূর করে রাখতে ওর মাথাটা সরিয়ে বলে, আমি একটা পিটিশন লিখে এনেছি, তুমি এটা পড়ে সই করে দিও। তারপর দেখি ওদের কি করতে পারি।

ঝিলিক সই করে বলে— তুমি ঠিক পারবে। কাল তোমার ওখানে যাবো, রেডি হয়ে থেকো, তোমাকে নিয়ে বের হবো।

অনিমেষ বলে— এই রে! ভুলেই গিয়েছিলাম আসল কথাটা বলতে, কাল আমার মেয়ের জন্মদিন। আমাদের ঘনিষ্ঠ কয়েকজনকে বলেছি, তুমিও যাবে কিন্তু ঝিলিক। কাল সন্ধেটা আমার বাড়িতেই হই চই করা যাবে। কি আসবে তো?

ঝিলিক বলে— সিওর।

অনিমেষের একমাত্র মেয়ে সুজাতার জন্মদিন উপলক্ষ্যে বাড়িতে কয়েকজন আত্মীয় বন্ধুকে ডেকেছেন অনিমেষ। ঝিলিকও এসেছে। ঝিলিক আজ খুব সুন্দর করে সেজেছে। সুজাতার সঙ্গে ঝিলিকের পরিচয় করিয়ে দেয় অনিমেষ। অনিমেষ বলে সুজাতা এই ঝিলিক সেন, আমার ক্লায়েন্ট। ঝিলিক, এই আমার মেয়ে সুজাতা এখন এম.বি.এ করছে।

ঝিলিক হাত বাড়িয়ে দেয় গ্ল্যাড টু মিট ইউ।

সুজাতা ওকে থ্যাঙ্কস্ জানায়।

সুজাতা দেখছে ঝিলিক তার বাবা অনিমেষের সঙ্গে একজন বন্ধুর মত বেশ খোলামেলা ভাবে কথা বলছে। সুজাতার এটা ভালো লাগে না। সুজাতা এর আগে ঝিলিক সম্বন্ধে একটা ধারণা করে নিয়েছে। আজ ঝিলিককে জিজ্ঞাসা করে বাবাকে কতদিন ধরে চেনেন?

ঝিলিকও দেখছে সুজাতাকে। ঝিলিক যেন ওর এই ধারণাটাকে ভেঙেই দিতে চায়। তাই বলে— অনেক দিন থেকেই।

সুজাতার ভালো লাগে না এই উত্তরটা। সুজাতা আবার জানতে চায়— বাবার সঙ্গে কিভাবে পরিচয় হলো? ঝিলিক যেন উত্তরটা এবার মজা করে দেবার জন্যে বলে—

সেটা তোমার বাবাকেই জিজ্ঞাসা করো।

সুজাতা গুম মেরে যায়। তার কাছ থেকে সরে যায়। ঝিলিকের এই সব কথায় যে সুজাতা খুশি হয়নি তা ওর চোখ মুখ দেখেই বুঝতে পারে ঝিলিক।

ওদিকে জন্মদিনের কেক কাটা শুরু হচ্ছে।

সব জন্মদিনের অতিথিরা সুজাতাকে ঘিরে ধরেছে। মোমবাতিগুলো নিভিয়ে সুজাতা কেক কাটে আর কেকের একটা টুকরো প্রথম তার বাবার মুখেই তুলে দেয়।

ঝিলিক দেখছে। তার বাড়িতে এসব উৎসব করার সময় তার বাবা মায়ের কাছে নেই। কোন এক বেদনায় ঝিলিকের চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে ওঠে।

সুজাতা সেদিক থেকে অনেক ভাগ্যবান। ওর বাবা তার জন্মদিনের উৎসব পালন করছে। এরপর হারমোনিয়াম বাজিয়ে সুজাতা গান গাইল। অনিমেষ সুজাতা ও তার স্ত্রী এই আনন্দ উপভোগ করছে। ঝিলিক দেখছে ওদের।

ঝিলিকের মন কি এক দুঃসহ অভিমানে ভরে ওঠে। তাদের মিলন উৎসবে নাচ গানে সবাই অংশগ্রহণ করেছে। শুধু ঝিলিকই এর ব্যতিক্রম। প্রচন্ড অভিমানে ঝিলিক বের হয়ে আসে সেই পার্টি থেকে।

অনিমেষ ওকে বের হয়ে যেতে দেখে বলে

—ঝিলিক কোথায় যাচ্ছো? না খেয়ে যাচ্ছ যে

—ঝিলিক, ঝিলিক!

ঝিলিক পেছনে ফিরেও চায় না। অনিমেষের ডাকে সাড়াও দেয় না। আজকের এই আনন্দ উৎসবে ঝিলিক আজ না খেয়েই পার্টি থেকে বের হয়ে যায়। অনিমেষ এগিয়ে এসে অনুরোধ করে, তবু তার কথাতেও ঝিলিক কর্ণপাত করে না। ও চলে যায়।

সুজাতা দেখল তার বাবার অসহায় অবস্থাটা।

ঝিলিক বাড়িতে এসে নিজের ঘরে ঢোকে। সুজাতার সেই প্রশ্নগুলো ঝিলিককে যেন তাতিয়ে তুলেছিল, ঝিলিক সুজাতার রহস্যময় কথার জবাব দিয়ে তাকে জানাতে চেয়েছিল যে অনিমেষের ওপর ঝিলিকের একটা অধিকার আছে। কিন্তু অনিমেষ সকলের সামনে যেন ঝিলিকের সেই স্বপ্নটাকে শেষ করে দিয়েছে। সে তার মেয়ের জন্মদিনে তার পরিবারকে নিয়ে একটা গান গাইল, অথচ ঝিলিককে একবারের জন্যও গাইতে ডাকলো না।

ঝিলিকের কি তার ওপর কোন অধিকার নেই?

তাহলে কি অনিমেষ এতোদিন যেসব কথা বলে ঝিলিককে আশ্বস্ত করেছিল সেসব মিথ্যে কথা।

ঝিলিকের চোখ পড়ে টেবিলের ওপর রাখা অনিমেষের একটা ছবির দিকে, ওই ছবিটা ঝিলিক তুলেছিল একটা পার্কে। ঝিলিক রাগে, অভিমানে সেই ছবি মেঝেতে আছড়ে ফেলে। ঝিলিকের সব থেকেও কিছুই নেই। ঝিলিকের নিজের বলতে কিছু নেই। তবু একটা মানুষকে আপনভাবে বাঁচতে চেয়েছিল। কিন্তু তাকেও সে পায়নি।

ঝিলিক অসহায় কান্নায় ভেঙে পড়ে।

মিলনবাবু এতদিন দাপটের সঙ্গেই এই এলাকায় রাজত্ব করে এসেছে। তার হুকুম মতই এখানকার সরকারি মহলের কাজও হয়েছে। এতদিন ধরে মিলনবাবু প্রচুর টাকা রোজগারও করেছে আর যে তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে তাকে হয় সরিয়ে দিয়েছে না হয় তার মুখ বন্ধ করে দিয়েছে। তাই তার বিরুদ্ধে কেউ কোন কথা বলতে সাহস পায় না।

সেই মিলনবাবুর ছেলে অর্জুনও বাবার পথেই চলেছে। সে এখন এদিকে বড় বড় ফ্ল্যাট তৈরি করছে, তৈরি করছে মার্কেট কমপ্লেক্স। এখানে ওখানে যেসব জায়গা পড়েছিল অর্জুন তাদের ধমকে না হয় নানা কেসে ফেলে বিব্রত করে না হয় জবর দখল করে নিজের দখলে এনে ওইসব জায়গায় বড় বড় ফ্ল্যাট গড়ে তুলে সেই সব ফ্ল্যাট বিক্রি করে চলেছে।

কেউ তাদের বাবা ছেলের এই অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর সাহস পায় না।

সেই প্রবল প্রতাপশালী মিলনবাবুর ছেলের নামে একটা মেয়ে কোর্টে একেবারে শ্লীলতাহানী করার অভিযোগ তুলে অর্জুনকে বিপদে ফেলেছে।

মিনলবাবু নিজেই যায় থানায়। থানায় ওসি ওকে খাতির করে বসায়।

মিলনবাবু বলে এ কেসটা পাল্টাতে পারলে না? মেয়েটা একটা লুজ ক্যারেকটার বলে ধরে এনে হাজতো পোরো।

দারোগা বলে— স্যার, মেয়েটার বাবা একজন বড় শিল্পপতি। বনেদি নামি পরিবার। তাছাড়া কেসে লড়ছেন একজন নামি উকিল।

আমি তো ওদের হটিয়ে দিতেই চেয়েছিলাম। ওরা গিয়ে পুলিশ কমিশনারকে ধরে এসব করেছে। আমার করার কিছু ছিল না স্যার।

মিলনবাবুও বুঝেছেন কোর্টে যেতেই হবে। তবে তিনি হাল ছাড়েননি। ভালো কথায় না হলে

অন্যপথের আশ্রয়ই নিতে হবে। তাই নেতা তার ছেলেকে বলে ওই মেয়েটার খোঁজ কর। ওকে যদি রাজি করাতে পারিস তাহলে কেসটা মিটে যাবে। দরকার হলে মাথা না হয় একটু নিচুই করবি। কাগজওয়ালারা টিভিওয়ালারা জানতে পারলে বিপদের আর শেষ থাকবে না।

অর্জুন তার চ্যালা গজুকে নিয়ে সেই রাতে ঝিলিকের গাড়ি ফলো করেছিল। কিন্তু মেয়েটা ওদেরকে দেখলেই রেগে ওঠে। আর অর্জুনও মাথার ঠিক রাখতে না পেরে সেই পথেই সেই রাত্রে তারা অপেক্ষা করছিল। ওকে তুলে নিয়ে যাওয়ার জন্যে আর তখনই বাবার পোষা মস্তান তিলক তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে মেয়েটাকে রক্ষা করে।

এরপর আহত অবস্থায় অর্জুনকে ফিরতে দেখে মিলনবাবুও অবাক হয়ে। এসব কি?

অর্জুন বলে— সেই মেয়েটার সাথে কথা বলার জন্য ওর গাড়ি ফলো করছিলাম আর তিলক দলবল নিয়ে এসে আমাদের ওপরে এভাবে অ্যাটাক করল। পালিয়ে না এলে বোধহয় শেষই করে ফেলত।

মিলনবাবু রেগে ওঠে— শালার এতবড় রোয়াব। তিলক এইসব করেছে? তোকেও মেরেছে? ব্যাটা তিলকের মরার জন্যে পালক গজিয়েছে। অর্জুনের চ্যালা গজুও চায় তিলককে হঠিয়ে মিলনবাবুর আরও কাছের লোক হতে। তাতে তারই সুবিধে, তাই গজু বলে— বলুন স্যার। একবার অর্ডার দিন, এই তিলকের পালক ছেঁটে দিই।

মিলনবাবুও ভাবছেন ইদানিং সব কেমন যেন বদলে যাচ্ছে। মিলনবাবু বলে— পথ থেকে তুলে এনে কাজ দিলাম, টাকা দিলাম, দুটো পুলিশ কেস থেকে বাঁচালাম। নাহলে তো জেলেই পচে মরতো আর সেই ব্যাটা কিনা এইভাবে বেইমানি করলো আমার সঙ্গে! একটা মেয়ের জন্য।

অর্জুন বলে— তুমি চুপ করে থাকতে পারো তবে আমি চুপ করে থাকবো না। এই তিলকের বাচ্চাটাকে আমি হাপিস করে দেবো।

গজু বলে— তুমি আমাকেও অর্ডার দাও গুরু, আমিই তিলককে ফিনিস করে দেবো।

মিলনবাবু চেনে ওদের। এই অর্জুন এক নম্বর গোঁয়ার। একটা মেয়েকে সামলাতে পারে না আর ওরা করবে খুন! বরং আর এক ঝমেলায় জড়িয়ে পড়বে। তাই মিলনবাবু বলে তিলকের ব্যাপারটা আমিই ভেবেচিন্তে দেখব। আগে এই কেসটা থেকে বের হই, তারপর যা হয় একটা করা যাবে।

তিলক এখন মন দিয়ে রেওয়াজ করছে। একজন টিচারের কাছে গানও শিখছে তিলক। বাড়িতেও রেওয়াজ করছে। শান্তা বুড়িও খুশি হয়েছে তিলকের গান চর্চার ব্যাপারে উৎসাহ দেখে। বলে— তুই মন দিয়ে গানের চর্চা করে যা আর ওসব মারপিট এবার ছেড়ে দে।

তিলক তার টিচার মিয়া গোলামের প্রিয় ছাত্র। গোলাম ওকে দু-এক জায়গায় নিয়েও যায়। তিলকের হাতে ছোঁয়ায় গীটারে সুরের মূর্ছনা তোলে আর কণ্ঠে মধুমাখা স্বরে গেয়ে ওঠে গোলামের সঙ্গে। তার সঙ্গে থাকে ফালতু।

ফালতু বলে, তোমার হাতে গলায় সুর কিলবিল করছে। যা গাও-না গুরু!

তিলক স্বপ্ন দেখে সে টিভিতে, ফিল্মে গান গাইছে।

সেদিন গোলাম অসুস্থ। সে একটা হোটেলে গায়। গোলাম আজ হোটেলে গাইতে পারবে না। অথচ আজ হোটেলে এক বিশেষ অনুষ্ঠান। হোটেলের ম্যানেজার বলে গোলামকে— তোমাকে আসতেই হবে গোলাম। এই অল্প সময়ে আমি আর কোন ভালো গাইয়েকে পাব না।

গোলাম বলে— ম্যানেজার, আমি আমার সেরা ছাত্রকেই পাঠাচ্ছি। সে আমার থেকেও ভালো গাইবে। খুব ভালো গলা। গোলাম তিলককে বলে তুমি আজ হোটেলে যাও তিলক। আজ তোমাকেই গাইতে হবে। আজ যদি ভালো গাইতে পারো ইউ মে গেট এ গুড চান্স।

তিলক চমকে ওঠে— আমাকে একা গাইতে হবে। ওরে বাবা।

ফালতু বলে— তুমি একাই একশো গুরু। চলো গুরু। দেখবে তোমার প্রোগ্রাম আজ হিট, হিট। সুপারহিট হবে।

তিলক যেন এবার জীবনে. অনেক কিছু পাবার স্বপ্ন দেখছে। তার মনে পড়ে ঝিলিকের কথা। ঝিলিক চেয়েছিল তিলক এই গুন্ডামো ছেড়ে একজন সঙ্গীতশিল্পী হোক।

এখন ঝিলিকের জীবনটাই যেন অর্থহীন হয়ে উঠেছে। ঝিলিকের যেন মনে হয় সে ওই সুজাতার কাছে হেরেই গিয়েছে। একা ওদের বাড়ি থেকে ফিরে এসে পরেরদিন আর সে অনিমেষকে ফোনও করেনি।

সেদিন অনিমেষও ঝিলিকের না খেয়ে চলে যাওয়াতে দুঃখই পেয়েছিল। তাই অনিমেষই এসেছিল ঝিলিকের বাড়িতে। যথারীতি ঝিলিকের মা-বাবা বাড়িতে নেই। ঝিলিক আজ কোথাও বের হয় নি। হঠাৎ অনিমেষকে আসতে দেখে চাইল।

অনিমেষ বলে— কাল কি হল? ওই ভাবে না খেয়ে চলে এলে যে!

ঝিলিকের মনে তখনও রয়েছে সেই গভীর অভিমান। অবশ্য সেটা প্রকাশ করতে পারে না। কেমন বাধো বাধো ঠেকে। তাই বলে— শরীরটা ভালো ঠেকছিল না।

অনিমেষ বলে না না। এখন ঠিকই আছি।

অনিমেষ বলে— কাল পার্টিতে না খেয়ে এসেছিলে, চলো তোমাকে কোন হোটেলে নিয়ে গিয়ে খাওয়াবো। না হলে আমি শান্তি পাবো না।

কথাটা ঝিলিকের ভাল লাগে। সে এই লোকটার সান্নিধ্য চেয়েছিল, তার অতৃপ্ত জীবনে কিছুটা শান্তির, আনন্দের স্পর্শ চেয়েছিল ঝিলিক। তাই অনিমেষের কোন কিছু পাওয়াকে সহজে তার জীবন থেকে হারিয়ে দিতে চায় না। তাই ঝিলিকের মন খুশিতে ভরে ওঠে। অনিমেষ তার জীবন থেকে হারিয়ে যায়নি। এটা আবিষ্কার করতেই ঝিলিকের নিঃসঙ্গ মনটা আনন্দে ভরে ওঠে।

অনিমেষ ঝিলিককে নিয়ে এসেছে নামি একটা পাঁচতারা হোটেলে, এখানে শহরের নামি দামি লোকেরা আসে। এই হোটেলের ব্যাঙ্কয়েটে বসেই বড় বড় ব্যবসায়ীদের অনেক বড় বড় লেনদেনের কথা হয়। এখানে নেতারা তাদের সাম্রাজ্য ধরে রাখার জন্য নানা আলোচনায় বসে। অনেকে আসে তার প্রেমিকাকে নিয়ে। অনিমেষ এনেছে ঝিলিককে। ক'দিনের মধ্যেই কোর্টে উঠছে কেসটা।

অনিমেষ বলে দু তিনজন সাক্ষীকে জোগাড় তো করা গেছে। তবে ওদের নাকি অর্জুন শাসিয়ে এসেছে।

ঝিলিক বলে— ওরা যদি ভয়ে সাক্ষী না দেয়?

অনিমেষ বলে— সাক্ষী না পেলে কোর্টে প্রমাণ করতে অসুবিধা হবে। ওরাও তাই চায় যাতে সাক্ষীরা না আসে।

ঝিলিক চায় দোষীদের শাস্তি হোক। তাদের শাস্তি দিতেই হবে। তাই বলে— এইভাবে সত্যকে ওরা গোপন করতে পারবে না। অনিমেষ বলে— ওরা এই করেই তো সমজের মাথায় উঠেছে। তবে মনে হয় তিলকের দল তা হতে দেবে না। ওই ছেলেটা সৎ সাহসী। ও কথা দিয়েছে যে করেই হোক সাক্ষীদের ও হাজির করবেই।

ঝিলিকের মনে পড়ে তিলকের কথা, তার সাহসের সঙ্গে ঝিলিক পরিচিত হবার সুযোগ পেয়েছে। মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করতেও ভয় পায় না ছেলেটা। তার বাবা মা সবাই হারিয়ে গেছে। সে এই অত্যাচারিত সমাজ ব্যবস্থায় বেড়ে উঠেছে। দেখেছে সমাজের এই কুৎসিৎ রূপটাকে, তাই সেও ঝিলিকের মত অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে চায়। ছেলেটাকে ক'দিন দেখেনি ঝিলিক। ঝিলিকের মনে হয় ওর সাথে দেখা করা দরকার। ওদিকে ঝিলিকের কানে আসে হলের থেকে ভেসে আসা একটা গানের সুর। সুরটা যেন একটা প্রদীপ শিখার মত সারা অন্ধকারকে উদ্ভাসিত করে তুলেছে। সারা হলে গুঞ্জন শোনা যায়। সুরটা ছড়িয়ে পড়ছে আকাশে বাতাসে, মঞ্চে তখন গাইছে একটা তরুণ। তার সঙ্গে রয়েছে যন্ত্রসঙ্গীতে সেই ফালতু, সে খোশমেজাজেই বাজিয়ে চলেছে। আর ঝিলিক দেখে মঞ্চে গাইছে সেই ছেলেটা— তিলক। তার হাতে ঝিলিকের দেওয়া সেই গীটারটা।

অবাক হয়ে দেখছে ঝিলিক। আজ সেই বস্তির গুন্ডা মস্তান তিলক কেমন যেন বদলে গেছে। সে আজ নিজেকে তুলে ধরতে চায় একজন প্রকৃত শিল্পীর পরিচয়ে।

ঝিলিক খুশি হয়েছে তিলকের সাফল্যে। তার মনে হয় তিলক নতুন করে বাঁচার ঠিকানা যেন খুঁজে পেয়েছে।

হলের প্রতিটি শ্রোতা তাকে আরও গান গাইবার জন্য অনুরোধ করে। অনেক নামি দামি লোক তাদের অর্থ বৈভব দেখাবার জন্য মঞ্চে পাঁচশো টাকার নোট ছুঁড়ে দিচ্ছে। তিলকের ওদিকে দেখার সময় নেই, তবে এসব দৃশ্য বেশ খুশি মনে দেখছে ফালতু আর তাই দেখে তার বাজানোর উৎসাহ জোরাদার হয়ে উঠেছে।

রাত হয়েছে। ঝিলিক ভেবেছিল অনুষ্ঠানের শেষে তিলককে সে অভিনন্দন জানাবে। কিন্তু ওর অনুরোধের চাহিদা যা বাড়ছে তাতে এই অনুষ্ঠান শেষ হতে বোধহয় রাত কাবার হয়ে যাবে। ওদিকে অনিমেষকে বাড়ি ফিরতে হবে।

অনিমেষ বলে— চলো ঝিলিক। তোমাকে পৌঁছে দেই রাত হয়েছে।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও ঝিলিক বের হয়ে আসে হোটেল থেকে, সে তিলকের সঙ্গে কথাও বলতে পারে না।

অনিমেষ বলে— ওকে কাল বলো যেন সক্ষীদের ঠিকমত হাজির করে। এখন চলো ওঠা যাক।

অনিমেষ ঝিলিককে নিয়ে বের হয়ে আসে। ওকে পৌঁছে দিয়ে অনিমেষ যখন নিজের বাড়ি ফেরে তখন রাত প্রায় দুটো। সারা বাড়ি নিস্তব্ধ। সাবিত্রী দিনভোর সংসারের কাজ নিয়েই ব্যস্ত। তারপর নিজের দুবেলা পুজো অর্চনার কাজ আছে। সাবিত্রী তখন ঘুমে মগ্ন। অনিমেষের কোন কাজে সে কোন বাধা দেয় না। স্বামীর গুরুত্বপূর্ণ কাজ থাকলেও অনেক দেরি হয় বাড়ি ফিরতে তা সে জানে।

কিন্তু সুজাতা এটা মেনে নিতে পারে না। সে দেখেছিল এই ঝিলিককে। তার সম্বন্ধে সুজাতার নিজের মধ্যে একটা ধ্যান-ধরাণা গড়ে উঠেছে। সুজাতা আজকের দিনের মেয়ে। সে এমন অনেক বড় লোকদের মেয়েদের অজস্র খাম খেয়ালিপনা আর ছেলেদের সঙ্গে লাগামছা মেলা মেশার ব্যাপারটা দেখেছে। তাই এই খামখেয়ালি চিত্তের এই মেয়েটার সঙ্গে তার বাবার এই মেলামেশাটাকে সে মোটেই মেনে নিতে পারে না।

সুজাতা তার বাবাকেও দেখেছে ঝিলিকের জন্যে ব্যাকুল হয়ে তার কাছে ছুটে যেতে। তার বাবা মনে হয় এই বেপরোয়া সুন্দরী মেয়েটার প্রেমেই পড়েছে।

সুজাতার মনে হয় এই ঝিলিক মেয়েটাই তাদের শান্তির সংসারে চরম অশান্তি ডেকে আনছে। সুজাতা এর প্রতিবাদ করবেই। তার মা শান্ত প্রকৃতির মহিলা। হিন্দু ঘরের বউ-এর আদর্শ মেনেই সাবিত্রীদেবী তার নিজের স্বামীকেই দেবতা মানেন।

তাই এরা স্বামীর সব অন্যায় অত্যাচারের দুঃখ মুখ বুজেই মেনে নেবে। সামান্য প্রতিবাদ করার সাহস এদের নেই। কিন্তু সুজাতা এসব নীরবে মেনে নেবে না। রাতে তার ঘুম আসে না। জেগেই আছে। দেখে রাত তখন প্রায় দুটো। গাড়িটা তাদের বাইরে এসে থামে। গাড়ি থেকে নামছে অনিমেষ।

ঝিলিক ওকে হাসি মুখে বিদায় জানিয়েছে, কাল তিলকের কাছে খোঁজ নিয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করবো। গুড নাইট! এন্ড সুইট ড্রিমস্।

হাসতে হাসতে ঝিলিক গাড়ি থেকে নামে। অনিমেষ ওকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে বাড়িতে এসে দেখে দরজা খুলে দাঁড়িয়ে আছে সুজাতা। সুজাতাকে দেখে অনিমেষ বলে— একটা কেসের সাক্ষীদের নিয়ে বসতে হয়েছিল তাই দেরি হয়ে গেল।

সুজাতা আজ কঠিন কণ্ঠে বলে— এই ঝিলিক সেনের কেস্‌টা নিয়ে দেখছি খুব ভাবছ, এতই ভবছ সে বাড়ি ফেরার কথাও মনে পড়ে না।

একটা মেয়ের মানহানির কেস—

অনিমেষ একটা জবাব দিতে যাবে এবার সুজাতাই বেশ কঠিন স্বরে বলে— সব কিছুরই একটা সীমা থাকা দরকার। সেই সীমাও ছাড়িয়ে গেছ বাবা!

অনিমেষ চাইল মেয়ের দিকে। সে বলে— কি বলতে চাস তুই? সুজাতা এবার কঠিন ভাবে বলে— কি বলতে চাই আশা করি সেটা তোমার বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না? আমিও একটা মেয়ে, কথাগুলো অনিমেষের মুখের উপর ছুঁড়ে দিয়ে দরজা বন্ধ করে ভেতরে চলেও যায় সুজাতা।

অনিমেষ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। আজ তার মনে হয় এই ঝিলিকের জন্য তাকে কাঠগোড়ায় দাঁড় করিয়েছে তার মেয়ে। নিজের ওপর ঘৃণা আসে অনিমেষের, মনে হয় সে যেন একটা ভুল কাজই করেছে। ঝিলিকের এই গায়ে পড়া ভাবটা আজ অনিমেষের মনে একটা নতুন প্রশ্ন আনে। তবে কি ঝিলিকের মত এক বড়লোকের বেপরোয়া মেয়ে তাকে নিয়ে কোন খেলাই শুরু করেছে!

ঝিলিকের মনে একটা আনন্দের সুর বাজে। এতোদিন সে ছিল নিঃসঙ্গ একা। কখনও স্নেহ, ভালবাসা পায়নি, আজ অনিমেষ তাকে নিজে নিয়ে গেছে সেই হোটেলে। সেখানে অন্য আর একজনের স্বপ্ন সার্থক হতে চলেছে। তিলক আজ তার মস্তানির পথ ছেড়ে গানের জগতে প্রতিষ্ঠিত হবার চেষ্টা করছে।

তিলক আজ এই হোটেলে অনুষ্ঠান করে রাতারাতি যেন খ্যাতির জগতকে ছুঁতে পেরেছে। দর্শকরাও আজ খুব খুশি। হোটেলের ম্যানেজারও খুশি হয়েছে তিলকের গানে সত্যি একজন বড় শিল্পীকে আবিষ্কার করেছে সে। আর সবচেয়ে খুশি হয়েছে ফালতু।

শো-র পর মঞ্চে দর্শকদের থেকে পাওয়া টাকার পরিমাণও নেহাত কম নয়।

ওদিকে শান্তা বুড়িও খুশি। ফালতু বলে, গুরু এসব তোমার। তারপর টাকার সবটা ওর হাতে তুলে দেয়, তা প্রায় হাজার পাঁচেক টাকা।

তিলক সব টাকাগুলো মাসির কাছে দিয়ে বলে— মাসি আমার প্রথম কামাই সব তোমার। শান্তা বুড়ি চমকে ওঠে— এত টাকা নিয়ে আমি কি করবো। এসব তুই রাখ। খেতে পরতে পারলেই আমি খুশি থাকবো রে— এটা তুই রাখ।

এমন সময় এসে পড়ে ঝিলিকের গাড়িটা। ঝিলিকও দেখছে তিলক টাকাগুলো তুলে দিচ্ছে মাসির হাতে।

তিলক ওকে দেখে বলে— এসো ম্যাডাম।

ঝিলিক বলে— তোমাকে শুভেচ্ছা জানাতে এসেছি তিলক। কাল হোটেলে তোমার গান শুনেছি দারুণ গেয়েছ তুমি। এইখানেই আটকে থাকলে চলবে না। তুমি কলকাতার সীমানা ছাড়িয়ে বাইরেও পা রাখবে। তোমাকে অনেক দূর যেতেই হবে।

তিলক হাসে। তিলক বলে— আমাদের ভাগ্য এইখানেই আটকে থাকবে ম্যাডাম।

ফালতু বলে— ওসব এখন থাক গুরু, আগে মেম্‌সাহেবের সাক্ষীর দিনে বস্তির ও সাক্ষীদের আদালতে নিয়ে যেতে হবে।

তিলকের মনে পড়ে কথাটা— তাই তো।

ফালতু বলে— বস যখন কথা দিয়েছে, তখন ওদের তুলে নিয়ে যাবোই কোর্টে। তুমি বেফিকর থাকো মেম্‌সাহেব। যে তোমার গায়ে হাত তুলেছে, গুরু তাদের সাজা দেবেই।

ওদিকে মিলনবাবুও বসে নেই। তার সপুত্র অর্জুনও বুঝেছে,এই কেসে বিশেষ করে নারী নিগ্রহের কেসে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ হাজির করতে পারলে তার সাজা হবেই। অর্জুন স্বপ্ন দেখেছিল এই প্রমোটারি ব্যবসার সঙ্গে সঙ্গে তার বাবা ভোটে জিতে এম.এল.এ হতে পারলে তার ব্যবসা আরও ভালোই চলবে। কিন্তু বাবা যা করতে পারেনি। অর্জুন তাই হতে চায়। ভোটে সে জিতলে একটা মন্ত্রীর পদ সে ঠিক ম্যানেজ করে নিতে পারবে। কিন্তু অর্জুনের মনে হয় এই মেয়েটা অর্জুনের সেই স্বপ্নকে সত্যি হতে দেবে না, তাই সেইসব সাক্ষীদের ভয় দেখিয়ে, টাকা দিয়ে সে সরিয়ে দেবে। আর সাক্ষ্যপ্রমাণ না পেলে কেস্‌টা ডিসমিস হয়ে যাবে।

মিলনবাবু এর মধ্যে সব খবর জেনে তিলককে ডেকে পাঠিয়েছে। মিলনবাবু একসময় তিলককে পুলিশের হাত থেকে বাঁচিয়ে নিজের কাজের জন্যে কাজে লাগিয়েছে, তাই মিলনবাবু আশা করেছে যে তিলক সেই প্রতিদান নিশ্চয়ই ভুলে যাবে না। সে তাকে ছেলের এই বিপদের হাত থেকে বাঁচাবে। তাই মিলনবাবু তিলককে ডেকে পাঠিয়ে বলে— অর্জুন একটা ফালতু কেসে ফেঁসে গেছে, ওর মত ভালো ছেলেকে বিরোধী দল ফাঁসানোর জন্যে মিথ্যে কেসে জড়িয়েছে। তুমি এই এলাকায় গিয়ে চায়ের দোকানদার আর পাশের বুড়িটাকে গিয়ে বলো,ওরা যেন কোর্টে সাক্ষী দিতে না যায়। ভালভাবে ওদের বুঝিয়ে বলবে দরকার হলে ওদের টাকাও দেবে।

তিলক শুনছে মিলনবাবুর কথা। অথচ তিলক নিজে কথা দিয়েছে ঝিলিককে, যে দোষীদের সে শাস্তি দেবেই। তাই মিলনবাবুর কথা শুনে তিলক এবার দোটানায় পড়ে।

মিলনবাবু বলে— টাকা নিয়ে যাও,ওদের মুখ বন্ধ করতে টাকা দিও।

তিলক বলে— যদি ওরা রাজি না হয়।

মিলনবাবু বলে— তাহলে ওদের মুখ চিরদিনের জন্যে বন্ধ করে দিতে হবে।

মিলনবাবুর হয়ে এসব কাজ তিলক এর আগেও করেছে। এসব খুনজখম তার কাছে নতুন কিছু নয়।

মিলনবাবু বলে— এসপার-ওসপার যা করার তা এই সপ্তাহের মধ্যেই করতে হবে।

তিলক মিলনবাবু কিছু টাকা দিয়ে কাজ শেষ করার হুকুম দেয়, ওরা যেন কোর্টের মুখোমুখি না হয়, তার আগেই ওদের বুঝিয়ে থামাতে হবে না হয় সরিয়ে দিতে হবে।

এবার সত্যিই তিলক ভয়ানক ভাবনাতেই পড়েছে। সে এতদিন যা করেছে, তার থেকে ইদানিং সরে গিয়ে গানের জগতে পা রেখেছে, এটা তার কাছে স্বপ্ন ছিল। কিন্তু এই মিলনবাবুর লোকেরা এদেরকে সুস্থভাবে বাঁচতে দেবে না। তার কথামত কাজ না করলে ওরা হয়তো তিলকের জীবনটাই বরবাদ করে দেবে।

এদিকে তিলক জানে এবার তাকে একটা সিদ্ধান্ত নিতেই হবে। মিলনবাবু সাপের মতই হিংস্র, তার কথা না শুনলেই বিপদ হবে সেটা জানে তিলক। ফালতু দেখছে ব্যাপারটা। হাসিখুশি তিলক যেন কোন এক গভীর চিন্তায় পড়েছে।

শান্তা বুড়ি বলে— কি হয়েছে রে তিলকের? আজ গানের রেওয়াজই করল না। ফালতুও দেখেছে সেটা। তাই ফালতুই বলে— কি কেস্ বল। বাংলার পাঁচের মত মুখ করে বসে আছ কি হয়েছে? তিলক এবার নিজের সমস্যার কথাটা জানায় ফালতুকে।

তিলক বলে— মিলনবাবু জানে যে আমি ওই সাক্ষীদের ফিট্ করেছি, এখন মিলনবাবু-র কথা শুনে কাজ করতে গেলে ঝিলিকের কেসটাই গুবলেট হয়ে যাবে। আর ঝিলিকের কাছেও অপরাধী হয়ে যাবে। এই মেয়েটা আমার জন্যে এত করে এত ভাবে। ওর জন্যেই একটা ভালো পথ পেয়েছিলাম, হয়তো এবার আমায় আবার চোখ মাথা নিচু করে মস্তানিই করতে হবে। মিলনবাবুর পায়ে বিকিয়ে দিতে হবে নিজেকে।

ফালতু সব কথা শুনে বলে— গুরু, একদিন তো মুখ বুজে মাথা নিচু করে ওদের গোলামি করে, তুমি গুন্ডা মস্তান ফালতু হয়ে গেছ। একবার ভালো পথ যখন পেয়েছ তখন এবার থেকে মাথা তুলেই বাঁচবে। আর চুপ করে তাদের অন্যায়কে মেনে নেবে না।

তিলকও যেন সেটাই ভাবছিল। তিলকেরও এই ঘৃণ্য জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা এসে গেছে।

ফালতু বলে— গুরু, আমার মাথায় একটা আইডিয়া এসেছে। আমি ম্যানেজ করছি সাক্ষীদের। উকিলবাবু তো বলেছেন— সাক্ষীদের আনতে পারলে এই অর্জুন আর ওর দলের পান্ডা গজুর জেল হবেই। তাই চুপ করে থকো। বলবে ওই লোকেরা সব ম্যানেজ হয়ে গেছে। ওরা যখন কোর্টে সাক্ষী দিতে যাবে।

তিলকের কথার জবাবে ফালতু বলে— অর্জুন-গজার জেল হয়ে যাবে। বছর তিন-চারের জন্য।

তখন মিলনবাবুর ছেলেপুলে কেউ থাকবে না আর এবার মিলনবাবুকে ভোটে হারিয়ে বিশুদাই আসবে। তাহলে একটিলে দুই পাখি খতম। তারপর তো মিলনবাবুর কোন ক্ষমতা থাকবে না আর কিছু করতেও পারবে না।

তিলক কথাটা ভাবছে। আজ তিলক মনে মনে এদের এতদিনের অন্যায়ের প্রতিবাদ করার একটা পথ পেয়েছে।

ফালতু বলে— কি গুরু? এইটুকু ফটকা খেলতেই হবে।

তিলকও যেন অন্তর থেকে সাহস পায়।

সে বলে— তাই করবো। বরং সেই বুড়ি আর চায়ের দোকানদারকে এর থেকে কিছু টাকাও দেব মেমসাহেবের হয়ে সাক্ষী দেবার জন্য।

ফলতু বলে— জিতে রহ গুরু। ভালো কাজে ঈশ্বরও তার সহায় হয়। দেখ ঠাকুর কি করে। এই ক'দিন চুপ করে থাকো। আর মিলনবাবুকে বলো, সব ম্যানেজ হয়ে গেছে। কেউ সাক্ষী দিতে যাবে না। আর আরও হাজার পাঁচেক টাকা লেগেছে বলো।

ঝিলিকের মনে এখন একটা তৃপ্তি ভরা। তিলকের মত পথের একটা মস্তানকে সে মানুষ করে তোলার কাজে এগিয়েছে।

আজ তিলক এসেছে অনিমেষবাবুর চেম্বারে। সামনেই ঝিলিকের সেই মামলার দিন। অনিমেষবাবুর কাছে এই কেসটা একটা চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মিলনবাবুর টাকা আছে, প্রতিষ্ঠা আছে, মিলনবাবু যেভাবে হোক তার ছেলেকে বাঁচাতে চায়।

মিলনবাবুও চেয়েছিল অনিমেষ এই কেসটা থেকে সরে দাঁড়াক। তাই মিলনবাবু অনিমেষের চেম্বারে এসে প্রস্তাব দেয়— ওসব যা হয়েছে, তা নিয়ে আর কোন বাড়াবাড়ি করবেন না। বরং ভালো টাকা দিচ্ছি, আপনি কেসটাকে ঘুরিয়ে দিন।

অনিমেষ বলে— মক্কেলের হয়ে মামলা লড়াই তার কাজ। অন্য জনের টাকা নিয়ে ওকালতির মত পবিত্র পেশাকে আমি অপমান করতে চাই না।

মিলনবাবু বলে— সততার দিন কি আজ কাল আছে মশাই? অনিমেষ দেখছে লোকটাকে। নেতাদের কাছে আজ এই জিনিসটার তেমন কোন মূল্য নেই।

তাই মিলনবাবুর কথার জবাবে অনিমেষ বলে— আমি অন্যায়ের প্রতিবাদ করবই।

মিলনবাবু হতাশ মনে ফিরে যায়। তবে মিলনবাবু বসে নেই। তাই তিলককে দিয়ে সাক্ষীদের মুখ বন্ধ করার ব্যবস্থা করেছে। তিলকও মিলনবাবুর ফতোয়াটা রেখেছে।

তিলক বলে সাক্ষীরা মুখ বন্ধ করেছে মিলনদা, ওরা কেউ সাক্ষী দিতে যাবে না।

মিলন খুশি হয়ে বলে — ভেরি গুড।

ফালতু বলে— মিলনবাবু এই চায়ের দোকানদার আর বুড়িটা আর পাঁচ হাজার টাকা চেয়েছে। তারাই তো মূল সাক্ষী।

·মিলনবাবু বলে ঠিক আছে। নিয়ে যাও আরও পাঁচ হাজার টাকা। কাজ যেন হয়।

ফালতু বলে— ওনিয়ে ভাববেন না। মামলার দিন দুটোকেই তুলে নিয়ে যাবো। আদালতে ঘেঁষতে দেব না, ব্যস মামলা খারিজ।

ঝিলিক এসেছে অনিমেষের কাছে।

অনিমেষ বলে— ঝিলিক। মিলনবাবু তো নানা ভাবে এই কেসটাকে কেঁচিয়ে দেবার চেষ্টা করছে।

ঝিলিক বলে — তাহলে এদের কি শাস্তি হবে না? তা নাহলে ওই অর্জুন আমাকে শাসিয়েছে এবার ছেড়ে দেবে না। এসব যদি হয়, আমার সম্মান রাখতে আত্মহত্যা করা ছাড়া উপায় থাকবে না।

অনিমেষ বলে— না না ঝিলিক। তিলক সাক্ষীদের আনবেই। আর সাক্ষীরা এলে অর্জুনের জেল অনিবার্য।

ঝিলিক বলে— আমি তোমার উৎসাহ নিয়েই বেঁচে আছি। আজ সন্ধ্যায় চলো আমাদের রিসর্টে, অনেক কথা আছে। অনিমেষের ফোনটা হঠাৎ বেজে ওঠে। ঝিলিক বিরক্ত হয়।— দেখ কোন মক্কেলের ফোন। শান্তিতে দু দণ্ড কথা বলার যো নেই তোমার চেম্বারে।

অনিমেষ ফোনটা ধরেছে। সুজাতা বাড়ি থেকে ফোন করেছে, তাদের পরিচিত এক আত্মীয় এসেছে। তাই সুজাতা বলে— তুমি চেম্বার থেকে সোজা বাড়ি চলে এসো।

অনিমেষ বলে— ঠিক আছে তাই যাচ্ছি।

কাল ঝিলিকের কেস্। ঝিলিকও অনিমেষের কাছে সময় কাটিয়ে সাহস পেতে চায়। বাবা মা তাদের নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত। তাই ঝিলিক অনিমেষের কাছে থাকতে চায়। বাবা বলেছেন দিল্লীতে কি কাজ আছে, ক'দিন সেখানেই থাকবে। মায়ের সেই নারীকল্যাণ সমিতির জরুরি এক অধিবেশন আছে।

অনিমেষ ফোনটা রেখে বলে— ঝিলিক আজ তোমার সঙ্গে আর রিসর্টে যাওয়া হচ্ছে না।

মানে! ঝিলিক চটে ওঠে।

সুজাতার মামি এসেছে, নিউইয়র্কে থাকে, কাল রাতেই ওঁর ফ্লাইট। তাই সুজাতা ফোন করেছিল, বলল— চেম্বার থেকে সোজা বাড়ি যেতে হবে। ঝিলিক বিবর্ণ মুখে চেয়ে থাকে অনিমেষের দিকে। তার সব অধিকার যেন পদে পদে কেড়ে নিচ্ছে সুজাতা।

অনিমেষ বলে তুমি ভেব না, আমি কাল আগেই কোর্টে পৌঁছে যাবো। আর তিলককে বলা আছে ওর দলবল সাক্ষীদের নিয়ে এসে পড়বে। তোমাকে ভাবতে হবে না। যা করার আমিই করবো। চলি। বাড়িতে ওরা ওপেক্ষা করছে।

অনিমেষ চলে গেল।

ঝিলিকও বের হয়ে আছে। নিঃসঙ্গ একা সে। আজই তার খুব বেশি অনিমেষকে দরকার ছিল।

রাত্রি নামে। এতবড় বাড়িতে ঝিলিক একদম একা। মা আজ বাইরে। বাবাও নেই শহরে। আজ নিজেকে খুবই দুর্বল মনে করে, চোখের সামনে ভেসে ওঠে সেই অর্জুনের নিষ্ঠুর মুখটা। তার কঠিন স্বরের কথাগুলো। এরমধ্যে ঝিলিককে ধরেছিল পথের মধ্যে অর্জুন। সে শাসায়— আমার নামে কেস্ করে কোন লাভ হবে না। আমি বেকসুর খালাস পেয়ে যাবো। আর তারপর তোমার চরম সর্বনাশের পালা, তোমাকে দুনিয়া থেকেই সরিয়ে দেব। সেই উদ্ধত কণ্ঠস্বরটাই আজ যেন আসে ঝিলিকের মনে। সে একা একা ভয় পায়।

রাত তখন প্রায় দুটো, ঝিলিক আর থাকতে না পেরে ফোন করে অনিমেষকে।

সুজাতাই বিরক্ত হয়ে ঘুম চোখে উঠে গিয়ে ফোনটা ধরেছে। আর ঝিলিকের কণ্ঠস্বর শুনে রেগে ওঠে — বাবা এখন ঘুমোচ্ছেন। কাল সকালে ফোন করবেন।

ফোনটা রেখে দেয় সুজাতা।

ঝিলিক আবার ফোন করে।

ফোনটা বাজছে।

সুজাতা এবার ইচ্ছে করেই ফোনটা ধরে না।

অনিমেষ ফোনের শব্দটা শুনে তার ঘর থেকে বের হয়ে এসে ফোনটা ধরে। ওদিক থেকে ঝিলিক বলে— তুমি একবার এখনি আমার বাড়িতে চলে এসো, এক্ষুনি।

অবাক হয় অনিমেষ। জানতে চায় কেন?

ঝিলিক বলে— খুব জরুরি দরকার। যে অবস্থায় আছো চলে এসো।

অনিমেষ ভাবছে হয়তো ঝিলিকের কোন বিপদই হয়েছে। তবু বলে কি ব্যাপার?

— ফোনে কথা না বাড়িয়ে এক্ষুনি চলে এসো প্লিজ!

ঝিলিকের কণ্ঠস্বরটা কেমন যেন আতঙ্কে ভরা।

অনিমেষ ভাবে হয়তো কোন দরকার সত্যিই।

তবু বলে— এত রাতে!

— হোক। তবু একবার এসো।

— ঠিক আছে।

সুজাতা ওর মেজাজেই বের হয়ে এসেছে। ও দেখে তার বাবা এই রাতেই বের হবার জন্যে গাড়ি বের করে গ্যারেজ থেকে।

সুজাতা জিজ্ঞাসা করে— কোথায় যাচ্ছো বাবা এত রাতে?

অনিমেষ বলে— জরুরি দরকার।

সুজাতা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে— এত রাতে ঝিলিকের কাছে না গেলেই নয় বাবা। ওটা একটা—

আর কি বলতে যাচ্ছিল সুজাতা। তার কথা শেষ হল না। অনিমেষ গাড়ি স্টার্ট দিয়ে বের হয়ে গেল, তবু অনিমেষ সুজাতার এই কথার ইঙ্গিতটা বুঝেছে।

অনিমেষ এখন শুধমাত্র ঝিলিকের বিপদের কথা শুনে ছুটে চলেছে।

নির্জন স্তব্ধ বাড়িতে ঝিলিক একা জেগে আছে।

দারোয়ান গাড়িটা চেনে তাই সেও গেটটা খুলে দিয়েছে।

অনিমেষ গাড়িটা বেশ খানিকটা ভেতরে এনে গাড়িবারান্দার নিচে গাড়িটা রেখে ব্যস্ত হয়ে ড্রইং রুমে ঢোকে।

ঝিলিক তারই জন্যে অপেক্ষা করছিল।

অনিমেষ হন্তদন্ত হয়ে ঢুকে সহজভাবেই ঝিলিককে বসে থাকতে দেখে বলে— কি ব্যাপার? এত রাতে এই ভাবে ডাকাডাকি। কি হয়েছে?

ঝিলিক হাসে। সে অনিমেষকে দেখে খুশি হয়েছে। সুজাতা তাকে অগ্রাহ্য করেছে কিন্তু তার বাবা ওর ডাকে এসেছে এতরাতে।

ঝিলিক হালকা স্বরে ওর হাত ধরে বলে — আগে বোস। অনিমেষকে বসিয়ে ওর পাশেই ঝিলিক ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে বলে— বাড়িতে বাবা মা কেউ নেই। এতবড় বাড়িতে আমি একা, বারবার তোমার কথাই মনে পড়ছিল, তোমাকে দেখতে চাইছিলাম, তোমাকে পাশে পেতে চাইছিলাম। তাই— এবার চটে ওঠে অনিমেষ। অনিমেষের মনে হয় এ যেন বড়লোকের মেয়ের খামখেয়ালিপনাই। অনিমেষের সুজাতার কথাগুলো মনে পড়ে। ঝিলিক যেন তাকে খেলার পুতুল ভেবে চরম অধঃপতনের পথে টেনে নিয়ে যেতে চায়। অনিমেষ এবার আর নিজেকে সামলাতে পারে না। ঝিলিকের এই ব্যবহারে অনিমেষের মাথার ঠিক থাকে না। অনিমেষ সপাটে ঝিলিকের গালে একটা থাপ্পর কসিয়ে বলে— তোমাকে চিনতে পারলাম। তোমার বিপদ ভেবে তোমাকে একজন মানুষের মতই সাহায্য করতে এসেছিলাম, কিন্তু তুমি যে সত্যি এত নির্লজ্জ, ইতর, নিচ তা ভাবিনি।

চড় খেয়ে চমকে ওঠে ঝিলিক। আর্তকণ্ঠে বলে— তুমি আমাকে মারলে?

— তোমাকেই মারাই উচিত। তুমি ইতর নিচ। তোমাকে আমি ঘৃণা করি। আমাকে আর কোনদিন ফোন করবে না।

ঘর থেকে বের হয়ে গিয়ে গড়িতে উঠে স্টার্ট দিয়ে বের হয়ে যায় অনিমেষ।

ঝিলিক স্তব্ধ পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে থাকে।

সকালে দিন কাটে অনিমেষের কোর্টে। আজ সে উকিল হিসেবে ঝিলিকের মামলা লড়ছে, এটা তার কর্তব্য। সেই চায়ের দোকানের মালিক, সেই বুড়ি, আরও দুজনকে সাক্ষী হিসেবে এনেছে কোর্টে।

ওদের দেখে চমকে ওঠে মিলনবাবু। অর্জুন তখন আসামীর কাঠগোড়ায়।

অনিমেষ একজন দুঁধে উকিল। সে তখন সাক্ষীদের দিয়ে অর্জুনের গুন্ডামির সনাক্ত করিয়ে, কড়াভাবে সাওয়াল করে চলেছে।

মিলনবাবু উকিল সাক্ষীদের দু-একটা কথা জিজ্ঞাসা করে। কিন্তু সাক্ষীরা ওই অর্জুন আর গজুকেই সনাক্ত করে।

এদিকে মিলনবাবু প্রমাদ গুনছে। পুলিশের বেষ্টনীতে রয়েছে অর্জুন, গজু। এবার তাদের যে শাস্তি হবেই সেটা তারাও বুঝে চুপসে গেছে। অর্জুন যে শেষ পর্যন্ত প্রমাণিত হয়ে যাবে সেটা ভাবেনি আর

তিলকও যে তার সঙ্গে এরকম বেইমানি করবে সেটাও কল্পনা করেনি খোদ মিলনবাবু।

বিজয়ির মত ফিরছে অনিমেষ। আজ এই কেসের রেজাল্ট হয়ে গেছে। অর্জুন আর গজুর সাত বছর সশ্রম কারাদণ্ডে আদেশ হয়েছে।

অনিমেষ তাই খুশি। তবু বলে— তিলক, ঝিলিক তো এল না। তার বাড়িতে সুখবরটা তুমিই দিয়ে এসো।

হঠাৎ এমন সময় ফোনটা বেজে ওঠে অনিমেষের চেম্বারে। অনিমেষ ফোনটা ধরেই চমকে ওঠে। তিলক বলে— আপনার কি হল স্যার।

অনিমেষ বলে— ঝিলিকের বাবার ফোন, চলো একবার ওদের বাড়িতে।

ওরা গাড়িতেই বের হয়ে পড়ে।

বড় রাস্তায় তখন লোকজনের ভিড়। অদ্ভুত এক স্তব্ধতা বিরাজ করছে ওদের বাড়ির চারপাশে।

অনিমেষ ওপরে উঠতে যাবে, ভেতর থেকে ডাকে ঝিলিকের বাবা। বলে— আপনি অনিমেষবাবু, এ্যাডভোকেট?

অনিমেষ বলে— হ্যাঁ।

মিঃ সেন বলেন— ঝিলিক আজ ভোরেই সুইসাইড করার জন্যে বিষ খেয়েছিল।

চমকে ওঠে অনিমেষ । আর্ত কণ্ঠে জানতে চায়, তারপর?

মিঃ সেন বলেন— ওকে খারাপ কন্ডিসানে নার্সিংহোমে পাঠান হয়েছে। ওর টেবিলে আপনার নামে এই চিঠিখানা ছিল।

অনিমেষ চিঠিখানা পড়তে যাবে। ঝিলিকের মুখটা ওর চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

—সংসারে বাবা মায়ের সাহচর্য.স্নেহ, ভালাবাসা সে কোনদিন পায়নি। তার হৃদয় ছিল পিতৃস্নেহে কাঙাল। তাই অনিমেষকে তার পাশে পেয়ে সে যেন তার অতৃপ্ত পিতৃস্নেহের স্পর্শই পেয়েছিল। তাকে সে বাবার আসনে বসিয়ে আদরিনী মেয়ের মতই পাশে পেতে চেয়েছিল। তাই তাকে জ্বালাতনও করেছিল। কিন্তু সেই রাতে অনিমেষ তাকে ভুল বুঝে, চড় মেরে তাকে অনেক অসম্মানজনক কথা বলেছিল। ঝিলিক সব হারিয়ে চরম অপমান সহ্য করে আর তার বাঁচার ইচ্ছে ছিল না। তাই চলে যাচ্ছে সে, এই স্নেহশীল সমাজ, এই পৃথিবী ছেড়ে।

চমকে ওঠে অনিমেষ— কেমন আছে ঝিলিক মিঃ সেন? ওর এই সর্বনাশের জন্যে আপনি আমি সবাই দায়ি। তাকে বাঁচাতেই হবে।

ওরা নার্সিং হোমে এসেছে। ডাক্তার বলেন — যাক অনেক চেষ্টা করে ওকে বিপদের মুখ থেকে ফিরিয়ে এনেছি।

ঝিলিকের জ্ঞান ফিরেছে। সে চেয়ে দেখে তার পাশে বসে আছে তার বাবা মা আর রয়েছে অনিমেষ।

ওদের মুখে চোখে ব্যাকুলতা, অনিমেষ নিজের কাছে নিজেই লজ্জিত। সে বলে— আমাকে ক্ষমা কর ঝিলিক, আমি তোমাকে বুঝতে পারিনি।

ঝিলিক আজ দেখে ওদের চোখেমুখে ব্যাকুলতা, স্নেহের উচ্ছলতা। আজ ওদের কাছে রয়েছে ভালোবাসা, একটু সময়।

ঝিলিক দেখে ওদিকে দাঁড়িয়ে আছে তিলক।

তিলক বলে— আজ টিভিতে আমার প্রোগ্রাম। দেখবে কিন্তু।

অনিমেষ বলে— ঝিলিক ওই অর্জুন আর গজুর সাত বছরের জেল হয়েছে। তিলকই সাক্ষীদের এনে, ওই শয়তানদের উচিত শিক্ষা দিয়েছে।

— তাই নাকি! ঝিলিকের চোখে খুশির ঝিলিক।

তার কাছে এই পৃথিবী যেন আবার স্নেহময়ী ভালোবাসাময় হয়ে উঠেছে। আবার নতুন করে সে বাঁচতে চায়।

দাশুদার ফর্দ

আমাদের পাড়ার দাশরথি দাসকে এক ডাকে পাড়া মায় বেপাড়ার অনেকেই চেনে। অবশ্য অনেকে আবার তাকে গুফোদা বলেই জানে।

দাশুদার চেহারাটা বেশ গোলগাল নধর। রং টা কালোর দিকে হলেও বেশ রসে-বশে থাকার জন্য একটা চকচকে ভাবও আছে। গোলমত মুখ একটু বেঁটে চেহারা। তাই একটু মোটা সোটাই দেখায় উচ্চতার অনুপাতে। সেই সঙ্গে তার গোঁফ জোড়াটাও মানিয়েছে চমৎকার।

অবশ্য এমন সতেজ গোঁফ জোড়াকে ঠিকমত চেকনাই বজায় রাখার জন্য দাশুদার সময় অর্থ মেহনৎও কম করতে হয় না। বৌদি দাশুদার প্রাণ গোঁফের যত্ন আত্তি দেখে বলে,

— কে তোমার বেশি আপন গো- গোঁফ জোড়া না আমি?

দাশুদা গোঁফে ইদানীং রোজ ওয়াটার ব্যবহার করে। আর করবেই না বা কেন। দাশুদার পিতৃপুরুষের ছিল পাটের আড়ত। সেই পাট থেকেই তারা তিনপুরুষ ধরে রাজ্যপাট চালিয়েছিল। এই খালধারে বিশাল আড়ত-গুদম। এখন দাশুদা, পাটের কারবারের পাশাপাশি আলকাতরা চিটেগুড় সিমেন্টের হোল সেলার হয়ে দুহাতে পয়সা লুটছে। পৈতৃক ব্যবসা ছাড়াও রয়েছে এই বাগবাজার বেলগাছিয়া অঞ্চলে বেশ কিছু বাড়ি জমি। মা লক্ষ্মী তাকে এখনও কৃপাদৃষ্টি দিয়ে রেখেছেন।

অবশ্য দাশুদা এত কিছুর মালিক হয়েও তেমন অতি আধুনিক হয়ে ওঠেনি। কারণ এখনও দাশুদাদের গ্রামের সঙ্গে সম্পর্ক আছে। হুগলীর কোন দুর মফঃস্বলের আদি বাসিন্দা তারা। দেশেও বিশাল বাড়ি-আত্মীয় পরিজন আছে। এখন দোল-দুর্গোৎসব হয় ঘটা করে। দাশুদা সেই ক'দিন কলকাতা থেকে দেশের বাড়িতে যান। আমরাও যাই তার সঙ্গে।

দাশুদার বাবা ছিলেন মোহনবাগানের গোঁড়া সমর্থক। কলকাতার ওই উত্তর অঞ্চলের বাসিন্দা তারা। তাই মোহনবাগানের সঙ্গে তাদের নাড়ির টান রয়েছে বংশানুক্রমিক। দাশুদা তাই জাত ফুটবল প্রেমী। সেই সুবাদেই আমাদের সঙ্গে তার পরিচয়।

দাশুদার বয়স পঞ্চাশ পার হয়েছে। দিনভোর গদিতে বসে ব্যবসার কাজ দেখেন। আর ব্যবসার কাজে যাতায়াতও করেন গাড়িতেই। এখন অবশ্য ব্যবসার কাজ তার ছেলেই বেশী দেখাশোনা করে। আর মোহনবাগানের খেলার দিন মাঠে যাবেই দলবল নিয়ে। এছাড়া দৈহিক পরিশ্রম কিছুই করতে হয় না।

এমনিতে ব্যস্ত স্বাধীন মানুষ। সব কাজ সময় থাকতে করতে চায় দাশুদা নিখুঁত ভাবে। তাই এক কাজ দুবার করতে হয়। টেনশন বাড়ে। ডাক্তার বলেছেন রোজ সকালে অন্ততঃ আধঘণ্টা মর্নিংওয়াক করতে। তাই রোজ সকালে বাড়ির ওদিকে বেলগাছিয়ার মাঠে ভ্রমণ করে। আমরা তখন ফুটবল প্রাকটিস করি মাঠে।

দাশুদা ফুটবল জীবনে খেলেছে কিনা মনে পড়ে না। তবে রক্তে তার ফুটবল। তাই নিজে না খেললেও ফুটবল প্রেমীই নয়, বিশেষজ্ঞ- মোহনবাগানের একজন মোটা ডোনার, পৃষ্ঠ পোষক। ক্লাবের জন্য অনেক টাকাই দেয়। তাই আমাদের ফুটবল ক্লাবও তার কৃপা থেকে বঞ্চিত হয়নি।

দাশুদাও একবার সকালে মাঠে আসে। আমাদেরও টিপস দেয়। আর ক্রমশঃ আমাদের ক্লাবের একজন কর্মকর্তাই হঠে ওঠে। আমরাও বুট-জার্সী খেলার খরচা বাবদ বেশ টাকাই পাই দাশুদার কাছ থেকে। সেই সুবাদেই আমাদের আপনজন হয়ে উঠেছে।

দাশুদার বাড়িতেও যাই। বৌদিও আমাদের স্নেহ করেন। গেলে আদর করে কাটলেটও খাওয়ান। দাশুদা বলে, — ছেলেগুলো কত ভালো।

পুজোর সময় দাশুদার গ্রামের টুর্নামেন্ট খেলতে যাই। দাশুদার নজর সবদিকে। তার বাবার নামে শিল্ড দিয়েছে গ্রামে। খেলার মাঠও বানিয়ে দিয়েছে ক্লাব। তবে দাশুদা এত কিছু দিলেও ওই শিল্ড যে গ্রামের বাইরে যাবে এটাকে মেনে নিতে পারে না। তাই কলকাতা থেকে আমাদের ফুলটিমকে নিয়ে যান। তিনচার দিন থেকে আমরা দাশুদার গ্রামেই শিল্ড রেখে দিয়ে আসি অন্যসব দলকে হারিয়ে। অবশ্য এই ব্যাপরে রেফারির অবদানও কম নয়। রেফারি স্বয়ং দাশুদার পাটের আড়তের ম্যানেজার শীতলবাবু। আমরা বিপক্ষের গোলে বল নিয়ে গেলেই তিনিই বাঁশী ফুঁকে বিপক্ষের বাধা দেবার জন্য পেনাল্টির বিধান দেন। গোলও অবধারিত। দাশুদা তখন ভুঁড়ি কাঁপিয়ে নৃত্য করে। আর আমাদেরও তোয়াজের মাত্রাটা বাড়ে।

অবশ্য দাশুদার কাজের ব্যবস্থাই আলাদা। গ্রামে যাবার তিন চার দিন আগে থেকেই আয়োজন শুরু হয়। একেবারে এলাহি ব্যাপার।

অতীতের দাশুদার গ্রাম কালীপুর ছিল অজ পাড়া গাঁ। তখন ছোট লাইনের ট্রেন গিয়ে কোন ছোট স্টেশনে নেমে সেখান থেকে ছোট খালে ডিঙিতে চেপে যেতে হোত তাদের গ্রামে। একেবারে অজ গ্রাম। রাস্তা নেই চারিদিক বন জঙ্গল। শেয়াল ডাকতো।

এখন সেই গ্রামের পাশ দিয়ে রাস্তা চলে গেছে। গাড়ি যাতায়াত করে। হাটবাজার হয়েছে। হয়েছে বিদ্যুতের আলো, মাঠ কলেজও। এখন কালীপুর বিরাট গঞ্জ। তবু দাশুদা বাড়ি যাবার ক'দিন আগে থেকে আমাদের নিয়ে ফর্দ করতে বসে। বিরাট আয়োজন। দু বস্তা চিনি, দু টিন সরষের তেল থেকে শুরু করে চায়ের সরঞ্জাম, খেলার মাঠে চোট লাগলে তার ওষুধপত্র, ব্যান্ডেজ সবই লিখতে হবে। বৌদি বলে,

— এখন কালীপুরে সবই মেলে। এতবড় গঞ্জ। সরষের তেলের টিন, চিনি, বস্তা। দাশুদা বলে— তুমি জানো না। ওখানে ফর্দ— এখনো আবার ফর্দ, কি দরকার? যদি কিছু না পাই, তাই এখান থেকে সব লিস্টি মিলিয়ে নিয়ে যাবো।

সরকার বলে— যখন বলছেন, তখন ওখানের গঞ্জেই সব কেনা ভালো। এতদূর বইতে হবে?

এবার দাশুদা খিঁচিয়ে ওঠে।

— থামো। না! আরে বাপু মেয়েদের কথায় চলো না সরকার। বারোহাত কাপড়েও যাদের কাছা দিতে জোটে না তাদের বুদ্ধিতে চললে বিপদেই পড়বে।

বৌদি চটে ওঠে এহেন কথায়। বলেন,

— যা খুশী করো। তবে ওখানে গিয়ে আমার পান আর তিনশো বাইশ জর্দা না পেলে আমিও অনর্থ বাধাবো কিন্তু। সব কিছু এখান থেকেই নিয়ে যাবে। মায়া পান— খয়ের অবধি।

কথাটা শুনিয়ে বৌদি চলে যায়। দাশুদা গজগজ করে— শুনলে কথা! কাজের সময় মাথাটা ডিসটার্ব করে দিয়ে গেল!

তারপর আবার লিস্টে মন দেবার জন্য বলে,

— হ্যাঁ সরকার, কতদূর এসেছিলে বলো।

সরকার একখানা সাড়ে তিনগজ কাগজে ফর্দ লিখে চলেছে।

সে বলে,

— আজ্ঞে, সেফটি পিন অবধি এসেছি।

দাশুদা আবার ফর্দে মন দেয়। বলে,

— সব কিছু নিখুঁত ভাবে গুছিয়ে নে যেতে হবে। একটার পর একটা।

যেন কিছু বাকী না থাকে।

যাবার দিন একটা ট্রাকে মালপত্র ওঠে। বস্তা টিন-কৌটো। দাশুদা নিজে লিস্ট ধরে সবকিছু চেক করে তারপর সরকারকে বলে—সব মিলিয়ে নাও।

আমাদের বলে— তোদের কিড ব্যাগ, স্যুটকেশের মাল সব চেক করে নিবি। যেন ওখানে গিয়ে না শুনি, এই যা! ফুটবলটাই ফেলে এসেছি, না হয় বুট আনি নি। খবরদার—

দাশুদার কাছে থেকে এসব শিক্ষাও আমরা পেয়ে গেছি। দাশুদার সঙ্গে বাজারে গেলেও দেখা যায় অনেক কাণ্ড। দাশুদা আজও তার বাজার করার অভ্যাসটা ছাড়তে পারেনি। গাড়ি নিয়ে বাজারে যাবে। সঙ্গে একজন কাজের লোকের হাতে থলে। আর দাশুদার হাতে বাজারের ফর্দ। বাজার সেরে গাড়িতে উঠতে যাবে, হঠাৎ আনাজের ব্যাগে হাত দিয়ে গর্জে ওঠে,

— এ্যাই ফটিক। কি বুদ্ধি তোর রে ইডিয়ট!

আজ্ঞে! ফটিক বলে সবই তো নিলাম।

— চোপ! সুক্তোর জন্য চাই কাচকলা-বড়ি-সজনে ডাঁটা।

এ গুলো কে কিনবে?

গাড়ি থেকে নেমে আবার বাজারের ও মাথায় গেল দশকর্মা ভাণ্ডারের পাশে মশলার দোকানে বড়ির সন্ধানে। সজনে ডাঁটার খোঁজে বাজার চষে ফেললো।

সেবার পটলের দোর্মা বানাতে হবে। বেশ মশলাদার দোর্মা। দাশুদা নিজে এসে বাজার করছে। বর্ষাকালে,বৃষ্টিও নেমেছে তেমনি। ওই বৃষ্টির মধ্যেই ফিরছে। হঠাৎ খেয়াল হয় মশলাপাতি সবই কেনা হয়ে গেছে দোর্মার। পটলই কেনেনি। লিস্টে ওই পটলের কথা লেখাও হয়নি।

একেবারে 'ডবল মিসটেক'। বাড়ির কাছে এসে গেছে। আবার গাড়ি ফেরাতে হলো পটল কেনার জন্য। তখন মুশুল ধারা বৃষ্টি নেমে গেছে। ড্রাইভার বলে।

—স্যার। হু হু করে জল জমেছে রাস্তায়। গাড়ি বন্ধ হয়ে যাবে।

— নো পটল চাই। চলো—

পটল অবশ্য কিনেছে দাশুদা বাজারে। কিন্তু গাড়ি তখন পটল তুলেছে। সারা পথে প্রায় কোমর ভোর জল। গাড়ি তখন রসোগোল্লার কড়াই-এ ভাসমান রসগোল্লার মত অবস্থায় পড়ে আছে। আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নেমেছে। কোনমতে ভাসমান গাড়িতেই পা তুলে বসে থাকে। জল কমতে লোকজন দিয়ে গাড়ি ঠেলে বাড়িতে আনে দাশুদা সমেত। তখন আড়াইটা বেজে গেছে।

পটল নাকি মহা অযাত্রা। তারপর বেশ কিছুদিন পটলের দোর্মার নাম শুনলে দাশুদা গর্জে উঠতো;
—থামবি৷ যত্তোসব অযাত্রার নাম। ওই নাম শুনে মাঠে গেছিলাম সেদিন। জেতা খেলাতে মোহনবাগান তিন গোল খেয়ে গেল।

দাশুদা তবু লিস্ট মিলিয়ে সব গোছগাছ করেই কাজ করে। সেবার দাশুদাকে বেশ জপালো আমাদের পাড়ার দত্ত মশায়। রেলে চাকরী করতো। এখন রিটায়ার করেছেন। তবে রেলের মালবাবু ছিল সে। তাই বেশ মালও কামিয়েছে চাকরীর সময়। তখন সরকারী চাকুরে। একেবারে বর্ণচোরা আম। থাকতো গো-বেচারার মত একটা ভাড়া বাড়িতে। ধুতি ময়লা পাঞ্জাবী, বগলে তালিমারা ছাতা নে অফিসে যেতো। একেবারে ছা-পোষা কেরাণী। দেখে মনে হতো খুবই দুঃখী। মাইনে সম্বল। কিন্তু রিটায়ার করার পরই নিরীহ মুরগী এবার নখ-দাঁতওয়ালা রাজপক্ষীতে পরিণত হলো। তখন বোঝা গেল দত্তবাবু ক্যায়সা চীজ। ওই মালবাবু থাকাকালীন মাল যা কামিয়েছে, তাতেই মালামাল হয়ে গেছে।

দাশুদার পাড়াতেই তিনতলা বিরাট বাড়ি হাঁকিয়েছে। নীচের তলায় কোন ব্যাঙ্ক ভাড়া দিয়েছে মাসে নগদ পনেরো হাজার টাকার বিনিময়ে। দোতলার তিনটে ফ্ল্যাটে তিনজনকে ভাড়া দিয়েছে। নিজে থাকে তিনতলার বাইশশো ফিট জায়গা নিয়ে। দাশুদার সঙ্গেও বেশ জমিয়ে নিয়েছে। সেই দত্তকবাবুই বলে দাশুদাকে।

—চলুন হরিদ্বার হৃষিকেশ-কেদার-বদ্রিনাথ ঘুরে আসি।

দাশুদার দৌড় বড়জোর দার্জিলিং। দু-একবার ওখানে গেছে অনেক তোড়জোড় করে। নাহলে ওর ঠেক ওই কালীপুরেই। তাই ওই দূর তীর্থের কথায় একটু ঘাবড়ে যায়।

— এতদূর ওই পাহাড় পর্বতে বরফের দেশে যাবেন?

দত্তমশাই রেলের চাকরীর দৌলতে রেলের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে দুর-দুরান্তে বিনা ভাড়াতে ঘুরেছে। এখনও নাকি রেলের পাশ পায়। দত্তমশাই বলে,

— আজকাল দুর তো কাছে এসে গেছে মশাই! রাজধানীতে যাবো, একেবারে পুরো এসি ট্রেন-এলাহি খাওয়া। দিল্লীতে নেমে টানা গাড়িতে হরিদ্বার। ওখানে থেকে টানা গাড়িতে চলে যাবেন বদ্রিনাথ-কেদারনাথ, নো প্রবলেম!

দত্তমশায় অবশ্য জানে দাশুবাবুকে ভর করতে পারলে হরিদ্বার থেকে সিধে গাড়িতে কেদার-বদ্রী ঘুরতে পারবে দাশুবাবুর খরচাতে। তাই ওকে জপাতেই হবে। দত্তমশাই বলে,

— আরে, আপনি-বৌদিতো ইয়ংম্যান। দেখবেন কোন কষ্টই হবে না গাড়িতে। আমি কয়েকবার গেছি। সব আমার চেনাজানা। পাহাড়-বরফ-পাইনবন, একেবারে সাক্ষাৎ মহাদেবকে দেখবেন।

— তাই নাকি! দাশুদাও যেন মহাদেবকে দর্শন করার কথাই ভাবছে। দত্তমশাই উৎসাহ ভরে বলে,

— নয়তো কি! ওতো সবই শিবক্ষেত্র। মহাদেব না টানলে কেউ ওখানে যেতে পারবে না মশায়। স্বয়ং মহাদেব আপনাকে টেনেছেন।

অতএব যেতেই হবে। দাশুদাও এবার রীতিমতো গ্যাস খেয়ে গেছে দত্তমশায়ের কথায়। বৌদিও প্রথম একটু ইতি উতি করেছিল। কিন্তু এতবড় তীর্থ করার লোভ আর সামলাতে পারে না। বৌদি ও বলে,

—তাই চলো গো। চেনাজানা লোক সঙ্গে থাকবে। কোন অসুবিধাই হবে না।

সারা পাড়াতে রটে গেল দাশুদা হিমালয় বিজয় করতে যাচ্ছে। অবশ্য কিছু দুষ্ট লোকের রটনা। দাশুবাবু বলে,— একটু তীর্থ ভ্রমণেই যাচ্ছি হে। যাই বাবা বদ্রীনাথ যখন টেনেছেন।

এইবার দাশুদা তার কাজ শুরু করেছে। আমাকে আর সরকারকে নিয়ে বসেছে। আমি এর মধ্যে হিমালয়ের দু'একটা পথে ট্রেকিং করে এসেছি। তাই দাশুদা মনে করে আমি হিমালয় ভ্রমণ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ। তাই আমাকে বলে,

— পাহাড়ে কি কি লাগবে বলে দে।

আমাদের ট্রেকিং রকক্লাইমবিং-এর জন্য অনেক কিছু সাজসরঞ্জাম লাগে। তাই বলি,

— তোমরা তো হরিদ্বার থেকে টানা গাড়িতে বদ্রিনাথ যাবে, ওখানে হাঁটার কোন ব্যাপার নেই। কেদার সীতাকুণ্ড থেকে তোমর ঘোড়া নেবে। সর্দি-গর্মি জামাকাপড় টুপি-বর্ষাতি জুতো -এসব শীতের পোষাক নেবে। আর কিছু জরুরি ওষুধপত্র, সঙ্গে ড্রাই ফুড -সন্দেশ-আর ছড়ি অবশ্যই।

এবার দাশুদা বলে— সরকার, হাঁ করে শুনছ কি? সব লিস্টে লিখে নাও এক এক করে। সব কিছু নিয়ে যেতে হবে। ওখানে কিছু পাবে না। দেখো, যেন কিছু ফেলে না যাই— সরকারও লিস্ট করতে থাকে। ছড়ির ব্যাপারে দাশুদা বলে, দুটো ছড়ি তো দুজনের। যদি একটা ভেঙে যায়? অতঃপর চারটে ছড়িও লিস্টে ঢুকলো। ওভারকোট-টুপি-বর্ষাতি ওষুধ তো হরেক রকম, খাবারও বাদ যায় না। দুজনের জন্য ফর্দটা গজ কয়েক লম্বা হয়ে গেছে। ফর্দই যখন দুগজী, মোট ঘাট কতটা হবে তা অনুমান করতে পারে।

যাত্রার দিন-ক্ষণ ঘনিয়ে আসছে, মালের ওজনও তত বাড়ছে। দুটো হোল্ডঅল্-দুটো স্যুটকেশ-জলের বড় ফ্লাস্ক, ছড়া-ছড়িগুলো অবশ্য হোল্ড অলে্ ঠাসা। দাশুদা কেবল লিস্ট জোড়া লাগাচ্ছে।

ওদিকে দত্তবাবু আর দত্ত গিন্নী প্রায় ঝাড়া হাত পা। একটা হোল্ডঅল্ আর একটা বড় স্যুটকেশ দুজনের।

সব মালপত্র গাড়িতে ফর্দমত মিলিয়ে তুলেছে দাশুদা। এখন গ্রীষ্মকাল। তাই গরমজামা-কাপড় সব স্যুটকেশে। এতেই ঘামছে দাশুদা। রাজধানী এক্সপ্রেসে এখান থেকে যাত্রা করবে দিল্লীতে। ওখানে একদিন থেকে গাড়ি নিয়ে যাবে হরিদ্বার। তারপর হৃষিকেশ থেকে টানা গাড়িতে কেদার-বদ্রি ঘুরবে। ওদিকের এজেন্ট গাড়ি ঠিক করে রাখবে।

বিকালে ট্রেন। ওদিকে দুপুর থেকেই একটা গাড়িতে মালপত্র সব আবার লিস্টমিলিয়ে চেক করে

নেয় দাশুদা। পথে জ্যাম হতে পারে বড়বাজারে। তাই আগেই যেতে হবে। দত্তমশায়রাও এসে গেছে। দাশুদার আবার লিস্ট চেক করে কাগজটা ভাঁজ করে পকেটে রাখে। ঘড়ির দিকে দেখে তাড়া দিতে থাকে।

—কুইক, জলদী। পথে কোথায় জ্যাম হবে কে জানে! বড়বাজার হয়ে যেতে হবে। বের হয়ে পড়ো টাইম থাকতে। দত্তমশায়ও সায় দেয়— তাই ভালো। আর দেরী করা ঠিক হবে না। দাশুদা লিস্টে শেষ বারের মতো চোখ বুলিয়ে বলে,

—ভজা, গাড়ি স্টার্ট কর। দুগগা-দুগ্গা।

যা ভয় করা হয়েছে তাই হলো। বড়বাজারে কোথায় ট্রাম বিকল হয়ে পড়েছে। ফলে বিরাট জ্যাম। ওদিকে ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে চলেছে। গাড়িও চলে না। এক পা এক পা করে নড়ছে। দাশুদা ছটফট করে। বলে,

—ফিরে এসে নর্থ ক্যালকাট ছেড়ে বালীগঞ্জেই থাকবো। এখানে মানুষ থাকে! ভজা-চালা গাড়ি।

ড্রাইভার ভজা কোনমতে এদিক— ওদিক করে কোনমতে হাওড়ার ব্রীজে এসে ওঠে। সামনেই স্টেশন। ঘড়িতে তখন চারটে বেজে পাঁচ। কোনমতে ওইটুকু পথ এসে মালমত্র নিয়ে প্লাটফর্মে যেতেই আরও দশ মিনিট লেগে যায়। তখন গাড়ি ছাড়তে আর মিনিট সাতেক বাকী। দত্তমশায়-দত্তগিন্নী অবশ্য নিজেদের মালপত্র নিয়ে গাড়িতে উঠে পড়েছে। তখনও লিস্ট মিলাচ্ছে দাশুদা। হঠাৎ পিছনের দিকে চেয়ে বলে।

— তোর বউদি কইরে?

এবার আমাদেরও খেয়াল হয়। দাশুদা কে লিস্টমত সব মালই মিলিয়ে দিয়েছি এতক্ষণ। বৌদির নাম লিস্টে নেই। তাই খেয়ালই করেনি ফলে সব মালপত্র তুলেই গাড়ি ছেড়ে দিয়েছি। বৌদিকে বাড়ি থেকে ডেকে আনার কথা মনেই হয়নি। এবার আমরাও চমকে উঠি।

— তাই তো! বৌদিকে তো তোলাই হয়নি। বাড়িতেই ফেলে এসেছি।

দত্তমশায় তাড়া দেয়— উনি না আসুন, আপনিই উঠে পড়ুন। দাশুদা কোন কিছু ফেলে যেতে রাজী নয়। রাজধানী এক্সপ্রেস অবশ্য যথা সময়েই সিটি বাজিয়ে হাওড়া স্টেশন থেকে যাত্রা করে গেল দত্তবাবুদের নিয়ে।

শূন্য প্লাটফর্মে এতসব মালপত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দাশুদা। বলে,

— বাবা মহাদেব ঠিকমত টানেননি রে, তাই যাওয়া হল না। লিস্টে সবই লিখলাম, তোর বৌদির নামটাই লেখা হয়নি। মিসটেক হয়ে গেছে।

আশ্বাস

ট্রেন থেকে নেমে সুধীর জায়গাটাকে এক নজরে দেখার চেষ্টা করে। চারিদিকে আমগাছের জটলা। তবে দুচারটে কাঁঠাল, জামমাদার আশশেওড়ার জঙ্গল মাঝে চোখে পড়ে বড় উঁচু বাঁধের উপর বিশাল কয়েকটা শিরীষ গাছও। ওরা যেন প্রহরীর মত বাঁধটাকে আগলে রেখেছে। স্টেশনের বাইরে একটা ইট ঘেরা ঢালু রাস্তা নদীর ধার দিয়ে অদূরে গঞ্জের দিকে এগিয়ে গেছে।

রাস্তার ওপরেই ভৈরবী নদীর ঘাট। নদীর খাত বেশ গভীর। তবে এখন শীতকাল, তাই নদীর জল তলানিতে ঠেকেছে। তবে নদীর খাদ দেখে মনে হয় বর্ষায় ওর রূপই বদলে যায়।

সুধীর সকালের ট্রেনে এসে নেমেছে রামপুর স্টেশনে। এইখানেই সে নতুন পোষ্টমাস্টার হয়ে বদলি হয়ে এসেছে,নিদেন চারপাঁচবছর কাটাতে হবে এখানে। তাই জায়গাটাকে একটু চেনার চেষ্টাই করছে।

—নমস্কার বাবু! চাইল সুধীর।

এই ট্রেনে কলকাতা থেকে ডাক আসে। ডাকের ব্যাগগুলো ট্রেনের ডাক কাসরী থেকে নামিয়ে এনেছে লোকটি। বেশ ভারী চেহারার নিরীহ গোছের মাঝবয়সী লোক। মুখে পুরোনো একগোছা গোঁফ। গায়ে ডাক বিভাগের খাঁকি জামা ধুতির উপর জামাটা আর কোমরে একটা বেল্ট। তাতে ডাক বিভাগেব একটা চাপকান।

সে বলে,— আমি ভুবনবাবু এখানের মেলগার্ড। শুনলাম আপনিও এই ট্রেনে আসছেন। আপনিই তাহলে নতুন মাস্টারবাবু। ছোট স্টেশন, স্থানীয় লোকজনই বেশি। আর আছে কিছু আনাজপত্রের ব্যাপারী। সকলেই এখানে প্রায় সকলকে চেনে। তাই নতুন মুখ সহজেই চোখে পড়ে। সুধীরের একটা পা হাঁটু থেকে নেই। ক্রটি নিয়েই চলাফেরা করে সে। ভুবনই এর মধ্যে ওর ব্যাগ সুটকেশ তুলে নিয়ে ওদিকে রাখা একটা ভ্যান রিক্সায় মেল ব্যাগের সঙ্গে তুলেছে। আর একটা রিক্সাও ধরেছে সুধীরের জন্য। ভুবন রিক্সাওয়ালা-কে বলে,

—বাবুকে ঠিকমত পোষ্টাপিসে নিয়ে যা। আমি আসছি।

নদীটা এখন গঞ্জের ঘর বাড়ির নিচু দিয়ে হাঁসুলির মত একটা বাঁক নিয়ে বয়ে গেছে। দু-চারটে নৌকাও রয়েছে। গঞ্জের এদিকে পোষ্ট অফিসের বাড়িটা। সুধীরের জন্য আগেকার পোষ্টমাস্টার অপেক্ষা করছে। আজই তাকে টাকা বুঝিয়ে দিয়ে তাকে সদরে গিয়ে রিপোর্ট করতে হবে।

সুধীরকে চার্জ বুঝিয়ে দিয়েছেন। সেই মাস্টারবাবু তখন গলা তুলে ডাকছেন,— মেইল! মেইল! কোন সাড়া শব্দ নেই। মাস্টারমশাই আর একপর্দা গলা তুলে হাঁকেন,— এই ব্যাগ মেইল! দেখা যায় ওদিকের দরজার সামনে এক মূর্তিকে। লম্বা চেহারা শীর্ণ মুখে ডাগর দুটো চোখে নির্বিকার চাহনি। এগিয়ে এসে বলে,

—বাবু ডাকতিছেন!

আগেকার মাষ্টারবাবু বলে,

—না, ভগবানকে ডাকছি— তোকে ডাকার দিন শেষ হয়েছে। বেচেঁছি— হাঁ করে দেখছিস কি? যা দৌড়ে দুকাপ চা নিয়ে আয়।

পথের ওদিকে চায়ের দোকানে এখন চা তৈরী শুরু হয়েছে। বাইরে এর মধ্যে বেশ কিছু আনাজ মহাজনদের ভিড় শুরু হয়েছে। ডাকও এসে গেছে এর মধ্যে। আগেকার মাষ্টারবাবুই এবেলাতেও কাজে হাত লাগিয়েছেন। বলেন,

—কলকাতায় এখান থেকে প্রচুর আনাজপত্র চালান যায়। ওদের টাকাও আসে ইনসিওর করে। কখনও রেজিস্ট্রি ডাকে হাজার হাজার টাকার ড্রাফট্ আসে। তাই সকলেই ওই সময় এসে হাজির হয়। টাকা নিয়ে মাল ন্যাস্ত করে বিকেলের ট্রেনেই সব চালান দেয়।

ওদিকের টিকরী এক্ট দেখবে ভায়া ওইটাই এখানের বড় কাজ।

এর মধ্যে চাও এনেছে মেইল।

—বিস্কুট আনিসনি?

মেইল আবার একগাল হেসে বলে,— ওটাতো বলেন নি। ঠিক আছে— বের হয়ে যায় সে। মাস্টারবাবু বলেন,

—ব্যাটা ভীষণ সৎ। তবে কি জানেন একেবারে হাঁদা ভোঁদা। লোকও নেই, ওকে দিয়েই তোমাকে চালিয়ে নিতে হবে ভায়া। ফ্যামিলি তো আনোনি।

—ফ্যামিলি! সুধীরের কণ্ঠে যেন কি বেদনার সুর ফুটে ওঠে। তাই বলে, না ওসব আমার নেই।

— ভায়া তাহলে স্রেফ আপনি আর কাঁপনি? আরে সরকারী চাকরী করো, বিয়ের বয়সও পার হয়নি। সুপাত্রই — বলো তো ঘটকালি করি।

মাস্টারবাবু হেসে ওঠে। সুধীর ওর হাসিটাকে আমল না দিয়ে অফিসের কাগজপত্র দেখতে থাকে। ও বেলাতেই মাষ্টারবাবু চলে যাবেন। তার আগেই সুধীর সবকিছু বুঝে নিতে চায়।

পোষ্টাপিসটা রাস্তার ওপরেই একটা বড় হলঘরে। ভিতরের দিকেও একটা ঘরে ডেলিভারি বিভাগের কাজকর্ম হয়। সকালের দিকেই ডাক আসে। এখানের অফিসের কাজ ছাড়া কিছু ব্রাঞ্চ অফিসের ডাকও যায় আসে। ওগুলো সকালে এগারোটার মধ্যেই সব চুকে যায়। আর বিকেলে ঘণ্টাখানেকের কাজ। মেলব্যাগ তৈরী করে স্টেশনে পাঠিয়ে ছুটি।

কোয়াটারটা পিছনের দিকে। জায়গার অভাব এখানে নেই তাই বেশ বড় উঠান। ওদিকে একটা ইদারা, বাথরুম— পাঁচিলের বাইরে কিছু ঝোপ জঙ্গল ভরা মাঠ, তারপরই নদী। মাষ্টারবাবু ওখানটায় কিছু কলাগাছ, পেঁপেগাছ, কুমড়ো গাছ লাগিয়েছিল। তার ফলও কিছু হয়।

মেইলও রয়ে গেছে তার কাছে। ছেলেটার কোন দাবীই নেই ওদিকে বাজারের কাছে একটা ঝুপড়িতে ওর বাবা সৎমাকে নিয়ে থাকে, তার সৎমা তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়েছে। আর ভাসমান খুড়কুটোর মত ভাসতে ভাসতে মেইল এসে ঠেকেছে এই ঘাটে।

কোয়াটারের ছাদ থেকে নদীর ওপারের চরভূমি— দূরের দু'একটা গ্রাম রাতের দিকে নজরে যায়। পাটক্ষেতে এসেছে সবুজের দাক্ষিণ্য। সুধীর এখানে একাই থাকে। মেইল অবশ্য তার রান্নাবান্না করে। চা বানায়, রাতের খাবারও করে। তবে ওর রান্না মুখে তোলা ভার। এতদিন চেষ্টা করেও ভাত ঠিকমত বানাতে পারে না। তরকারী কখনও আধসেদ্ধ থেকে যায়। কোনদিন নুন ঠিক হলো না, ঝালের জন্য বাতিল করতে হয়। আর থাকলে ও শুধু নীরবে হাসে। তাকে কেউ বহালও করেনি। তাই বরখাস্ত করার প্রশ্নও ওঠে না। তবু সুধীর ওকে খাওয়া দাওয়া ছাড়া মাসে একশো টাকা করে মাইনে দেয়। তবে মেইল সেটা হাতে নেয় না। সুধীর ওর নামে একটা পাশবই করে তাতে মাসে মাসে টাকাটা জমা করে। আরও বিচিত্র কথা। মেইল সেই পাশবইও নিজের কাছে রাখে না, বলে— ওটা আপনিই রেখে দেন বাবু। ও যেন সুধীরের মতই চাল চুলোহীন। হতচ্ছাড়া...

অবশ্য সুধীর এমন ছিল না, বীরভূমের এক গ্রামে ওর ঘরবাড়ি বাবা-মা সবই ছিল। ভালোভাবে স্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে কলেজে ঢুকেছিল। তার স্বপ্ন ছিল সে কলেজের অধ্যাপক হবে। নিজে আরও পড়াশোনা করবে। পি-এইচ -ডি করবে।

হঠাৎই মা মারা গেলেন। সুধীরের জীবনে ওর মা-ই ছিল সব। বাবা আড়তদার। ধানচালের ব্যবসা নিয়েই থাকতেন। আর ছিলেন কঠিন প্রকৃতির মানুষ। বাবা তার তেজারতি মহাজনী, সুদের হিসাব নিয়েই থাকতেন। সে চেনে টাকা। তাই সুধীরের দিকে নজর দেওয়ার মত সময় তার ছিল না। সুধীর মায়ের মৃত্যুর পর কেমন যেন নিঃসঙ্গ হয়ে যায়। কলেজ থেকে সাইকেলে বাড়ি ফিরছিল। হঠাৎ

কেমন অন্যমনস্ক হয়ে যায় আর হাইওয়েতে সেই মুহূর্তে একটা লরীও তেড়ে আসে। তাকে ধাক্কা দিয়ে ছিটকে ফেলে উধাও হয়। লোকজন তাকে হাসপাতালে নিয়ে যায়। সুধীরের তখন জ্ঞান নেই। জ্ঞান হলো যখন তখন দেখে তার একটা পা হাঁটু থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া তাকে বাঁচাবার অন্য কোন পথই ছিল না।

বি.এ. পরীক্ষার পর দুর্ঘটনা ঘটেছিল। বি-এতে অনার্স নিয়েই পাশ করে। এর মধ্যে সুধীর আবার উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা শুরু করে। তার চলাফেলাটা রপ্ত করে। কিন্তু এর মধ্যে সংসার চালাবার জন্যই তার পিতৃদেব আবার এক গরীব ব্রাহ্মণকে কন্যাদায় থেকে উদ্ধার করার জন্যই তার এক মুখরা কন্যাকে ঘরে আনে। সুধীর তখন সবে চলাফেরা শুরু করে, এমনি দিনে ওই ভদ্রমহিলা তার নতুন মা প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন,

—ওই খোঁড়া ছেলের পিছনে কাড়ি কাড়ি টাকা তো খরচ করেছ। টাকা এত সস্তা নয়' লেখাপড়াও শিখিয়েছ, এবার আমার ভবিষ্যতের কথা ভাবো। ওকে নিজের পথ দেখতে বলো।

সেদিন সুধীরের চোখে জল এসে গেছিল। তার মায়ের কথাই মনে পড়ে। মা থাকলে এসব কথা শুনতে হতো না। পা হারিয়ে সে মুষড়ে পড়েছিল। আর ওই কথা শুনে সুধীরও যেন একবার নিজের পথ খোঁজার লড়াই শুরু করে।

সুধীর নতুন উদ্যামে নিজের পথ খোঁজার জন্য অনেক চাকরীর পরীক্ষাই দিতে শুরু করে। পড়াশুনাতে সে ভালোই। তাই শেষ অবধি ডাকবিভাগে এই চাকরিটা পেয়ে যায়। হাঁটা চলার অসুবিধা হয়। তবু অফিসে বসেই এই চাকরিটা করা যাবে। তাই সুধীর শেষ অবধি এই চাকরীই নেয়।

আর দেখে সুধীর তার সরকারী চাকরী পাবার পর সেই সৎমাও কেমন বদলে যায়। এতদিন সুধীর ছিল তাদের সংসারের একটা বোঝা মাত্র, পঙ্গু, অসহায় একটি জীব। এখন সরকারী চাকরী পেতে সেই মহিলাও কেমন স্নেহময়ী হয়ে ওঠে। সুধীরের পিতৃদেব সেই সুদখোর মহাজন এবার রোজগেরে ছেলের প্রতি বেশী কর্তব্য করেন, তাই এবার সুধীরকে বিয়ে থা দিয়ে সংসারী করাতে চায়। সুধীর তখন কাছাকাছি একটা সাইটে চাকরী করছে। সেখানেই থাকে। সুধীরও ততদিনে চিনেছে তার বাবা সৎমাকে। তার মনে হয় এসবের বাস্তবে কোন দাম নেই। সে তাই ওদের সংসার থেকে, বন্ধন থেকে দূরেই থাকতে চায়।

কিন্তু সুধীরের বাবা মা এর মধ্যে সুধীরের পাত্রীর সন্ধানও করেছিল। সুধীরের বাবার অবস্থা ভালো। তাছাড়া ছেলেও সরকারী চাকুরে, হোক না একটু খোঁড়া। বিয়ের বাজারে সুধীরের ভালোই দাম পাবে সুধীরের বাবা। তারজন্যই ওরা বেশী আগ্রহী। কিন্তু সুধীর এ বিয়েতে রাজী নয়। সে জানে হয়তো কোন মেয়ে তার পঙ্গুতার জন্য তাকে মেনে নিতে পারবে না। সুধীর তাই বিয়ে করতে রাজী নয়। তবুও বাবার চাপে শেষ অবধি বিয়ে করতে রাজী হয়।

দেবিকার বাবার অবস্থাও মন্দ নয়। দেবিকা বাবার একমাত্র মেয়ে। তাই তার মনে একটা চাপা অহঙ্কারও আছে। আর তাছাড়া সে সুন্দরী, তার মনেও আশা ছিল তার স্বামী হবে সুস্থ সমর্থ কোন তরুণ। কিন্তু তাকেও বাবার চাপে বিয়ে করতে হয়েছিল। দেবিকা তাই সুধীরকে প্রথম দেখাতেই চমকে উঠেছিল। সে সুধীরকে ঠিকমত মেনে নিতে পারেনি।

সুধীরও এটাকে খুব একটা অসঙ্গত ভাবেনি। তবু সে দেবিকাকে সবদিক থেকে সুখী করার চেষ্টাই করেছিল। সুধীর ওকে শহরের বাসায় এনে ঘর বেঁধেছিল। সুধীরের তার সব শূন্যতা পূর্ণতাকে পূর্ণ করতে চেয়েছিল দেবিকাকে নিয়ে।

কিন্তু দেবিকা সুধীরের সেই ভালোবাসার কোন মর্যাদা দেয়নি। দেবিকা শহরে এসে এবার পড়াশুনা শুরু করে কলেজে। সুধীরও তাতে উৎসাহ দিয়েছিল। সুধীর বলে,

—আমি নিজে বেশীদূর পড়তে পারিনি। দেবিকা তুমি গ্রাজুয়েশন করে এম.এ করবে। ডক্টরেট করবে।

দেবিকা জবাব দেয়নি। ও ওই বিকৃত মানুষটাকে কেমন যেন সহ্য করতে পারে না। ওর চলাফেরায়

ওঠে ক্রাচের কঠিন শব্দ। দেবিকার কানে বাজে ওই শব্দটা। দেবিকাও মুক্তি চায় এই বন্ধন থেকে তাই সে নিজের জন্য পড়ছে।

কয়েকটা বছর কেটে গেছে। দেবিকাও বি. এ. পাশ করে টিচার্স ট্রেনিং পড়ায় সুযোগ পেয়ে চলে যায় বাইরে। সুধীর তাকে ট্রেনে তুলে দিয়ে আসে। তখনও ভাবেনি সুধীর, দেবিকা তার জীবন থেকে সরে যাবার জন্যই এই প্রস্তুতি নিয়েছে। বাইরে যাবার পর দেবিকার চিঠিপত্রও কমে আসতে লাগল। সুধীর তবু চিঠি দেয় কিন্তু তার উত্তর বড় একটা আসেনা। পরে একটা চিঠিতে দেবিকাই জানিয়ে দেয় সে দূরের কোন স্কুলে চাকরি নিয়ে চলে যাচ্ছে। সুধীর যেন তার পথ চেয়ে না থাকে। অতীতের সব কথা ভুলে গিয়ে দেবিকা নিজের জীবন নিজেই গড়ে নেবে। সুধীরের জীবনে এমনি করে সব হারিয়ে গেছে।

তার মা হারিয়ে গেছে— হারিয়ে গেছে তার একটা অঙ্গ। তবু নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখেছিল দেবিকাকে নিয়ে। কিন্তু দেবিকাও চলে গেল তার জীবন থেকে। বাবাও মারা গেছেন, এখন সৎমাই সর্বেসর্বা। তার ছেলেই ব্যবসা পত্রের মালিক। সেখানে সুধীরের কোন ঠাঁই নেই। এখন সুধীর নিঃসঙ্গ, একা। তার শূন্য জীবনে আর কেউ নাই। তাই কাজ নিয়েই ভুলে থাকার চেষ্টা করে। সকাল বিকেল কেটে যায় অফিসের কাজ নিয়ে। বিকেল নামে আমবাগানে নদীর চরে। তখন সন্ধ্যার পর স্টেশনে আসে মাঝে মাঝে। সন্ধ্যার সময় কলকাতা যাবার গাড়ি একটা আসে। অনেক অচেনা মুখের ভিড়, কলরব ওঠে। ট্রেন চলে যাবার পর নামে শূন্যতা আর রাতের অন্ধকার। শূন্য প্ল্যাটফর্মে দু'একটা টিমটিমে আলো জ্বলে। ফিরে আসে সুধীর।

মেইল-ই তার সঙ্গী। অবশ্য মেইলের নিজের একটা জগৎ আছে মেইলের সঙ্গে তার নিঃস্ব জীবনের যেন একটা মিল খুঁজে পেয়েছে। কিন্তু মেইল এই বঞ্চনাকে সহজভাবেই মেনে নিয়েছে। তাই সে হেসেই সবকিছু এড়িয়ে যেতে পারে। আর খুশীতে গানও গায়।

সেদিন সুধীর বাসায় ফিরছে। ভিতরে কার হাসি আর টুকরো গানের সুর। একটা মেয়ের গলা ভেসে আসে। সুধীর একটু অবাকই হয়। মেইল মেয়েটার কথা শুনে হাসছে। সুধীরকে দেখে মেয়েটা বের হয়ে গেল। ও কালুরাম গোয়ালার মেয়ে। এখানে দুধ দিতে আসে। ওই চঞ্চলা মেয়েটাকে এর আগেও দেখেছে সুধীর। লাইনের ধারে কালুরামের দরমা— বাঁশের বাড়ি। আর তার লাগায়ো একটা চালায় কয়েকটা গরু বাছুরও আছে। মেয়েটাকে দেখেছে ওখানে। গুরুগুলোকে খাবার দিচ্ছে। আবার খদ্দেরদের সঙ্গে দুধের দামের হিসাবও করে। কালুরাম হিসাব কিতাব বোঝে না। চঞ্চলাই ওসব হিসাব করে টাকা নেয়।

সুধীরও ওর খরিদ্দার। কালুরাম বলে,

— আমি ওসব হিসাব কিতাব বুঝিনা না বাবু। চঞ্চলাই উৎসব করে। ওকেই টাকা দিবেন।

চঞ্চলাও দুধ দিতে আসে— কিন্তু মেইলের সঙ্গে তার সম্পর্কটা যেন সুধীরের কাছে কেমন ঠেকে।

দোলের দিন এখানে বেশ ধুমধাম করে দোল হয়। কালুরামের খাটালেও হোলির আসর বসে। সেদিন মেইলের আর দেখা মেলে না। অফিসও বন্ধ। মেইল আগে থেকেই এদিন ছুটি নিয়েছে। সুধীরই একেবলা সেদ্ধ ভাত করে নেয়। তখন চারিদিকে হোলির হৈ চৈ চলেছে।

বিকেলে বের হয়েছে সুধীর। দোকান পাট বন্ধ, পথে রঙ আবীর। ওদিকে লাইনের ধারে কালুরামের খাটালে তখনও ঢোলক বাজছে, নাচগান চলছে। সুধীর দেখে মেইল এখানেই রয়েছে। চঞ্চলাকে চেনা যায় না। রঙ মেখে তখনও নাচগান হচ্ছে আর মেইলের সারা মুখ গা রং আবীরে ভর্তি সবকিছু যেন ওদের আজ খুশীতে রঙীন হয়ে উঠেছে। ওই নিঃস্ব মেইলের মুখে কি যেন পরম তৃপ্তির আভাস। সুধীর সরে আসে। মেইল আজ রাতেও উৎসবে মেতে থাকবে। খাওয়া দাওয়া হবে ওখানে। শূন্য কোয়ার্টারে একাই রয়েছে সুধীর। রাত নামে, চারিদিকে ঢোলকের শব্দ, উদ্দাম হাসি আর গানের সুর। চারিদিকে আনন্দমেলার আয়োজন। ওই আনন্দের যজ্ঞেও সুধীরের কোন আমন্ত্রণ নেই। সে বার বার অনুভব করে সে নিঃস্ব একা। মাও তাকে একলা ফেলে চলে গেছে। হারিয়ে গেছে দেবিকাও।

মেইল এর পাশেও আজ রয়েছে সেই দুরন্ত মেয়েটা— ওদেরও খুশীর জগৎ আছে। সুধীরের জগত শূন্য রয়ে গেছে।

পরদিন আসে মেইল। সকালে এসে সেই সকর্ণ বিস্তারিত হাসি হাসে। মুখে কপালে কখনও রঙের ছাপ, সুধীর বলে,

—কি রে কালতো খুব হোলির নাচগান হলো?

হাসে মেইল। নিজের কাজে মন দেয়। ছেলেটা এমনিতে বেশ কর্মঠ। সৎ।

এই অফিস থেকে দুতিনটে ব্রাঞ্চ অফিসে ডাক আনা নেওয়ার জন্য একজন মেল রানার নামাতে হবে। এখন চাকরিটা সাময়িক। তবে সুধীর জানে এই পদটা পাকা হবে পরে। আর এই খবরটা বের হতে এর মধ্যে সুধীরের কাছে বেশ কয়েকজন এসে হাজির হয়। ওদিকের পানের দোকানের মালিক মনোরম মাহতো তার ভাইপোর জন্য ওই চাকরী করে দিলে মাষ্টারবাবুকে নগদ পাঁচহাজার টাকাও দেবে বলেছে। সুধীর সেদিন বলে,

— মেইল তুই একটা দরখাস্ত দে। মেলবাহকের জন্য।

মেইল সেই হাসি হেসে বলে,

— কি হবে বাবু দরখাস্ত দিয়ে? ওসব নোকরী আমাকে কে দেবে? এই বেশ আছি। তবু সুধীরই ওর দরখাস্ত লিখে দিয়ে বলে,

—সই কর। চিরকাল এমনিই থাকবি? ঘরসংসার করবিনা?

মেইল ক্লাশ এইট অবধি পড়েছে। তাই ইংরাজীতেই সই করে বলে,

—ওসব আমাদের জন্য নয় বাবুজী।

ও যেন নিদারুণ পরাজয়টা সহজভাবে মেনে নিতে চেষ্টা করে। সুধীর বলে,

— কেন রে? চাকরি করবি, ঘর পাতবি এসব কি চাসনা।

মেইল বলে,— চাইলেই কি সব মেলে বাবুজী? মেলে না। তাই অনেক চেয়ে দুঃখ বাড়িয়ে লাভ কি? যেটুকু পাই তাই নিয়েই আমি খুশী থাকতে চাই।

মেইল চলে যায়, কুয়োতলায় জামা কাপড়গুলো কাচতে থাকে। সুধীরের মনে হয় মেইলের মত বোকা নিরীহ মানুষটার জীবনেও যেন ব্যাথা যন্ত্রণার অনুভূতি আছে। যেটাকে সে গোপনই করতে চায়।

এর কয়েকদিন পরই ওই খাটালের মালিক চপলার বাবা অফিসে আসে। তখন বেলা হয়ে গেছে। সুধীর অফিস বন্ধ করে এসে কালুরাম বলে,— একটা পাশবই দেখিয়ে,

—এসব কি আছে দ্যাখেন বাবুজী।

সুধীর পাশবই দেখে বলে,

—পনেরো হাজার টাকার মত আছে। তা টাকা তুলবে নাকি? না জমা দেবে।

কালুরাম বলে,— না বাবু। মেয়েটার সাদী দিব ভাবছি।

—চপলার বিয়ে দেবে?

সুধীরের মনে পড়ে চঞ্চলাকে। চঞ্চল মেয়েটা দেখতে শুনতেও ভালোই, চটপটে। সেই বাবার দুধের ব্যবসা— খাটালের হিসাব রাখে। ওকে দেখেছে সুধীর মেইলের সঙ্গে এখানে ওখানে। সেদিন দেখেছিল আমবাগানে। এখন আমের মঞ্জুরী এসেছে। বাতাসে আমের বোলের সৌরভে আকুল মৌমাছিদের আনাগোনা। চঞ্চলা আর মেইল বাগানে। চঞ্চলার চোখে জল! সেও যেন মেইলকে কি জানাতে চায়।

সেই কথা শোনে না সুধীর। তবে তার বুঝতে দেরী হয়নি চপলার মন। মেইল যেন সেই ডাকে সাড়া দিতে গিয়েও পারে না। আর তো জীবনে কিছু পাবার অধিকারও নেই।

আজ কালুরামকে মেয়ের বিয়ের জন্য টাকা তোলার ব্যাপারে আকার্ত সুধীর বলে,

— ছেলে কোথাকার?

কালুরাম বলে,

—লালগোলায় স্টেশনের বাইরে ওর পার্টসের দোকান আছে! ছেলেকে বিশ হাজার ক্যাশ দিতে হবে।

দোকান বড় করবে। একটা মেয়ে। তাই ভাবলাম বাকী টাকা উই খাটাল বিক্রী করে তুলবো।

— সেকি! তোমার কি হবে? ওই খাটাল থেকেই তো চলে তোমার। সুধীরের কথায় কালুরাম বলে,

— কি করবে বাবুজী, মেয়ের সাদী তো দিতে হবে? নিজের কথা ভেবে কি হবে? আমার একটা পেট— যো সো করে চলে যাবে।

সুধীর বলে,— কেন মেইল তো ভালো ছেলে। চপলাও চেনে ওকে। ওর সঙ্গে বিয়ে হলে চপলাও খুশী হবে। তোমার খাটালও থাকবে। ভালোই হবে।

—ক্যা বাবুজী। মেইল তো নাকার আছে। চপলাও বলেছিল। আমি না করে দিয়েছি।

কালুরাম সাফ জবাব দিয়ে ওই প্রসঙ্গ এড়াবার জন্য বলে,— সামনের হপ্তা পাকা কথা দিতে হবে। আমি খাটাল বিক্রীর বাতও বলেছি। পরে আসবো।

কালুরাম চলে যায়। সুধীর কি ভাবছে— তার জীবন থেকে দেবিকাও চলে গেছে। আজ হয়তো সে অন্য কোথাও বিয়ে থা করে ঘর বেধেছে। চাকরীও করছে। একা পড়ে আছে সুধীর। চঞ্চলাও চলে যাবে তার নতুন স্বামীর ঘরে।

মেইল হালভাঙা পালছেঁড়া নৌকার মতই দিশাহীন অকূলে ভেসে বেড়াবে। তারই মত। সুধীর নিজের জীবনকে সুন্দর করে গড়ে তুলতে পারেনি। সেখানে রয়েছে অন্তহীন শূন্যতা। এবার একজনের জীবনে সে পূর্ণতা এনে দেবে। এই চঞ্চল মুখরা মেয়েটা, মেইলকে সুখী করবেই।

নিজেই এবার শহরে যোগাযোগ করে ইন্সপেকটারের সঙ্গে। তার সুপারিশেই মেইলের মেলগার্ডের চাকরিটাও হয়ে যায়। সেদিন বেশ শীত পড়েছে। সকালে মেইল বালতি নিয়ে গেছে নদীতে জল আনতে। কুয়োর জলে ডাল সেদ্ধ হয় না। সকালের ডাকে মেইল-এর নিয়োগ পত্রটা এসেছে। সুধীর ভিতরে এসে মেইলকে খুঁজছে। দেখে মেইল শীতের সকালেই জামা, সোয়েটার পরেই নদী থেকে কাঁপতে কাঁপতে একেবারে পাখী ডোবার মত ডুবে কাঁপতে কাঁপতে আসেছে বালতিতে জল নিয়ে।

— কিরে? সুধীর অবাক হয়,

মেইল বলে,— নদীতে জল আনতে গিয়ে পিছলে হাঁটু জলে পড়ে গেলাম। তখন ভাবলাম, আধা যখন ভিজেছি, পুরো ভিজেই শুদ্ধ হয়েনি।

সুধীর হাসে,— বুদ্ধু কোথাকার। কাল থেকে তুই মেল রানার। এই তোর চাকরির চিঠি এসেছে।

—বাবুজী! কি বললেন? আমি পাব সরকারী নোকরী। ওই অবস্থাতে টিপ করে প্রণাম করে সে ছুটলো বাইরের দিকে।

সুধীর ডাকে কিন্তু তখন মেইলের সাড়া দেওয়ার সময় নেই। বিশেষ কাউকে যেন সুখবরটা দিতে চলেছে ওই অবস্থাতেই। আজ তার জীবনের চরম মুহূর্তের আনন্দ যেন তার সঙ্গে ভাগাভাগি করে নিতে চায় সুধীর।

এরপর আর কালুরামের অমত হয়নি বিয়েতে। চপলা এখন মেইলের স্ত্রী। ওই খাটালেই মেইল চপলার নতুন সংসার গড়ে উঠেছে। সকালে মেইল খাকী জামা, কোমরে বেল্ট পরে মেল ব্যাগ নিয়ে নিয়ে ছোটে। দুতিনটে ব্রাঞ্চ অফিসের দিকে। চপলা দেখে সেই নতুন মানুষটাকে। মেইলও আজ বদলে গেছে। জীবনে অনেক কিছুই পেয়েছে সে।

সুধীরের বদলির চাকরি। ক-টা বছর কোনরকমে কেটে গেছে এখানে। এবার চলে যাচ্ছে সে। ক্রাচ নিয়ে এসেছে প্ল্যাটফর্মে সঙ্গে মেইল, চঞ্চলাও। সুধীর বলে,

—চলি রে! ভালো থাকিস,

মেইল—চপলা প্রণাম করে। ট্রেন ছেড়ে দেয়—চলে যাচ্ছে সুধীর এখান থেকে। আর হয়তো কোনদিনই দেখা হবে না মেইল ও চপলার সঙ্গে ওরা হাতনাড়াতে থাকে। বাঁকের মুখে শেষ বার দেখা যায় তাদের। তারপর তারাও হারিয়ে গেল সুধীরের সামনে থেকে। তবু সুধীরের মনে পড়ে ওদের দুটো হাসিমুখ— ওর নিজের জীবনে শূন্যতাকে পূর্ণ করতে পারেনি। তবু ওদের তো সুখী করেছে। এটুকু তার অনেক বড় আশ্বাস।

অমৃতের স্পর্শ

ছোট্ট নদীটা বালুর রাশ বুকে নিয়ে ভোরের আলোয় যেন রাতঘুম সেরে জেগে উঠেছে। নদীটাতে এখন জল সামান্য। তিরতিরে একটা জলের রেখা বয়ে চলেছে। তবে বর্ষায় এর রূপ বদলে যায়। সে তখন উন্মত্তা। দু'কূল ছাপিয়ে গেরুয়া ঢল নামে তখন। সেও সেই কালীপুরের মন্দিরের চিরজাগ্রতা কালীর মতোই উন্মত্তা-লোলজিহ্বা নিয়ে সর্বস্ব যেন গ্রাস করতে চায়।

এখন সে শান্ত। দু'দিকে এখানে ঘন বন। কসাড়-শেওড়া, শিরীষ, শিমুল বন— কী নেই? দু-একটা বটগাছও মাথা তুলে অরণ্যকে ঘনান্ধকারে ভরিয়ে রেখেছে।

নদী এখানে উত্তরবাহিনী আর ওদিকেই একটু উঁচুতে কালীপুরের দেবীমন্দির। প্রাচীন মন্দির এখন জীর্ণ। কোনও ভক্ত মায়ের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে পুরনো জীর্ণ মন্দিরটাকে সংস্কার করে নতুন রূপ দিয়েছেন। মন্দিরের মেঝেটা মার্বেল দিয়ে বাঁধানো। বেদির উপর মায়ের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত। তার দেখাদেখি আর একজন সিমেন্ট, লোহা, সার ইত্যাদির ব্যবসায়ী, তিনি নাকি মায়ের নাম করে বস্তা বস্তা গঙ্গামাটি দিয়ে সিমেন্ট, সারের ভাণ্ডার অফুরান করে লাখ লাখ টাকা কামিয়েছেন। তিনি নাটমন্দির তৈরি করেছেন।

ফলে ওই মহলে মায়ের মহিমা খুবই প্রচারিত হয়েছে। মা নাকি প্রকৃতই রক্ষকর্ত্রী্য তাঁর দয়াতে সকলে সব বিপদ থেকে রক্ষা পায়।

তাই কাতারে কাতারে শনি-মঙ্গলবার বাজার থেকে গাড়ি হাঁকিয়ে, ট্রেনে বাসে দূর-দূরান্ত থেকে মায়ের ভক্তরা আসে। আর আসে এলাকার বহু মানুষ। অমাবস্যার দিন তো মন্দিরে পা রাখা যায় না। সারা এলাকার মানুষের ভিড়ে মন্দির, নাটমন্দির চত্বর গমগম করে ওঠে। ফলে এখানে হোটেল, দোকানপাট বেড়েই চলেছে। আর নদীর ধার কালীপুরের শ্মশানে, এখন পরিণত হয়েছে মহাশ্মশানে।

রক্তাম্বর পরিহিত ছোট, বড় মাঝারি মাপের সাধু সেই বনের এখানে ওখানে ঝুপড়ি গড়ে বাস গড়েছে। হোম, যাগযজ্ঞ হয় রাত্রে। রাতের অন্ধকারে বনের মধ্যে এখানে ওখানে হোমের আগুন জ্বলে ওঠে। রাতের অন্ধকারে গম্ভীর কণ্ঠস্বর ওঠে-- "জয় মা কালী কামিনী"। অমাবস্যার অন্ধকারে আরণ্যক পরিবেশে ওই ভাষা কেমন পরিবেশকে রহস্যময় করে তোলে।

ওদিকে একটা গাছের গায়ে হেলান দিয়ে বসে আছে একজন সন্ন্যাসী। এর জটাজূটও নেই অন্য সাধুদের মতো। তবু চোখে মুখে একটা প্রশান্তির ছাপ বিরাজমান। মুখে আভিজাত্যের ছাপ। এর মধ্যে একটা স্বাতন্ত্র্য ফুটে উঠেছে।

বেশ কিছু ভক্তের দল সাধুদের ঘিড়ে ভিড় জমিয়েছে। সাধু মাহারাজারা মাঝখানে চোখ বুজে স্থির হয়ে বসে আছেন। যেন সমাধিতে বিরাজ করছেন। এঁদের কেউ কেউ মাঝে মাঝে চোখ খুলে দেখেন প্রণামীর পাত্রে প্রণামী কেমন পড়ল। দেখে নিয়েই চোখ বুজেন আবার।

কিন্তু এই সাধুর কাছে কোন ভক্তই নেই, গাঁজার ধোঁয়াও নেই, প্রণামীর পাত্রও নেই, ওই গাছের নিচে আলো আঁধারি পরিবেশে তিনি একাই স্তব্ধ হয়ে বসে আছেন। যেন নিবাত-নিষ্কম্প একটি দীপশিখা। লোকে দূর থেকেই একে প্রণাম করে চলে যান। ইনি যেন এদের সমাদর থেকে স্বতন্ত্র, নিঃসঙ্গ, সবকিছু থেকে যেন দূরেই সরে গেছেন।

কথাটা নিজেও ভেবেছিল বিজনবিহারী। আজ এমনি শ্মশানের আরণ্যক পরিবেশে এসে সেও প্রথমে ঠিক বুঝতে পারেনি কি করে কাটাবে তার বাকী জীবনটা। অনেক দুঃখ-শোক-বঞ্চনাই সে পেয়েছিল জীবনে। প্রথমে সবকিছু মেনে নিতেই চেষ্টা করেছিল বিজন চৌধুরী।

বাংলার কোনও প্রত্যন্ত গ্রামের জমিদার ছিলেন তার বাবা। আয়পত্র কম ছিল না। বিরাট প্রাসাদ, কাছারি বাড়ি, অতিথিশালা, দেবালয়— সবই ছিল।

বাবা যখন মারা যান তখন বিজনের সংসার হয়েছে। বিজনবাবুর পিতৃদেব অনেক দেখেশুনে পরমাসুন্দরী একটি কন্যারত্নকে এই বাড়ির বৌ করে এনেছিলেন, বিজনের জীবনে এসেছিল অঞ্জনা। সাধারণ ঘরের মেয়ে— ভোগবিলাস-ঐশ্বর্য তেমন কিছু দেখেনি। কায়ক্লেশে দিন কাটত তার বাবার বাড়িতে, কিন্তু বিয়ের পর এই ঐশ্বর্যের মধ্যে এসে অঞ্জনা ভেবেছিল তার সৌন্দর্য দিয়েই এতসব অর্জন করেছে।

বিজেনের একটি মেয়েও হয়েছে। বিজন সর্বদা পড়াশুনা নিয়ে থাকে। গ্রামে নিজেই একটি স্কুল করেছে। আগে থেকে তার বাবার প্রতিষ্ঠিত দাতব্য চিকিৎসালয়ও ছিল। বাবা মারা যাবার পর সেসব ভারও বিজনের উপর এসে পড়ে।

বিজন দেখেছে অঞ্জনা সবসময় পরীর মত সেজেগুজে থাকে। শাশুড়ি নেই, বিজনের মা আগেই গত হয়েছেন। বিজন বলে সংসারের দিকে নজর দেবে তো? মেয়েটা কাজের লোকের কাছে মানুষ হবে, মার কর্তব্য কি কিছু নেই? তাছাড়া সংসারের অন্য কাজ—

অঞ্জনা ঠোঁটে লিপস্টিক লাগাতে লাগাতে বলে, ওকে দেখার জন্য তো লোকজন রয়েছে, আমার সময় নেই, আজ শহরে যেতে হবে কিছু কেনাকাটা করতে, নরেনবাবুকে বলে রেখেছি—

নরেন সেন বিজনদের স্টেটের নতুন ম্যানেজার। পুরনো নায়েবমশাই মারা যাবার পর বিজনের বাবা ওকে বহাল করেন। তিনি চেয়েছিলেন ইংরেজিতে জ্ঞান থাকা দরকার এমন একজন ছেলের। ওই জন্যে নরেনকে তিনি বহাল করেন। নরেন শহরের ছেলে, লেখাপড়া জানে— অবশ্য তার থেকে বেশি জানে আদব কায়দা। স্যুট পরে শহরে যায় এস্টেটের গাড়িতে— নাকি অনেক মামলা চলছে বিষয়-আশয় নিয়ে।

বাবা মারা যাবার পর বিজন বলে, ওসব মামলায় কাজ নেই। শুধু শুধু টাকা খরচা। ওই সব টাকা স্কুল,হাসপাতালে দিলে কাজ হবে।

নরেনও সাবধানী লোক। সে জানত কর্তাবাবু মারা যাবার পর এবার বিজনবাবুর মতো উদাসী ধরনের মানুষ এবার মামলার নামে নরেনের পকেট ভরানো পছন্দ করবে না। ওসব কাজে নরেনের আর আমদানি হবে না। এখানে এসে নরেনবাবুও আমদানির পথগুলো সাফ করে রেখেছিল। আর সে জানে, ঐ অঞ্জনাই ক্রমশ মাথা তুলবে। তাই নরেন ওই ভবিষ্যৎ মালকিনকে হাতে রেখেছে। শহর থেকে অঞ্জনার পছন্দমত নানা জিনিস এনে ওকে নজরানা দিত। অবশ্য ওদের পয়সাতেই। অঞ্জনাও খুব খুশি হত।

বিজন এসব কোনওদিন তাকে দেয়নি। সে তার নিজের কাজ নিয়েই ব্যস্ত থাকত। অঞ্জনা সেজেগুজে আসত বিজনের নজর কাড়ার জন্যই। সুন্দরী মেয়েরা চায় সবাই তার রূপের প্রশংসা করুক। কিন্তু সেদিকে নজর দেওয়ার বদলে বিজন বলে— "সাজগোজ করলেই হবে, মেয়েটার জ্বর তাকে দেখাশুনা করতে হবে না?" অঞ্জনা বলে—"ডাক্তারবাবু তো এসেছেন। আমি একটু বেরুচ্ছি।"

বিজন অবাক হয়ে স্ত্রীকে দেখে। এই সংসারে ও যেন মক্ষীরানীই হয়ে থাকতে চায়। আরও অবাক হয় গাড়িতে নরেনকে বসে থাকতে দেখে। শহরে যাচ্ছে সে মামলার তদারক করতে। অঞ্জনাও তার সঙ্গে শহরে চলে যায়।

বিজন সেদিন নরেনকে বলে আমি ঠিক করেছি, বেশ কয়েকটা মামলা আর চালাব না। তাই উকিলবাবুকে ডেকে পাঠিয়েছি মীমাংসা করে নেবার জন্য। অযথা বাজে খরচা করে লাভ নেই। নরেন বলে, সে কি স্যার! সব মামলাতেই জিতব আমরা, কয়েক লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ পাবো। আর এক্ষুনি সেসব ছেড়ে দেবেন?

নরেন এর মধ্যে অঞ্জনার মনের কাছাকাছিও এসে গেছে, নরেন চায় অঞ্জনা তার সাথে শহরে যাতায়াত করুক।

অঞ্জনার মনের ভিতর ছিল একটা শূণ্যতা। বিজন সেই শূণ্যতা পূরণ করার চেষ্টাও করেনি। সে তার জগৎ নিয়েই ব্যস্ত ছিল। নরেনকে পেয়ে অঞ্জনা দেখেছিল নরেন তার মনের চাহিদাকে বোঝে। নরেনও এবার নিজ স্বার্থে অঞ্জনার মনের শূণ্যতাকে পূর্ণ করতে আগ্রহী হয়। আর কিছুটা সমর্থও সে হয়েছে। অঞ্জনার মনে এখন নরেন একটা স্থান করে নিয়েছে।

অঞ্জনা বিজনের কাজকর্মগুলোকেও পছন্দ করে না। মৃদু প্রতিবাদও করেছে ইতিপূর্বে কিন্তু বিজন কান দেয়নি। এবার অঞ্জনাই বলে— মামলা জিতবই, আর মোটা টাকা পাবো, এ সময় মামলা বন্ধ করা যাবে না।

বিজন চুপ করে থাকে। এবার অঞ্জনা বলে— বিষয়-আশয় যা বোঝ না তা নিয়ে তোমাকে আর মাথা ঘামাতে হবে না। এবার আমিই সব দেখাশুনা করব। বিজন এসব বিষয়-আশয় নিয়ে মাথা ঘামাতে চায় না। সে এখন নিজের খেয়ালে ঘুরে বেড়ায়। দিগন্ত প্রসারী সবুজ প্রান্তর, বর্ষার মেঘছায়াবৃত আকাশ, বৃষ্টিধারা, বালুচর, এখনও তার মনে ঝড় তোলে। ওই অসীম দিগন্তসীমায় সে হারিয়ে যেতে চায়। অঞ্জনা যেন তাকে সেই মুক্তির পথ দেখিয়েছে।

অঞ্জনা নিজেও লেখাপড়া জানে— আর নরেনও তাই অঞ্জনাকে বলে, ম্যাডাম, এসব বিষয়-আশয় আপনি নিজেই দেখাশুনা করুন। ছোটবাবু তো এসব দেখছেন না। সব যে চলে যাবে!

অবশ্য নরেন ইতিমধ্যেই কিছু চলে যাবার ব্যবস্থা করেছে। আর ও জানে যে জমিদারি প্রথা চলে যাবে। তাই তার আগেই নরেন নিজে কিছু ম্যানেজ করেছে। আর অঞ্জনার হাতে এসব এলে সেই হবে সর্বেসর্বা। তাই সেইই অঞ্জনাকে এসব বিষয়-আশয় দেখার কথা বলে। অঞ্জনা বলে— আমি তো এসবের কিছু বুঝি না নরেন। নরেন বলে, আপনি চিন্তা করবেন না। আমি সব বুঝিয়ে দেব। অঞ্জনাও তাই নিজেই এবার কাছারিতে বসে, আর নরেনের পরামর্শমতই চলে।

বিজন এসব দেখে মাত্র। কিছুদিনের মধ্যেই এবার অঞ্জনা সব দেখেশুনে বলে— এস্টেটের আয়পয় কমে আসছে। স্কুল, হাসপাতাল এসব চালানো যাবে না। আর টাকা দেওয়া যাবে না। নরেনও তাই বলেছে। বিজন শুনছে ওর কথাগুলো, দেখছে, এখন নরেন প্রায়ই অন্দরে আসে। অঞ্জনার ঘরে দু'জনে বসে খাতাপত্র দেখে, বিষয়-আশয় নিয়ে কথা বলে। বিজন বলে— কাছারির কাজ কাছারিতেই করবে। বাড়িতে কেন?

অঞ্জনা চটে ওঠে। বলে, আমার কাজ আমাকে করতে দাও। বিজন চুপ করে যায় সেদিন। ক্রমশঃ তার মনে হয়েছে অঞ্জনাই সব দখল করে নিজের ইচ্ছামত কাজ করতে চায়। বিজন কোনোদিন নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চায় নি।

সবকিছু দেখে বিজন স্তব্ধ হয়ে যায়। সেও বুঝেছে অঞ্জনা এবার বদলে গেছে। অঞ্জনার এ রূপ-বদল তার মোটেই ভালো লাগে না, তবু সে চুপ করে থাকে।

এবার তার স্কুল, হাসপাতাল ওসব বন্ধ করে দিতে চায় ওরা। বিজন প্রতিবাদ করতে অঞ্জনাই বলে, এ আমার হুকুম। নিজেদের ভবিষ্যতের কথা ভাবতে হবে। দানছত্র খুলিনি। বিজন বলে, বাবা এসবের জন্য টাকা বরাদ্দ করে গেছেন।

নরেন বলে, তখন টাকা ছিল। বিজন এই প্রথম চটে ওঠে, সে টাকা এখন কোথায় গেল? এস্টেটের আয় কমে গেল কেন? দুটো মহালও চলে গেল, সে টাকাও নেই?

নরেন এবার চমকে ওঠে। এসব তারই কীর্তি। বিজন সে সব জানে এটা বুঝতে পারে নরেন।

এবার সে চায় বিজনকেই হটাতে। তাই বলে, ম্যাডাম সব হিসাব দেখেছে। অঞ্জনা বলে, তাই বলছি বাজে খরচা আর করা যাবে না। এবার থেকে তুমিও মহালে ঘোরো, ঘরে বসে দিন কাটানো আর চলবে না।

বিজনের মুখচোখ রাগে অপমানে লাল হয়ে যায়। সে বের হয়ে আসে। আর ঘরে ফেরে না।

— বাবা! বাবা! দয়া কর বাবা। কারও কাতর আর্তনাদে বিজনের চমক ভাঙে। অতীতের হারানো দিনগুলোর কথাই ভাবছিল বিজন। এবার সে এই অরণ্যভূমি মহাশ্মশানে ফিরে আসে। অতীতের কথা

ভোলার জন্যই। বিজন সব ছেড়ে পথে বের হয়েছে। কি যেন আরও কিছু পাওয়ার সন্ধানে, যা সে সংসারে পায়নি। তাই নয়, সে বের হয়ে এসেছে পরমার্থ আর শান্তির সন্ধানে। সব ছেড়ে এই সন্ন্যাসীর জীবনেও এসে দেখছে এখানেও আছে অর্থের নেশা, প্রতিষ্ঠার দম্ভ। মানুষদের এরা ঠকিয়ে অর্থের চাহিদা মেটায়।

লোকটা বলে, ছেলের অসুখ বাবা। বিজন বলে, ডাক্তারের কাছে যাও। এ কাজ তাদের। আমার করবার কিছু নেই। বিজন দেখে ওদিকে তার আসনের সামনে কোন ভক্ত কিছু টাকা রেখে গেছেন। সেইগুলো দেয় লোকটাকে। ওষুধ কিনে দিও। লোকটা টাকা নিয়ে চলে যায়। দৈবকৃপা না পাক, টাকা পেয়েও সে খুশি।

এক সাধু বলে, মাটি পুবে মাদুলি দিয়ে টাকা পেতে, তা নয়, প্রণামীর টাকাই দিয়ে দিলে? হাসে বিজন। এরকম অর্থ, প্রতিষ্ঠা, সব সে ঘৃণাভরে প্রত্যাখান করে এসেছে। আর সে ফিরে চায়নি। নির্জনে নিজেকে পাবার জন্য সব ছেড়ে এসেছে।

কালীপুরের শ্মশানের সাধুদের মহলে তার নাম ছড়িয়েছে। ভক্তরাও অনেকে আসে। কিন্তু বিজনের এই খ্যাতি ভালো লাগে না। নিজেকে সে সবকিছু থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চায়।

সেদিন মহাশ্মশানে কোনও ধনী মহিলা সাধুদের দান-দক্ষিণা দিতে এসেছেন। সুন্দরী মহিলা, সর্বাঙ্গে নানা গহনা, পরনে দামী শাড়ি, পার্লকি, ম্যানেজার, লোকজন রয়েছে। সাধুদের কুঠিয়াতে গিয়ে তাদের দামী কম্বল, ধুতি, চাদর, টাকা দিয়ে পুণ্য অর্জন করছে।

সেই দলটা এদিকেও আসে। বিজন এখন অন্য মানুষ। মুখে অযত্নবর্ধিত দাড়ি। শরীরও কৃশ হয়ে গেছে। সেই মহিলা এসে পায়ের কাছে কম্বল, চাদর, অর্থ, ফলমূল রেখে প্রণাম করে মুখ তোলে। বিজন নীরবেই হাত তোলে আশীর্বাদের ভঙ্গিতে।

বিজনের মনে ঝড় ওঠে। অঞ্জনাই এসেছে তাকে দান করে পুণ্য অর্জন করতে। আর ওই নরেনই এখন সব। সেই বলে অঞ্জনাকে - চল, বেলা হয়ে গেছে, রোদে কষ্ট হচ্ছে তোমার।

বিজনকে ওরা চিনতে পারেনি, কিন্তু বিজন ওদের চিনেছে। আজ সে অতীতের সব কথাই ভুলে যেতে চায়। যে যা ভাবে ভাবুক। আজ বিজন অমৃতপথযাত্রী। জগতে তার আর কোনও লেনদেনা নেই।

কিন্তু চিনেছিল অঞ্জনা, ওই শ্মশানে ওইভাবে বিজনকে বসে থাকতে দেখে সে অবাক হয়, সেই চাহনি চিনতে তার ভুল হয়নি। আজ নিজেকেই অপরাধী মনে হয় অঞ্জনার। অঞ্জনা দেখেছে নরেনকে। সে অবশ্য চিনতে পারেনি, অঞ্জনা সরে আসে সংযতভাবে, তার মুখে কোনও বিস্ময়ের রেখাও ফুটতে দেয় না।

দামী হোটেল গড়ে উঠেছে কালীপুরে। কিন্তু ওসবের পরিচালনার ভার নরেনের হাতে। এদিকে মেয়ে বড় হচ্ছে। এবার অঞ্জনাও বুঝেছে নরেনকে সরাতেই হবে।

এমনি দিনে হঠাৎ বিজনকে দেখে অঞ্জনা যেন কিছুটা ভরসা পায়। এবার তাকে একটা সিদ্ধান্ত নিতেই হবে।

শ্মশান থেকে ফিরে অঞ্জনা হোটেলের ঘরে ঢুকেছে। আজ তার মনে পড়ে বিজনের কথাই। অমন দেবতার মতো মানুষটাকে অঞ্জনা সেদিন আঘাতের পর আঘাতই দিয়েছেন। তাই বিজন সবকিছু ছেড়ে চলে যায় সেদিন। নরেন ডাকে। বিরক্ত করবে না— অঞ্জনা বলে। আমার মাথা ধরেছে তুমি খেয়ে নাওগে।

এবার সে ওই স্বার্থপর নরেনকে এড়াতে চায়।

রাত্রি নামে আরণ্যক পরিবেশে। গাছে গাছে অন্ধকারে জোনাকি জ্বলে। দু একটা শিয়াল এদিকে-ওদিকে চেঁচাচ্ছে। এখন শ্মশানে লেগেছে অন্ধকার, তাই চুলা ঝকমক করছে। জেগে আছে বিজন।

অঞ্জনাকে নিয়ে নরেন সেই হোটেলেই উঠেছে। নরেন বলে—ওই নোংরা সাধু-ফকিরদের মাঝে মানুষ যায়— Horrible!

সে দুপুরেই ঠাণ্ডাঘরে জিন নিয়ে বসেছিল নরেন। এখন ওই বসন্তপুর এস্টেটের সেইই মালিক প্রায়। জমিদারি চলে যাবার আগে নরেন সেখানে ধানকল, পাটকল গড়ে এখন তোফা আছে। অঞ্জনাকেও সে পুরোপুরি গ্রাস করতে চায়।

অঞ্জনা সেদিন বিজনকে অপমান করেই তাড়িয়েছিল। নরেনও খুশি হয়েছিল।

বলে সে— ঠিকই কাজই করছ ম্যাডাম, দুষ্ট গুরুর চেয়ে শূণ্য গোয়াল ভালো।

অঞ্জনা ক্রমশই বুঝতে পেরেছে নরেনের মতলবটা, কিন্তু তখন আর তার করবার কিছুই ছিল না এখন সে নরেনের হাতে পড়েছে। জমিদারি চলে গেছে, অবশ্য ধানকল,জুটমিল ভালোই চলছে।

হঠাৎ এভাবে অঞ্জনাকে দেখবে ভাবেনি বিজন। তার ঘর, সেই দিনগুলোর কথা সে ভুলতে চায়, তবু যেন বার বার মনে পড়ে। এসব তার কাছে এখন অতীত। বিস্মৃত অতীত— তার কোনও বাস্তব অস্তিত্ব তার কাছে নেই। সে বের হয়েছে তার থেকে বৃহত্তর, মহত্তর কিছুর সন্ধানে।

হঠাৎ কার পায়ের শব্দে চাইল বিজন। কে? ছায়ামূর্তিটা এগিয়ে আসে। এবার তারার আলোয় দেখা যায় অঞ্জনাকে এখন তার বেশবাস সাধারণ।

—তুমি, এখানে? বিজন তাকে দেখামাত্র চমকে ওঠে।

অঞ্জনার চোখে জল। আজ অনেক ভেবেই এসেছে সে। বলে, আমাকে ক্ষমা কর, বাড়ি ফিরে চল আমার সঙ্গে। আজ তোমাকে আমাদের খুবই দরকার।

বিজন বলে— কিন্তু তোমাদের দরকার আমার আর নেই। ওসব পিছনে ফেলে এসেছি।

অঞ্জনা বলে— আমাকে ক্ষমা কর। কাল সকালে যাব। আজ তুমি আমাকে ফেরাতে পারবে না। আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার সুযোগটুকু দাও।

বিজন চুপ করে থাকে। অঞ্জনার কোন কথার জবাব দেবার প্রয়োজনও সে বোধ করে না।

বিজন আজ দেখেছে বিরাট বিশ্বকে, দেখেছে প্রকৃতির মাঝে এক অদৃশ্য সত্তাকে— যিনি রূপাতীত, অধরা। সেই অধরা অমৃত সন্ধানেই বের হয়েছে সে আর সব বস্তুকে পিছনে ফেলে। সে একলা পথযাত্রী। এই দুস্তর যাত্রায় কোনও সঙ্গী থাকে না, এই অনুভূতি সব হারাবার পরই আসে স্পর্শটুকু পাবার আশ্রয়। সে আর ঘরের বাঁধনে বাঁধা পড়তে চায় না।

অঞ্জনা নতুন করে বাঁচতে চায়। আজ সকালে আলো ফুটেছে অরণ্যভূমিতে, পাখিদের কলরব ভেসে আসে। ভোরের বাতাসে নাম-না-জানা ফুলের মধুর সুবাস। অঞ্জনা এসেছে আজ বিজনকে নিয়ে ঘরে ফিরবে। কিন্তু দেখে গাছতলাটা শূণ্য— হোমের আগুনও নিভে গেছে, কেউ নেই। চমকে ওঠে অঞ্জনা। এদিকে ওদিকে খুঁজে চলে। কেউ বলে সাধুবাবাকে খুঁজছেন? কাল তো ভোররাতের আগেই কোথায় চলে গেছেন। অঞ্জনার বুকে ঝড় ওঠে। হতাশার বেদনায় তার চোখে জল নামে। আজ বিজনকে পেয়েও সে হারিয়েছে। বিজন তার জন্যই সব ছেড়ে আবার হারিয়ে গেল অসীমে। এই নিঃস্ব জীবনে বিজন কী পেয়েছে তা জানে না অঞ্জনা! এর পরিমাণও তার অজানা।

তবে অঞ্জনা বুঝেছে এবার তাকে নিজের পথেই চলতে হবে। অঞ্জনার মধ্যে এক কঠিন ব্যক্তিত্ব ফুটে ওঠে। তাই সে এবার নরেনকেই চাকুরি থেকে বরখাস্ত করে। নরেন এটা ভাবতেই পারেনি। অঞ্জনা সহকারী ম্যানেজার নিমাইবাবুকে ডাকিয়ে আনে।

অঞ্জনা এখন বদলে গেছে। বিজনের ক্ষণিকের দর্শন— তার ওইভাবে সর্ব তুচ্ছ করে হারিয়ে যাওয়াটা অঞ্জনার মনেও একটা স্থায়ী পরিবর্তন এনেছে। সে এখন সাজগোজ, আগের সেই বিলাস-ব্যসনও ছেড়ে দিয়েছে। এখন সেও যে সংসারে থেকেও সংসার বিরাগী। মনে হয়, এই বিষয় সম্পদের থেকেও আরও মূল্যবান অনেককিছুই আছে। যার সন্ধান সে আজও জানেনা।

তারই নেশাতে অঞ্জনা এখন তীর্থে তীর্থে ঘোরে। সাধুদের আস্তানার পাশপাশে ঘোরে কিসের সন্ধানে? একবার যদি বিজনের সঙ্গে দেখা হয় সে প্রশ্ন করবে— কিসের সন্ধানে সব ছেড়ে বের হয়েছে সে? তা কি পেয়েছে?

কিন্তু তার আর দেখা পায়নি।

এবার এসেছে ম্যানেজারকে নিয়ে অঞ্জনা দ্বারকাতীর্থে। ভারতের একপ্রান্তে আরব সমুদ্রে ধারে এই প্রধানতীর্থ। দ্বারকাধীশের সুপ্রাচীন মন্দিরের পাশে শঙ্করাচার্যের মঠ। গোমতী নদী এসে এখানে আরব সমুদ্রে এসে পড়ে। ওর বুকে ধূ-ধূ বালুচর। তার ধারে সাধুদের কুঠিয়া। যাত্রী-সাধুরা ঘুরতে ঘুরতে এইসব কুঠিয়াতে থাকেন।

অঞ্জনা সকালে নদীর দিকে গেছে, দেখেছে ওই কুঠিয়াগুলো। সেদিন দেখে অপরিচিত সাধু নদীতীরে দেহ রেখেছেন। স্থানীয় মানুষজনই শ্রদ্ধাভরে তার শেষকৃত্য সম্পাদন করার আয়োজন করছে। যাত্রীদের মধ্যেও অনেকে স্বেচ্ছাতে চাঁদা দিচ্ছেন। অঞ্জনা এগিয়ে গিয়ে প্রাণহীণ সাধুর দেহটা দেখে চমকে ওঠে। তার পায়ের তলা থেকে যেন মাটি সরে যায়। এ আর কেউ নয়, তার স্বামী বিজনবিহারীই, আজ এখানে এই দূরে কোন তীর্থে এসে তার পরিক্রমা থেমে গেছে চিরদিনের জন্য। অঞ্জনার মনে হয়, যার জন্য সে ঘর ছেড়েছিল সেই অমৃতের স্পর্শ কি সে পেয়েছিল? তার শূণ্য জীবনপাত্রে কি কোনও অমৃতধারার স্পর্শ ঘটেছিল। এ প্রশ্নের উত্তর আজ আর মিলবে না।

হঠাৎ দেখা যায় শূণ্য গোমতীর বুকে আরব সাগরের জোয়ার এসে ঢুকেছে। নীল জলধারা হয়ে চলেছে। দেখে দূরে বালুচরে পড়ে থাকা এতদিনের সেই শূণ্য কমণ্ডলুটা, সেই পাত্রটা সাগরের জলে পূর্ণ হয়ে উঠেছে।

চমকে ওঠে অঞ্জনা। মনে হয় সে তার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছে। শূণ্য কমণ্ডলুটা আজ জীবনের উর্বর বালুচরে কি অমৃতধারা স্পর্শে পূর্ণ হয়ে উঠেছে?

বিজন শূণ্যহাতে এই পৃথিবী থেকে ফিরে যায় নি। অঞ্জনার চোখে জল নামে।

উৎসব

ফিঙী গ্রামের নাম ওই অঞ্চলের দূর-দূরান্তের মানুষও জানে। ওই নামকরণ করা নিয়েও অনেক কাহিনী প্রচলিত আছে। অনেকে বলে এককালে ওখানে ফিরিঙ্গি সাহেবদের কুঠি ছিল। এখনও নীলকুঠির ধ্বংসাবশেষ রয়ে গেছে। ভাঙা কিছু বাড়ি নীলকুঠির চিমনিটাও ভেঙে পড়েছে। সেখানে গজিয়েছে বট-অশত্থের গাছ। ওদিকটা জঙ্গলে ঢাকা। সেই ফিরিঙ্গিদের নাম থেকেই গ্রামের নাম হয়তো ছিল ফিরিঙ্গি। পরে সেটা অপভ্রংশ হতে হতে ফিঙীতে পরিণত হয়েছে।

এককালে ওই নীলকুঠির দৌলতে বেশ জমাট আর বর্দ্ধিষ্ণুই ছিল: হাট-বাজার বেশকিছু বিত্তশালী লোকের বাস ছিল তখন থেকেই। এখন আরও বাড় বাড়ান্ত হয়েছে, আর লেগেছে আধুনিকতার ছোঁয়া।

সেই নীলকুঠি আমল থেকে সাহেবদের কুঠিবাড়ির সামনের মাঠে একটা বটগাছের নিচে কোন প্রস্তরীভূত দেবতা ধর্মপাল। সেই সময় সাহেবদের দাক্ষিণ্যে ওই বটতলায় তখনকার মানুষদের অনেকের আনন্দ দেবার জন্যই সাহেবরা প্রচুর ধেনোমদ আর দশ বিশটা ছাগল ভেড়া কাটত। একদিনের উৎসব করে নীলকর সাহেবরা সেই শোষিত-শাসিত সর্বহারা চাষীদের কাছে যেন দয়াবান হয়ে উঠতো। এই রীতিটাই সাহেবরা বলবৎ রেখেছিল। প্রতিবছর বৈশাখী পূর্ণিমার দিন হতো সেই মদ্যপান আর মাংস ভোজনের উৎসব। ক্রমশঃ নীল চাষীদের সংখ্যা বাড়তে সাহেবরাও দশ বিশটা ছাগল ভেড়ার জায়গায় তিরিশ-চল্লিশটা বলির ব্যবস্থা করতো।

মেলাও বসতো সেদিন ওই বাবা ধর্মপাল-এর বসতি বটগাছের আশেপাশে। কবিগানও হতো।

তারপর ফিরিঙ্গিরা সব ছেড়ে চলে গেল। নীলকুঠিও বন্ধ হয়ে গেল। ক্রমশঃ কালের প্রবাহে সেসব ঢেকে গেল অরণ্য-ভূমিতে। কিন্তু সেই নির্জন গ্রামপ্রান্তে সেই বটগাছ আর বিশাল হয়ে উঠলো। আর সেই বৈশাখী পূর্ণিমায় বাবা ধর্মপালের উৎসবে তখন বিভিন্ন গ্রামের কিছু বর্দ্ধিষ্ণু মানুষের উৎসাহে বিশালতর হয়ে উঠলো। তিনি পরিণত হয়েছেন গণদেবতায়। আর এলাকার বহুগ্রামের মানুষও এবার ধর্মপালের বলি দিয়ে মাংস ইত্যাদি খাবার উৎসবে পরিণত হয়েছে।

এখন সেই উৎসবকে আরও বিশালতর করে তুলেছে বাড়ুয্যে পরিবারের কর্তারা। তাদের সঙ্গে রয়েছে দত্ত বাড়ির শ্যাম দত্ত।

শ্যাম দত্তের বিশাল ধানকল। ওদিকে সরকারি লোন নিয়ে গড়ে তুলেছে বিশাল মুরগীখামার এছাড়াও রয়েছে বিরাট ছাগল-ভেড়ার খামার। শহরের বাজারে ছাগলভেড়া চালান দেয়। একদিকে বিশাল এলাকা জুড়ে বৈজ্ঞানিক প্রথায় তিনি ছাগল ভেড়ার উৎপাদন করেন, চালান দেন বিভিন্ন শহরে। অবশ্য এসবই সম্ভব হয়েছে পঞ্চায়েতের প্রেসিডেন্ট হবার পর।

দুষ্টলোকে বলে, নানা কৌশলে গ্রামের মধ্যে শিল্প পশুপালন কেন্দ্র এসব গড়ে গ্রামে টাকা পেয়েছেন। তাছাড়া পঞ্চায়েতের বিভিন্ন খাতের প্রচুর টাকা ও তিনি নিয়মিত অনেক ব্যবসাই শুরু করেছেন।

আর আজকের ফিঙী গ্রামের চেহারাও বদলেছে। শ্যামদত্তের আশপাশে লোটনচকোত্তী, হারা প্রামাণিক আরও অনেক নেতা উপনেতাও জুটেছে।

তাদের মধ্যে হারা প্রামাণিক এখন ওই নীলকুঠির জঙ্গলের মধ্যে নাকি বেশ বড়সড় মদ চোলাই -এর কুটিরশিল্পও গড়ে তুলেছে। অবশ্য মদের অন্যতম প্রধান কাঁচামাল চালের খুঁদ টন টন আসে ওই

শ্যামদত্তের ধানকল থেকে। চিটেগুড়ের যোগানদার ঐ বাড়ুয্যেমশায়। ওদের বাজারে এখন বিরাট দোকান ধানচালের আড়ত। এরাই এখন গ্রামের মাথা। এখন ধর্মপালের উৎসবের মূলহোতা এরাই।

এই মেলার নাম এখন সারা জেলায় এবং কলকাতা অবধি ছড়িয়েছে। সাতদিন ধরে মেলা বসে ওই বটগাছকে কেন্দ্র করে চারিদিকে মাঠে। সার্কাস, সিনেমা যাত্রাগান এসব তো হয়ই আর বসে জুয়ার আসর।

যাত্রাপালা শুরু হবে মাঝরাতে। সন্ধ্যা থেকে চলবে জুয়ার আসর, রাতভোর চলবে যাত্রা, আর জুয়া হাজার হাজার টাকা ওড়ে তখন।

শ্যামদত্তই বুদ্ধি করে কৌশলটা বের করেছে। যাত্রার খরচা দেবে জুয়াড়িরা আরও কিছু আমদানী হয়। এছাড়া চলে মদের ফোয়ারা।

হারা প্রামাণিকের কারখানায় মাসখানেক আগে থেকেই মদ তৈরী শুরু হয়। বড় বড় ট্যাঙ্কে মদ রাখা হয়। দশদিনের উৎসবে তার মদ বেচে হাজার হাজার টাকার আমদানী হয়।

আর বলি! ছাগল-ভেড়া-কেউ নিম্নবর্ণের মানুষ শুয়োরও বলি দেয়। এই বলির সংখ্যা ক্রমশঃ হাজার ছাড়িয়ে দেড় দুহাজারে পরিণত হয়েছে। শুধু ফিঙী গ্রামই নয় আশপাশে ধোকড়সা-আন্দুল-কেশপুর-মনোহর-মায় দাইহাট-কটোয়া থেকে লোকজন আসে।

ফিঙীর বাইরে সপ্তাহ খানেক আগে থেকে ছাগল-ভেড়া-শুয়োরের হাট বসে। এক একটা ছাগলের ওজন পনেরো বিশ কেজির নিচে নয়।

নোটন চক্রবর্তীরাই ওই ধর্মপালের পূজারী। ওরই পূর্বপুরুষ ছিল নীলকর সাহেবদের চামচে-আড়কাটি।

হাজার হাজার ছাগল ভেড়া শুয়োর কেনাবেচা হয় মায় মুরগী অবধি। বাড়ুয্যেমশাই মেলা কমিটির সেক্রেটারী, হারুদত্ত চেয়ারম্যান। নোটন চক্কোত্তীও মেম্বার। গ্রামে কথা হয়েছিল বাবার উৎসবে অন্যসময় ভক্তদের দেওয়া প্রণামী যা আসে, তা লাখ দুয়েক হয়, তবে বাবার মন্দির কেন হবে না?

এ নিয়ে গ্রামে আলোচনা সভা সবই হয়। মন্দির তৈরির প্ল্যান বাজেট ও ধরা হলো প্রায় লাখ দেড়েক টাকা।

তারপরই সেদিন নোটন চক্কোত্তীই-ভোরে হাঁপাতে হাঁপাতে গ্রামে রটিয়ে দেয় যে, আজ রাতেই বাবা ধর্মপাল তাকে স্বপ্ন দিয়েছেন সাক্ষাৎ দর্শন দিয়ে। স্বপ্ন দেখেছেন যে তিনি বলছেন,-এসব মন্দির টন্দির গড়িস না— গাছতলায় মুক্ত আকাশের নিচেই থাকতে চাই। মন্দির করলে তোদের ঘোর অমঙ্গল হবে। গ্রামে আগুন মহামারী শুরু হবে। তোরা কি তাই চাস?

নোটনের কথার পুনরাবৃত্তি করে নবীন রুইদাস। ধর্মপাল লৌকিক দেবতা, সেখানে ইত্যিজাতের পূজা করার বলি দেবার অধিকার রয়েছে। নবীন গাছতলা রোজ পরিষ্কার করে। গোবর দিয়ে নিকোয়। ফুলটুল যোগান দেয়। নবীনও বলে, হ্যা গো। আমাকে কে যেন বল্লেক-গাঁয়ের লোকদের মানা কর—মন্দির যেন না করে। আমি মুক্ত গাছতলায় থাকবো। খাপরার মন্দিরে পুরবি না আমাকে, উসব শুনে গায়ে কাঁটা দিচ্ছে গো। এ্যাই দ্যাখ।

নবীনের কথাটাও ছড়িয়ে পড়ে। তারপর হারুদত্ত আবার সভা ডাকে—তখন তারা ক্ষেত্র তৈরী করে ফেলেছে। সাধারণ মানুষও বলে,—তালে মন্দিরের দরকার নাই বাপু।

পুজোতেই আরও ধুমধাম করা হোক। পরবর্তীকালে বছরে আরও একটি উৎসব আর মদ মাংস ভোজনের দিন বেড়ে গেল ফিঙী গ্রামে। ফলে দেড় হাজারের জায়গায় বলি বাড়লো শ পাঁচেক। জুয়ার ছকেও আমদানী বাড়ল মদ বিক্রিও বাড়লো।

হারুদত্ত বলে—দেখলেতো বাড়ুয্যে। তুমিও ছিলে মন্দির করার দলে। লাখ দুয়েক টাকা বেঁচে গেল—ওই স্বপ্নের গল্প ফেঁদে— আর লাভই হলো দ্বিতীয়বার মেলা বসিয়ে।

নোটন বলে, —দ্যাখো ক্যামন প্ল্যান করলাম। দুবোতল মদ দিও দত্তমশায়, ও ব্যাটার স্বপ্নটা ইত্যিজনের মধ্যে জোর চাউর হয়ে গেছে।

ফলে ফিঙী গ্রামে ধর্মপালের ডবল মেলা আর ওই দুহাজার বলির প্রথাটা এখন কায়েম হয়ে গেছে।

এই নিয়ে কিছুদিন ধরে বাড়ুয্যেদের ওই পশুপালন খামারে বেশ আলোচনা শুরু হয়েছে। বিরাট এলাকা জুড়ে খামার। বড় বড় শেডে থাকে দেশী বেশ বড় জাতের ছাগল, রামছাগল। পাঁঠাদের কদর এখানে বেশি। কারণ ওই বলির সময় এক একটা পাঁঠা হাজার বারোশ টাকাতে বিক্রি হয়। আরও বড় সাইজের পাঁঠার দামতো দুহাজারের উপরে।

আর বেশি দর ভেড়াদের। বাবা ধর্মপাল ভেড়ার বলিতে বেশি প্রসন্ন হন।

বাড়ুয্যেমশায় হিমাচল প্রদেশ থেকে সেরা জাতের ভেড়া আনিয়ে এখানে তাদের বংশবৃদ্ধি করছে। বাচ্চাগুলো ছয়মাসের মধ্যে নধর হয়ে ওঠে।

নোটন চক্কোত্তী বিধান দিয়েছে—বাবা ধর্মপালের স্বপ্নে তাকে আদেশ দিয়েছেন হৃষ্টপুষ্ট শিংদাড়ি বিশিষ্ট পাঁঠা বা ভেড়াই বলি দিতে হবে। ছাগশিশু-শিশুভেড়া বলি নিষিদ্ধ।

তাই বেশ নধর পাঁঠা ভেড়াই বলি দেওয়া হয়। ওই খামারের ছাগল ভেড়াদের সঙ্গে আশপাশের গ্রামের ছাগল ভেড়ারাও মাঠে চরে, আটদশজন রাখাল ওই বিশাল পালকে সামলায়। ওদের মধ্যে শহর থেকেও বেশ কিছু ভালো জাতের পাঁঠা ভেড়াদের আনা হয়েছে। তারাও দেখছে যে এই অঞ্চলের বিশেষ করে ফিঙী গ্রামের ওই ক'জন মাতব্বরের জন্য তাদের বংশধরদের হত্যা করা হচ্ছে। এবার সেই শহরের থেকে আনা বেশ প্রধান পাঁঠা আর ভেড়াগুলোও ভাবনায় পড়ে। তাদের ভাষা মানুষ বুঝতে পারে না। কিন্তু ওই প্রাণীদেরও একটা ভাষা আছে।

সব প্রাণীদেরই নিজেদের ভাষা আছে। হাতিতো দূরেও তাদের ভাষাকে পাঠাতে পারে। সুতরাং পাঁঠা-ভেড়াদের ভাষা আছে, সেটা তারা বোঝে। মানুষ সে ভাযা বোঝে না।

এখন যুগ বদলেছে। ওই ফিঙী গ্রাম তার আশপাশের গ্রাম পঞ্চায়েত অন্যসব গ্রামে ভোটও হয়। ছাগল ভেড়াগুলো এখন বড় হয়েছে। তারা দেখছে চাষীরা বিরাট মিছিল করে আন্দোলন প্রতিবাদ করে সেবার মাঠে টিউবওয়েল বসাতে বাধ্য করে। জোরজার করে দাবী আদায় করে পাকা রাস্তাও বানায়। আবার দেখছে ওই দত্ত বাড়ুয্যের ভোটের সময় বোমা মেরে লোক তাড়িয়ে ভোটে জেতে।

ছাগল ভেড়ারাও দেখেছে একসাথে লড়তে পারলে বা ঠিক জায়গামতো আঘাত করতে পারলে কাজ হাসিল করা যায়। তারাও এবার দেখেশুনে জ্ঞান লাভ করেছে মানুষ নামক জন্তুদের কাছ থেকে। তাই এবার ওই প্রধান পাঁঠা ভেড়ার দল যোয়ান ছাগল ভেড়াদের বলে-লড়াই করেই এই গণহত্যা রোধ করতে হবে। দুচারজন গাঁইয়া ছাগল বলে,—ওরা যদি মারে।

শহরের ছাগনেতা এবার দাড়িনেড়ে শিংউচিয়ে বলে,—আমরা মারবো। ভাইসব লড়তে হবে—এক সঙ্গে।

একটা ধেড়ে ভেড়া, শাসালো ঘাড়ে গর্দানে নেতার মতো গর্জে ওঠে, —এ লড়াই বাঁচার লড়াই।

আর তরুণ ছাগল—ভেড়াগুলো মাঠে চরতেমানুষদের গর্জাতে শুনেছে। তারাও এবার সেই বুলি বলে তাদের ভাষায়,—এ লড়াই জিততে হবে।

একটা রামপাঁঠা এবার ধর্মপালতলার চারপাশে ছিটিয়ে থাকা ফুলনৈবিদ্যর আতপ চাল খেতে খেতে বলে, —ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে এই খুন বন্ধ করতে হবে।—ভাইসব আমাদেরও বাঁচার অধিকার আছে। মানুষ হয়েছে বলে আমাদের, ইচ্ছামতো খুন করে আমাদের মাংস খাবে এযুগে এ আর হতে দেব না।

কে একজন চীৎকার করে, —দুনিয়ার ছাগল, ভেড়া।

সমস্বরে তরুণরা বলে—এক হও—এক হও।

একটা ধেড়ে ভেড়া, বেশ বাঁকানো শিং তার। ওই ধর্মপালের শিলাখণ্ড দেখিয়ে সে বলে, এটার সামনে আমাদের খুন করে হাজারে হাজারে। দেবো শালা পাথরটাকেই ফাটিয়ে চুর করে। মার গুঁতো।

ভেড়ার শিং-এ হীরের মতো কঠিন বস্তুকে বেধে আগেকার বাদশারা পরখ করতো ওই গুতোনি

সহ্য করে ও হীরা অটুট আছে কিনা। যে হীরা অটুট থাকতো, তাকেই ধরা হতো খাঁটি হীরা বলে। ওদের শিং-এর এত জোর। দুতিনটে বিশাল সাইজের ভেড়া এবার বটগাছের নিচে পড়া থাকা তেল সিঁদুর মাখানো পথারটাকে গুঁতো মারতে থাকে বেশ জোরে জোরে।

এই ভাবে ভেড়াদের সমবেত আক্রমণ পাথরের মূর্তির নাকটা দুটুকরো হয়ে ভেঙে পড়ে। একটা আঙুলও ভেঙে যায়। রাখালগুলো ছুটে আসে। হেঁই শালারা গুঁতোগুতি করার জায়গা পেলিনা।

মদ্দা ভেড়াছাগলদের মধ্যে এমন লড়াই প্রায়ই হয়। এ যেন তেমন লড়াই। ওরা ছড়ি দিয়ে তাড়াতে চেষ্টা করে। দুটো ভেড়া এবার মার খেয়ে এই প্রথম রুখে দাঁড়ায়। একটা ভেড়া তেড়ে এসে একটা রাখালের তলপেটেই সজোরে গুঁতো মেরেছে। ভাগ্যিস শিংটা ঢোকেনি তবু মাথার গুঁতো খেয়ে ছেলেটা ছিটকে পড়ে, অন্য একটা ভেড়া সপাটে ঝেড়েছে অন্য একজনের হাঁটুতে। বাপ-রে বলে সেও ছিটকে পড়ে। লোকজন জুটে যায়।

ছেলেদুটোকে মারাত্মক আঘাতসহ হাসপাতালে পাঠানো হলো। একটার নাকি কিডনিই ফেটে গেছে, সে মারা যায়। অন্যজন এর হাঁটু ভেঙে যায়। লোক জানে ভেড়ার আঘাত এমন দুর্ঘটনা হয়। ওরা এটাকে নেহাত দুর্ঘটনা বলেই মেনে নেয়। কিন্তু ওই বিদ্রোহী ভেড়া ছাগলরা বেশ বুঝেছে প্রাথমিক লড়াইয়ে তারা জিতেছে। মানুষ নামক জীবদের সহজেই আঘাত করা যায়। এটা জেনেছে তারা।

ফলে তাদের সাহসও বেড়েছে আর এর মধ্যে সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করে তুলেছে তারা। বৃহত্তর প্রতিরোধের জন্য। তারা এবার মাঠে ঘোরার সময় সমবেত হয়, মিটিং করে। মানুষ নামের জীবদের দেখাদেখি তারাও এবার নিজেদের ভাষায় দাড়ি নেড়ে শিং উঁচিয়ে ভাষণ দেয়। সমবেত ছাগল ভেড়ার দলও সমর্থন করে তাদের, শিং নেড়ে মৃদু শব্দ করে।

ফিস্তী ধর্মপাল পূজা সমিতি এবার মহাধূমধাম করে, পূজা করার বাজেট করছে। জুয়ার ছক বসায়, তারা এবার মেলার একশো পঁচিশ বছর পূর্তির বিশাল উৎসবের জন্য লাখ খানেক টাকা দেবে।

এবার বলি হবে হাজার আড়াই জীব। এখন থেকে পাঁঠা ভেড়ার বাজার দর দ্বিগুণ থেকে তিনগুণ। এবার এই বলির রক্তমেখে তরুণ ক্লাব নাকি ব্যাণ্ড সহযোগে টুইষ্টনাচ নেচে গ্রাম প্রদক্ষিণ করবে। প্রতিবার তারা বলির রক্ত মেখে ধর্মপালতলাতে নাচে। সারা গ্রামের প্রতি ঘরে ঘরে পনেরো বিশ কেজি ওজনের পাঁঠা ভেড়া বলি দেওয়া। পথ ঘাট রক্তে ভরে ওঠে। গ্রামের লোকজন তাদের দূরের আত্মীয়দের মাংস খাবার আমন্ত্রণ জানায়। ঘরে আনে তাদের।

এবার তার ডাবল মাংস হবে। তাই নিমন্ত্রিতও হবে প্রতি ঘরে ঘরে অনেক।

সর্দার পাঁঠা-ভেড়ারা দেখে উৎসবের দিন যত কাছে আসছে। ততই তাদের প্রিয়জনকে হারাতে হচ্ছে। ওরা বাধা দিতে পারেনা মানুষদের সঙ্গে। দেখতে দেখতে প্রায় খামার ফাঁকা। শুধু বেশ কিছু বড় প্রধান পাঁঠা আর ভেড়াদের আর মাদী ছাগল-ভেড়াদেরই রাখে ভবিষ্যত বংশবৃদ্ধি করার জন্য। বাকী তাদের মধ্যে তরুণ কিশোর পাঠা ভেড়াদের জোর করে তুলে নিয়ে গেছে বলিদান করার জন্য। সর্দার পাঁঠা ভেড়াগুলো নিজেদের কেমন অসহায় বোধ করে। ওই অসহায় বড় পাঁঠা আর ভেড়ারা দেখে মানুষ নামক জন্তুরা সত্যিই তাদের থেকে অনেক বলশালী।

এবার উৎসব শুরু হয়েছে খুব ধুমধাম করে। বিরাট মেলা বসেছে—সার্কাস এসেছে। দোকান পসার যাত্রার আসরও বসেছে। আর শুরু হয়েছে ভক্তদের পাঁঠা ভেড়া নিয়ে দলে দলে আসা। বৈশাখ মাস। চারিদিকে নিঃস্ব রোদের খর তাপে মাটি তেতে উঠেছে। ধর্মপাল তলায় তখন হাজার হাজার পাঁঠা-ভেড়াকে হাজির করা হচ্ছে। হাজার দুতিন পশুকে পাইকারী হারে খুশী মনে মন্ত্রপাঠ করছে নোটন চক্কোত্তী। সঙ্গে পাঁচসাতজন সহকারীও রয়েছে। এত প্রাণীকে মন্ত্র পড়াবার সময় নেই মাইকে মন্ত্র পড়ানো হচ্ছে। নোটন ফোকলা দাঁত নিয়ে অং বং করে মন্ত্র পড়ছে মাইকে। একটা যেন কাওয়ালীর আওয়াজ উঠছে, তার সঙ্গে মিশেছে হাজার অসহায় প্রাণীর অন্তিম আর্তনাদ। নোটনের সহকারীরা ফুল বেলপাতা ছড়াচ্ছে ওই ভিজে কম্পমান আতঙ্কিত প্রাণীদের গায়ে।

এইভাবে চলতে থাকে। এইবার বলিদান শুরু হবে। দশটা হাঁড়ি কাঠে দশজন হন্তারক খাঁড়া নিয়ে তৈরী। সমবেত শব্দে মানুষেরা এবার আওয়াজ তোলে,— জয় বাবা ধর্মপাল।

ওদিকে নীলকুঠির মাঠের জঙ্গলে তখন চোলাই মদের কারবার জোর চলছে। টাঙ্কি টাঙ্কি চোলাই মদ তৈরী চলেছে শ্যাম দত্তর কোম্পানী। বোতল বোতল মদ গিলছে অনেকে এর মধ্যে। ওই বয়স্ক পাঁঠা-ভেড়া ক-টা দূরে দাঁড়িয়ে দেখছে তাদের বংশধর জাত ভাইদের খুন করে মাংস খাবার জন্য যেন শত শত হায়নার মত রক্তলোভী মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। বলি শুরু হবে, ওদিকে সেই ক্লাবের ছেলেরাও তাসা পার্টি নিয়ে তৈরী। বলি শুরু হলে তারা ওই বলির রক্ত মেখে নাচ শুরু করবে।

এদিকে ক-টা মাতাল দেখছে ওই বয়স্ক পাঠা-ভেড়াগুলোকে বাড়ুয্যের খামার ম্যানেজার বাঁচিয়ে রেখেছে বংশবৃদ্ধির জন্য। মাতালদের দু-একজন বলে—এ্যাই মাংসের রোষ্ট খেয়েছিস কখনও মানে ঝলসানো মাংস, ঝলসানো মাংস দারুন খেতে, সাহেবরা খায়।

অন্য মাতালটা বলে— তা পাবি কোথায়? মাতাল বলে,—ওইতো ক-টা বিশাল পাঁঠা ভেড়া রয়েছে, ওদেরই রোষ্ট করছি। জ্যান্ত রোষ্ট, দেখবি—

লোকটা তার সঙ্গীকে নিয়ে একবালতি মদ ওই চার পাঁচটা বড় বড় পাঁঠা—ভেড়ার গায়ে ছিটিয়ে দেয়।

ছাগল ভেড়াগুলো অবাক হয়। সারা গায়ে মদ, দাড়ি রোম মদে ভিজে গেছে, আর পরক্ষণেই মাতালটা ও তার সঙ্গীরা পরপর কয়েকটা দেশলাই কাঠি জ্বেলে ফেলে দেয় ওই পাঁঠা-ভেড়াদের গায়ে।

ব্যস দপ করে জ্বলে ওঠে তারা। লোম দাড়ি জ্বলছে। ভেড়ার লোম ও কেন ভালোই জ্বলে ওঠে। জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ডের মতো আতঙ্কিত পাঁঠা ভেড়াগুলো প্রাণ ভয়ে ছুটলো গ্রামের দিকে। হৈচৈ করে ওঠে সকলে, এই যেন নতুন মজা। জ্বলন্ত অগ্নিশিখাগুলো এবার কাতর আর্তনাদ করে গ্রামে ঢুকে পড়েছে।

ওদিকে মদের বড় বড় ট্যাঙ্কে মদ রাখা আছে বালতি চুবিয়ে মদ তোলা হচ্ছিল। একটা জ্বলন্ত ভেড়া কি করে ওই দিকে ছুটে যেতে মদে পড়ে ওর গা থেকে জ্বলন্ত রোম পোড়া একেবারে স্পিরিট এর উপর পড়ে। আগুনের উপর পড়তেই ট্যাঙ্কটা দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে। আর দুরন্ত শব্দে প্রচণ্ড আওয়াজ তুলে বিস্ফোরণ ঘটে যায়। জ্বলন্ত স্পিরিট আর ট্যাঙ্কের টুকরো বোমার মতো ছুটে যায়। ওদিকে সেই আগুন লেগেছে আর একটা ট্যাঙ্কে। চারিদিকে উৎক্ষিপ্ত হয় জ্বলন্ত মদ। চট খড়ের ছাউনি দেওয়া গুদামে পড়ে তারপর দাউদাউ করে আগুন জ্বলতে থাকে মেলায়। আর ছুটছে ট্যাঙ্কের টুকরো, জ্বলন্ত মদ তাতে পুড়ছে বহুমানুষ আর্তনাদ করে ওঠে।

ওদিকে বাকী পাঁঠা আর ভেড়া কয়েকটা জ্বলন্ত দেহ নিয়ে গ্রামে ঢুকেছে। সারা গ্রাম তখন মেলায় বলিদানের উৎসব দেখতে গেছে। গ্রামের ঘরে রয়েছে কিছু বুড়ো বুড়ি আর কচি কাচা বাচ্চা।

ওই জ্বলন্ত দেহ নিয়ে ছাগল ভেড়াগুলো যেখানে খড় পালুই ধানের গোলা, কারো খামারে ঢুকেছে। বৈশাখ মাস রোদের তাতে সব তেতে ফান হয়ে রয়েছে। ডোবা ছোট পুকুরে কোথাও এতটুকু জল নেই। এবার খড় পালুই-ধানের গোলা খড়ের গাদা ওদের দেহের আগুনের স্পর্শে দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে।

বিশাল গ্রাম, জায়গায় জায়গায় খড়ের বাড়ি। খড়ের পালুই সব এখন ধূ ধূ করে জ্বলছে। সেখানে থেকে আগুন লেগেছে খড়ের চালে জল নেই। নেভানোর লোকজনও মেলায়। ফলে আগুনও বিনা বাধায় এচাল থেকে ওচাল এপাড়া থেকে ওপাড়ায় ছড়িয়ে পড়ে সারা গ্রাম জ্বলছে—ওদিকে জ্বলছে মেলাও। আহত হয়েছে অনেক, বিস্ফোরণে ক'জন নাকি মারাও গেছে। ভীত ত্রস্ত লোকজন দেখে গ্রামকে গ্রাম জ্বলছে। এবার বলিদান রইল পড়ে, দৌড়লো সকলে নিজের ঘরে গ্রাম বাঁচাতে। মেলা ভস্মীভূত, চারিদিকে আর্তনাদ আর কান্নার শব্দ। বলির পাঁঠা রইল পড়ে। ওরা গ্রাম বাঁচাতে প্রাণ বাঁচাতে দৌড়ালো।

ছাগল ভেড়াগুলোও এবার মুক্তি পেয়ে, তারাও মাঠ জঙ্গল পার হয়ে উধাও হয়ে গেল। জ্বলন্ত ধ্বংসস্তুপে পরিণত হল মেলা। আর ফিঙ্গী গ্রামকেও বাঁচানো যায়নি। খড়ের ঘর খড়ের পালুই ধানের গোলা সর্বস্ব পুড়ে ছাই। গ্রামে মাত্র কয়েকটা পাকা বাড়ি সেগুলো পুড়ে ঝলসে ফেটে ফুটে কোনমতে টিকেছিল। বাকী অর্দ্ধেক গ্রাম শেষ।

সে সব আজ কয়েক বছর আগেকার কথা। এখনও অবশ্য নতুন প্রজন্ম ধর্মপালের উৎসব করে। তবে ওই ঘটনার পর থেকে পশুমেধ যজ্ঞ আর মাংস খাবার উৎসব আর হয় না।

এখন পূজা হয় বেশ নিষ্ঠার সঙ্গে। পশুবলি ওই ঘটনার পর থেকে বন্ধ হয়ে গেছে ফিঙ্গীতে।

এখন বলি অবশ্য হয়, তা আখ, চালকুমড়ো ইত্যাদি।

ওই ঘটনার পর পশুপালন খামার এর অনেক টাকার তছরূপ ধরা পড়ে। পশু খামারও বন্ধ হয়ে গেছে। আর মদের কারবারী শ্যাম দত্ত সেদিনের মদ-এর ট্যাঙ্ক বিস্ফোরণে মারা যায়।

নোটন চক্কোত্তী টিকে-আছে, তবে কোন ধাবমান এক বলির ভেড়ার আক্রমণে তার একটা পা নড়বড়ে হয়ে গেছে। এখন লাঠিতে ভর করে লেঙড়ে লেঙড়ে চলে। দাঁতও আর নেই। সুতরাং মাংস খাবার সাধ থাকলেও সাধ্য আর নেই।

দুঃসময়

কলেজের ছাত্রদের ধর্মঘট শুরু হয়েছে। অবশ্য কারণটা তুচ্ছই, তবু কলেজের কিছু ছেলে বিকাশের নেতৃত্বে তাদের দাপট আর মস্তানি দেখাবার জন্য এই ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে। অন্য ছেলেরা ভয়ে, একদিকে বাধ্য হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মেয়েরাও ক্লাসে যেতে ভয় পায়। ওরা বীরদর্পে স্লোগান দিচ্ছে, —কমনরুমে পাখা চাই—ইত্যাদি।

এমন সময় দেখা যায় মানসীকে, সে এগিয়ে আসে। বিরক্ত হয় ওদের স্লোগান শুনে, ছেলেরা এতে বাধা দিতে চায়। মানসী রুখে ওঠে। ওদিকে দাঁড়ানো ভীত ছেলেমেয়েদের বলে,— আমি ক্লাসে যাচ্ছি যাবোই, তোমরা যদি যেতে চাও এসো। মানসী গটগট করে এগিয়ে যায়, বাধা দিতে আসে বিকাশ, মানসী ওর গালেই একটা চড় মেরে গর্জে ওঠে— নিজের ভবিষ্যৎ ঝরঝরে করছো, করো— ওদের ক্ষতি করবে কেন? কলেজে পড়তে এসেছো না নেতাগিরি করতে এসেছো?

— গেলে ভালো হবে না। বিকাশ বাধা দিতে চায়।

— সরে যাও, নাহলে—মানসীও রুখে ওঠে।

— না হলে? বিকাশ গর্জে ওঠে। আর সেই সঙ্গে ওর গালে এসে পড়ে মানসীর একটা অতর্কিত চড়। একেবারে ঘাবড়ে যায় বিকাশ, সরে গেছে। সেই অবসরে মানসী ঢুকে পড়ে কলেজে ওদের সবকিছু ব্যূহ ভেদ করে আর তার পিছু পিছু ঢুকে যায় ছেলেমেয়েরাও। বিকাশ এর সব প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে যায়।

এবার ভীষণভাবে বিকাশ গর্জে ওঠে,— এতো বড় হিম্মৎ। বিকাশের চ্যালা বলে,—মানসীর হিম্মৎ আছে গুরু।

—শোন! ওর জবাবই দেব এবার।

কলেজে পড়ছে মানসী—ক্লাস চলে ঠিক মতনই। অধ্যাপক ইতিহাসের ঝাঁশির রানীর অধ্যায় পড়াচ্ছেন। বলেন মেয়েদের বীরত্বের কথা।

বৈকাল বেলা। মানসী ফিরছে। পথটা নির্জন। সন্ধের মুখোমুখি সময়। হঠাৎ এই নির্জন পথে অপেক্ষা করছিল বিকাশ চ্যালাদের নিয়ে। অন্যদিন মানসী গাড়ীতে ফেরে। কে এসে খবর দেয়, —আজ মানসীর গাড়ি আসেনি বাড়ি থেকে। হেঁটেই ফিরছে বাগানের পথে।

বিকাশ বলে। চল দেখা যাক।

মানসীও ভাবেনি যে আজ গাড়ী আসবে না। একাই ফিরছে সে ওই পথে। হঠাৎ বিকাশদের অপেক্ষা করতে দেখে অবাক হয়। চারদিক নির্জন। বিকাশ বলে, জবাবটা এবার দিচ্ছি।

ওরা মানসীকে আক্রমণ করে। মানসী বিপন্ন, অসহায়। এমন সময় ওই পথে সাইকেল নিয়ে আসছে একটি তরুণ। হঠাৎ ওদের ধস্তাধস্তি, মহিলা কণ্ঠের প্রতিবাদ, এদের উন্মাদ হাসির শব্দে এগিয়ে গিয়ে দৃশ্যটা দেখে, একটি মেয়েও ওপর এরা চরম অত্যাচার করতে চায়। এবার প্রদীপ ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। আর প্রদীপের একার প্রহারে এরাও বিপন্ন বিকাশও আহত। একাই মেয়েটিকে বাঁচায় প্রদীপ।

মানসী দেখছে প্রদীপকে। প্রদীপ বলে,ওই বাদরগুলোর সঙ্গে কলেজে আজ কি গোলমাল হয়েছিল শুনেছি।

—কলেজ থেকে এবার পাস করে বেরিয়ে গেল তোমাদের ব্যাচ। এখন এই জানোয়ারের দলই কলেজে দাপাচ্ছে প্রদীপবাবু। প্রদীপ বলে, এ যুগের ওই ধর্ম! চলো, পৌছে দিই। কোনদিকে বাড়ি যেন?

মানসী বলে, একাই যেতে পারবো। ওরা আর কিছু করার সাহস পাবে না।

চলে যায় মানসী।

প্রদীপের বাড়িতে আরেকজন বলতে তার মা আর কাজের লোক হরিদা। হরিদাই এখন প্রদীপের গার্জেন। কানে কম শোনে। চা দিতে বল্লে নিয়ে আসে মোচার কথা।

মা বলে, কানে যন্তর নে। কাজ করবি কি করে?

হরি বলে, কাজের লোক আনো মা, প্রদীপের বিয়ে দাও।

প্রদীপ বলে, তাহলেই তোমার কান ভালো হবে?

— তোর মেজাজ ঠাণ্ডা হবে! কাজকর্মে মন দিবি। চাকরী করছিস এবার বিয়ে থা কর। মা কি চিরকালই খাটবে?

মা মালতী দেবীও বলেন, তাই বল।

প্রদীপ চাকরীও পেয়েছে ভালো নতুন একটা ফার্মে। মানসীর সঙ্গে দেখা হয়ে যায় সেদিন। কলেজে এককালে ভালো ছাত্র ছিল প্রদীপ। গানও গায় ভালো। বাড়িতে এখন গানের চর্চা করে। তার মুগ্ধ শ্রোতা ওই হরিদা। হরিদা তন্ময় হয়ে মাথা নাড়ে, আঃ দারুণ।

প্রদীপ বলে, কানে শোন না-গান শোন কি করে?

— শুনি সব শুনতে পাই রে।

প্রদীপ লাইব্রেরীতে এসে দেখে মানসীকে। সেই ঘটনার পর থেকেই প্রদীপের মনে মানসীর কথাটা বার বার এসেছে। কিন্তু তার ঠিকানা জানে না, কলেজে দেখেছিল মাত্র। তবু মনে পড়ে মানসীর কথা।

হঠাৎ বই-এর র‍্যাকের থেকে একটা বই বের করছে সেই বই -এর শূণ্য র‍্যাকের ওদিকেই ফুটে ওঠে মানসীর মুখটা।

—তুমি!

মানসীও এগিয়ে আসে। মানসীই বলে, তারপর আর দেখাই নেই! ভুলেই গেলে তো!

ওর কণ্ঠস্বরে একজন ভারিক্কী পড়ুয়া চাইল বিরক্ত হয়ে। ওরা যেন মুক্তির স্বাদ পেতেই বের হয়ে দু'জনে গঙ্গার ধারে নির্জন ঠাঁই-এ বসে। সূর্য অস্ত যাচ্ছে গঙ্গার বুকে। দিন শেষের বিদায় বিধুর আরক্তিম সন্ধ্যায় যেন দু'জনে দু'জনের মধ্যে খুঁজে পায়।

প্রদীপ আজ এক নতুন স্বপ্ন দেখে।

স্বপ্ন দেখে মানসীও। তার সমাজে দেখছে ভবেনকে। আরও অনেককে। মানসীর বাবা মিঃ অনিমেষ বোস শিল্পপতি। নিজের বিরাট ব্যবসা, কারখানা। মিঃ বোস বেশ জেদী, কঠিন প্রকৃতির মানুষ।

ভবেন ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে মিঃ বোসের কারখানাতে ম্যানেজার। তরুণ ভবেন এখানে যোগ দিয়েই মালিক মিঃ বোসকে খুশী করার কাজে লেগে যায়। ছেলেটা কাজ করে তার নিজের কেরিয়ার সম্বন্ধে খুবই সচেতন। তার লক্ষ্য চাকরী নয়, সে স্বপ্ন দেখে একদিন নিজেই মালিক হবে। তাই মিঃ বোসকে খুশী করে তার নজরে পড়তে চায়। আর সেই কাজে কিছুটা সফলও হয়েছে ভবেন।

ক্রমশঃ মিঃ বোসের বাড়িতেও আসে। ফ্যাক্টরীর এক্সটেনশন, নতুন প্ল্যান্ট বসিয়ে দু'নম্বর ফ্যক্টরী চালু করতে চান মিঃ বোস।

ভবেনও বলে— ওসব আমি করে দেব স্যার।

মিঃ বোসও ক্রমশ ভবেনকে বিশ্বাস করতে শুরু করেন। বাড়িতে আসলে মিঃ বোসই পরিচয় করিয়ে দেন মানসীর সঙ্গে ভবেনের। মিঃ বোসের একমাত্র মেয়ে। ভবেনও বেশ হিসাব করে চলে। তাকে তার ভবিষ্যৎ গড়তে হবে। তাই সে বুঝেছে মানসীকে হাতে আনতে পারলে সহজেই পুরো রাজত্ব আর রাজকন্যা হাতে পাবে সে।

মিঃ বোসও কথাটা ভাবেন। ভবেনের মত ছেলেকে পেলে তার ব্যবসারও সুবিধা হবে। তাই

পার্টিতে ও ভবেনকেই পাঠান। মানসীকেও বলেন মিঃ বোস এবার তোকেই পাশ করে ব্যবসাপত্র দেখতে হবে। তুইও ক্লাবে পার্টিতে যা। সমাজে মেলামেশা কর।

মানসী দেখছে এই অর্থবানদের সমাজকে। দেখছে এই সমাজের বৌ-মেয়েদের। টাকা আছে তাদের, তাই মদও খায় ক্লাবে আর পুরুষদের সঙ্গে মেলামেশাতেও তারা বেশ উদার-উচ্ছৃঙ্খল। মানসীও দেখছে ভবেনকে।

ক্রমশঃ যেন তার কাছে একটু বেশীই ঘনিষ্ঠ হতে চায়। মানসী ক্লাবে ওই পান ভোজনের হল্লাটুকু মেনে নিতে পারে না। তাই বিরক্ত বোধ করে। ওদের বেলেল্লাপনাকে আধুনিক বলে মেনে নিতেও তার রুচিতে বাধে।

তাই এড়াতে চায় ভবেনকে।

ভবেনও সেটা বুঝে যেন আরও মরিয়া হয়ে ওঠে মানসীকে একান্তে পাবার জন্য।

মানসী আজ প্রদীপকেও দেখছে। শান্ত-সামান্য নিয়ে তৃপ্ত, আরও মুগ্ধ হয় তার গানে।

সেদিন কোন অনুষ্ঠানে গাইছে প্রদীপ। সেখানকার কর্মকর্তারা ভবেনকেও নিমন্ত্রণ করেছে। মিঃ বোস বলেন— সমাজে মেলামেশা কর মানসী মা। ভবেন বলে, চলো।

মানসী ইচ্ছার বিরুদ্ধেই এসেছে। এখানে যখন এসেছে তখন মঞ্চে গাইছে প্রদীপ। অবাক হয় মানসী। ওই গানে যেন সুরের ইন্দ্রধনু জেগে ওঠে তার মনে। ভবেনের অবশ্য ভালো লাগে না। বলে, এই রবীন্দ্রসঙ্গীত যেন এযুগে অচল। চাই দ্রুত তাল, লয় শারীরিক রক্ত গরম করে দেবে, তা নয়—

প্রদীপ গাইছে— আজি কি পাইনি হিসাব মিলাতে মন মোর নহে রাজি ভালবেসে ছিনু এই ধরণীরে—।

গান শেষ হতে ভবেন দেখে মানসী নেই। খুঁজছে তাকে। মানসী উঠে গেছে প্রদীপের সন্ধানে। ওদিকের বাগানে প্রদীপকে পেয়ে এগিয়ে যায়। প্রদীপও অবাক হয়।

—তুমি।

মানসী বলে, এমন সুন্দর গাও বলোনিতো? আমি কি এতই দূরের মানুষ তোমার কাছে?

হাসে প্রদীপ, —যাক আমার গান গাওয়া আজ সার্থক হয়েছে। তোমাকে খুশী করতে পেরেছি।

—কবে একান্তে গান শোনাবে?

প্রদীপ বলে,—শুনবে? তাহলে—

এসে পড়ে ভবেন। সে অবাক হয়। দেখে মানসী যেন খুশিতে ফেটে পড়ছে ওই প্রদীপের সামনে। ভবনের ব্যাপারটা কেমন ভালো লাগে না।

প্রদীপ চলে যায় কোন বন্ধুর ডাকে।

মানসী ফিরে আসে গাড়ীতে। ভবেনও যায়।

— ওই গাইয়েটাকে চেনো নাকি?

—দারুণ গান ভদ্রলোক। মানসী উচ্ছ্বসিত স্বরে বলে।

ভবেন বলে, অল বোগাস! ফালতু একটা গাইয়ে,—বাজে!

মানসী দেখে ওই ভবেনকে। বলে, টাকা আর প্রতিষ্ঠা না থাকলে তাদের কোনও দামই নাই, না?

—টাকাই সমাজের স্ট্যাটাসের মাপকাঠি ম্যাডাম।

—আপনার কাছে। মানসী কঠিন কণ্ঠে জবাব দেয়।

মানসীর মনে প্রদীপের সেই গানটা ভেসে আছে। জীবনের হিসাব মেলানো যায় না। টাকা প্রতিষ্ঠা ছাড়াও মানুষের পাবার কিছু আছে।

তাই প্রদীপের ওখানেই আসে। হরিদা, মালতীও খুশী হয়। প্রদীপও। মানসী দেখেছে তাদের সংসারে মা নেই। মাকে মনে পড়ে না। বাবাও দিনরাত টাকা আর ব্যবসার পিছনে ব্যস্ত। দেখেছে সংসারের ভার চাকর-বাকরদের ওপর। তার ওপর ভবেন আসে— এখন সেই যেন ক্রমশ বাবার

প্রশ্রয় পেয়ে মানসীর ওপর গার্জেনী করে।

এখানে এক সুন্দর সহজ পরিবেশ। মায়ের স্নেহ সে পায়নি। মালতী যেন মানসীর মায়ের সেই অভাবটাকে দূর করেছে।

ওদের দেশের বাড়িতে যেতে হয় প্রদীপকে মাঝে মাঝে। মানসীই বলে— চলো, তোমার সঙ্গে গ্রামেই ঘুরে আসি।

— সেকি! মাটির রাস্তা-পাড়াগাঁ।

— হোক! মানসীও যাবে এই রবিবারে ওর সঙ্গে।

ওদিন ভবেনের নাকি জন্মদিন পার্টি—যেতেই হবে মানসীকে। মিঃ বোসও যাবেন। ওখান থেকেই শহরের বাইরে ওদের কারখানাতেও যাবেন। ভবেন বলে মানসীও যাবে কিন্তু।

মানসী বিপদে পড়ে। মিঃ বোস বলেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই যাবে মানসী।

ভবেন সেদিন অপেক্ষা করছে মানসীর জন্য, পার্টি জমে উঠেছে। পানাহার চলেছে। মানসীর দেখা নেই। বন্ধুরাও ভবেনকে বলে, তোমার মানসী কই হে ব্রাদার?

— কি বলে একেবারে বড়গাছে ডেরা বেধেছো ব্রাদার? রাজকন্যা উইথ ফুল রাজত্ব! চালাও—

বলে, রাজকন্যা কেটে পড়ে নি তো? নাহলে জন্মদিনে হবু হাজব্যান্ডকে শুভেচ্ছা জানাতে এল না?

ভবেন শুনছে কথাগুলো। মিঃ বোসও এসেছেন। তিনিও মানসীকে এখানে না দেখে অবাক হন।

— তাহলে মানসী গেল কোথায়? এখানে আসতে বললাম-আমার কথার গুরুত্ব দিল না! স্ট্রেঞ্জ!

মিঃ বোসের মোবাইল ফোনটা বেজে ওঠে। কারখানার একটা ব্রেকডাউন হয়েছে এখুনি যেতে হবে।

মিঃ বোস ও ভবেন তখুনি বের হয়ে যায়। ওই কারখানা শহর থেকে বেশ কিছুটা দূরে গ্রামাঞ্চলে।

মানসী ওই পার্টিতে যায়নি। সে এসেছে প্রদীপের সঙ্গে তাদের গ্রামে। গ্রামে ধান মাঠ-মুক্ত সবুজ জগতে সে আজ কি তৃপ্তি খুঁজে পায়, শহরের ওই প্রাচুর্য আর বিকৃতির জীবন থেকে সে এখানে এসে আজ প্রদীপকে নতুন করে চেনে। আজ সেও এমনি নির্জন সবুজে একজনকে নিয়ে ঘর বেঁধে সামান্য নিয়েই সুখী হতে চায়।

তাই যেন মনে সুর ওঠে। প্রদীপও স্বপ্ন দেখে। গ্রামের পাশ দিয়ে হাইওয়ে গেছে। ওই পথে গাড়ী চলেছেন মিঃ বোস ভবেনকে নিয়ে। ভবেনও আজ হতাশ হয়েছে। মিঃ বোসেরও যেন মন মেজাজ ভালো নেই। কে জানে, কি মেজর ব্রেকডাউন হলো, প্রোডাকশনই বন্ধ না হয়ে যায়।

হঠাৎ এমনি সময় পথের ধারে বাগানে কাদের গানের সুর শুনে চাইল ভবেন। ওই সুর সে চেনে-সেদিনের ফাংশনে ওই গলার গানই শুনেছিল। গাড়ী একটু স্লো করতেই মিঃ বোস শুধোন—কি হলো?

ভবেন আগেই দেখছে। আর এই পল্লীগ্রামের নির্জনে মানসীকে সেই গাইয়ে ছেলেটির সঙ্গে মসগুল হয়ে ঘুরতে দেখে অবাক হয়। মানসী যে এতদূর এগিয়েছে তা স্বপ্নেও ভবেন ভাবেনি। আর মিঃ বোসও মানসীকে এখানে একটি অপরিচিত সাধারণ ছেলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে দেখে চমকে ওঠেন।

— একি মানসী! তোমার পার্টিতে না গিয়ে এখানে ওই একটা মোস্ট অর্ডিনারি ছেলের সঙ্গে? চেন ওটাকে?

ভবেন বলে, গান টান গেয়ে বেড়ায়। দেখছিলাম একদিন একটা অনুষ্ঠানে মানসী ও কথা বলেছিল ওর সঙ্গে।

—হুম। মিঃ বোসের মুখটা গম্ভীর হয়ে ওঠে। রেগে গেলে তিনি কথা বলেন না, গুম হয়ে যান। শুধু বলেন, চলো। আর ছেলেটার খোঁজ নাও তো।

অর্থাৎ বিহিতটা তাকে এমনিতেই নয়, বেশ ভেবেচিন্তেই করতে হবে।

মিঃ বোস সব বিপদের বিনাশ অঙ্কুরেই করতে চান। তাই তিনি এবার সিদ্ধান্তই নিতে চান। আর

ইদানীং মানসীও যেন কেমন বদলে গেছে। কলেজের পরীক্ষা হয়ে গেছে। তিনি ওকে অফিসে বের হতে বলেন। মানসী বলে, বাবা সবেতো পরীক্ষা চুকলো। এতদিন কলেজের যোয়ালেই বাঁধা ছিলাম, এবার একটু ফ্রি হতে দাও।

সেদিন বাবার কথাটার গুরুত্বই দেয়নি। বাড়ি থেকে যখন তখন বের হয়ে যায়। সে খবর বাড়ির সরকারই সাহেবকে দেয়। সেদিন মিঃ বোসের হুকুমে ওই পার্টিতে না গিয়ে অজপাড়াগায়ের একটা ছেলের সঙ্গে বেরিয়ে গেছে শহর থেকে, এসব ব্যাপার মূলেই বিনাশ করতে চান। তাই স্থির করেছেন মিঃ বোস এবার ভবেনের সঙ্গেই বিয়েটা দিয়ে ভবেনকে ওই নতুন কারখানার ভার দেবেন আর মানসীকে অফিসের কাজেই লাগাবেন। তার ছেলে নেই; যে সাম্রাজ্য তিনি নিজে গড়েছেন। সেসব দেখাশোনা করবে ওই মানসী আর ভবেনই।

মানসী এসব খবর জানে না। সে এখন স্বপ্ন দেখছে প্রদীপকে ঘিরে। ওই শান্ত পরিবেশ, সবুজ গ্রাম—প্রদীপ তার মনে একটা ঠাঁই করে নিয়েছে।

প্রদীপও স্বপ্ন দেখে মানসীকে ঘিরে। দু'টি মন আজ এক সুরে মিশে গেছে অন্তরে বাইরে।

সেদিন ভবেনই বাড়ির বাগানে মানসীকে একা দেখে এগিয়ে আসে। শুধায়—সেদিন জন্মদিন পার্টিতে গেলে না?

মানসী বলে, জরুরী কাজ ছিল।

হ্যাঁ। দূর গ্রামে গিয়ে একট গাইয়া ভূতের সঙ্গে গান গাইছিলে।

চমকে ওঠে মানসী। ভবেন তাহলে তার পিছনে চর লাগিয়েছে। মানসী রেগে ওঠে। বলে, আপনি বাবার কারখানায় কাজ করেন, তাই বলে আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলাবার কোন অধিকার আপনার নেই।

ভবেন জানতো বড়লোকের মেয়ের মেজাজ। এমনি একটা উত্তরই পাবে তা জানতো সে। একদিন ভবেনও ভাগ্যের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠবেই, তার একটা সিঁড়ি ওই মানসী। মিঃ বোস তাকে এমনি আভাস দিয়েছেন। ভবেনও খুশী হয়েই মত দিয়েছে মিঃ বোসকে। তাই মানসীর জবাবে বলে, আজ অবশ্য কৈফিয়ৎ চাওয়ার কোনও অধিকার আমার নেই। কিন্তু একদিন সে অধিকার আমি পেতেও পারি। তাই—

চমকে ওঠে মানসী— হোয়াট। কি বললেন? আমাকে শাসন করার অধিকার পাবেন আপনি? রাবিশ। ননসেন্স।

মানসী রেগে চলে যায় ভিতরে। ওই লোভী মানুষটা বাবার বিশ্বাস অর্জন করেছে কৌশলে, এবার তাকেও অপমান করতে চায়। ওর গালে একটা চড় কষাতে পারলে খুশী হতো মানসী। লোভী ইতরদের মানসী ওই ভাবেই শাসন করতে চায়। ফের ওই সব কথা বললে মানসী ওই ভাবেই জবাব দেবে ভবেনকে। রাগে ফুসছে মানসী।

সেই আগুনে যেন ঘি পড়েছে। মিঃ বোস সে রাতেই মানসীকে তার মতামত জানায়। এও জানান যে তিনি এবার মানসীকে বিয়ে দিয়ে মুক্ত হতে চান। আর পাত্র তিনিই ঠিক করেছেন। তাদের কথাও দিয়েছেন।

মানসী অবাক হয় বাবার কথায়। বলে সে,—আমাকে জিজ্ঞাসা না করেই তাদের কথাও দিয়ে দিলে, আর যে বিয়েটা করবে তার কথাটা শোনার দরকারও বোধ করলে না?

মিঃ বোস কঠিন জেদী প্রকৃতির মানুষ। নিজের ব্যক্তিত্বের উপর তার দৃঢ় বিশ্বাস। তাই কেউ তার কোন কাজের কৈফিয়ৎ চাইলে তিনি তাকে ক্ষমা করেন না।

মিঃ বোস বলেন, তোমাকে কি কৈফিয়ৎ দিতে হবে? হাউ ডেয়ার ইউ সে সো? দেখছি কিছুদিন থেকেই তুমি বাড়াবাড়ি শুরু করেছো। আমি ওসব পছন্দ করি না। চাই বিয়ে থা করে ব্যবসাপত্র দ্যাখো। আর ভবেনকেই আমি পছন্দ করেছি। তার সঙ্গেই বিয়ে দিতে মনস্থ করেছি।

চমকে ওঠে মানসী। এবার বুঝেছে সে ভবেন কেন ওই কথা বলেছিল। এসব তারই ষড়যন্ত্র।

লোভী মানুষটাকে বাবা চিনতে পারেনি। মানসী চিনেছে। মানসী বলে, ও কাজের চেয়ে অকাজের লোক। লোভী কেরিয়ারিস্ট। আজ আমাকে বিয়ে করে সে সবকিছু দখল করতে চায়। তার জালে পা দিও না বাবা।

মিঃ বোস তার সিদ্ধান্তে কেউ ভুল ধরুক তা চান না। সহ্যও করতে পারেন না। তাই বলে, ডোন্ট সে ননসেন্স। আমি মানুষ চিনি আর সিদ্ধান্ত নিতে ভুলও করি না। ওখানেই বিয়ে হবে।

— তা হতে পারে না বাবা। আমি আমার পছন্দমত ছেলেকেই বিয়ে করবো। আর আমি সেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি।

মিঃ বোস চমকে ওঠেন। রাগটা চড়ে গেলে তিনি চুপ করে যান। মেয়ের কথায় বুঝেছেন, মানসী একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তাকে এখুনিই তার থেকে সরানো যাবে না। কৌশলে সরাতে হবে। তাই বলেন, তাই নাকি! ছেলেটিকে তাহলে আনো। দেখাই যাক তাকে। আমার মেয়ে নিশ্চয়ই ভুল করবে না। তাকে নিয়ে এসো।

মানসী ভাবে বাবা তার মতের গুরুত্ব দিতে চান। তাই বলে, ঠিক আছে, আনবো তাকে। তোমার নিশ্চয়ই পছন্দ হবে। মানসীও খুশী হয়েছে। বাবা হয়তো মত দেবেন তার বিয়েতে।

কিন্তু ব্যাপারটা শুনে প্রদীপ চমকে ওঠে।

— তোমার ববার সামনে পরীক্ষা দিতে যেতে হবে?

হাসে মানসী—কিছু পেতে গেলে সাহসী হতে হয় মশাই। অনেক তো ভালোবাসো আমায় এটুকু করতে পারবে না? ভয় নেই আমি পাশেই থাকবো। বাবা মত দিলে ব্যাস!

প্রদীপ শুধায়— যদি মত না দেন?

প্রদীপও এখন মানসীকে ছেড়ে থাকতে পারবে না। তার স্বপ্নও অনেক। মানসী বলে, তখন আমি নিজেই সিদ্ধান্ত নেব। চলো কাল।

প্রদীপ এর আগে কোনদিন মানসীদের বাড়িতে আসেনি। শুনেছে বালিগঞ্জের দিকে ওদের বাড়ি। অবস্থাপন্ন ঘর। কিন্তু অবস্থাটা যে এত উঁচুতে অবস্থিত তা স্বপ্নেও ভাবেনি। বালিগঞ্জ গার্ডেনের ওদিকে পাঁচিল ঘেরা বিরাট বাড়ি, গেটে দারোয়ান, সামনে সাজানো বাগানে নানা ফুলের বাহার। মার্বেল পাথরে মোড়া মেঝে—বসার ঘরে একটা ব্রোঞ্জের মূর্তি। পিতলের টবে নানা গাছ। সোফাগুলোতে বসলে মানুষই যেন ডুবে যাবে। সিলিং থেকে ঝুলছে বেলজিয়াম গ্লাসের একটা ঝাড়বাতি।

এই বাড়ির মেয়ে মানসী। আর প্রদীপ ভাবতেই পারে না। মানসী বলে, কি হলো?

— না কিছু না। প্রদীপ যেন নিজেকে কেমন অসহায় বোধ করে।

মিঃ বোস দেখেছেন প্রদীপকে। তার সন্ধানী দৃষ্টিতে যা দেখার দেখে নিয়েছেন। জিজ্ঞাসা করেন, এখন কি করা হয়?

— ভ্যান গার্ড কোম্পানীতে চাকরী করি স্যার। অ্যাসিসটেন্ট অ্যাকাউন্ট্যান্ট।

মিঃ বোস এই কোম্পানীকে চেনেন, চেনেন তার কর্মকর্তাদের। ওরা প্রায়ই আসে মিঃ বোসের কাছে। তাদের কিছু যন্ত্রপাতি উনি কেনেন। এবার মিঃ বোস বললেন, আমার মেয়ে যেভাবে মানুষ যেভাবে সে থাকে সে তো তোমার রোজগার করা সম্ভব হবে না ইয়ংম্যান। সুতরাং—

মিঃ বোস উঠে ভেতরে চলে যান। যাবার আগে বলেন, এরপর আর এগোন যায় না। বাই—

চলে যান তিনি উপরে। মানসী দেখছে প্রদীপের বেদনাহত মুখটা। বাবা এভাবে বাড়িতে ডেকে এনে তার টাকার গরমে এমনি অপমান তাচ্ছিল্য করবেন তা ভাবে নি।

— বাবা! মানসী কি বলতে চায়।

মিঃ বোস ওর কণ্ঠস্বরে কানও দেন না। যেন এসব নিয়ে জবাব দিতে তার সম্মানে বাঁধে।

প্রদীপ বের হয়ে চলে আসে।

আবার মানসীই বাবাকে কি বলতে যায়। আর মিঃ বোস এর নীল রক্তে তুফান জাগে। বলেন তিনি—ওই গাইয়া রাস্কেলটার জন্য সেদিন আমাকেও অপমান করেছিলে। ভবেনের পার্টিতেও যাও

নি। আজ ওই ভিখিরিটাকে এখানে ডেকে এনেছো—কি ভেবেছো? আমি মত দেবো? নেভার। ভবেনের সঙ্গেই তোমার বিয়ে হবে— দিস ইজ মাই অর্ডার।

মানসীও আজ বাবার কথায় বলে আমি তোমার মাইনে করা কর্মচারী নই, যে অর্ডারই দেবে আর মুখ বুজে মানতে হবে।

—মানসী।

মানসী বলে, যেখানে এটুকু মর্যাদা নেই সেখানে থাকাও সম্ভব নয়। বের হয়ে যায় মানসী।

আজ সে তার সিদ্ধান্তই নিয়েছে। ওই ভবেনের মত মদ্যপ, লোভী একটা মানুষকে স্বীকার করে এই ঐশ্বর্য তার প্রয়োজন নেই। সে প্রদীপের সামান্যতেই খুশী হবে।

প্রদীপের মা মালতী দেবী, হরিদাও জানে যে প্রদীপ গেছে তার হবু শ্বশুরের কাছে। মালতীই বলেছিল, আমারও তো যাওয়া উচিৎ। হাজার হোক মানী লোক।

হরি বলে, তুমি ছেলের মা। তুমি যাবে কি! ওই হবু বেয়াইই আসবে দেখো।

মালতী বলে, তাহলে ভালো সন্দেশ টন্দেশ আন হরি। এতবড় লোক আসবেন। বসার ঘরটা একটু গোছ গাছ কর।

হরিও খুশী হয়ে সন্দেশ, ফুলদানির জন্য ফুল এনে ঘর সাজাচ্ছে, ঢুকছে প্রদীপ, অপমানিত, বিধ্বস্ত। মা'ত অবাক।

— কি হলো? তোর শ্বশুর এলেন না।

—বামন হয়ে চাঁদে হাত দিতে গেছলাম মা। ওই বিরাট বাড়ির মেয়ে মানসী তা জানতাম না। ওর বাবা বিরাট লোক।

—তাতে কি! মেয়েদের চিনিস না, মানসী অন্যধাতের মেয়ে রে! ওর মনটা বড় ভালো। তা কি বললো ওর বাবা?

— হরিদা ওসব ফেলে দাও। ঘর সাজাতে হবে না। তারা কেউ আসবে না। ভুল! মস্ত ভুলই করেছিলাম মা! এই বাড়িতে মানসী কে মানায় না, তার বাবাও তাই বলেছেন।

প্রদীপ নিজের ঘরে গিয়ে গুম হয়ে বসে।

মা-হরিদার সব খুশী হারিয়ে যায়। এ বাড়িতে আঁধার নামে। মায়ের মন কাঁদে ছেলের এই বেদনায়।

মা বলে, তবু মনে হয় ভুল তুই করিসনি প্রদীপ। মানসী বড়লোকের মেয়ে হতে পারে, কিন্তু ওর মত মেয়ে হয় না। সে তো তোর অবস্থা সব জানে।

— বড়লোকের খেয়াল মা, আমাকে নিয়ে একটা খেলাই করে গেছে।

—না, না প্রদীপ!

আবছা অন্ধকারে মানসীর কণ্ঠস্বর বেজে ওঠে। চকিত হয়ে চাইল ওরা। মা বারান্দার লাইটটা জ্বেলে দিতে মানসীর উপর এক ঝলক আলো পড়ে। সেই আলোয় মূর্তিময়ী প্রতিবাদের দৃপ্ত রূপ দাঁড়িয়ে আছে। মানসী বলে,—তা নয় প্রদীপ!

—মানসী।

মানসী বলে, আমি আজ এই ঐশ্বর্যের দম্ভ, বাবার অন্যায় শাসনকে তুচ্ছ করে সব পিছনে ফেলে বের হয়ে এসেছি প্রদীপ তোমার কাছে।

প্রদীপ বলে, কি বলছ মানসী! ওই ঐশ্বর্য সম্পদ তুচ্ছ করে নির্মম অভাব আর দারিদ্র্যের মধ্যে এসো না মানসী। একদিন তোমার ভুল বুঝতে পারবে। না তুমি ফিরে যাও। এখানে তোমাকে মানায় না।

মানসী বলে, যে ঐশ্বর্যে শান্তি নেই, আছে শুধু দম্ভ, জ্বালা আর লালসা, সেই ঐশ্বর্যের থেকে অভাবও শান্তির। আমার ভালোবাসার অমর্যাদা আমি করতে পারবো না। আমি পুতুল খেলা করি নি প্রদীপ, আমাকে ফিরিয়ে দিও না।

প্রদীপ তবু বলে, না!

মা-ই এগিয়ে আসে—প্রদীপ। ওরে যেচে ঘরে মালক্ষ্মী এসেছে। যে এত কিচ্ছুকে তুচ্ছ করে তোর

কাছে আসতে চায়, তাকে ফিরিয়ে দিলে ঈশ্বরও তোকে কোনওদিন ক্ষমা করবে না বাবা। এসো মা— দুঃখের সংসারে সুখের স্পর্শ ভরে তোল মা। সুখী হও। মানসীকে মা-ই টেনে নেন। হরিদা কোথা থেকে শাঁখ এনে বাজাতে থাকে।

মালতীই পুরোহিত ডেকে সাধ্যমত আয়োজন করে বিয়ের অনুদান করে। প্রদীপের অফিসের বন্ধুরা, প্রতিবেশীরাও আসে।

মানসীর স্বপ্ন আজ সত্যি হয়েছে। জানে যে তাকে সংগ্রাম করে বাঁচতে হবে। তবু বলে সে প্রদীপকে ফুলশয্যার রাতে, আমি সব জেনেই এসেছি প্রদীপ। তুমি পাশে থাকলে সব যুদ্ধই আমি জয়ী হবো।

মিঃ বোস আজ হেরে গেছেন। নিজের বাড়িতে বসে সরকারের কাছে ওদের বিয়ের সব খবরই পান। ভবেনও রয়েছে।

ভবেনই বলে, পুলিশে খবর দেব? টেনে থানাতে পুরবে ছেলেটাকে। ওই মানসীই ফুঁসলে নিয়ে গেছে। ঠকিয়েছে।

থানা পুলিশ হলে কাগজে খবর বেরুবে। তাছাড়া মানসীও এখন সাবালিকা তাই এই বিয়ে ঠেকানো যাবে না। মিঃ বোস বলেন, বিয়ে করবে ঘর বাঁধবে! দেখা যাক! ওই ছেলেটাকে উচিত শিক্ষাই দেব!

প্রদীপ মানসী বিয়ের পর এসেছে পুরীতে হানিমুনে। সমুদ্রের তীরে ওরা নিজেদের স্বপ্নের জগতে হারিয়ে যায়। মানসীও স্বপ্ন দেখে। শহরে ফিরে কাজে যোগ দেয় প্রদীপ। মানসীও ওর মধ্যে বাড়িতেই দুচারটে বাচ্চাকে পড়ায়। তাতেও কিছু রোজগার হয়।

প্রদীপ বলে, সত্যিই তোমার উপর অবিচারই করেছি। কত বড় ঘরে ছিলে—

হাসে মানসী— বিচার কিন্তু আমি করেছি। আর খরাপ কি আছি। বেশতো রয়েছি। মালতী হরিদাও মানসীকে নিয়ে খুশী। এমনি দিনে মানসী জানতে পারে মা হতে চলেছে। সারা বাড়িতে খুশীর পরিবেশ গড়ে ওঠে। এবাড়িতে আসছে নতুন অতিথি।

মালতী বলে, বৌমা বাবাকে জানাই?

মানসী বলে,— যিনি বালিগঞ্জ থেকে শ্যামবাজার এসে খবর নিতে পারেন না, তাকে জানাতেও হবে না।

প্রদীপও স্বপ্ন দেখে সে বাবা হতে চলেছে।

এ বাড়িতে আসে নতুন অতিথি, মানসীর সন্তান। সুন্দর একটি ছেলে। মা নাম রাখেন। প্রদীপের ছেলের নাম হোক অনির্বাণ। কি মা, নাম পছন্দ? মানসীও খুশী হয়। খোকন পেয়ে সে যেন অনেক কিছুই পেয়েছে।

অনির্বাণ বড় হয়ে ওঠে। হরিদার পিঠে বসে ঘোড়া চালায়। মালতী বলে, এতদিন পর তোর একটা ভালো চাকরী জুটেছে হরি। প্রদীপও খুশী।

কিন্তু ভবেন খুশী নয়। সরকারের মুখে শোনে প্রদীপের ছেলের কান্না। মানসীও ভালোই আছে। সরকার এর লোকই ভবনের কথায় পানের দোকান থেকে প্রদীপের খবর নিয়ে যায়।

মিঃ বোস মেয়ের কাছে এতটা আঘাত প্রত্যাশা করেননি। তিনিও জেদী মানুষ। তাই মেয়ের কথা মনে আসলে মদ গিলে সেটা ভুলতে চান, আর ভবেনই কৌশলে মিঃ বোসকে মদের নেশায় ডুবিয়ে দিয়ে নিজেই এই সাম্রাজ্যের অধিপতি হতে চায়।

ভবেনই এখন বোস কনসার্নের অলিখিত ম্যানেজিং ডিরেক্টর। মিঃ বোস অফিসে আসেন মাত্র। আসলে সব কাজ দেখে ওই ভবেনই। সে এখনও মানসীকে ভুলতে পারেনি।

প্রদীপকে নিয়ে শান্তির ঘর সংসার করছে সে। এবার ভবেন তাদের সংসারেই কঠিন আঘাত করতে চায়।

মানসীর সঙ্গে একদিন দেখাও হয়ে যায় ভবেনের পথে। ভবেন বলেস ভুল করলে মানসী এভাবে বাজার করতে হয়। সেদিন রাজী থাকলে আজ গাড়ীতে চড়তে।

মানসী বলে, আবার বাবার গাড়ীতে চেপে ওই কথাটা আমাকে বলে খুশী হয়েছো না? যে গাড়ী আবর্জনার মত ফেলে এসেছি—কুকুরের মত সেইটা চিবোচ্ছ—

— কি বললে? ভবেন চটে ওঠে।

মানসী বলে, এত বুদ্ধি তোমার। ওই ইঙ্গিতটা বোঝবার মতো বুদ্ধি কি নেই?

চলে যায় সে। ভবেন গর্জায়, ঠিক আছে।

পরদিনই ওই ভ্যানগার্ড কোম্পানীর ম্যানেজার তার চেম্বারে ওদের বিলের টাকা চাইতে এলে বলে ভবেন, প্রদীপ রায় আপনাদের ওখানে কাজ করে?

— হ্যাঁ।

ভবেন বলে, ও আমাদের কোম্পানীকে সাপ্লাই দেবার নাম করে বহু টাকা চিট করেছে। অবশ্য এসব তাকে বলার দরকার নেই। আমাদের বড় সাহেব মিঃ বোস চান ওই বদলোককে যে কোম্পানী প্রশ্রয় দেয়, তাদের সঙ্গে আমাদের কোনও সম্পর্ক যেন না রাখা হয়।

ভ্যানগার্ড কোম্পানী এদের সঙ্গে বছরে প্রায় আশি নব্বই লাখ বা তারও বেশী টাকার ব্যবসা করে। বোস কনসার্নের পেমেন্টও খুব ভালো। এত দামি পার্টি ভ্যানগার্ড কোম্পানী হাতছাড়া করতে চায় না। প্রভূত লোকসান হবে তাদের, গুডউইলও বিপন্ন হবে এতবড় পার্টি হাতছাড়া করলে। তবু ভ্যানগার্ড কোম্পানীর ম্যানেজার মিঃ সিং বলেন, ই ক্যা বাত ভবেনজী?

ভবেন বলে, আমার কথা নয়, মিঃ বোসের কথা। অবশ্য আপনাদের উপর কোনও প্রেসার দিচ্ছি না এব্যাপারে। আপনার স্টাফ সে আপনি ডিসিশন নেবেন। কিন্তু আমাদের ডিসিশনটা জানিয়ে দিলাম। লেট আস পার্ট লাইক ফ্রেণ্ডস্!

মিঃ সিং ব্যবসায়ী মানুষ। জানে কাকে বেশী দরকার। প্রদীপ তাদের একজন কর্মচারী মাত্র। এমন সাধু কর্মচারীকে রেখে এত বড় পার্টিকে তারা হারাতে পারবে না। তাই বলে মিঃ সিং, ভাববেন না ভবেনজী, আপনার মতন পার্টিকেই আমরা চাই। প্রদীপ রায় এখানে সাইফার।

প্রদীপ ক'দিন খুব ব্যস্ত। তার সন্তান অনির্বাণ-এর কিছুদিন থেকেই শরীরটা ভালো নেই। মানসীও চিন্তিত। মালতীও ডাক্তারের কাছে নিয়ে যায় নাতিকে।

ডাক্তার বলেন, ঠিক ব্যাপারটা বুঝছি না। একবার স্পেশালিস্টকে দেখানো দরকার। জ্বরটাও কমছে না।

মানসী ভাবছে ছেলের কথা। প্রদীপের মাপা মাইনে। তার মধ্যে সংসার চালাতে হয়। এতগুলো প্রাণী, খোকনের চিকিৎসার ঘটা, তার অন্যখরচাও বেড়েছে। তারপর স্পেসালিস্ট দেখাতে হবে।

প্রদীপও ভাবনায় পড়ে। প্রদীপ বলে, দেখি অফিসে কোনও কিছু পাই।

সেদিন অফিসে প্রদীপ অনেক আশা নিয়েই এসেছে। কিন্তু বড়সাহেবের ঘরে যাবার ডাক আসতে ঘাবড়ে যায়। লোনের কথাটাই জানাবে সে। ছেলের চিকিৎসা করাতে হবেই। বড়সাহেব মিঃ সিং আগেই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। প্রদীপ যেতে ওর হাতে খামটা দিয়ে বলে, আই অ্যাম সরি প্রদীপ। কোম্পানীর অবস্থা ভালো নয়, কিছু লোককে তাই যেতেই হবে।

প্রদীপ চিঠিটা পড়ে চমকে ওঠে। তার চাকরীই খতম হয়ে গেছে। অবশ্য কোম্পানী তাকে এক মাসের মাইনে বাড়তি দিয়েছে। সবে বছর চারেক চাকরীতে ঢুকেছে। প্রভিডেন্ট ফাণ্ডে সামান্যই জমেছিল। সেটাও দিয়েছে তাকে। প্রদীপের পায়ের নীচে থেকে মাটি সরে যায়। অস্ফুট কণ্ঠে বলে সে, স্যার!

— আই অ্যাম সরি প্রদীপ। মিঃ সিং তাকে বিদায় করে দেন।

মা সব শুনে চমকে ওঠে। মানসী নেই—হরিদার সঙ্গে গেছে স্পেশালিস্টের কাছে। ডাক্তার আজ নানা টেস্ট করে রিপোর্ট দেবেন।

মা বলেন প্রদীপকে, এত ভেঙে পড়িসনা বাবা। চাকরীর সন্ধান কর। অন্যত্র ঠিক পেয়ে যাবি। মা জানে না এখন পশ্চিমবাংলায় চাকরীর প্রকৃত অবস্থাটা কি!

বিপদ একা আসে। মানসীও ফিরেছে খোকনকে নিয়ে। ঘরে খোকনকে এনে কান্নায় ভেঙে পড়ে সে। মালতী দেবীও আসেন, কি হোল মা?

প্রদীপ নির্বাক। মানসী ডাক্তারের রিপোর্ট তুলে দেয় ওর হাতে। প্রদীপ আজ সকালে অফিসে নিজের মৃত্যুদণ্ডই যেন শুনে এসেছে। কি করবে জানে না। সামনে অতল অন্ধকার আর এখন সেই অন্ধকারে কোথায় তীব্র ঝড় উঠেছে, মত্ত ঝড়। অন্ধকার আকাশে সগর্জনে ঝলসে ওঠে বজ্রের নির্ঘোষ বিজলির জ্বালায় যেন সব কিছু তা ধ্বংসই হয়ে যাবে।

খোকনের রোগটা কঠিন— থ্যালাসেমিয়া। ওই নিস্প্রাণ সুন্দর শিশুর ভাগ্যে নিষ্ঠুর দেবতা যেন মৃত্যুর পরোয়ানা লিখে দিয়েছে। প্রদীপ আর্তনাদ করে ওঠে, না না! এ হতে পারে না।

মানসী বলে, তাই হয়েছে। আমাদের খোকন, ওকি বাঁচবে না মা? ওকে নিয়েই সব আশা স্বপ্ন—

প্রদীপ বলে, ওকে সারিয়ে তুলবই মানসী।

ডাক্তারের কাছেই নিয়ে যায় খোকনকে। হাসপাতালে দামী ওষুধ, ব্লাড ট্রান্সফিউশন-রক্ত চাই। প্রদীপ ব্লাডব্যাঙ্কে ঘুরছে নিজেই রক্ত দেয়, যাতে ছেলের জন্য রক্ত পায়। চাকরীর সন্ধানেও ঘোরে। ক্লান্ত হতাশ! তবু থামেনা সে। মায়ের গহনা বিক্রী করে ছেলের জন্য। মালতীই দেয়।

দেখে মানসী। সংসারে নেমে আসে এবার নগ্ন অভাবের ছায়া। প্রদীপের চাকরী নেই। ছেলের অসুস্থ। মানসীও দিশেহারা। খোকনের রোগ যন্ত্রণা দেখে প্রদীপ আর থাকতে পারে না। কোথাও ওষুধও কিনতে পারে না। রক্ত দেবার খরচও নেই। প্রদীপ যেতে চায়নি। মানসীকে এর আগে বাবার কথা বলেছে, মানসী বাবার ওখানে যেতে রাজী নয়। কিন্তু খোকনের যন্ত্রণা দেখে প্রদীপ এসেছে মিঃ বোসের বাড়িতে।

ভবেনও রয়েছে। মিঃ বোস প্রদীপকে দেখে না দেখার ভান করেন। প্রদীপ বলে, খোকনের খুব অসুখ। তার ঠিকমত চিকিৎসা হচ্ছে না—।

— খোকন? মিঃ বোস অবাক হোন।

প্রদীপ বলে, আমাদের সন্তান। মানসী—

—মানসী! মিঃ বোস বলেন, মানসী বলে কেউ আমার নেই। যে ছিল সে বহুদিন আগেই মারা গেছে।

প্রদীপ বিবর্ণ মুখে কথাগুলো শুনলো। মিঃ বোস বলেন, ভবেন দারোয়ানদের বলে দাও, ওই ভিখিড়িদের কেউ যখন তখন এখানে আসুক এটা আমি চাই না।

প্রদীপ মাথা নিচু করে বের হয়ে আসে।

মানসী এসেছে একটি থ্যালাসেমিয়া রোগীদের সাহায্যকারী সংস্থার কাছে। এদের মধ্যে নিখিলই উদ্যোগ নিয়ে গড়ে তুলেছে এই সংস্থা। অবশ্য টীকা বা অন্য সাহায্যের জন্য জনসাধারণের কাছে তারা যায়।

আর নেত্যবাবু এখানের নেতা, তারও অনেক ব্যবসা। ইদানীং বেনামীতে অনেক বন্ধকারখানার জমি অন্যায় ভাবে করে হাউজিং কমপ্লেক্স বানিয়ে প্রচুর টাকা কামিয়েছে। নেত্যবাবুই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ভোটের আশায় এমন সংস্থার প্রেসিডেন্ট হয়েছে।

সেদিন মানসী আসে ওদের সংস্থায় ছেলের চিকিৎসার জন্য। নেত্যবাবুর লোভ অনেক। মানসীকে দেখে নিত্যকালী বলে, নিশ্চয়ই তোমার ছেলের চিকিৎসা হবে। আমরা তো ওই রোগের জন্যই লড়ছি। সেই-ই বলে, নিখিল টাকার জন্য ভেবো না। এর চিকিৎসার ব্যবস্থা করো। এ আমাদের পবিত্র কর্তব্য।

মানসীও নেত্যবাবুর কাছে কৃতজ্ঞ। খোকনের ব্লাড দেওয়া হলো। ওষুধপত্রও আসে। নেত্যবাবু বলেন, চলো পৌঁছে দিই। শ্যামবাজারে থাকোতো।

—আবার কষ্ট করবেন! মানসী কুণ্ঠিত।

নেত্যকালী বলে, ওদিকেই যাচ্ছি। গাড়ীতে নেত্য বলে, চলে আসবে এখানে। নাহয় আমাকেই ফোন করো। আর এতো রাজারোগ। কিছু টাকা রাখো।

মানসী অভাব সত্বেও টাকাটা নিতে পারে না। জানে সংসারের অবস্থা। প্রদীপের কোনও চাকরী নেই। মানসী চায় নিজেও কিছু রোজগার করতে। বলে মানসী, তার চেয়ে আমার যদি একটা চাকরীর ব্যবস্থা করে দেন। নেত্যবাবুর মত নেতাদের অনেক বিজনেসম্যানদের খুশী রাখতে হয়। নেত্যবাবুর হাত অনেক লম্বা। তাই বলে, তোমাদের বাড়িতো দেখে এলাম। দেখি চেষ্টা করে। তোমার জন্য কিছু করা তো কর্তব্য। খোকনের চিকিৎসারও কিছু সুরাহা হবে দেখি।—

মানসী আশা নিয়েই ফেরে।

প্রদীপ এখন একটা ফার্মে পার্ট টাইম খাতাপত্র লেখে। ইনকাম ট্যাক্সের হিসাব দেখে সামান্য কিছু পায়। আজ মানসীর বাবার কাছে গিয়ে অপমানিত হয়ে ফিরেছে। কথাটা সে মানসীকে বলতে মানসী চটে ওঠে— কেন গেছলে ওখানে?

প্রদীপ বলে, আমার জন্য তোমার খোকনের এত কষ্ট দেখতে পারিনা মানসী। নিজেকেই অপরাধী মনে হয়। কোথা থেকে কোথায় এনে নামিয়েছি তোমাকে!

মানসী বলে, তার জন্য তুমি দায়ী নও প্রদীপ! এসময় ভেঙে পড়লে চলবে না। লড়াই করতে হবে— জিততেই হবে।

প্রদীপ জানে না কিভাবে জিতবে সে!

মানসীর কথা ভোলেনি নেত্যকালী। সেই-ই খবর দেয় নিখিল মারফৎ। ওই সংস্থার কর্মী নিখিলও আসে খোকনের খবর নিতে। তার মারফৎ নেত্য মানসীকে ডেকে পাঠায়।

মানসী যেতে নেত্য বলে, তোমার চাকরীর ব্যবস্থা করেছি। একটি ফার্মের কাজের চিঠিও দেয়। বলে, রিসেপসনিষ্টের চাকরী। এখন হাজার পাঁচেক দেবে। চলো নিয়ে গিয়ে চেয়ারে বসিয়ে দিই।

মানসী ওই লোকটির কাছে অশেষ কৃতজ্ঞ।

মানসীর চাকরী হয়ে যায়। বাড়িতে কিছু বলেনা মানসী। সকালে বের হয়, প্রদীপ তার আগেই বের হয়ে যায়, চাকরীর সন্ধানে ঘোরে। মানসী বের হয়, মালতী হরিদাই তখন দেখাশোনা করে খোকনকে। ফেরে সেই বৈকালে।

মালতী কি যেন ভাবে। প্রদীপও ফিরেছে সেদিন দুপুরে। খোকনের জ্বর বেড়েছে—মা বিপন্ন। মানসী বাড়িতে নেই। প্রদীপ রেগে ওঠে। সেও শোনে মানসী রোজই বের হয়ে যায়, ফেরে সেই বিকেলে।

খোনককে সেই সংস্থায় নিয়ে যায়, নিখিল নিজে ডাক্তার সে কোনওমতে সুস্থ করে। প্রদীপ খোকনকে নিয়ে বাড়ি ফেরে। তখনও ফেরেনি মানসী। প্রদীপ রেগে ওঠে।

মানসী বৈকালে খোকনের জন্য কিছু ফল, হরলিকস নিয়ে ফিরতে প্রদীপ এই প্রথম মানসীর ওপর রাগে ফেটে পড়ে। বলে সে, রোজ অসুস্থ ছেলেকে ফেলে কোথায় যাও সেজেগুজে?

মানসী জবাব দেয় না। প্রদীপের পুঞ্জীভূত রাগ অভিমান আজ ফেটে পড়ে। স্ত্রীকে যা তা কথা শোনায়। বলে, বড়লোকের মেয়ের স্বভাবদোষ যাবে কোথায়? উড়ে বেড়ানোর স্বভাব তো সেই জগতেই ফিরে যাও। তোমাকে চিনতে পারি নি, আজ তার মাশুল দিচ্ছি।

মানসীর চোখে জল, সে সরে যায়।

মালতী বলে, কাকে কি বলছিস প্রদীপ? বৌমা তেমন নয়।

— কি জানো মা ওদের সম্বন্ধে? ওরা সব পারে!

— না! মালতী তা বিশ্বাস করে না।

রাতে প্রদীপ নীচে শোয়, মানসীর চোখে জল। খোকনকে বুকে জড়িয়ে চোখের জল ফেলে অপমানের যন্ত্রণা। প্রদীপও তাকে ভুল বুঝেছে।

মানসী তবু কিছু বলে না। সেদিন মানসী অফিসে কাজ করছে। প্রদীপ এসেছে এখানে যদি কোনও চাকরী পায় তার জন্য। কর্তাদের সঙ্গেই দেখা করবে। রিসেপশনের মহিলাটি চেয়ারটা ঘুরিয়ে ফোন-এ কথা বলে ঘুরেই নবাগতকে শুধায়—কার সঙ্গে দেখা করবেন?

প্রদীপও দেখছে মানসীকে। প্রদীপ ওদিকে সোফায় বসেছিল ভিতরে যাবার জন্য। আর যাওয়া হলো না। সে কাচের ওদিকে সরে আসে। আজ বুঝেছে প্রদীপ, মানসী সংসারের জন্য এত বড় ঘরের মেয়ে হয়েও আজ সামান্য চাকরী করতে বাধ্য হয়েছে। নিজেরই গ্লানি আসে।

সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরে মানসী। খোকনকে বুকে তুলে নিয়ে মালতীকে খামটা এগিয়ে দেয়। মালতী শুধায়—কি আছে মা?

—টাকা। মা একটা চাকরী নিলাম। লেখাপড়া শিখেছি তবু কিছু রোজগার হলে খোকনের চিকিৎসাটা হবে।

মালতী বলে, মা! আজকালকার মেয়েদের নামে অনেক কথাই শুনি। সেসব ভালো কথা নয়। কিন্তু তোমাকে দেখে মনে হয় ওসব মিথ্যা। ঘরের লক্ষ্মী তুমি— আর আমার এমন বরাত সেই লক্ষ্মীকেই ভিক্ষায় পাঠিয়েছি।

মানসী বলে, এসব কি বলছেন মা? নিজের সংসারের জন্য কিছু করবো না?

আজ প্রদীপও অনুতপ্ত। রাতে মানসীকে বলে, সব জেনেছি মানসী। তোমাকে চিনতে পারিনি। এত বড় ঘরের মেয়ে হয়ে আজ তোমাকে কোথায় নামিয়েছি। কত লোককে চাকরী-বাকরী দিতে পারো— আজ তোমাকেই চাকরী করতে হচ্ছে।

মানসী বলে, লড়াইয়ে নেমে পিছিয়ে যেতে চাইনা। তুমিও চেষ্টা করো, ঠিক কাজ একটা পাবেই। কারো দয়ায় নয়, নিজেদের যোগ্যতায় মাথাটা উঁচু করে।

খোকনের চিকিৎসা চলছে। কিন্তু কোনও উন্নতি নেই। নিত্যবাবুর ওখানে আসে মানসী। নিখিল ডাক্তারও বলে, দেখা যাক। চেষ্টাতো করতেই হবে।

নেত্যবাবুও অভয় দেয় মানসীকে।

সেদিন মানসী অফিসে কাজ করছে। ওদের বড়সাহেব এখানে বিশেষ আসে না। তার অনেক ব্যবসা। মাঝে মাঝে আসেন। খাতাপত্র দেখেন। সেদিন বড় সাহেব এসে খাতা-পত্র দেখে একটা নাম চোখে পড়ে তার—'মানসী রায়'।

ম্যানেজার বলে, নতুন রিসেপশনিস্ট স্যার। খুব কাজের মেয়ে।

—ওকে একটু পাঠিয়ে দিন আমার ঘরে।

সেইমত মানসীকে ম্যানেজার এসে বলে, বড় সাহেব এসেছেন, তোমাকে চেম্বারে যেতে বলেছেন।

মানসী একটু ঘাবড়ে যায়। এখন তার চাকরীটির খুব দরকার। ভয়ে ভয়ে বড় সাহেবের চেম্বারে ঢুকেছে। বিরাট রিভলবিং চেয়ারে বসে আছে ভবেন।

আজ সে নানা ফন্দি ফিকির করে নিজেরই ব্যবসা করেছে। আর ভাগ্য ক্রমে মানসী এখন তারই কর্মচারী।

মানসীর মাথা ঝিমঝিম করছে।

— বসো! ভবেন দেখছে ওকে, বলে, তাহলে সেই প্রেমের মূল্য এখন দিচ্ছো বেশ ভালো ভাবেই মানসী!

মানসী কোনোমতে বলে, আর কিছু বলবেন?

—বলারতো অনেক কিছুই ছিল, তুমি কি শুনবে? অবশ্য শুনলে তোমার মঙ্গলই হবে।

ভবেন আজও মানসীকে ভোলে নি। সে দেখছে মানসী আজ অভাবের শেষ সীমায় পৌঁছেছে—তার ছেলের থ্যালাসেমিয়া। সে বাঁচবে কিনা সন্দেহ। ভবেন তাই একটা রিস্কই নিতে চায়। বলে সে, মানসী অভাবের ছায়া ঘরে ঢুকলে প্রেমের ছবিটা জানলা দিয়ে উধাও হয়ে যায়। এখন জীবনের যন্ত্রণাকে বুঝেছো! কি দাম এই প্রেমের? সংসারের? এখনও সময় আছে সুন্দরভাবে কাটাতে পারবে,

তাই বলি ওই অপদার্থ স্বামী নামক জীবটাকে এবার ছেড়ে দাও। ডির্ভোসের দরখাস্ত করো— আমিই সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। তারপর আমরা আবার সুখে সম্পদের মাঝে কাটাতে পারবো। ছেলেরও চিকিৎসা হবে—ভেবো না। এই অফিসের কর্মচারী নয়। মালকিন হবে তুমি।

মানসীর সারা মন রাগে অপমানে ফুটে ওঠে। নীরবে দুঃসহ অপমানটাকে সহ্য করে সে। ভবেন বলে, এখুনি জবাব দিতে হবে না। ভেবে দেখো। পরে জানাবে।

মানসী কোনোমতে বের হয়ে আসে। আজই সিদ্ধান্ত নেয় সে। এই লোভী ইতর লোকটাকে মুখের মতন জবাব দেবে। তার বাবার পয়সায় আজ এখানে উঠে তাকেই চরম অপমান করছে সে। বাবারাও প্রশ্রয় নিশ্চয়ই এতে আছে।

ভবেনও স্বপ্ন দেখে মানসী আবার তার হাতেই আসবে। রুগ্ন ছেলেটাকে সে চিকিৎসার নামে শেষই করে কাঁটামুক্ত করে মানসীকে নিজের করে পাবে।

মানসীকে ঢুকতে দেখে চাইল। খুশী ভরে বলে ভবেন, বসো। সুমতি হয়েছে তাহলে! কালই ডিভোর্স শ্যুট করে দাও।

মানসী কাগজটা এগিয়ে দেয়— একি! ভবেন চমকে ওঠে। মানসী বলে, জুতো দিয়ে গালে মারতে পারলে খুশী হতাম, ওটা সংস্কারে বাধে! হাজার হোক বড় সাহেব, তাই এই রেজিগনেশন লেটারই দিয়ে গেলাম।

মানসী দৃপ্তভঙ্গীতে বেরিয়ে যায়। ভবেন হতভম্ব।

মানসী প্রদীপকে শুধু বলে, ওখানে টেম্পোরারী চাকরী, তাই চলে গেল।

এখন কি করে সংসার চলবে জানে না।

আর নেত্যবাবুও যেন তৈরী ছিল। বিপদতারণ দেশসেবক হিসেবে সে এসে পড়ে।

খোকনেরও বাড়াবাড়ি। ডাক্তাররা চিকিৎসা করছে। হাসপাতালে আছে। প্রদীপও ব্যস্ত। মানসী এসেছে নেত্যবাবুর কাছে। নেত্যবাবু অভয় দেয়, দরকার হলে ভোলোরেই নিয়ে যাবো।

মানসী প্রদীপও ভাবনায় পড়ে। এতটাকা কোথায় পাবে তারা। নেত্য বলে ওর জন্য ভেবো না।

এবার মিঃ বোস সত্যিই ভাবনায় পড়েন। তার কোম্পানী—কারখানার অবস্থাও খুব খারাপ। ম্যানেজার খাতাপত্র আনে— দেখা যায় ক'বছর ভবেন এই কোম্পানী থেকে লাখ লাখ টাকা তুলে নিয়েছে নানা ভাবে।

আর নিজেই কারখানা করেছে এখানের টাকায়। ওদের সব পার্টিকে সেই মাল সাপ্লাই করেছে আর কাঁচামাল বের হয়ে গেছে মিঃ বোসের কোম্পানীর ভবেনের কারখানায়।

তার লাখ লাখ টাকা চলে গেছে নানা পথে ওই ভবেনের কোম্পানীতে। মিঃ বোস সব দেখে গর্জে ওঠেন।

—এসব কি করেছো ভবেন? তোমাকে বিশ্বাস করেছিলাম, আর আজ এইভাবে আমার সর্বনাশ করেছো?

ভবেন বলে, আমি কিছুই করিনি। আইন মাফিক,কাজই করেছি। আশা করি কোম্পানীর সব ব্যাপার নিজেই দেখেছেন। এসব কাগজে আমার নয় আপানারই সই রয়েছে।

ভবেন মদ্যপ অবস্থাতেই বোস সাহেবকে দিয়ে সব কাগজ সই করিয়েছে। নিজে কোন ধরাছোঁয়ার মধ্যে নেই আজ সে বলে, আপনার যখন এত সন্দেহ, আমি চলেই যাচ্ছি।

মিঃ বোস বলেন, তোমাকে জেলে দেবো। ইউ চিট্ ফ্রড।

— সেই চেষ্টা করে দেখতে পারেন। ভবেন চলে যায়।

আজ মিঃ বোসের মনে পড়ে মানসীর কথাগুলো। তার একমাত্র মেয়ে। সে বলেছিল ওই ভবেন একটা লোভী ইতর। বেইমান। ওর মত একটা শয়তানকে মানসী চিনেছিল, সেদিন মিঃ বোস চিনতে পারেনি। ওই শয়তান তার সুনাম, ব্যবসা, সম্পদ নয়, তার সবচেয়ে বড় সম্পদ আপনজন তার মেয়েকেও এখান থেকে চলে যেতে বাধ্য করিয়েছে।

আজ কত কষ্টেই না আছে তার একমাত্র সন্তান। মনে পড়ে প্রদীপ এসেছিল মানসীর সন্তান থ্যালাসেমিয়ার রুগী, তার চিকিৎসার জন্য কিছু টাকার জন্য। সেদিন তাকে চরম অপমান করে তাড়িয়ে দেন ওই ভবেনের জন্য।

আজ চরম শিক্ষাই হয়েছে তার। মহাপাপই করেছেন তিনি মানসীকে দূর করে দিয়ে। এই সেই পাপের শাস্তি। আজ বার বার মানসীর কথা— তার রুগ্ন সন্তানের কথাই মনে পড়ে।

মানসী এসেছে নিত্যবাবুর কাছে। আর তার কোনোপথই নেই। ধূর্ত নেত্যবাবুও তা জানে। সে এবার নিজমূর্তি ধরেছে। বলে, তোমার ছেলের চিকিৎসা হবে, তবে আমাকে একটু খুশী করতে হবে মানসী!

— মানে! মানসী অবাক হয়।

নেত্যবাবু বলে, মানেটা বুঝলে না। বুঝিয়ে দিচ্ছি। মানসীকে এবার নখদাত বের করে একট হিংস্র জানোয়ার যেন আক্রমণ করেছে। মানসী ভাবতেই পারেনি মানুষ এত নীচ- লোভী ইতর হতে পারে!

সে এখুনি আক্রমণের জন্য তৈরী ছিল না। নিজেকে নেত্যবাবুর অত্যাচার থেকে মুক্ত করার চেষ্টা করে প্রাণপণ। তার ইজ্জৎই লুঠতে চায় ওই দানব। অসহায় মানসী—

এমনসময় এসে পড়ে প্রদীপ। সেই নেত্যবাবুকে এবার উত্তমমধ্যম দেয়। নিখিলও এসে পড়েছে। সেও ভাবতে পারেনি নেতা সাজা লোকটা এত লোভী ইতর।

নিখিলও বলে, পবিত্র এই সংস্থায় আপনার মতো ইতরের ঠাঁই নেই। আপনারা দেশে সমাজের কলঙ্ক। দূর হয়ে যান।

গর্জাচ্ছে নেতা, পয়সা পাবে কোথায়? সংস্থা চালাবে কে?

—ভিক্ষা করবো তবু আপনাদের মতো ভণ্ড নেতাদের দয়া চাইবো না। দূর হয়ে যান।

হঠাৎ মালতীর আর্তচিৎকারে সচকিত হয় প্রদীপ— মানসী ছুটে যায় ওয়ার্ডের দিকে নিখিলও ছোটে।

কিন্তু তখন সব শেষ। অনির্বাণ-মানসীর খোকন আর নেই। এদের সব সমস্যা নিজের সব যন্ত্রণা থেকে সে মুক্তি দিয়ে গেছে এদের।

মানসীর চোখে জল। আজ তার সব হারিয়ে গেল। সে হেরে গেছে জীবনের লড়াই-এ। হেরে গেছে সে।

এমন সময়ে এসে পড়েন মিঃ বোস। আজ তিনি অনুতপ্ত। তাই ছুটে এসেছিলেন প্রদীপের বাড়ীতে। সেখান থেকে এসেছে এখানে।

মানসীর চোখের জল যেন মৃত শিশু কোলে আগুন হয়ে ঝরে ওই মিঃ বোসের উপর। মানসী বলে, কি দেখতে এসেছো বাবা? আমি কেমন হেরে গেছি, তাই না? দেখ তোমার বংশের শেষ দীপশিখাটুকুও নিভে গেল। দেখে যাও আর তোমার টাকার প্রাসাদে ফিরে গিয়ে হাসবে জয়ের হাসি!

মিঃ বোসের চোখে জল। আজ মেয়ের কাছে তিনি চরম অপরাধী। বলেন —আমি মহাপাপ করেছি রে! তাই একেবারে সব হারিয়ে গেল। তুই হেরে যাবি না মা, তোর কিছু হারায় নি। অনির্বাণ গেছে এই থ্যালাসেমিয়ায়, এবার তুই গড়ে তুলবি এক সুন্দর চিকিৎসাকেন্দ্র— যেখানে হাজার অনির্বাণরা আবার সেরে উঠবে এই কালব্যাধি থেকে, তাদের হাসি আনন্দে চারিদিক ভরে উঠবে। তাদের মাঝেই ফিরে পাবি তোর সন্তানকে। আমাকেও মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে দে মা!

আজ সেখানে গড়ে উঠেছে সুন্দর ফুলের রাজ্যে নতুন এক চিকিৎসালয়। নিখিল ডাক্তারও ব্যস্ত। ছোটদের গানের সুর ওঠে— ওদের রোগের মধ্যে বাঁচার আশ্বাস আনে আজ মানসী—

ওই ফুলের মেলায়, শিশুদের কলরবে মানসী যেন অনেক অনির্বাণকেই ফিরে পেয়েছে তার নিরলস সেবার মধ্যে দিয়ে।

পিয়াসী মন

ঝিলমিল সেদিন গানের স্কুলের অনুষ্ঠানে একাই বাজিমাত করে দেয়। এমনিতে সে সুন্দরী, ভগবান তাকে অযাচিতভাবেই কিছু সৌন্দর্য দিয়ে গড়েছেন নিখুঁতভাবে। স্নিগ্ধ চেহারা, ওর গহন কালো চোখের চাহনিতে কী যেন রহস্য ফুটে ওঠে। দেহে সদ্য-জাগ্রত যৌবনের দৃপ্ততা, ওর চলারও একটা ছন্দ আছে। পানপাতার মতো মুখ, হাসিটা যেন প্রথমে চোখের তারায় ঝিলিক দিয়ে ওঠে। তারপর সেটা সারামুখে ছড়িয়ে পড়ে। তাও ওর মা ওর নাম রেখেছিলেন ঝিলিক। সদ্য যৌবনের ছোঁয়ায় ও যেন একটা বিদ্যুতের ঝলকেই পরিণত হয়েছে। কলেজে ও সকলের প্রিয়। রূপের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলে ওর দস্যিপানা, নাচে, গানে, খেলায় সে পিছিয়ে নেই। কলেজের ছেলেরাও যেন ওই বিদ্যুতের ঝলকে মাঝে-মাঝে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

নাচের স্কুলের নৃত্যনাটিকায় সে 'শ্যামা'র ভূমিকায় আজ দর্শকদের মুগ্ধ করেছে। খবরের কাগজের দু'-একজন রিপোর্টার, প্রাইভেট চ্যানেলের লোকেরাও তার ইন্টারভিউ নিয়েছে। ঝিলিকও তার এই কৃতিত্বে খুশি। ঝিলিকের বাবা সমাজের একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি। রিষড়ার দিকে তাঁদের বিরাট ফেব্রিকেশন, অন্যসব দামি যন্ত্রপাতি তৈরির কারখানা। মিঃ বোস নিজের ব্যবসাপত্র, পার্টি নিয়েই ব্যস্ত। মানিকবাবু তখনও মিঃ বোস হয়ে ওঠেননি। তখন মানিক বোস টেকনিক্যাল স্কুলের ডিপ্লোমা নিয়ে দু'চার বছর ছোট একটা কারখানায় কাজ করে সবে মিঃ রায়ের রিষড়ার কারখানায় এসে জয়েন করেছেন। মিঃ রায় এন্টারপ্রাইজের এই কারখানা বেশ বড় আর এখানে আধুনিক যন্ত্রপাতি বসিয়ে কারখানাকে অনেক উন্নতমানের কারখানায় পরিণত করেছেন। মিঃ রায়, মানিক এখানে ফোর্জিং সেকশনে জয়েন করেন। কোম্পানির এলাকাটা বেশ বড়। ওদিকে শহরের সীমানা শেষ হয়ে গ্রামের শুরু হয়েছে। ওই গাছগাছালি-ঘেরা জায়গাটায় শ্রমিকদের কিছু কোয়ার্টারও রয়েছে। মানিক তেমনই একটা দু'কামরার ছোট কোয়ার্টারে তাঁর স্ত্রী রুপালি আর ছোট ঝিলিককে নিয়ে ঘর বাঁধেন। মানিক এমনিতে সুপুরুষই— আর রুপালির রূপও ছিল। কিন্তু রুপালি প্রথম থেকেই সেই রূপকে নানাভাবে আরও সোচ্চার করে তুলতে চেষ্টা করতেন।

রুপালি আশা করেছিলেন তাঁর স্বামী মোটা টাকা আমদানি করবেন। কোনও ইঞ্জিনিয়ার বা ডাক্তার কিংবা কোনও বড় ব্যবসায়ী হবে। কিন্তু তাঁর বাবার তেমন সাধ্য ছিল না। তাই রুপালির বিয়ে হয়েছিল ডিপ্লোমাধারী এক শিক্ষিত যুবকের সঙ্গে। সেই নিশানার অতৃপ্তি রুপালির মনে যেন স্থায়ীভাবে বাবা বেঁধেছিল। তার সব সুখ-শান্তির ছোট জগৎকে ঘুণপোকার মতো ছিন্নভিন্ন করেছিল। সেই অতৃপ্তিটা ক্রমশ বাড়তে থাকে আর তার বহিঃপ্রকাশও ঘটতে থাকে নানাভাবে।

এদিকে ছোটখাটো কর্মীদের সারিবদ্ধ কোয়ার্টার। ওদিকে মাঠ, তার ওদিকে মিলের কয়েকজন সেকশন ম্যানেজারের বাংলো। সাজানো বাগান, গাড়ি, সবই আছে ওঁদের। রুপালি ওসব দেখেন। বিকেলে ছোট ঝিলিকের হাত ধরে বের হন তিনি। ওদিকে ইঞ্জিনিয়ারদের বউরা বের হন, তবে ওঁরা এঁদের এদিকটা বড় একটা আসেন না। ওঁদের ওদিকেই নিজেদের মধ্যে হাসিগল্প করেন।

রুপালি দেখেন ওঁদের। ওই জগতে প্রবেশের ছাড়পত্র তাঁর নেই। এমনকী অফিসার'স ক্লাবেও যাওয়ার অধিকারও যেন তাদের সীমিত। রুপালি মানিককে বলেন,

"তুমি বলেছিলে, তুমিও নাকি প্রমোশন পাবে। সেকশন ম্যানেজার হবে। এই পায়রার খোপের মতো কোয়ার্টারে থাকা যায়? উঃ দম বন্ধ হয়ে আসে।"

মানিক বলেন, "প্রমোশনের এখনও দেরি আছে।"

"তখন তা হলে মিথ্যে কথা বলেছিলে? ঠকিয়েছিলে আমাকে? বাবা"

ঝিলিক মায়ের ওই চড়া স্বরের কথাগুলো শোনে। মা কেমন যেন মাঝে-মাঝে তুচ্ছ কারণে অসহ্য রাগে ফেটে পড়েন। বাবাকেও যা-তা বলেন। ঝিলিককেও যেন সহ্য করতে পারেন না। ছোট মেয়েটা মায়ের ধমক খেয়ে সরে আসে বারান্দায়। মা তখনও বাবার সঙ্গে ঝগড়া করছেন।

মানিক বলেন, "আমি মিথ্যে বলিনি। তোমাকেও ঠকাইনি। আমি যা, তাই বলেছি। অকারণে তুমি ঝিলিককে বকলে। এতটুকু মেয়ে, ওর কী দোষ?"

রুপালি সেটাও বোঝাতে পারেন না মানিককে। ওই মেয়েটা যেন রুপালির কাছে একটা বোঝা হয়ে গেছে। রুপালি চান নিজের স্বাধীনতা, তাই টাকারও দরকার। মানিকের মাপা রোজগারে তার নিজের শখ-সাধ মেটানো যায় না। তার কোনও চাওয়াই পূর্ণ হয় না। তাই এর মধ্যে তিনিও চেষ্টা করছে, যদি কোনও কাজটাজ পান। ঝিলিক একটু বড় হতে তাকে স্কুলে পাঠিয়ে রুপালিও বের হয়। হাওড়ার কোনও এক শেঠজির অফিসে কাজও পেয়েছে।

মানিক বলেন,"কী এমন মাইনে দেয় যে, এইভাবে ঝিলিককে কাজের মেয়ের কাছে রেখে চাকরি করতে যেতে হবে?"

"টাকার দরকার। আমিও রোজগার করতে চাই। কারও কাছে হাত পাততে আমার সম্মানে লাগে।"

" তোমার স্বামীর যা রোজগার তাতে সংসার চলে যাবে। অন্যরাও তো চালাচ্ছে।"

রুপালি বলেন, "আমি আমার মতো করে চলতে চাই।"

ঝিলিক স্কুল থেকে ফিরে আসে ওদের কাজের মেয়ের সঙ্গে। তখন নির্জন দুপুর। অন্যদের মা-বাবারা স্কুল থেকে আনতে যান। ওর বাড়িতে মা-বাবা কেউই থাকে না। সমস্ত বিকেলটা ঝিলিকের একা-একাই কাটে। ছোট মেয়েটা যেন তখন থেকেই বুঝেছে তার অনেক কিছুই নেই। মা ফেরেন সন্ধ্যের পর। মাকে দেখে আকুল হয়ে ওঠে মেয়ের মন। তাই মা ফিরতেই কাঁদো-কাঁদো চোখে ছুটে যায় ঝিলিক। জড়িয়ে ধরে রুপালির গলা। রুপালি বলে, "ঝিলিক! আমি এখন টায়ার্ড, ফ্রেশ হতে হবে। যাও হোমটাস্ক করো।"

"ছোট মেয়েটকে এতটুকু আদর করারও সময় নেই।" মানিক বলেন।

রুপালি বলে, "তুমি তো রয়েছ। আমার সময় নেই।"

মানিক ঝিলিককে দেখতে থাকেন। রুপালি তার নিজের ঘরে চলে গেছে। মায়ের থেকে বঞ্চিত হয়ে ঝিলিকের চোখে জল নামে। ওকে কাছে টেনে নেন মানিক। মানিকও যেন রুপালির এই পরিবর্তনে বিস্মিত।

মানিক বোস সংসারের জন্য, মেয়ের জন্য যা করার তাই করেন, চেষ্টার কোনও ত্রুটি তিনি করেননি। তবে তিনি বেশি করেন ওই কারখানার জন্য। এমনিতে কাজপাগল নিষ্ঠাবান কর্মী তিনি। আর নিজের কাজে কোনওদিন ফাঁকি দেন না। দরকার হলে বেশি সময় কারখানায় থেকে বড়-বড় ঢালাই এর কাজও নিজে তদারক করে নির্ধারিত সময়ের আগেই নিখুঁতভাবে করে তোলেন। ফলে কারখানার মালিক মিঃ রায়ের সুনজরে পড়েন মানিক। মিঃ রায় একা বিল, কাস্টিং নিয়ে ব্যস্ত। সেকশন ম্যানেজারও ঠিকমতো কাজ তুলতে পারছেন না। ওদিকে বিদেশের অর্ডার সময়মতো শিপমেন্ট করতে না পারলে প্রায় পঞ্চাশ লাখ টাকার অর্ডার বাতিল তো হবেই। ভবিষ্যতেও সেখানের কোনও কাজও আর পাবে না মিঃ রায়ের ফার্ম।

মানিক সেদিন কাজের ব্লুপ্রিন্টটা দেখে বলেন, " এই অ্যাঙ্গেলের ডিগ্রি ঠিক নেই স্যার। তাই কাস্টিং করলেই এখান থেকে মাল ওভার-ফ্লো করছে। এখানে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল করলে কোনও প্রবলেমই হবে না।"

ম্যানেজার একটু বিরক্তিভরা সুরে বলেন, "আপনি করতে পারবেন?"

ওদিকে মিঃ রায়ের সামনে সময়ের ঘণ্টা বাজছে। নির্ধারিত দিনে শিপমেন্ট করতে হবে

তিনি বলেন, "একবার চেষ্টা করে দেখুন। মানিক তুমি পারবে?"

"মনে হচ্ছে পারব স্যার।"

মানিক তখন থেকেই তাঁর দলবল নিয়ে কাজ শুরু করেন। নিজে দিন-রাত থেকে দশ ঘণ্টার মধ্যে সব রেডি করেন। আর কোনও সমস্যাই নেই। জটিল কাস্টিংও মানিক বোস দেড়দিনে করে দেন সঠিকভাবে। মালও এখানকার কোম্পানির লোকেরা ও.কে. করে পাঠিয়ে দিল। সেই থেকেই মানিক বোস মিঃ রায়ের সুনজরে পড়ে যান। সেই জন্য মিঃ রায়-এর বাড়িতেও যেতে হয় মানিককে।

ক্রমশ কারখানার অনেক সমস্যা নিয়েও মিঃ রায় মানিকের মতামত নেন।

মিঃ রায়ের মেয়ে মীরাও ক্রমশ মানিককে চেনে। মিঃ রায় তাঁর মেয়েকে বলেন, "কাজের সমস্যা, লেবার প্রবলেম, সব সমস্যার সুরাহা করতে পারে মানিক। সারা কারখানার সবকিছু ওর নখদর্পণে।"

মীরা কারখানার এহেন নিঃস্বার্থ কর্মীকে দেখেন। যিনি নিজের জন্য কিছু চান না। শ্রমিকদের জন্য, চিকিৎসার সুবিধার জন্য হাসপাতালের উন্নতি, তাঁদের ছেলেমেয়েদের জন্য স্কুল, এসব নিয়েই মানুষটা পড়ে থাকেন। মিঃ রায়ও এখন মানিকের উপর নির্ভর করেন। ওঁকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজও দেন। মীরাও ক্রমশ যেন মানিককে অন্য চোখে দেখতে থাকেন।

এসব খবর অবশ্য বেশ রংচং নিয়ে বাবু কলোনিতে পৌছায়।

মানিককে এখন মালিকের মেয়ে মীরার সঙ্গেও দেখা যায়। তাদের নিয়ে সরস কাহিনীও লোকের মুখে-মুখে আলোচনা হয়। এসব কথা রুপালির কাছে পৌছায়। রুপালি এখন কিছুটা বদলেছে। বাইরের জগতে একবার পা বাড়িয়ে সেই জগতে যে তার কদর এখনও আছে, সেটাও বুঝেছেন রুপালি। এখন তিনি অন্য একটা বড় অফিসে কাজ করেন। তাদের নানারকম ব্যবসাপত্র। রুপালির জগতের পরিধিটা, তাদের ব্যস্ততা, অভিজ্ঞতাও বেড়েছে। ঝিলিক স্কুলে পড়ে, সে এখন ফুটফুটে এক বালিকা। এখন দেখেছে সে মা মাঝে-মাঝে বেশ দেরি করে বাড়ি ফেরেন। বড় একটা গাড়ি মাকে পৌছে দিয়ে যায়। মা গাড়ি থেকে নেমে হাসিমুখে সেই অচেনা লোকটিকে হাত নাড়েন। এক-একদিন মাকে দেখে ছুটে আসে ঝিলিক বাড়ির বাইরে। মোটা দামি সুট-পরা একটা লোককে দেখে সে। মাকে বলে, "ও কে মা?" " তোমার জেনে কী দরকার?" ধমকে ওঠে রুপালি।

চুপ করে যায় ঝিলিক। ওই লোকটার মুখচোখ, ওর চাহনি যেন মোটেই ভাল লাগেনি ঝিলিকের। ঝিলিক এখন মাকেও বেশি সময় পায় না। বাবা কারখানা আর মালিকের বাড়ি নিয়ে ব্যস্ত। ঝিলিকের সময় কাটে না। দেখে মাঝে-মাঝে বাবাও ফেরেন গাড়িতে। তাঁকে পৌছে দিয়ে যায় একটি দামি পোশাক পরা সুন্দরী মেয়ে। ঝিলিক অবশ্য ভয়ে বাবাকে তার পরিচয় জিজ্ঞেস করতে পারেনি।

ঝিলিকের মনে হয় তাকে এড়িয়ে বাবা-মা দু'জনেই যেন নতুন করে তাদের দুটো জগৎ গড়ে নিয়েছেন। সেখানে ঝিলিকের কোনও ঠাঁই-ই নেই। ঝিলিক দেখে আশপাশে বাড়ির ছেলেমেয়েদের। তাদের মা-বাবা সবাই রয়েছেন। আর তারা মা-বাবার নিবিড় সান্নিধ্য পায়। ঝিলিকের মা-বাবা থেকেও নেই। সবাই যেন কী একটা অপরাধে তাকে নিঃসঙ্গতার মধ্যে ফেলে দিয়েছেন। কিন্তু তার অপরাধটা জানা নেই— তাই মনের মধ্যে নীরব একটা ক্ষোভ।

রুপালি এখন ভাল রোজগার করেন। এখন তিনি তাদের ফার্মের ম্যানেজারের পি.এ। তারও চেম্বার আছে। ম্যানেজারের সঙ্গে অনেক পার্টিতেও যেতে হয়। দেখেছেন তিনি নতুন এক সমাজকে। যেখানে প্রাচুর্য, বৈভব আর উদ্দাম জীবনের মত্ততা রয়েছে। ওই গতিময় জীবনের সঙ্গে তিনি নিজেকে পুরোপুরি মিশিয়ে দিতে চান। ম্যানেজারও তাই চান। ওর ফ্ল্যাটেও মাঝে-মাঝে আসেন রুপালি। এটাই যেন তার নতুন সংসার। মানিক বোস এখন ব্যস্ত। মিঃ রায় তাঁকে প্রমোশন দিয়েছেন। তাদের নতুন বাংলো হয়েছে, গাড়িও হয়েছে। এত কিছু হওয়ার পরেও ঝিলিক তবু সেই নিঃসঙ্গই রয়েছে। মানিক একদিন রুপালিকে বলেন, "আজ আমার প্রমোশন হয়েছে। বাংলো, গাড়ি সবই হয়েছে, মাইনেও বেড়েছে। এবার ওসব চাকরি ছেড়ে নিজের ঘর-সংসার দেখো।"

এখন রুপালি আর তার ছোট ঘরের সীমানার মধ্যে বন্দি হয়ে থাকতে চায় না। মেয়েটা সারাদিন

একাই থাকে। রুপালি বলে "আমাকে বাইরের কাজ ছেড়ে দিয়ে এই ঘরের মধ্যে বন্দি হয়ে থাকতে হবে?"

"আমাদের ঘরের মেয়েরা সবাই তাই করে।"

রুপালি স্পষ্ট জানিয়ে দেন,"ওসব আমার দ্বারা হবে না।"

"তবে কি ওই ম্যানেজারের সঙ্গে ওর ফ্ল্যাটেই—"

রুপালিও এবার ফুঁসে ওঠেন, "তুমি কী করো তা আমার কেন, কারখানার কারওরই আর জানতে বাকি নেই। ওই মালিকের মেয়ের সঙ্গে কী সম্পর্ক তোমার?"

মানিক বোসও গর্জে ওঠেন। ওদের দু'জনের কণ্ঠস্বরও সপ্তমে ওঠে। মানিক এসব অপবাদ সইতে রাজি নন। বরং তিনি নিজে দেখেছেন, ওই ম্যানেজারের সঙ্গে রুপালির সম্পর্কটা।

হোটেলের পার্টিতেও ওই ম্যানেজারের সঙ্গে রুপালিকে দেখেছেন তিনি। ইদানীং রুপালি মদও খান। সেসব কথাই সোচ্চারে ঘোষণা করতে রুপালি হাতের কাছে ফুলদানিটাই ছোড়েন মানিকের দিকে। অল্পের জন্য মানিক বেঁচে যান। দামি আয়নাটা সশব্দে ভেঙে চুরমার হয়ে যায়।

ঝিলিক ভীত, ত্রস্ত চাহনিতে মা-বাবার ওই খণ্ডযুদ্ধ দেখছে। মায়ের উপরেই তার যেন রাগটা বেশি। পরদিনই ঝিলিকের মা সকালবেলায় চলে গেলেন এই বাড়ি থেকে তার মালপত্র নিয়ে। মানিক দেখেন রুপালি এর মধ্যে সেই ম্যানেজার মিঃ আগরওয়ালকে ফোন করে ওই বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার কথাটা জানাতে মিঃ আগরওয়ালও যেন হাতে চাঁদ পান। তিনিও এইটাই চেয়েছিলেন। তাই মিঃ আগরওয়ালও বলেন, "আমি গাড়ি পাঠাচ্ছি রুপালি। আমার ক্যামাক স্ট্রিটের ফ্ল্যাট তো খালিই পড়ে আছে, ওখানেই চলে এসো।"

রুপালিও এবার তাই এই বাঁধাধরা জীবন থেকে তার নতুন জীবনে গিয়ে নতুন করে বাঁচবেন। গাড়িও এসে গেছে। রুপালি তাঁর মালপত্র দুটো সুটকেসে পুরে এ বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছেন। ঝিলিক কাল রাত থেকে ঘুমোতে পারেনি। সে দেখেছে দুটো ভদ্র-সভ্য মানুষের মধ্যে ওই ঝগড়া, হাতাহাতিও। মা-বাবা যেন দু'জনে নখদন্ত বিস্তার করে একে অপরকে আক্রমণ করছেন। আর আক্রমণের তীব্রতা লক্ষ করেছে মায়ের মধ্যেই যেন বেশি। শেষে দু'জনে ক্লান্ত হয়ে থেমেছেন। ওদের কারও খেয়াল নেই যে, তাদের জীবনে আর-একজনের ভূমিকা আছে, সে ওই ছোট মেয়েটা। ঝিলিকের কথা কেউ এরা ভাবেননি। একাই ভীত, ত্রস্ত চাহনিতে দেখছে ঝিলিক যে, দু'জনের কেউ তার জন্য ভাবেননি। ওদের জীবনে যেন ঝিলিকের কোনও অস্তিত্বই নেই। একা ঝিলিক নিজেই কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল জানে না। ঘুম ভাঙে সকালে। তখন কেউ তার কথাও জিজ্ঞেস করেন না। ঝিলিক দেখে তার মাকে নিয়ে যাওয়ার গাড়িও এসে গেছে। মানিকই এবার রুপালিকে বলেন, "ঝিলিকের কথাটাও একবার ভাববে না? ওর কী দোষ?"

রুপালি বলেন, "ওটা ভাববে তুমি! আমি পিছনের কথা ভুলে যেতে চাই। তাই পরিচয় মুছে ফেলেই চলে যাচ্ছি।"

ঝিলিক ভেবেছিল মা তার কথাটা ভাববেন। আবার সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু তা হল না। মা চলে গেলেন, ঝিলিক দরজার পাশে দাঁড়িয়ে দেখে। তার সারা মনে একটা ঝড় ওঠে। মা যে তাকে এইভাবে ফেলে রেখে চলে যাবেন তা ভাবতেও পারেনি সে। মা চলে গেলেন। হারিয়ে গেলেন। ঝিলিক তার মায়ের উপর রাগে-দুঃখে কান্নায় ভেঙে পড়ে। একটা অস্ফুট আর্তনাদ করে। রুপালি তখন গাড়িতে উঠে দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন। শীততাপনিয়ন্ত্রিত দামি গাড়ি। বাইরের একটা অসহায় ছোট মেয়ের কান্না সেই প্রাচুর্যের বেড়া পার হয়ে পৌঁছাতে পারে না। রুপালি চলে গেলেন। ঝিলিকের সবকিছু যেন ওর পলকে হারিয়ে যায়। তবু এগিয়ে আসেন মানিক। এতক্ষণে পরে তার মনে পড়ে মেয়ের কথা। তিনি কাছে টেনে নেন ঝিলিককে। ঝিলিক আর্তকণ্ঠে বলে,

"মা চলে গেল বাবা? আমাকে ফেলে চলে গেল?"

একটা শিশুর এই প্রশ্নের কোনও জবাব দিতে পারেন না মানিক বোস। মনে হয় তার, আজকের

সমাজের হঠাৎ পাওয়া সুবিধের জন্য দায়ী তারা। তাই এই জীবনযাত্রাকে অতি সহজেই কলুষিত করেছেন তারা। যার ফলভোগ করতে হবে আগামী প্রজন্মকে। যার ফলে মূল্যবোধ, মানবিকতার দিকটাই বিপন্ন হবে সবচেয়ে বেশি।

মানিক মেয়েকে কাছে টেনে সান্ত্বনা দেন, "আমি তো আছি, আয় ঝিলিক।"

অসহায় ঝিলিক আজ অনেক কিছু হারিয়ে যেন বাবার ওই কথায় সান্ত্বনার আশ্বাস খোঁজে।

কিন্তু ঝিলিকের কিশোরী মন আবার আঘাত পায়। মা চলে যাওয়ার পর কাজের মেয়েই এখন তার বাড়ির সব কিছু দেখাশোনা করে। ঝিলিক স্কুলে যায়। সেটুকু সময় ও বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে ভালই থাকে। হাসিখুশি, নাচগান আর পড়াশোনার মধ্যে। বাড়ি ফিরতে মন চায় না। বাড়িতে কাজের মেয়েকেও দেখেছে এদিকে একটা কাজের লোকের সঙ্গে হাসি-মশকরা করতে। কাজের মেয়েও ঝিলিককে ফিরতে দেখে বলে,"এত তাড়াতাড়ি স্কুলের ছুটি হয়ে গেল, না স্কুল থেকে চলে এসেছ মা বলে?"

ঝিলিক বলে, "তা কেন আসব? ক'টা বাজে দ্যাখো না মতিদিদি। পাঁচটা বেজে গেছে।"

কাজের মেয়ে হরিমতির এবার খেয়াল হয়। ওদের প্রেমালাপ বন্ধ হয়। ওবাড়ির কাজের লোক গাজন বলে, "চলি, সাহেবের ফেরার সময় হয়ে গেছে।"

মতি ঝিলিককে বলে, ওই গাজন যে এখানে আসে তা সাহেবকে যেন না জানায়।

ঝিলিক বুঝতে পারে এদের জীবনের এইসব গোপনীয়তা এরা প্রকাশ করতে চায় না। হয়তো তার মায়ের জীবনেও তেমন কোনও গোপনীয়তা ছিল, যেটা তার মা প্রকাশ করতে চাননি। তাই তার মা তাদের ফেলে চলে গেছেন।

২

মানিক বোস এখন বাধাবন্ধহীন মুক্ত পুরুষ। রুপালি ডিভোর্স চেয়ে মামলা করেছিলেন। আর মানিক তাকে মুক্তি দিয়েছেন। তাই অনায়াসেই মানিক বোস রুপালিকে ভুলে যেতে পেরেছেন। এখন তার জীবনে আরও এগিয়ে এসেছেন মীরা। তার মালিক মিঃ রায়ের একমাত্র কন্যা।

মিঃ রায়ের ফ্যাক্টরিও এখন মানিকই দেখাশোনা করেন। মিঃ রায়ের শরীর ভাল যাচ্ছে না। একমাত্র মেয়ে মীরার জন্য, কারখানার জন্য একটা বিশেষ ভাবনা ছিল মিঃ রায়ের। এখন সে ভাবনা কিছুটা দূর হয়েছে। তিনিও এবার মীরার সঙ্গে মানিকের বিয়ের কথাটা ভাবছেন। মীরাও এখন মানিকের বাংলোতে আসেন মাঝে-মাঝে। তিনি দেখেছেন অসহায় ঝিলিককে। তার দেখাশোনারও কেউ নেই। ঝিলিক দেখেছে মীরাকে। মা যেমন একটা ঠাণ্ডা গাড়িতে করে চলে গেছিলেন, তেমনই আর-একটা ঠাণ্ডা গাড়িতে করে আসেন মীরা।

প্রথম দিন যখন ওই গাড়িটা আসে, ছুটে গেছিল ঝিলিক, "মা, মা, তুমি এসেছ!"

গাড়ির দরজা খুলে নামেন মানিক। ঝিলিক বলে,"বাপি! মাকে এনেছ?"

অনেক আশা নিয়ে ছোট মেয়েটা বাবার কাছে ছুটে গেছিল। ভেবেছিল মা-বাবার ঝগড়াটা মিটে গেছে। কিন্তু থমকে যায়। দেখে গাড়ি থেকে অন্য এক মহিলাকে নামতে। ঝিলিক হতাশ, স্তব্ধ, তার সব খুশির রঙিন বেলুন চুপসে গেছে।

মানিক বলেন, "ঝিলিক, ইনি মীরাদেবী। মিস রায়, এই ঝিলিক!" ঝিলিক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে। মীরা তাকে কাছে ডাকেন, "এসো, কাছে এসো। ভারী সুন্দর নাম তোমার, ঝিলিক!"

মানিকও বলেন, "যাও উনি ডাকছেন। যাও।"

ঝিলিক এগিয়ে যায়। মীরা ওকে কাছে টেনে নেন। ওর ওই স্পর্শটুকু ঝিলিকের মনে একটা সব হারানোর জ্বালাকেই তীব্রতর করে তোলে। তার মা-ও অনেক দিন আগে কাছে টেনে নিতেন। তারপর সেইসব এখন ঝিলিকের মনে এক বেদনাদায়ক স্মৃতিতে পরিণত হয়েছে। বাস্তবে তার কোনও অস্তিত্বই নেই।

মিস রায় ঝিলিকের জন্য অনেক কিছুই নিয়ে আসেন। মাঝে-মাঝে আসেন বাংলোতে। ঝিলিক ওর আসাটাকে ঠিক মেনে নিতে পারে না। ওর মনে হয়, মা বোধ হয় বাবার সঙ্গে মীরার মেলামেশার কথা জানত, আর তাই বাবার সঙ্গে ঝগড়া করে চলে গেছেন। মা চলে যাওয়ার মূল যে এই মিস রায়, এটাই এবার ঝিলিকের মনে হয়। আর তাই ঝিলিকও মীরাকে ঠিক মেনে নিতে পারে না। তবে বাইরে তার প্রকাশ কিছু ঘটায়নি। এটা তার নিজস্ব গোপন চিন্তা। তাই এটাকে মনের মধ্যেই ঝিলিক রেখেছে গোপনে। ঝিলিকের মানসিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করার মতো সময় অবশ্য মানিক বোস ও মীরা রায়ের নেই। মিঃ রায় এবার ওদের বিয়ে সেরে মীরার হাতে ব্যবসাপত্র, ফ্যাক্টরির সব ভার তুলে দিয়ে অবসর নিতে চান। তারই ব্যবস্থা করছেন।

ঝিলিক সেদিন স্কুল থেকে ফিরে হরিমতি আর গজনের কথা শোনে। এখন মানিক বাংলোতে আসেন রাত্রে। অন্য সময় ঝিলিক না থাকলে হরিমতিই বাংলোতে থাকে। আর ওবাড়ির কাজের লোক গাজনও আসে। ওদের প্রেমালাপ ভালই চলে। ঝিলিক বাংলোয় ঢুকে কথাটা শোনে। হরিমতি বলে, "এবার মানিকসাব তো বড় বাংলোয় চলে যাবেন। এই মালিকের জামাই হয়ে।"

গাজন বলে, "তাই তো শুনছি রে।"

ঝিলিক কথাটা শুনে থমকে দাঁড়ায়। ওই মহিলাকে বাবা বিয়ে করছেন। ঝিলিক এবার বুঝেছে, মা কেন চলে গেছেন। যে মহিলার জন্য তার মা চলে গেছেন এ-বাড়ি থেকে, তার জীবন থেকে এবার সেই মহিলাকেই তাকে মেনে নিতে হবে। আজ তার মনে হয়, ভাল-মন্দের দিকে তার বাবা এতটুকু নজর দেননি। তার কথাও ভাবেননি, ভেবেছেন শুধু নিজের কথাই। পরম স্বার্থপর জগতের রূপটাই এবার ঝিলিকের চোখের সামনে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।

এর কিছুদিন পরই মানিক আর মীরার বিয়ে হয় বিরাট অনুষ্ঠান করে। অবশ্য ঝিলিক সেদিন কোথাও যায়নি। একাই বাংলোয় তার নিজের ঘরে বসেছিল।

হরিমতি বলে, "যাবে না?"

ঝিলিক জবাব দেয় না। সেই রাতে খাবারও খায়নি সে। কেন জানে না, বারবার তার মায়ের কথাই মনে পড়ছিল। মা চলে যাওয়ার পর তাদের কোনও খবর নেননি। ঝিলিকের মনে হয়, এই পৃথিবীতে সবাই যে-যার নিজের জগৎ নিয়ে রয়েছে।

সেখানে অপরের কথা ভাবার সময় নেই। ঝিলিকও যেন নির্জন, নিঃসঙ্গ একটি দ্বীপ, যার চারদিকে অন্তহীন সমুদ্রের বিক্ষোভ।

সেই বিক্ষোভের জ্বালায় সেও যেন একট নীরব প্রতিবাদী চরিত্রে পরিণত হয়েছে।

মানিক বোস অবশ্য ঝিলিকের কোনও অভাবই রাখেননি। তারপর বেশ কয়েকটা বছর কেটে গেছে।

৩

সময় বয়ে চলে নিজের স্রোতে। ঝিলিক এখন থাকে শহরের এক বিরাট বাগান-ঘেরা বাংলোয়। তার নিজের গাড়ি, ড্রাইভারও আছে। কলেজে পড়ে ও। বাইরের প্রাচুর্য থাকলেও ঝিলিক অন্তরে-অন্তরে একটা দৈন্যকে অনুভব করে। এ-বাড়িতে সে যেন ওই মীরা বোসের দয়াতেই রয়েছে। অবশ্য ওই ভদ্রমহিলা ঝিলিকের সঙ্গে ভাল ব্যবহারই করেন। তবে ঝিলিক তাকে মা বলে ডাকতে যেন দ্বিধা বোধ করে। মানিকবাবু এখন এসব কারখানা, ব্যবসার মালিক হয়েছেন। তাঁর হালচালও বদলে গেছে। এখন দামি সুট পরে পাইপ মুখে চেম্বারে বসে কাজ করেন। মাথায় মস্ত টাক পরেছে। ওটা নাকি টাকা বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়তে থাকে। মীরাও অফিসে বসেন। ঝিলিক সেই একাই। কলেজে তবু বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে হইচই করে সময়টা কেটে যায়। এর মধ্যে এ বাড়িতে আরও একজন এসেছে। তার নাম স্বাতী। মিঃ বোস ও মীরার সন্তান।

মীরা এখন নিজের সংসার গড়ে তুলেছেন নিজের সন্তানকে নিয়ে। অবশ্য তার জন্য আয়া, নার্স সবই আছে। তবু মীরা চান তাঁর নিজের সন্তানকে কাছে পেতে। অফিস থেকে সকাল-সকাল ফিরে আসেন। ঝিলিক দেখে মীরা স্বাতীকে নিয়ে বাগানে খেলা করছেন। ছোট মেয়েটা দৌড়ে এসে মাকে ছোট হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে। অনাবিল হাসিতে ফেটে পড়ে মা আর মেয়ে।

ঝিলিকের মনে পড়ে তার ছেলেবেলার কথা। তার মাকেও সে এমনি করে জড়িয়ে ধরত। আজ এই মহিলার জন্যই তার মা হারিয়ে গেছেন। ঝিলিকের জন্য কোথাও এতটুকু নিশ্চিন্ত স্নেহছায়া নেই।

ওকে বাগানে ওভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মীরা কঠিন কণ্ঠে বলেন, "ঝিলিক। কাল তোমার এগ্‌জাম। আর তুমি এখনও পড়া ছেড়ে বাগানে ঘুরছ? যাও, পড়তে বসো।"

ঝিলিক দেখছে মীরাকে। তার মনে হয়, মা-মেয়ের মধুর মিলনদৃশ্যটাও যেন তার সামনে ঘটাতে চান না মীরা বোস। তাই তিনি সরিয়ে দিতে তান ঝিলিককে। জীবনের সব সুন্দর থেকেই বঞ্চিত করেছেন ওই মহিলা।

ঝিলিক তবু বাবাকে একান্তে পেতে চায়। এই বড় বাড়িটায় অচেনা বিজাতীয় পরিবেশে ওই বাবাই যেন তার পরিচিতজন। মানিক বোস এখন খুবই ব্যস্ত। সমাজে তিনি এক পরিচিত নাম। নিজের চেষ্টায় তিনি একজন শিল্পপতি। তাই তাঁর কাজও অনেক। বাড়িতেও নিজের চেম্বারে বসে কাগজপত্র দেখতে হয়। পরের দিন কাজের রুটিন করতে হয়। ঝিলিক আসে। বাবার সান্নিধ্য পেতে চায় সে। কিন্তু সেখানেও সেই বাধা। মানিক বোস তখন তাঁর পি.এ-কে আগামী দিনের বোর্ড মিটিং-এর জন্য নোট দিচ্ছেন। ওকে দেখে বলেন, "ঝিলিক। কিছু বলবে?"

"না। এমনিই এলাম"।

নিভৃতে বাবার সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিল। কিন্তু বাবাকে একান্তে পাওয়ার কোনও অধিকার তার নেই। মীরা ঘরে ঢোকেন, হাতে তাঁর ফাইল। বলেন, "ব্যালেন্সশিটের ড্রাফটটা তৈরি আছে। দেখে নাও।"

মানিককে ফাইলটা এগিয়ে দিয়ে ঝিলিককে দেখে বলেন,

"এখানে কেন?"

ঝিলিকের এখানে থাকারও অধিকার নেই। ঝিলিক ম্লান মুখে উঠে বের হয়ে যায়। ওঁরা ঝিলিকের দিকে চেয়েও দেখেন না। ব্যবসার লাভ-ক্ষতি খুঁজতে ওঁরা ব্যস্ত। এখানে স্নেহ-মায়া-মমতার কোনও দাম নেই।

ঝিলিক কলেজে পড়ছে। তার রূপ-যৌবন তাকে মোহময়ী করে তুলেছে। ঝিলিক বাড়িতে নিঃসঙ্গ, একা। কিন্তু কলেজে সে অনেকেরই প্রিয়। আর তরুণ যৌবনের দীপশিখা তাকে যেন আরও ঘনিষ্ঠভাবে টেনে এনেছে পাদপ্রদীপের নীচে। ঝিলিকও চায় অনেকের বন্ধু হতে। বাড়িতে তার চারদিকে একটা নির্জনতার, নিঃসঙ্গতার ঘেরাটোপ। কিন্তু বাইরে সেই বাধাটা সরে যায়। ঝিলিকের মন চায় আরও অনেক কিছু পেতে। সে নাচ জানে, গানও গায়। খেলাধুলোতেও ভাল। তাই তার বন্ধু পেতে দেরি হয় না।

কলেজের ছেলেমেয়েরা সহজেই তার আপনজন হয়ে ওঠে। তেজি, প্রতিবাদী ঝিলিক এখানে ছেলেদের অনেকের ঔদ্ধত্যের উচিত জবাব দিয়ে মেয়েদের নেত্রী হয়ে উঠেছে। ঝিলিক যেন বাইরে এসে এক অবাধ মুক্ত জীবনের সন্ধান পেয়েছে। এতদিন ধরে ঝিলিক সেই ছেলেবেলা থেকেই একটার পর একটা আঘাত নীরবে সহ্য করেছে, করতে বাধ্য হয়েছে। তার মা নিজের স্বার্থে তাকে ত্যাগ করে গেছেন জবাব দিতে পারেনি। তার বাবাও ঝিলিকের দিকে তেমন নজর দেননি, নীরবে অবহেলাই করেছেন ঝিলিক তাও সহ্য করেছে। সহ্য করেছে তাদের সংসারে মীরার আসাটা। ওঁদের শাসন মেনে নিয়েছে এবার বাইরের জগতে এসে আজ ঝিলিকও যেন নিজের এক প্রতিবাদী সত্তাকে ফিরে পেয়েছে। তাই কলেজে ছেলেদের জুলুমের প্রতিবাদ করে তৃপ্তি পায়। ঝিলিক মনে-মনে প্রতিবাদের শক্তি, সাহস সঞ্চয় করতে থাকে। সমাজের অনেক অন্যায়ের বিরুদ্ধে, স্বার্থপরতার বিরুদ্ধে সে মাথা তুলতে চায়।

কলেজের দু'-চারজন বন্ধুও আসে ঝিলিকের বাড়িতে। ঝিলিকের ঘরটা বাইরের দিকে। তবু মীরার সবদিকে নজর থাকে।

মাঝে-মাঝে ওর বন্ধুদের হইচই কানে আসে। মানিক বোসের বাড়ি হলেও এ-বাড়ি তাঁর বাবারই দেওয়া। তাই তাঁর কিছুটা প্রাধান্য রয়েছে। তাঁর মেয়ে স্বাতীকে অবশ্য মীরা ঝিলিকের কাছ থেকে দূরেই রাখেন।

মানিকবাবুও এটা দেখেছেন। তিনি মীরাকে বলেন,"ঝিলিকের কাছে ওকে যেতে দাও না কেন?"

মীরা অবশ্য জানেন, মানিকের প্রথমা স্ত্রী রুপালির কথা। তিনি এখন মিঃ আগরওয়ালের সঙ্গেই থাকেন। অবশ্য বিয়ে-থা হয়নি ওদের। রুপালি এখন তার অস্তগামী রূপকে প্রজ্জ্বলিত করে রাখতে চান। ওই সমাজের অনেকেই নাকি তার রূপের আগুনে এখনও ঝাঁপ দিতে চায়। মীরা সেসব খবর কিছু-কিছু রাখেন। তবে মানিকের সঙ্গে এ-নিয়ে কোনও কথা তার হয়নি। মানিক রুপালিকে ভুলে গেছেন। তাই মানিকের কথায় মীরা বলেন, "মায়ের রক্ত তো ঝিলিকের দেহে। তা ছাড়া আমার মেয়েকে আমি আমার মতো করে বড় করব, মানুষ করব।"

মানিকও চুপ করে যান। মীরার কথার উপর কথা বলার সাহস তাঁর নেই। তিনি জানেন যে, আজ তিনি মিঃ বোস হয়েছেন ওই মীরার জন্যই।

ঝিলিকও জানে তার বাবা একজন মেরুদণ্ডহীন মানুষে পরিণত হয়েছেন। তিনি আজ মীরা বোসের কারখানার অলিখিত জেনারেল ম্যানেজার। মালিক ওই মীরা বোস। তাই ঝিলিকও মনে-মনে মীরা বোসের ঐশ্বর্যের দম্ভ, প্রতিষ্ঠাকে ঘৃণা করে। মীরা সেদিন বলেন ঝিলিককে," তোমার বন্ধুবান্ধবরা বাড়িতে এত হইচই করে কেন? সভ্য সমাজের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ঘোরো?"

ঝিলিক দেখছে মীরাকে। ঝিলিক বলে, "ওরা সকলেই ভদ্রঘরের ছেলেমেয়ে। আর ভদ্রতার মাপকাঠিটা সকলের ক্ষেত্রে এক নয়, তা বুঝেছি।

"মানে? কী বলতে চাও তুমি?" মীরা ফুঁসে ওঠেন। ঝিলিক যে এভাবে তার কথার জবাব দেবে তা ভাবেননি। ওর কথাগুলোতে মীরা অপমানিত বোধ করেন।

ঝিলিকও চেয়েছিল মীরাকে আঘাতই দেবে। আর সেটা কিছুটা পেরেছে দেখে খুশি হয় ঝিলিক মনে মনে। সে বলে,"মানেটা নিজেই বুঝে নাও। ঠিক আছে, ওদের এখানে আসতে নিষেধ করব।"

মীরা জবাব দেবার আগেই ঝিলিক ওঁর মুখের উপর কথাগুলো ছুড়ে দিয়ে বের হয়ে যায়।

মীরা অসহায় রাগে ফুঁসছেন। আজ ঝিলিক মীরাকেও একটা কঠিন আঘাত করেছে। মীরা তাই ঝিলিকের সম্বন্ধে কিছু ব্যবস্থা নিতে চান। এই বাড়ি, এই প্রাচুর্য, সবই তাঁর। তাঁর বাড়িতে বসে, তাঁর অন্নে প্রতিপালিত হয়ে, তাঁর মুখের উপর জবাব দেবে ওইটুকু একটা অবাধ্য মেয়ে। এটাকে মেনে নেবে না মীরা। তিনি এ-নিয়ে মানিককে কিছু বলার প্রয়োজনীয়তাও বোধ করেন না। এবার তিনি ঝিলিকের ব্যাপারে নিজেই একটা সিদ্ধান্ত নেবেন। মীরা ভেবেচিন্তেই পথটা নিয়েছেন। এর মধ্যে মীরা তার বাবার আমলের পুরনো সরকারমশাইকে ডেনে এনে বলেন, "আপনি একটা ছেলের সন্ধান করুন। মোটামুটি কাজকর্ম করে, নিজের বাড়িঘর আছে। স্ত্রীকে প্রতিপালন করতে পারবে এমন একটা ছেলের খোঁজ করুন। ঝিলিকের বিয়ে দেব। তাদের মেয়ে অপছন্দ হবে না নিশ্চয়ই।"

সরকারমশাই তাঁর মালকিনের মেজাজ বোঝেন। তিনি জানেন এমন ছেলের খোঁজ তিনি পেয়ে যাবেন আর এই মওকায় সরকারও কিছু কামিয়ে নিতে পারবেন। তাই বলেন, "এমন ছেলের খোঁজ মনে হয় পেয়ে যাব। তবে কী জানেন মেমসাহেব, বরের বাপেরাও এখন অর্থলোলুপ হয়ে উঠেছে। এ-বাড়ির মেয়ে শুনলে বেশ কিছু টাকাই দাবি করে বসবে।"

মীরা বলেন, "ঠিক আছে। ও আমার নিজের মেয়ে না হলেও ওর বিয়েতে আমি খরচ করব। আর উপযুক্ত ছেলে হলে তার জন্য কিছু খরচ করতে হবে। তবে তাদেরও জানিয়ে দেবেন, ঝিলিক এ-বাড়ির পোষ্য মাত্র, আর কিছু নয়। আর হ্যাঁ, কথাটা গোপন রাখবেন। যা বলার আমাকেই বলবেন।"

সরকারমশাই অভিজ্ঞ মানুষ। তিনি বলেন, "তাই হবে মা। কাল থেকেই আমি নানা জায়গায় খোঁজ করছি।"

মীরা সেই কাজটা ত্বরান্বিত করার জন্যই সরকারের হাতে নগদ পাঁচশো টাকা দিয়ে বলেন, "যাতায়াতের খরচ বাবদ রাখুন। কাজটা তাড়াতাড়িই করতে হবে।"

সরকারও করিতকর্মা লোক। তিনি এর মধ্যে তাঁর চেনাজানা দু'তিনটে ছেলের সন্ধান খুঁজে বের করেন। ক'দিন ধরে খোঁজাখুজি করে সরকার শেষ অবধি তাঁরই পরিচিত এক ভদ্রলোকের সন্ধান পান। ভদ্রলোকের বাড়ি বরানগরে। ওখানকার পুরনো বাসিন্দা। পৈত্রিক বাড়ি একখানা আছে, তাঁর ছেলে নাকি ইছাপুরে গানসেল ফ্যাক্টরিতে কাজ করে। সরকারও সেই কনকবাবুকে বলেন সবই। আর জানান, লাখখানেক টাকার দাবি করতে। ওটা সরকারও চেষ্টা করবেন পাইয়ে দিতে। এছাড়া গহনা, অন্য জিনিসপত্রও পাবেন। ছেলের জন্য মোটরবাইক, কালার টিভি, ফ্রিজও। তবে ওই লাখ টাকার থেকে সরকারকে পঁচিশ হাজার টাকা দিতে হবে।

ছেলের বাবা কনকবাবু আদালতের পেশকার ছিলেন। তিনি আইনকানুন বোঝেন। যখনই শুনেছেন মেয়েটি বোসসাহেবের প্রথমা স্ত্রীর মেয়ে, তখনই তিনি হিসেবও করে নিয়েছেন, হিন্দু উত্তরাধিকার আইনের কথাগুলো। ভবিষ্যতে ঝিলিকেরও পিতৃধনে দাবি থাকবে। এটা নিয়ে কনকবাবু এখন কোনও কথাই তুলতে চান না। ওটা যথাসময়ে প্রকাশ করবেন। তবু সরকারকে বলেন,"আরে সব ঠিক আছে। তবে একলাখ নয়। দু'লাখই বরপণ দিতে হবে। আপনাকে পঁচিশ হাজার দেব।"

সরকার এসে মীরা বোসকে সব খবরই দেন। মীরা বলেন, "ভাল করে সব খোঁজখবর নিয়েছেন তো? ছেলের চাকরির জায়গায় গিয়েও খবর নিন। মানে, সব খবর ঠিক হলে তখন পাকা কথা হবে। তাঁদেরও নিয়ে আসবেন। তাঁরা মেয়েকে দেখে যাবেন।" সরকারমশাইও বুঝেছেন, আর সব খবর ঠিক হলে তাঁর পঁচিশ হাজার টাকা অনায়াসেই এসে যাবে। আর ম্যাডাম ছেলের জন্য দু' লাখই দেবেন।

সেদিন মানিক বোস বাড়ি ফিরেছেন একটু আগে। তাঁর মনটাও বেশ খুশি। ওঁদের কারখানায় বাইরের একটা বড় অর্ডারও এসেছে। আর সন্ধ্যার পর মানিক বোস বাড়িতে থাকলে একটু পানটানও করেন। ওই অভ্যেসটা মালিক হওয়ার পর থেকে শুরু করেছেন। ক্লাবে, পার্টিতেও একটুআধটু মদ্যপান করতে হয়। মীরা এসে বসেন। মানিক বোস তখন সবে দু'-এক পেগ চড়িয়ে মেজাজটাকে রঙিন করে তুলেছেন। মিঃ বোস বলেন, "তুমিও একটু নাও মীরা। এক যাত্রায় পৃথক ফল কেন হবে?"

মীরা বেশ সিরিয়াস মুডেই বলেন, "এখন থাক। জরুরি কথাটা সেরে নিই।"

"জরুরি কথা।" মিঃ বোস অবাক হন, "কী এমন জরুরি কথা?"

" আমি ভেবে দেখলাম, ঝিলিকের বিয়ে-থা দিয়ে এখনই সরানো উচিত। আমার মেয়ে আছে, তার কথাও ভাবতে হবে। তাই ঝিলিকের জন্য একটা ভাল ছেলের সন্ধান করেছি।"

মানিক বোসের এবার খেয়াল হয় ঝিলিকের ব্যাপারে। মেয়ের দিকে বাবার তাকানোর সময় নেই। মাঝে-মাঝে দেখা হয় এইমাত্র। সত্যিই ঝিলিক বড় হয়ে উঠেছে। মানিক মীরার কথার উপর কথা বলতে পারেন না। তা ছাড়া ঝিলিকও এখন তাঁর কাছে একটা বাড়তি বোঝামাত্র। অতীত জীবনের সেই দিনগুলোর প্রতীক। মানিক বোস ওসব অধ্যায় ভুলে যেতে চান এখন। তাই বলেন, "তা, বিয়ে-থা দেওয়াই ভাল"।

মীরাও নিশ্চিন্ত হন। ভেবেছিলেন মানিক হয়তো এ-নিয়ে কোনও প্রশ্ন তুলবেন। কিন্তু তিনি কোনও কথা না তুলে বিয়েতে মত দেওয়ার জন্য খুশিই হন মীরা।

মিঃ বোস বলেন," ছেলেটা ভাল তো? কী করে?"

মীরা বলেন, "সরকারমশাইকে দিয়ে সব খোঁজখবর নিয়েছি। ছেলেটা সরকারী চাকরী করে। নিজের বাড়ি এই কলকাতার কাছেই বরানগরে। ছেলে আর ছেলের বাবা কাল আসবেন। তুমিও থাকবে। কালই পাকা কথা হয়ে যাবে।"

মানিক বোস বলেন, "ঝিলিককে বলেছ? তার মতও নেওয়া দরকার।"

" সে আমি ঠিক সময়ই বলব। আর তার অমতও হবে না। ওসব আমি ম্যানেজ করে নেব।"

" তা হলে তো ভালই। একটা ঝামেলা মিটে যায়।"

"আমিও তাই চাই।"

অবশ্য ঝিলিক এসবের কিছুই জানে না। সে তখন তার গানের স্কুলের নৃত্যনাটের রিহার্সাল নিয়েই ব্যস্ত। এ-বাড়িতে ওদিকের ড্রয়িংরুমে নানাধরনের লোক আসে নানা কাজ নিয়ে। তাই ওই ছেলের বাবা আর ছেলের আসার ব্যাপারটাও ঝিলিকের নজরে আসে না। সে তখন শ্যামা চরিত্র নিয়ে ভাবছে। ও জানে না যে তার বিরুদ্ধে একটা গভীর ষড়যন্ত্র গড়ে উঠছে এ-বাড়িতে। সেদিন অনুষ্ঠান শেষ করে বাড়ি ফিরেছে ঝিলিক। মনে তখনও সেই শ্যামার প্রেমের উচ্ছলতা যেন কোনও অচিন রাজপুত্তুরের সঙ্গে কোনও অজানা স্রোতে ভেসে চলেছে। মীরাকে তার ঘরে আসতে দেখে তাকাল ঝিলিক।

মীরা বলেন, "ঝিলিক! আমরা তোমার বিয়ে ঠিক করেছি। আগামী বাইশ তারিখে বিয়ে।"

ঝিলিক চমকে ওঠে। কথাগুলো যেন বিশ্বাসই করতে পারে না, "বিয়ে! আমার।"

"হ্যাঁ। মেয়েদের তো বিয়ে করতেই হয়। ছেলেটিও ভাল। কলকাতাতেই বাড়ি। তোমার বাবাও দেখেছেন ছেলেটিকে। আর কথাও হয়েছে, বিয়ের পর পড়াশোনা করতে পারবে। তোমার গানটানেও ওঁদের আপত্তি নেই। আশা করি তোমারও আপত্তি হবে না"।

মীরা কথাগুলো ওর মুখের উপর টুকরো-টুকরো পাথরের মতো ছুঁড়ে দিয়ে চলে গেলেন। ঝিলিক স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। সে তখনও ভাবতে পারছে না যে, এইভাবে তার কোনও মতামত না নিয়ে ওঁরা একেবারে পাকা কথা দিয়ে বসবেন। অর্থাৎ ওঁরা ঝিলিকের মতামতের কোনও দামই দিতে চান না। তারও যে একটা ব্যক্তিসত্তা আছে, তারও নিজস্ব মতামত আছে, তার কোনও দামই না দিয়ে তাকে বিয়ের নামে একটা অজানা অচেনা ছেলের হাতে তুলে দিয়ে তার জীবনকে শেষ করে দিতে চান। ঝিলিকের স্বপ্ন ছিল, সে নামী শিল্পী হবে। তার নাচের ছন্দে নিজেকে মেলে ধরবে মানুষের সামনে। সুরের আকাশে নিজেকে বিলিয়ে দেবে।

কিন্তু তা আর হবে না। ওরা তার সব আশা, স্বপ্নকে শেষ করে দিতে চান। ঝিলিক আজ নতুন করে ভাবছে তার অতীতের ঘটনাগুলোকে। আজ সে উনিশ বছরের পরিণত, যুক্তিসঙ্গত মনন দিয়ে ঘটনাগুলোকে বিশ্লেষণ করতে চায়। তার প্রতিবাদী মন নীরবে এত বড় অন্যায়, অত্যাচারকে মেনে নেবে না।

৪

বিজন গ্র্যাজুয়েশন করে চাকরির চেষ্টা করছে। মধ্য কলকাতার একটা অন্ধকার গলির মধ্যে পুরনো পলেস্তারা খসা একটা মেসে থাকে। সাবেকি আমলের এই বাড়িটায় অতীতে একদিন কয়েকজন অফিসকর্মী মিলে মেস করেছিলেন। সেই থেকে একদল বোর্ডার আসেন, অন্যদল রিটায়ার করে দেশের বাড়িতে চলে যান, কেউ বা থেকে যান কলকাতার শহরতলিতে। আবার নতুন বোর্ডার আসেন।

· এমনি আসা-যাওয়ার ভিড়ে শামিল হয়ে ক'বছর আগে এনেছিল বিজনকে তার বন্ধু জন পল। একই কলেজে পড়ে তারা। অবশ্য জন পলের তালতলার দিকে নিজেদের বাড়ি আছে। সংসারে ওর আপন বলতে দিদিমা কাঞ্চনমালা। ওর দিদিমার বয়স এখন সত্তর ছাড়িয়ে গেছে। বিজনের তখন থাকার জায়গা নেই। ওর এই সংসারেও কেউ নেই। গ্রাম থেকে জমিজিরেত যা ছিল তা বেচে শহরে এসেছে। এখানকার কলেজে ভর্তি হয়েছে। রয়েছে গ্রামের একজন পরিচিত লোকের মেসে। সেখানেও অসুবিধা হচ্ছে। জন পলের আদিবাড়ি উত্তরবঙ্গে। ওর মায়ের মা কাঞ্চনমালা বা কাঞ্চি ছিলেন তরাই অঞ্চলের কোনও চা-বাগানের মেয়ে। সেই চা-বাগানের মালিক ছিলেন খাস ইংরেজ রবার্ট পল।

সাহেবের নজরে পড়েন সেই সুন্দরী তরুণী মেয়েটি। চা-বাগানের অন্য কুলি-কামিন মেয়েদের সঙ্গে তিনি যেতেন পাতা তুলতে। নরম আঙুলের চাপে কচি দুটো সবুজ পাতা আর-একটা কুঁড়ি উঠে আসত হাতে। তারপর বোঝাই করতেন পিঠের ঝুড়িতে। আর মিষ্টি সুরে গান গাইতেন। বর্ষার সময় মেঘগুলো উপরের পাহাড়, চা-বাগানে লুকিয়ে পড়ত। রবার্ট পল তখন ইংরেজ তরুণ। হঠাৎ তার চোখ পড়ে কাঞ্চির দিকে।

কাঞ্চির ওই সুর, তার কালো চোখের ডাগর চাহনি, বৃষ্টিভেজা যৌবন, উচ্ছল দেহের সোচ্চার রেখাগুলো বিদেশি নিঃসঙ্গ রবার্ট পলের মনে যেন কী সাড়া জাগায়। তরুণ রক্তে মাতন জাগে, রবার্ট চাইলে আর পাঁচজন সাহেবদের মতো কাঞ্চিকে ভোগ করে দূর করে দিতে পারতেন অনায়াসেই। কিন্তু তা করেননি। রবার্ট কাঞ্চিকে তাঁর বাবার অনুমতি নিয়ে বিয়ে করে স্ত্রীর মর্যাদা দিয়েই বাংলোতে নিয়ে গেছিলেন। তাঁদের একটা মেয়ে ছিল, যার নাম নীলম। নীলমের রক্তে ছিল ব্রিটিশ রাজত্বের প্রভাব। সুন্দরী নীলমকে রবার্ট দার্জিলিং-এর নামীদামী স্কুলে পড়িয়েছিলেন। এরপর দেশ স্বাধীন হল।

বিদেশি রবার্ট এতদিন এদেশে ব্যবসা করেছেন। এখন তাঁর বয়সও হয়েছে। আর এদেশে থাকতে চান না তিনি। তাই দেশে ফিরে গেছিলেন। অবশ্য তাঁর ওই চা-বাগান, ফার্ম, বাংলোয় মায় কলকাতার একটা বাড়ি, সবই দিয়ে গেছিলেন তাঁর স্ত্রী কাঞ্চিকে। রবার্ট দেশে ফিরে যাওয়ার পর কাঞ্চি তাঁর ভাইকে চা-বাগান চালানোর ভার দিয়ে মেয়েকে নিয়ে কলকাতার বাড়িতে আসেন। নীলমের বিয়েও দিয়েছিলেন। কিন্তু তার ভাগ্যে সুখ ছিল না। বিয়ের কয়েক বছর পর ওই সন্তানের জন্ম দিতে গিয়ে নীলম মারা যায়। আর তার স্বামীও কয়েক বছর পর চা-বাগানে যাওয়ার পথে গাড়ি দুর্ঘটনায় মারা যায়। কাঞ্চির সম্বল ছিল ওই নাতি জন পল। ছোট ছেলেটাকে কাঞ্চিই মানুষ করেন।

ক্রমশ পলও বড় হয়ে ওঠে। কলেজে পড়ছে। কাঞ্চির বয়স হয়েছে, তবু পাহাড়ি মেয়ে, তাই দেহের বাঁধুনি এখনও অটুট আছে। আর তাঁর স্বামী রবার্ট পলের সঙ্গে অনেকদিন ঘর করে তাঁর চা-বাগানের কাজ, চায়ের ব্যবসাটা ভালই বোঝেন।

কলকাতায় বসেই বাগান চালান। আর এখনও টি-অকশন সেন্টারে যান, চায়ের ব্যবসাটা এখনও বজায় রেখেছেন কাঞ্চি। এবার পল পাস করলে কাঞ্চনমালাও ওকে টি-অকশন এর কাজে লাগিয়ে দেবেন। পলও দেখতে সুন্দর, সুপুরুষ। ওকে দেখে কাঞ্চির সেই তরুণ রবার্টের কথা মনে পড়ে। একই রকম নাক-মুখ-চোখ। চোখের তারাটাও নীলচে। ওর রক্তে রবার্টের রক্ত প্রবাহিত। আর রবার্টের মতো তার দিলও দরাজ। অন্যের জন্য কিছু করতে পারলে ও খুশি হয়।

পলের সঙ্গে এ-বাড়িতে আসে বিজনও। কাঞ্চির সঙ্গে পল পরিচয় করিয়ে দেয় বিজনের। পল বলে, "দিদা! এই বিজন আমার বিশেষ বন্ধু। বিজন, ও আমার গার্লফ্রেন্ড। আমার দিদা মিসেস কাঞ্চনমালা।"

কাঞ্চনমালার বয়স হচ্ছে, তবু এখনও তাঁর অতীতের রূপের কিছু আভাষ রয়েছে। বিজন বলে, "তুই খুব লাকি রে জন। এমন গার্লফ্রেন্ড পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার।"

কাঞ্চনমালা হাসেন। বলেন, "কেন রে? তোর হিংসে হচ্ছে?" বিজনও মহিলার কথায় খুশি হয়। বলে, "তা একটু হচ্ছে বই কি!" "তা হলে তোর গার্লফ্রেন্ডও হতে রাজি। কী রে পল!"

পল বলে, "দিদা, ওসব হিসেব পরে হবে। বিজনের মেসের মিল বন্ধ করে দিচ্ছে কাল থেকে। কিছু খাবারের ব্যবস্থা করো তো তোমার নতুন বয়ফ্রেন্ডের জন্য।"

কাঞ্চি অবাক হন, "ওর মেসের মিল বন্ধ করে দিচ্ছে? হোয়াই? কাহে?"

"ওসব কথা ছাড়ো তো দিদা।"

কাঞ্চি যেন বদলে যান। হাঁকডাক করে কাজের লোককে দিয়ে খাবার আনান। ফ্রিজ থেকে কিছু সন্দেশ বের করে নিজেই ওদের দিয়ে বলেন, "আগে খা। তারপর কথা হবে।"

কাঞ্চিই পলের কাছ থেকে বিজনের অসহায় অবস্থার কথা শুনেছিলেন। বিজন কলেজের অন্যতম সেরা ছাত্র। অথচ পয়সার অভাবে ঠিকমতো পড়তে পারে না। টিউশনি করে নিজের খরচ চালাতে হয়।

কাঞ্চি বলেন, "পল, চা-বাগান থেকেই ওর পড়া-থাকার জন্য খরচ যাবে। বিজন, তুমি এম.এ. পড়বে।"

বিজনের অভাব রয়েছে, তবু বিজন অযাচিতভাবে এই সাহায্য নিতে চায় না। তার সম্মানে বাধে। তাই বলে, "গার্লফ্রেন্ড, জানা রইল আমার ব্যাঙ্ক এখানেই রয়েছে। দরকার হলে আমিই চেয়ে নেব"।

পলও জানে বিজনের অবস্থাটা। তার সম্মানজ্ঞানকেও চেনে পল। তাই বলে, "ও.কে. বিজন, এখন যা করার আমায় করতে দে।" সেই থেকে পলই বিজনের মেসের টাকা মিটিয়ে দেয় জোর করে। তবু বিজন বলে, "আমাকে আমার লড়াই লড়তে দে পল। দরকার হলে তোকে ডাকব।" বিজন কোনওরকমে এটা-সেটা করে তার পড়ার খরচ তোলার সংগ্রাম চালিয়ে যায়। তবু মাঝে-মাঝে বিপদে পড়ে বিজন। টিউশনির টাকা ঠিকমত পায় না। ফলে মেসের মিলও বন্ধ হয়ে যায়। এর মধ্যে বিজন একটা পথ বের করেছে। সেবার ক'দিন মিল বন্ধ, একবেলা মুড়ি-চিঁড়ে খেয়ে থাকে। তবু সেকথা পলকে জানতে দেয় না। সে-রাতে বিজন টিউশনি করে ফিরছে। দেখে ওদিকে একটা বড় বাড়িতে বিয়ের অনুষ্ঠান চলছে। মঞ্চ তৈরি করে নাচগানও চলছে। বিজন দর্শকদের মধ্যে রয়েছে সেই বিয়েবাড়ির কর্তারা ওদিকে ভূরিভোজের ব্যবস্থাও করেছেন। তাঁরাই বলেন, "একটা ব্যাচ বসে যান প্লিজ। দেরি হচ্ছে। চলুন দাদারা।"

সেই জনতার ভিড়ে মিশে গেছে বিজন। কর্মকর্তারা তাকেও বসিয়ে দেন। বিজনের আজ রাতে খাবার সংস্থান নেই। কিন্তু কে যেন ডেকে নিয়ে গিয়ে বিজনকে নানা সুখাদ্য খাইয়ে দিল। বিজন দেখে বিয়েবাড়ির জনতার ভিড়ে এইভাবে মাঝে-মাঝে বেশ সুখাদ্য সমাদরের সঙ্গে খাওয়া যায়।

সেই শুরু। তারপর বিজন দু'-দশটা বিয়েবাড়িতে গেছে। অবশ্য এর মধ্যে সেও এই বিয়েবাড়ির ব্যাপারে বেশ কিছুটা অভিজ্ঞ হয়ে উঠছে। ওর পুঁজি মাত্র খানদুয়েক জামা-প্যান্ট। তবু সে নিজেই ওসব কেচে যত্ন করে আর এর মধ্যে বিয়েবাড়ির খবরও কিছু পেয়েছে সে। মাঝে-মাঝে বরযাত্রী, কনেযাত্রী, নিমন্ত্রিতদের ভিড়ে মিশে গিয়ে সুখাদ্য খেয়ে আসে। এ যেন তার কাছে একটা খেলায় রূপান্তরিত হয়েছে। এজন্য সে মনে-মনে একটা যুক্তিও খাড়া করেছে। ওই বিয়েবাড়িতে বিজন দেখেছে, সমাজের একটা বিশেষ শ্রেণী যারা মানুষকে ঠকিয়ে প্রভুত সম্পদ অর্জন করেছে, তাদেরই রাজত্ব। তারা লাখ-লাখ টাকা হাওয়ায় ওড়ায়। সাধারণ মানুষদের কথাও ভাবে না। ওই উৎসবে তাদের প্রতিষ্ঠা, প্রাচুর্যকে কায়েম করতে চায়। তাই সে ওদের ওইভাবে ঠকিয়ে, ওদের অন্যায়, অত্যাচারকে কিছুটা জবাব দিতে চায় এইভাবে। সে এই পেশায় বেশ অভিজ্ঞ হয়ে উঠেছে। নিমন্ত্রিতদের দলে সহজেই মিশে যায়। তার চেহারায় একটা মার্জিত মধ্যবিত্ত ছাপ রয়েছে। যথেষ্ট রুচিশীল। তাই কোনও অসুবিধে হয় না। একটা ব্যাচে সে বসে পড়ে। হাসি-হাসি মুখে আর পাঁচজনের মতো রান্নার তারিফও করে। পানটা হাতে নিয়ে এদিক-ওদিক দেখে খাওয়ার পর নীরবে সরে পড়ে। মনে হয় বিজনের, আর একটা মালকে ঠকাতে পেরেছে আজ। সেদিনও বিজন নিমন্ত্রণ বাড়িতে যাওয়ার প্রোগ্রাম করছে, বাড়িটা একটু দূরে। আর দূরে বলেই ভালই হয়। কারণ স্থানীয়, পরিচিত কেউ থাকবে না। সেদিন পলও এসেছে বিজনের মেসে। অবশ্য গোপনে পল জেনেছে যে, বিজন গত দু'মাসের টাকা দিতে পারেনি। কয়েকদিন নো-মিল চলছে তার। পল টাকাটা ম্যানেজারকে দিয়ে বলে, "ওকে জানাবেন না যে আমি দিয়েছি।"

ম্যানেজার জানেন পল আর বিজনের সম্পর্কটা। তিনি বলেন, "বিজনবাবু তো পড়াশোনায় শুনেছি এস্টার। দু'-একটা স্কুলে ওকেও ডাকছে। আরে মশাই, এম.এ.পিএইড .ডি. না করে মাস্টারিই করতে বলুন। এখন তো রাজার চাকরি ওই মাস্টারি।" পল বলে, "ও কি শুনবে? করুক যা করছে।"

বিজনের ঘরে গিয়ে দেখে বিজন তখন বেশ মনোযোগ দিয়ে জুতোয় কালি লাগিয়ে ব্রাশ গিয়ে ঘষছে।

পল বলে, "কী রে, জুতো পালিশের কাজে হাত পাকাচ্ছিস নাকি!"

বিজন বলে, "দাঁড়া, তোর দামী সুটের সঙ্গে জুতোটা মানাচ্ছে না। ছেড়ে দে, আমি পালিশ করে দিই।"

পল বলে, "থাক। আমার এই ভাল।"

বিজন বলে, "তা সত্যি। চেনা বামুনের পৈতের দরকার হয় না। তোর গাড়ি, সুট, আর ওই হিরো মার্কা চেহারাই ঢের।"

কী ভাবে বিজনও পলকে তার কেরামতি দেখাতে চায়। সে বলে, "পল, এসেছিস ভালই হয়েছে। চল, সন্ধেবেলা একটু ঘুরে আসবি আমার সঙ্গে।"

"কোথায় রে! সত্যিকরে কোনও গার্লফ্রেন্ডের ওখানে যাবি নাকি!

তাই জামা-প্যান্টে মাঞ্জা দিচ্ছিস, জুতো পালিশ করছিস?"

"চল তো, দেখবি নিজের চোখেই।"

পল বলে, " তোর গার্লফ্রেন্ডকে যদি ভাগিয়ে দিই, তখন তো বুক চাপড়াবি আর গাল দিবি।"

"আরে না না, তুই তা করবি না জানি।"

"দ্যাখ, এত বিশ্বাস করিস না। নাথিং ইজ আনফেয়ার ইন লাভ অ্যান্ডওয়ার।"

বিজন হাসে। বলে, "গাড়ি এনেছিস তো?"

গাড়ি হাঁকিয়ে আজ এই বিয়েবাড়িতে যাবে বিজন পলকে নিয়ে। বাড়িটা কোনও এক বড় শিল্পপতির। এদিকটাও নির্জন। বিশাল এলাকা জুড়ে দীর্ঘ সীমা প্রাচীর। ভিতরে বাগান, সামনের লনে প্যান্ডেল করা হচ্ছে। রঙিন আলোয় বর্ণময় হয়ে উঠেছে বাগানটা। মৃদু স্বরে সানাই বাজছে, বাড়ির বাইরে অনেক ভিড়। গাড়ির সারি। পল এসে থামে বিজনকে নিয়ে। বিজন আগে থেকেই জানত। সে বলে "এই বাড়িতে যাব।"

গাড়ি রাখার জায়গা কাছাকাছি নেই। ওরা গড়িটা দূরে বাগানের পাঁচিলের গায়ে রেখে আসে গেটের দিকে। অতিথিরা আসছেন। দামী পোশাক পরা, মহিলারাও যেন পরির মতো সেজে আছেন। গেটে সাদর অর্ভ্যথনা করে ফুল দিয়ে। বিজন পলকে নিয়ে আসে ভিতরে। প্যান্ডেলে খাবার-পানীয়র ছড়াছড়ি। পল এসব দেখেশুনে অবাক। ধনী বাঙালিদের দু'চারটে পরিবারে যাতায়াত আছে তার ব্যবসার খাতিরে। কিন্তু এঁদের চেনে না। তাই বিজনকে বলে, "এঁরা কারা রে?"

বিজনও গৃহকর্তার নামটা জানে না, তবে পদবিটা শুনেছে। তাই বলে। "হবে কেউ।"

" সে কী! নেমন্তন্ন খেতে এসেছিস, তাঁদের নামটাই জানিস না?" বিজন গলা নামিয়ে বলে, "চুপচাপ থাক এখন।"

"মানে!"

বিজন পলকে এদিকে টেনে আনে। এদিকটা একটু ফাঁকা। বিজন বলে,"ওখানে বিরাট বুফেতে খাওয়াদাওয়া চলছে। ওদিকে চল, খাবার ঠাণ্ডা হতে দিতে নেই।"

ওদিকের লনে মাঝে-মাঝে টেবিল ঘিরে চেয়ার রাখা। ওদিকে চারটে লম্বা টেবিলে রকমারি খাবার রাখা আছে। জার্মান সিলভারের বাসনের নীচে বার্নার জ্বলছে। অতিথিরা নিজেদের পাত্রে ওইসব খাবার নিজেদের পছন্দমতো তুলে নিচ্ছেন আর ছড়ানো টেবিল-চেয়ারে মৃদু আলোয় বসে খাচ্ছেন। সানাইয়ের সুর ওঠে।

বিজনও পলকে নিয়ে বসেছে একটা টেবিলে। চটপট খেয়ে আইসক্রিম দিয়ে ডিনার শেষ করে। ওদিকে তখন সাড়া ওঠে, বর এসেছে। অনেকে গেটের বাইরে ভিড় করে। কয়েকখানা গাড়ি থেকে লোকজন নামছে তত্ত্বের রকমারি প্যাকেট নিয়ে। ওদিকে শাঁখ বাজিয়ে বরকে কারা অভ্যর্থনা করে নিয়ে যাচ্ছে। পল দেখছে। বিজন বলে, "চল এবার।"

পলকে ও ওই ভিড় থেকে বাইরের পথে আনে। পল বলে, "এ কী নেমন্তন্ন রে! বিয়েবাড়িতে এলি, বর এল, গেলি না। বাড়ির লোকজনদের সঙ্গে দেখাও করলি না। খেলি আর চলে এলি?" বিজন বলে, আরে খেতেই তো এসেছিলাম। নেমন্তন্ন কেউ করেনি।"

" সে কী!" অবাক হয় পল।

বিজন বলে, "টাকা দিতে পারি না, মাঝে-মাঝে নো- মিল হয়ে যায়। বিয়ে, অন্য উৎসবের

ভোজবাড়িতে তাই এভাবেই রাতের খাবারটা সেরে নিই। ভাল খেলে দু'-একদিন কিছু না খেয়েও থাকা যায়।"

পল এবার অবাক হয়।

"রাস্কেল, এইভাবে থাকিস তবু দিদার টাকা নিবি না? চল, আজ তোকে ধরে নিয়ে যাব গার্লফ্রেন্ডের কাছে। তোর এইভাবে চুরি করে খাবার কথা বলব। চল!"

বিজন বলে, "এই প্লিজ! পল গার্লফ্রেন্ড যেন এসব জানতে না পারেন। দুঃখ পাবেন।"

পল বলে, "চল তার কাছে। গাড়িটা কোথায় রাখলাম!"

"ওদিকে বাড়ির পিছনে আছে।"

ওরা গাড়ির দিকে চলেছে। এদিকটায় তত আলো নেই। বাড়ির পিছনের দেওয়ালটার পর একটা খাল, বসতির শেষ। ওরা পাঁচিলের কাছে এসেছে। গাড়িটা রয়েছে, হঠাৎ দেখে ওদিকের পাঁচিল থেকে একটা ছায়ামূর্তি টপকে সিধে গাড়ির ছাদেই নেমেছে। আলো এখানে তত নেই।

বিজন বলে, "চোরটোর হবে। বাড়িতে ঢুকে কাজ সেরে এইদিক ধরেই বের হয়ে পালাচ্ছে। ধর—ধর।"

সেই ছায়ামূর্তি তখন গাড়ির ছাদ থেকে বনেটে নেমে নীচে পা দিতে যাবে, বিজন ছুটে গিয়ে তাকে জাপটে ধরে চমকে ওঠে। একটা বিচিত্র অনুভূতি জাগে ওর দেহ-মনে। পুরুষ তো নয়, দেখে পথের আলোয় এক সুন্দরী তরুণী। বিজনও নিমেষের মধ্যে তাকে ছেড়ে দিয়েছে। পলও অবাক। সুন্দরী মেয়েটার পরনে দামী শাড়ি, গায়ে অনেক গহনা। কপালে চন্দনের ফোঁটা। বিজন বলে, "তুমি, ইয়ে আপনি কে?"

মেয়েটি বলে, "আমার খুব বিপদ। আমাকে জোর করে এরা একটা অজানা, অচেনা ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে আমার জীবনটাই নষ্ট করে দিতে চায়। আমাকে শেষ করে দিতে চায়। তাই আমি কোনওমতে নিজেকে বাঁচার জন্য পালিয়ে এসেছি। দয়া করে আমাকে এই জায়গা পার করে দিন। না হলে ওরা ধরতে পারলে আমাকে শেষ করে দেবে। প্লিজ!"

ওদিকে সানাই বাজছে। বিয়েবাড়ির আনন্দ চলছে। ওরা জানে না যে, বিয়ের কনেই এভাবে পালিয়েছে।

মেয়েটা বলে, "যা করার তাড়াতাড়ি করুন। না হলে আপনাদেরও ওরা ছাড়বে না। সাঙ্ঘাতিক লোক ওরা। আপনারাও বিপদে পড়বেন।"

মেয়েটি নিজেই গাড়ির দরজা খুলে ভিতরে ঢোকে। বলে, " কেউ দেখতে পেলে আর রক্ষা থাকবে না। চলুন, এখান থেকে শিগগির।"

এবার পল, বিজনও বুঝেছে। বিজন বলে, "পল! অসহায় মেয়েটকে এখানে ফেলে রেখে যাস না। চল, ওকে দূরে কোথাও নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেব। ও যেখানে যাওয়ার ঠিক চলে যাবে।" পলও বুঝেছে যে, বিপদের আশঙ্কাও রয়েছে। তাই ওরা গাড়িতে উঠে কাচ বন্ধ করে স্টার্ট দিয়ে কোনওমতে ওই জনবহুল আলোকিত গেটের সামনে দিয়ে বের হয়ে যায়। তখনও বিয়েবাড়িতে উৎসবের মেজাজ। সানাই বাজছে। তখনও কারও খেয়াল হয়নি।

ঝিলিক অন্য কোনও পথ না পেয়ে এই চরম পথই বেছে নিয়েছে। ঝিলিক তবু তার বাবা মিঃ বোসকে বলেছিল, "আমার বিয়ের জন্য ব্যস্ত হোয়ো না বাবা। আমি তোমাদের বোঝা হয়ে থাকব না। দয়া করে আমার নিজের পথ আমাকে খুঁজে নিতে দাও।"

কিন্তু মীরা তাঁর সিদ্ধান্তে অনড় থাকেন। ঝিলিককে বলেন, "এ বিয়ে হবেই।"

ঝিলিক বলে, "আমার জীবনটা নষ্ট করে দেওয়ার কোনও অধিকার তোমার নেই। নিজের মা হলে এইভাবে সর্বনাশ করতে পারতে না।"

মীরা জানান, " তোমার নিজের মা তো তোমার খবরই নেয় না। তোমার ভরণপোষণও করে না। সেটা করি আমি। তাই আমার কথা তোমায় শুনতেই হবে।"

ঝিলিক ওঁদের অনেক অত্যাচার সহ্য করেছে। দেখছে বাবাও আজ তার জন্য ভাবেন না। সে চুপ করেই থাকে। এঁদের অন্ন-আশ্রয়ের দয়ায় এঁরা ঝিলিককে বাধ্য করাতে চান এই বিয়েতে। ঝিলিকের মনও বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। সে এর প্রতিবাদ করবে।

আর কোনও পথ না দেখে ঝিলিক বিয়ের রাতেই একটু সুযোগ পেয়ে পিছনের বাগানে নেমে পড়ে। কোথায় যাবে জানে না,তবু এত বড় পৃথিবীতে সে তার ঠাঁই খুঁজে নেবেই। তার লড়াই সে একাই লড়বে। পাঁচিল টপকে এদের রাজ্য ছেড়ে চলে যাবে সে যেখানে হোক।

ওই দুটি তরুণের মধ্যে একজন তাকে চোর সন্দেহে অন্ধকারে জড়িয়ে ধরেছিল। পুরুষের নিবিড় স্পর্শ তার জীবনে এই প্রথম। প্রথম চকিত স্পর্শে ঝিলিকের কুমারী মনে কী বিচিত্র আবেশ আনে। আর তার গলার স্বরে, শরীরের কমনীয়তায়, অনুভূতিতে বিমূঢ় হয়ে ছেলেটিও তাকে বাহুমুক্ত করে দেয়।

ঝিলিক দেখছে দু'জনকে। ভদ্র,মার্জিত রুচির তরুণ। ওরা তার কথা শুনে তাকে গাড়িতে তুলে বের হয়ে যায়। ভয়ও করে ঝিলিকের। তবে গাড়ির কাচটাই ওকে বাঁচিয়ে দেয়। নিরাপদে সকলের নজর এড়িয়ে বের হয়ে আসে ওরা। পল-বিজনও ভাবছে এবার। পিছনের সিটে ওই পলাতকা মেয়েটি, বয়সও তেমন বেশি না। ভিক্টোরিয়ার কাছে ময়দানে এসে গাড়ি থামায় তারা। তখন এদিকে ভ্রমণকারীদের ভিড়ও কমেছে।

পল বলে, "কোথায় যাবে তুমি! এখানে একটা ট্যাক্সি ডেকে দিই!"

ঝিলিক এবার সত্যিই ভয় পায়। এবার বুঝেছে রাতের কলকাতার এই অঞ্চল তার অচেনা। তখন জেদের বশে সাহস করে ওইভাবে কসরত করে বের হয়েছিল, এখন বের হয়ে এসে বুঝেছে তার পায়ের তলার কোনও মাটি নেই। এত বড় শহরে কোথাও যাওয়ার ঠিকানা তার জানা নেই। সে হঠকারীর মতো কাজটা করে ফেলেছে।

পল বলে, "কী হল? চুপ করে রইলে যে? বলো, কোথায় যাবে?" এবার ঝিলিক অসহায় কণ্ঠে বলে, "আমার যে যাওয়ার কোনও ঠাঁই নেই।"

বিজন অবাক হয়, " সে কী! তবে যে বের হয়ে এলে ওখান থেকে। এখন বলছ ঠাঁই নেই। এবার দয়া করে নেমে যাও তো।"

ঝিলিক বুঝেছে তাকে এবার বাঁচার জন্য কঠিন হতে হবে। সে বলে, "আপনারাই আমাকে একটু ঠাঁই দিন।"

"নিজের ঠাঁই নেই। আর তোমাকে ঠাঁই দেব। নামো তো।" ঝিলিক কঠিন স্বরে বলে, "চুপ করে যা বলি শুনুন। আমাকে আপনাদেরই ঠাঁই দিতে হবে। না হলে আমি গাড়ি থেকে নেমে চিৎকার করব। আপনারা আমার সর্বনাশ করার জন্যই..." ওদিকে পুলিশের গাড়ি রয়েছে। এবার বিজন বুঝতে পারে যে, মেয়েটিও সহজে তাদের মুক্তি দেবে না। ঝিলিক জানে তার শাসানিতে কাজ হয়েছে। তাই আরও এক ডোজ দাওয়াই দেওয়ার জন্য বলে, "আমি এখনই চিৎকার করে পুলিশ ডাকব। আপনাদের দু'জনকে এমন শিক্ষা দেব। অ্যাই যে ..."

পল বলে, "চুপ করো, তোমাকে চিৎকার করতে হবে না। দয়া করে চুপ করো। আমাদের ভাবতে দাও।"

ঝিলিকও এবার যেন ভরসা পেয়েছে। সে বলে, "যা ভাবার তাড়তাড়ি ভেবে কিছু করুন? না হলে..."

পল এবার বিজনকে উদ্দেশ্য করে বলে, " তোর পাল্লায় পড়ে বিয়ের ভোজ খেতে গিয়ে বিয়ের কনেই যে এমন অ্যাটাক করে বসবে তা ভাবিনি।"

বিজন বেশ বিপদে পড়েছে। সে বলে, "কী ডেঞ্জারাস মেয়ে বল তো? একেবারে ডাকাতের মতো অ্যাটাক করল। এখন কী হবে? এই যে, কী যেন নাম তোমার?"

ঝিলিক উত্তর দেয়, "ঝিলিক।"

"তা বুঝেছি। একেবারে ত্রাস, বিদ্যুতের ঝিলিক। একবার ধরলেই ফিনিশ। ওরে পল, কিছু একটা কর।"

পল বলে,"একটা মতলব মাথায় এসেছে। দেখি সেটা অ্যাপ্লাই করে,যদি কিছু হয়। তবে, বিজন, এ ব্যাপারে তোকেই মেন রোল করতে হবে।"

"আমাকেই শেষে বলির পাঁঠা করবি?"

" তা তো বনে গেছিস। যা আবার চুরি করে বিয়ের নিমন্ত্রণ খেতে।"

ঝিলিক বলে, "কী হল? আপনাদের ভাবনা শেষ হল, না হলে এই আমি চিৎকার শুরু করছি।"

পল বলে, " দয়া করে থামো। উঃ, চলো দেখি, তোমার জন্য যদি কিছু করা যায়। তবে তোমাকে একটু অভিনয় করতে হবে, বুড়ি খুবই ভাল। মাঝে-মাঝে খুব বিগড়ে যান। তাঁকে ম্যানেজ করতে পারলে ব্যস। অল কোয়াইট ইন দ্য ওয়েস্টার্ন ফ্রন্ট। যা বলি শোনো ঝিলিক।"

ঝিলিকও ওদের কথা বেশ মনোযোগ দিয়ে শুনছে। ঝিলিকের মনে হয় জীবনের অনেক দিকই তার অজানা ছিল। এবার যেন সেই অজানা অচেনা জগৎকেও চিনতে হবে তাকে, বাঁচার জন্য।

৫

কাঞ্চনমালার বয়স হয়েছে। সংসারে তাঁর অবলম্বন ওই একমাত্র নাতি পল। কাঞ্চি ওই পলকে নিয়ে নাজেহাল হয়ে উঠেছেন। পলের টাকার অভাব নেই। চা-বাগানের ব্যবসা এখন ভালই চলছে। আর কাঞ্চির এখানে টি-অকশনেও ভাল টাকা আয় হয়।

পলও এখন ব্যবসার কাজে নেমেছে। কিন্তু এ ছাড়াও পলের নানা কাজ আছে। সে এদিকের বস্তির ছেলেমেয়েদের জন্য স্কুল করেছে। সেখানে গরিব ছেলেমেয়েদের জন্য খাবারও দেয়। ওই স্কুলবাড়ি লাগোয়া একটা বিল্ডিং-এ দাতব্য চিকিৎসালয়ও করেছে। পল এ-সমস্ত কাজ নিজেই করে।

কাঞ্চিও এসব কাজে বাধা দেন না। কারণ তিনি দেখেছিলেন তাঁর স্বামীকে। মানুষটাও ছিলেন এমন পরোপকারী। তিনি চা-বাগানের কুলি-কামিনদের জন্য ইশকুল, হাসপাতাল করেছিলেন। তাদের থাকার জন্যও প্রভুত উন্নতি করেছিলেন। রবার্ট বলতেন, "এদেশে আমি এদের পরিশ্রমে রোজগার করি। এদের জন্য কিছু করা দরকার। আমার পরেও যদি ছেলেমেয়ে হয়। তাদেরও বলবে, আমার টাকা তাদের একার নয়। তার থেকে গরিব, অসহায়দের জন্য কিছু করতে হবে। তোমাকেও বলি, মানুষকে সাহায্য করবে। গড উইল হেলপ ইউ।"

কাঞ্চি সেই কথাগুলো আজও ভোলেননি। সেই বিদেশি লোকটার আদর্শকে পলই বাঁচিয়ে রেখেছে। বহুজনকে সে অন্ন,আশ্রয় দিয়ে সাহায্য করে। কিন্তু পলকে সংসারি করতে চান কাঞ্চি। ছেলেটা পরের কথাই ভাবে। নিজের জন্য কিছু করে না। চা-বাগানেও সে এইসব জনসেবার কাজ চালায়। রাত হয়েছে, ছেলেটা ফেরেনি। এবার তাই কাঞ্চি ঠিক করেছেন, পলকে বলবেন, এত রাত করে যেন না ফেরে। তাঁর ঘুমের ব্যাঘাত হয়।

হঠাৎ নীচে গাড়ি থামার শব্দ হয়। গাড়িটা গ্যারাজে রেখে এবার পল উঠে আসবে। কাঞ্চিও উঠে আসেন। আজই পলকে বলবেন, এত রাত অবধি বাইরে না থাকার জন্য। নীচে বিজনের গলাও পান তিনি।

বারান্দায় উঠে আসছে পল, বিজন, আর ওদের সঙ্গে রয়েছে একটা সুন্দরী মেয়ে। পরনে সুন্দর শাড়ি, গয়না। ওর দামী শাড়িটা লটপটে হয়ে গেছে, মুখের মেকআপও ঘামে নষ্ট হয়ে গেছে। তবু ওর সুন্দর মায়াভরা দুটো চোখের চাহনি মনকে নাড়া দেয়। পলের ইঙ্গিতে ঝিলিক এসে প্রণাম করে কাঞ্চিকে। পলই বলে, "দিদা, এ ঝিলিক। হঠাৎ পথে দেখা, খুব বিপদে পড়েছিল।"

বিজনও নিপুণ অভিনেতার মতো বলে,

"চার-পাঁচজন বদমাশ গুণ্ডা ওকে অ্যাটাক করেছিল। আমি আর পল হঠাৎ এসে পড়ে ওকে বাঁচালাম। বাড়ি থেকে ওকে কোনও এক বাজে ছেলের সঙ্গে জোর করে বিয়ে দিয়ে দিচ্ছিল। ওর জীবনটা বরবাদ করে দিত ওর সৎ-মা। ও তাই বের হয়ে এসেছে।"

কাঞ্চি দেখছেন ঝিলিককে। ঝিলিকও বয়স্কা মহিলাকে দেখে এবার ভরসা পায়। ওর মন বলে, এখানে ওই মহিলা তাকে বাঁচাতে পারেন।

ঝিলিক বলে, "আমার জীবনটা ওরা বরবাদ করে দিল, এটা আমি মেনে নিতে পারছি না। তাই সৎমার বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছি।' কাঞ্চি বলেন, "ঠিক করেছ! আজও কি ওরা মেয়েদের উপর এমনি অত্যাচার করবে? নারী স্বাধীনতার যুগেও মেয়েদের কি করার কিছুই নেই?"

পল বলে, "কিন্তু এখন কী করবে? ওর তো যাবারও কোনও জায়গা নেই। তাই তোমার কাছেই এনেছি।"

বিজন বলে, "দিদা, তুমি তো মেয়েদের উপর অন্যায়, অত্যাচার রুখতে শুনেছি, অনেক কিছু করেছ।"

ঝিলিক জানায়, এখানে ঠাঁই না পেলে তাকে বাড়িতেই ফিরতে হবে। তারপর আর কোনও পথ না পেলে নিজেকে শেষই করে দেবে।

" নো-নো। পুওর গার্ল, এখানেই থাকবে তুমি। তারপর দেখি তোমার জন্য যদি কিছু করা যায়"।

ঝিলিক পায়ের নীচে মাটি পায়। আনন্দে বলে, "সত্যি বলছ দিদা!"

কাঞ্চি ওকে কাছে টেনে নিয়ে বলেন, "দিদা যখন বলেছ, এখন থেকে তুমি আমার নাতনি। কী নাম তোমার?"

"ঝিলিক বোস।"

"সুন্দর নাম। নামের মধ্যে একট রিভলভিং স্পিরিট আছে, তাই এত বড় প্রতিবাদ করতে পেরেছ। তুমি পাশের ঘরেই থাকবে,আর পল, আজ থেকে তুমি থাকবে নীচে।"

পল বলে, "একদিনে প্রথম নজরেই গার্লফ্রেন্ড তুমি ওকে কাছে টেনে নিলে, আর দূরে সরিয়ে দিলে আমাকে? ঠিক আছে!"

বিজন বলে, "তুই নীচেই থাক পল। নীচেই আড্ডা জমানো যাবে। উপরে উঠে আর কাজ নেই।"

পল বলে, "দিদা, আমাকে নীচে পাঠালে? ঠিক আছে! তবে বিজনকেও উপরে উঠতে দিও না। পরে তোমাকে প্রবলেম ফেস করতে হতে পারে।"

কাঞ্চি বলেন, "চলো ঝিলিক। লেট দেম ফাইট বিটুইন দেম। ও দুটোকেই কাল থেকে উপরে উঠতে দেব না।"

ঝিলিককে নিয়ে চলে যান কাঞ্চি।

পল এবার বলে, "বিজন, এবার কিছু কাজকর্ম কর। নতুন করে বাঁচতে গেলে তো রসদ চাই।"

"কেন?"

"তখন তো ঝিলিকের হয়ে খুব ওকালতি করলি। ওকে নিয়ে চল। নিয়ে এলাম তোর কথায়। এখন বলছিস কেন? ন্যাকা, যেন ভাজা মাছ উলটে খেতে জানে না? বলব সব তোর কীর্তির কথা গার্লফ্রেন্ডকে?"

বিজন যেন ধরা পড়ে গেছে। সে বলে, "অ্যাই পল। এসব কথা দিদা যেন জানতে না পারেন।"

"দিদার চোখকে ফাঁকি দেওয়া খুবই কঠিন কাজ রে!"

ওদিকে মিঃ বোসের বাড়িতে তখন হইচই পড়ে গেছে। বিয়ের ছাদনাতলায় কনেকে আনতে গিয়ে দেখে, অন্ধকার ঘরটা শূন্য। কনে আর নেই। বাড়িতে কোথাও দেখা মেলে না ঝিলিকের। এদিকে লগ্ন বয়ে যায়। পাত্রপক্ষও ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। তারপর জানা যায় কনেই উধাও হয়েছে। মিঃ বোসও ভাবতে পারেননি যে, ঝিলিক এইভাবে বাড়ি থেকে উধাও হয়ে যাবে। মীরাও এই প্রথম দেখলেন

যে, বাড়িতে তাঁর অবাধ্য হয়ে ঝিলিকই তাঁকে অপমান করেছে।

পাত্রপক্ষও এবার বলেন, "বড় লোকের ঘরে এর জন্য বিয়ে দিতে চাইনি মশাই। তাঁদের ছেলেমেয়ের স্বভাবচরিত্র এমনই।" কে একজন বলে উঠেন, "আর কেন হবে না! বাবা-মা দু'জন কেমন দেখতে হবে তো! বাইরে চিকন-চাকন, ভিতরে খড় গোঁজা। টাকার দেমাক আছে। ভিতরে বেশরম।"

মীরাও শোনেন ওদের এইসব কথা। তাঁর সারা শরীর রাগে জ্বলে ওঠে। মানিক বোসও কথাটা ভাবছেন। মীরা ওই ঝিলিককে ঠিকই চিনেছিলেন। ওর মা'র স্বভাবচরিত্র সম্বন্ধে নানা কথাও শুনেছেন তাঁরা।

তাই মানিক বোস বলেন, "যেমন মা, তেমনই তার ছা। এই জন্যই তো সে ইচ্ছে করেই আমাদের সম্মান ধুলোয় মিশিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে।"

বরপক্ষ বর নিয়ে চলে গেলেন বেশ দু'-চার কথা শুনিয়ে। মীরা বোস মানিককে বলেন, " ওই মেয়ে নিশ্চয় কারও সঙ্গে বেরিয়ে গেছে। যেখানে গেছে যাক। আমরা আর কোনও খোঁজখবরই করব না। ও আমাদের কেউ নয়। আর তুমি ওর কোনও খোঁজখবর করবে না। জানবে তোমার ওই মেয়ে ছিল না, নেই। এ-বাড়িতে তাকে আমি আর পা রাখতে দেব না।"

অবশ্য ঝিলিকও এমনই কিছু ঘটাবে তা অনুমান করে নিয়েছিল। সে এ-বাড়ির কেউ নয়। এখন তার নিজের লড়াই নিজেকেই লড়তে হবে।

সে এ-বাড়িতে অর্থাৎ কাঞ্চনমালার এখানে এসে এঁদের সঙ্গে নিজেকে খাপখাইয়ে নিতে চেষ্টা করে। এ -বাড়ির কর্ত্রী ওই কাঞ্চিকেও তার খুব ভাল লাগে। এর মধ্যে কাঞ্চিও ঝিলিকের অতীত জীবনের ঘটনাগুলো শুনেছেন। দেখেছেন একটা অসহায় মেয়ের বাঁচার লড়াই। কাঞ্চির জীবনেও এমন কিছু ঘটনা ঘটেছিল। তাঁদের প্রেমের সেই প্রথমদিনগুলোতে পাহাড়ি সমাজেও কিছু আপত্তি উঠেছিল। অনেকেই তাঁর বাবার নামেও অপবাদ দিয়েছিল। তিনি নাকি টাকার লোভে ঘরের ইজ্জত পরদেশি সাহেবের কাছে বিক্রি করে দিয়েছিলেন।

বাবার এই অপমান তাঁর চোখেও জল এনেছিল। অবশ্য রবার্ট সব শুনে তাঁকে বিয়ে করেছিলেন। কিন্তু তাতেও শান্তি আসেনি, এবার রবার্টের ওই সাহেবসমাজ তাঁকে পরিত্যাগ করেছিল। তবুও রবার্ট ওঁদের ত্যাগ করেনি। পরদেশি হয়েও তাঁর প্রেমের মর্যাদা রেখেছিলেন। জ্ঞাতিদের ত্যাগ করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর যাতে কাঞ্চি সবকিছু পান সে ব্যবস্থাও করেছিলেন। আজও কাঞ্চি তাঁকে ভোলেননি। কাঞ্চিও রবার্টের প্রেমের মর্যাদা দিয়ে এসেছেন। তিনি তাঁর জাত জ্ঞাতিদের ছেড়ে এখানে তাঁর নাতিকে নিয়ে রয়েছেন। রবার্টের স্মৃতিবিজড়িত চা-বাগান আজও চালিয়ে যাচ্ছেন। এই স্বাধীনচেতা কাঞ্চি তাই ঝিলিকের এই প্রতিবাদকে সমর্থন করেন। বলেন, "তুমি ঠিক কাজ করেছ ঝিলিক। কিন্তু এবার নিজের বাঁচার জন্য কিছু করতে হবে তো? তা সচমুচ কাউকে মোহব্বত করেছ নাকি? কে সেই ছেলে? কী করে?"

কাঞ্চি ভেবেছেন কথাটা। হয়তো ঝিলিকের জীবনে তেমন কোনও ছেলে এসেছে, যার জন্য ঝিলিক ঘর ছেড়ে বাইরে পা বাড়িয়েছে। কাঞ্চি বলেন, "তার নাম, পাতা বলো। আমি পলকে বলছি তাকে ডেকে আনবে আমার কাছে।"

ঝিলিক বলে, "না দিদা। তেমন কেউ নেই। আর কারও ভরসাতে আমি ঘর ছাড়িনি। শুধু অন্যায়কে মেনে নিতে পারিনি তাই ঘর ছেড়ে চলে এসেছি।"

কাঞ্চি মেয়েটার দুঃসাহস দেখে অবাক হন। বলেন, "কী বলছ?" একা নিজের ভরসাতেই চলে এলে?"

"হ্যাঁ। এবার এই দুনিয়াতে নিজের বাঁচার একটা পথ খুঁজে নেবই। লেখাপড়া জানি। কম্পিউটারের কাজ জানি।"

"এ যুগে তোমাদের মতো ছেলেমেয়েদের সত্যি সাহস আছে ঝিলিক। লড়াকু মনও আছে।'

ঝিলিককে এনেছিল বিজন আর পল। অবশ্য পলকে চেনেন কাঞ্চি। অন্য সব কাজে পল ঠিক এগিয়ে যাবে, সে সাহস তার আছে। কিন্তু মেয়েদের ব্যাপারে পল লাজুক ধরনের। সেও দেখেছে তাদের চা-বাগানের ম্যানেজার রবি প্রধানের মেয়ে সীতাও এগিয়ে আসতে চায় পলের দিকে। কাঞ্চিও এটাকে সমর্থন করেন। তিনিও চান পল ঘর বাঁধুক থিতু হোক। কিন্তু পলই এড়িয়ে যায়। কাঞ্চি পলকে বলেন,

"তুম কোই কামকা নাহি। একঠো লেড়কিকো পেয়ার করতে পারিস না?"

পল দিদাকে জড়িয়ে ধরে বলে, "তার জন্য তুমি তো আছ মাই সুইট গার্লফ্রেন্ড।"

কাঞ্চি হাসেন, "বুদ্ধু কহিঁকা।"

পলের সঙ্গে ঝিলিকের এসব ব্যাপার হতে পারে না। তবে কি বিজনেরই পরিচিত? বিজনই পলকে বলে এখানে এনেছে ঝিলিককে? আজকালকার ছেলেমেয়েরা সহজেই বন্ধুর মতো মেশে। হইচই করে। কিন্তু হঠাৎ তারা ঘর বাঁধতে চায় না। সংসারের গারদে বন্দি হওয়ার চেয়ে তারা মুক্ত বিহঙ্গের মতো নীল আকাশের অসীমে ডানা মেলে উড়তে চায়।

কাঞ্চি সেদিন বিজনকে ধরেন। বিজন সেই রাতে একটা বিচিত্র পরিস্থিতির মুখোমুখি হবে তা ভাবতেও পারেনি। বিজনের মনেও গভীরভাবে রেখাপাত করেছে ওই ঘটনাটা। একটি অসহায় মেয়েকে তারা চরম সর্বনাশের হাত থেকে বাঁচিয়েছে। বিজনের চোখের সামনে ভেসে ওঠে ঝিলিকের অসহায় সেই চাহনি। ওর নরম দেহের সেই ছোঁয়াটুকু বিজনের মনে সুর জাগায়।

বিজনের চিন্তাভাবনায়ও যেন সেই সান্নিধ্যটুকু কি পরিবর্তন এনেছে? বিজনও ভাবছে সেই কথাটা। এম.এ. করছে, থিসিসও সাবমিট করেছে। এবার তাকেও তার পায়ের নীচে মাটি পেতে হবে। আর সেই মাটিতে সে নতুন করে ঘর বাঁধবে ওই ঝিলিককে নিয়ে। তাকে বিজন দেবে আশ্রয়-সান্নিধ্য, তার অন্তরের নিঃশেষ ভালবাসা। বিজনকে এবার একটা সম্মানজনক কাজ খুঁজে নিতে হবে। সে যেন তার জীবনে নতুন করে বাঁচার তাগিদ খুঁজে পেয়েছে। দু'-এক জায়গায় চেষ্টা করছে সে। তার জন্য যেসব পরীক্ষা দিতে হয় সেই পরীক্ষায় বসবে। তাকে পাস করতেই হবে এবার।

পলও দেখছে বিজনের এই পরিবর্তন। এতদিন সে পড়াশোনা নিয়েই ছিল। এবার 'নেট'-এর পরীক্ষাও দিয়েছে। পল বলে, "কী রে বিজন? হঠাৎ এবার চাকরির জন্য হামলে পড়ছিস! এতদিন তো এসব কথা ভাবিসনি!"

বিজন বলে, "এবার ভাবতে হচ্ছে রে।"

বিজন এর মধ্যে আসে পলের বাড়িতে। এখন ঝিলিকও মাঝে-মাঝে বের হয়। সেদিন কাঞ্চি বলেন, "কী রে ঝিলিক, ও-বাড়িতে যাস নাকি? মা-বাবা কী বলেন?"

ঝিলিক জানায়, "ও বাড়িতে যাওয়ার ইচ্ছে আমার নেই দিদা। ওঁরা আমার কথা আর ভাবেন না। আমি তো ওঁদের বোঝা ছিলাম। সে-ই যখন সরে গেছে ওঁরা খুশিই হয়েছেন। না হলে তো খোঁজখবর করতেন!"

"তবে কোথায় যাস?"

কাঞ্চির কথায় বলে ঝিলিক, "দু-চারটা অফিসে ঘুরছি দিদা। মনে হয় একটা চাকরি পেয়ে যাব। নিজের পায়েই দাঁড়াতে হবে। তোমাদের কালে অনেক যোগ্য প্রেমিক ছিল, মেয়েদের তারা ঠাঁই দিয়েছে। একালের ছেলেদের জন্য নিশ্চিন্ত নির্ভর কিছু নেই। তাই ছেলেমেয়েদের ঘর বাঁধার স্বপ্ন, সাধ, অপূর্ণই থেকে যায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে। তাই নিজের বেঁচে থাকার দায়টা নিজেদেরই বইতে হয়।" কাঞ্চিও দেখেছেন সমাজের এই নতুন রূপটাকে।

৬

কাঞ্চির তবু মনে হয়, বিজনও এসব ব্যাপার নিয়ে ভাবছে। সেদিন বিজন এসেছে এ-বাড়িতে। ঝিলিকও বাইরে বের হয়েছিল। একটা অফিসে ইন্টারভিউ দিয়ে ফিরছে।

বড়-বড় অফিসগুলো শহরের ব্যস্ত এলাকায়। কাচের সুইং ডোরের ওদিকে বড় হলঘরে।

সাজানো আধুনিক ধরনের চেয়ার-টেবিল, অনেক টেবিলে কম্পিউটার রয়েছে। ওদিকে হলের ওপাশে দামী সোফা। হলটা শীততাপনিয়ন্ত্রিত। এখানে যারা কাজ করছে, তারাও বেশ ছিমছাম চেহারার। বেশকিছু মহিলাও কাজে ব্যস্ত। অফিসে কাজের একটা পরিবেশ আছে। ওকে বেয়ারা বসের ঘরে নিয়ে যায়। মালিক ভদ্রলোক ঝিলিককে বসিয়ে নানা প্রশ্ন করেন। বেয়ারা ঠাণ্ডা পানীয় এনে দেয়।

মালিক ভদ্রলোক জানান, "সপ্তাহখানেকের মধ্যে খবর পাবেন। দেখি, আপনার জন্য কিছু করতে পারি কি না।"

"অনেক ধন্যবাদ স্যার।" ঝিলিকও আশা নিয়ে বের হয়ে আসে। বিজন দু'-একটা কলেজে যোগাযোগ করেছে। এমনিতে সে কৃতী ছাত্র। তার পরীক্ষার ফলও ভালই। থিসিসও খেটেই তৈরি করেছে সে। মনে হয় তার রিসার্চের স্বীকৃতি ও পাবে।

দু'-চারজন বন্ধুবান্ধবও কলেজে রয়েছে। তাদের কাছে খবর নিয়ে বিজন এবার কলেজে কমিটির কর্মকর্তাদের কাছেও দরবার করেছে। মনে হয় একটা কাজ ও পাবে।

সেদিন ঝিলিক ফিরছে। হঠাৎ পথে বিজনকে দেখে তাকাল। বিজনকে সে এর মধ্যে দু'-একদিন পলের বাড়িতেও দেখেছে। পলও কৃতজ্ঞ। পল ওকে গাড়ি থেকে নামিয়ে দিতে চেয়েছিল। মেয়েদের ঝামেলায় পল জড়াতে চায় না। কিন্তু বিজনই পলকে বলে। সে ওকে দিদার বাড়িতে নিয়ে যায়। আর ঝিলিকও বুঝেছে ওই মমতাময়ী বৃদ্ধার আশ্রয় না পেলে বিপদেই পড়ত ঝিলিক। বিজনকে দেখে ঝিলিক বলে, "এদিকে, কী ব্যাপার?"

বিজনও গেছিল কোনও কলেজে কমিটির চেয়ারম্যানের কাছে। সেও অপ্রত্যাশিতভাবে এখানে ঝিলিককে দেখে বলে,"তুমি এখানে?"

ঝিলিক বলে, "এসেছিলাম এদিকে একটা অফিসে। পায়ের নীচে মাটি নেই তা তো জানেন। দিদার ঘাড়ে বসে খেতে ভারী লজ্জা করে। তাই এসেছিলাম, যদি কোনও কাজকর্ম পাওয়া যায়।" বিজন ঝিলিকের দিকে তাকিয়ে দেখে। সুন্দরী, প্রতিবাদী মেয়েটি বাঁচার জন্য লড়াই করতে চায়।

বিজনের মনে হয়, ওর যদি কোনওদিন সেই অবস্থা আসে। বিজনের প্রথম কাজ হবে ঝিলিককে একটা নিশ্চিন্ত জীবনের সন্ধান দেওয়া। দু'জন এগিয়ে চলে পায়ে-পায়ে। একসঙ্গে পথ চলারও আনন্দ আছে। পথ চলার ক্লান্তিটুকু থাকে না। সবই সহনীয় হয়ে ওঠে। বিজনও সেই তৃপ্তির সন্ধান পায় ওর সান্নিধ্যে এসে। দু'জনে ফিরছে পলের বাড়িতে।

কাঞ্চি বাইরের ঘরে বসে তাঁর অফিসের এক কর্মচারীর কাছে কাজের হিসেব নিচ্ছিলেন। পলও গেছে অকশন মার্কেটে। ঝিলিক বিজনকে একসঙ্গে বাড়িতে ঢুকে দেখে কাঞ্চি বলেন, "বোস, কোথায় গিয়েছিলি দু'জনে? সিনেমা দেখতে?"

বিজন বলে, "তুমি সুকান্তের কবিতা পড়োনি গার্লফ্রেন্ড। কবি বলেছেন, 'ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়/পূর্ণিমা চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি'। বেকারের জীবনে প্রেম, সিনেমা! তোমাদের দিন কবে বদলে গেছে দিদা। প্রেম-ট্রেম এখন দূর আকাশের তারা। চাকরির সন্ধানে ঘুরতে ঘুরতে পথে দেখা হল ঝিলিকের সঙ্গে। প্রেমের কোনও সিন এই বাস্তব নাটকে নেই গার্লফ্রেন্ড।" কাঞ্চি শুনছেন বিজনের কথা। ওর মুখে কঠিন সত্যগুলোই প্রকাশ হয়েছে। কাঞ্চির মনে হয়, ওদের কথাটা সত্যিই। আজকের তরুণদের জীবন সত্যিই সেদিনের তুলনায় অনেক বেশি সঙ্ঘাতময়। এদের তুলনায় পলের জীবনে মূল সমস্যাগুলো তত তীব্র নয়। রর্বাট পলের বংশধর সে, তাই তার সবকিছুর মালিকও সে। কাঞ্চি ভাবতে বসেন, ঝিলিকের সঙ্গে পলের জীবন যদি জড়ানো যায়। তারা দু'জনেই সুখী হবে। পল এমনিতে উদাসীন, সংসারে তার মন নেই। ঝিলিক তার জীবনে এলে পলের ছন্নছাড়া জীবনে একটা স্থিতিশীলতা আসবে। কাঞ্চিও আশা করেন, পল-ঝিলিকের মধ্যে পরিচয়টা আরও গভীর হোক। তারপরই এই সিদ্ধান্তটা নেওয়া যাবে।

পল তার নিজের অফিসের কাজ, ব্যবসার কাজ দেখার পর বের হয়ে পড়ে বস্তির বিভিন্ন এলাকায়। তার অনেক কাজ। কোথায় নাইট স্কুল, কোথায় দাতব্য চিকিৎসালয়, কোথায় শিক্ষাকেন্দ্র— তা ছাড়া বস্তির মানুষদের কিছু ছোটখাটো সমস্যা নিয়ে ভাবতে হয় তাকে। ইদানীং ঝিলিকও পলের এসব কাজকর্মের খবর জেনেছে। বিজনও পলের এসব কাজে সাহায্য করে। ঝিলিক বলে, "ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে শুনেছ?"

পল বলে, "না চাইতেই গড আমায় অনেক কিছু দিয়েছেন। তাই যাদের খুবই দরকার, তাদের জন্য কিছু করার চেষ্টা করি। ষোলো আনা একা খেলে যা পাপ হবে। অন্যের জন্যও কিছু করা দরকার।"

ঝিলিক জানে পলের এই স্বভাবের কথা, তাই বলে, " তোমার কাজে আমিও হাত লাগাতে চাই।"

" সে কী! তোমরা তো নিজেদের নিয়ে লড়াই করো। প্রতিবাদ করো, নিজেকে নিয়ে যারা এত ভাবে তাদের ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াবার সময় কোথায়?"

ঝিলিক জানে তাকে চাকরি একটা পেতেই হবে। তবু বলে, "গড তো তোমার মতো আমায় উজাড় করে দেননি। তাই বাঁচার রসদটুকু নিজেকে জোগাড় করতে হয়। তবু তারপর হাতে সময় থাকলে নিজেই তোমার কাজে যোগ দেব। তোমার ঋণ তো শোধ করতে হবে!"

"ওসব কথা কেন আসছে ঝিলিক? এ তো আমার কর্তব্য, এখানে ঋণের কথা উঠছে কেন? কারও কাছে আমার চাওয়ার নেই। কিছু নিতেও চাই না। তোমাদের সমাজে আমি ব্রাত্য, তাই কিছু দিয়ে যেতে চাই।"

ওর কথাগুলোর মধ্যে পলের জীবনের বেদনাগুলো প্রকাশ পায়। ঝিলিক ভাবে, ছেলেটার জীবনে কোথায় যেন একটা বেদনা লুকিয়ে আছে।

বিজন এসে গেছে। মুখে-চোখে ওর খুশির আবেশ। বিজন বলে, " তোরা দু'জনেই আছিস? অ্যাই পল, দিদা কোথায়? দিদা...?

গলা তুলে ডাক দিতে কাঞ্চিও এসে পড়েন, "কী হল রে? চিৎকার করে পাড়া মাথায় করছিস!"

"গুড নিউজ গার্লফেন্ড, একটা কলেজে লেকচারারের চাকরি পেয়েছি। বেশি দূরে নয়, এই কলকাতার কাছাকাছি। তাই তো সুখবরটা বলতে এলাম।"

পল বলে, "এ তো সত্যিই দারুণ সুখবর। কিন্তু দিদা, দেখেছ ব্যাটা হাড়কিপ্পন, মিষ্টিও আনেনি।"

কাঞ্চি বলেন, "আমিই ওকে মিষ্টি খাওয়াব। ঝিলিক চলো তো কিচেনে।"

ঝিলিককে নিয়ে চলে যান কাঞ্চি।

পল বিজনকে বলে, "তা সুখবরটা কাকে দেওয়ার জন্য ছুটে এসেছিস? আমাদের না ঝিলিককে?"

বিজন বলে, "মানে?"

"মানেটাও বলে দিতে হবে প্রোফেসর সাহেবকে। তা ভাল কথা রে। ঝিলিকের শূন্য জীবনে তুই এলে ও সুখী-ই হবে। আর আমি সবচেয়ে বেশি সুখী হব।"

বিজন যেন পলের কাছে ধরা পড়ে গেছে। বিজন বলে, "জীবনে কোনওদিন কিছুই পাইনি রে। তোর মতো বন্ধু পেলে সব কিছুই পেয়েছি। তাই আরও কিছু পাওয়ার স্বপ্ন দেখি।"

" তোর সব স্বপ্ন সত্যি হবে বিজন। তোর জীবনে ঝিলিক এলে তোরা সুখীই হবি।"

৭

ঝিলিক কিন্তু এ-নিয়ে বিশেষ ভাবে না। তার জীবনে প্রেম আসেনি। প্রাচুর্যের মধ্যে থাকলেও তার জীবনে বঞ্চনার জ্বালা তাকে সব সময় প্রজ্জ্বলিত করে রেখেছিল। যেমন তপ্ত মাটিতে বৃক্ষলতা জন্মায় না, তেমনই তার অন্তরে প্রেমের স্নিগ্ধতা ফুটে ওঠে না। ওইভাবে জেদের বশে বাড়ি থেকে বের হয়ে এসে এখানে কাঞ্চির কাছে আশ্রয় নিয়েছিল। পলও তার দিকে বেশি নজর দিতে পারেনি। ঝিলিক

এখান থেকে বাঁচার জন্য একটা চাকরি খুঁজতে ব্যস্ত। তাই ওদের কাউকে নিয়েই ঝিলিক প্রেমের স্বপ্ন দেখার অবকাশ পায়নি। চাকরিই ছিল তার প্রথম ধ্যানজ্ঞান। ঝিলিক ছেলেবেলা থেকে নিঃসঙ্গ, একা। মানুষের সমাজ, আজকের সমাজের আপনজনরা তাকে তেমন কোনও স্নেহ-মমতার স্পর্শ দিতে পারেনি। পেয়েছে শুধু অবজ্ঞা আর অবহেলা। একটি শিশু শৈশবে তার আপনজনের কাছে যা প্রত্যাশা করে, তার কোনওটাই পায়নি ঝিলিক। ঝিলিকের অন্তরের সুকুমার বৃত্তিগুলোর বিকাশ ঘটার কোনও সুযোগই হয়নি। তাই ঝিলিক রয়ে গেছে আত্মকেন্দ্রিক, অভিমানী, জেদি। তার বঞ্চিত মন মানুষকে বিশ্বাস করতে পারেনি। তাই তার কাছে প্রেমের সংজ্ঞাটা অন্যরকম। হয়তো অবান্তর, মূল্যহীন, তাই সেও কারও কাছে কিছু পেতে চায় না।

বিজনের চাকরির খবরটা শুনে তার মনেও একটা আশা জাগে। পরদিনই মিঃ কানোরিয়ার অফিস থেকে নিয়োগপত্রটা আনে সে। শেষ অবধি মিঃ কানোরিয়া ঝিলিককেই চাকরিটা দিয়েছিলেন। চিঠিখানা হাতে পেয়ে ঝিলিকের মন খুশিতে নেচে উঠেছিল। তার মনে একটা আত্মপ্রত্যয় জাগে।

কাঞ্চি ভাবছেন, কীভাবে ঝিলিক আর পলের জীবনটা মিলিয়ে দেওয়া যায়। মেয়েটা বুদ্ধিমতী, স্মার্ট আর শিক্ষিতা। পলের জীবনে এলে পল সুখী হবে। তা ছাড়া ব্যবসার কাজও দেখাশোনা করতে পারবে। কথাটা কীভাবে বলা যায়, সেকথাই ভাবছেন কাঞ্চি। এমন সময় ঝিলিকের খুশিভরে ঘরে ঢুকতে দেখে চাইলেন কাঞ্চি, "কী খবর ঝিলিক?"

ঝিলিক চিঠিখানা দেখিয়ে বলে,"আমিও একটা ভাল চাকরি পেয়েছি দিদা।"

সে যেন বিজনের চাকরি পাওয়ার জবাবে নিজের সাধ্যের কথাটা জানাতে এসেছে। কাঞ্চি বলেন, "তোমার দিদাক কি একটা নাতনিকে অন্ন-বস্ত্র দেওয়ারও ক্ষমতা নেই? তাই চাকরির দরকার হল?"

ঝিলিক ওঁকে জড়িয়ে ধরে বলে, "না না। আমার দিদার সে ক্ষমতা আছে। না হলে এতদিন ধরে অন্ন-আশ্রয় তুমি দিতে না।"

"তবে?" কাঞ্চি প্রশ্ন করেন।

তিনি আজকের তরুণ-তরুণীদের মনের কথাগুলো ঠিক যেন বুঝতে পারেন না। পলকেও দেখেছেন। সে এই জগৎ সম্বন্ধে উদাসীন। ঝিলিকও নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত।

এ-যুগের ছেলেমেয়েরা সীমিত গন্ডির বাইরে যা ভাবে, তার খবরও কাঞ্চির মতো অতীতের মানুষদের অজানা।

ঝিলিক বলে, "দিদা, চাকরিটার দরকার। আমিও চাই নিজের পায়ে দাঁড়াতে। স্বাধীনভাবে বাঁচতে।"

" তোমার স্বাধীনতায় কেউ তো বাধা দেয়নি ঝিলিক।"

কাঞ্চির কথায় ঝিলিক বলে, "স্বাধীনতা মানে মুক্তি। নিজের মতো করে চলা। ও তুমি বুঝবে না দিদা। তোমাদের যুগ বদলে গেছে। আমাদের ভাবনাগুলোর সঙ্গে তোমাদের ভাবনার মিল ঠিক হবে না। মানে আজকের দিনে অর্থনৈতিক স্বাধীনতাও পেতে চায় মেয়েরা। আর তার সঙ্গেই জড়িয়ে আছে সামাজিক স্বাধীনতা। তাই চাকরিটা নেব। তুমি ভুল বুঝো না দিদা, লক্ষ্মী দিদা!" কাঞ্চিকে জড়িয়ে ধরে ঝিলিক এই স্বাধীনতাটুকু আদায় করে নিতে চায়। পল এর মধ্যে এসে পড়ে। সে বলে,"কী ব্যাপার, গার্লফ্রেন্ড। এবার তোমারও একজন গার্লফ্রেন্ড জুটে গেছে।" ঝিলিক বলে, " কেন, হিংসে হচ্ছে নাকি?"

" না না, তবে খাল কেটে কুমির এনেছি কি না ভাবছি। এবার আমার গার্লফ্রেন্ডকেই না পর করে দেয়।"

কাঞ্চি বলেন, "ঝিলিকও ভাল চাকরি পেয়েছে পল।"

" তাই নাকি! এ তো রীতিমত সুখবর। বিজনও চাকরি পেয়েছে। এবার তুমিও চাকরি পেলে। ভেরি গুড নিউজ।"

কাঞ্চি পলের এই ব্যবহারে মোটেই খুশি হননি। ভেবেছিলেন অন্তত পল ঝিলিকের চাকরি করাটাকে সমর্থন করবে না। সে এ-ব্যাপারে কিছু বলবে বা বাধা দেবে। কিন্তু তা না করে বরং

ঝিলিকের এই কৃতিত্বকে অভিনন্দনই জানিয়েছে। এটা তাঁর মোটেই ভাল লাগেনি। হতাশ হন তিনি আজকের ছেলেমেয়েদের মন থেকে এই উত্তাপটুকু হারিয়ে গেছে দেখে। একটা ব্যথা অনুভব করেন তিনি।

ঝিলিক এসেছে তার নতুন অফিসে। ঝিলিক এর আগেও তার বাবার অফিসে বসে মাঝে-মাঝে ফাইলপত্র দেখত। এক্সপোর্ট, ইমপোর্টের ব্যাপারে সে অনেক কথাই জানত। মিঃ বোস-এর কারখানার বহু মাল বিদেশে এক্সপোর্ট হত। আবার বিদেশ থেকে বেশ কিছু যন্ত্রপাতি আমদানিও করা হত। যার জন্য এক্সপোর্ট লাইসেন্স, শিপমেন্ট বিল, কাস্টম্স ক্লিয়ারেন্স, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গ্যারান্টি, এ-সমস্ত কাগজপত্রের কথা জানত ঝিলিক।

মিঃ কানোরিয়ার রপ্তানির ব্যবসা। ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে তাঁদের মালপত্র যায়। তার জন্য চিঠিপত্র, ফ্যাক্সও পাঠাতে হয়। এখান থেকে পোশাক, যন্ত্রপাতি, কেমিক্যালস, মাইকা নানা জিনিসপত্র রপ্তানি করে তারা। মিঃ কানোরিয়া অভিজ্ঞ ব্যবসায়ী, ভদ্র, বিদেশে পড়াশোনা করেছেন। আর তাই বিদেশের নানা শহরে ঘুরে তাঁর ব্যবসার কেন্দ্র খুলেছেন বিভিন্ন শহরে, ঝিলিক নিজের জীবন সম্বন্ধে উদাসীন হলেও কাজের ক্ষেত্রে সে সত্যিই বেশ সিরিয়াস। কাজটা সে মন দিয়ে করে। আর এই কাজের পরিবেশে এসে ঝিলিকও কাজের লোক হয়ে নিজের ব্যক্তিত্বকে প্রকাশ করতে চায়। ছেলেবেলা থেকেই সে লড়াকু ধরনের। তার জেদও বেশি। সেও দেখিয়ে দিতে চায়, এই পুরুষশাসিত সমাজে মেয়েদের একটা বিশেষ ভূমিকা আছে। ঝিলিক মন দিয়ে ফাইলগুলো পড়ে। কোন মালের জন্য কী কী আইন, রীতিনীতি, সেসব জেনে নেয় সে। অফিসিয়াল ফর্মালিটিগুলো কী তাও জেনে নেয়। তাই তাপ কাজও নিখুঁত হয়। আর সব কাজ সে শিখে নিয়েছে। প্রয়োজন হলে অফিসে অন্য সহকর্মীদের কাজেও সে সহযোগিতা করে। ফলে অফিসেও সে এরই মধ্যে পরিচিত প্রিয়জন হয়ে উঠেছে। ঝিলিকের কাজে মিঃ কানোরিয়াও খুশি হন। তিনিও ঝিলিকের উপর নজর রেখেছিলেন। মিঃ কানোরিয়া দেশ-বিদেশে যাতায়াত করেন। ব্যবসার রীতিনীতি তিনি বোঝেন। ঝিলিকের রূপ আছে, স্মার্টনেশ আশে। যদি কাজটা শিখে নেয়, ওকে দিয়ে ব্যবসার কাজও ভাল হবে।

তাই মিঃ কানোরিয়া ঝিলিকের ফাইলগুলো পড়েন। পার্টিদের সঙ্গে বিজনেস ডিলের রীতিনীতি দেখেও খুশি হন। পার্টিরাও খুশি। পার্টির ইন্টারেস্টও দ্যাখে, সেই সঙ্গে দ্যাখে কোম্পানির স্বার্থ। মিঃ কানোরিয়া তাঁর ম্যানেজারকে বলেন, "মিস বোসকে দিয়ে এক্সপোর্টের কাজগুলো করাবেন। আর আপনি নিজে নজর রাখবেন।"

মিঃ কানোরিয়াও ঝিলিককে মাঝে-মাঝে তাঁর চেম্বারে ডেকে পাঠিয়ে পার্টির ব্যাপারে খোঁজখবর নেন। ঝিলিকেরও ওই বয়স্ক মানুষটাকে ভালো লাগে। কাজের মানুষ মিঃ কানোরিয়া। ঝিলিককে স্নেহ করেন। বলেন, "কাজই আমাদের ধর্ম মিস বোস, যে তোমাকে অন্ন দেয় তাকে সেবা করা তোমার ধর্ম।"

ঝিলিক একমনে কথাগুলো শোনে। এতদিন তার সামনে কোনও স্থির লক্ষ্য ছিল না। ঝিলিকও জানত না কী করবে সে? কোন পথে যাবে? এবার তাই কাজের পরিবেশে এসে ঝিলিক যেন একটা পথের সন্ধান পেয়েছে। তার মনে একটা আত্মবিশ্বাস জন্মেছে। এই পথেই তাকে এগোতে হবে। আরও উপরে উঠতে হবে। সে তার বাবা মিঃ বোস আর সৎমাকে দেখাতে চায়, সেও অনেক কিছু করতে পারে। সমাজের উপর তলায়ও উঠতে পারে। মুক্তি পেতে পারে পরের আশ্রয়ে পরগাছার জীবন থেকেও।

মিঃ বোসের কাজকর্ম চলছে মোটামুটি। মীরাও কারখানায় আসেন। এতদিন তাঁদের তৈরি মালের দেশ-বিদেশে ভালই বাজার ছিল। মীরা বোসও ভাবতেন, এসব হয়েছে তাঁর কর্ম-কুশলতার জন্যই। মানিক বোস তো উপলক্ষ মাত্র। মীরাই আসল, যাঁর জন্য এই ব্যবসা। এইভাবে চলছে। মীরা এখন নিজের মেয়ে স্বাতীকে নিয়েই ব্যস্ত। স্বাতী এখন কলেজে পড়ে।

মীরা-মানিক কারখানা নিয়ে ব্যস্ত। কিন্তু এবার সেল তাদের ক্রমশ কমতে থাকে। এমনকী

বিদেশের বেশ কিছু অর্ডার, যা এতদিন তাঁরাই পেয়েছিলেন, সেই অর্ডারও এবার বেশ কয়েকটা চলে গেছে অন্যত্র।

মিঃ মানিক বোসও অবাক হন। মীরা অর্ডার কমে যেতে বলেন, "বাজারে আমাদের জায়গাটা অন্য কোনও কোম্পানি দখল করতে চায়। এ-নিয়ে খোঁজখবর করুন ম্যানেজারবাবু।"

মিঃ বোসকেও বলেন মীরা, "দিনরাত মদ গিলে বসে থাকলে চলবে? ব্যবসা যে লাটে উঠবে এবার। খোঁজ নাও, কারা আমাদের অর্ডার হাতিয়ে নিচ্ছে।"

ম্যানেজার বলেন, " আমি খোঁজ নিচ্ছি ম্যাডাম। মিঃ কানোরিয়ার কারখানা এখন এসব মাল বিদেশে এক্সপোর্ট করছে। ওদের মালের কোয়ালিটিও ভাল। আর দিল্লি মিনিস্ট্রিতেও ওদের চেনাজানা আছে"।

"তাই বলে আমাদের সর্বনাশ করবে? বাইরের পার্টিদের লিখুন, আমরা কম দামেই মাল দেব।" তারপর মিঃ বোসকে বলেন, "আর তুমিও খোঁজখবর নাও। দরকার হলে মিঃ কানোরিয়ার সঙ্গে দেখা করে কথা বলো। আমরাই না হয় তাঁকে আমাদের মাল দেব এক্সপোর্টের জন্য। যেভাবে হোক আমাদের কারখানাকে বাঁচাতেই হবে।"

মিঃ বোসও ভাবনায় পড়েছেন।

তাঁর কর্মদক্ষতা আর আগের মতো নেই। ঝিলিক যতদিন এ-বাড়িতে ছিল, তবু বাবা-মেয়ের মধ্যে একটা সম্পর্ক ছিল। বন্ধনও ছিল। কিন্তু মীরা আর তাঁর মেয়ের কাছে মানিক বোস কোনওদিন নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারেননি।

ঝিলিক চলে গেছে। কোথায় গেছে এ নিয়ে মীরাও কোনও খোঁজখবর নিতে চাননি। মানিক তবু চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তিনিও ঝিলিকের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করেননি।

মানিক বোস এ-বাড়িতে থাকেন মাত্র। মীরা তাঁর মেয়েকে নিয়ে থাকেন দোতলার মহলে। মানিক বোস থাকেন নীচে। যেন এ-বাড়ির কোনও আশ্রিত কর্মচারী মাত্র। নিঃসঙ্গ রাতে তাঁর মনে পড়ে তাঁর আগের স্ত্রী রুপালির কথা। সেদিনগুলো কোথায় হারিয়ে গেল! তবু ঝিলিক ছিল। মানিক তাকেও চলে যেতে বাধ্য করেছেন এখান থেকে। এবার বুঝেছেন মীরাই তাঁকে ঝিলিকের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছেন। তিনিও মণিকাঞ্চন ফেলে আজ ওই মীরা-স্বাতীর মতো মূল্যহীন শুধু ঝকঝকে কাচ নিয়েই ঘর করার অভিনয় করছেন। আজ ভাবেন, ঝিলিককে খুঁজে পেলে তিনি তাকে নিয়ে অন্যত্র বাঁচার চেষ্টাই করবেন। তিনি এই সোনার শিকলের বাঁধন কেটে নতুন করে বাঁচতে চান। ওদিকে ব্যবসার অবস্থাও খারাপের দিকে চলেছে। প্রতিপক্ষ বাধার সৃষ্টি করছে। আর মীরাও মানিকের উপরই রাগটা দেখান, "অকর্মণ্য, অপদার্থ তুমি। তোমার জন্যই এতদিনের কারবার ডুবতে চলেছে।" মানিক মুখ বুজে এসব অপমান সহ্য করেন অসহায়ের মতো।

৯

এখন ঝিলিক চাকরি নিয়েই ব্যস্ত। তবু কাঞ্চির এখানেই আছে। বিজনও আসে মাঝে-মাঝে। বিজন এখন অধ্যাপনার চাকরি নিয়ে ব্যস্ত। তার সঙ্গে নিজের পড়াশোনা, লেখাপড়াও আছে। এখন বিজন মেস ছেড়ে দিয়ে শ্যামবাজারের ওদিকে একট ছোট বাড়ি ভাড়া নিয়েছে পার্কের ওদিকে। এদিকটাতে এখন গাছগাছালির সবুজ স্নিগ্ধতা কিছুটা রয়েছে। বিজনের নতুন বাড়িতে আসার দিন সে একটা ছোটখাটো পার্টি দিয়েছিল। সেখানে হাজির ছিল বিজনের কয়েকজন বন্ধু, পল আর ঝিলিক।

সন্ধ্যার পর বন্ধুরা আসে। ঝিলিকও আসে অফিস থেকে।

পল বলে, "ঝিলিকের বরাতই সবচেয়ে ভাল রে।"

বিজন বলে, "তা সত্যি।"

"এবার দুজনে ঘর বাঁধ বিজন।"

বিজন অবশ্য সে-ই স্বপ্নই দ্যাখে। সেই রাতের সেই মুহূর্তের জন্য ঝিলিকের দেহের নিবিড় স্পর্শটা আজও বিজনের মনে ঝড় তোলে।

নিঃস্ব বিজনের জীবনে ঝিলিক আনবে পূর্ণতার স্পর্শ। ঝিলিক এসেছে। বিজন ওর ঘর দেখায়। তার পড়ার ঘরটা কীভাবে সাজাবে। বেডরুমের পরদা কী ডিজাইনের হবে, এসবই বলে। "এখন থেকে নিজের মতো করে সাজিয়ে নাও।"

ঝিলিক চমকে ওঠে। ওর মনে হয় বিজন ইচ্ছে করেই এ-বাড়িতে এনেছে। বিজনের মনেও একটা আশা, স্বপ্ন রয়ে গেছে। ঝিলিক এ-ধরনের আশা কল্পনাও করেনি। তার এখন ওই ব্যবসার নতুন জগতে এগিয়ে যাওয়ার কথাই বারবার মনে পড়ে। দেশদেশান্তরের স্বপ্ন তার মনে। ঝিলিক বাড়ির আরাম, নিশ্চিন্ততা ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে। কারণ সে বিয়ে, ঘরসংসারের বেড়াজালে বন্দি হয়ে থাকতে চায়নি।

সে চায় তার নিজের জগতের মুক্ত আকাশে বিচরণ করতে। তার বঞ্চিত জীবনে ভালবাসা কেউ দেয়নি। তাই ভালবাসার মিথ্যা স্বপ্নও সে দেখে না। তার অশান্ত যৌবন ঘর বাঁধতে নয়, চায় ঘর ভেঙে যাওয়ার মতো মুক্ত পৃথিবীর পথে উধাও হতে।

বিজনের মনে কিন্তু ঘরের স্বপ্ন। আর সেটা পলও জানে।

ঝিলিক বলে, "ঘরের মোহ আমার নেই, পল। তাই ঘর সাজিয়ে সেই সাজানো ঘরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হওয়ার স্বপ্নও দেখি না।" পল বলে, " দেখবে ঝিলিক, দেখবে। সব ছেলেমেয়ে একটা বয়সে যাযাবর হতে চায়। কিন্তু তারাই আবার ঘর বাঁধে পরম মমতায়।" রাত নামে। ওদের খাওয়াদাওয়া হয়ে গেছে। বিজনের কলেজের বন্ধুরা ফিরে গেছে। এবার গাছগাছালির বুকে ঘুমন্ত পাখিদের ডানার ঝটপটানি শোনা যায়।

পল বলে, "আজ চলি, বিজন। চলো ঝিলিক।"

কাঞ্চি বেশ কিছুদিন ধরেই কথাটা ভাবছেন, ঝিলিক আর পল স্বাভাবিকভাবে মেলামেশা করুক। মাঝে-মাঝে দু'জন পার্টিতেও যায়। ফেরে রাত করে। কাঞ্চিও ভাবছেন কথাটা। ঝিলিকের নিশ্চয়ই আর অমত হবে না। কাঞ্চি ঘুমোননি। পল, ঝিলিক তখনও ফেরেনি। হঠাৎ গাড়ির শব্দ শুনে তাকালেন। দেখলেন ওরা ফিরছে। ঝিলিকের সাজগোজে বেশ সুশ্রী ভাব ফুটে উঠেছে। দু'জনকে মানিয়েছে সুন্দর।

পরদিন ছুটি। সপ্তাহের এই একটা দিন ঝিলিকের ছুটি। সে একটু বিশ্রাম পায়। বেলা অবধি ঘুমিয়ে তারপর ওঠে। অন্যদিন আটটার মধ্যে তৈরি হতে হয়। ঝিলিক আজ বেলা অবধি ঘুমিয়ে উঠেছে। তাকে উঠতে দেখে কাজের লোক চা নিয়ে আসে। সে বলে,"দিদি তুমি আজ এত দেরিতে উঠলে। মা'জি এর মধ্যে তোমার খোঁজ করে গেছেন।"

ঝিলিক একটু অবাক হয়, বলে, "দিদা খোঁজ করছিল আমার?

কেন?"

"কী জরুরি কাজ আছে।" কাজের লোক জবাব দেয়। কাঞ্চি সকালে নিজের ঘরে বসে ব্যবসার কিছু জরুরি কাজ করছিলেন। তিনি লেখাপড়া জানেন। রবার্ট-এর সঙ্গে বিয়ের পর সেই চা-বাগানের মালিক গর্ভনেস রেখে কাঞ্চিকে ইংরেজি পড়িয়েছিলেন। ইংরেজি আদবকায়দাও শিখিয়ে নিয়েছিলেন। তিনিই ঝিলিককে ঢুকতে দেখে বলেন, "এসো ঝিলিক।" "আমায় খুঁজছিলে? কী জরুরি কথা আছে?" ঝিলিক বলে। কাঞ্চিও ভাবছেন কীভাবে কথাটা জানাবেন। বলেন, "বোসো"। ঝিলিক আসে। তার মনে হয় কাঞ্চি এবার তার চাকরির ব্যাপারে জেনেছেন। তা নিয়ে কিছু বলবেন। কারণ এখন চাকরির ব্যাপারে ঝিলিকের বাড়ি ফিরতেও দেরি হয় মাঝে-মাঝে। দিদা হয়তো এখনও ভাবেন যে, মেয়েদের সন্ধ্যার পর বাইরে থাকতে নেই। অবশ্য ঝিলিকও উত্তরটা ঠিক করে রেখেছে। আজকাল মেয়েরাও ছেলেদের চেয়ে কম নয়। তাদেরও কাজে আটকে পড়তে হয়। দেরি তো হবেই।

কাঞ্চি বলেন, "ক'দিন ধরেই কথাটা ভাবছি ঝিলিক। মানে তোমার কাছে যদি আমি কিছু চাই, তোমার অসুবিধে না থাকলে তুমি আমায় দেবে?"

ঝিলিক ওই মহিলার কাছে কৃতজ্ঞ। ওকে সেই রাতে, যেদিন ঝিলিকের সামনে কোনও আশ্রয় ছিল না বৃদ্ধা তাকে সাদরে বুকে টেনে নিয়ে তার সংগ্রামকে সমর্থন করেছিলেন। তাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। সম্মানের সঙ্গে ঝিলিক এখানে আজও রয়েছে ওই বৃদ্ধার স্নেহছায়ায়।

এখান থেকেই সে আজ তার পায়ের নীচের মাটি খুঁজে পেয়েছে। ঝিলিক বলে, "কী বলবে বলো না দিদা। এত সঙ্কোচ করছ কেন?"

কাঞ্চি ইতস্তত করেন এই ভেবে, না জানি ঝিলিক তাঁর কথায় কী ভাবে! হয়তো কাঞ্চি যে তার উপকার করেছেন, তার প্রতিদান হিসেবে চাইছেন। তাই অনেক ভেবে বলেন, "জানো ঝিলিক, মেয়েদের লড়াই করতে হয় তা জানি। এ ছাড়া মেয়েদের একজনকে পাশে চাই, যাকে নিয়ে সে ঘর বাঁধবে। স্বপ্ন দেখবে, একটি সুখী নিশ্চিন্ত জীবনের। তাই ভাবছিলাম, তুমি যদি আমাদের সংসারে আসো। মানে, পলকে বিয়ে করে আমার নাতিটার ভার নাও। ও বড় অসহায়, একা। অন্যের কথাই ভাবে। ওর কথাটা যদি তুমি ভাবো একবার।"

ঝিলিক চমকে ওঠে। পলও প্রকৃত বন্ধু। ওকে নিয়ে কোনওদিন এসব কথা ভাবেনি সে। আর ঘর ছেড়ে বেরিয়েছে ঝিলিক, আর-একটা ঘরের বাঁধনে বাঁধা পড়তে চায় না। আজ কাঞ্চির কাছে এসব কথা শুনে ঝিলিক বিব্রত বোধ করে। এখানেই রয়েছে সে। আজ কাঞ্চির অন্ন, আশ্রয় তার ভরসা। তাই তার মুখের উপর স্পষ্ট না বলতে বাধে তার।

কাঞ্চি বলেন, "ঝিলিক! হয়তো তুমি ভাববে তোমায় সাহায্য করেছি। এখন তার দাম চাইছি। তা নয়। পল ছেলে হিসেবে ভাল। তবে ওর দাদু ছিলেন ব্রিটিশ। ওর দেহে হয়তো খাঁটি বাঙালির রক্ত নেই। কিন্তু ছেলেটা মনেপ্রাণে বাঙালি। ওর মনটা অনেক বড়। ও নিজে মুখ ফুটে কোনওদিন কিছু চাইবে না। ওর টাকারও অভাব নেই। যদি একজন ভাল জীবনসঙ্গিনী পায় ও, আমি নিশ্চিন্তে মরতে পারি। সেই আশা নিয়েই কথাটা বলছি। অবশ্য তোমায় কোনও চাপ দিতে চাই না। তুমি ভেবেচিন্তে এর জবাব দিও।"

"কোনও তাড়া নেই আমার।"

ঝিলিক ভাবছে। বেরিয়ে আসে সে। পল বাইরে থেকে দিদার ঘরে আসছিল। হঠাৎ ঘরে ঝিলিক আর দিদার ওই কথা শুনে পল বাইরে থমকে দাঁড়ায়। দিদা যে ঝিলিককে একথা বলবেন তা সে ভাবেনি। পল জানে, ঝিলিককে ভালবাসে বিজন। সে আজ ঘর বেঁধে বসে আছে। পল ওদের মাঝে কাঁটার মতো বিঁধে থাকতে চায় না। তার কোনও চাহিদাই নেই। তাই দিদাকে এসব কথা বলতে দেখে লজ্জা পায় সে। সরে যায়।

ঝিলিক বেরিয়ে যাওয়ার পর পল ঘরে ঢোকে। কাঞ্চি চাইলেন ওর দিকে।

"ঝিলিককে এসব কথা বলে তুমি ঠিক করোনি দিদা।"

"আমার উপর কথা বলিস না পল। সারাজীবন তুই কি একাই থাকবি? ওরে, মানুষের জীবনে প্রেমের প্রয়োজন আছে। মানুষ চায় ফুল-ফলে ভরে উঠতে, অন্যদের নিয়ে সুখী হতে। আমার জীবন দিয়ে এটা বুঝেছি। তাই আমাকে বাধা দিস না।"

"তুমি ভুল করছ দিদা, এ তোমার ভুল।"

"দ্যাখ, মেয়েদের মন আমি বুঝি রে। তুই আর কথা বলিস না।" ঝিলিকও নতুন করে কথাটা ভাবে। এতদিন সে এ-বাড়িতে রয়েছে। এদেরই একজন হয়ে গেছে। পলকে জেনেছে বন্ধুর মতো। কিন্তু আজ কাঞ্চির কথাগুলো ঝিলিকের মনে ঝড় তুলেছে। একটা বাঁধনকে এড়াবার জন্য সে সেই রাতে বেরিয়ে পড়েছিল। আজ আবার হঠাৎ ঘরবন্দি হওয়ার কথায় ঝিলিক ভাবনায় পড়েছে। সন্ধ্যা নামছে। হঠাৎ পলকে ঢুকতে দেখে তাকাল। পলও বোধ হয় সেই একই দাবি নিয়ে তার কাছে ছুটে এসেছে। ঝিলিক তাকাল। পল বলে, "দিদার কথায় তুমি কিছু মনে কোরো না ঝিলিক। দিদা নিজের নাতিকে সুখী করার জন্য তাঁর ফর্মুলা মতোই ভাবনাচিন্তা করে কথা বলেন। ওঁর কথার কোনও দাম না দিলেই ভাল করবে।"

ঝিলিক পলের কথায় অবাক হয়। কিছুটা নিশ্চিন্তও হয়, "সত্যি বলছ পল?"

"তোমাকে বন্ধু বলেই ভাবি ঝিলিক। তোমার উপর কোনও দাবি আমি রাখতে চাই না। ভালবাসার দাম আমি জানি না। তাই ভয় হয়। কাউকে ভালবেসে যদি মিথ্যা কথা বলি। তাই ওটাকে এড়িয়ে চলতে চাই।"

ঝিলিকের মনে হয়, আজকের ছেলেমেয়েরা অনেকটাই স্বাভাবিকভাবে কথা বলে, প্রেমের জটিলতায় যেতে চায় না তারা। বাস্তব জগৎ ছেড়ে বেরোবার ফুরসত নেই তাদের। পল বলে, "ভালবেসে কাউকে নিজের করে বন্দি করে রাখাটা পরম স্বার্থপরের কাজ। প্রেম তো মুক্তিও দিতে পারে।"

ঝিলিকও ভাবছে কথাটা।

"দ্যাখো ঝিলিক, তোমার স্বাধীন মতামতই জানাবে দিদাকে। সেখানে কোনও বাধ্যবাধকতা নেই। মনে রেখো, তুমি আমার বন্ধু।"

চলে যায় পল। একা বসে আছে ঝিলিক। আজ পলকে নতুন করে চিনেছে। পলও তাকে সেই আকাশের ঠিকানা দিয়ে গেছে। পলের সমস্যাটার সমাধান হয়ে গেছে। কিন্তু সেইসঙ্গে আরও একটা সমস্যা দেখা দেয়। ঝিলিকও জানে কাঞ্চিকে জবাব দিতে তার কষ্ট হবে। বৃদ্ধা অনেক আশাই করেছিলেন। তাঁকে হতাশ করতে হবে। কিন্তু কোনও পথই নেই। কাঞ্চিকে ওই কথাই জানিয়ে দেবে ঝিলিক। আর তারপরই সে এ-বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে।

একটার-পর-একটা বাধা পার হতে হবে। তাই একদিন সে আশ্রয় ছেড়ে এসেছিল। আজ আবার তাকে আর-একটা আশ্রয়ও ছাড়তে হবে। নতুন আর-একটা ঠিকানা তার দরকার। মানুষকে এগিয়ে চলতে হলে অনেক কিছুই পিছনে ফেলে এগিয়ে যেতে হয়। এক জায়গায় ধরা দিতে চায় না মন। তবু ঝিলিক থামবে না।

১০

অফিসের কাজে ঝিলিকের নামডাক হয়েছে। অনেক সহকর্মী তাকে ভালবাসে। কারণ খোদ মালিক মিঃ কানোরিয়াই ঝিলিককে মেয়ের মতো স্নেহ করেন। সহকর্মীদের অনেকের অনেক সমস্যাই সে সমাধান করে দেয়। সেদিন ঝিলিক অফিসে বসে তার কয়েকজন মহিলা সহকর্মীকে কথাটা বলল। আজকাল বহু মেয়ে অফিসে কাজ করে, নয়তো বাইরে থেকে এসে কলকাতায় পড়াশোনা করে। এদের থাকার জন্য বেশ কিছু লেডিজ হস্টেল রয়েছে। সেখানে রাঁধুনি, কাজের লোকও আছে। খাওয়াদাওয়ারও ব্যবস্থা থাকে। অফিসে দু'-তিনজন মেয়ে তেমন একটা বেশ ভাল লেডিজ হস্টেলের কথাই বলে। অনিতা নামে একজন, "ওখানে থাকতে পারো ঝিলিক। সিঙ্গল রুমও আছে ওই হস্টেলে। লেকের কাছে, খোলামেলা। পরিবেশও ভাল। তোমার কোনও অসুবিধে হবে না।"

"তা হলে চলো, আজ দেখে আসি। ধরো, পছন্দ হলে অ্যাডভান্সও দিয়ে আসব।"

"তাই চলো। আমরা দু'-তিনজন থাকি ওখানে। তোমার কোনও অসুবিধে হবে না।"

অফিসের পর এসেছে ঝিলিক ওদের সঙ্গে সেই হস্টেলে। বেশ বড়সড়। সামনে একটু বাগান মাত্র। আরও দু'তিনজন যারা থাকেন এখানে, তাদের সঙ্গেও কথা হয়েছে ঝিলিকের। কিন্তু হস্টেলের কর্ত্রী মিসেস বোসের সঙ্গে তার দেখা হল না। তাঁর সেক্রেটারি আছে, মিসেস বোস নাকি কোনও জরুরি কাজে বেরিয়েছেন। ঝিলিকের ঘরটা পছন্দ হয়। দারুণ খোলামেলা। তিনতলার ওদিকের সিঙ্গল রুমটাও দারুণ। ভাড়া মাসে হাজার টাকা। আর খাওয়াদাওয়ার জন্য মেস সিস্টেম আছে। ঝিলিক ওই সহকারী মহিলাকে অ্যাডভান্সের টাকাটা দিয়ে রসিদ নিয়ে বেরিয়ে আসে। এই মাসের আর চার-পাঁচদিন আছে। তাই সামনের পয়লা তারিখ থেকে চলে আসবে ঝিলিক এখানে।

ঝিলিক আজ মুক্তমনে বাড়ি ফেরে। এবার তার থাকার জন্য একটা ঠিকানা পাওয়া গেছে। এখন সে শুধু মুক্তির দিন গোনে।

১১

মীরা বোস বুঝেছেন কানোরিয়া কোম্পানিই তাঁদের চেয়ে সস্তায় মাল তৈরি করে বিদেশের বাজার ধরে ফেলেছে। এই বুদ্ধিটা ঝিলিকই দিয়েছিল মিঃ কানোরিয়াকে। সে জানত ওসব মাল কোন-কোন দেশে নেয়। সে মিঃ কানোরিয়াকে বলে, "ওই মিঃ বোসদের কারখানার মাল এনে তাকে খুলে, মেশিনারির ডিজাইন দেখে সেইমতো মাল তৈরি করে বিদেশে শ্যাম্পেল পাঠালে কাজ হবে।"

এর মূলে ঝিলিকের কিছুটা প্রতিশোধ নেওয়ার ইচ্ছেও ছিল। মিঃ কানোরিয়া ওর কথাটা লুফে নেন। তাঁর কারখানায় ওই মাল আরও উন্নতমানের মেটিরিয়াল দিয়ে তৈরি করে আরও ভাল ফিনিশ করে, বাইরের বাজার ধরে ফেলেছেন তিনি। আর এবার চান ওই মিঃ বোসদের কারখানাটাই দখল করতে। অবশ্য সেটা করার জন্য তিনি এবার সাবধানে এগোতে থাকেন। মানিক বোসের সঙ্গেও যোগাযোগ করেছেন তিনি। মিঃ কানোরিয়া চান প্রথমে ওঁদেরই এই মাল তৈরির বড় অর্ডার দিয়ে সেই মাল নিজেদের ছাপ দিয়ে বাইরে পাঠাতে হবে।

মানিক বোসও ভাবছেন এবার, মীরাও ভাবনায় পড়েছেন। এমন দিনে কানোরিয়ার এত বড় অর্ডার পেয়ে মীরাই বলেন, "তুমি যাও। মিঃ কানোরিয়ার সঙ্গে মিট করে দরদস্তুর করে অর্ডার ফাইনাল করে এসো।"

"তাই যাব। লোকটাকে এখন চটানো ঠিক হবে না। দেখি দর কী দেন। তারপর ফাইনাল কথা হবে।"

১২

কাঞ্চি ক'দিন থেকেই ঝিলিকের কথা ভাবছিলেন। ঝিলিক সেদিন কাঞ্চির ঘরে গেছে। মেয়েটা সেই সকালে বেরিয়ে সন্ধ্যার পর ফেরে। কাঞ্চি ভেবেছিলেন পলের সঙ্গে বিয়ে হলে মেয়েটার খাটনি কমবে, নিজেদের অফিসে বসবে। দরকার হলে মাঝে-মাঝে চা-বাগানের বাংলোয় যাবে। ঝিলিক আর পল হারিয়ে যাবে সবুজের জগতে। কাঞ্চিও তাঁর সেই চা-বাগানের হারানো দিনে ফিরে যেতে চান।

ঝিলিক পাশে বসে। কাঞ্চি ওর দিকে অনেক আশা নিয়ে চেয়ে রয়েছেন। হয়তো ঝিলিক তাঁর প্রস্তাবে রাজি হয়েছে। ঝিলিক বলে, "পল আমার বন্ধু দিদা। ওকে অন্যভাবে ভাবতে পারি না। তুমি আমায় ক্ষমা করো প্লিজ।"

ঝিলিক ওই স্বপ্নময় সুন্দর জগতের ডাকে সাড়া দিতে পারবে না। অবাক হন কাঞ্চি। মনে হয়, আজকের যৌবন সব সুন্দরকে যেন হারিয়ে ফেলে কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি হতে চায়। ছুটে যেতে চায় রুক্ষ পাথুরে পথে। চলে যায় ঝিলিক। তখনও স্তব্ধ হয়ে বসে আছেন কাঞ্চি। মনে হয় তাঁদের দিনগুলো আজ হারিয়ে গেছে।

এখানে প্রেম-সুর-সবুজ কোনও কিছুরই অস্তিত্ব নেই।

পরদিন সকালে ঝিলিক ওর জিনিসপত্র প্যাক করছে। ঘরে ঢোকে পল। চমকে উঠে বলে, "এ কী!"

"পল, কাল আমি দিদাকে আমার মতামত জানিয়ে দিয়েছি।"

পল সহজভাবেই বলে, "দিদা অবশ্য একটু দুঃখ পেয়েছেন। কিন্তু আমি খুশিই হয়েছি ঝিলিক। তোমাকে বন্ধুর মতোই পেতে চাই। চলে যাওয়ার প্রশ্ন উঠছে কেন?"

"আসলে, এরপর দিদার সামনে যেতে আমার বাধবে, পল। দয়া করে আমায় ভুল বুঝো না। আমায় এখান থেকে যেতেই হবে। আমিও মুক্তির স্বাদ পেতে চাই।"

"কোথায় যাবে?"

পলের কথায় ঝিলিক বলে, "চলো! তোমারও জানা দরকার। যদি আবার তোমার সাহায্যের দরকার হয়। তাই তুমিও চলো আমার নতুন হস্টেলটা দেখে আসবে।"

পল বলে, "যেতেই হবে?"

"প্লিজ, বাধা দিও না।"

"বিজন জানে?"

ঝিলিক জানে বিজন সম্বন্ধে পলের দুর্বলতার কথা। ছন্নছাড়া বিজনকে সে আজ সমাজের একজন করে তুলেছে। আর ঝিলিকের সঙ্গে ওকে জড়াতে চায়।

তাই ঝিলিক বলে, "ওটা তুমি জানিয়ে দিও। আর লাভই বা কী বলো?"

"আছে ঝিলিক, বাঁচতে গেলে কোথাও না কোথাও মাথা নত করতে হয়। কিছু পেতে গেলে কিছু দিতেও হয়। এই দেওয়া-নেওয়াকে অস্বীকার করা যায় না।"

"তোমার এই গুরুগম্ভীর তত্ত্বগুলো আমার বুঝে কাজ নেই। এখন চলো হস্টেলে। সেখানে ওয়েটিং-রুম অবধি তোমার দৌড়। ওটা প্রমীলাদের রাজ্য, পুরুষের প্রবেশ নিষেধ।"

মিসেস বোসের হস্টেলের গালভরা একটা নামও আছে। মিসেস বোসের বয়স হয়েছে। আগে ছিলেন ছিমছাম সুন্দরী কোনও ঘরনী। সেই ঘরের ঠিকানা আজ নেই। মিসেস বোসের নামটাই রয়ে গেছে। জীবনের অনেক পথই পার হয়ে এসেছেন তিনি। এখন এই হস্টেল চালিয়েই তাঁর দিন কাটে।

ভারী চেহারা। চোখে সেল ফ্রেমের চশমা। জীবনে অনেক বঞ্চনা সহ্য করে ভদ্রমহিলার মেজাজটা উগ্রই হয়ে গেছে। নিজের জীবনে একসময় অনেক ঝড় বয়ে গেছে। অনেক ঘর ভাঙতে দেখেছেন তাঁর জীবনে। এখন তাই সামান্য বেচাল দেখলেই ফুঁসে ওঠেন। হস্টেলে মেয়েদেরও কঠিন শাসনের মধ্যে সংযত করে রাখতে চান। তিনি এতকাল বাঁধন মেনে এসেছেন। আজ তাই মিসেস বোস মেয়েদের সেই বাঁধনকে মানতে বাধ্য করান। এগুলো নাকি প্রয়োজন আছে আজকের সমাজে, মেয়েদের জীবনে।

এর আগে খাতায় ঝিলিকের নামও তোলা হয়েছে। তখন খেয়াল করেননি মিসেস বোস। টাকা জমা পড়েছে। নতুন বোর্ডার আসবে।

গাড়িটা এসে থামে। নামছে পল, সঙ্গে ঝিলিক। মিসেস বোস তখন অফিসে নেই। ঝিলিক খাতায় নাম লিখে সই করে বাকি টাকা দিয়ে অপেক্ষা করছে ড্রয়িংরুমে। ওদিকে ঘরটা তৈরি করছে। পল এদিক-ওদিক দেখে ঝিলিককে বলে, "এখানে থাকতে পারবে ঝিলিক? মনে হচ্ছে এখানে হাসতেও মানা।" " দেখা যাক। না পোষালে আবার ব্যাক টু প্যাভেলিয়ন। তোমার বাড়ি তো রয়েছে।"

হঠাৎ মেয়েদের হাসি কলরব থেমে যায়। ভদ্রমহিলা এগিয়ে আসেন। ঝিলিকের সঙ্গে পলকে দেখে বলে, "এখানে ভিজির্টাসদের সময় চারটে থেকে ছ'টা, এখন নয়।"

"আমাকে পৌঁছে দিতে এসেছে।"

"ঠিক আছে। এসে গেছ এখানে। ওর আর দরকার নেই, নিজের ঘরে যাও।"

ঝিলিক দেখছে মহিলাকে। ওই মুখ, ওই চোখ, কঠিন কণ্ঠস্বর যেন ওর চেনা মনে হয়। খুব চেনা। অতীতের হারিয়ে যাওয়া মায়ের মুখখানা ভেসে ওঠে। অমনি শাসনের স্বরে কথা বলতেন, যা আজও বদলায়নি। সেই চাহনি। ছোট, ঝিলিকের সামনের সেই মহিলা, আজ ঝিলিকের মনে হয় এতদিন পর সে হারানো সেই মহিলাকেই আবার আবিষ্কার করেছে এখানে। মহিলার জীবনে ওসব ভাবনার কোনও ঠাঁই আগেও ছিল না, এখনও নেই। তাই ঝিলিকের ভাবনার রেশ কেটে যায় ওঁর কণ্ঠস্বরে, "গো টু ইয়োর রুম।" আর পলকে বলেন, "ভিজিটিং আওয়ার্সের মধ্যে আসতে হবে। নট নাউ।"

পল বেরিয়ে আসে। ঝিলিকের মনে হয়,যে জীবনকে সে ভুলতে চেয়েছিল, যাকে সে এতদিন

ভুলেই ছিল, আজ হঠাৎ সেই কঠিন অতীত তার জীবনে ফিরে এসেছে। ঝিলিকের প্রতিবাদী মনও কঠিন হয়ে ওঠে। এই বাধা তাকে পার হয়ে চলতে হবে। ঝিলিক উপরের তলায় তার ঘরের দিকে চলে যায়।

১৩

বিজন সেদিন লেখার কাজে ব্যস্ত। এখন সে তার নিজের বাসাটিকে সুন্দর করে সাজিয়েছে। এবার সে অপেক্ষা করে। সেদিন রাতে বিজন ঝিলিককে কথাটা বলেছিল। কিন্তু ঝিলিক কোনও জবাব দেয় না। ওর মৌনতাকে সম্মতির লক্ষণ বলেই ধরে নিয়েছিল বিজন। হঠাৎ পলকে আসতে দেখে তাকাল বিজন। পল হয়তো কিছু আশার খবরই এনেছে। পল বলে, "তুই কী রে বিজন? ঝিলিক আমাদের বাড়ি থেকে চলে গেল একটা লেডিজ হস্টেলে। সেখানের সুপারকে দেখলাম যেন মেয়েদের জেলখানার ওয়ার্ডেন। একেবারে বুলডগ-মার্কা চেহারা। ওখানে তো ঝিলিকের লাইফ হেল হয়ে যাবে।"

বিজন অবাক হয়ে বলে, "তোদের ওখান থেকে চলে গেল কেন?"

"তোদের ব্যাপার তোরাই জানিস! আমি বলি, তুই গিয়ে ঝিলিককে ওখান থেকে তোর এখানে উদ্ধার করে নিয়ে আয়।" বিজন ভাবছে, ঝিলিক পলের বাড়ি থেকে চলে গেছে। বিজন তাকে আশ্রয় দেবে, এইভাবে অসহায় মেয়েটাকে বানে ভাসা খড়কুটোর মতো এখানে-ওখানে ভেসে বেড়াতে দেবে না। তাই সেদিন বিকেলে বিজন আসে ঝিলিকের অফিসে। পাঁচটায় ওর অফিস ছুটি হয়। তাই অফিসের গেটের বাইরেই অপেক্ষা করে বিজন।

ঝিলিক বের হচ্ছে। ওর গাড়িটা গেটের ওদিকে কারপার্কে রাখা আছে। হঠাৎ বিজনকে দেখে তাকাল ঝিলিক। ও যে এখানে তারই জন্যে দাঁড়িয়ে আছে সেটাও বুঝেছে ঝিলিক। তবু বলে, "কী ব্যাপার! এখানে?"

"তোমার সঙ্গে কিছু কথা আছে ঝিলিক। চলো, বাইরে কোথায় যাওয়া যাক।"

ঝিলিক, পল ও বিজন দু'জনের সঙ্গেই সহজভাবে মিশতে পারে। ওরাই সেদিন তাকে নিয়ে গেছিল কাঞ্চির কাছে। দুই বন্ধুর প্রীতির সম্পর্কও সে জানে। এর মধ্যে বিজন একটা ট্যাক্সি ধরেছে। বিজন বলে, "গঙ্গার ধারে চলো। আউটরাম ঘাটের দিকে।"

এদিকটা এখনও কিছুটা ফাঁকা। সবুজ ঘাস আছে, আছে গাছগাছালি, পাখিদের কলরব। গঙ্গার ধারে ওরা একটা বেঞ্চে বসে।

ঝিলিক বলে, "পল তোমায় পাঠিয়েছে?"

ঝিলিক জানে, পলের বাড়ি ছেড়ে চলে আসায় পল মোটেই খুশি হয়নি। তাই বোধ হয় পলই বিজনকে পাঠিয়েছে।

"না না। শুনলাম, তুমি কোনও হস্টেলে আছ? ওখানে কেন গেলে?"

"আমি শুধু একা থাকতে চাই।"

"আমরা কি তোমায় বিরক্ত করি?"

"না না। তা করো না। তোমরা বরং আমায় নানাভাবে সাহায্য করেছ।"

"ঝিলিক,আজ তুমি হয়তো বুঝতে পারছ না। এই বয়সে সবাই প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। কিন্তু একদিন সেও অনেক কিছু পেতে চায়। আপস করে সুখে শান্তিতে বাঁচতে চায়। ভালবাসার সন্ধান করে। তবে কেন আমরা নতুন করে বাঁচতে পারব না!"

ঝিলিক এর উত্তর জানে না। তার মনের কোণে আজও রয়েছে সেই বঞ্চনার জ্বালা। তাকে ঠকতে হয়েছে বারবার। তাই সে সরে এসেছে এ-পথ থেকে অন্য পথে। সঙ্গীবিহীন সে-পথে ঝিলিক একা।

তবু ওই একাই সে থাকতে চায়। নিজের সঙ্গে মুখোমুখি হতে তার ভয় নেই। অন্যের মুখোমুখি হতেই তার সংশয়। ঝিলিক বলে, "আমার জীবনটাই বঞ্চনায় ভরা বিজন। তাই ভয় হয়, কিছু চাইতে গেলে ঠকব। তাই আমি কারও কাছে কিছু চাই না। নিজেই দূরে সরে থাকতে চাই। যা পেতে চাই তা নিজে অর্জন করে পেতে চাই। কারও দয়া নেব না।"

"দয়ার কথা কেন আসছে? তোমার যোগ্যতায় তুমি অর্জন করেছ এই অধিকার। ওই হস্টেলে আর নয়। নিজের ঘরেই আসবে।" সন্ধ্যা নামছে, গাছের ডালে ঘরে ফেরা পাখিদের কলরব ওঠে। বিজন বলে, "দেখেছ, ওই আকাশের পাখিরাও দিনভর আকাশে উধাও হয়। কিন্তু দিনের শেষে অন্ধকারে আবার ঘরের ঠিকানা খুঁজে নেয়।"

"তা সত্যি।"

"কথাটা ভেবে দ্যাখো ঝিলিক। আমি তোমার পথ চেয়ে থাকব।" ঝিলিক ভাবছে। হস্টেলের সবই ভাল, কিন্তু ওই মিসেস বোসের কড়াকড়ি কোনও মেয়েরই ভাল লাগে না। ঝিলিক তবু সবকিছুকে মেনে নিয়েছে। তার মনে হয়, বাবাকে হারিয়েছে ঝিলিক। বাবা তার কোনও খবর রাখেন না। তবু মাকে দেখেছে, দেখেছে যে অহঙ্কার, স্বপ্ন নিয়ে সেদিন মা তাকে ফেলে রেখে ঘর ছেড়েছিলেন, আজ সেই অহঙ্কার, প্রতিষ্ঠা, স্বপ্ন তাঁর হারিয়ে গেছে। জীবন তাঁকে কিছু দেয়নি। বরং ঠকিয়েছে অনেক। তাই মিসেস বোস এত কঠিন হয়ে পড়েছেন।

মায়ের এই পরাজয়টা ঝিলিককে দুঃখ দেয়। আর এটা একটা চ্যালেঞ্জ হয়ে ওঠে তার কাছে। এমনিতে জেদি সে। ঝিলিকও ভাবে সেও ঘর ছেড়ে এসেছে, সব হারাতে নয়, ঠকতে নয়। অনেক কিছু পেতে, এই যৌবনের লড়াই তাকে জিততেই হবে। হস্টেলে ফিরে ঝিলিকও অফিসের ফাইলপত্র নিয়ে বসে। তার ওই এক্সপোর্টের ব্যবসার সবকিছু জানতে চায়। এই পথেই তাকে এগিয়ে যেতে হবে। মিঃ কানোরিয়াও এবার বিদেশে তাঁদের অফিস খুলেছেন। ঝিলিকও স্বপ্ন দ্যাখে। তার যোগ্যতা দিয়ে অনেক কিছু পেতে হবে। আজকের যৌবন ওই মিথ্যা প্রেমের কাল্পনিক স্বপ্নে ভুলতে চায় না, বাস্তবে সে জয় করতে চায় অনেক কিছু। সেদিন বিজনই ওকে এই অবধি পৌঁছে দিয়ে গেছে। ঝিলিকের কাছে বিজনের কথাগুলো তেমন রেখাপাত করেনি। ঝিলিক দূরের স্বপ্ন দেখতে অভ্যস্ত।

রাতে খাওয়াদাওয়ার পরও পড়াশোনা করছে ঝিলিক। ফরেন মার্কেট, ফরেন এক্সচেঞ্জের জটিল আইনগুলো তার মগজে ঘুরপাক খাচ্ছে। বিভিন্ন দেশের কাস্টমসের নিয়মও বিভিন্ন। কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল জানে না ঝিলিক। টেবিলল্যাম্পটা জ্বলছে। বাড়ির আর সব আলো নিভে গেছে।

মিসেস বোসের রাতেও ঘুম ঠিকমতো হয় না। তার জীবনটাও বিচিত্র। অনেক কিছু পাওয়ার স্বপ্ন নিয়ে তিনি অতীতে ঘর ছেড়েছিলে। ছেড়ে এসেছিলেন তার ছোট্ট মেয়ে ঝিলিককেও। সেই মিঃ আগরওয়াল তাকে অনেক আশার স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন। বেশ কিছুদিন কাজের পর আগরওয়ালও তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেন।

এবার অন্যত্র ঠিকানা খুঁজতে হয় সেদিনের রুপালিকে। আর বারবার তিনি ভুলই করেছেন, ঠকেছেনও বারবার।

রুপালির মাঝে-মাঝে মনে পড়ে হারানো দিনের কথা। শুনেছেন তার স্বামী এখন বড় কারখানার মালিক হয়েছেন দ্বিতীয়া স্ত্রীর দৌলতে। ঝিলিকের কথাও তেমন কিছু শোনেননি। সবই তার হারিয়ে গেছে। তাই হঠাৎ সেদিন ঝিলিককে তার হস্টেলে দেখেন মিসেস বোস। নিজের পরিচয়ও দিতে পারেনি। অচেনা হলেও মিসেস বোস তবু সেই ফেলে আসা মেয়েকে কাছে পেয়েই খুশি। রুপালিও শুনেছেন ঝিলিকের সহকর্মীদের কাছে যে, ঝিলিক কোম্পানির চিফ এগজিকিউটিভ। রুপালি ভেবে আনন্দিত হন যে তার মেয়ে জীবনের লড়াইয়ে জিতেছে।

রাতের স্তব্ধতা নেমেছে। মিসেস বোস বের হয়ে আসেন। ওদিকে তিনতলায় ঝিলিকের ঘরে আলো

জ্বলছে। এগিয়ে যান তিনি। এখানে রাত এগারোটার পর আলো জ্বালে না কেউ। খোলা দরজার কাছে এসে থমকে দাঁড়ায় রুপালি। ক্লান্ত মেয়েটা ঘুমিয়ে পড়েছে। ফুলের মত মুখে পড়েছে মৃদু আলো। বইপত্তর ছড়ানো, যেন ছোটবেলার সেই ঝিলিক এমন পড়তে-পড়তে ঘুমিয়ে পড়ত। মা একমনে মেয়েকে দেখতে থাকেন। হঠাৎ ঘুমন্ত ঝিলিকের ঘুম ভেঙে যায়। চোখ মেলে দেখে সামনে মিসেস বোস। ওর মুখচোখের চাহনিও বদলে গেছে। সেই কাঠিন্য আর নেই। কী যেন বিচিত্র মমতা মাখানো সেই হারানো মায়ের মুখ। আর সেটাকে লুকোবার জন্যই ভীত-ত্রস্ত পায়ে চলে যান মিসেস বোস। উঠে পড়ে সে। চকিতের জন্য মনে পড়ে সেই হারানো টুকরো স্মৃতিগুলো। তবু তার মনে হয় মিসেস বোস বোধ হয় জেনেছে কিছু।

পরদিন ঝিলিক অফিসে যাওয়ার জন্য তৈরি হয়ে নেমেছে। ওর অফিসের গাড়ি এসে গেছে। মিসেস বোস বলেন, "এত রাত জেগে পড়াশোনা করলে শরীর খারাপ হবে যে।" ঝিলিক বলে, "কী করব? অফিসের কাজে ওসব পড়ার সময় পাই না।"

১৪

মানিক বোসও আজ অনুতপ্ত। মীরা এসেছেন তাঁর জীবনে। অতীতের সবকিছু মুছে দিয়ে তিনি মানিকের জীবনকে বদলে দিয়েছেন। বাইরে মানিকের সম্পদ যত বেড়েছে, অন্তর থেকে ততই নিঃস্ব হয়েছেন মানিক বোস। তাঁর মেয়ে তাঁকে ফেলে পালিয়ে গেছে। মানিক খোঁজ করার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু মীরার জন্য তা পারেননি।

মানিক বোস আজও স্ত্রীর গোলামি করে চলেছেন। তাঁর ব্যবসার আয় বাড়ানোর জন্য এসেছেন মিঃ কানোরিয়ার কাছে। যদি কোনওরকমে কোম্পানিটা বাঁচানো যায়। কানোরিয়া এখন বিশ্বজয়ের কথা ভাবছেন। নর্থ আমেরিকার বিভিন্ন স্টেটে তাঁদের মাল সাপ্লাই দিতে চান। নিউ ইয়র্কে একটা অফিস করবেন। মানহাটান অঞ্চলের একটা অ্যাপার্টমেন্টের পঞ্চাশ তলায় একটা অফিস কাম থাকার জায়গাও নিয়েছেন প্রচুর ডলার খরচ করে। ওই অফিস থেকে কানাডা-দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন দেশেও তাঁরা মাল জোগান দেবেন। তাই তাঁদের মালেরও দরকার। মিঃ কানোরিয়া মিঃ বোসকে বলেন, "আপনাদের সব মাল আমাদের দিতে হবে।"

এয়ারকন্ডিশনড্ অফিসে বসে ওঁরা কথা বলছেন। কাগজপত্র দেখছেন। মিঃ বোসও যেন আশার আলো দেখছেন। তাঁদের কাজ বন্ধ হবে না। তবে কী দর দেবেন মিঃ কানোরিয়া তার উপরই সব নির্ভর করছে। হঠাৎ ঘরে ঢোকে একটি সুন্দরী মেয়ে। হাতে ফাইল। মিঃ বোস প্রথমে হতচকিত হয়ে যান। ঝিলিককে এখানে এইভাবে দেখবেন ভাবেননি। সেই রাতে বাড়ি থেকে বের হয়ে গেছিল ঝিলিক। কয়েক বছর কেটে গেছে। মানিক বোস ভেবেছিলেন ঝিলিকও পরাজিতের ভিড়ে হারিয়ে গেছে রুপালির মতোই।

কিন্তু আজ দেখছেন নতুন এক ঝিলিককে, যে হার মানেনি। মিঃ কানোরিয়া বলেন, "মিঃ বোস, এই মিস বোস। আমাদের সেলস এগজিকিউটিভ। মিস বোস, উনি এসেছেন মর্ডান স্টিল থেকে। আমাদের কোটেশনগুলো ওঁকে দিয়ে দিন।"

ঝিলিক মিঃ বোসকে দেখছে। এখন সে যেন মানিককে চেনে না। একেবারে পাকা প্রফেশনাল ভঙ্গিতেই সে আলোচনা করে চলেছে। বলে, "এই কোটেশন আর আমাদের নির্দেশমতো সেই কোয়ালিটির মাল যদি দিতে পারেন, আমরা চুক্তি করতে পারি। আর মাল নিচু মানের হলে বাতিল করার অধিকার আমাদের থাকবে।"

মিঃ বোস বলেন, "আপনাদের শর্তে আমরা রাজি।"

মিঃ কানোরিয়া বলেন, "কালই আসুন। সব ফাইনাল করে দেব।" বেরিয়ে আসেন মিঃ বোস। মীরা ওঁর জন্য অপেক্ষা করছিলেন অফিসে। মানিক এসে তাঁকে সব খবরই দেন। তবে ঝিলিকের ব্যাপারে

কোনও কথাই বলেননি। ওটা তাঁর একান্ত নিজের ব্যাপার। মানিক বোস কানোরিয়ার দু'একজন কর্মীকে আগেই হাতে রেখেছিলেন। তাদের কাছ থেকে ওই ঝিলিকের খবর কিছু নিয়েছেন। আর এসব ব্যাপারে পারচেজের ওপরওয়ালাদের সঙ্গে বিশেষভাবে কথা বলেছেন। মানিক মীরাকে এসব খবর দেন না। আজ তিনি আবার নতুন করে স্বপ্ন দেখেন। এইখান থেকে মীরার আজ্ঞাবহ দাস হতে আর পারবেন না মানিক। তিনি ভাবছেন, এবার নতুন বাড়িতেই চলে যাবেন। সেখানে তিনি হারানো ঝিলিককে নিয়ে নতুন করে বাঁচবেন নিজের পরিচয়ে। ঝিলিক দেখছে হস্টেলে ইদানীং তার জন্য আলাদা খাবার আসছে। বেয়ারা বলে, "ম্যাডাম আপনার ঘরে খাবার দিতে বলেছেন। আপনাকে ডাইনিং হলে যেতে হবে না।"

ঝিলিক এসব পছন্দ করে না। তবু চুপ করে থাকে। মিসেস বোসও এবার যেন নতুন করে ভাবছেন। সেদিন ছুটির দিন। সকালে মিসেস বোস উপরের ঘরে রয়েছেন। নীচে অন্যরা কাজ করছে। মানিক বোস খুঁজে-খুঁজে এই হস্টেলে এসেছেন। অনেক আশা নিয়ে এখানে তিনি এসেছেন। ঝিলিকের কাছে তাঁকে ক্ষমা চাইতে হবে। তার কাছে কথাটা পাড়বেন মানিক বোস। এবার তাকে নিয়ে যাবেন তাঁর নতুন বাড়িতে। শেষজীবন মানিক বোস এবার মেয়ের সঙ্গেই কাটাতে চান।

অফিসে এসেছেন মানিক বোস। সহকারী মহিলাকে বলেন, "আমি ঝিলিক বোসের সঙ্গে দেখা করতে চাই। দয়া করে যদি তাকে খবর দেন। খুব জরুরি দরকার।"

সহকারী মহিলা বলেন,"এখন দেখা হবে না। বিকেলে আসুন, চারটের পর।"

হঠাৎ এসময় অফিসে এসে পড়েন মিসেস বোস। মানিককে তিনি দেখেননি। মিসেস বোস কঠিন স্বরে বলেন, "এখন কোনও মেয়ের সঙ্গে দেখা হবে না। ভিজিটিং আওয়ারে আসুন।"

কণ্ঠস্বর মানিক বোসের কানে যেতেই মানিকবাবু চমকে ওঠেন। এদিকে তাকাতেই মানিকবাবু বিস্মিত হন। এতদিন পর এই মহিলাকে দেখে। বয়সের ছাপ চেহারায় পড়লেও মুখ-চোখে তিনি সেই রুপালিকে চিনতে পেরেছেন। রুপালিও মানিককে এখানে এভাবে দেখবেন ভাবতে পারেননি।

মানিকবাবু বলেন বিস্মিত কণ্ঠে, "রুপা! তুমি এখানে?"

রুপালি মানিককে দেখছেন। আজ মনে হয় পৃথিবীটা সত্যিই খুব ছোট। এখানে কেউ কাউকে লুকিয়ে চিরকাল থাকতে পারে না। একদিন না একদিন তাদের দেখা হয়ে যাবেই। তাই এতদিন পরেও মানিকবাবু খুঁজে পেয়েছেন তাঁর স্ত্রী আর মেয়েকে। রুপালিও ঝিলিককে দেখার পর একটা স্বপ্ন দেখেছেন। মুখে তিনি জানাতে পারেননি। কিন্তু বারবার তাঁর মনে হয়েছে, যেন সেদিন তিনি ভুলই করেছিলেন। যে আশা নিয়ে স্বামী-সন্তান ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিলেন, সে আশা তাঁর ব্যর্থ হয়ে গেছে। আজ মানিকও ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত। তিনিও এই প্রাচুর্যের, গোলামির জীবন থেকে সরে আসতে চান। মানিক তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, "ঝিলিক তোমার কাছেই রয়েছে।"

রুপালি আজ এতদিন পর মানিককে এখানে দেখে ওদিকের ঘরে এনে বসিয়েছেন। চা এনেছেন। মানিক ভাবেননি রুপালিকে এখানে এভাবে দেখতে পাবেন। রুপালি বলেন,"না। ও এসে পড়েছে আমার হস্টেলে। আমি কোনওদিন ভাবিনি, বিশ্বাস করিনি, সব আমার হারিয়ে গেছে। আর আজ আবার সবই আমায় ভাগ্য ফিরিয়ে দিয়েছে।"

মানিকও বলেন, "হয়তো তাই রুপা। এতদিন ধরে বারবার ভুল করেছি আমরা! সব ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করে আবার কি নতুন করে শান্তিতে বাঁচতে পারি না আমরা?"

রুপালির বঞ্চিত মনও তাই চায়। তিনি বলেন, "আমিও আজ সেই স্বপ্নই দেখি।"

ঝিলিক নীচে নেমে এসে ওদিকের ওয়েটিং-রুমে ঢুকতে যাবে। জানলা দিয়ে তার বাবাকে দেখে চমকে ওঠে। এতদিন পর বাবাকে এখানে এভাবে দেখবে, তা সে ভাবেনি। বাবা যে খোঁজখবর করে এখানে আসবেন, আর তার মাকে দেখবেন, তা ভাবেনি।

ঝিলিক বাইরে থেকে ওঁদের কথা শুনছে। আজ তাঁরা দু'জনকে পেয়েছেন, খুঁজে পেয়েছেন তাঁদের

মেয়েকেও। বিধাতা তাঁদের এভাবে মিলিয়ে দিয়েছেন। তাই তাঁরাও এবার স্বপ্ন দেখছেন নতুন করে ঘর বাঁধার। ঝিলিক সরে আসে। সে ওঁদের স্বপ্ন-জগতের বাইরেই তার নিজের জগৎ নিয়ে থাকতে চায়। সকলেই চায় নিজের চাওয়াটাকে পূর্ণ করতে। বিজনও নিজের ঘর বাঁধতে চায়। সেদিন বিজনও ঝিলিককে সেই কথা বলেছিল। ঝিলিক শুধু শুনেছিল ওর কথা, কোনও জবাব দেয়নি।

পলও চায় এবার বিজনের সঙ্গে ঝিলিকের বিয়েটা হয়ে যাক! অবশ্য কাঞ্চি ভেবেছিলেন, ঝিলিক পলকে বিয়ে করবে। কিন্তু কাঞ্চি দেখেছেন তাতে উলটো ফলই হয়েছে। চলে গেছে ঝিলিক এই বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র। ঝিলিক এবার অবাক হয়। দেখে যে, মা-বাবা তার ছেলেবেলায় দু'জনে ঝগড়াই করতেন। এখন তাঁরা ঝগড়াও যেন ভুলে গেছেন।

মানিকবাবু এবার মীরার কারখানার একটা ভাল কাজের ব্যবস্থা করে নিজে সরে আসবেন। কথাটা তিনি ঝিলিককেও বলেছেন। মানিকবাবু এখন ওই হস্টেলের আসেন মাঝে-মাঝে। ঝিলিককে তিনি প্রথমদিনই এখানে এসে কথাটা বলেছিলেন, রুপালির সামনে বহুদিন পর যেন তাঁদের পারিবারিক মিলন ঘটেছে। মানিকবাবু বলেন, "ঝিলিক, যা হওয়ার হয়ে গেছে। এখন দিন বদলেছে, তোর মাও তোকে কাছে পেয়ে নতুন করে ভাবছে। যে ঘর ভেঙে গেছিল, তাকে আবার গড়ে তুলতে চাই মা।"

ঝিলিক কোনও উত্তর দেয়নি। তার মনে হয়েছে, সকলেই এখন যে-যার জগতে ব্যস্ত। যে দর্পণে নিজেদের অবয়বগুলো ফুটে ওঠে, সেই দর্পণটাই ভেঙে গেলে অবয়বগুলোর বিকৃত ছবিগুলো ফুটে ওঠে। এসবই সেই বিকৃত মুখের ভিড়। ঝিলিক এখানে প্রকৃত রূপটাকে আর দেখতে পায় না।

রুপালিও বলেন, "তোমার বাবার কথাগুলো একবার ভেবে দ্যাখো ঝিলিক!"

রুপালিও আজ মেয়েকে কেন্দ্র করে বাঁচতে চান। সকলেই বাঁচতে চায়। তাই বিজনও এসেছে, সঙ্গে এসেছেন কাঞ্চি আর পল। পলই কাঞ্চিকে ঝিলিকের এই নতুন হস্টেলের ঠিকানা বলেছে। ঝিলিক ভাবতেই পারেনি যে, সব ব্যাপার এমনই নাটকীয়ভাবে ঘটে যাবে।

মানিকবাবু, রুপালিও রয়েছেন। ঝিলিক ওঁদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়, "আমার মা-বাবা!"

মানিকবাবু ওই বয়স্কা মহিলা কাঞ্চি, তাঁর সঙ্গে পল আর বিজনদের দেখে তাকালেন। পলই পরিচয় করিয়ে দেয়। ঝিলিক বলে, "বাবা, সেই রাতে বাড়ি থেকে বের হয়ে পথে নেমেছিলাম, কোনও আশ্রয় ছিল না। এরাই নিয়ে গিয়ে ওই দিদার কাছে তুলেছিল। ওঁর কাছেই ছিলাম বছরদুয়েক প্রায়। উনি আমাকে নাতনি বলেই মেনে নিয়েছিলেন। বিরাট চা-বাগানের মালিক।" মানিকবাবু, রুপালিও ওঁদের কৃতজ্ঞতা জানান।

কাঞ্চি বলেন, "এরা আমার নাতিই। এ পল, আর এই বিজন। এখন প্রোফেসর, খুব ভাল ছেলে। ঝিলিক, এইভাবে পথে- পথে শূন্য হাতে কোনও মেয়ে ঘুরতে পারে না। এ-সমাজে মেয়েদের অনেক বিপদ। জীবনে তাই একজনকে পাশে চাই, যার উপর তুমি নির্ভর করতে পারো। আর বিজন সেই হিসাবে যোগ্য পাত্র। তুমিও ওকে চেনো।"

মানিকবাবুও এবার ঝিলিককে ঘরবাসী করতে চান। বলেন, "ঝিলিক, উনি ঠিকই বলেছেন।"

"কারেক্ট।" কাঞ্চি বলেন, "তাই তোমাদের বিয়ে দিতে চাই। নাতনির জন্য আমাকে এটুকু করতে দাও। আর মিঃ বোস, মিসেস বোস, আশা করি এই বিয়েতে আপনাদেরও আপত্তি হবে না।" মানিকবাবু বলেন, "এ তো খুব ভাল কথা।"

রুপালি বলেন, "ঝিলিক, তুমি আর অমত করো না। বিয়ে-থা করেও তো চাকরি করতে পারবে।"

কাঞ্চি বলেন, "তা হলে মিঃ বোস, আপনারা আমার বাংলোয় আসুন। ঝিলিক, তুমিও আসবে। ওখানেই সব কথা হবে।" খুশি হয়ে মানিকবাবু নিজের বাংলোয় ফেরেন। এর মধ্যে কাঞ্চনমালার বাংলোয় যাবেন তাঁরা। মীরাকে অবশ্য এসব কথা কিছুই জানাননি মানিকবাবু। বলেন, "আমাদের কারখানার জন্য অফারটা মনে হয় পেয়ে যাব।"

মীরা বলেন, "মনে হয় না। ওই অর্ডারের চিঠিখানা আমার হাতে চাই।"

"দেখি দু'-একদিনের মধ্যে কী হয়।"

এখানকার আকর্ষণও তাঁর মন থেকে মুছে গেছে। এখন নতুন স্বপ্ন দেখেন মানিক বোস, রুপালি বোস।

ঝিলিকও বুঝেছে, এবার যেন একটা চক্রব্যূহের মধ্যে পড়েছে সে। চারদিক থেকে সাঁড়াশি-আক্রমণ আসছে। তাকে তারা মুক্ত আকাশ থেকে টেনে নামিয়ে খাঁচায় আটকাতে চায়। নিজের কাছে বারবার হেরে যাচ্ছে সে। পথই যে মেয়েটার ঘর, সে ঘরবন্দি হতে চায় না। আজ তার প্রতিবাদী সত্তাকে সার্থক করতে গিয়ে যেতে চায় সে। তাই এটুকু পাওয়ার কোন মূল্য দিতে পারে না ঝিলিক। সে বাঁধন নয়, মুক্তি চায় অবাধ নীল আকাশে। সব তুচ্ছ আশা, প্রেমের কল্পিত বাঁধন কেটে উধাও হতে চায়।

মিঃ কানোরিয়া ঝিলিককে তাঁর চেম্বারে ডেকে পাঠান। তাঁর আমেরিকার অফিসে তিনি একজন বিশ্বাসযোগ্য লোক পাঠাতে চান। নিউ ইয়র্ক, মানহাটনের অফিসে থাকবে সে।

কানাডা-লাতিন আমেরিকার বাজারও তাকে ঘুরতে হবে। আর মিঃ কানোরিয়া ঝিলিককে সেই দায়িত্ব দিতে চান। ঝিলিক ভাবতে পারেনি এভাবে একটা সুযোগ তার এসে যাবে কৃতিত্বের জগতে নিজের যোগ্যতাকে তুলে ধরার। এ তার কাছে মুক্তির আহ্বান। ঝিলিক বলে, "আমি রাজি স্যার। এই লড়াই জেতার জন্য আমি প্রাণপণ চেষ্টা করব। এ-লড়াই জিততেই হবে।"

মিঃ কানোরিয়া দেখছেন একটি তরুণীকে, যার চোখে বিশ্বজয়ের স্বপ্ন। মিঃ কানোরিয়া বলেন, "ও.কে, আজই পাসপোর্টের দরখাস্ত করে দাও আমাদের ট্রাভেলিং এজেন্ট সব ব্যবস্থা করে দেবে। আর হ্যাঁ, মাসখানেকের মধ্যে তোমাকে চলে যেতে হবে নিউ ইয়র্কে। টিকিটের ব্যবস্থাও হয়ে যাবে। ওখানে আমাদের এজেন্ট থাকবে। তোমার কোনও অসুবিধে হবে না। তার সঙ্গে ফোনে কথা বলে নেবে।"

"ঠিক আছে স্যার।" ঝিলিক বের হয়ে আসে। তবে এসব খবর ঝিলিক তার সহকর্মীদের হস্টেলে জানাতে নিষেধ করে। এ তার একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার। মানিক বোসকে ঝিলিক এর মধ্যে তাঁর কারখানার মালের অর্ডারের চুক্তিপত্র দিয়েছেন। তাই মানিকবাবুও খুশি। তিনি হস্টেলে মাঝে-মাঝেই আসেন।

১৫

ঝিলিক দেখে কাঞ্চনমালা বলেন, "তা হলে ঝিলিক, তোর বিয়েতে এমন রোশনাই করব, যার ঝিলিক একদম বিজলির মতো চমকাবে। সানাই বাজবে।"

ঝিলিক হাসে। বসে, "তোমাদের বিয়েতেও এমনি ধুমধাম হয়েছিল নাকি?"

"আরে না না। রবার্ট আমাকে চার্চে নিয়ে গেল। পাদরিসাহেবের সামনে ক্যান্ডেল জ্বেলে শাদি হয়ে গেল। একদম চোরি চোরি।" ওঁরা সবাই যে-যার স্বপ্নের মধ্যে রয়েছেন। এসব খবর কেউ জানতে পারেননি। দু'দিন আগে ঝিলিকই অফিসের কাজে বাইরে যেতে হবে বলে হস্টেল ছেড়ে একটা হোটেলেই চলে আসে। তার মালপত্র, কাগজপত্র সব নিয়ে অফিসের গাড়িতে বের হয়ে যায় দমদম এয়ারপোর্টে মিঃ কানোরিয়ার ম্যানেজারের সঙ্গে। রাত প্রায় বারোটায় এয়ার ইন্ডিয়ার প্লেন ছাড়বে।

মুম্বই-কুয়েত- লন্ডন-আটলান্টিক হয়ে প্লেন ইংল্যান্ডের জোসেফ কেনেডি এয়ারপোর্টে গিয়ে পৌঁছবে পরের দিন রাত তিনটেয়। তখন নিউ ইয়র্কে বিকেল।

ইমিগ্রেশন চেক করিয়ে ঝিলিক চলে গেল, সিকিউরিটি চেকিং জোনে চেকিং শেষ করে টানেলের মধ্যে দিয়ে গিয়ে উঠল প্লেনে। বোয়িং ফোর ফোর সেভেনে তার যাত্রা শুরু করল। আকাশে উড়ছে

প্লেনটা। নীচে রাতের আলোকিত ঘুমন্ত শহর। আজ সকলে তার পিছনে পড়ে রইলেন। দূর আকাশের তারার মতো এঁদের জীবন থেকে মিলিয়ে গেল দূরে আজ ঝিলিক।

·

সকালে খবরটা পান মানিকবাবু। কানোরিয়া কোম্পানির বিদেশে বাণিজ্যিক সাফল্যের খবর। আর তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে ঝিলিকের নামও। কাঞ্চিও এসে পড়েছেন হস্টেলে। মানিক-রুপালি আজ হতাশ। বিজন, পলও এসেছে।

কাঞ্চি বলেন, "ওরা বাঁধন মানে না মিঃ বোস। আজকের যৌবন এমনই উদ্দাম। ওরা ছোট গণ্ডির মধ্যে থাকতে চায় না। ওরা অনেক স্বপ্ন দেখে। তাকে সার্থক করার জন্য লড়াই করে।"

·

ঝকঝকে সোনা-রোদ-মোড়া আকাশ। নীচে নতুন শহরের আকাশছোঁয়া ঘরবাড়ি এদিকে সাজানো ছবির মতো কাচের বাড়িগুলো দেখা যায়। প্লেনটা এসে এয়ারপোর্টের টারমাকে নামে। নেমে এল নতুন জগতে ঝিলিক বোস। নতুন জগৎ দেখছে সে। এখানকার লড়াইও তাকে জিততে হবে সব পাওয়ার স্বপ্ন নিয়ে। সে পিছনে রেখে এসেছে সব বাঁধন। সে হার মানেনি।

ঋষির প্রেম

মহর্ষি ভৃগুর পুত্র মহর্ষি চ্যবন নর্মদাতীরে মুণ্ডমহারণ্যে গভীর তপস্যায় রত। দিন, মাস, বৎসর অতিক্রান্ত হয়ে যায়, মহর্ষি চ্যবনের দেহ ঘিরে নর্মদাতীরে মহারণ্যে এক বিশাল বল্মীকের স্তূপ রচিত হয়েছে। মহর্ষি ধ্যানমগ্ন।

তখন এই মহারণ্য, বৈদুর্য্য পর্বত, বিন্ধ্য পর্বত জুড়ে ছিল মহারাজ যযাতির রাজ্য। মহারাজকন্যা সুকন্যা তখন পূর্ণযৌবনা, সুন্দরী, সুলক্ষণা। রাজকন্যা সুকন্যা একদিন সখীদের নিয়ে সৈন্যাদিসহ এই নর্মদাতীরে মহারণ্যে প্রমোদভ্রমণে এলেন।

সুন্দর বনভূমি, সবুজ স্নিগ্ধ পরিবেশ, নর্মদার বারিধারায় সূর্যের কিরণ মরকত মণির ঔজ্জ্বল্য এনেছে। রাজকন্যা ওই বল্মীকের স্তূপের কাছে এসে দাঁড়ালেন। বিস্মিত হয়ে দেখেন বিশাল বল্মীকের স্তূপ — তার থেকে দুটি ছোট ছিদ্র আর সেই ছিদ্র থেকে যেন এক দীপ্তি প্রকাশিত হচ্ছে।

কৌতূহলী হয়ে রাজকন্যা কোনও বৃক্ষের ডালের অগ্রভাগ দিয়ে ওই ছিদ্রপথে আঘাত করতে থাকেন, দু'একবার আঘাতের পরই দেখেন ওই বল্মীকের স্তূপ বিদীর্ণ করে দীর্ঘকায় এক কঙ্কালসার দেহ বের হয়ে পড়েছে, চোখে তার প্রদীপ্ত আভা।

দীর্ঘকাল তপস্যারত, তাই দেহ কঙ্কালসার, শীর্ণ। চ্যবন তপোভঙ্গ হতে ক্রুদ্ধ হয়ে বলেন সুকন্যাকে 'তুমি বার বার আমার চোখে আঘাত করে আমাকে অপমান, অবজ্ঞা করেছ। এর প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে তোমাকে। তুমি আমাকে বিবাহ করে পতিত্বে বরণ করবে।' চমকে ওঠেন সুকন্যা। জীর্ণ কঙ্কালসার প্রেতাত্মার মতো শীর্ণ একজনকে বিবাহ করতে হবে, লোকটার দুঃসাহস তো কম নয়। সুকন্যা বলে, 'কাকে একথা বলছ জানো ঋষি? আমি এখানের রাজকন্যা। একথা বলার কি শাস্তি জানো?'

তপস্বীও বলেন, 'আমি মহর্ষি চ্যবন, তোমাকে বিবাহের জন্য ভাবে দেখতে বলছি। সম্মত হও কন্যা'।

সুকন্যা এই চলমান কঙ্কালকে বিবাহের কথা জীবনেও ভাবতে পারবেন না। তাই অস্বীকার করেন মুনির প্রস্তাব।

তেজস্বী মুনিও বলেন, ' তোমার রূপ-যৌবনের খুব অহঙ্কার, না? এই অহংকার চূর্ণ করার শক্তি আমার আছে।'

'অক্রুধ্যৎ স তয়া বিদ্ধে নেত্রে পরমমন্যুমান্।
ততঃ শর্যাতিসৈন্যস শকৃন্মূত্রে সমাবৃণোৎ'

(মহাভা, বন, ১২২ অ, ২৩)

মুনি বলেন, "শর্যাতিকন্যা! যতক্ষণ না আমায় পতিত্বে বরণ করো, ততক্ষণ তোমার পিতার বিপুল সৈন্যবাহিনীর মলমূত্রদ্বার রুদ্ধ থাকবে।'

রাজকন্য সুকন্যা মুনির কথায় কর্ণপাত না করে অরণ্য থেকে ফিরে আসেন। ওই কঙ্কালসার এক অরণ্যচারী মুনিকে বিয়ে করবে যৌবনবতী রাজকন্যা। মুনিকে সেও জানিয়েছিল, 'আপনি বিগতযৌবন, বৃদ্ধ।'

মুনি বলেন, 'এ তোমার পাপের শাস্তি, তোমার সাহচর্য, সেবা আমি চাই। তোমাকে তাই বিবাহ করতে হবে।'

— 'অসম্ভব'।

রাজকন্যা ফিরে আসেন।

এদিকে মহাতেজা ঋষির অভিশাপে তখন মহারাজ শর্যাতির সৈন্যদলের মলমূত্রত্যাগ বন্ধ। সারা সৈন্যবাহিনী অসুস্থ। মহারাজ ক্রমশ অনুসন্ধান করে প্রকৃত কারণ জানতে পারেন। সৈন্যবাহিনী না থাকলে রাজ্যপাট থাকবে না। মহারাজ শর্যাতি শেষ অবধি কন্যাকে ওই কঙ্কালসার মহর্ষি চ্যবনকে বিবাহ করতে রাজি করালেন।

সুকন্যার কোনও অনুনয়-বিনয়ও মহারাজ মানলেন না। ঋষিকে আরও ক্রোধান্বিত করার সাহস তাঁর নেই। বাধ্য হয়েই পিতার রাজ্যপাট রক্ষার জন্যই পূর্ণযৌবনা সুকন্যাকে ওই বৃদ্ধ কঙ্কালসার জীর্ণ মুনিকে বিবাহ করে নর্মদাতীরের মহামুণ্ডারণ্যের পর্ণকুটিরেই আসতে হল তাঁকে সেবা করার জন্য।

দিন, মাস, বৎসব, বৎসরের পর বৎসর যায়, এই নির্জন মহারণ্যের পর্ণকুটিরে রাজপুরীর সব ঐশ্বর্য-বিলাস-বৈভব পরিত্যাগ করে রয়েছেন সুকন্যা। বৃদ্ধ জরাগ্রস্ত ঋষির সেবা করেন মুখ বুজে।

পাথরের দেবতাকেও মানুষ ভক্তি করে পূজা করে আনন্দ, তৃপ্তি পায়, এই জরাজীর্ণ বৃদ্ধ স্থবিরকে সেবা করে তার কণামাত্র আনন্দও পান না সুকন্যা। তাঁর দেহে প্রদীপ্ত যৌবনের ঢল, মত্তা নর্মদার মতো যৌবনপ্রবাহ কী ব্যর্থতায় পাষাণতটে মাথা খুঁড়ে হাহাকার করে ব্যর্থতার ব্যাকুল বেদনায়!

সুকন্যা মনে মনে ক্ষুব্ধ, ঋষির জন্যই তাঁর জীবন-যৌবন ব্যর্থ হয়ে গেল। প্রেমের ব্যর্থতা তাঁর নারীজীবনের বেদনাকে প্রতিনিয়তই প্রকটিত করে তোলে।

বসন্তকাল। অরণ্য এসেছে বসন্তের অফুরান সৌন্দর্য, বাতাসে নাম না জানা বনফুলের সৌরভ, অলিকুলের গুঞ্জনে বনভূমি গুঞ্জরিত, কোকিল, দোয়েলের সুর জাগে। হঠাৎ সেদিন নর্মদাতীরে রাজকন্যা সুকন্যা ওই বসন্তের স্পর্শমাখা বনভূমিতে দুটি অপরূপ সুন্দর তরুণকে দেখেন।

তারা দেখছে সুকন্যাকে। ওই জরাগ্রস্ত শীর্ণ ঋষিকে অকুণ্ঠ সেবা করে চলেছে ওই সুন্দরী। তারা বলে সুকন্যাকে— 'আমরা অশ্বিনীকুমার, সুন্দরী! ওই জরাগ্রস্ত মৃতপ্রায় বৃদ্ধের সেবা করে এই অরণ্যে পড়ে না থেকে, এসো আমাদের যেকোনও একজনকে পতিত্বে বরণ করো। তোমার রূপ-যৌবন-নারীত্বকে এভাবে ব্যর্থ হতে দিও না।'

সুকন্যা মনে মনে ক্ষুব্ধ। আজ এই তরুণদের দেখে সেও ঈষৎ বিচলিত। তাঁর নারীমনও সার্থকভাবে বাঁচতে চায়। কিন্তু জানেন সুকন্যা ওই কঙ্কালসার ঋষির তপস্যার প্রভাব খুবই শক্তিশালী। তিনি নিজে তাঁর কাছে পেয়েছেন লঘুপাপে গুরুদণ্ড। তাই বলেন তরুণদের, 'আমি নিরুপায়। এই প্রস্তাব আর করবেন না। ওই অন্তর্যামী ঋষির ক্রোধকে প্রদীপ্ত করলে আপনাদেরও চরম শাস্তি পেতে হবে। আপনারা এই মুহূর্তে এখান থেকে চলে যান। না হলে আপনাদের সর্বনাশ হবে কাপুরুষের দল।'

অশ্বিনীকুমারদ্বয় বলেন, 'আমরা হীন-স্বার্থপর-অযোগ্য প্রেমিক নই কন্যা। আমর দেববংশজাত। দেবতার প্রণয় কোনও সুযোগের সন্ধান করে না। আমরা জোনাকির মতো ক্ষীণ দ্যুতির নই, যে, অন্ধকারের প্রতীক্ষায় থাকব। আমাদের মনে কোনও তস্করবৃত্তি নেই। তোমার জীবনের ব্যর্থতার সুযোগ নিয়ে তোমার যৌবনক্ষুধাকে প্রদীপ্ত করে তোমাকে ওই জরাগ্রস্ত বৃদ্ধ স্বামীর কাছ থেকে কৌশলে নিয়ে যেতেও চাই না।

"তাবব্রূতাং পুনস্ত্বোনামাবাং দেবভিষগ্‌বরৌ।
যুবানং রূপসম্পনং করিষ্যাবঃ পতিং তব
ততস্তস্যাবয়োশ্চৈব বৃণীষ্যান্যতমং পতিম্।।

(ওই, ১২৩/১২-১৩)

কল্যাণী, আমরা দেব-চিকিৎসকদের প্রধান। জরা দূর করে জরাজীর্ণ রুগ্নদেহে রূপ, স্বাস্থ্য, ক্লান্তি ও পুষ্টি প্রদানের রহস্য জানি। আমরা তোমার স্বামীকে পূর্ণযৌবন দান করে রূপবান করে তুলব।

তারপর আমরা এবং তিনি এই তিনজনের মধ্যে যাকে তোমার পছন্দ হয়, তাকেই তুমি পতিত্বে বরণ করে নিও।'

মহর্ষি চ্যবন তাঁর জরাজীর্ণ দেহ নিয়ে সকলের অলক্ষে এখানে এসেছিলেন, তিনিও অশ্বিনীকুমারদের কথা শুনে বলেন,—

"তচ্ছ্রুত্বা চ্যবনো ভার্যামুবাচ ক্রিয়তামিতি।
ভর্ত্রা সা সমনুজ্ঞতা ক্রিয়তামিত্যথাব্রবীৎ।।"

(ওই ১৫)

মহর্ষি বলেন, 'আপনারা তাই করুন', স্বামীর আদেশ পেয়ে সুকন্যাও বলেন 'হ্যাঁ। তাই করুন'।

মহর্ষি চ্যবন বলেন অশ্বিনীকুমারদের 'যদি আপনারা আমার জরা দূর করতে পারেন তা হলে আমি আমার তপস্যার তেজে আপনাদের দুজনকে ইন্দ্রের সঙ্গে একত্রে সোমপানের মর্যাদা দান করব।'

"তস্মাদ্ যুবাং করিষ্যামি
প্রীত্যাহং সোমপীথিনৌ।"

(ওই ২৪)

অশ্বিনীকুমারদের এই অধিকার ছিল না। তাঁরা দুজনে ইন্দ্রের সমভাগী হবার মর্যাদাপ্রাপ্তির কথায় আনন্দিত হন।

যথসময়ে ওষুধ লতাগুল্ম নানা প্রক্রিয়ার পর তাঁরা দুজন জরাজীর্ণ ঋষিকে নিয়ে নর্মদার জলে প্রবিষ্ট হলেন। এদিকে সুকন্যার মনে তখন ঝড় বয়ে চলেছে। এক বিরাট সমস্যা তাঁর সামনে। কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন তিনি? সত্যিই জরাজীর্ণ ঋষি নবযৌবন ফিরে পাবেন?

এদিকে সুতনু এই প্রেমিকদ্বয়, আর জরা দূর হলেও কি ঋষি চ্যবন তাঁকে কোনওদিন প্রেম নিবেদন করবেন? তিনি তো কঠিন, তপস্বী, রুদ্রতেজা। নারীমনের কামনা কি চিরঅতৃপ্তই থাকবে? নিস্পৃহ উদাসীন মুনির হৃদয়ে প্রেমের লেশমাত্র নেই— যদি সুকন্যা ওই রূপবান তরুণদেরই কাউকে পতিত্বে বরণ করেন, তবুও ওই পাষাণহৃদয় মুনির মনে সুকন্যার জন্য কোনও বিরহবেদনা-বোধও থাকবে না। নিজেকেই অতি তুচ্ছ, ব্যর্থ এক নারী বলেই আজ প্রতিভাত হয় সুকন্যার মনে।

তিনজন নর্মদাস্নান, বন্দনা করে এসে সুকন্যার সামনে উপস্থিত। পুষ্পমাল্য হাতে নিয়ে কুটির থেকে বের হয়ে এলেন সুকন্যা। বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে দেখেন তিনজনকে।

তিনজনই এখন সমান রূপবান, স্বাস্থ্যবান অপরূপ তরুণ। মুনির দেহে যৌবনের প্রাচুর্য। তিনজন যেন একই বৃক্ষের তিনটি কুসুম। এইরূপ বর্ণময় দ্যুতিমান।

সুকন্যা দেখছেন তাঁদের তিনজনকে।

অশ্বিনীকুমার দু'জনের মনে আনন্দের আভাস, চোখে মুখে আশা, স্বপ্নের উজ্জ্বল প্রকাশ। ওদিকে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন তরুণ-যুবক ঋষি চ্যবন। তাঁর চোখে আজ নিরাশার অন্ধকার। আজ তাঁর মনে হারাবার বেদনা, চোখে মুখে সেই বেদনার প্রকাশ। ব্যাকুল চাহনিতে তিনি চেয়ে আছেন মালা হাতে সুকন্যার দিকে।

সুকন্যা দেখছে আজ নতুন এক ঋষিকে— যাঁর চোখে বিরহের বেদনা, হারাবার ব্যাকুলতা।

এ যেন এক নতুন সত্তাকেই আবিষ্কার করেছেন সুকন্যা,প্রেমিক এক চিরতরুণকে। পাষাণের ঘুম যা এতদিন ভাঙাতে পারেনি, আজ সেই পাষাণের বুকে এসেছে প্রেমের স্পন্দন, প্রাণের স্পন্দন!

চ্যবন বলেন, 'এবার তোমার প্রতিশোধ নেবার লগ্ন এসেছে সুকন্যা। তোমার ইচ্ছামতো কাউকে আজ বরণ করে নিতে পারো।'

সুকন্যা স্তব্ধ, বেদনাহত কণ্ঠের কথাগুলো শুনছেন, দেখছেন ওই নবরূপের চ্যবনকে, আজ সুকন্যা সারা অন্তরমন দিয়ে মহর্ষিকে বরণ করে তাঁর পদপ্রান্তে লুটিয়ে পড়েন।

বনভূমি পাখির কলকাকলিতে ভরে ওঠে— তার সঙ্গে মিশেছে নর্মদার কলতান। মহামুণ্ডারণ্যে আজ নববসন্তের জাগরণ!

বাঁচার জন্য

গুপীবাগানের গ্রামীণ মেলা যেন জমে উঠেছে। আগে এই জায়গাতে মেলা হত জমিদারি আমলে। তখন মেলার উদ্যোক্তা ছিলেন গ্রামের জমিদার সিংহবাবুরা। এই বাগানের ওদিকেই রয়েছে কিছু গাছগাছালি। আর দুটো পুকুরও রয়েছে। আর ছায়াঘন বাগান—ফাঁকা জায়গা। তই এখানে মেলা বসে—যাত্রার আসর—কবিগান—আলোচনার আসরও বসত। আর আসত ঝুমুর নাচের দল। সেখানে জমিদারবাবুরাও তাদের থাকার জন্য তালপাতার ঘর করে দিতেন মেলার একদিকে। ওর একটু আড়ালে ওদের নাচগান—খেউরের আসর বসত। আর বেশি লোকের ভিড় হত সেখানেই।

এখন জমিদারদের দিন শেষ হয়ে গেছে। সমাজের বুকে পঞ্চায়েত প্রধান, নেতা এসব শ্রেণির আবির্ভাব হয়েছে। জমিদারদের ঠাঁই দিয়েছে এরাই। আগে জমিদারদের তবু হৃদয় ছিল। মানুষদের জন্য ভাবতেন। প্রজাদের জন্য হাসপাতাল—স্কুল—পাকা রাস্তা এসব করেছিলেন নিজেদের টাকায়। আজকের গজিয়ে ওঠা এক নতুন নেতার দল এসব ভাবে না। এরা সর্বস্ব নিজেদের পকেটে পোরে। আর অন্যদের শাসন করে মাত্র। তারাই এখন সমাজের মাথায় বসে প্রচার করে গ্রামীণ উন্নতির জন্য অনেককিছু করছে। অবশ্য মেলায় যে আয় হয়, সেটা খাতায় জমা পড়ে না। এখানকার প্রধান নবীনবাবুর পকেটেই যায়। অবশ্য নবীনবাবুও একা এসব খান না। তাঁর বশংবদ কিছু লোককে তিনি ভাগ-বখরাও দেন। তাঁর দলের লোকরাও তাই নবীনবাবুকে সমর্থন করে।

এই মেলার প্রধান আকর্ষণ জুয়া খেলা। এটা অবশ্য আইনত বন্ধ রাখার হুমকি আছে। তাই প্রকাশ্যে এসবের অনুমতি দেওয়া নেই। তবে দেখা যায় ঘুপচি অন্ধকারে বেশ কয়েকটা জায়গাতে ওরা বসে। গ্যাসের আলো জ্বলে। ওদিকের জুয়ার ছক ঘিরে লোকজনের ভিড়। তারা তাদের সামান্য পুঁজি লাগায় জুয়ার ছকে। হেরে যায়। তারা মরিয়া হয়ে আবার খেলতে থাকে টাকা জোগাড় করে। দু'একজন কিছু পায়, তারাও হৈচৈ করে ওঠে। আবার দ্বিগুণ উৎসাহ নিয়ে ছকে টাকা ঢালে।

নীলু বেশ ওস্তাদ খেলোয়াড়। নীলুকে এদিককার লোক সবাই চেনে। নিটোল স্বাস্থ্য—দীর্ঘ চেহারা। ওর হাত জুয়ার বোর্ডে ঠেকলে জীবন্ত হয়ে যায়। নীলু ডোমের ডাকাতের দল। ওর দলের অত্যাচারে এলাকার মানুষ ঘর ছেড়ে পালাতে শুরু করে। কারোর বাড়িতে হানা দিয়ে তাদের সর্বস্ব লুট করে নেয়। বাধা দিতে গেলে মানুষকে খুনও করেছে। শেষ অবধি নীলু তার মায়ের কথায় নাকি ওই ডাকাতি খুনখারাপি ছেড়ে দিয়ে এখন জুয়ার ছক নিয়ে মেলায় কয়েকজনকে টাকা দিয়ে নিজের দলের জুয়া বসিয়ে বেশ ভালো টাকা রোজগার করে। জুয়ার ছকে লোককে বসিয়ে তাকে ফকির বানায়। বলে নীলু, কেনে এসেছিলি বাপ! এখন যা তো!

প্রধান নবীনবাবুও জানেন নীলুকে। নীলুও এই মেলায় জুয়ার অনুমতি পাবার জন্যই নবীনবাবুকে হাজারখানেক টাকা দিয়েছে। অবশ্য নবীনবাবু বলেন, এত কমে হবে না নীলু।

নীলু বলে, বাজার খুব খারাপ প্রধানবাবু, দয়া করে এটাই নিন। তবে বাজার উঠলে আরও কিছু দেব আপনাকে।

নীলুকেও হাতে রাখার দরকার নবীনবাবুর। কারণ এখানে ভোটে জিততে গেলে লোককে চমকাতেও হয়। ভোটের দিন অন্য প্রার্থীদের গৃহবন্দি করে রেখে ছাপ্পাভোটও করতে সাহায্য করে নীলুর দল। তাই নবীনেরও যেমন নীলুকে দরকার, নীলুরও তেমনি দরকার নবীনবাবুকে। তাই ওরা মিলেমিশেই চলে।

মেলায় জুয়ার ছকে বেশ ভালো আমদানিই হচ্ছে। আর বেশি চাপ পড়ে যে ঘরে, সেই ঘরে ঘুঁটি আর পড়ে না। নীলুর ঘুঁটিও যেন কথা বলে। চামড়ায় কৌটো মতো একটা পাত্রে ঘুঁটিটা নাড়াচাড়া করে ছকে ফেলে নীলু। দেখা যায় যে ঘরে কোনো টাকা নেই সেই ঘরেই ঘুঁটিটা পড়েছে। বাকি সব টাকা নীলুর।

লোকসমাগমও হয়েছে। যাত্রা হবে আজ। তাই জুয়ার ছকেও খদ্দেরদের ভিড় রয়েছে। যাত্রা শুরু হবে মাঝরাতে। চলবে রাতভোর। নীলুর জুয়ায় আজ ভালো আমদানি হচ্ছে। নীলু ক্লান্তি কাটাবার জন্য আর খেলায় হাত ঠিক রাখার জন্য মাঝে মাঝে দু'এক পাত্র মদও গিলছে।

হঠাৎ কাকে দেখে চাইল। তাকে এই এলাকার কেন, এই অঞ্চলের অনেকেই চেনে। কাজলী বৈষ্ণবীর মেয়ে। বাবুপাড়ার ওদিকের বাগানের একটি ঘরে থাকে কাজলী তার মেয়েকে নিয়ে। ওর বাবা কে তা কেউ জানে না। তবে দুষ্টুলোকে বলে, এই দশবনির জমিদার রাঙাবাবুর সঙ্গে কাজলীর একটা বিশেষ সম্পর্ক ছিল। কাজলী আজও রাঙাবাবুর বাগানের ঘরেই থাকে। আর কাজলী মেয়ের নাম রেখেছে রাধারানী। এর আগেও কাজলী রাধারানীকে বেশ কয়েকজন আখড়ার বৈষ্ণবদের সঙ্গে মালাচন্দন করে তাদের আখড়ায় পাঠিয়েছিল। অবশ্য তার বদলে পয়সাও পেয়েছে। রাধারানী সেইসব বুড়ো ভাম বৈষ্ণবদের বেশ কিছু টাকা-গহনা বার করে মেরে ঘরে ফিরে এসেছে। কাজলীরও এইভাবে বেশ ভালো টাকা রোজগার হয়েছে। আর মেয়েও বেশ কিছু নিয়ে এসেছে।

রাধারানী এই গ্রামেই থাকে। তার জন্য বেশ কিছু ছেলে কাজলীর ওখানে লাইন দিয়েছে। নীলুর অবশ্য সে সময় নেই। তবু রাধারানীর ওই মত্ত যৌবনকে, ওই গভীর রহস্যময় চাহনিকে দেখেছে নীলু।

রাধারানী বলে, খেলা শেষ নাকি গো? ভাবলাম একদাগ খেলব, তা উঠে পড়ছ যে! ভয় পেলে নাকি গো? আমার তো অনেক বদনাম—

হাসে নীলু। তার রঙিন চোখে ফুটে উঠেছে রাধার যৌবন-উত্তাল দেহটা। তার কথাগুলো যেন নীলুর নেশাভরা মনে ঢেউ তোলে। নীলু ছকটা আবার পেতে বসে।

তোমার মতো খেলুড়ে পেলে সারাজীবন খেলায় মেতে থাকতে পারি গো! লাও—লাগাও দান—

রাধা বলে—নিজেকেই তোমার ছকে এড়ে দিতে মন চায় গো!

হাসছে নীলু। —তাই নাকি! যদি ইক্কা-তক্কা করে জিতে নিই? চাইল রাধা। চোখে তার কেমন বিচিত্র চাহনি। বলে সে, নিজেকে বাজি রাখার মতো খেলুড়ে পেলে তাই করব ওস্তাদ, দেখি তুমি কেমন বাজিকর। নাও— দুশো টাকা এই জাহাজ ঘরে—সত্যি দুশো টাকার নোট রাখে এই ঘরে। ওর দেখাদেখি অন্যরাও ওই ঘরেই বেশ কিছু টাকা রাখে। আর জাহাজের ঘরেই উঠেছে ঘুঁটিটা। নীলু রাধারানীকে চারশো টাকা দিয়ে বলে, না! তুমিই জিতেছ গো!

এবার রাধারানী ওই চারশো টাকাই দেয় জুয়ার ছকে চিরতনের ঘরে। বলে, এবার দান ফেলো কারিগর।

নীলু তার অভ্যস্ত হাতে ঘুঁটিটাকে কৌটোয় ফেলে নাড়াচাড়া করে ঠিক কৌশল মতো ছকে ফেলে। কিন্তু নীলু অবাক হয় তার ওষুধে যেন কাজ হয় না। ঘুঁটি পড়ে সোজা ওই চিরতনের ঘরে। অর্থাৎ এবার নীলুকে দিতে হবে আটশো টাকা।

হাসছে রাধারানী। বলে, কি গো, তুমি কেমন কারিগর গো? হেরেই যাচ্ছ বার বার?

নীলু বলে, তোমার কাছে হেরেও আনন্দ গো! নিজেকেই ধরা দিতে চাই তোমার কাছে।

দেখছে ওকে রাধারানী। নীলুকে চেনে সে। বলিষ্ঠ একটি যুবক। সে খুনও করতে পারে, ডাকাতিও করতে পারে। আবার প্রেমে পড়ে মন দিতেও পারে। রাধারানীও বহু পথ ঘুরেছে। আখড়ার বয়স্ক বুড়ো বৈষ্ণবদের দেখেছে। মুখে হরিনাম—অন্তরে একটা লোভী-শয়তান। রাধারানী তাদের হাত থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে এনেছে। সেও চায় একজনকে ভালোবেসে তাকে নিয়ে বাঁচতে।

দেখেছে সে নীলুকে। নীলুর মতোই একজন সুপুরুষকে পেতে চায় অন্তর-মন। যাকে নিয়ে সে জীবনপথে পাড়ি দিতে পারবে।

নীলু আটশো টাকা বের করেছে। রাধারানী বলে, ওটা তোমার কাছেই রাখো গো কারিগর। আমার আসলটা দিয়ে দাও। একদিনে বেশি লাভ আমার ধাতে সয় না। লাভের জন্য তোমার কাছে আসিনি বাবু।

রাত শেষ হয়ে আসছে। এবার বাড়ি ফিরবে নীলু। দলের ছেলেরাও যেতে চাইছে। নীলু বলে রাধারানীকে, কি গো! রাত তো শেষ হতে চলল! বাড়ি ফিরবে তো? এসো তবে। দোকানিরা ঝাঁপ বন্ধ করে ঘুমুচ্ছে।

রাধারানী বলে, হ্যাঁ, এবার ফিরতে হবে। ঘুমও আসছে।

ওরা দুজনে ফিরছে মাঠের পথে গ্রামের দিকে। শীত তখনও ফুরিয়ে যায়নি। মাঠের উপর দিয়ে চলেছে। কেমন হিমহিমে ভাব। আকাশে শেষ রাতের তারাগুলো জ্বলজ্বল করছে। নীলু বলে, একটা রাত শেষ হয়ে যায়। আবার আসে দিন।

রাধারানী বলে, কারিগর, দিনরাত আমার জীবনে সব একাকার গো। একদিন মনে ছিল আশা—স্বপ্ন—সুর। ভেবেছিলাম, আজ না হোক কালকের দিনটা সুখকর হবে। কিন্তু রাধারানীর জীবনে সুখ আর আসেনি।

নীলু দেখছে ওকে। বলে সে, রাধারানী, আমিও তো সুখের স্বপ্ন দেখেছিলাম। সুখের সন্ধানে অনেক ঘুরেছি। অনেক কিছু করেছি। কিন্তু সুখ নয় গো, যা পেয়েছি তা শুধু দুঃসহ। শুধু ঠকেছি আর ঠকেছি।

রাধারানীও অনেক কিছুই করেছে। কিন্তু সুখের স্পর্শ পায়নি। তাই যেন দুটি মন আজ কী হতাশায় ভরে ওঠে!

রাতজাগা পাখিদের কলরব ওঠে। ভোরের বাতাস যেন কী স্বপ্ন আনে ওদের মনে।

টাকাটা নিলে না? তোমার পাওনা টাকা—

রাধারানী বলে, তারচেয়েও বেশি যদি কিছু চাই! দেবে তো?

মানে! নীলু চাইল ওর দিকে। ওর মনে যেন কী ঝড় উঠেছে। মুখে-চোখে একটা নীরব ব্যাকুলতা। নীলুও যেন সত্যিকারের কিছু পেতে চায় রাধারানীর কাছে।

হাসে রাধারানী। বলে সে খুব ঘাবড়ে গেছ মনে হচ্ছে কারিগর! ভয় নেই—তোমাকে বিপদে ফেলতে চাই না। বরং তোমাকে বিপদ থেকে বাঁচাতে চাই গো—

নীলু দেখছে ওকে। বলে সে—কী বলছ তুমি?

বুঝতে পারছ না? ঠিক আছে, পরে বুঝিয়ে দেব। এখন চলি—

চলে যায় রাধারানী।

নীলু বাড়িতে আসে। তার মনে তখন কথাগুলো নাড়াচাড়া দেয়। রাধারানীর হাঁকডাকটা সেও জানে। ওর মা কাজলী বোষ্টমীকে সে চেনে। টাকার জন্যই বারবার কাজলী মেয়েকে ওই আখড়ার বৈষ্ণবদের কাছে বিক্রি করেছে। আর রাধারানীও তাদের আশ্রয় থেকে অনেক কিছু নিয়ে বের হয়ে এসেছে। আবার অন্য জায়গায় বেসাতি করেছে।

কাজলী বোষ্টমী অতীতে জমিদারদের ছত্রছায়ায় ছিল। তখন রাঙাবাবুও বেঁচেছিলেন। কোনো কিছুরই তার অভাব ছিল না। রাধারানী তখন কৈশোর ছাড়িয়ে যৌবনে পা দিয়েছে। রাঙাবাবু বলতেন, ভালো ছেলের সঙ্গে ওর বিয়ে দেব। ঘর-সংসার করবে। রাধারানীও সেই স্বপ্নই দেখেছিল।

কিন্তু তা হয়নি। জমিদারবাবু মারা যাবার পর সত্যিই বিপদে পড়ে কাজলী মেয়েকে নিয়ে। তার ঘরে থাকা দুষ্কর হয়ে ওঠে। ছোট জমিদারবাবু বলেন, হাজার পাঁচেক টাকা দিচ্ছি, মেয়েটাকে পাঠা দু'একদিন। কাজলী জানে ওদের স্বভাবের কথা। তাই এবার সেও রাধারানীকে দিয়ে আসে বৈষ্ণবদের আখড়ায়। তারাও অনেক টাকা-গহনা দেয় রাধারানীকে পাবার জন্য। কাজলীও ওসব নিয়ে মেয়েকে দিয়ে আসে তাদের আশ্রমে। রাধারানীও দু-তিনদিন পর ঠিক সুযোগ বুঝে সেই আখড়া থেকে ফিরে আসে মায়ের কাছে।

এইভাবেই চলেছে রাধারানীর জীবন। রাধাও অনেক কিছু পেয়ে ঘর বাঁধতে চেয়েছিল। কিন্তু তার মা চায় রাধারানীকে নিয়ে বেসাতি করতে। এক একবার দশ পনেরো হাজার টাকা পায় কাজলী। তার সঙ্গে গহনাও যা পায় তা কম নয়। তাদের শেষ জীবনের জন্য আরও কিছু সঞ্চয় করতে চায় কাজলী। রাধারানীর এই যৌবন বয়সেই যা রোজগার করার করে নিক।

তাই কাজলী এবার দক্ষিণ খাঁড়ির বড় আর মস্ত ধনী বৈষ্ণব আখড়ার সাধক কৃষ্ণদাস বাবাজীর সঙ্গেই রাধারানীর মালাচন্দনের আয়োজন করেছে। তারজন্য কাজলী পাবে তাদের গ্রামেই প্রায় আট বিঘে ধানের জমি। আর নগদ দশ হাজার টাকা। সঙ্গে চার ভরি সোনা। আর রাধারানী ওই আশ্রমে থাকলে কৃষ্ণদাস বাবাজীর আর্শীবাদে সেই হবে আশ্রম-প্রধান।

কাজলী বলে, আর ভাবতে হবে না রে রাধারানী। বুড়ো তো আর ক'দিন। যা দিচ্ছে কম নয়। আর বুড়ো চলে গেলে তুই হবি আশ্রমের মালিক। ওরে এমন সুযোগ হারাস না মা।

রাধারানীর আর এই জীবন ভাল লাগে না। ওই বৈষ্ণব মহারাজের ধর্মাচরণের আড়ালে চলে নগ্ন ভণ্ডামি আর শয়তানি। এতবড় ভণ্ডামিকে আর সহ্য করতে পারে না রাধারানী। সেও চায় ওই লোকঠকানো খেলা বন্ধ হোক। মায়ের এই বেসাতির বস্তুতে নিজেকে পরিণত করতে চায় না।

মায়ের কথার কোনো জবাবই দেয় না রাধারানী। তবে রাধারানী দেখেছে ওই আশ্রম থেকে লোকজন এসেছে। মাও তাদের বেশ মান খাতির করে খাইয়েছে। আরও অনেক কথাই হয়েছে। অবশ্য রাধারানী এ বিষয়ে কোনো আগ্রহই দেখায়নি।

নীলুও যেন পথ চেয়েই ছিল। সন্ধ্যা থেকে মেলায় এসে নীলু তার লোকদের নিয়ে জুয়ার ছক পেতে জুয়া খেলছে আর তার দলের হয়ে তাদের কাজকর্ম তদারকি করছে। এবার প্রধান ছকে এসে বসেছে। খদ্দেরদের ভিড়ও দেখছে। আর আমদানিও হয়েছে প্রচুর। তবু নীলু যেন চোখ মেলে ছিল কখন দেখবে রাধারানীকে। কখন শুনবে তার কথা।

শেষ রাতে জুয়াও শেষ হয়ে গেছে। এবার ছক তুলে বাড়ি ফেরার পালা। আজ ভালোই রোজগার হয়েছে নীলুর। নীলু দেখেছে দু-তিনবার মেয়েটা আসছে তার কাছে। আর ওর জন্যই যেন নীলুর জুয়ার আমদানিও দ্বিগুণ হয়ে গেছে।

হঠাৎ এসে পড়ে রাধারানী। আজ সে যেন আরও সেজে এসেছে। তার রূপ-যৌবন ঝড় তোলে নীলুর মনে। ক'দিন থেকে নীলুও দেখছে রাধারানীকে। বলে রাধারানী, আজ ভোররাতে মন্দির হয়ে যাব।

মন্দিরে যাবে? একটু অবাক হয় নীলু।—তাই চলো।

রাধারানীই আজ বলে কথাটা। আর নীলুও চমকে ওঠে। এই স্বপ্নই সে দেখেছিল। তবে জানাতে পারেনি রাধারানীকে। আজ রাধারানী নিজে থেকে কথাটা বলে। আজ নীলু-রাধারানী দুজনেই তাদের শূন্য জীবন দুজনের মধ্যে পরিপূর্ণ করতে চায়।

তাই ওরা এসেছে মন্দিরে। আজ দেবতাকে সাক্ষী রেখে দুটি মন দুজনকে ঘিরে নতুন করে বাঁচার ঠিকানা খোঁজে।

কাজলী সব দেখেশুনে এবার চমকে ওঠে। নীলুর ঘরেই রয়েছে রাধারানী। দুজনে বিয়ে করে সংসারী হয়েছে। কাজলী বলে, একি করলি রাধা, একটা ডাকাত জুয়াখোরকে বিয়ে করলি!

রাধা বলে, আমি কোনো অন্যায় করিনি মা। এবার আমাকে শান্তিতে বাঁচতে দাও।

নীলুও আজ বাঁচতে চায়। জীবনের অর্থ খুঁজতে চায় রাধারানীর মাঝে।

মুষ্টি যোগ

গিন্নির দাঁত আর আমার চুল নিয়ে খুবই ঝামেলাতে পড়েছি। আমার মাথার চুলগুলো এতদিন ধরে বেশ কুচকুচে কালো জাম রং ধরে বিরাজ করছিল। যাত্রার ছোকরা কেষ্টর মতো বাবরির আকারও নিয়েছিল।

অবশ্য চুলের যত্নও আমি কম করতাম না। চুলের জন্য নানারকম তেল-শ্যাম্পু ইত্যাদি ব্যবহার করতাম। ঘন ঘন চিরুনি আঁচড়ে অবাধ্য চুলগুলোকে সযুত করতাম। বন্ধুরা বলত,

—তোর চুল সত্যি দেখবার মতো!

ওদের কথায় গর্বে আমার বুক ভরে উঠত। বলতাম, এরজন্য যত্ন করতে হয়, তোয়াজ করতে হয় আর খরচা করতে হয় রে!

বয়স বাড়ছে। হঠাৎ দেখি আমার সাধের চুলগুলো এবার চিরুনির সাথে ঝরাপাতার মতো ঝুর ঝুর করে পড়ছে। খসে পড়া চুল নয়, যেন ওসব আমার জীবনের পরমায়ু। বুকটা কেঁপে ওঠে। কপালের সামনের দিকটা ক্রমশ ঘাসবিহীন ফুটবল মাঠে পরিণত হচ্ছে। এবার ছুটলাম ডাক্তার-এর কাছে। অনেকেই আশাও দিল। তাদের মোটা টাকা ভিজিট দিয়ে আরও মোটা টাকার ওষুধ-তেল এসব কিনে মালিশও শুরু করলাম মাথার। কিন্তু টাকাই যায় আর কপালের টাকও বাড়তে থাকে। চুল খসছে তো খসছেই। ক্রমশ কপাল আর মাথায় সীমানা একাকার হয়ে গেল। আর মাথার মধ্যেখানের চুলগুলোও যেন ওই নানারকমের তেলের পরশে উধাও হয়ে গেল।

ক্রমশ ভূমি দখলের মতো অদৃশ্য টাকবাহিনীও আমার এমন উর্বর মাথার চুলগুলোকে সাফ করে তাদের দখলই কায়েম করল। নিজেরই বিশ্রী লাগে টাকে হাত বোলাতে তবু এখানে ওখানে এখনও টোটকার সন্ধান করছি যদি চুল আবার গজায়।

নিজের এই হাল, অন্যদিকে গিন্নির দাঁতও এবার ছেড়ে যাবার জন্য নোটিশ দিতে শুরু করেছে। বত্রিশজনের মধ্যে দু'চারজন ইতিমধ্যে চলে গেছে। বাকিদের বেশ কয়েকজন নড়বড় করছে। তাদের বিদায় ব্যথায় গিন্নিও নাজেহাল। নানা মাজন-পেস্ট ব্যবহার করছে। সেও চিন্তিত। অবশ্য বন্ধুরা বলে, —যাক না গিন্নির দাঁত! ও তো যাবেই রে! বয়স হচ্ছে তো! দাঁতবিহীন হয়ে গেলে মহিলারাও অসহায় হয়ে পড়ে। দাঁতের বাড়ি দিয়ে বাড়ি শুদ্ধ সবাইকে আর ঠান্ডা করা যাবে না। তাই গিন্নিও বলে,

—একটা কিছু করো।

এদিকে আমার মাথা জোড়া টাক, ওদিকে দন্তহীন গিন্নি। সমস্যাটা ক্রমশই জটিল হয়ে উঠেছে।

সেদিন ট্রেনে শান্তিপুর যাচ্ছি। শান্তিপুরের আগে হরিপুর স্টেশনের কাছে আমার আত্মীয় বাড়ি করেছেন। প্রায়ই যেতে বলেন—যাওয়া আর হয় না। সেদিন বের হয়েছি। বর্ষার সময়। বৈকালের দিকে ট্রেনে ভিড়ও বেশ রয়েছে। যাত্রীদের কলরব চলছে। সেইসঙ্গে মিশেছে হকারদেরও গলার বিচিত্র চিৎকার। কী নেই! গাড়ির কামরাতো নয় যেন ডিপার্টমেন্টাল স্টোর। সবই মেলে—চানাচুর-চা-বিস্কুট-ঠান্ডা পানীয়-ওষুধ-জরিবুটি।

হঠাৎ দেখি এক ভদ্রলোক মাথায় চিকন কালো, বেশ কোঁকড়ানো চুল। বয়স হয়েছে, কিন্তু চুলে পাকও ধরেনি। চড়া গলায় তিনি ভাষণ দিচ্ছেন,

—আমার প্রপিতামহ বরিশালের গণ্যমান্য কবিরাজ ত্রৈলোক্যনাথ ভেষজকাচার্যর তৈরি এই তেল

ব্যবহার করুন। চুল পাকবে না-ঝড়বে না। আমাকে দেখুন—এই পূর্বপুরুষদের আবিষ্কৃত তেল ব্যবহার করে আমার চুল আজও যৌবনের চুলই রয়েছে। বিশুদ্ধ কবিরাজি মতে ভেষজ গাছগাছালির তৈরি এই চারপুরুষের প্রচলিত তেল ব্যবহার করে লাখ লাখ মানুষের টাকে আবার কুচকুচে কালো চুল গজিয়েছে। দাম প্রতিটি শিশি এগারো টাকা। তিন শিশি ব্যবহার করলেই চুল আবার গজিয়ে যাবে। কুচকুচে কালো চুল। দাম একত্রে পঁচিশ টাকা। তিন শিশি পঁচিশ টাকা মাত্র। ত্রৈলোক্যবিজয়ী কেশ কালা তেল।

দু'একজন কিনলেন। এক ভদ্রলোকও কিনলেন। তার নাকি টাক পড়ে গেছিল। দুসপ্তাহে টাকে বর্ষার মাঠের বুকে ঘাস গজানোর মতো চুল গজাচ্ছে। বললেন,

—কাজ হচ্ছে মশাই? ভেরি গুড তেল।

ব্যাকুল হয়ে আমি একত্রে তিনখানাই কিনে ফেললাম ওর কাছ থেকে। ব্যাগেও পুরলাম। দেখি যদি টাক আবার ঢাকা পড়ে। স্বপ্ন দেখি হারানো চুল আবার ফিরছে-কালো চুল। ভাবতেও ভাল লাগছে। হঠাৎ অন্য কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়।

এটা বেশ ভরাটে কণ্ঠস্বর—দাঁতের জন্য ভাববেন না। বিখ্যাত কবিরাজের আবিষ্কৃত দেশীয় সতেরোটি গাছগাছালির সঙ্গে ইলেকট্রনযুক্ত দন্তমঞ্জন-দন্তমঞ্জরী ব্যবহার করুন। দেখুন, আমার দাঁত। বাহাত্তরে পা দিয়েছি, তবু দাঁত এতটুকু পড়েনি। স্রেফ এই দন্তমঞ্জন ব্যবহার করছি। যারা এই ইলেকট্রিক দন্তমঞ্জন ব্যবহার করেছেন তারা জানেন এর মহিমা। দাঁত পড়বে না-পড়বে না। যতদিন বাঁচবেন দাঁত অক্ষয়-অমর হয়ে থাকবে। গ্যারান্টি দিয়ে থাকি। প্রতি ফাইল দশ টাকা। আর বড় ফাইল পনেরো টাকা। একটি ব্যবহার করলেই ফল পাবেন।

নিজের টাকের জন্য তেল কিনেছি—গিন্নির দাঁতের সমস্যা। তার জন্য কিছু না করলে নেহাৎ স্বার্থপরের মতোই কাজ হবে। অনেক সময় টোটকা-কবিরাজি ওষুধেও কাজ হয়। সেই কথা ভেবেই একটা বড় ফাইলই কিনলাম গিন্নির দাঁতের জন্য। মাজন বিক্রেতা বলে,

—ইলেকট্রিক মাজন তো! পূর্বদিকে সূর্যের দিকে মুখ করে দাঁত মাজতে বলবেন। ইলেকট্রিকের কাজ এতে ভাল হবে। হাতে হাতে ফল পাবেন।

ইলেকট্রিক দন্তমাজন না হয় পূর্বদিকে মুখ করে মাজলে কাজ হবে, টাকে তেল কোন দিকে মুখ করে মাথায় লাগালে কাজ হবে। সেটা তো জানা হল না! গিন্নি বলে—আমি নাকি সংসারের অযোগ্য লোক। কোনও কিছুই ঠিকঠাক করতে পারি না। কথাটা যে বর্ণে বর্ণে সত্যি তা বুঝতে পারি! তাই চেষ্টা করি যদি চুলের তেলওয়ালাকে যদি পাই। কথাটা জেনে নেব যাতে হাতে হাতে চটজলদি ফল পাই। কিন্তু তার পাত্তা আর পেলাম না।

সন্ধ্যা নামছে। আমিও হরিপুরের স্টেশনে নামলাম। তখন সাঁঝবাতি জ্বলে উঠেছে। মাঠের মাঝে স্টেশন ছিল। এখনও মাঠ কিছু আছে। তবে ঘড় বাড়ি-ছোটখাটো দোকানও হয়েছে। তবে আশেপাশে ওদিকে রয়েছে ঘন পাটের ক্ষেত ওর মাঝ দিয়ে হাঁটাপথে ট্রেন থেকে নামা মানুষের অনেকেই। আমিও একটু এগিয়ে একটা চায়ের দোকানের আলো জ্বলতে দেখে সেদিকে এগিয়ে গেলাম। ওখানেই আমার আত্মীয়ের বাড়ির খোঁজ করতে হবে।

গ্রাম্য চায়ের দোকান। কম পাওয়ারের দু'তিনটে আলো জ্বলছে। অবশ্য ওই বাতির জন্য পয়সাও দিতে হয় না। মাথার উপরের লাইন থেকে বাঁশের বাখারিতে তার জড়িয়ে বেশ কায়দা করে হুক করা হয়েছে।

চাও খেতে হবে। না হলে ঠিকানা জানলেও বলবে না বলেই মনে হল দোকানিকে। তাই চা নিয়ে বসেছি। হঠাৎ দেখি বাঁশের মাচানে বসে সেই ইলেকট্রিক দন্তমাজনওয়ালা আর চারপুরুষের আবিষ্কৃত কেশ তেলওয়ালাকে। ওরা চা শেষ করে উঠছে। তেলওয়ালা মাজনওয়ালাকে বলে,

—ক্যামন ব্যবসা হল রে?

মাজনওয়ালা বলে—ব্যবসা বড় মন্দা গো দাদা। চলছে কুনমতে। হাসে তেলওয়ালা।

—দিনভোর সংসেজে ব্যবসা করেও পেট চলে না আমার তোমারও। তবু তো করতে হবে। নে এখন মেক্‌আপ তুলে বাড়ি চল। দিনভোর এসব পরে মাথায় কুটকুট করে। যত্তোসব—

তারপর দেখি তেলওয়ালা একটানে মাথার ওই চিকন-কালো চুলের পরচুলটা টেনে খুলে ফেলে। আর মাথা জোড়া চকচকে টাক বের হয়। পরচুলটা খুলে লোকটা তখন খসখস করে টাক চুলকাচ্ছে। ওদিকে সেই মাজনওয়ালাও মুখে আঙুল পুরে দু'পাটি ঝকঝকে বাঁধানো দাঁত খুলে নিয়ে কাগজে মুড়ে ঝোলায় পুরছে। লোকটার মুখের আদলই বদলে গেছে দন্তবিহীন মাড়ির জন্য।

ওরা দুজনে ব্যাগ হাতে ওদিকের পাটক্ষেতের মধ্যেকার পথে অদৃশ্য হয়ে গেল। আমিও এবার বোকার মতো ওদের দিকে চেয়ে থাকি। দুজনে এই অধমের চল্লিশ টাকাই মেরে গেল। চায়ের দোকানদারের কথায় হুঁশ হয়। সে বলে,

—সুধন্যবাবুর বাড়ি তো—সোজা ওই পথেই চলে যান। পথের শেষেই বাঁহাতে বাড়ি।

পায়ে পায়ে এগিয়ে চলি, দুটো চড়ই মেরেছে আমার গালে।

আক্কেল দাঁত

কেদার খুড়ো আমাদের পল্লীমঙ্গল নাট্যসংস্থার ট্রেজারার-কাম-ডিরেক্টর-কাম প্রধান পৃষ্ঠপোষক, বয়স নেহাত কম নয়, হাফ সেঞ্চুরি পার হয়ে খুড়ো এখন ষাট ছুঁইছুঁই। কিন্তু বয়স ধরার কোন উপায় নেই, কলপ করে মাথার চুলগুলোকে আর শ্বেতবর্ণের দিকে যেতে দেননি। শক্ত-সামর্থ চেহারা। সাজগোজও বেশ ফিটফাট। একেবারে মস্তান মার্কা চেহারা। দামী দেশি ধুতি-আদ্দির পাঞ্জাবিতে গিলে করা আর বেশ হালকা পাতলা গোঁফও রাখে কেদার খুড়ো। এবার কর্ণার্জুন পালা ধরেছে। আমাদের খুড়ো ক্ল্যাসিকাল গান, ক্ল্যাসিকাল নাটকের পক্ষপাতী। আমরা ধরেছি জমাট প্রেমের নাটক—প্রেম-প্রেম খেলা—আর খুড়ো ধরেছে কর্ণার্জুন। নিজে সাজবে শকুনি—গিমিক দিয়ে হাসি গোঁফে তা দিয়ে কথা বলা—চিবিয়ে চিবিয়ে কথা বলা এসব নাটকীয় ভঙ্গিমা ভালোই আসে খুড়োর। কিন্তু মুশকিল হয়েছে আজকাল—কেদার খুড়োর আক্কেল দাঁতটাই একটা কঠিন সমস্যার সৃষ্টি করেছে। প্রথমে কদিন টিস্ টিস্ করে তারপর টস্‌টস্ করতে শুরু করে। অর্থাৎ আক্কেল দাঁত এবার পড়ব পড়ব করছে সেটাই জানান দেয়। তবু কেদার খুড়ো ওই দাঁত নিয়েই অন্যদের অভিনয়ের আক্কেল দিতে থাকে। নিজেই কর্ণ-দুঃশাসনকে পোজ দেখিয়ে দেয়। গলা তুলে ভীমকে গর্জন করেও দেখায়।

নিজের শকুনির রোলও তেমন খেলিয়ে করতে পারছেন না। দাঁতের ব্যথাটা মাথা ঘাড় অবধি ডানা মেলেছে। খুড়োর দাঁতের ব্যথাটাও ততবেশি চাগিয়ে উঠেছে। রিহার্সাল পণ্ড, বুড়ো গাল ধরে বসে থাকে। আমরাই বলি,

—খুড়ো দাঁতটা তুলে ফেলো। ওদিকে নাটকের দিন এগিয়ে আসছে। দাঁত ঠিক না হলে নাটকের কী হবে? তোমার রোলই বা করবে কী করে?

এদিকে খুড়ো তার আক্কেল দাঁত হারাতে রাজি নয়। মণিদা বলে,

খুড়ো ছোকরা সেজে থাকলে কী হবে? মেঘে মেঘে অনেক বেলাই হয়েছে। দাঁত তো এবার সবই যাবে। চুল না হয় কলপ করলে—দাঁত তো মানবে না, পড়বে। তাই তুলে ফ্যাল ওই সব আলগা দাঁত।

কেদার খুড়ো তবু আশা রাখে তার দাঁত আবার সেট হয়ে যাবে। দাঁতের ব্যথাও বাড়ছে। সরব কেদার খুড়ো ক্রমশ নীরব হয়ে আসছে। অবশ্য কেদারবাবুর স্ত্রী আমাদের দীপা খুড়িমা কিছুটা নিশ্চিন্ত। কারণ খুড়ো যতক্ষণ বাড়িতে থাকে ততক্ষণ খুড়ির সঙ্গে তার বচসা চলতে থাকে। খুড়ো একটা কথা বললে খুড়ি বলেন পাঁচটা, আর আমাদের সরব খুড়ো তখন প্রয়োগ করেন নিদেন গোটা দশেক চোখা চোখা বাক্যবাণ। এখন খুড়ো অসহায়। বাক্য বন্ধ। গলাও ফুলেছে। খুড়িও সেকারণে এখন তাই নিশ্চিন্ত। খুড়ি বলে,

—না বাপু! দাঁত তুলে আর কাজ নেই। একগাদা টাকা খরচ তো হবেই, আবার শুরু হবে অশান্তি, সেই কথার কচকচি। এ তবু শান্তিতে আছি। খুড়ো চোখমুখ পাকিয়ে পোজ পাচারে মূকাভিনয় করে জানাতে চায় কারো সর্বনাশ, কারো পৌষমাস। খুড়ি সেসবে কান না দিয়ে বলেন,

—ওসব দাঁত এবার এক এক ঝরাপাতার মতোই ডাল থেকে টুপটাপ করে খসে পড়বে। বয়স তো হলো।

খুড়োর চোখ জ্বলে ওঠে ওই বয়সের কথা শুনে। বয়স হওয়া মানেই বাতিলের দলে পড়ে যাওয়া।

এটা হতে চায় না। তাই এবার খুড়ো ভাবছে গিন্নি যখন অমত করছে তখন দাঁত তুলতেই হবে। শুধু একটাই নয়, সব কটা দাঁত খুলে সুন্দর করে বাঁধিয়ে নেবে। ঝকঝকে সুন্দর নকল দাঁত লাগিয়ে হারানো যৌবনকে আবার হাতের মুঠোর মধ্যে আনবে। আমরাও তাই চাই। নাটকের দেরি নেই—খুড়োকে দরকার। এখন খুড়োর নীরব থাকা চলবে না। তাছাড়া শকুনির পার্টও করতে হবে তাকে। তাই বলি, —দাঁতটা তুলে নাও খুড়ো। ভবেশ বলে,

—হ্যাঁ খুড়ো তাই নাও। আমাদের পাড়ার চণ্ডী ডাক্তার। সুন্দর চেম্বার আর তেমনি হাত। আমার জ্যাঠামশাই-এর দু'পাটি দাঁত তার এক একদিনে তিনচারটে করে পটাপট—ক্ষেতের মুলো তোলার মত করে সাফ করে সেখানে নতুন দাঁতের পাটি সেট করে দিয়েছে। খুড়ো যেন আশার আলো দেখে। কোনওরকমে অস্ফুট স্বরে বলে,

—তাই নাকি, লাগেনি?

ভবেশ বলে, আরে আজকাল এমন ইনজেকশন হয়েছে যে তুমি জানতেই পারবে না। পটাপট তুলে নেবে ওনলি আশি টাকা। একত্রে দাঁত তুলতে তিনশো কুড়ি টাকার জায়গায় তিনশো টাকা।

খুড়ো বলে ইশারায়,

—চারটে নয়, আপাতত—একটা। এই আক্কেল দাঁত তুলে দিলেই হবে। বাকি দাঁত মজবুত আছে। ভবেশ বলে, —ঠিক আছে। তাই হবে। তাহলে কবে যাবে বলো? আগে থেকে নাম লেখাতে হবে।

আমরা বলি, নাটকের আর মাত্র চার-পাঁচদিন আছে। তবু ফুল রিহার্সাল তো দিতে হবে। তুমি কালই দেখ যদি খুড়োর দাঁত তোলা হয়। ভবেশ বলে, কাল, দেখি কত নম্বর পড়ে। বললাম, তোমার তো ওর কমপাউন্ডার-এর সঙ্গে চেনাজানা আছে। একটু বলেকয়ে ম্যানেজ করে নামটা উপরের দিকে লিখিয়ে আনো। ফটিক কোন কোর্টে কাজ করে, সে বলে,

—আরে পেশকারকে বল্লে—মামলাই আগে উঠে আসে, তার দাঁতের মামলা কেন উঠবে না। একটুন ম্যানেজ কইরা লও। কেসখানা তো জরুরি। এতবড় পার্ট করনে লাগব খুড়ারে। দাঁত তোলবার লাগবোই।

ভবেশ বলে, —দেখি ম্যানেজ করতে পারি কিনা। খুড়ো কালই চলো সন্ধ্যায়। পরশু ডেট, তারপর দুদিন ফুল রিহার্সাল, স্টেজ-রিহার্সাল দিবা।

চণ্ডী ডাক্তার পাড়ার অনেক দিনের বাসিন্দা। শীর্ণ লম্বা চেহারার খিটখিটে মেজাজের লোক। পাড়ার ওদিকে চঞ্চল মেডিকেল স্টোর্স-এর পেছনে একটা ঘরে ওর চেম্বার। আগে ভদ্রলোক ধুতি-শার্ট পরত।

এখন ডাক্তারি ভেক ধরার জন্য প্যান্ট-শার্ট ও মাঝে মাঝে কোটও পরে। আর ইদানীং নাকি কানেও কম শোনে চণ্ডী ডাক্তার।

অবশ্য এটা বোধহয় চণ্ডী ডাক্তারের প্রতিপক্ষ নরেন ডাক্তার-এর রটনা। নরেন ডাক্তার সবে দাঁতের ডাক্তার হয়ে এসেছে। তার ডাক্তারী পসার এখনও জমেনি। তবে তার ঠাঁটবাট আছে। শ্বশুরের দেওয়া একটা গাড়িও তার আছে। কারণ ডাক্তারের ডিগ্রি-ডিপ্লোমা থাক আর না থাক কিছু যায় আসে না—গাড়ি একটা না থাকলে সে নাকি ডাক্তার হবার যোগ্যই নয়। তাই শ্বশুরকে চাপ দিয়ে বৌ-এর সঙ্গে গাড়িও পেয়েছে। শোনা যাচ্ছে চণ্ডীবাবুও নাকি খুব শিগগীর গাড়ি কিনবে। তবে পুরোনো ডাক্তার। পুরোনো চাল ভাতে বাড়ে তাই অনেক পুরোনো রুগীরা ওর কাছেই আসে। কারণও আছে। নরেন নেয় নাকি একশো টাকা প্রতি দাঁতের জন্য—সেখানে চণ্ডীবাবুর চার্জ আশি টাকা আবার বেশি দাঁত তুললে ডিসকাউন্টও দেয়।

ভবেশদা কেদার খুড়োকে এর মধ্যে ম্যানেজ করে এতদিন দাঁত দেখিয়েছে। তখন চণ্ডীবাবু দাঁত তোলেন নি। ব্যথা-বেদনা কমাবার ওষুধ দিয়েছিল। বলেছিল তিনদিন পর আসবেন। তুলে দেব। জানতেই পারবেন না। খুড়ি বলে,

—দাঁত তোলাবে তাহলে? সত্যি!

খুড়ো বেশ কয়েকদিন বাক্য ব্যয় করতে পারেনি। সেসব বাক্যবাণ প্রয়োগ করে তিনি স্টেজ রিহার্সাল দেবেন ফাঁক পেয়ে। নাহলে শান্তি স্বস্তি পাচ্ছেন না। তাই ঘাড় নেড়ে জানায় যে দাঁত উৎপাটন করবে। হোক আক্কেল দাঁত ওটাকে না তুলে শান্তি নেই। খুড়ি বলে,

—না তুললে চলবে কেন? ঘরে যে শান্তি রয়েছে তাকে অশান্তি তো করতে হবে। তোলো গে দাঁত তারপর দেখা যাবে।

ওরা এসেছে চণ্ডী ডাক্তারের কাছে। রোগীরা অনেকেই জানে চণ্ডী ডাক্তার এখন কানেও কম শোনে, তাই কোন দাঁত তুলতে হবে জোরে জোরে জানিয়ে দেয় তারা। চণ্ডীবাবুও সেই মতো ইনজেকশন দিয়ে পটাপট দাঁতগুলো তোলে ক্ষেতের মুলো তোলার মতো।

কেদার খুড়োকেও ইনজেকশন দেয় ডাক্তার। কেদার খুড়োও অবাক। কোনও যন্ত্রণাই নেই। আর চণ্ডী ডাক্তার খুড়োকে চেয়ারে বসিয়ে হাঁ করতে বলে মুখে সাঁড়াশি ঢুকিয়ে একটা দাঁত বের করে এনে দেখায়। খুড়োও খুশি, ওই দাঁতটা তাকে বেশ কিছুদিন ধরে অপরিসীম যন্ত্রণা দিয়েছিল। এবার সেই যন্ত্রণা থেকে মুক্ত হবে। সে এখনই বেশ হালকা লাগছে ওই দাঁত তোলাতে।

খুড়োর তোলা দাঁতের জায়গাটা তুলো দিয়ে দেয় ডাক্তার আর খুড়ো গুণে গুণে আশিটি মুদ্রা দিয়ে আর বেশি কিছু টাকার রকমারি ওষুধ কিনে আক্কেল দাঁত মুক্ত হয়ে বাড়ি ফিরেছে তখন রাত প্রায় দশটা। ভবেশদা বলে,

—কাল পুরো রেস্ট, গরম কিছু খাবে না। কালই দেখবে ফিট হয়ে গেছ। তবে নো টক-ঝাল।

খুড়ি বলে— ও চুপচাপ থাকবে? কাল থেকেই ঘরে নাটক শুরু হবে। হাড়মাস জ্বালিয়ে দেবে বাক্যবাণে।

ভবেশ বলে, —না, না। তবে কর্ণার্জুনে শকুনি এবার দারুণ করবে খুড়ো।

কেদার খুড়ো নীরবে শোনে, এখন বেশ ভালোই লাগছে। বেদনাও নেই। কিন্তু খেলা শুরু হয় পরদিন সকাল থেকেই। দাঁতের ব্যথাটা আবার ঝনঝনিয়ে ওঠে। কথা বলারও ক্ষমতা আর নেই। আর খুড়ো এবার আবিষ্কার করে সেই যন্ত্রণাদায়ক আক্কেল দাঁত যেখানে ছিল সেখানেই রয়েছে। চণ্ডী ডাক্তার কানে কম শোনেন। খুড়ো ঠিক মতো আসল দাঁতটা দেখিয়ে যা বলেছিল সেটা ডাক্তারের কর্ণপাত হয়নি।

চণ্ডী ডাক্তার দাঁত তোলার আগে ইনজেকশন দিয়ে দাঁতের পাটি অবশ করে অন্য একটা কাঁচা দাঁতই তুলে দিয়েছে—আসল দাঁতটা রেখে। এখন সেই আসল আক্কেল দাঁতের বেদনাটাও মিশেছে আর ইনজেকশনের প্রভাব কেটে যেতে বেদনাটা এবার দ্বিগুণভাবে ঠেলে উঠেছে।

কথা বলবার শক্তিও নেই। আবার ছুটতে হবে চণ্ডী ডাক্তারের কাছে, দাঁতের বেদনা কমাবার জন্য। ওদিকে নাটকের দিন সমাগত। এবার কেষ্টদাকেই ধরা হয়েছে। ও যদি কোনও মতে শকুনির পাটটা করে দেয়। কেদার খুড়ো এখন নীরব। তার আক্কেল দাঁতই যে এমন আক্কেল দিয়ে যাবে তাতো ভাবেনি।

চাঁচর

শোনা যায়, কবি কালিদাস নাকি কোনও সময় খুবই মূর্খ ছিলেন। যাকে বলে হস্তী মূর্খ। যে ডালে বসতেন তিনি গাছে উঠে কাঠ কাটার সময় সেই ডালটাই কাটতেন। অবশ্য তার জন্য কী মাশুল তাকে দিতে হয়েছিল, তা জানা যায় না। তবে তার সেই বুদ্ধিহীনতার কথা সবাই জানে।

একালেও সেই কালিদাসের অভাব নেই। তবে সেই কালিদাস মা সরস্বতীর বরে কালজয়ী কবি হয়েছিলেন। একালে অবশ্য মা সরস্বতী তেমন বর-টর দেন না। ফলে একালের কালিদাসরা অন্ধকারেই হারিয়ে যায়।

আমাদের গ্রামের ভবচরণও তেমনি একজন মানুষ। শুধু ভুলো মনের মানুষই নয়—হাড় কুঁড়ে। সংসারে বন্ধন একমাত্র তার মা। আর মায়ের বন্ধনও ওই ভবা। মা গ্রামের এর-তার বাড়িতে মুড়ি ভেজে—অন্যসব কাজকর্ম করে সামান্য যা আনে তাই দিয়েই ভবকেও খাওয়াতে হয়।

ভবা খায়-দায় আর ঘুরে বেড়ায়। মাঝে মাঝে যাত্রার দলে পাটও করেছে। ধ্রুব-তে ধ্রুব, ভক্ত প্রহ্লাদে প্রহ্লাদ। তখন দেখতে শুনতেও ছিল ভাল। আর ওর বাবা কেত্তন গাইত। ভবাও বাবার সঙ্গে কেত্তন গাইত। গানটানগুলো তাই গাইতে পারে ভালই। আর যাত্রার দলে পাটও করত। তার ওই পাট আর গানে নাকি লোকের চোখে জল এসে যেত। সেবার, গ্রামে হরিশচন্দ্র পালায় ভবা করেছে রোহিণীর অভিনয়। তার অভিনয় নাকি অন্তর কাঁদিয়ে দিয়েছিল দর্শকদের। ভবার কদরও বেড়ে গেল গ্রামে—আশেপাশের গ্রামে। অনেকে আদর করে ডেকে নিয়ে যায় বাড়িতে। সেখানে গান করে। খাবার-দাবারও দেয়।

ভবার সেই আদর হল কাল। পড়াশুনাও করে না। পাড়ায় কেউকেটা হয়ে ঘুরে বেড়ায়। কিছুদিনের মধ্যে ভবাও এবার বদসঙ্গে পড়ে আর মদ গাঁজাও খায়। ওদিকে বাবাও মরে গেছে, অভাবের সংসার। মা বলে, কাজকর্মই দ্যাখ। দাসমশাই-এর আড়তেই যা, যদি কাজ মেলে।

দাসমশাই হরিভক্তিপরায়ণ লোক। গলায় কণ্ঠি, কপালে তিলক। বড় আড়তের মালিক। দাসমশাই হিসাবী লোক। কাজের মানুষ। বলে,

—গাড়ি থেকে বস্তা বস্তা ধান, গম, রোয়া রোয়া পাট নামাতে হবে ভব।

ভবও দেখছে এহেন কাজ বড় কঠিন। ওই ধানের বস্তা, গমের বস্তা নামাতে গিয়ে বিপদেই পড়বে সে। ধানের ভুষো ময়লা ভরে যায় নাকে মুখে। ভয়ে সরে আসে। তার দ্বারা এসব হবে না। ওদিকে মাও বোঝেন ওকে—অন্নচিন্তা চমৎকারী।

অবশ্য প্রায়ই ভুলে যায় সবকিছু।

সেবার গ্রামের সেনবাড়ির তত্ত্ব নিয়ে গিয়েছিল সেন মশায়ের বেহাই-এর বাড়িতে। সেনমশাই তত্ত্ব সাজিয়ে দেন। চিঠিও দেন তার বেহাই মশাইকে। ভবকেও বলে দেন তার বেহাই-এর নাম ঠিকানা। ভবও সেই তত্ত্ব নিয়ে গিয়ে হাজির হয় সেই গ্রামের অন্যপাড়ায় কার বাড়িতে। সেখানেই নামিয়ে দিয়ে চলে আসে।

ওদিকে সেনমশায়ের বেহাই তো সেনমশাই-এর তত্ত্ব না পেয়ে রেগে খাপ্পা। সেনমশাইও ভবাকে নিয়ে হাজিব হয় সেই গ্রামে। কিন্তু ভব আর ঠিক করতে পারে না কোথায় সে তত্ত্ব পৌঁছে দিয়ে গেছে। সেনমশাই গর্জে ওঠে,

—ব্যাটা মাতাল, ওসব বেচে মাল খেয়ে এসেছে!

চড়চাপড়ও মারে ভবার গালে। ভবাও ঠাওর করতে পারে না কি হল ব্যাপারটা।

ভবা অবশ্য ইদানীং ভাবছে কথাটা। সংসারের মানুষগুলো যেন কেমন বদলে গেছে, মায় তার নিজের মা অবধি। খেতেও দেয় না ঠিকমতো। মালও জোটে না। নসু সাহা তো পয়সা না দিলে এক পাঁট মদও দেয় না।

সেবার গ্রামের লোকজন তীর্থভ্রমণে যাচ্ছে বাসে করে। তাদের জন্য কাজের লোকের দরকার। মালপত্র নামাতে হবে। চা—খাবারও দিতে হবে। তারা ভবকে নেয় ওরই জন্য। বক্রেশ্বর তারাপীঠ যাবে বাস।

ভবা তারাপীঠে এসেছে। গাছগাছালি ঘেরা শ্মশান। ওদিকে গাছের এদিক-ওদিক মায়ের ভক্তরা জুটে গেছে। মদের ফোয়ারা চলছে। ভবাও বসে যায়। কার মাল কে খায়। ভব আজ খুশি। মদের অভাব নেই। ওদিকে মায়ের নামে ভাণ্ডারা চলছে। খিচুড়ি-লাবড়া-পায়েস। ভবও দেখে। এখানে যেন পাত পাতলেই খাবার মেলে। দুদিন ছিল তারা। ভব দেখে এখানে প্রতিদিনই কেউ না কেউ ভাণ্ডারা দিচ্ছে। আর দ্বারকার জলের অভাবও নেই। ভবারও ভালো লাগে জায়গাটা। মায়ের ডাকও উঠছে আকাশে বাতাসে।

ভবকে ফিরতে হবে। অবশ্য ফেরার সময় ঘটে বিচিত্র ঘটনা। ভবা উঠে পড়েছে বাসে। বহু যাত্রীবাহী বাস আসে এখানে। পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে মাঠে। তীর্থ সেরে যাত্রীরা যে যার বাসে ওঠে। বাস ছেড়ে দেয়। ভবাও উঠেছে বাসে। বেশ কিছুক্ষণ আসার পর ভবার খেয়াল হয়, সে অন্য বাসে উঠেছে। তার গ্রামের চেনা লোকগুলো নেই। বাসও যেন অন্য পথে চলেছে। ভবা শুধায়,

—কোথাকার গাড়ি গো? হাট গোবিন্দপুর যাবে তো?

এবার গাড়িতে দু'-চারজন রসিক ছিল। তারাও মাল খেয়ে বলে,

—এ তো খয়রাশোলের গাড়ি। তবে হাট গোবিন্দপুর এটাই মনে করো।

এবার ভবার কান্না পায়। ভবেশ রাস্তা হারিয়ে ফেলেছে। বাস কন্ডাকটার ব্যাপারটা বুঝে ওকে কাছের কোনও স্টেশনে নামিয়ে দিয়ে বলে,

—কোথায় যায়? কোন স্টেশনে নামতে হয়?

ভবার দুর্গাপুরের কথাটা মনে পড়ে। বলে—দুর্গাপুর।

দুর্গাপুরে দু'-একবার এসেছে। ওখান থেকে বাঁকুড়ার বাসে গেলে ওদের স্টপেজে পৌঁছাবে। কন্ডাকটার বলে,

—এখান থেকে দুর্গাপুরের গাড়ি যায়। যাও তো যত্তোসব! পাগল মাতালের কাণ্ড!

গ্রামে যাত্রীবাহী বাস ফিরেছে। ফেরেনি ভব। ভবার মায়ের শরীরও খারাপ। তবু ছেলেটার উপর তার বড় মায়া। ভোলা মনের ছেলেটা কোথায় যে হারিয়ে গেল, বৃদ্ধা কান্নাকাটি শুরু করে। গ্রামের লোকও আফশোষ করে।

এমনি দিনে ফিরে আসে ভব। কিন্তু সেই ভুলের কথা সে প্রকাশ করতে চায় না। বলে,

—মায়ের ধর্মশালায় থেকে গেলাম গে মায়ের নাম-গান করে। খাই দাই—

ভব এখনও সেই গানটা অবশ্য ছাড়েনি। ইদানীং সে কালী সঙ্গীতও গাইছে। বলে,

—মনে হল ঘরে আর ফিরবো না গো। মায়ের ডাকে সাড়া দিয়েই ওখানে থেকে যাব। তা মা রয়েছে ঘরে। মহাবন্ধন। তাই ফিরে এলাম।

ভব যেন সংসার ত্যাগই করবে এবার মায়ের ডাক শুনে। এসব দেখে নসু সাহাও ওকে মাঝে মাঝে মদ দেয়। দু'-একজন ভক্তও জুটেছে। ওই মায়ের নাম করেই এবার ভব যেন পায়ের তলে মাটি পেতে চায়।

সেবার হাটে গিয়ে মদ গিলে ভোম হয়ে বসে থাকে গাছতলায়। বড়জোড়ার পথে পথে ভুল করে চলে গেছে খালি গায়ে। পথও ঠাওর হয় না। রাতভোর গাছতলায় পড়ে থাকে। আর বাড়ি ফেরে

সকালে। শোনা যায়, ভবা নাকি সাধনা করে রাতভোর মহাশ্মশানে বসে। লোকে এখন সমীহ করে তাকে।

ভবার মায়ের শরীর ভেঙে পড়েছে। শয্যা নিয়েছে বুড়ি। ভবা অবশ্য তার জন্য ভাবেও না। তার নজর মদের দিকে। মাও একদিন বেঘোরে মারা গেল। ভবার মনে হয় এবার সব বাঁধনই ছিঁড়েছে তার। বলে—সংসার ত্যাগ করলাম রে!

নসু বলে—সংসার করলি কোথায় যে ত্যাগ করবি! মায়ের দিকেও চাইলি না। মদ নিয়েই রইলি!

ভবাও ভাবছে কথাটা। এবার মনে হয় তার মাও নেই, তবু পড়ে আছে চালাঘরটা। ভবা সেই ঘরের কথাও মাঝে মাঝে ভুলে যায়। মদ খেয়ে সে সবকিছু ভুলে থাকতে চায়।

গ্রামে ঘটা করে দোল উৎসব হয়। দোলের সময় চলে ন্যাড়াপোড়া। সব আবর্জনা—বাতিল জিনিস—গাছের ডালপালা জ্বালিয়ে অগ্ন্যুৎসব করা হয়। ভবাও চাঁচরের দলে ভিড়েছে। মাঠে বাঁশ, কাঠ, পাতা জড়ো করে আগুন দেওয়া হচ্ছে। ধূ ধূ করে জ্বলছে আগুন। সবাই হৈ চৈ করছে। ভবাও মাল খেয়ে ফিট। সেও চাঁচরের দলের লিডার। আর খেয়াল করেনি। চাঁচরের পাশেই ভবার ঘরখানা। ওর মা তবু কষ্ট করে ছাউনি দিয়ে রেখেছিল। এবার আগুনের লেলিহান শিখা গিয়ে পড়ে ওর ঘরের চালেই। সবাই চিৎকার করে। নিমেষের মধ্যে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে ওঠে। সবাই চিৎকার করে,

—ভব, তোর ঘর।

ভবা মদের নেশায় তখন ফিট। বলে,

—বুড়ির ঘর পোড়ানো হচ্ছে রে! না! বেশ ভালোই জ্বলছে। জয় মা—জয় তারা।

ভবা তখন পরমানন্দে চাঁচর উৎসব পালন করছে। পিছনের সব বন্ধন মনের সব আবর্জনা সে আগুনে জ্বালাচ্ছে।

হিরো

উদয় কুমার স্বপ্ন দেখে সে রুপোলি পর্দার হিরো হবে। হিরো হবার জন্যই যেন সে এই ধরণীতে অবতীর্ণ হয়েছে। বন্ধুরাও বলেছিল উত্তমকুমারের পর তুই হবি দুসরা নম্বর উদয় কুমার। উদয়ের বাবার এখানে বিশাল ধানকল-তেলকল-পাটের আড়ত। গঞ্জের ধনী ব্যবসায়ী। গাড়ি, ট্রাক-ব্যবসা-বাণিজ্য কি নেই। উদয়ের বাবা "রামনিধি" সেকেলে ধরনের মানুষ। এখনও সেই ছোট ধুতি আর ফতুয়া পরেই গদিতে বসেন, হাজার হাজার টাকার কারবার করেন। গলায় কণ্ঠি-কদমছাঁট চুল। রামনিধির সুপুত্র উদয়ের মেকাপ সম্পূর্ণ আলাদা। এখনকার টাইট জিন্স-চক্কর-বক্কর কাটিং শার্ট-মাথায় বাবুই পাখির বাসা , দামী বিদেশি সেন্টের ভুরভুরে গন্ধ। গাড়ি নিয়ে ঘোরে বন্ধুদের সঙ্গে।

আর উদয়ের বন্ধু-নিতুর এক পিসতুতো কাকা মিলটন সে নাকি সুবিখ্যাত পরিচালক ফিল্মের।

নিতুই বলল—আরে তুইতো হিরো হবিই—সিওর। চল মিলটনদার কাছে, মিলটনদা এবার নিজেই প্রডিউসার ধরে ছবি করছে। হিরোইন নিয়েছে মুম্বাই-এর বিপাশা বসুকে। ও তো নতুন চেহারা খুঁজছে হিরো করার জন্য। ওদের আড্ডার সবাই বললো—মুম্বাই-এর নামীদামী হিরোইন নিয়েছে আর তার বিপরীতে অচেনা মুখ হিরো?

নিত্য বললো ওই মুখ আর পাবলিক দেখছে না, আর তাই নতুন মুখ, আর উদয়ের মতো কাউকে দেখলে ওরা লুফে নেবে।

উদয় যেন আশার আলো দেখছে। তার বাবা রামনিধির মতে ছেলে বি. এ পাস করেছে গদিতে বসে ব্যবসা-বাণিজ্য দেখুক। কিন্তু উদয় চায় ফিল্মের হিরো হতে। গদিতে বসে দু-নম্বরি ব্যবসা করে তার বাবার মতো টাকা রোজগার করতে সে চায় না। নিত্যর কথায় বলে উদয়—হ্যাঁরে নিত্য, একটা চান্স দেবে আমাকে তোর সেই মিলটনদা?

নিত্য বলে—মিলটনদা আমাকে ব্লাইন্ডের মতো ভালোবাসে।

উদয় তার গাড়িতে করে নিত্যকে সঙ্গে নিয়ে হাজির হয়েছে স্টুডিওতে, উদয় আজ সেজেছে দারুণ। চেহারাটা তার ভালই, মাথায় সেই বাবুই বাসা চুল, পরনে দামী শার্ট—ওদের গাড়িটা স্টুডিওতে ঢুকছে, দেখা যায় কয়েকজন হিরো—তার মধ্যে দু-একজন চেনা মুখ ফ্লোরে শ্যুটিং করতে ঢুকছে। উদয়ের মনে হয় সেও একদিন ওদের মতোই করে স্টুডিওতে ঢুকবে? স্টুডিও-র মাঠের ওদিকে সারিবদ্ধ ঘর, এক-একজন ডিরেক্টারের। ঘরের মধ্যে চেয়ারে আলো করে বসে আছে সেই ভুবন বিখ্যাত পিসতুতো কাকা মিলটন সেন। সামনের কয়েকটা চেয়ারে বেশ কয়েকজন চামচা, ওদিকে বসে একজন মহিলা অভিনেত্রী।

ঘরের দেওয়ালে "মন মাতানো হাসির" একটা বড় প্ল্যাকার্ড।

মিলটন বললো—বসো উদয়। হিরো হবার মতো যোগ্যতা তোমার আছে কিনা দেখতে হবে। যদি সেই যোগ্যতা থাকে—আমিই তোমায় এই "মন মাতানো হাসি" ছবিতে চান্স দেব। অবশ্য মুম্বাই-এর হিরোইনকে ম্যানেজ করে নেব। তবে যোগ্যতা যাচাই করতে হবে তোমার। এর মধ্যে চা-ও এসে গেছে। স্টুডিও ক্যান্টিনের দুধ ছাড়া লিকার চা। ওরা বলে লাল চা, খাও উদয়। কবে তোমার শ্যুটিং ডেট জেনে যাবে।

উদয় বলে—আমাকে কি পরীক্ষা দিতে হবে?

মিলটন বলে—ক্যামেরা টেস্ট, ভয়েস টেস্ট আর একটা ছোট সিন্ অভিনয় করিয়ে টেস্টের কিছু তুলে দেখে নিতে হবে। এসব তো যন্ত্রের ব্যাপার।

মিলটন তার সহযোগীকে বলল—স্টুডিওর একটা ডেট নে। হাফ্ শিফটের কাজ। আবার মিলটন বলে, ওদিকে—তোদের স্টুডিও ভাড়া-ক্যামেরাম্যান-সাউন্ড-আলো-টেকনিসিয়ান এসব মিলিয়ে বেশ কিছু টাকা খরচা পড়বে হে। সেটা প্রায় হাজার পঁচিশেক টাকা।

উদয়ের কাছে টাকাটা কোনও ব্যাপারই না। উদয় বলে ওর জন্য ভাববেন না। পকেট থেকে চেক বই বার করে মিলটনের নামে একটা পঁচিশ হাজার টাকার চেক দিয়ে বলে—কালই ব্যাঙ্ক থেকে তুলে নিতে পারেন।

মিলটন ভাবল যে নিত্য এবার একটা বিশাল মুরগি নিয়ে এসেছে অবশ্য ওর তবে এত দরাজ দিল হবে ভাবেনি।

মিলটন বলল—তাহলে পরশুদিনই তোমার টেস্টের ব্যবস্থা করব।

উদয়কে নিয়ে ফিরছে নিত্য, পরশুদিন ওর টেস্ট করা হবে। নিত্য বলে, দেখবি মায়ের দয়ায় তুই ঠিক পাস করে যাবি। স্ক্রিপটা পড়ে নিবি ভালো করে আর এর মধ্যে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে কয়েকটা পোজ নিয়ে অ্যাক্টিং করবি। একবারে রিয়েল প্রেমিকের মতো করে চাই। ওসব আমি তোকে কালই দেখিয়ে দেব। পাবলিসিটি কেমন হয়। ব্যানারে পোস্টারে ছবি ইয়া বড় করে।

উত্তম কুমারের পর উদয় কুমার। উদয়ও স্বপ্ন দেখছে। নির্দিষ্ট দিনে উদয় বেশ সেজেগুজেই গাড়ি হাকিয়ে এসেছে। অবশ্য তার পরিবারের কাউকে খবরই দেয়নি উদয়।

নিত্যই বলে এখন থেকে একটানা ফিল্মে চান্স পেতে চলেছিস, ছবি শুরু হলে তখন ওরা জানবে। এসব কথা কাউকে বেশি জানাস না।

উদয়ও এতবড় অ্যাডভেঞ্চারের কথা কাউকে বলেনি। মিলটন তার কয়েকজনকে নিয়ে রেডি। দুরু-দুরু বুকে ফ্লোরে ঢুকছে উদয়। মুখে পড়েছে ঝাঁঝালো আলো দু-দিক দিয়ে। ক্যামেরাম্যান যেন তার দিকে বন্দুকের নল তাক করে রয়েছে। মিলটনের গলা শোনা যায়—সাইলেন্স-স্টার্ট সাউন্ড-ক্যামেরা, ক্যামেরা ম্যান জানায়-রোলিং। মিলটন চিৎকার করে—অ্যাকসন। উদয় এবার তার অদৃশ্য প্রেমিকের উদ্দেশ্যে গদগদ ভাষায় সে তার স্ক্রিপ্ট অনুযায়ী ডায়লগ বলে চলেছে। তার কণ্ঠস্বর কাঁপছে-ঘামছে উদয়। হাঁটু দুটোও কাঁপছে। তবু কোনও মতে ডায়লগ শেষ করে। দুপুরে লাঞ্চ ভালোই হয়েছে। ছবির ফিল্ম ওয়াশ করা হচ্ছে পরেই আবার ল্যাবরেটারিতে যাবে টেস্ট করে আসবে। ওদিকে বলির পাঁঠার মতো বসে আছে উদয়। কে জানে কি রির্পোট আসবে। তার ওপরই নির্ভর করছে উদয়ের ভাগ্য।

মিলটন হাসিমুখে ফিরে এসে উদয়কে বলে—দারুণ-দারুণ হয়েছে হে।

নিত্য বলে, কিরে বলেছিলাম না উদয় তুই পারবিই।

মিলটন বলে তোমাকেই হিরো বানাবো, আজ ফাইনাল ডিসাইড করলাম। বোম্বেতে কথা বলে হিরোইনকেও রাজি করিয়েছি। তবে লাখ কয়েক টাকা বেশি নিচ্ছে।

মিলটন বলে, আজই তোমার সঙ্গে কন্টাক্ট করতে চাই। আর শোনো উদয়। নতুন হিরো তুমি, বেশি টাকা দিতে পারব না। এখন সাইনিং পাঁচহাজার রাখো। এরপর থেকে দেব আড়াই হাজার টাকা। উদয়ের টাকার দরকার নেই। তার বাবা গদিতে বসে দু-নম্বরি কারবার করে যা পায় তা কম নয়। উদয় জানে বাবার আলমারিতে দু-নম্বরি করা কত লাখ টাকার বান্ডিল আছে কে জানে? ওসব টাকা দিনের আলোর মুখ দেখেনি। রামনিধির বাক্সে না লক্ষ্মী বন্দি আছে। উদয় বলে—টাকার কথা বলছি না। মিলটন বলে—কাজ করবে তার দাম নিতে পারবে না—তাই কি মানতে হবে—নাও। উদয় মুগ্ধ হয়ে ওঠে মিলটনের কথায়। সই করে এদিকে সহকারী প্রোডাকস্যান ম্যানেজার শুটিং-এর ডেট জানিয়ে দেয়। আর মিলটন বলে তার সহকারী পরিচালককে, শ্যাম, উদয়কে একটা চিত্রনাট্যের কপি দিয়ে দিবি শ্যুটিং-এর আগে। ওর রোলটা আমি বুঝিয়ে দেব।

এর মধ্যে দু-একদিন আউটডোর শ্যুটিংও হয়েছে। একটা বাগানে ওরা গেছে গাড়িতে করে। ক্যামেরা রয়েছে। বড় বড় রিফ্লেকটার থেকে আলো শিল্পীদের মুখে ফেলা হচ্ছে। উদয় আর দু-একজন শিল্পী। দু-জন মহিলা শিল্পীও আছে। এর মধ্যে উদয়ের ছবিও দু-একটা কাগজে ছাপিয়েছে—পাড়ায় গেছে তার হিরো হবার খবর। এরপর হিরোইন আসবে বোম্বে থেকে তার সঙ্গে টানা শ্যুটিং।

সেদিন সন্ধ্যায় ফিরেছে শুটিং থেকে উদয়। নিত্যও এসেছে। নিত্য বলে—খুব বিপদে পড়েছে মিলটনদা। প্রডিউসার যে চেক দিয়েছে সেটা ক্লিয়ার হয়ে আসেনি, আউটস্টেশান চেক। ওদিকে কাল থেকে টানা শ্যুটিং, লাখ সাতেক টাকার জন্য সব আটকে না যায়। বম্বে থেকে হিরোইনও এসে গেছে। টাকা আসতে আরও দিন সাতেক সময় লাগবে। এলেই দাদা টাকাটা দিয়ে দেবে। মিলটনদাও চেষ্টা করছে এদিক থেকে ম্যানেজ করবার। খুব আপসেট দেখলাম মিলটনদাকে।

উদয়ের চোখ ভেসে ওঠে তার বাবার আলমারিতে রাখা সেই ঠাসা টাকার বান্ডিলগুলো। ওগুলো আলমারিতে পড়েই আছে। বাবা টাকা কোথায় রাখে জানে উদয়। উদয়ের ভাগ্যও এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে। হিরোর চান্স দিয়েছে তার মতো একটা সৎ লোক টাকার জন্য বিপদে পড়বে? উদয় মিলটনদাকে বলে টাকাটা যদি আমি দিই হবে? মিলটন ওকে ধরে বলে— উদয় খুব বাঁচালে ভাই। টাকাটা আমি মুম্বাই-র থেকে এলেই দিয়ে দেব, সাত দিনের মধ্যে, উদয় বলে—আমি কালই যাবার সময় টাকাটা নিয়ে যাব।

উদয় তাই রাত্রেই আলমারি থেকে সাতলাখ টাকার বান্ডিল বের করে অ্যাটাচিতে রাখে। আলমারির তাক বেশ খালি হয়ে গেছে। কদিন পর টাকা পেলে আলমারিতে রেখে দেব। বাবা জানতেও পারবে না। মিলটনদা টাকাটা পেয়ে খুশি। বলে—আজ অন্য সিনগুলো শ্যুট করবো, সন্ধ্যার প্লেনে হিরোইন আসছে, কাল থেকে ওর সঙ্গে টানা শ্যুটিং। তারপর দিন আর শ্যুটিং হয় না। ওদিকে তার স্টুডিওটার অফিসেও তালা পড়েছে। মিলটনদারও আর দেখা নেই। এর মধ্যে প্রোডাকসানের লোকজনরাও হাজির হয়েছে। তাদের কাজের বকেয়া টাকাও বাকি। মিলটন ঠকিয়েছে। উদয় বলে আমাদের নিয়ে যে শ্যুটিং করল। ক্যামেরাম্যান বলে— ছাই করেছে। ক্যামেরাই চলেছে তাতে রিলও ছিল না। ওসব ওর ছবির নতুন হিরো, তোমার কাছে কত টাকা ঝেড়েছে? চুপ করে থাকে উদয়। উদয়ের বাবা আলমারির তাক খালি দেখে ধরে উদয়কে। রামনিধিও শুনেছে উদয়ের হিরো হবার কাহিনী। বাবা বলে—আমি লোকের থেকে দু-নম্বরি করে কামাচ্ছি ও ব্যাটা আমার চেয়েও বড় দু-নম্বরি রে, তাই চোরের উপর বাটপারি করে গেছে। এবার তাই হিরো সাজার সখ ছেড়ে দিয়ে গদিতে বসে ব্যবসা দেখ। আর হিরো হয়ে কাজ নেই।

রমণ ডাক্তারের মুষ্টিযোগ

দৈ গাঁয়ের রমণ ডাক্তারের কথা এর আগেও দু'একবার বলেছি। একেবারে পল্লী অঞ্চল। লাল মাটি, শালবনের দেশ। অবশ্য শালবন এখন আর নেই। এখন সেখানে ইউক্যালিপটাস জঙ্গল। পাঁচ ছয় বছরেই ওই সব গাছ ভাল দামে বিক্রি হয়। গ্রামগুলোতে স্বাধীনতার পর দু'একটা প্রাইমারি স্কুল হয়েছে। পঞ্চায়েতের বাবুদের দয়ায় কোথাও কিছু পথঘাটও হয়েছে। রাজনীতির মারপ্যাঁচ দলবাজি-মারপিট এসবও বেড়েছে। মায় মাঝে মাঝে দু'একটা খুনের ঘটনাও ঘটে। লোকদের হাতে, অন্তত পঞ্চায়েতের নেতাদের-গ্রামীণ সমাজের রূপটাও বদলেছে। কিছু মানুষের সদর্থক পদচারণাও চলে এখন গ্রাম-সমাজে।

আর একটা জিনিস প্রায় মুছেই গেছে। সেটা হল গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্র। দু'একটা তৈরি হয়েছিল এই অঞ্চলে। জগন্নাথপুরের স্বাস্থ্যকেন্দ্র তো ছিল বেশ বড়সড়—ওখানে কিছু রোগীও থাকতে পারত, আহার ওষুধ পেত। দুজন এমবিবিএস ডাক্তারও ছিলেন। দূর এই পল্লী অঞ্চলের মানুষ তবু চিকিৎসা কিছু পেত। গ্রামের বাইরে অনেকটা জায়গা নিয়ে এই স্বাস্থ্যকেন্দ্র গড়ে উঠেছিল।

দৈগাঁয়ের পাশেই জগন্নাথপুর। দৈগাঁ বা দইগ্রাম এই অঞ্চলের মধ্যে বেশ বড় আর সমৃদ্ধ গ্রাম। এই গাঁয়ে উচ্চমাধ্যমিক স্কুল রয়েছে। মায় এখানে রয়ে গেছে বেশ কয়েকজন হাতুড়ে ডাক্তার। আর একজন কবিরাজও আছে। ওই ডাক্তাররা অবশ্য তেমন ডিগ্রিধারী নয়। এরা এলোপ্যাথি-হোমিওপ্যাথি-কবিরাজি সব ধারাতেই চিকিৎসা করে রোগীকে সারিয়ে তোলে। ওদের দিনকাল ভালোই চলছিল। কারণ ওই ছড়ানো ছিটানো গ্রামে ডাক্তার বলতে তারাই। স্বাস্থ্যকেন্দ্র হবার আগে তাদের রোজগার ভাল ছিল। তবে স্বাস্থ্যকেন্দ্র হবার পর তারা মুষড়ে পড়ে।

রমণ ডাক্তার তখন এখানে নতুন এসেছে। তরুণ একটি ছেলে। সে নাকি একজন সিভিল সার্জেনের সহকর্মীই ছিল। তার আগে শহরের কোনও নামী ডাক্তারের কাছে ছিল। সেখানে অনেক মেজর অপারেশন করেছে। রমণ ডাক্তারের বরাতজোরেই পাঁচ ছ বছরের পর রাজ্যে এল নতুন শাসক দল। এবার নাকি পঞ্চায়েতের দিন বদলাবে। গাঁয়ের নিতাইবাবু বলেন,—এ তোমাদের বন্ধু সরকার হে—

অবশ্য দেখা গেল, বছর খানেক ঘুরতে না ঘুরতেই ওই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের দরজা বন্ধ হয়ে গেল। লোকজন, ডাক্তারও চলে গেল কোথায়। ওষুধ নেই-পথ্য নেই-ডাক্তার নেই। পরে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের দরজা-জানলাও কারা খুলে নিয়ে চলে গেল, আর গ্রামের বাইরে সেই স্বাস্থ্যকেন্দ্র এখন রাতের অন্ধকারে চোলাই মদের ডেরাতে পরিণত হয়েছে। স্বাস্থ্যকেন্দ্র চলে যায় সমাজবিরোধীদের দখলে। উঠানে হাঁটু অবধি ঘাস গজিয়েছে।

ফলে রমণ ডাক্তারদেরই সুবিধা হয়েছে। দেশের মানুষের রোগব্যাধি তো থাকবেই। তখন আসত স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। এখন বাধ্য হয়ে আসে এইসব ডাক্তারদের কাছে। দৈ গাঁয়ের বামুন পাড়ার একটা দোতলা ঘর ভাড়া করে রয়েছে রমণ। আর ওই বাড়ির রকে একটা বেদি বানিয়ে তার উপর শতরঞ্চি পেতে বসে রমণ ডাক্তার। পাশে দুটো ওষুধের বাক্স। একটাতে এ্যালোপাথি ওষুধ, ইঞ্জেকশনের সিরিজ ইত্যাদি। আর অন্যটাতে ছোট ছোট শিশির সার। ওই স্বাস্থ্যকেন্দ্র উঠে যেতে রমণ ডাক্তার বলে, আরে যেখানে দুর্নীতি ঢোকে, সেখানে আর কিছুই থাকবে না। তাই দেখলাম এসব লোকের সর্বনাশ করার খেলাও শেষ হবে। হলও তাই। ঈশ্বর যা করেন তা মঙ্গলের জন্য হে। ওখানে কি চিকিৎসা হত?

ডাক্তারদের পকেটেই ভরনো হত। তাদের দলকে এইসা ডোজ দেওয়া হল বলে এইসা ডোজ দেওয়া হল যে স্বাস্থ্যকেন্দ্রই সরে গেল। আরে বাবু আমার দাওয়াইতে হয় সারবে না হয় সরে যাবে।

স্বাস্থ্যকেন্দ্র উঠে গেছে নাকি রমণের একডোজে। যে কারণেই হোক ওইসব হাতুড়ে ডাক্তার—কবিরাজদের ভালই হয়েছে। ওদের মধ্যে রমণের পসারই সব থেকে ভাল অবশ্য রমণের জনসংযোগটা খুবই ভাল। গ্রামে কলে গেলে সে আরও অনেকের সঙ্গে দেখা করে। উপপ্রধানের ওখানে গিয়ে তাঁর স্ত্রীর ব্লাডপ্রেসার দেখে। দু'এক ডোজ হোমিওপ্যাথি ওষুধ দিয়ে তাঁর বাড়িতে পান ভোজনও সেরে আসে।

হাটবারের দিন হাটতলায় গুপীর দোকান থেকে চেয়ার-টেবিল-টুল নিয়ে বটগাছের নিচে বসে যায়। আর গুপী দেখে ভিজিট—ওষুধের দাম নিয়ে দরদস্তুর নেই, যে যা দেয় তাতেই খুশি। সপ্তাহের আনাজপত্র জুটিয়ে আনে রোগীদের কাছ থেকে তাও কম নয়। ফলে তার পসারই বেশি এই অঞ্চলে।

এবার হঠাৎ কেমন একটা কালো মেঘ দেখা যায় দৈগাঁয়ের মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের সভ্যদের আকাশে। রমণ ভাবনায় পড়েছে। এতদিন ফাঁকা মাঠে খেলেছে এইসব ডাক্তার সাজা মানুষগুলো। কিছু হয়নি, তবু ইঞ্জেকশন দিয়ে, ওষুধ দিয়ে টাকা নিয়েছে। এবার এখানে সত্যিকার এমবিবিএস এক নতুন ডাক্তারের আগমন হয়েছে।

ভট্টাচার্য পাড়ার পরেশ ভট্টাচার্য বেশ নামী-দামী লোক। গ্রামের স্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন। সবে রিটায়ার করেছেন। আর পঞ্চায়েতেরও প্রেসিডেন্ট। সেই পরেশ ভট্টাচার্যের বড় ছেলে নরেশ এবার বাঁকুড়া মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস পাস করে গ্রামে এসেছে। পরেশবাবুর অবস্থাও ভাল। জমি জায়গা—পুকুর, বাগান সবই আছে। তার আয়ও কম নয়। এবার রিটায়ার করে পরেশবাবু গ্রামের সম্পত্তি দেখাশোনা করছেন। তাঁর মনে হয় নরেশ গ্রামে থেকে ডাক্তারি করুক। আর সেই সঙ্গে তাঁর এতবড় স্টেটের কাজও দেখাশোনা করুক। তাতে সব দিকই বজায় থাকবে। তাঁর যা টাকা আছে তাও কম নয়। নরেশ রোজগার না করে জনসেবা করলে আরও সুবিধা হবে পরেশবাবুর। জীবনের এতদিনের আশা, এম এল এ হবার জন্য ভোটে দাঁড়াবে। ছেলে বিনা পয়সায় জনসেবা করলে তারও এলাকায় সুনাম বাড়বে। তাঁর এমএল এ হওয়া কেউ আটকাতে পারবে না।

তাই পরেশ ভট্টাচার্য সেদিন তাঁর ছেলেকে বলেন, এই গাঁয়ে এই অঞ্চলে তোর জন্ম। এখানের মানুষ ঠিকমতো চিকিৎসা পায় না। তুই ডাক্তার হয়ে এদের সেবা করবি, এই আমি চাই। দেশের মানুষের সেবা কর।

নরেশও তাই বাবার কথা মতো গ্রামেই রয়েছে। এখানেই চেম্বার করে গাঁয়ের মানুষের চিকিৎসা শুরু করেছে।

এতদিন শহরে থেকেছে নরেশ। দেখেছে সে জীবনযাত্রার মান। সেখানে ডাক্তারের চেম্বারে ভিজিট পঞ্চাশ টাকা। কারও বা একশো টাকা। আর একটু নামডাক হলে রোগীর অভাব হয় না। মাসে অন্তত পনেরো-বিশ হাজার টাকা আসবেই।

কিন্তু গ্রামে ব্যাপারটা সম্পূর্ণ আলাদা। চেম্বারে রোগী এলে ভিজিট নেই। যা পাও ওষুধের দামে তুলে নাও। আর বাইরে গ্রামে তেমন কলও হয় না। সপ্তাহে পাঁচ-ছটা বড়জোর। আর সেখানে রোগীর বাড়িতে পঞ্চাশ টাকা দিতে মরাকান্না শুরু করে। তবু পাস করা ডাক্তার, তাই পয়সা বেশি লাগে। ফলে তার চেম্বারেই আসতে শুরু করে রোগীদের ভিড়। নরেশ অনেক বেলা অবধি রোগী দেখে। কম্পাউন্ডার হরিপদও এখন রোগীদের মোচড় মেরে ডাক্তারবাবুর চেয়ে বেশি রোজগারই করে।

ওদিকে এবার ব্যাপারটা দেখে রমণ ডাক্তার শশী ডাক্তার মায় নবীন কবিরাজও বিপদে পড়ে। রমণ খবর পায় তার বহু রোগীই এখন নিয়মিত নরেশ ডাক্তারের ওখানে যাচ্ছে। গাঁয়ের গবু মল্লিকের মায়ের নানা ব্যাধি। কাল অবধি ও ছিল রমণ ডাক্তারের বাঁধা খদ্দের। তার দাওয়ায় রোগী বসার জায়গা থাকত না। এখন দু'পাঁচজন যাদের কোনও সাধ্যই নেই—তারাই আসে মাত্র রমণের কাছে।

সেদিন শশী ডাক্তার, সেও অবশ্য বাঁকুড়ে, আর কবিরাজিও করে। সেই বলে

—রমণ একটা কিছু করো। না হলে ডাক্তারি ছেড়েই দিতে হবে। সব রুগী যাচ্ছে ওই কালকের ছোকরার কাছে। আমরা কি ডাক্তারি জানি না?

রমণ ভাবছে এবার কথাটা। তার চ্যালাকেও হাত করেছে। রমণ গজগজ করে,

—রোগীরাও বেইমান! এতদিনের সম্বন্ধ, তা আর রাখল না। দৌড়ালো ওই চ্যাংড়া ছোড়ার দিকে।

—তাই বলছি তোমার দাওয়াই, টোটকা কিছু করো। না হলে আর বাঁচা যাবে না। এমন সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্র উঠে গেল—এই ছোকড়া তো নস্যি হে।

রমণও ভাবছে কথাটা। এই এলাকার বিভিন্ন গ্রামের দু'চারজন মৃত্যুপথযাত্রী রোগীদের খবর সে রাখে। তারই পরিচিত নশীগঞ্জের রাখাল ঘোষের মা। মহিলা নানা ব্যাধিতে ভুগছে। বাঁচার কোনও আশা নেই।

সেদিন রাখালই আসে রমণের কাছে। বলে সে,—একটা কিছু করো ডাক্তার। মায়ের রোগ তো সারছে না।

রমণও যেন একটা সুযোগ পায়। সে জানে বুড়ি আর সুস্থ হবে না। দু-একদিনের মধ্যেই সরবে দুনিয়া থেকে। তাই মরণ ওই মৃত্যুটাকে নিয়েই এবার বেসাতি করতে চায়। বলে সে,

—রাখালবাবু, আমাদের বিদ্যা তো সামান্য! এতদিন ধরে চেষ্টাও করলাম। তেমন কিছু হল না। ওই যে নতুন নরেশ ডাক্তার এসেছে, উনি খুব নামী ডাক্তার। সাক্ষাৎ ধন্বন্তরী। আপনি বরং ওকেই নিয়ে মাকে দেখান। উনি সারিয়ে তুলতে পারেন।

রাখালও সেই মতো গেছে নরেশের কাছে। দৈগাঁয়ের মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের সভ্যরা এই অঞ্চলের অনেকেই শোনে রমণ ডাক্তারই বলেছেন রাখাল ওখানে চিকিৎসার জন্য। সকলে এই নতুন ডাক্তারের গুণের কথা জানার জন্য উৎসুক।

ডা. নরেশ ভট্টাচার্যও এসে দেখে রোগীর অবস্থা মোটেই ভাল নয়। তবু ইঞ্জেকশন দিতে হয়। আর ইঞ্জেকশন দেবার ঘন্টাখানেক পরই এতদিনের অসুস্থ সেই মহিলা মারা যায়।

খবরটা এবার বিদ্যুৎ গতিতে ছড়িয়ে পড়ে। অনেকেই বলে পরেশের ব্যাটা আর কেমন হবে। ব্যাটা টুকে ডাক্তারি পাস করেছে।

শশী ডাক্তার তো হাটতলায় গুপীর চায়ের দোকানে বাঁশের মাচায় বসে বলে,

– গোবদ্যি হে! ডাক্তার নয়– গোবদ্যি! মানুষ মারা ডাক্তার!

রমণ নীরবে হাসে মাত্র। তার ডাক্তারি এবার শুরু হয়েছে নরেশের উপর। আর দাওয়াই যাতে বৃথা না যায় সেই চেষ্টাই করবে রমণ। নরেশকে এক ঘা দিতে পেরেছে। আরও দু'একটা ঘা ঠিকমতো দিতে পারলে নরেশ বিধ্বস্ত হয়ে এখান থেকে পালাবে, আর এই অঞ্চল রমণদের মতো হাতুড়ে মার্কা ডাক্তারদের কাছে মুক্তাঞ্চল হয়ে উঠবে।

নরেশও ভাবতে পারেনি যে, ওই মৃত্যুপথযাত্রী রুগী মারার জন্য খেসারত দিতে হবে তাঁকে। হাটতলায় জটলায় তাঁকে নিয়ে যে সমালোচনা হচ্ছে, নরেশও অবাক হয়। তার চেম্বারে ইদানীং রোগীও কমে আসছে। গ্রামের মধ্যে আধুনিক বড়লোকরাই তাঁর কাছে আসত। নরেশ একটু ঘাবড়ে গেছে।

নরেশের বাবা পরেশ ভট্টাচার্য এতদিন তাঁর বাড়িতে চিকিৎসার ভার দিয়েছিলেন রমণের উপরই। নিজেও টুকটাক চিকিৎসা করাতেন তার কাছে। তবে নরেশ ডাক্তারি পাস করে এখানে চেম্বার করার পরে আর পরেশবাবু রমণের ওষুধও খান না।

হঠাৎ পরেশবাবু অসুস্থ হয়ে পড়েন। নানা জটিল ব্যাধি তাঁকে আষ্ঠে পিষ্ঠে জড়িয়ে ধরে। গ্রামের লোকও খবর পেয়ে তাঁকে দেখতে আসে। নরেশও এবার বাবার চিকিৎসা করছে নিজে। দরকার হলে শহরের বন্ধু ডাক্তারদেরও আনছে বাড়িতে। রমণের কাছে সব খবরই যায়। রমণ চুপচাপ শোনে মাত্র।

পরেশবাবুর অসুখ কিন্তু এতটুকু কমেনি। বরং বেড়েই চলেছে। গ্রামের লোকজনও ভিড় করে। রমণও আসে। বলে সে,

—আরে, নরেশ বাবাজির মতো ডাক্তার বাবার চিকিৎসা করছে ভয় নেই, পরেশদা ভাল হয়ে উঠবেন। ভেবো না—

কিন্তু পরেশবাবু আর ভাল হন না। দিন কয়েক পর পরেশবাবু মারা যান। গ্রামের লোকও এসে পড়ে। খরচা করে তাঁকে দাহ করা হল। শ্রাদ্ধানুষ্ঠানও করল নরেশ বাবার কাজকর্ম চুকে যাবার পর চেম্বারে বসে। আর আবিষ্কার করে রোগীরা যেন কর্পূরের মতো উবে গেছে। হাটতলায় রতনেশ্বর মন্দিরের ওখানে শোনে নরেশ, লোকজন আলোচনা করছে তাঁকে নিয়েই। ওরা বলে,

—সত্যি গোবদ্যি হয়ে—রোগীকে না মেরে ও ছাড়বে।

কে বলে—ডাক্তার নয়—খুনে। কী জানে ডাক্তারির? রমণ ডাক্তারকে দ্যাখো, রোগীকে চাঙ্গা করে তুলবেই। আর ও প্যান্টালুন পরা ডাক্তার কিনা মানুষ মারার কল!

নরেশও বাবার মৃত্যুর পর নিজেকেই অপরাধী মনে করে। নিজের হাতে বাবার চিকিৎসার ভার না নিলেই ভাল করত। এইসব চরম অপবাদ শুনতে হতো না। তাছাড়া ওরা অনেকেই ওকে বলে বাবার হত্যাকারী।

—অবশ্য এসব প্রচারে রমণ ডাক্তারের জনসংযোগও অনেক বড় ভূমিকা নিয়েছে।

এর কিছুদিন পরই নরেশ এখানের পাট চুকিয়ে দিয়ে চলে গেল শহরে। কোনও এক হাসপাতালে চাকরি নিয়ে।

দৈগাঁয়ে আবার শান্তি ফিরে এসেছে। রমণ ডাক্তারই নয়—অন্যসব হাতুড়েরাই আবার আগেকার মতো এখানে চিকিৎসার নামে প্রহসন চালাচ্ছে।

সরকারের স্বাস্থ্যব্যবস্থা যত ধ্বংস হবে, রমণের মতো কৌশলী হাতুড়েরাই বাড়বাড়ন্ত ততই থাকবে। অবশ্য শশী বলে,

—তাহলে তোমার ওষুধ ধরেছে রমণ! নরেশ ভোঁ কাট্টা!

রমণ বলে—আমার মুষ্টিযোগ কখনও ব্যর্থ হবে না শশীদা।

জ্বালা

বিক্রম সাধারণ ঘরের ছেলে। বাবা একটা করাখানায় কাজ করেন। বাড়িতে বিক্রমের বাবা-মা-ছোট বোন চন্দ্রা আর ছোট ভাই রবি। কলোনিতে একটা ছোট্ট বাড়ি। অভাব তো নিত্যসঙ্গী, তবু বাড়িতে শান্তির অভাব নেই।

বিশ্বনাথ সৎ নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মন, নিত্য পূজা করে কারখানার কাজে যান। বিক্রমকে তবু তিনি মানুষ করতে চান। সেজন্য এত অভাব সত্ত্বেও তাকে কলেজে পড়ান। বিক্রম কলেজের কৃতি ছাত্র। খেলাধূলা—পড়াশোনাতে তার সুনাম রয়েছে। পাড়ার অবসরপ্রাপ্ত স্কুলশিক্ষক সত্যবাবুর ছেলে অজয়ও কলেজে পড়ে। বিক্রমের বন্ধু সে। বিক্রম প্রতিবাদী চরিত্রের তরুণ।

ওদের কলেজে পড়ে সন্ধ্যা, বড়লোকের মেয়ে। গাড়িতে করে কলেজে আসে। মন্টুও গাড়ি হাঁকিয়ে কলেজে আসে। মস্তানি করে। সন্ধ্যার দিকেও হাত বাড়াতে চায়। কলেজের সব ব্যাপারে সর্দারি করে। তাই নিয়ে বিক্রমদের সঙ্গে তার বচসা। হাতাহাতিও হয়। বিক্রমকেই সকলে সমর্থন করে। সন্ধ্যাকেও বিক্রমই মন্টুর হাত থেকে বাঁচায় একদিন। ফলে সন্ধ্যা বড়লোকের ঘরের সুন্দরী মেয়ে হয়েও বিক্রমের মতো অতি সাধারণ প্রতিবাদী চরিত্রের ছেলের প্রতি আকৃষ্ট হয়।

মন্টুও চটে ওঠে বিক্রমের উপর। কিন্তু বিক্রমকে সে বহু চেষ্টা করেও প্রত্যাঘাত করতে পারে না। কলেজের বাৎসরিক অনুষ্ঠানেও মন্টুর অনুষ্ঠান হবে। মন্টুর দলবলও তার গান-নাচের সময় তুমুল হাততালি দিয়ে উৎসাহিত করে। কিন্তু দেখা যায়, তার অনুষ্ঠানকে ছাপিয়ে যায় বিক্রমের অনুষ্ঠান। বিক্রম এবারও জয়ী হয়। রাগে-অপমানে ফেটে পড়ে মন্টু। আর রাগটা বেড়ে যায় সন্ধ্যাও নিভৃতে বিক্রমের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশছে দেখে।

বিশ্বনাথবাবুর কারখানার মালিক কিশোরবাবু সামান্য অবস্থা থেকে বড় হয়েছেন। এখন সে এই অঞ্চলের নেতা আর কারখানার মালিক। তাই শ্রমিক দরদী নেতা কিশোরবাবু তার কারখানার শ্রমিকদের নানাভাবে বঞ্চিত করেন। শ্রমিকরা তার প্রতিবাদ করে। আর বিশ্বনাথই তাদের জনপ্রিয় নেতা। তার নেতৃত্বে বিদ্রোহী শ্রমিকরা ধর্মঘট করেছে আর কিশোরবাবুর কুকর্মের সহকারী হয়ে কেষ্টই এবার ওই বিশ্বনাথকে প্রচণ্ড প্রহার করে। ধর্মঘট ভেঙে দেয়। আহত ব্যর্থ বিশ্বনাথবাবু বাড়ি ফেরেন কোনওমতে।

ওদিকে বিক্রম-সন্ধ্যার পরিচয় ক্রমশ ভালোবাসায় রূপান্তরিত হয়েছে। বড়লোকের আদুরে একমাত্র মেয়ে সন্ধ্যা। কিন্তু সে দেখেছে ছেলেবেলায় তার বাবা তখনও ধনী নেতা হয়নি, সেই সময়ের ওই লোকটার অনেক কুকীর্তি-অন্যায়ও। কিশোরের একমাত্র স্বপ্ন-তাকে বড় নেতা হতে হবে। বড়লোক হতে হবে। তাই অনেক অকাজ-কুকাজই সে করত। তখন সন্ধ্যা ছোট। দেখত তার মা, বাবার এসব অন্যায়ের প্রতিবাদ করতো। তাই নিয়ে অশান্তি হত। কিশোরও পদে পদে বাধা পেয়ে স্ত্রীর উপর চটে যেত। ওই-ই যেন কিশোরের পায়ের কাঁটা। পুলিশকেও জানাবে তার কথা। তাই কিশোর পথের কাঁটা সরাবার জন্য স্ত্রীকেও হত্যা করে আত্মহত্যা বলে চালিয়েছিল। কিন্তু ছোট সন্ধ্যা সেটা দেখেছিল। তার শিশুমনে তখন থেকেই বাবার সম্বন্ধে একটা নীরব ঘৃণা ছিল।

কিন্তু তবু এ বাড়িতেই রয়েছে সন্ধ্যা। কিশোর এখন বড় নেতা। তবু বিয়ে করেনি। আলাদা বাগান বাড়ি করেছে। বাড়িতে সে সন্ধ্যাকে নিয়েই থাকে। বাইরে থেকে বাবা-মেয়ের সম্পর্কটা লোকে স্বাভাবিকই দেখে। কিশোরও খবর পেয়েছে সন্ধ্যা এখন কলেজে একটি ছেলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা শুরু

করেছে। অবশ্য কিশোরবাবু খবরটা পায় মন্টুর কাছ থেকেই। মন্টুর বাবাও ব্যবসায়ী। কিশোরবাবুর পরিচিত।

সন্ধ্যাকে কিশোরবাবু স্নেহ করেন। আজ তার টাকার অভাব নেই। প্রতিষ্ঠাও সমাজে। তাই একমাত্র মেয়ের মনে আঘাত দিতে চান না। সন্ধ্যাও এটা জেনে খুশি হয়। তার প্রেমপর্ব আরও ঘনিষ্ঠ হয় বিক্রমের সঙ্গে। দুজনে রঙিন স্বপ্নও দেখে।

এমনি দিনে বিক্রম বাড়ি ফিরে দেখে তার আহত বাবাকে। তাকে মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে কারখানার মালিক। প্রতিবাদী বিক্রম বাবার উপর এই অত্যাচারে চটে ওঠে।

বিক্রম এসেছে কিশোরের অফিসে। আর তার বাবাকে এইভাবে মারার জন্য কঠিনভাবে প্রতিবাদ জানিয়ে ওদের ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করে। কিশোরবাবুও অপমানিত বোধ করেন ওই তেজস্বী ছেলেটার সামনে।

বিশ্বনাথবাবু বিব্রত বোধ করে, কিন্তু মেনে নেয়। চাকরি ছেড়ে বিশ্বনাথ এবার পুজা-যজমানিই শুরু করে। অজয়, তার বাবা সত্যবাবুরাও খুশি হয়।

সন্ধ্যার বিয়ে দিয়ে এবার কিশোর দায়মুক্ত হতে চায়। সন্ধ্যাও তার ভালোলাগা ছেলেটার কথা বলে। কিশোরবাবু বলেন, তাকে আন। আলাপ করি। তারপর যদি শুভকাজটা হয়ে যায় আমিও নিশ্চিন্ত হবো।

সেইমতো সন্ধ্যা বিক্রমকে তার বাবার কাছে আনতে চায়। বিক্রম প্রথমে ঘাবড়ে যায় ওইভাবে পরীক্ষা দিতে। শেষে সন্ধ্যার কথায় তার বাবার সঙ্গে দেখা করতে আসে অনেক আশা নিয়ে। সন্ধ্যার মনেও বিচিত্র স্বপ্ন। কিন্তু কিশোরবাবু বিক্রমকে দেখে চমকে ওঠে। বিক্রমও। এই সেই লোভী অত্যাচারী মালিক। আর কিশোরও দেখে এই সেই ছেলেটা, যে তাকে অফিসে ঢুকে অপমান করেছিল। তাই সেই অপমানের জবাবই দিতে চায় কিশোর। সেও দারোয়ান দিয়ে তাড়িয়ে দেয় বিক্রমকে। আর সন্ধ্যাকেও সাবধান করে, যেন বিক্রমের সঙ্গে মেলামেশা না করে। মন্টুও এতে ইন্ধন জোগায়। কারণ সেও সন্ধ্যাকে হাতে আনতে চায়। কিশোর বিক্রমকে উচিত শিক্ষাই দেবে এবার।

সেই রাতেই পুলিশ হানা দেয় বিক্রমের বাড়িতে। তারা বিক্রমকে একটা খুনের দায়েই অ্যারেস্ট করে আনে। আর কিশোরবাবুর কথা মতো দারোগাও নিপুণভাবে কেস সাজিয়ে নির্দোষ বিক্রমকে খুনের আসামি করে কাঠগোড়ায় দাঁড় করায়।

সন্ধ্যাও অসহায়। সেও বাবার এই জঘন্য কাজের প্রতিবাদ করে। বিক্রমকে সেও বাঁচাবার চেষ্টা করে। কিন্তু পারে না। বিক্রমের বাবা ধর্মগুরু লোক। গরিব। ওর মা, ভাই, বোন চন্দ্রাও বিশ্বাস করে না যে তার দাদা এসব করেছে। চন্দ্রাও এর মধ্যে অজয় মারফত সন্ধ্যার সঙ্গে পরিচিত হয়েছে। সে দেখে সন্ধ্যাও দাদাকে সত্যিই ভালোবাসে। কিন্তু বিক্রমকে জেলেই পাঠাল কিশোরবাবু তার মেয়ের ভালোবাসার অপরাধে।

বিক্রমও বুঝেছে সে বড়লোকেদের চক্রান্তের শিকার হয়েই জেলে যেতে বাধ্য হল।

সন্ধ্যা এটাকে মেনে নিতে পারে না। তার বাবার ওপর ছেলেবেলা থেকেই সেই রাগটা ছিল। আর সন্ধ্যা জানে তার বাবা খুনি। আজ সেই লোকটার জন্যই সন্ধ্যার প্রেম ব্যর্থ হয়ে গেল। নির্দোষ বিক্রমকে জেলে যেতে হল। সে আজ বাবার ওপর রাগে ফেটে পড়ে। আর এই নোংরা লোকটার সঙ্গে কোনও সম্পর্ক রাখবে না বলেই চলে যায় এই বাড়ি ছেড়ে তার এক বান্ধবী ইলার ফ্ল্যাটে।

কিশোর এখন ভোগবিলাসের রাজ্যে ডুবে আছে। তার চাই আরও টাকা-প্রতিষ্ঠা। তার কাছে মেয়েও তুচ্ছ। স্ত্রীকেও মেরেছে। মেয়ে সরে যেতে কিশোর যেন বন্ধনমুক্ত হয়ে ওঠে। তার নিত্যনতুন মেয়ের অভাব হয় না বাগান বাড়িতে। সেখানে তার জন্য মেয়ে জোগান দেবার লোকেরও অভাব নেই।

বিক্রম জেলে। নিজের মনেই গ্লানি-হতাশা আসে তার। জেলে তার পরিচয় হয় কলকাতা কেন ভারতের অন্যতম নামী স্মাগলার আলি সাহেবের সঙ্গে। জেলে সে রয়েছে সম্রাটের মতো দাপটে।

সেই-ই তরুণ বিক্রমের জীবনের কাহিনী শুনে তার জন্য কিছু করতে চায়। বলে, —কিছু না করে খুনি আসামি যারা সাজাল, তাদের জবাব দিতে হবে। তারজন্য তালিম আমি দেব। তাগদও পাবে বাবুজি, মদতও। ওরা মানুষের দুষমন, তাদের শেষ করতে হবে।

বিক্রমও তাই চায়। সেও কথা দেয় জেল থেকে ছাড়া পেলে সাহেবের সঙ্গে যোগাযোগ করবে। আলিও ওকে তালিম দেয় জেলের মধ্যে। সে বের হবার আগেই বিক্রমকে তৈরি করে দিয়ে যাবে। কাজ এগিয়ে রাখবে। সন্ধ্যা এখন ইলার ওখানে। বাবার সঙ্গে তার কোনও যোগাযোগ নেই। চাকরির সন্ধানে ঘুরছে একটা অফিসে। সেই মালিকের ইশারায় তার লোকজন কৌশলে তুলে নিয়ে যায় সন্ধ্যাকে এক বাগানবাড়িতে। বেশ বুঝেছে, ওই মালিক অর্ডার পাবার জন্য তাকে অন্য কারো ভোগে লাগাতে চায়। সন্ধ্যা অবাক হয়। সেই লোকটি আর কেউ নয় তার বাবা কিশোরবাবু।

আজ সন্ধ্যাকে এখানে দেখে কিশোরও চমকে ওঠে। সন্ধ্যার মনে জমে বাবার সম্বন্ধে আরও ঘৃণা। বাবাকে অপমান করেই বের হয়ে আসে সন্ধ্যা।

ইলাও সব শুনে চমকে ওঠে। সন্ধ্যার মনে পড়ে বিক্রমের কথা। তার সঙ্গে কত অভিসার। তাদের মধুর মিলনের স্মৃতি। আর সেই সঙ্গে আবিষ্কার করে সন্ধ্যা যে সে বিক্রমের সন্তানের মা হতে চলেছে। ইলাও খুশি হয়ে সন্ধ্যাকে বলে, দেখবি, তোর ছেলেই তোর দুঃখ- অপমান সব মুছে দেবে। তাকে মানুষ করবি তুই। ভয় কি। আমি তো আছি।

সন্ধ্যা এত দুঃখের মধ্যে মা হবার স্বপ্ন দেখে। মনটা কী আশ্বাসে ভরে ওঠে। তার একটি পুত্র সন্তান হয়। সন্ধ্যা-ইলার স্নেহে সে বড় হতে থাকে।

ইলা একজন নামকরা ক্যাবারে নাচিয়ে। নামীদামী হোটেলে নাচে গায়। সন্ধ্যা বলে, আমাকেও তালিম দাও ইলাদি। আমিও নাচব-গাইব। কলেজে তো দারুণ নাচতাম। আমার ছেলেকে ভালো বোর্ডিং-এ রেখে পড়াব। টাকা তো চাই। বাবার পাপের টাকায় আমার দরকার নেই।

ইলা বুঝেছে সন্ধ্যার সমস্যা। তাই সেও এবার তালিম দেয় সন্ধ্যাকে। সন্ধ্যাও নিপুণ ক্যাবারে ড্যান্সার হয়ে ওঠে। রোজগারও করছে।

বিক্রম জেল থেকে ছাড়া পায়। এবার বাড়িতে আসে সে। এখন ছোট ভাই রবিও চাকরি করছে। চন্দ্রাও। বিশ্বনাথবাবু বাড়িতে মন্দির করে মহাধার্মিক সেজে রোজগার করেছেন। বিক্রমকে দেখে তারা চমকে ওঠে। চন্দ্রা বাড়িতে ছিল না। রবি-বিশ্বনাথ এখন বদলে গেছে। বাড়িও করছে। সমাজে তাদের সুনাম হয়েছে। বিশ্বনাথ পরম ধর্মপরায়ণ তারা জেনেশুনে আসামি-খুনি বিক্রমকে এ বাড়িতে থাকতে দিয়ে তাদের সুনাম হারাতে চায় না। মা কিন্তু ছেলেকে বুকে টেনে নিতে চায়। কিন্তু বিশ্বনাথ, রবি কঠিন প্রতিবাদ করে। বিক্রম বুঝেছে সমাজে তার ঠাঁই নেই। ওই কিশোরবাবু তাকে অন্ধকারের জগতেই নির্বাসন দিয়েছে। বিক্রম হতাশ হয়ে বের হয়ে আসে।

তবু খোঁজ করতে আসে সন্ধ্যার। কিন্তু কিশোরের লোকজন তাকে দূর করে দেয়। সন্ধ্যার খবরও দেয় না।

আজ সব হারিয়ে বিক্রম আসে আলির কাছে। আসি সব শুনে বলে,—দাগী আসামিকে কেউ ঠাঁই দেয় না বাবুজি। ঠাঁই তোমাকে করে নিতে হবে। লড়ে যাও। আমি পাশে আছি।

এবার যেন নতুন বিক্রমের জন্ম হল। সে এবার বড় বড় অ্যাকশন করে অনায়াসে। আর এবার অন্য মাফিয়া দলের বহু লাখ টাকার মালও চোট করে।

কিশোরবাবু এখন তার বিশ্বস্ত লোক হরেকেষ্ট-বাবুদের নিয়ে মন্টুর নেতৃত্বে এখন সেনা-অস্ত্রশস্ত্র-ব্রাউন সুগার, এসবের ব্যবসা করে কোটিপতি হয়েছে। আর অন্যদিকে কাগজে-টিভিতে জনপ্রিয় নেতা হিসাবেই পরিচিত। এবার তার দলের প্রভূত লোকসান করেছে একটি নতুন দল। তাদের নেতার নাম কুমার। দারুণ সাহসী সে। এবার সে কিশোরের দলকে ঘা মারতে চায়।

বিক্রমও এখন দামী স্যুট পরে গাড়ি হাঁকায়। এত টাকা-খ্যাতি তার, তবু মনে পড়ে সন্ধ্যার কথা।

দুনিয়া তাকে সরিয়ে দিয়েছে, সন্ধ্যা তাকে আজও কি চোখে দেখে সেটা জানে না। হয়তো সন্ধ্যা তাকে আজও ভালোবাসে। কিন্তু তার কোনও খবর পায়নি বিক্রম।

সন্ধ্যা এখন হোটেলের ক্যাবারে ড্যান্সার। কিশোরেরও নানা হোটেলে বড় বড় স্মাগলিং কিংদের সাথে দেখা করার জন্য, দেশের নেতাদের সঙ্গে মিটিং করার জন্য হোটেলে যেতে হয়। সে একটা হোটেলে গিয়ে নৃত্যরত সন্ধ্যাকে দেখে। আর খোঁজ নিয়ে তার ফ্ল্যাটে আসে। দেখে সন্ধ্যা আর তার ছেলেকে। এবার কিশোর ওদের নিজের বাড়িতে নিয়ে যেতে চান। কিন্তু সন্ধ্যা বাবাকে পাত্তাই দেয় না। বরং অপমান করে তাড়িয়ে দেয়। জানায় যে তার মুখোশ খুলে দেবে।

ওদিকে খুঁজছে তাকে বিক্রমও। হঠাৎ সেদিন বিক্রম অজয়কে পথে দেখে। অজয় গ্রাজুয়েট হয়েও চাকরি পায়নি, হকারি করে। অজয় সন্ধ্যার খবর জানে। আজ বিক্রম অজয়কে গাড়িতে তুলে বাংলোতে আনে। সন্ধ্যার খবরও শোনে। অজয়দের জমি-বাড়িও সব দখল করে নিয়ে সেখানে বিরাট বিল্ডিং বানিয়েছে কিশোরবাবুর ডানহাত ওই মন্টা। বাধা দিতে গিয়ে ওর বাবাও বোমার আঘাতে মারা যান। সে নতুন পুলিশ ইন্সপেকটার সংগ্রামবাবুর কাছে গেছিল। তিনিও চেষ্টা করেছেন ওই আসামিদের ধরার জন্য। সন্ধ্যাও কিশোরবাবুর অন্যায়ের প্রতিবাদে ঘর ছেড়েছে। আর বিক্রমের সন্তানের মা হয়েছে সে। বিক্রমও খুশি হয়। সন্ধ্যা তাহলে বদলায়নি। তাদের সন্তানকে নিয়ে বিক্রম নতুন করে বাঁচবে। সেই মতো আশা নিয়ে এসেছে বিক্রম সন্ধ্যার ফ্ল্যাটে। দেখে কিশোরবাবু গাড়িতে উঠে চলে যাচ্ছেন। বিক্রম এবার সন্ধ্যার ফ্ল্যাটে গিয়ে বেল টিপতে সন্ধ্যা ভাবে তার বাবাই ফিরে এসেছে। দরজা খুলে কড়া কথা বলতে গিয়ে থামে। বিক্রমকে দেখে। এখন তার দামী গাড়ি-স্যুট। আর শুনেছে সন্ধ্যা বিক্রম জেল থেকে ফিরে এসেছে। হোটেলেও তাকে একদিন দেখেছে। আর বুঝেছে সেও জেল থেকে বের হয়ে ক্রিমিন্যাল—বড় স্মাগলার হয়ে উঠেছে। তার বাবার মতোই অন্ধকার রাজ্যেই গেছে। ওদের ঘৃণা করে সন্ধ্যা।

সন্ধ্যা এখন নিজের ফ্ল্যাটে থাকে আর ছেলে রাজাকে বাইরের কোনও দামী বোর্ডিং স্কুলেই রেখেছে নিজের রোজগারে। সে আজ বিক্রমকে কঠিন ভাষায় জানিয়ে দেয়, কোনও স্মাগলারকে নিয়ে ঘর করে না সে। তার সন্তানকেও বিক্রমের স্পর্শ পেতে দেবে না।

বিক্রম দেখে টেবিলে তার সন্তান রাজার ছবি। সে অজ্ঞাতসারে ছবিটাই সরিয়ে নিয়ে আসে। সন্ধ্যাও তাকে ফিরিয়ে দিল। বিক্রমের এত টাকাও মিথ্যা হয়ে গেছে। আজ তার পাশে আপনজন কেউ নেই। তবু নিজের ছেলের ছবিটা দেখে স্কুলের কোনও অনুষ্ঠানের ছবি। পিছনে রাজার নাম, স্কুলের ঠিকানা লেখা।

ওদিকে অজয়ও চায় কিশোরীবাবুদের অত্যাচারের জবাব দিতে। তার বাবাকেও মেরেছে। সে এসেছে ইন্সপেকটর সংগ্রামের কাছে।

সংগ্রামবাবু দেখেছেন এই এলাকায় বিরাট স্মাগলিং র‍্যাকেট চলেছে। দুই দলের মধ্যে গোলাগুলিও চলে। তিনি তাদের ধরারও চেষ্টা করেন। আর ধরেন মন্টুর চ্যালাদের।

কিন্তু কিশোর এখন মন্ত্রী। মন্টু তার সেনাপতি। তাই মন্টুর লোকদের ছেড়ে দেবার জন্য সংগ্রামের কাছে ফোনে অনুরোধ—হুমকিও আসে। সংগ্রামের স্ত্রীও ভয় পায়। অজয় আসে। সে বলে, ওরাই আমার বাবাকে খুন করেছে। ওরাই এসব স্মাগলিং করে। দেশের শত্রু ওরা।

সংগ্রাম বলে তারজন্য প্রমাণ চাই। অজয় আর সংগ্রামের বোন রিয়াও প্রমাণ সংগ্রহে নেমে পড়ে।

সংগ্রাম মন্ত্রীর অনুরোধও রক্ষা করে না। সে আসামিদের ছাড়ে না। আদালতে পাঠায়। কিন্তু কোনও সাক্ষীই আসে না। ওরা ছাড়া পেয়ে যায়। সংগ্রাম চটে ওঠে। অজয়, রিয়া বলে, প্রমাণ তুমি পাবেই দাদা।

বিক্রম খুঁজে খুঁজে সেই স্কুলে এসেছে। এখানে রাজাকে দেখে। তাদের স্কুলে বহু টাকা সাহায্যও দেয়। রাজার সঙ্গে পরিচিত হয়। রাজারও ভালো লাগে নতুন আংকেলকে।

কিশোর এখন মন্টার দলকে দিয়ে বহু টাকা বিদেশে পাচার করে। কিশোর মন্ত্রী হিসাবে রাজাদের স্কুলে অনুষ্ঠানে এসে প্ল্যান করে এক বাস ভর্তি ছেলেকে বিদেশি শত্রুদের হাতেই পাচার করে দেবে। মন্টাও প্ল্যান করে সে ওই ছেলেদের পিকনিকের নাম করে নিয়ে গিয়ে কৌশলে তাদের বর্ডার পার করে বিদেশিদের হাতে তুলে দেবে একলাখ ডলারের বিনিময়ে। কিন্তু ছদ্মবেশী অজয় ওদের প্ল্যানটা জেনে ফেলে আর সংগ্রামকে খবর দিতে এসে তাকে না পেয়ে বিক্রমকেই খবরটা দেয়। আজ রাতেই ওরা কাজটা করবে। তাও জানায়।

বিক্রমও বুঝেছে রাজার বিপদ। তাই সেও তার দলবল নিয়ে ছুটে যায় রাতের অন্ধকারে। আর বর্ডারে গিয়ে দেখে, মন্টা তার দলবল নিয়ে বাসের ছেলেমেয়েদের পাচার করছে। সে এবার ঝাঁপিয়ে পড়ে আর কঠিন লড়াই করে বাঁচায় ওদের। সংগ্রামও এসে পড়ে ফোর্স নিয়ে। বিক্রম তখন মন্টাকে ধরেছে হাতেনাতে।

ওদিকে গার্জেনরাও সব ছুটে যায় স্কুলে তাদের ছেলেমেয়েদের বিপদের কথা শুনে। সন্ধ্যার চোখে জল। তার একমাত্র অবলম্বন আজ হারিয়ে যাবে। এমন সময় এসে পড়ে বিক্রম রাজাদের নিয়ে। আজ রাজাই বলে সন্ধ্যাকে, মা, নতুন আংকেল না এসে পড়লে আমাদের কোথায় চালান করে দিত মা। নতুন আংকেলই বাঁচাল আমাদের। বিক্রমের হাতে গুলি লেগেছে। রক্ত পড়ছে। আজ সন্ধ্যাও বুঝেছে তার ছেলের জন্যই প্রাণ বাজি রেখে লড়েছে। আর পাচারকারী লোকজন তার বাবার। আজ সন্ধ্যাই রাজাকে বলে, ওই তোমার বাবা, রাজা। প্রণাম করো।

বিক্রমও রাজাকে বুকে জড়িয়ে ধরে। আজ সে তার স্ত্রী-পুত্রকে ফিরে পেয়েছে। হতাশার অন্ধকারে আলো জাগে। এবার নতুন করে বাঁচবে তারা।

কিন্তু কিশোরবাবু বুঝেছে ওদের বাঁচা মানেই তার সর্বনাশ। এবার মন্টাকে সংগ্রামবাবু ধরেছে। আর বিক্রম-সন্ধ্যাও এবার সাক্ষ্য দেবে। মন্টা যদি সব কথা বলে দেয় কিশোরবাবুর রাজ্য চলে যাবে। তাই কিশোরবাবুও এবার বিক্রম- সন্ধ্যা-তার ছেলেকে নিয়ে বিপাকে পড়েছে।

কিশোরবাবু হাজতের মধ্যেই মন্টাকে মেরে ফেলে রটিয়ে দেয় সংগ্রামের অত্যাচারেই মারা গেছে মন্টা। সংগ্রামও বিপদে পড়ে।

আর কিশোর ওদিকে সামলে এবার আসে বিক্রম-সন্ধ্যার কাছে। বিক্রমকে লোভ দেখায় টাকার। তাকে মন্ত্রী বানিয়ে দেবে। কিন্তু বিক্রম-সন্ধ্যা তাতে রাজি নয়। তাই কিশোর এবার সন্ধ্যা-রাজাকেই তুলে নিয়ে যায়। কিশোর ওদের নিয়ে যায় তার সুরক্ষিত গুদামে। জানে খবর পেয়ে বিক্রম আসবে। আর ওখানেই ওদের শেষ করবে সে।

অজয়ের কাছে সংগ্রাম খবর পেয়েছে যে সন্ধ্যা রাজকে পাওয়া যাচ্ছে না। ওদের কিশোরবাবুই তুলে নিয়ে গেছেন। বিক্রমও খবর পায়, আজ তার জীবনে কিশোরবাবু চরম সর্বনাশ এনেছে। সে এবার ওকে ছাড়বে না। আজ বিক্রমও দলবল নিয়ে গিয়ে হানা দিয়েছে সেই গুদামে। কিশোরবাহিনীও তৈরি। তুমুল লড়াই করে কিশোরকে আজ ধরেছে বিক্রম। সন্ধ্যা-রাজাকে উদ্ধার করেছে। কিশোর বিক্রমের নয়, সারা দেশের বহু মানুষের সর্বনাশ করেছে মন্ত্রী হয়ে। এতবড় অমানুষ সে, তাকে শেষ করবে। এসে পড়ে সংগ্রাম অজয়রা।

আজ সংগ্রামই হাতেনাতে ধরে কিশোরকে। তার গুদামে পায় বহু বেআইনি ড্রাগ, বিদেশি অস্ত্র, গুপ্তচর সংস্থার কাগজপত্র। কিশোরের দিন শেষ হয়।

আজ বিক্রম আবার নিজের কঠিন সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে নতুন করে বাঁচার পথ পায়। আজ বিক্রম এতদিন পর জীবন-সংগ্রামে জয়ী হয়েছে।

সম্পর্ক

তপসে আর ক'জন ছেলে পথের ধারে এক ভাঙাবাড়ির রকে বসে বিড়ি ফুঁকছে। অবশ্য বিড়ি ফোঁকার বয়স তাদের নয়, এখন এদের স্কুলে পড়ার কথা। একটু ভদ্রভাবে থাকার কথা। কিন্তু তার কিছুই জোটেনি ওদের ভাগ্যে। পথের ধারেই ওরা মানুষ। অনেকেরই মা-বাবার খোঁজ নেই। স্টেশনে না-হয় বাজারের কাছ থেকে নানাভাবে দু'দশ টাকা রোজগার করতে পারলে পাইস হোটেলে খাওয়া জোটে নাহলে কলের জলই ভরসা।

ওদের তুলনায় তবু তপসে ভাগ্যবান। তার মা আছে। মা থাকে খালপাড়ের একটা ঝুপড়িতে। বাবুদের বাড়িতে বাসন মাজার কাজ করে। ওর মা মালতী আশা করেছিল তার তাপস স্কুলে পড়বে ভদ্রলোকেদের ছেলেদের সঙ্গে। পাস করে সেও চাকরি করবে। তাদের দিন বদলাবে। কিন্তু মালতীর কোনো আশাই পূর্ণ হয়নি। তপসে কর্পোরেশনের স্কুলে ভর্তি অবশ্য হয়েছিল। কিন্তু ততদিনে ওই বাজার-ইস্টিশন পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে জানাশোনা হয়ে গেছে। দেখছে তপসে ওই ছেলেরা কীভাবে দশ-বিশ টাকা রোজগার করে আর মুক্ত-বিহঙ্গের মতো জীবনযাপন করে।

ওদের মধ্যে জগাই সর্দার। জগা বলে, আমাদের কেউ পাত্তা দেয় না। পায়ের নীচে মাটিও নেই। আমাদের লড়াই করেই বাঁচতে হবে। চুপচাপ থাকলে তো না খেয়ে মরব। তপসে তুইও আয়। এসব লেখাপড়া-টড়া আমাদের জন্যে নয় রে।

কথাটা ভেবেছে তপসে। পড়াশোনা তার মাথায় ঢোকে না। সব বইও নেই। আর মা সবদিন তাকে খেতেও দিতে পারে না। খালি পেটে স্কুলে আসে। শুনেছিল স্কুলে নাকি দুপুরে খেতে দেবে। কিন্তু সে আশাও আর পূর্ণ হয়নি।

তাপসের মায়ের ক'দিন ধরে অসুখ। কাজে যেতে পারছে না। একদানা খাবার নেই ঘরে, টাকারও অভাব। ওষুধপত্র কেনা তো দূর অস্ত। সেদিন ওই পথের ধারে রকে বসে আছে তপসে আর দু'তিন জন ছেলে। একটু এগিয়েই শ্মশানঘাট। এই পথ দিয়ে দিনে বেশ কিছু মৃতদেহ নিয়ে যাওয়া হয় দাহ সংস্কারের জন্যে। কেউ আসে দামী খাটে। গায়ে দামী কাপড়। লোকজন খই-এর সঙ্গে পয়সাও ছেটায়। ফুলে ফুলে যেন ঢাকা পড়ে থাকে মৃতদেহ।

কথাটা ক'দিন ধরে ভাবছে তপসে। দলের ছেলেরাও দেখেছে এ পথে নগদ আয় ভালোই হবে। কারণ, প্রতিদিন রাতে প্রচুর মৃতদেহ আসে এখানে। তাদের অনেকেই ভালো টাকা খরচা করে ফুলে মালায় সাজিয়ে আনে সদ্য প্রয়াত প্রিয়জনকে। তপসে এর মধ্যে শ্যামবাজারের কয়েকটা ফুলের দোকানে কথাও বলেছে। তারা সস্তায় টাটকা ফুল পেলে নেবে। দরকার পড়লে রজনীগন্ধাকে তুঁতের জলে ডুবিয়ে ফ্রেশ করে নেবে।

সেদিন প্রথম তপসে শ্মশানঘাট থেকে প্রচুর রজনীগন্ধার মালা-স্টিক-জুঁই-এর মালা-লাল গোলাপের কয়েকটা তোড়া নিয়ে আসে সেই ফুলের দোকানে। দোকানদার দেখে শুনে খুশি হয়। বলে, রেখে যা। নে দামটা। এমন মাল পেলে রোজ আনবি।

দোকানদার তপসেকে চল্লিশ টাকা দেয়। তপসে জানে এসবের বাজারদর। বলে সে, কম করে পঞ্চাশ টাকা দাও, নিধুদা। এত টাকার ফ্রেশ মালা দিলাম।

নিধু ওকে হাতে রাখার জন্য পঞ্চাশ টাকাই দেয়। বলে, আরও বেশি করে মালা আন। দাম ভালোই পাবি।

ক্রমশ এই কাজেই অভ্যস্ত হয়ে ওঠে তপসে। মাকে বলে, বিজনেস করছি মা। বিশ-পঞ্চাশ টাকা দেয় মায়ের হাতে। মাও কিছুটা নিশ্চিন্ত দেখে তপসেকে। বস্তিতে ওর বয়সী ছেলে অনেক আছে। তারা জুয়া খেলে। রাতে চুল্লু খেয়ে নিজেদের মধ্যে মারপিট করে। তপসে ওদের দলে নেই। সে সকাল থেকে রাত ন'টা পর্যন্ত সেই পথে শবযাত্রার খবর রাখে। ফুলের স্তূপ দেখলে খুশি হয়ে সেও ওই শ্মশান-যাত্রীদের দলে যোগ দেয়। আর গিয়ে যত তাড়াতাড়ি পারে ফুলগুলো সংগ্রহ করে ফুলের দোকানে ছোটে। তবে মাঝে মাঝে শুখা মরশুমও আসে। তপসে বলে, এই তেলিয়া, বাবুরা কি মরতেও ভুলে গেছে রে! মালকড়ি যে মিলছে না মোটে। তেলিয়া বলে, মিলবে মিলবে। একটু সবুর কর। হঠাৎ খোলের শব্দে চাইল ওরা। দুজন লোক খোল বাজাচ্ছে আর কিছু লোক তারস্বরে হরি-সংকীর্তন করে যেন মৃতের স্বর্গযাত্রার পথ সুগম করার চেষ্টা করছে। কিছু লোকও চলেছে শোকযাত্রায়। তার পিছনে একটা ট্রাকে দামী খাটে শায়িত মৃতদেহ। তপসের নজর যায় ফুলগুলোর দিকে। রজনীগন্ধার পুরু গোড়ের মালা, জুঁই ফুলের মালার সুবাসে ম-ম করছে চারদিক। আর রয়েছে রজনীগন্ধার গোছা গোছা স্টিক। গোলাপের তোড়াও রয়েছে বেশ কয়েকটা। অনেক ফুল, অনেক মালা—আর সবই তাজা।

তপসে তার দলবল নিয়ে এবার সামিল হয়ে ওঠে। তারাই পথ দেখায়। রাস্তা পার হয়ে মিছিলকে নিয়ে যায় শ্মশানে। লরি থেকে বডিটা নামায়। দরদী বন্ধুর মতো শ্মশানবন্ধুদের সহযোগিতা করে। তপসের সঙ্গীরা এবার ওই খাট-জামাকাপড় এসবের দায়িত্ব নেবে। তারা তখন ট্রাক খালি করে ফুল মালার স্তূপ নামিয়ে একটা ভ্যান-রিকশায় তোলে। অনেক মাল। তপসেও আজ খুব খুশি। হঠাৎ তার নজরে পড়ে একটা আংটি। মনে হয় মৃতের আঙুলে ছিল, খোলা হয়নি। কীভাবে সেটা পড়ে গেছে। ইংরাজিতে লেখা আছে 'এস'। তপসে ওটাকে পকেটে পোরে। মনে হয় সোনারই আংটি। এতবড় লোকের আঙুলে পিতলের আংটি নিশ্চয়ই থাকবে না।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করা যাবে না। সঙ্গে এত তাজা ফুল। তপসে ভ্যান-রিকশায় বসে বলে, জলদি চল বাবা, শ্যামবাজার মোড়।

আজ অনেকদিন পর তপসে বেশ ভালো টাকা পায় ওইসব ফুল-মালা-তোড়া বিক্রি করে। আজ আবার কী একটা উৎসব। ফুল বাজারে পড়তে পারছে না। তাই নিধু ভালো দামই দেয় তপসেকে।

ওর মা মালতী তখন সবে কাজ থেকে ফিরেছে। জানে ছেলে আসবে। তাই ভাত চাপিয়েছে। আর বাজার থেকে সস্তায় কিছু তরকারি আর কুচো মাছের ভাগ কিনে এনেছে। এমন সময় তপসেকে ফিরতে দেখে চাইল। তপসেও ফেরার পথে বাজারের থেকে একটা বড় লাইলনটিক্কা মাছ এনেছে। মা চাইল, এত সকাল-সকাল ফিরলি!

তপসে বলে, একটা পার্টির বড় কাজ করে ভালো টাকা পেয়ে গেলাম। তাই ভাবলাম আজ খাওয়া-দাওয়া করে দুপুরটা ঘুমুব। তাই চলে এলাম।

মালতী ছেলের সুমতিতে খুশি হয়। বলে, আমিও তাড়াতাড়ি রান্না শেষ করছি।

তপসে তখন পকেট থেকে আংটিটা বের করে ভালো করে দেখছে। পড়াশোনা সে করেছে কিছুটা। এ বি সিও চেনে। তাই এস অক্ষরটা পড়েছে। লোকটার নাম বোধহয় শচীন শরৎ বা সদানন্দ-শ্যামল, এস দিয়ে এমনি কিছু হবে। নাম যা হোক, এটা সোনার হলে ভালো টাকাই পাবে। আর পিতলের হলে মনে হবে ওই ব্যাটা মরেও তার সঙ্গে ঠাট্টা করে গেল।

তপসে বলে মা, দ্যাখো তো এই আংটিটা। এক জায়গায় কাজ করতে গিয়ে কুড়িয়ে পেলাম। এক বড়লোকের বাড়িতে কাজ করছিলাম। দ্যাখো তো সোনার না পিতলের?

মালতী আংটিটা হাতে নিয়ে এদিক-ওদিক ঘুরিয়ে দেখেই চমকে ওঠে। বলে সে—কোথায় পেলি এটা?

বললাম তো কাজ করতে গিয়ে কুড়িয়ে পেয়েছি।

চুরি করিসনি তো? মালতীর কণ্ঠে উদ্বেগের সুর।

তপসে বলে, মা, গতর খাটিয়ে খাই। চুরি করতে যাব কেন? সামনে পড়েছিল কুড়িয়ে এনেছি। আমি না নিলে আর কেউ নিয়ে যেত। তা ওটা সোনার না পিতলের?

দেখছে আংটিটা মালতী। এই আংটিটা তার খুব চেনা। আজও ভোলেনি মালতী সেই দিনগুলোর কথা। গোটা জীবনটাই যে বদলে গেছে তারপর।

বাবাকে মালতীর মনে পড়ে না। ওদের বাড়ি ছিল নৈহাটির ওদিকে কোনও গ্রামে। মাও মারা যাবার পর মালতীকে নিয়ে আসে ওর এক দূরসম্পর্কের মাসি এই কলকাতা শহরের কোন বস্তিতে। বলে মাসি, বসিয়ে খাওয়াবার সাধ্য তো আমার নেই বাছা—আমি বাবুদের বাড়িতে কাজ করে খাই। তুইও আমার সঙ্গে কাজে বের হবি।

মালতী তখন তরুণী। ওর দেহে এসেছে সদ্য জাগর যৌবনের উচ্ছলতা। মালতী দেখতে শুনতে খারাপ নয়। মালতী প্রথমে কাজ করতে যায় সেই বড় বাড়িটাতে। এককালে এঁরা ছিলেন জমিদার। কলকাতা শহরে বেশ কয়েকটা বাজার। তার আয়পয়ও কম নয়। সেখান থেকে ভাড়া বাবদ যা দৈনিক তোলা হয়, তাও কম নয়।

তাছাড়া জমিদারবাড়ির বাবুদের অনেকেই নানারকম ব্যবসা—কাজ-কারবার করে তাঁদের ঠাটবাট বজায় রেখেছেন। সোমনাথবাবুও এই বংশের ছেলে। শৌখিন লোক। বসার ঘর দেখলেই তাঁর রুচির পরিচয় পাওয়া যায়। নিজেও গান করেন। তাই মাঝে মাঝে কোনো ওস্তাদকে নিয়ে গানের আসর বসে। সঙ্গে মদ্যপানও চলে। তবে ওসব ব্যাপারে সোমনাথবাবু কখনোই মাত্রা ছাড়ান না।

মালতী মাসির সঙ্গে এই বাড়িতে কাজ করতে এসে এদের ঠাঁটবাট-বৈভব দেখে অবাক হয়। ভগবান এদের যেন দু'হাতে ঢেলে দিয়েছেন। বাড়ির সামনে বাগান। ওদিকে গ্যারেজে দু'তিন খানা ঝকঝকে গাড়ি। এদিকে কাজের লোকেদের এখনও জায়গাটাকে শীতল করে রেখেছে।

বড় বড় ঘর। মেঝেতে ঝকঝক করছে মার্বেল পাথর। মালতী মুছে মুছে তার আরও জেল্লা বাড়ায়। মাসি বলে গিন্নিমাকে, মা, বোনটা আমার চলে গেল। একে আর গাঁয়ে কোথায় কার কাছে রাখি, তাই নে এলাম। গতরে খাটবে—খাবে। বড় ভালো মেয়ে গো।

গিন্নিমাও দেখছে মালতীকে। কৈশোর ছাড়িয়ে যৌবনে পা দিয়েছে। দেখতে-শুনতে ভালোই। গিন্নিমা বলে, ঠিকমতো কাজ করতে বোলো, বেচাল দেখলেই আমি কিন্তু দূর করে দেব।

মাসি বলে না মা, খুব ভালো মেয়ে। ওসব ওর স্বভাবে নেই। ওর দিকে একটু দয়া করেন। বেচারা সব হারিয়ে তবু বাঁচতে পারবে আপনার দয়ায়। ওরে মালতী, পেন্নাম কর গিন্নিমাকে। সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা।

অন্নপূর্ণার দয়াতেই মালতী কাজে বহাল হল। বাড়ির বাইরে বাগানের একটা ঘরে ওর থাকার ব্যবস্থাও হল। নীচের তলায় বাড়ির কাজের লোকদের জন্য আলাদা রান্না হয়। সেখানে খেতেও পায় মালতী। মাসির বয়স হয়েছে সে এখন বেশি খাটতে পারে না।

মালতী এবাড়ির কর্তাদের দেখেছে দূর থেকে। সুন্দর চেহারা। তাঁরা নীচের ঘরে বসে ব্যবসার কাজ দেখেন। মালতী এই সময় মাঝে মাঝে ট্রেতে করে অতিথিদের জন্য সরবত-চা-কফি নিয়ে যায়। বড়বাবুও দেখেন মালতীকে। মালতী ওই চাহনির অর্থ সবটা বুঝতে না পারলেও কিছুটা বোঝে। সেই চাহনির সামনে থেকে সরে আসে মালতী। বড়বাবুই শুধোন মালতীকে, এখানে তোমার কোনো অসুবিধা হচ্ছে না তো?

মালতী সসঙ্কোচে বলে, না বাবু, আমি খুব ভালো আছি। কথা ক'টা বলেই কোনোমতে বের হয়ে আসে সে।

সোমনাথবাবুর এই অফিসের দিকে আরও দু'তিনটে ঘরে বাবুরা কাজ করেন। এটা দোতলার

ঘর। এঁদের আর একটা মহল বলতে সেই চারতলায়। ছাদেও বাগান মতো করা আছে। বাড়ির বৌ-ঝিরা বিকালে চা খেতে খেতে আড্ডা জমায়। মালতীরাও থাকে টুকটাক ফরমাশ খাটার জন্য।

সেদিন বৃষ্টি নেমেছে। বড়বাবুর অফিসঘরে তিনজন বন্ধু জুটেছে। মদের আসর বসেছে সেখানে। আর মালতীই ঘন-ঘন নানা ভাজাভুজি-কাজু-কিশমিশ, রান্নাঘর থেকে মুরগির মাংসের পকোড়া—না হয় মাছভাজা এসবের জোগান দিচ্ছে। এগিয়ে দিতে হয় জলের জগ। সোমনাথবাবুও পেগের পর পেগ চড়িয়ে চলেছেন বন্ধুদের সঙ্গে।

অনেক রাতে ঠাকুর খাবার আনে। তখন ওঁদের অনেকেই মেঝেতে গড়াগড়ি খাচ্ছেন। তবে বড়বাবু মানে সোমনাথবাবু আর দু'একজন ঠিক বসে আছেন। খাবার আসতে তাঁরা এবার খাওয়া শুরু করেন। অর্থাৎ সর্বভুক প্রাণী ওঁরা । কোনো কিছুতেই আপত্তি নেই।

রাত কত হয়েছে জানে না মালতী। তখনও বৃষ্টি পড়ছে। তবে খুব জোরে নয়। আবহাওয়া বেশ ঠান্ডা। মালতী বাগানের ওদিকে তার ঘরে শুয়ে আছে। ঘুম আসে না। সে বাবুদের এখানে কাজ করছে, কিন্তু কেন জানে না একটা অজানা ভয় তার মনে সাড়া তোলে। এই মদের আসরের দৃশ্যটা বারবার তার চোখে ভেসে ওঠে। দেখেছে বড়বাবুকে। মানুষটা মদ খেলে কেমন বদলে যান।

হঠাৎ বাইরে দরজায় কড়া নাড়ার শব্দে চমকে ওঠে মালতী। এত রাতে তাকে কে ডাকবে? মালতী ওঠে। সাড়া দেয়—কে?

জবাব নেই। তবে কড়া নাড়া থামে না। মালতী দরজা খোলে আর সামনে স্বয়ং বড়বাবুকে দেখে চমকে ওঠে। নেশায় টলছেন। আজ বড়বাবু অন্যমানুষ। কিছু না বলে মালতীকে ঠেলে সরিয়ে ঘরে ঢোকেন। মালতী বলে, দয়া করে যান। যান বড়বাবু।

সোমনাথবাবু যাবার জন্য আসেননি। কিছুদিন থেকেই মালতীর যৌবনপুষ্ট দেহটার দিকে চেয়ে কেমন নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন। আজ তাই নিজেকে মদের পাত্রে ডুবিয়ে তৈরি হয়ে এসেছেন মালতীর ঘরে। মালতীকে তিনি জড়িয়ে ধরেন। মালতী তবু কান্নাভেজা স্বরে বলে, দয়া করুন, ছেড়ে দিন, বাবু। ছেড়ে দিন আমাকে। আমার সর্বনাশ করবেন না, বাবু।

উন্মাদ হয়ে গেছেন আজ বড়বাবু সোমনাথ মিত্র। বলেন তিনি, তোমাকে রাজরানী করে রাখব।

মালতীর চরম সর্বনাশ করে সোমনাথবাবু বের হয়ে যান ঘর থেকে। পরের মাসে মালতীর মাইনে ডবল হয়ে যায়। আর এস্টেটের সরকার দামী শাড়ি-ব্লাউজ-প্রসাধন দ্রব্য দিয়ে যায়। বাড়ির অন্য কাজের লোকেরাও মালতীকে যেন একটু সম্ভ্রমের চোখে দেখে।

তারপর থেকে মাঝে মাঝেই রাত্রে বড়বাবু আসেন মালতীর ঘরে। মালতীও এখন তাঁর আসাটা আর অত্যাচারটা মেনে নিয়েছে। বড়বাবু ওকে একটা সোনার হারও দিয়েছেন। মালতীর মাসি মাঝে মাঝে আসে। সে অনেক খবর রাখে। বলে সে, সাবধানে থাকিস লা। যা পারিস টাকা-সোনা হাতিয়ে নে। বড়লোকের খেয়াল, এখন হ্যাঁ আবার না হতেও সময় লাগবে না। মালতী বলে—না-না মাসি। বাবু লোক ভালো। আমাকে একটা বাড়ি দেবেন বলেছেন।

সব আশা, স্বপ্ন হঠাৎ একদিন শেষ হয়ে যায়। মালতী আবিষ্কার করে সে মা হতে চলেছে। তার গর্ভে সোমনাথ মিত্রের সন্তান। খবরটা প্রকাশ্যে এসে পড়তেই সোমনাথবাবু গর্জে ওঠেন, আমার খেয়ে-পরে আমারই নামে বদনাম! কার না কার পাপ আমার ঘাড়ে চাপাতে চায়! দূর করে দাও ওকে।

বাড়ির গিন্নির কাছে গিয়ে মালতী সব জানায়। মাসিও এসেছে। যদি কিছু টাকা আদায় করা যায়। গর্জে ওঠেন সোমনাথ—কী? ব্ল্যাকমেল! পুলিশে খবর দেব। যাও, এক্ষুনি এখান থেকে ওকে নিয়ে যাও।

মাসি বের হয়ে আসে মালতীকে নিয়ে। এবার মালতীর জীবন-সংগ্রাম শুরু হয়। মাসি বাচ্চাটা নষ্ট করো, না! ও আমার সন্তান। একদিন ও ওই বড়বাবুকে এর জবাব দিতে পারবে।

সেদিনগুলোর কথা আজও মালতী ভোলেনি। এতগুলো বছর কেটে গেছে। তার ছেলে এখন খেটে খাচ্ছে। আজ নগদ শ'খানেক টাকা রোজগার করেছে আর এনেছে এই আংটিটা। সোমনাথ মিত্রের আঙুলে দেখেছে সে। আজও সেকথা ভোলেনি।

তপসে বলে, কী গো, পিতলের না সোনার?

মালতী বলেসোনারই। বড়লোকের দামী জিনিস।

বলে তপসে, শালা ফুটে গেছে। তবে মরার পরও বড়লোকি চাল ভোলেনি। ফুল বেচে চারশো টাকা পেয়েছি। আর এই আংটিটা নিদেন দু'হাজার টাকা। এরকম বড়লোকদের মাঝে মাঝে ফুটিয়ে দাও ভগবান দু'হাত্তা কামিয়ে নিই।

তাপসের কথাগুলো শুনছে মালতী। মনে হচ্ছে আজ সত্যি সত্যিই হারিয়ে গেছে তার অতি আপনজন। কিন্তু এসব কথা তাপসকে তো বলা যাবে না।

দু-দিনের পরিচয়

সকালের প্রথম আলোর আভা পড়েছে গাছগাছালির ওপর, কুয়াশার চাদর সরে যাচ্ছে সেই আলোর আভায়। পাখিদের কলরব ওঠে। নতুন দিনের প্রভাত চলছে—এক রাতের জড়তা কাটিয়ে জেগে উঠছে সবাই। কারখানার গেটে তখন সবে শুরু হয়েছে শ্রমিক কর্মচারীদের আনাগোনা। গেটের ওদিকেই মানিকের চায়ের দোকান। এই জায়গাটাতে ইঞ্জিনিয়ার কারখানা শুরু হবার সময় থেকেই মানিক ওখানে চা-খাবারের দোকান করেছিল। সেদিন মানিক ছিল তরুণ, আজ তার চুলে পাক ধরেছে। কারখানার সঙ্গে সঙ্গে তারও বয়স বেড়েছে—সেই ঘুমটি দোকানের চেহারা বদলে এখন কেমন বড়সড় রেস্টুরেন্টেই পরিণত হয়েছে। বাইরে কয়েকটা বেঞ্চ-চেয়ার ছড়ানো থাকে। কারখানার একটা ক্যান্টিন অবশ্য আছে, তবু মানিকের দোকান ভালোই চলে। শ্রমিক-কর্মচারীদের এটা একটা যেন মিলনক্ষেত্র। মানিক এখানে বসে বসে কারখানার সব খবরই রাখে। শ্রমিক নেতা ভূধরবাবুও এখানে এসে বসে। সকাল থেকেই মানিকের চায়ের দোকান চালু হয়ে যায়।

আজ হঠাৎ সেই ছবিটা যেন থমকে যায়।

সকালের শিফটের কাজের জন্য এসেছে শ্রমিকরা। এসেছে প্রভাতও। সাইকেল থেকে নেমে দেখে প্রভাত—অন্যদিনের মতো কারখানার গেটটা বন্ধ—আর গেটের বাইরে ভিড় করেছে শ্রমিকরা। শ্রমিকরা আজ উত্তেজিত। প্রভাতকে দেখে শ্রমিকরা বলে দেখুন স্যার—রাতারাতি কারখানা লক-আউট করে নোটিশ লটকে দিয়েছে।

—সেকি! কথাটা শুনে প্রভাতও চমকে ওঠে।

একজন শ্রমিক গেটে লটকানো একটা নোটিশ দেখিয়ে বলে,

—পড়ে দেখুন। আপনি তো পড়ালেখা জানা ইঞ্জিনিয়ার—দেখুন কি লেখা আছে।

প্রভাত এগিয়ে গিয়ে নোটিশটা পড়ছে, তারও সারা শরীরে রক্তপ্রবাহ যেন থেমে আসে। মালিক পক্ষ প্রভূত লোকসান এবং শ্রমিক অনিয়মের জন্য বাধ্য হয়ে এই কারখানার কাজ বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছে। অন্য কোনও বিজ্ঞপ্তি জারি না হওয়া পর্যন্ত কারখানা বন্ধই থাকবে।

কে যেন প্রভাতকে তার মৃত্যুদণ্ডের আদেশই শুনিয়েছে। প্রভাত এখনও কথাটা বিশ্বাসই করতে পারছে না।

ওদিকে তখন শ্রমিক নেতা ভূধরবাবু তার দলবল নিয়েও এসে গেছে। ভূধরবাবু এবার মানিকের দোকানে টেবিলের উপর দাঁড়িয়ে দম নেওয়া কাঠের পুতুলের মতো হাত-পা নেড়ে মালিকদের এই চক্রান্তের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে।

প্রভাত সরে আসে। সে জানে এই ভূধরবাবুই গোপনে মালিকদের কাছে গিয়ে আবার তাদেরই সমর্থন করবে আর তার জন্য ভালো টাকাও পাবে। কিছুদিন থেকে শ্রমিকদের মধ্যে এই ভূধরবাবুই তিনমাসের বোনাস আর মাইনে বারাবার অনুমোদন শুরু করেছিল। তার জন্য শ্রমিক কর্মচারীদের কাছে সংগ্রামী তহবিলেও মোটা টাকা চাঁদাও তুলেছিল।

সেই আন্দোলন ক্রমশ বিদ্রোহের রূপ নেয়। চালু কারখানা ক্রমশ অচল হয়ে আসতে থাকে।

প্রভাত কয়েক বছর আগে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করেছে। ছাত্র হিসাবে সে ভালোই ছিল। ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার সময় থেকে সে স্বপ্ন দেখত পাস করে সে বিদেশে পড়তে যাবে। সেখানে মাস্টার ডিগ্রি করে বিদেশেই কোনও ভালো ফার্মে কাজ নেবে।

প্রভাতের বাবা তখনও চাকরি করছেন। একটা বেসরকারি ফার্মে মোটামুটি ভালো চাকরি—ওর বাবা বিজয়বাবু কোম্পানির পাশের এলাকায় ফ্ল্যাটে থাকতেন। প্রভাত থাকত কলেজ হোস্টেলে। মাঝে মধ্যে ছুটিতে বাড়ি আসত। এই বাড়িতে থাকে মা-বাবা আর ছোট ভাই তিমির। বেশ ভালোই ছিল তারা। সাজানো সংসার। হঠাৎ করে তার ছোট ভাই-র শরীর-স্বাস্থ্য ভালো যায় না—প্রায়ই অসুস্থ হয়ে পড়ে, পড়াশোনাও ঠিকমতো হয় না। তখন সে ক্লাস সিক্সে পড়ে। আর সেই সময় তার রোগটাও ধরা পড়ে। হার্টের কারণে তার শরীরে নানা জটিল সমস্যা দেখা দেয়। তার চিকিৎসাও হয়েছিল।

তিমিরের বাবা তার ছেলের জন্যে চিকিৎসার কোনও ত্রুটি রাখেনি।

তাদের সুখের সংসারে অশান্তির কালো মেঘ ঘনিয়ে আসে। প্রভাত ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করে—তার ইচ্ছা ছিল সে বিদেশে পড়তে যাবে। তার জন্যে বিদেশের কলেজে কাগজপত্র, ফর্মও আনে। পেপারও রেডি করে। এমনি দিনে প্রভাতের বাবা হঠাৎ কয়েক দিনের জন্যে অসুখে পড়েন। দামী নার্সিংহোমে পাঠানো হল তাকে—কিন্তু তাতেও কিছু হল না। বেশ কিছুদিন এভাবে চলার পর তিনি কোমায় চলে গেলেন। শেষ পর্যন্ত অনেক চেষ্টা করেও তাকে বাঁচানো গেল না। তিনি মারা গেলেন।

এদিকে নার্সিংহোমের বিলও বিরাট বেড়ে গেছে—সেই টাকা দিয়ে নার্সিংহোম থেকে বাবার দেহ মুক্ত করে এনে সৎকার করে প্রভাত।

এরপর সেই কোম্পানির কোয়ার্টার ছেড়ে দিতে হল তাদের। কোথায় যাবে জানে না। টাকারও দরকার। এদিকে অসুস্থ ভাইয়ের শরীর খারাপ রয়েছে। এমন বিপদের দিনে এই ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্মে চাকরি নিতে বাধ্য হয়েছিল প্রভাত, শুধুমাত্র বাঁচার তাগিদেই।

পেছনের সেই দিনগুলোকে ফেলে প্রভাত চলে এসেছিল শহরতলীর এই কারখানায়। এদিকেই স্টেশনের কাছে তার স্কুলজীবনের কয়েকজন বন্ধুও রয়েছে। শ্যামল-সুধীর এখন এই অঞ্চলের অনেক নেতাদেরই চেনে জানে—তাদের সঙ্গে ওঠা বসা। সুধীর তাদের প্রমোটারি ব্যবসাতে এখন মাল জোগান দেয় আর এসব করে সেও একজন উঠতি নেতা হয়ে উঠেছে।

সুধীরই প্রভাতকে ওদের এলাকায় একটা ঘরের সন্ধান করে দিতে প্রভাত মা-ভাইকে নিয়ে এখানে এসেই বাসা বাঁধে। প্রভাত এই চাকরিটা পেয়ে এখানে এসে তবু কোনওমতে দিন চালাচ্ছিল। তিমিরের চিকিৎসাও চলছিল। তবে ডাক্তারবাবু বলেছিল "একটা জটিল অপারেশন করলে হয়তো তিমিরের সুস্থ হবার সম্ভাবনা থাকতে পারে। তবে তার জন্য বেশ টাকারও দরকার।"

প্রভাতের বন্ধুরাও জানে এই সমস্যার কথা। প্রভাত এখন এই পাড়ারই বাসিন্দা। অফিসের ডিউটির পর সন্ধ্যায় কোনও কোনওদিন সুধীরদের আড্ডাতেও যায়। সুধীর-প্রবীর অন্য কয়েকজন তরুণও আসে।

সুধীর বলে প্রভাত, লেগে থাক আমাদের সঙ্গে। দেখি যদি একটা দাঁও মারতে পারি, তিমিরের চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়ে যাবে। তোকে চিন্তা করতে হবে না।

প্রভাত বলে দেখি, অফিস থেকেও যদি কিছু টাকা লোন পাই।

সুধীর বলে দ্যাখ। তবে কি জানিস—যা দিনকাল পড়েছে, সোজাপথে কাজ হবে না। এখন যুগ বদলেছে—বেঁচে থাকতে গেলে এই যুগের হাওয়াতে গা ভাসাতে হবে।

প্রভাত বলে তাইতো দেখছি—দেখেছিস ভূধরবাবুকে। ব্যাটা নেতা হয়ে কেমন ব্যবসা ফেঁদে বসেছে। লাখ লাখ টাকা কামিয়ে চলেছে। আর আমি—?

সুধীর বলে সবাই ওকে তোষামোদ করে চলে। মনে হয় ভিতরে ভিতরে নিশ্চয়ই একটা কিছু করে।

প্রবীর বলে আমারও তাই মনে হয়। মারি তো গণ্ডার—লুটি তো ভাণ্ডার। চুনোপুঁটি মেরে হাত ময়লা করিস না—প্রভাত বলে, কি করবো?

প্রবীর বলে তাই ভাবছি। দ্যাখ যদি কোনও প্ল্যান মাথায় আসে তোর। প্রভাত তবু চাকরি নিয়েই ছিল। তার টাকার খুব দরকার। কিন্তু উপায় নেই। আর এমনদিনে হঠাৎ তার কারখানা বন্ধ হয়ে গেল।

বেলা বাড়ছে। কারখানার গেটে তখন শ্রমিকদের ভিড়। টিভি-ক্যামেরাও এসেছে। আর ভূধরবাবু

ক্যামেরার সামনে পোজ দিয়ে মালিকের বিরুদ্ধে নানা কথা বলে চলেছে। প্রভাত সরে আসে। তার সামনে ভেসে ওঠে ভূধরবাবুর আর এক মূর্তি। সে দেখেছে এই ভূধরবাবু মালিকদের সঙ্গে গোপনে কথা বলে ফোনে। দামী গাড়িতে চড়ে, ওদিকে তার প্রমোটারি অফিসে এ.সি লাগানো। এসব টাকা কোথা থেকে আসে তা হয়তো অনেকেই জানে না, তবে প্রভাত জানে।

তাই ওর কথা না শুনে বের হয়ে আসে প্রভাত।

চেনা জানা দু-একটা কোম্পানিতে গেছে প্রভাত যেখানে কোনও কাজ পাওয়া যায়। কিন্তু হতাশই হতে হয় প্রভাতকে। বিকেল নামছে। দিনভোর আজ এখানে ওখানে ছুটেছে প্রভাত। কিছু খাওয়াও হয়নি। একটা পাউরুটি আর কয়েকটা কলা খেয়ে সঙ্গে চা পেটে দিয়েই দিনভোর শূন্য মনে ছুটেছে প্রভাত। বাড়িতে মা তখন তিমিরকে ওষুধ দিচ্ছে। প্রভাত অবশ্য মাকেও বলেনি তার কারখানা লকআউটের কথা।

মা বলে প্রভাত, তিমিরের ওষুধগুলো ফুরিয়ে গেছে।

প্রভাত বলে কাল এনে দেব মা।

মা বলে তাই আনিস। সামনের সপ্তাহের ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হবে। ডাক্তারের ভিজিট নগদ চারশো টাকা। বেশ কিছু টেস্টও করতে হবে।

অর্থাৎ হাজার খানেক টাকার প্রয়োজন। প্রভাত কি করবে তাই ভাবছে। সামান্য কিছু টাকা ব্যাঙ্কে রয়েছে তাও খুব সীমিত। সেই জমানো টাকা শেষ হলে কি করবে প্রভাত নিজেও জানে না।

তবু সে মাকে কিছু বলে না। সকালে বের হয় যেন কারখানায় যাচ্ছে। কারখানাতে আসে একবার, এসে দেখে কারখানার গেটে তখন তক্তপোষ পেতে কয়েকজন বসে আছে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ শ্লোগান দেয়—

বন্ধ কারখানা খুলতে হবে খুলতে হবে।
মালিকের কালো হাত ভেঙে দাও গুঁড়িয়ে দাও।

বেশ ওইটুকুই। মালিকদের অবশ্য দেখাও পায় না কেউ। সেখান থেকে প্রভাত সরে আসে। সারাদিন ঘুরে ক্লান্ত হয়ে সন্ধ্যায় আসে প্রবীরদের আড্ডায়।

প্রবীর-সুধীর-নিখিলরা এসে জোটে।

ওদের কোনও কাজকর্ম নেই। সুধীর এদিক-ওদিক ঘুরে দালালি করে কিছু পায়—প্রবীর এখন ভূধরবাবুদের প্রমোটারি কাজ মাঝে মধ্যে কিছু সামলায় আর পাড়ায় কিছু কাজ করে।

প্রবীর বলে আমি তো টেনেটুনে ম্যাট্রিক পাস। তুই তো ইঞ্জিনিয়ারিং পাস তাও বেকার। আমার একটা কাজের সন্ধান আছে। কাজটা ঠিকঠাক করতে পারলে একদিনে এক কোটি টাকা এসে যাবে।

—কোটি টাকা! অবাক হয় প্রভাত। বলে কোটি টাকা কে দেবে?

প্রবীর বলে কে আবার দেবে, নিজে রোজগার করবি।

সুধীর বলে হ্যাঁ, সারাজীবনভোর আর ভাবতে হবে না। পায়ের উপর পা তুলে বসে বসে খাবি।

প্রভাতের কাছে এক কোটি টাকা যেন স্বপ্নই।

প্রবীর বলে আমি অনেক ভেবেচিন্তে দেখলাম—একবার যদি ব্যাঙ্ক ডাকাতি করা যায় ঠিকমতো, ব্যাঙ্কের খবর দেবার লোকও পেয়ে গেছি—ঠিকমতো যদি প্ল্যান করে কাজটা করতে পারা যায় তাহলে তার চেয়েও বেশি পাওয়া যাবে।

প্রভাত এবার ব্যাপারটা হেসে উড়িয়ে দেয়।

ছাড়তো ওসব কথা তোদের যত সব গুলবাজি।

প্রবীর বলে নারে। সত্যিই সিরিয়াসলি বলছি।

প্রভাত ওদের কথায় আমল দেয়নি। তখনও স্বপ্ন দেখছে প্রভাত—হয়তো তাদের কারখানা আবার চালু হবে, না হয় অন্য কোন কাজ সে পাবেই। ব্যাঙ্ক ডাকাতির মতো দুঃসাহসিক কাজের কথা তার মাথায় আসে না। সে এই কাজ কখনোই করতে পারবে না। কিন্তু কঠিন বাস্তব জীবনের মুখোমুখি

হয়ে প্রভাত বার বার আঘাতেই জর্জরিত হয়েছে। এদিকে বাড়িভাড়া বাকি পড়েছে। মুদির দোকানেও সব টাকা দিতে পারেনি। এখন মাও [illegible] গেছে যে প্রভাতের কারখানা লকআউট হয়ে গেছে।

দু-মাস কেটে যাওয়ার পরও কারখানা বন্ধ রয়েছে, খোলার কোনও আশাও আর নেই। মালিকের কোনও অসুবিধা হবে না কারণ তার অন্যসব ব্যবসাপত্র রয়েছে।

হিমালয়ের ওদিকে তরাই-র জঙ্গলে তার বিরাট কাঠের ব্যবসা, করাত কল, বেশ কয়েকটা চা-বাগান আছে। তারা বুঝেছে এখানে কারখানা রাখা আর লাভজনক নয়, প্রচুর টাকা লোকসান হয়েছে এই কারবারের জন্য—তাই এবার এই কারখানা তুলে দেবে। এখানে সে প্রোমোটারি ব্যবসা করবে। ভূধরবাবুও এই প্রোমোটারি কাজের অংশীদার থাকবে।

তাই এই কারখানা আর খুলবে না। গোপনে রাতের অন্ধকারে কারখানার যন্ত্রপাতিও সরে যাচ্ছে ভূধরবাবুর সাহায্য নিয়ে। এদিকে প্রভাতের মতো কর্মীদের সামনে নেমেছে অতল অন্ধকার। প্রভাত শেষ চেষ্টা হিসাবে গিয়েছিল মিঃ আগরওয়ালার হেড্ অফিসে। পার্ক স্ট্রিট এলাকার বিশাল একটা বাড়ির সাত তলার বিশাল এলাকা জুড়ে মিঃ আগরওয়ালার এয়ার কনডিশনার অফিস। নানা বিভাগের কাজ চলছে সেখানে। এদিক ওদিক ছড়ান-ছেটানো রয়েছে বেশ কিছু কম্পিউটার।

ওদিকে মিঃ আগরওয়ালার চেম্বার। বেয়ারার হাতে স্লিপ দিয়ে বাইরে বসে অপেক্ষা করছে প্রভাত। এদিক-ওদিক কর্মব্যস্ত সুন্দরী মহিলাদের আনাগোনা। হঠাৎ চেম্বার থেকে ভূধরবাবুকে বের হয়ে আসতে দেখে একটু অবাক হয় প্রভাত। এই নেতাটি যে এখানে প্রায়ই আসে সেটা বুঝেছে প্রভাত। ভূধরবাবুও দেখছে প্রভাতকে। তাকে চেনে ভূধরবাবু—তাকে সে কারখানাতেই দেখেছে। কিন্তু এখানে সে প্রভাতকে না চেনার ভান করেই বের হয়ে আসে।

বেয়ারা বলে প্রভাতকে—আন্দার যাইয়ে।

প্রভাতও বুঝেছে যে ভিতরে গিয়েও কোনও ফলই হবে না। তবু যায় আগরওয়ালার চেম্বারে।

চেয়ারে বসে আছে মিঃ আগরওয়ালা। মুখে চোখে একটা নীরব অনুভূতি। চোখে গোল্ড ফ্রেমের চশমা। প্রভাতের হাত থেকে ওর দরখাস্ত নিয়ে পড়ে দেখছে। তারপর প্রভাতকে বলে, কারখানার হিসাবপত্র সারা হয়নি এখনও। ওসব সারা হলে আপনাকে চিঠি দিয়ে জানানো হবে— পাওনা থাকলে তখন পেয়ে যাবেন।

প্রভাত বলে আমাদের প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি।

মিঃ আগরওয়াল উঠে পড়ে। প্রভাতের ওসব কথার জবাব দেওয়ার প্রয়োজনও বোধ করে না। বের হয়ে যাবার আগে বলে, জরুরি মিটিং আছে, যেতে হচ্ছে। ওসব হিসাব হলেই পাবেন।

—কিন্তু কারখানা তো তিনমাস বন্ধ হয়েই আছে।

কোনও জবাব দেয় না আগরওয়ালা। বের হয়ে গেল।

নীরবে বের হয়ে আসে প্রভাত। সে বেশ বুঝেছে—ওদের শক্তি আছে। তাই তাদের মতো গরিব কর্মীদের স্বার্থ লুঠ করে নেবে তারা।

বাড়িওয়ালাকে দু-মাসের ভাড়া দেওয়া হয়নি। সেদিন বাড়িওয়ালা এসে বেশ কড়া ভাষায় শাসিয়ে যায়—আর একমাস দেখব। তারপর যা করার করব। কোর্টঘর আমি করি না। টেনে মালপত্র বের করে দেব।

ওদিকে তিমিরের ওষুধ ঠিকমতো দেওয়া যায় না। এখন সে শয্যা নিয়েছে। সে তার দাদার দিকে চোখ মেলে চেয়ে থাকে। সে যেন এখন শুধু মৃত্যুর দিন গুনছে।

এই তিমিরই ছিল প্রভাতের একমাত্র অবলম্বন। একসময়ে দুজনে কত হৈ-চৈ করত। তিমির ভাল গান গাইত—সেই তিমির রোগে ভুগে ভুগে একেবারে বদলে গেছে।

তিমির বলে আমি আর বাঁচব নারে।

প্রভাত এখন ভাইয়ের চিকিৎসাও ঠিকমতো করতে পারে না। প্রভাত তিমিরকে বুকে টেনে নিয়ে বলে,

—না না তিমির, তোকে আমি সারিয়ে তুলব। তুই আবার ভালো হবি, স্কুলে যাবি গান গাইবি—

তিমির বলে, তুই কাঁদছিস দাদা।

—নারে, তুই দেখিস—তোকে আমি ঠিক সারিয়ে তুলবোই। কিন্তু কী করে তা করবে তা জানে না প্রভাত।

সেদিন সে ব্যাঙ্কে গেছে টাকা তুলতে। দেখে ওদিকেই বিশাল সিন্দুকের হাতলটা ঘুরিয়ে ক্যাশিয়ার-ম্যানেজার দুজনে মিলে সেটা খুলছে। প্রভাত দেখছে—সব লক্ষ করছে ব্যাপারটা। সেই মোটা দরজাটা খুলতেই দেখা যায় ভিতরে থরে থরে সাজানো আছে নোটের বান্ডিল। তার সামান্য কিছু পেলে প্রভাত তার ভাই-এর চিকিৎসা করে তাকে সারিয়ে তুলতে পারবে। নিজেরাও শান্তিতে থাকতে পারবে।

এত সঞ্চয় এখানে পুঞ্জীভূত হয়ে আছে অথচ তার হাতে কিছু নেই, তার বাঁচার অধিকারও নেই। সর্বস্ব হারিয়ে প্রভাতকে—তাদের পরিবারকে তিল তিল করে মরতে হবে।

প্রভাত এই নীরব অসহায় মৃত্যুকে মেনে নিতে পারবে না।

সে বাঁচাতে চায় এর জন্য একটা পথ তাকে খুঁজে নিতেই হবে।

প্রভাত এসেছে প্রবীরদের ঠেকে। আজ যেন আবহাওয়াটা কেমন বদলে গেছে। ঝড়ো হাওয়ার সঙ্গে মিশেছে বৃষ্টির দাপট। পথেঘাটে লোকজনও তেমন নেই।

সুধীর-প্রবীররা আজ এই বাদল আবহাওয়ায় একটা মদের বোতল নিয়ে বসেছে—নিখিল কোথা থেকে এনেছে গরম পেঁয়াজি। এমন সময় প্রভাতকে চুপ করে থাকতে দেখে প্রবীর বলে—কিরে কী ব্যাপার? তুই তো অসময়ে আসিস না।

আজ নিজের দরকারেই আসতে হয়েছে প্রভাতকে।

প্রভাত বলে—প্রবীর তোদের কথামতো সেই রোজগারের কথাই ভাবছি। তোদের কথাই ঠিক। ওদের ব্যাঙ্কে কোটি কোটি টাকা পড়ে আছে। ওদের ওই সিন্দুকে।

প্রবীর বেশ খুশি হয়েছে কথাটা শুনে।

—আমি তো আগেই বলেছিলাম, মারি তো গণ্ডার লুটি তো ভাণ্ডার। একরাতের কাজ। ব্যাস কোটি টাকার মালিক। আমার সব প্ল্যান করাও হয়ে আছে।

প্রভাত বলে খুব হিসাব করে কাজে এগোতে হবে। ওদের সিন্দুক খোলার ব্যাপারটা জানা দরকার।

প্রবীর বলে তার জন্যে লোকও আছে—ওর জন্য ভাবতে হবে না। ওসব হয়ে যাবে।

প্রভাত বলে তাহলে সেই ব্যবস্থাই কর।

ওদের মনে তখন মদের নেশা। সেই নেশার ঘোরেই ওরাও এই কাজে সহমত পোষণ করে।

শুরু হয় ওদের প্রস্তুতি পর্ব। প্রভাতের এসব দিকে মাথা ভালোই খেলে। কদিন ধরে সুধীর-প্রবীর আর নিখিলরা ব্যাঙ্কের এদিক-ওদিক বেশ ভালো করে দেখে নিল। সকাল দশটার সময় ব্যাঙ্ক খোলে। তখন অবশ্য ভিড় তেমন থাকে না। কর্মীরাও কাজে এসে তখন গা-ছাড়া অবস্থায় থাকে। ম্যানেজারের টেবিলে রয়েছে এমার্জেন্সির সুইচটা। আর ব্যাঙ্কের মিটার বক্স থাকে নিচে সিঁড়ির এক নির্জন কোণে। সামনের রাস্তাতেও তখন কোনও ভিড় থাকে না। ওরা ব্যাঙ্কের ভল্ট খুলে কিছু ক্যাশ বার করে আবার সেটা বন্ধ করে দেয়। তবে ভল্ট খুলে ক্যাশ বের করতে তবু বিশ মিনিট সময় লেগে যায়। এই সময়টায় ভল্ট খোলার পাশে থাকে একজন-দুজন। প্রভাতের এ কাজে মন সায় দেয় না—তার ভয়ই লাগে। কখনও এসব কাজ সে করেনি।

কিন্তু ক্রমশ তার মনেও সাহস এসে যায়। এতদিন সে ভালোভাবে বাঁচার চেষ্টা করেছে। এতো লেখাপড়া শিখেছে তবু সমাজ তাকে একটা চাকরি দেয়নি। তাই এই অন্ধ সমাজের প্রতি প্রভাতের মন যেন বিদ্রোহ ঘোষণা করে।

এই অপারেশান কিভাবে চালানো হবে তাই ওদের মধ্যে বিস্তর আলোচনা হয়েছে। ক্যাশ নিয়ে যাবে সুধীর যদি কেউ ধরা পড়ে তাই ওরা অপারেশানের পর তিনজন তিনদিকে চলে যাবে। তবে কদিন

পরেই একত্রে দেখা করবে একটা জায়গায়। আর কেউ ধরা পড়লে কেউ অন্যজনের নাম বলবে না। ক্রমশ দিন এগিয়ে আসছে।

ব্যাঙ্কের বেশ কিছু পার্টির মোটা টাকা ব্যাঙ্কে জমা হয়েছে তাই অন্যদিনের থেকে ব্যাঙ্কে এখন প্রচুর টাকাও এসেছে। সেসব খবর পৌঁছে গেছে এদের কাছে। প্রভাতও এবার মনে মনে তৈরি অন্যরাও তৈরি আছে। সেদিন ব্যাঙ্ক খোলার দশ মিনিটের মাথায় ক্যাশিয়ার, ম্যানেজার দুজনের সামনে ভল্ট খোলা হয়েছে ঠিক এমন সময়ে সবাই এসে পড়ে। হাতে উদ্যত রিভলবার। ওরা ব্যাঙ্কের ম্যানেজারকে রিভালবার দেখিয়ে ধরে এনে মুখে কাপড় গুঁজে বেঁধে রেখেছে। ওরা তখন ভল্ট থেকে টাকার বাণ্ডিল প্ল্যাস্টিকের ব্যাগে পুরে বের হয়ে যায়।

নিচে গাড়িও পার্ক করে রাখা ছিল তাতেই করে রওনা হয়ে যায়। তবে এর মধ্যে পাশের এক দোকানদার পুলিশকে ফোনও করে দেয়। ঠিক যেন নেশার ঘোরে ওরা কাজটা করে ফেলেছে।

এত সহজে যে সব কিছু ঠিকঠাক করে ফেলবে তা ওরা নিজেরাও ভাবতে পারেনি। ওদের হাতে এখন প্রায় কোটি টাকাই এসে গেছে।

দুটো গাড়ি ওরা বের করে রেখেছিল। একটাতে সুধীর-নিখিল ক্যাশ নিয়ে কেটে পড়ে ওরা কলকাতা থেকে দূরে চলে যায় আর অন্য গাড়িটাতে উঠেছে প্রভাত আর প্রবীর। ওরা চলে যাবে অন্যদিকে।

কিন্তু ওরা ভাবতে পারেনি যে ওদের পেছনে পুলিশ তাড়া করছে। ওরা কলকাতার রাস্তা ছেড়ে চলেছে বনগাঁ-র দিকে। ওরা একটা কলাবাগানে নেমে গাছগাছালির মধ্যে দিয়ে পালাচ্ছে। হঠাৎ গুলির শব্দ ওঠে, ছিটকে পড়েছে প্রবীর। প্রভাতের হাতে রিভালবার কিন্তু গুলি চালাবার আগেই তাকে ধরে ফেলে পুলিশ।

প্রভাত আর পালাতে পারে না, প্রবীরও নেই। পুলিশ ওকে ধরে আনে কলকাতায়।

পরের দিন কাগজে খবরটা ছাপা হয় বিশাল ভাবে। পুলিশ একজনকে মেরে ফেলেছে, অন্যজনকে ধরতে পেরেছে। কিন্তু ব্যাঙ্ক থেকে লুঠ হওয়া সেই টাকার হদিশ পায়নি। মনে হয় দলের অন্যরা টাকা সমেত নিরাপদে বের হয়ে গেছে।

প্রভাতের মা সাবিত্রী দেবীও বেশ কিছুদিন ধরে প্রভাতের মধ্যে একটা পরিবর্তন লক্ষ করেছিল। এর আগে কখনও জোরে কথা বলেনি। ভদ্র ব্যবহার ছিল প্রভাতের।

প্রভাতকে পুলিশ ধরে এনেছে—পুলিশ তাদের বাড়িতেও গেছে খোঁজখবর নিতে। সাবিত্রী দেবীও আঘাত পেয়েছে ছেলের জন্যে। চাকরি না পেয়ে প্রভাত কেমন ভেঙে পড়েছিল মাঝে মাঝে রাতেও বাড়ি ফিরত না। বলত—কাজের চেষ্টা করছি। মা বলত—এত ভেঙে পড়ছিস কেন? দেখবি পথ একটা ঠিক পেয়ে যাবি।

জবাব দিত না প্রভাত। তিমিরের অসুখও বাড়ছে—ছেলেটাও বুঝেছে এ পৃথিবীতে থাকার দিন তার ফুরিয়ে আসছে। ঠিকমতো খেতেও পায় না ঔষুধ তো দূরের কথা। মা এখন পুরনো খবরের কাগজ সংগ্রহ করে এনে বাড়িতে ঠোঙা তৈরি করে কিছু রোজগারের চেষ্টা করে।

কদিন প্রভাত আর ফেরেনি। তিমিরকে সে এত ভালোবাসতো শেষের দিকে তাকেও এড়িয়ে চলত প্রভাত।

দুদিন তার কোনও খবর নেই। একদিন সকালে পুলিশ এসে হাজির হয়। আর তখনই জানা যায় যে সেদিনই সাংঘাতিক ব্যাঙ্ক ডাকাতি হয়ে যায়। প্রভাত তার অন্যতম পাণ্ডা। পাড়ার দু-চারজন ছেলেও এর সাথে জড়িত। তাদের মধ্যে প্রবীরকে পুলিশ এনকাউন্টারে শেষ করেছে! বাকিদের ধরার ব্যবস্থা চলছে।

তিমির শুনছে পুলিশের কথা। মা অসহায় কান্নায় ভেঙে পড়ে—একি সর্বনাশ হলো আমার।

পুলিশ অফিসার বলে এত বড় শিক্ষিত ছেলে—শেষে কিনা ব্যাঙ্ক ডাকাতি করবে। কোর্টে কি হবে কে জানে?

পুলিশকে দেখেই চমকে ওঠে বাড়িওয়ালা। তার তিনমাসের বাড়ি ভাড়া বাকি, তার ওপর প্রভাতের এই ব্যাঙ্ক ডাকাতির কেসে জড়িত থাকার কথা শুনে বাড়িওয়ালার নীতিজ্ঞান টনটনিয়ে ওঠে। সে বলে, মা-ছেলে এবার দয়া করে বাড়ি ছেড়ে দিন। নাহলে পুলিশ আমাকে নিয়েই টানাটানি শুরু করবে। একজন ক্রিমিনালের মাকে আমি বাড়িতে রাখব না।

সাবিত্রী দেবী কি জবাব দেবে জানে না। তার চোখে জল নামে। সামনে তার কোনও বাঁচার পথ নেই। ক্রমশ যা ছিল সব নিঃশেষ হয়ে গেছে।

সাবিত্রী বলে তাই হবে দত্তমশাই, আমরা এবাড়ি ছেড়ে দিয়ে দেশের বাড়িতেই ফিরে যাব। এখানে আর কিছুই নেই। সবই আমার শেষ হয়ে গেছে।

...প্রভাতের জীবনে এ যেন এক নতুন অভিজ্ঞতা। এতদিন সে ভালো পড়াশোনা করেছে, পাস করেছে, তারপর চাকরি করেছে। চোর-ডাকাতদের সমাজ কখনও মেনে নেয় না, এখন তাকে জেলে রাখা হয়েছে—সাধারণ দাগী মর্যাদার অন্য আসামীদের সঙ্গেই।

জেলে এসে দেখেছে এখানে মদ-গাঁজা-মারপিট সবই চলে। এ যেন নরকের পরিবেশ।

পুলিশ এবার জানতে চেষ্টা করছে যে এই ডাকাতির সঙ্গে আর কারা জড়িত, আর লুঠ করা টাকা কারা নিয়ে গেছে। তাই ওরা চাপ দিচ্ছে প্রভাতের ওপর। প্রভাত জানে সুধীর-নিখিল এখনও ধরা পড়েনি। তারা কোনও নিরাপদ আশ্রয়ে চলে গেছে।

প্রভাত অবশ্য তাদের নাম বলেনি। পুলিশ ওকে নানারকম ভাবে চাপ দিয়েছে। শারীরিক নির্যাতনও করেছে। তবু কোনও জেদের বশে প্রভাত মুখ বন্ধ করে রেখেছে।

প্রভাত দেখেছে জেরার সময় পুলিশের আসল রূপটা। অনেক মার সহ্য করেছে, তবু মুখ খোলেনি প্রভাত।

সুধীর-নিখিল মাল নিয়ে নিরাপদ জায়গায় গা ঢাকা দিয়ে আছে। তবে তাদেরও ভয় হয়—যদি প্রভাত মুখ খোলে তবে তাদেরও বিপদ হতে পারে।

সুধীররা দু'জনে পুলিশের নজর এড়িয়ে এসে পড়েছে শহরের এদিকে একটা আধা বস্তিতে। এখানে কেউ কারো খোঁজ রাখে না। ওরা এই ভিড়ে ঠাসা জায়গার মধ্যেই দুখানা ঘর ভাড়া নিয়ে আছে ওরা যেন এদিকে কোথাও কাজ করে এমন অভিনয় করে।

সুধীর মাঝে মধ্যে তার দু-একজন চ্যালার সঙ্গে দেখা করে। তারাই খবর আনে যে প্রবীর মারা গেছে—ধরা পড়েছে প্রভাত। পুলিশ ওকে মুখ খোলানোর চেষ্টা করছে কিন্তু এখনও প্রভাত ভেঙে পড়েনি। তবে কতদিন সে শক্ত থাকতে পারবে কে জানে।

পুলিশ ওকে কাল কোর্টে তুলবে আর চেষ্টা করবে যাতে ওর জেল না হয়।

সুধীরও মনস্থির করে ফেলে। ওরা যেভাবে হোক প্রভাতকে কাল পুলিশের হাত থেকে উদ্ধার করে তিনজনেই এই মুলুক ছেড়ে চলে যাবে। তাদের হাতে এখন প্রচুর টাকা তারা দূরে কোথাও গিয়ে গা ঢাকা দিয়ে যাবে। পুলিশের গাড়িটা যাবে একটা ফাঁকা জায়গায় উপর দিয়ে। ওদিকে ধাপার মাঠ। বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে নানা শাক-সব্জীর চাষ। পথটাও কিছুটা নির্জন। সুধীর-নিখিলরা পথের উপর বেশ কিছু ডালপালা দিয়ে পথটা আটকে রেখেছে। ওরা এদিকে-ওদিকে ঝোপে অপেক্ষা করছে। দেখা যায় পুলিশের গাড়িটা এসে পথের উপর ড্রাম-গাছের ডালপালা দেখে থেমে গেছে। কজন পুলিশ তালা খুলে গাড়ি থেকে নেমে সেইসব ডালপালা সারছে, প্রভাত গাড়িতে বসেছিল। সে এরমধ্যে জেলেই একজন আসামির কাছে খবর পেয়েছিল যে পথে তাদের গাড়ি আটকানো হবে আর সেই সুযোগেই পালাতে হবে প্রভাতকে।

প্রভাতও তৈরি ছিল। গাড়ি থেকেই সে দেখে নিয়েছে পথের ধারে ঝোপঝাড় ঘন ক্ষেত রয়েছে এদিক ওদিক, কোনওমতে ক্ষেতের মধ্যে একবার ঢুকতে পারলে সে ঠিক পালাতে পারবে। গাড়িটা দাঁড়াতেই ওরা নেমেছে পথ পরিষ্কার করতে, প্রভাত সুযোগ বুঝে লাফ দিয়ে ক্ষেতের মধ্যে লুকিয়ে পড়তেই একজন কনস্টেবল চিৎকার করে ওঠে—'ভাগ গিয়া-ভাগ গিয়া'।

ওদিকে ঝোপের মধ্যে রয়েছে সুধীর, নিখিল—ওদের দেখে প্রভাত গিয়ে ক্ষেতের মধ্যে ঢুকেছে। আর একজন পুলিশও দেখছে তাদের।

এরাও পালাচ্ছে—পুলিশও এবার গুলি চালাতে থাকে। ঝোপঝাড় লক্ষ্য করে ওরা গুলি চালাতে থাকে। মুহূর্তে আকাশ-বাতাস গুলির শব্দে মুখরিত হয়ে ওঠে। প্রভাতের কানের পাশ দিয়ে একটা ক্ষেতে ঢুকছে। ও জানে না সুধীর-নিখিলের কোনও খবর। ওকে তখন একটা দুঃসাহসিক শক্তি ভর করেছে। সে দৌড়াচ্ছে ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে। হাঁফাচ্ছে—তবু থামে না। যে ভাবে হোক তাকে পালাতেই হবে। মুক্তি পেতেই হবে।

প্রভাত এসে থামাল জলাশয়ের ধারে। এদিকে-ওদিকে ছড়ানো ছিটানো রয়েছে ভেড়ি, দেখা গেল একটা জায়গায় কয়েকটা চালাঘরের মতো, দু-একজন লোককেও দেখা যায়। সে এদিকের ঝোপের মধ্যে বসে থাকে। বেলাও পড়ে আসছে। চারদিকটা এখানে বেশ শান্ত। প্রভাত আরাম করতে থাকে, দেখে ওদিকে একটা পথ চলে গেছে শহরের দিকে। রাস্তা দিয়ে দু-চারটে ট্রাক যাতায়াত করছে।

বিকাল গড়িয়ে সন্ধ্যা নামছে। প্রভাত জানে না তার অন্য বন্ধুদের খবর। এখন সে একা। আর একাই তাকে এবার নতুন করে বাঁচার কথা চিন্তা করতে হবে।

সন্ধ্যের অন্ধকার নামছে, সেই সঙ্গে শুরু হয়েছে মশার উপদ্রব। প্রভাত রাস্তায় এসে দাঁড়ায়। হেড লাইটের আলো চোখে এসে পড়ে। একটা ট্রাক চলেছে শহরের দিকে। হাত দেখাতে সেটা থেমে যায়। এখানে এই ভাবেই যাতায়াত করে অনেকে। তাই ওরা প্রভাতকেও ট্রাকে তুলে নিল। ওরা সব্জী নিয়ে যাচ্ছে শিয়ালদহের কোলে মার্কেটে।

রাত তখন প্রায় নটা বাজতে চলেছে। ট্রাকটা এসে থামে শিয়ালদহ স্টেশনের কাছে। প্রভাতও নেমে পড়ে ট্রাক থেকে। শিয়ালদহ স্টেশন চত্বরে তখন যাত্রীদের ভিড়। ঘোষণা হচ্ছে নর্থ বেঙ্গল মেল...। প্রভাতের মনে শব্দটা যেন কি একটা আশার আলো বয়ে আনে। তাকে দূরে কোথাও হারিয়ে যেতে হবে। এ যেন তার সেই পথ নির্দেশিকা।

প্রভাত মন থেকে সব দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলে মাথা উঁচু করে প্ল্যাটফর্মে ঢুকে অপেক্ষামান ট্রেনটার একটা কামরায় উঠে পড়ে। প্ল্যাটফর্মে তখন যাত্রীদের কলরব চলছে, ব্যস্ততার মধ্যে যাত্রীরা গাড়িতে উঠছে।

ট্রেনটা ছেড়ে দিল—প্ল্যাটফর্ম ছাড়িয়ে বের হয়ে গেল।

ক্রমশ গতিবেগ বাড়ছে ট্রেনটা একবার দমদম স্টেশনে থামার পর সে আবার সব স্টেশন পেছনে ফেলে সামনের দিকে ছুটে চলেছে। শহরের সীমানা ছাড়িয়ে রাতের অন্ধকারে ট্রেনট চলেছে। পেছনে পড়ে রয়েছে এতদিনের শহর কলকাতা, প্রভাতের মনে পড়ে মা-তিমিরের কথা। তারাও যেন এই অতল অন্ধকারে চিরদিনের জন্যে হারিয়ে গেছে তার জীবন থেকে। সভ্য জগৎ থেকে তার নাম মুছে গেছে—জীবন তাকে এক নামহীন অন্ধকার জগতে নিয়ে চলেছে। কোথায় চলেছে তা নিজেও জানে না প্রভাত। তবু তাকে বাঁচতে হবে।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল জানে না। চোখের সামনে ভেসে ওঠে পুলিশের ছায়ামূর্তি। পেছনে পুলিশের গুলির শব্দ। তাকে যেন ধরে ফেলেছে। হঠাৎ তার ঘুম ভেঙে যায়। ধড়ফড় করে উঠে বসে প্রভাত । তখন সকাল হয়ে গেছে জানলার ফাঁক দিয়ে দেখা যায় অসমতল সবুজ ভূমি-দিনের প্রথম চিকন আলোয় তা যেন আরও সুন্দর লাগছে।

ট্রেনটা চলেছে শিলিগুড়ির দিকে। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই ট্রেনটা নিউ জলপাইগুড়ি পৌঁছাবে। একরাতেই সারা পরিবেশ যেন বদলে গেছে। প্রভাত উঠে বসে—টয়লেটে গিয়ে মুখে চোখে জল দিয়ে আসে। তার মধ্যে ট্রেনটা ঢুকে পড়েছে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে। যাত্রীরা হৈ-হৈ করে নামছে মালপত্র নিয়ে। প্রভাতের কোনও তাড়া নেই। নামবে ধীরেসুস্থে। প্রভাত নামতে যাবে সিটের নীচে দেখে একটা ব্যাগ পড়ে আছে। কোনও যাত্রী ভুল করে ব্যাগটা ফেলে নেমে গেছে। প্রভাত ব্যাগটা তুলে নিয়ে প্ল্যাটফর্মে নামে যদি সেই যাত্রীর কোনও খোঁজ পায়।

কিন্তু যাত্রীদের তখন দাঁড়াবার সময় নেই। তারা যাবে পাহাড়ে। প্রভাত ব্যাগের দাবিদারও পায় না। সেও বের হয়ে আসে ব্যাগ নিয়ে।

এবার তার মনে পড়ে তার একটা আস্তানা দরকার। কাল থেকে নাওয়া-খাওয়াও হয়নি। পুলিশ হয়তো এরমধ্যে তার নামে ছবিও বের করেছে।

...প্রভাতের এখন একটা আশ্রয়ের দরকার। এখানে যেমন চেনা-জানাও কেউ নেই। প্রভাত তাই শহরের একটা সস্তার হোটেলে শেল্টার নিয়ে ঠান্ডা মাথায় ভাববে। একটা চায়ের দোকানে এসে সে ব্যাগটা খুলেছে। দেখে তার ভিতর দু-একটা প্যান্ট-জামা একটা চাদর ছাড়া রয়েছে একটা প্যাকেট। তাতে রয়েছে কয়েকশো টাকা। ভগবানই যেন এসব তাকে জুটিয়ে দিয়েছে। কয়েকদিন তার নিশ্চিন্তেই চলে যাবে এতে, তার মধ্যে নিশ্চিয় একটা ব্যবস্থা করে নিতে পারবে।

প্রভাত চায়ের দোকানে জিজ্ঞাসা করে এদিকে মোটামুটি থাকার মতো হোটেল আছে ভাই?

চায়ের দোকানের লোকটা বলে শিলিগুড়িতে পথেঘাটে এমন থাকার জায়গা পাবেন মশাই। একটু এগিয়ে গিয়ে পাবেন ভালো হোটেল। সোজা চলে যাবেন বাঁ দিকেই পাবেন দু-তিনটে হোটেল।

প্রভাত আবার পথে নামে এখন তার দরকার একটা হোটেলের নিভৃত আশ্রয়। তারপর ঠান্ডা মাথায় ভাববে কি করা যাবে।

...সুধীর-নিখিলরা সেদিন পথের ওপর গাড়িটা থামতেই যে এই ভাবে প্রভাত পালাবে তা ভাবেনি। বোধহয় খবরটা ঠিকমতো প্রভাতের কাছে পৌঁছাতে পারেনি তারা। তাই প্রভাত গাড়ি থেকে নেমে ওইভাবে পালাল।

পুলিশ অবশ্য তাড়া করেছিল প্রভাতকেই। এদের দুজন তখন ঝোপের ভেতর থেকে সরে গিয়েছিল। পুলিশ তাদের কথা জানতেও পারেনি—ওরা প্রভাতকে লক্ষ্য করে গুলিও চালিয়েছিল কিন্তু প্রভাতের কোনও বিপদ ঘটেনি শেষ পর্যন্ত। সুধীররা ঝোপঝাড় থেকে ক্ষেতের আড়ালের মধ্যে দিয়ে আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে কোনওমতে তাদের সেই নিরাপদ আশ্রয় ফিরে গেছে।

পুলিশ সেদিন সারা এলাকা চষে ফেলে আসামিকে ধরার জন্যে। গ্রামের লোকজনও এদিক ওদিক থেকে বের হয়ে আসে আর সেই সুযোগে সুধীর-নিখিলরা ভিড়ে মিশে সরে আসে সেখান থেকে। তারাও জানে না প্রভাতের কোনও সন্ধান।

পুলিশের দলবল অবশ্য আসামির হদিশ পায় না। সুধীর জানে প্রভাতের বাড়ির অবস্থা। প্রভাতের কোনও সন্ধান নেই। তখন তার সংসারের অবস্থা আরও শোচনীয়। বাড়িওয়ালা লোকজন নিয়ে এসেছে—ভালোভাবে বের না হলে তারা ওদের ঘর থেকে বের করে দেবে। সাবিত্রী দেবীর আজ করারও কিছুই নেই।

বেশ কিছুদিন আগে সাবিত্রী দেবী স্বামী বেঁচে থাকতে দু-একবার দেশের বাড়িতে গিয়েছিল। বীরভূম জেলার একটা ছোট্ট গ্রামে তাদের জীর্ণ বাড়ি আছে মাত্র। জমি জায়গায়ও কিছু ছিল তবে দেখাশোনার অভাবে সেসব জমি তখন ভাগচাষীদের হাতেই চলে গেছে। এতদিন সে জমি-বাড়ির কথা ভাবেনি আজ সেই জীর্ণ বাড়িটাতেই তাকে ফিরে যেতে হবে। সঙ্গে মরণাপন্ন ছেলেকে নিয়ে। তিমিরের চিকিৎসাও হবে না সেখানে। চোখের সামনে তিল তিল করে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বে তিমির। প্রভাত আজ থেকেও না থাকা। কোথায় কোন দূরে অজানা অন্ধকারে হারিয়ে গেছে প্রভাত।

সাবিত্রী দেবী নিজেও ঘর ছেড়ে, কলকাতা ছেড়ে ফিরে যায় তাদের দেশে।

...সুধীর সেই নিরাপদ আশ্রয় থেকেও প্রভাতের মা-ভাই-র কথা জানে। কিন্তু তারা বাইরে আসতে পারে না। সুধীরের দু-একজন বিশ্বস্ত চ্যালা-ই শহরের সব খবর, পুলিশের কাজ কর্মের খবর দেয়।

সুধীরের চ্যালাদের মধ্যে পাঁচুগোপাল বেশ চতুর-বুদ্ধিমান। পাঁচু পাড়ার মোড়ে একটা চায়ের দোকান চালায়। সুধীররাই ওর এই চায়ের দোকান করে দিয়েছিল। চায়ের দোকানের একটা সুবিধা আছে। সহজে এখানে বসে অনেকের খবর পাওয়া যায়। পাঁচুর সঙ্গে পুলিশেরও দহরম-মহরম আছে। সেই পাঁচুই সুধীরের কাছে খবর পাঠায়। সুধীর সেদিন পাঁচুর হাতে বেশ কিছু টাকা পাঠিয়ে প্রভাতের

মায়ের কাছে দিতে বলে। সুধীর জানে ওদের টাকার খুব দরকার। এই কদিন তারাও প্রভাতের গাড়ি আটকানোর প্ল্যান নিয়ে ব্যস্ত ছিল। কিন্তু প্রভাত ফেরার হতে সুধীর সাবিত্রী দেবীর কাছে কিছু টাকা পাঠায় পাঁচুর হাত দিয়ে।

কিন্তু পাঁচু সেই টাকা এনে দেখে সাবিত্রী দেবী সেখানে নেই। পাড়ায় খবর পায় বাড়িওয়ালা তাদের তুলে দিয়েছে। সাবিত্রী দেবী অসুস্থ ছেলেকে নিয়ে কোথায় চলে গেছে। তার আর কোনও খবর পাড়ার লোকও দিতে পারে না। পাঁচুও সেইমত সুধীরদের কাছে এই টাকা পৌছে দিয়ে খবর দেয়।

সব শুনে সুধীর বলে, নিখিল প্রভাতটাও ফেরার হয়ে গলে, ওর মা-ছোট ভাইটাও যে কোথায় চলে গেল, তার খবরও নেই।

নিখিল বলে সব কেমন ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল রে। এই টাকাটাই আমাদের জীবনে অভিশাপ হয়ে এলো। সুধীরও তাই ভাবছে। সে বলে বেশ ছিলাম। কি যে কুমতি হলো। প্রবীরটা মারা গেল। প্রভাত হারিয়ে গেল। প্রভাতের মা,ভাই-এর চরম সর্বনাশ হলো। এই সবকিছুর জন্যে আমরাই দায়ী।

পাহাড়ী গাঁয়ের অবস্থানটা সত্যিই বিচিত্র। তরাই-র একটা অংশে একটা সুন্দর উপত্যকা ঘিরে গড়ে উঠেছে বসতি। চারিদিকে পাহাড় আর পাহাড়ের গায়ে বেশ সমৃদ্ধ শালবন। গাছগুলোও বেশ প্রাচীন। পাহাড়ের একদিকে সুন্দর ছবির মতো চা-বাগান। নীচ থেকে ধাপে ধাপে পাহাড়ের উপর চা গাছগুলো। একটা নদী পাহাড় ঘেষে বয়ে চলেছে তারই জলে উপত্যকার চাষাবাদ হয়। পাহাড়ের গা বেয়ে বড় রাস্তাটা সোজা গ্যাংটক-কালিম্পং -এর দিকে চলে গেছে। রাস্তা দিয়ে মালবাহী ট্রাক, কিছু যাত্রীবাহী বাসও ছুটে চলেছে। এই বড় রাস্তার থেকেই একটা সরু একটা পথ বের হয়ে এই পাহাড়তলীর উপত্যকায় ঢুকছে পাহাড়ের কোল ঘেঁষে।

বিস্তীর্ণ এই উর্বর উপত্যকার মাটিতে সোনা ফলে। এখানে উপত্যকার জমিদার ছিলেন শচীনন্দন সিং। নেপালের ওদিকে তাদের ব্যবসা ছিল। শচীনন্দন কলকাতাতেই পড়াশোনা করেন। কলকাতাতেও তাদের বাড়ি ছিল। আর এক বাঙালি মেয়েকে ভালোবেসে বিয়ে-থা করার ফলে তার পরিবারের সঙ্গে বনিবনা হয়নি।

তাই শচীনন্দন সিং খুঁজে পেতে এই উপত্যকার অঞ্চলে ব্যবসা শুরু করেন। নিজের চেষ্টাতেই এখানে চা-বাগান গড়েন, শচীনন্দন সিং ছিলেন শৌখিন প্রকৃতির মানুষ। প্রথম যখন এখানে এসেছিলেন তখন পাহাড়ী অঞ্চলের এই উপত্যকা ছিল বন-জঙ্গলে ঢাকা। দু-একটা ছোটখাটো বাড়ি-বস্তি ছিল। তাদের জীবিকা বলতে সামান্য জমি চাষ আর কাঠ কাটা। চাষআবাদ করতে হতো না।

শচীনন্দন ক্রমশ আরও শ্রমিক এনে বন কেটে সরকারের কাছ থেকে উপত্যকার ইজারা নিয়ে এখানে চা-বাগান, কলা-বাগান আর চাষের জন্যে জমি তৈরি করে এই অঞ্চলের চেহারা বদলে ফেলেন।

তৈরি করেন নিজের সুন্দর বড় বাড়ি। তাঁর জমিদারিতে যারা কাজ করতো তাদেরও কোনও অভাব হতো না। এসব বেশ কিছুদিন আগেকার কথা। এখন শচীনন্দন সিং আর বেঁচে নেই। সেই চা-বাগান কিনে নিয়েছে কলকাতার এক ধনী ব্যবসায়ী। তার আরও দু-একটা চা-বাগান আছে, আর নতুন করে তারা উপনগরী, হেলথ ক্লাব, শপিং মল এইসব ব্যবসাও শুরু করেছে। সেই মালিক চা-বাগান কিনে নিয়েছে তবে উপত্যকার বেশ জমি—কলাবাগান এখনও কিছু রয়েছে শচীনন্দন সিং-এর পরিবারে। শচীবাবুর বাঙালী স্ত্রী রজনী দেবী এখন তার একমাত্র মেয়ে বিদিশা আর ছোট ছেলে সুজয়কে নিয়ে এখানেই থাকেন। বাড়িতে গাড়ি রয়েছে। ওতে করেই বিদিশা, সুজয় স্কুলে-কলেজে পড়তে যায়।

বিদিশা এবার বি.এ দিয়েছে, আর সুজয় পড়ে হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলে। রজনীদেবী যেন ছেলেমেয়েকে কাছছাড়া করতে চান না। রজনীদেবী সেদিন শিলিগুড়িতে এসেছে ব্যাঙ্কে, পরিবারের নানা কাজ থাকে, সেই সব কাজ সেরে-টুকটাক মার্কেটিং করে গাড়িতে চেপেছে। হিল কার্ট রোড ছাড়িয়ে সেবকের দিকে চলেছে, হঠাৎ গাড়ির ইঞ্জিনটা বন্ধ হয়ে যায়। ড্রাইভার নেমে এটা-ওটা

নাড়াচাড়া করেও স্টার্ট করতে পারে না। যতই চেষ্টা করা হয় তাতে কোনও কাজই হয় না। এদিকে সন্ধ্যা নামছে। এদিকে বুনো হাতির উৎপাতও আছে, মাঝেমধ্যে তাড়া এসে বাড়িতেও হানা দেয়।

রজনীর ভাবনা হয় নিজের জন্য নয়, সুজয় রয়েছে। গাড়িও নড়ার নাম করে না। হঠাৎ এমন সময় একজন তরুণকে আসতে দেখে চাইল রজনী। তরুণটিও দাঁড়িয়ে পড়েছে—এগিয়ে এসে ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করে এনি প্রবলেম?

রজনী আর্তকণ্ঠে বলে গাড়িটা বন্ধ হয়ে গেছে বোধহয় ইঞ্জিনের প্রবলেম। ড্রাইভার বলে স্টার্ট নেহি লেতা।

তরুণটি এবার সামনে ঝুঁকে গাড়িটা দেখছে, ড্রাইভার এর আগেই বনেট খুলে চেক করছিল কিন্তু সে কিছুই কিনারা করে উঠতে পারেনি। তরুণটি এবার কি সব চেক করে বলে রেঞ্জ লাগবে। রেঞ্জ নিয়ে এটা সেটা ঠুকোঠুকি করে, দু-একটা স্ক্রু খুলে ড্রাইভার এবার স্টার্ট দিতেই নীরব ইঞ্জিনটা গর্জন করে চলতে থাকে। রজনীদেবীও খুশি হয় কিন্তু হঠাৎ আবার বন্ধ হয়ে যায়।

সুজয় বসেছিল গাড়িতে। স্টার্ট নিতেই নড়েচড়ে ওঠে সুজয়ের মুখেও তার বিচ্ছুরণ ঘটে। হেসে ওঠে সুজয়—মা গাড়ি চলবে—তরুণটি চমকে ওঠে গাড়িতে বসা ছোট্ট সুজয়ের হাসি শুনে। মনে হয় ওর হাসিটা খুব চেনা।

কিন্তু পরক্ষণেই ইঞ্জিনটা বন্ধ হয়ে যেতে সুজয় বলে, কি হলো? তরুণটি বলে একটা পার্টস বদলাতে হবে। নইলে ইঞ্জিন চলতে চলতে বন্ধ হয়ে যাবে। আবার ওকে চালু করতে হবে। কতদূর যাবেন?

রজনী বলে এখান থেকে এখনও প্রায় দশ-বারো কিলোমিটার পথ যেতে হবে।

তরুণটি বলে যাবে, তবে মাঝপথে দু'একবার আবার স্টার্ট করে চলতে হবে। তারপর পার্টসটা বদলে নেবেন।

রজনী বলে কিন্তু এতটা পথ যাবো কি করে, পথে তো আবার বন্ধ হবে তখন—

সুজয় বলে মা, ওঁকে গাড়িতে নিয়ে চলো, পথে ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে গেলে উনিই আবার চালু করে দেবেন।

রজনী ভাবেনি যে এত সহজে ব্যাপারটার সমাধান বের হয়ে যাবে। কিন্তু তারপর বলে—উনি কি যাবেন?

সুজয় বলে তুমি বলো না—বলো—উনি কি যাবেন?

তরুণটি হেসে ফেলে। নিজেই সে বলে ঠিক আছে। চলো, তোমাদের বাড়ি পৌছে দিই।

রজনীও নিশ্চিন্ত হয় তাহলে তো ভালোই হয়। কি বলে যে ধন্যবাদ দেবো তোমাকে—তুমিই বললাম—

তরুণটি বলে না না। ঠিক আছে।

ড্রাইভার গাড়ি স্টার্ট দেয়। গাড়ি চলতে শুরু করে।

তরুণটি বলে টপ গিয়ারে মাত উঠাও—অ্যাইসা চলো। গাড়িটাও ঠিক চলেছে এবার।

প্রভাত এইভাবেই রজনী সিং-এর সঙ্গে পরিচিত হয়ে উঠবে ভাবতেও পারেনি। দুদিন ধরে সেও হোটেলে রয়েছে, ভাবছে শহর ছেড়ে দূরে কোথাও যদি কোনও কাজ পায়তো তাই নিয়েই চলে যাবে। এইভাবে দু-এক জায়গায় চেষ্টাও করেছে সে। কিন্তু কাজের কোনও হদিশ পায়নি। পথে হাঁটছিল হঠাৎ গাড়িটা দেখে দাঁড়িয়ে পড়ে। গাড়ির ইঞ্জিন যন্ত্রপাতির কাজ সে জানে। সে ইঞ্জিনিয়ার তাই এগিয়ে এসে সাহায্য করেছে তারপরেই উঠে আসতে হয়েছে তাদের গাড়িতে।

রাত্রি নেমেছে—বন পাহাড়ের বুক চিরে গাড়িটা এসে এক বাগানে ঢোকে। অন্ধকারে দেখা যায়—ওরা এসে হাজির বেশ বাগান ঘেরা একটা বড় বাড়ির সামনে। রজনী বলে তোমার নামটাই জানা হয়নি।

এবার প্রভাত চমকে ওঠে। নামটা বলা ঠিক হবে না তাই ওই নামটা উড়িয়ে দিয়ে বলে কুমার

মুখুজ্জে। শিলিগুড়িতে একটা ছোটখাট্রো কাজ করি। তবে বাধা কাজ তেমন নেই—

রজনী বলে রাতটা এখানে খাওয়াদাওয়া করে থেকে যাও। কাল সকালে কথা হবে।

কাজের লোককে বলে ওর থাকার ব্যবস্থা করে রজনী। ছেলেকে নিয়ে উপরে চলে যায়।

প্রভাত দেখছে ছোট্ট সুজয়কে। তার মনে পড়ে ফেলে আসা ভাই তিমিরের কথা। ঠিক অমনি মুখ-শান্ত-ডাগর দুটো চোখ-হাসিটাও তিমিরের মতোই। প্রভাত এখানে এসে তার হারানো তিমিরকে খুঁজে পেয়েছে যেন। ওরা কোথায়? কীভাবে আছে? তার কিছুই জানে না প্রভাত।

—চলিয়ে সাব।

বেয়ারার কথায় চমক ভাঙে প্রভাতের। সে এগিয়ে যায় ওর সঙ্গে। রাতের অন্ধকারে এখানে এসেছিল প্রভাত। চারদিকের পরিবেশটা তখন ঠিক বুঝতে পারেনি। রাতেও খাওয়াদাওয়ার পর শুয়ে পড়েছিল। এখানে এসে কেমন যেন একটা উৎকর্ণেই ছিল প্রভাত। শিলিগুড়ির হোটেলে থাকত ভয়ে ভয়ে। মনে হত যে-কোনও সময়ে পুলিশ এসে তুলে যাকে তাকে। তাই রাতে ভালো ঘুমও হত না। কিন্তু এই বনপাহাড়ীর মধ্যে এসে প্রভাত যেন মনে মনে একটা জোর পায়। আজ রাতে ভালোই ঘুমিয়েছে সে।

সকালে ঘুম ভাঙার পর বাইরে আসে। এখানে সূর্যের দেখা মেলে একটু বেলা হবার পর, পাহাড়ের উপর সূর্য উদয় হয়। তার আলো সারা উপত্যকায়। এদিকে বিস্তীর্ণ উপত্যকার বুকে পাহাড় থেকে নেমে এসেছে কলার বাগান। শান্ত পরিবেশ।

এদিকে ওদিকে দু-একটা নেপালি চা-বাগানের কিছু কর্মীর বসতি। ওরাও এসেছিল চা-বাগানে কাজ করতে। বংশানুক্রমে তারা এখন এখানেই রয়ে গেছে।

—গুড মর্নিং। চাইল প্রভাত।

দেখা যায় কাল রাতের সেই ম্যাডাম রজনীদেবী, একটা শাল ঢাকা দিয়ে মর্নিংওয়াকে বের হয়েছে।

প্রভাত চাইল। রজনী বলে, সকালে জায়গাটা খুব সুন্দর। অরণ্যের রূপ দিনের আলোয় ক্ষণে ক্ষণে বদলায় কুমার।

রজনী সকালে উঠে তার বাগান থেকে বের হয়ে রাস্তার দিকে এগিয়ে চলে। প্রভাতও চলেছে তার সঙ্গে। ওদিকে চাষের কাজ চলছে। ঝর্ণার জলকে মোটর চালিয়ে মাঠে আনা হয়েছে।

ওদিকে অনেকটা জায়গায় জুড়ে গোলাপ ফুলের চাষও হয়েছে।

রজনী বলে; এককালে এই সারা উপত্যকা লিজ নিয়েছিল আমার স্বামী। এই চা-বাগান ওর। আর এদিকের বিস্তীর্ণ জমিও ছিল। এখানকার মানুষের দিন ভালো ভাবেই চলে যায়। আমারও দিন চলে যায় এর থেকে।

প্রভাত বলে, ম্যাডাম, ঝর্ণার জলে যদি একটা ডাইনামো বসানো যায়, দিব্যি কারেন্টও হবে ওর থেকে। এখানে বিদ্যুৎ এলে আরও উন্নতি হবে। চাষের সঙ্গে অন্যান্য কাজকর্মেরও সুবিধা পাবেন, কোনও হাতের কাজের প্রতিষ্ঠানও গড়ে উঠতে পারবে। আপনাদের অবস্থা আরও ভালো হবে। রজনী কি যেন ভাবছে। বলে, করতে তো আমি চাই কুমার। পাশে যে তেমন কেউ নেই। তাই আমার স্বপ্ন-স্বপ্নই থেকে যাবে। কুমার বলে তা সত্যি। কাজের লোকের খুবই অভাব। বসতির লোকজন তখন মাঠে নেমেছে। রজনীকে দেখে তারা সেলাম করে। বাড়ির মেয়েরাও বের হয়ে আসে। রজনীও তাদের চেনে। সুখ-দুঃখের কথাও হয়। ওসব সেরে ফিরছে রজনী কুমারের সঙ্গে তার বাড়িতে।

রজনীকে দেখছে কুমার।

রজনীর কর্মযজ্ঞের কিছুটা আভাস পেয়েছে প্রভাত। শহর থেকে দূরে এই শান্ত পরিবেশে এসে প্রভাতের ভালো লাগে। আর এখানে সব থেকে বড় পাওয়া এই সুজয়কে। সকালেই সুজয় বাংলোর সামনে মাঠে এসে একাই ব্যাডমিন্টন খেলছে। তার খেলার সঙ্গীও নেই। প্রভাতকে দেখে বলে—খেলবে। এসো না—

প্রভাতও নেমে পড়ে কোর্টে। দুজনে হৈ-হৈ করে ব্যাডমিন্টন খেলছে। প্রভাতের মনে হয় সে যেন

তার ছোট ভাই তিমিরের সঙ্গেই ব্যাডমিন্টন খেলছে। প্রভাত যেন দূর অতীতে হারিয়ে যায়। আজ সে তিমিরের কোন খবর জানে না। তার মনে হয়, এই সুজয়ই যেন তার সেই তিমির।

—সুজয়, বেলা হয়ে গেছে। চলে এসো—

কার ডাক শুনে চাইল সুজয়। বলে, দিদি, কুমারদাকে হারিয়েই যাচ্ছি, এই সেটটা হতে দে—প্লিজ। কুমার দেখছে তরুণী মেয়েটাকে। ও যে সুজয়ের দিদি তা বুঝেছে প্রভাত। ম্যাডামের মেয়ে। বেশ সুন্দরী আর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মেয়ে।

এমন সময় রজনী এসে হাজির হয়, ওদের খেলাও থেমে গেছে।

মাকে দেখে বিদিশা বলে সুজয়ের কাণ্ড দ্যাখো মা, পড়াশোনা ছেড়ে খেলতে বসেছে।

রজনী বলে, সুজয় যাও। পড়তে বসো। মাধ্যমিকে তুমি ভালো রেজাল্ট করোনি। যাও দিদির কাছে ওসব দেখে নেবে।

চলে যায় সুজয় দিদির সঙ্গে। প্রভাতকে ফিরতে হবে। ওদিকে ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে আসবে সেই শিলিগুড়িতে পার্টস বদলাতে হবে।

প্রভাত বলে তাহলে আসি ম্যাডাম। রজনী দেখছে তার কাজের পরিচয়ও আর সেই ঝর্ণার জলে ডায়নামো বসিয়ে জলবিদ্যুৎ তৈরির পরিকল্পনাটাও শুনেছে। রজনীর স্বামী শচীনন্দনজীও এমনি একটা স্বপ্ন দেখেছিল যেটা কাজে পরিণত করতে পারেনি। আজ প্রভাতকে সেই কথা বলতে দেখে কথাটা মনে ধরেছে রজনীর।

রজনী বলে তুমি ঝর্ণার জল থেকে বিদ্যুৎ তৈরির কথা বলছিলে, ওটা করা যায় না? কত খরচা পড়বে?

প্রভাত বলে, যায়। আর খরচাও খুব বেশি না। শিলিগুড়িতে পুরনো ডায়নামো সস্তায় মিলবে—একটু মেরামত করে নিলেই হবে।

রজনী বলে তাহলে ওটা করার ব্যবস্থা করো। তুমি শিলিগুড়িতে একটা ডায়নামো দেখে এসো। তোমার সুবিধামতো কাজ করবে। মাইনে যা চাও দেব—

কুমার ভাবতে পারেনি যে এমনটা হবে। তার এই জায়গাটাকে ভালো লেগেছে, ভালো লেগেছে এই মানুষটিকে। সবচেয়ে খুশি হবে প্রভাত সুজয়কে কাছে পেলে।

প্রভাত বলে, না তেমন কোনও অসুবিধা হবে না এখানে থেকে কাজ করতে। —তাহলে তো খুব ভালোই হয়। তাহলে তুমি এখানে থেকে কাজটা শুরু করো, কুমার। আমিও চাই এই উপত্যকার রূপ বদলাতে।

প্রভাত এখন পাহাড়তলীর এই বাংলোতেই রয়ে গেছে।

রজনীদেবীও খুশি। প্রভাত এরমধ্যে তার কাজও শুরু করে দিয়েছে। সেই ঝর্ণাটা একহাজার ফুট পাহাড়ের উপর থেকে নীচে এসেছে। তার চেহারাটা একটা ছোটোখাটো জলপ্রপাতের আকারই নিয়েছে। পাথরে-পাথরে ঘষা খেয়ে সেই জল নামছে। সেখানেই ডায়নামো ফিট করে বিদ্যুৎ তৈরি করে সেই কারেন্ট এনেছে বাংলোয়।

প্রভাত রয়েছে এই বাড়িতে, সুজয় এখন তার কাছেই পড়াশোনা করে। অবশ্য এটা মোটেও সুজয়ের দিদি বিদিশার পছন্দ নয়।

বিদিশা প্রথম থেকেই এই তরুণটিকে যেন দেখতে পারে না। ওকে এড়িয়ে চলে। এতদিন সুজয় বিদিশার সঙ্গেই ব্যাডমিন্টন খেলত। কিন্তু দিদি খেলাধুলোয় তেমন চৌখস নয়, ফলে খেলাটা হয়ে উঠতো একপেশে। সুজয়ের ভালো লাগত না, এবার প্রভাত আসাতে এখন সুজয়ের ভালো খেলার সঙ্গী জুটেছে।

বিদিশার সঙ্গে খেলছে সুজয় — প্রভাত এসে দাঁড়াতে সুজয় তার দিদিকে বলে—তুই বের হয়ে যা দিদি, কুমারদা খেলবে।

এটা যেন বিদিশার কাছে চরম অপমান। সে র‍্যাকেটটা ফেলে দিয়ে বের হয়ে আসে।

সুজয় এটা দেখেও দেখে না। কিন্তু প্রভাত বলে, উনি তো খেলছিলেন।

সুজয় বলে দিদিতো 'গুড ফর নাথিং'—ছাই খেলে।

সুজয় জানে বিদিশা রাগ করেছে।

সুজয় সেদিন বিদিশার কাছে পড়ছে, একটা ইকুইসানের অঙ্ক নিয়ে হিমসিম খাচ্ছে বিদিশা।

সুজয় বলে, অঙ্কটা করে দে দিদি, না হলে ক্লাসে মাস্টারের বকুনি খেতে হবে।

বিদিশা চেষ্টা করছে, কিন্তু হচ্ছে না।

ওদিকে টেবিলে বসে প্রভাত রজনীর ফার্মের জমা খরচের হিসাব দেখছে। সে নিজে ছিল খুব ভালো ছাত্র। তাই সে বিদিশাকে বলে, ভুল করছেন, ওটা এইভাবে করুন। এই তো—

নিজেই অঙ্কটা ঠিক ভাবে করে দেখাতে সুজয় বলে,

—দারুণ! দ্যাখ দিদি তুই পারলি না—

এ যেন বিদিশার পরাজয়। চলে যায়।

প্রভাত বলে, দিদিকে এভাবে বলা তোমার ঠিক হয়নি।

সুজয় বলে, বারে ও পারল না তুমি করে দিলে বলব না?

এসব খবর রজনীর কাছেও পৌঁছে যায়। ড্রইংরুমে সন্ধ্যার পর রজনী হিসাবপত্র নিয়ে বসে। প্রভাত এখন ফার্মের কাজ কর্ম দেখছে। আর ফার্ম এখন লাভের মুখ দেখছে। ওদিকে ঘরে এখন সেই ডায়নামো থেকে বিদ্যুৎ তৈরি হচ্ছে, বিজলি বাতিও জ্বলে।

রজনী বলে, কুমার দারুণ মাথার ছেলে।

বিদিশা বলে, ওসব ওর ভড়ং, তুমি অজানা অচেনা একজনকে এনে কাজ দিলে শেষে কোনও প্রবলেম হয় না।

রজনী বলে, কুমার তেমন ছেলে নয়। প্রভাতও দেখেছে বিদিশা তাকে এড়িয়ে চলে। প্রভাত অবশ্য এটাকে সহজভাবেই মেনে নিয়েছে। সে পাহাড়তলীর বসতির সহজ সরল মানুষগুলোকে নিয়ে এখানকার রূপ বদলাতে এখন ব্যস্ত। রজনীও এই কাজে এগিয়ে এসেছে। চাষে এখন সেচের উন্নতি করে নতুন চাষের জমিও বের করছে। দু-তিনটে ছোট জলাশয় খনন করে তাতে জল সঞ্চিত করে রাখার ব্যবস্থাও করেছে। সেদিন বাংলোর অফিসে রজনী বলে, কাজকর্ম দেখছে এমন সময় দু-তিনটে দামী গাড়ি আসতে দেখে চাইল। গাড়ি থেকে নামছে রাশভারী চেহারার লোক, ওকে চেনে রজনী।

বিদিশা-সুজয় বাইরে বাগানে ছিল।

লোকটা নেমে চারিদিকে দেখছে, চারদিকে সবুজ-কমলালেবুর বাগান। এখন লেবু পাকা শুরু হয়েছে, ওদিকে সুন্দরী একটা মেয়েকে ও ছোট ছেলেটাকে দেখে চাইল লোকটা। এর মধ্যে গাড়ি থেকে তার অন্য চ্যালারাও নেমেছে। তাদেরই একজন ভদ্রলোককে ওই ছেলেমেয়ের পরিচয় জানিয়ে দিতে লোকটা মাথা নাড়ে।

তারপর এসে অফিসে ঢোকে। তার দু-তিনজন অনুচর সঙ্গে।

—নমস্তে ম্যাডাম।

বিদিশা চাইল। দেখেই চিনেছে বিদিশা লোকটাকে। পরনে দামী স্যুট। লোকটা তাদের জীবনে দুর্বিসহ হয়ে উদয় হয়েছে। তবু মনের জ্বালা চোখে মুখে আড়াল করে বলে,

—আসুন, মিঃ আগরওয়াল। বলুন—হঠাৎ এদিকে?

আগরওয়াল লোকটাকে দেখতে দানবের মতো কুশ্রী হলেও এমনিতে বেশ সৌখিন। সবসময় সেজেগুজে থাকে দামী সেন্ট ব্যবহার করে।

চেয়ারে বসে বলে, চা-বাগানে এসেছিলাম, তাই শোচলাম আপনাদের খবর নিয়ে যাই।

এই আগরওয়াল কলকাতার নামী ব্যবসায়ী, এখানে চা-বাগানও আছে সেই সুবাদেই পরিচয়।

রজনী দেখছে লোকটাকে। শচীনন্দনকে নানা প্রস্তাব দিয়ে ফাঁসিয়ে লোকটা ওদের চা-বাগানের দখল

নেয়। শচীনন্দনজী মারা যাবার পর নানা দেনা, ব্যাঙ্ক লোন দেখা দেওয়ায় এই বাগানটাই হস্তান্তর করে। এখন আগরওয়ালাই সেই চা-বাগানগুলোর দখল নিয়েছে।

আজ আগরওয়াল বলে, রেকর্ড খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলাম—শচীনন্দনজী আমাদের ফার্ম থেকে সাত লাখ টাকা নিয়েছিল—এসব পাহাড়ের জমিন গিরবী রেখে।

রজনী চমকে ওঠে, কি বলছেন এসব? উপর পাহাড়তলীর জমিন কোথাও বন্ধক রাখেনি, টাকাও নেননি।

হাসে আগরওয়াল, আপনি সব ব্যাপারটা জানেন না ম্যাডাম। ঠিক আছে। গিরবী তো ছাড়লাম। তবে একটা কথা বলছি আপনাকে ভি পার্টনার করে দেব, এক ভদ্রলোক জমিটাতে টাউনশিপ করতে চায়। হেলথ ক্লাব-লজ সবই হবে। আমি সব পেপার রেডি করে দেব সই করে দেবেন, হাতে ভালো ক্যাশ এ্যাডভানস আসবে—রজনী শুনছে কথাগুলো।

রজনী বলে, এখানে উপনগরী-টাউনশিপ হলে পাহাড়তলীর এতগুলো পরিবারের কী হবে? তাদের ঘর বাড়ি-জমি, রোজগারের জায়গা চলে যাবে তারপর তারা যাবে কোথায়? বাঁচবে কী করে?

আগরওয়াল বলে, ম্যাডাম আমাদের বাঁচাটাই বড়। ওদের বাঁচার কথাটা ওদেরই ভাবতে দিন। আমরা ওদের জমিঘরের জন্য কিছু টাকা দেব, ব্যাস ওরা দুসরা কোথাও সরে যাবে। ইখানে টাউনশিপ হবেই।

রজনী বলে, জমি-বাড়ি থেকে উৎখাত হয়ে চাষীর জীবন থেকে ভূমিহীন দিনমজুরে পরিণত হবে।

আগরওয়াল বলে, কি আর করা যাবে বলেন? আজকাল সবাই তা করে। আমার কথাটা বলে গেলাম। হামি কাগজ সব রেডি করে আনব কিন্তু। যেন রজনীকে হুকুম দিয়েই চলে গেলেন আগরওয়াল।

প্রভাত বাইরে থেকে ঘরে এসে ঢুকেছে তখন রজনী চুপ করে বসে আছে। প্রভাত বলে, শরীর খারাপ নাকি ম্যাডাম।

—না। কুমার একটা প্রবলেম হয়েছে—

তারপর সেই প্রবলেমের কথাগুলো জানায় প্রভাতকে। এই পাহাড়তলীর বুকে এই আগরওয়ালাদের উপনগরীর কথা।

প্রভাত বলে, আপনি না করে দিন। এতগুলো পরিবারের সর্বনাশ হবে। এই সুন্দর পরিবারগুলো নষ্ট হয়ে যাবে।

রজনী বলে, এই লোকটাকে তুমি চেনো না কুমার, লোকটা সাংঘাতিক। খবরটা এর মধ্যে পাহাড়তলীর কয়েকটা বসতির মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। শান্ত মানুষগুলো এতোদিন ধরে মুখ বুজে সব সয়ে এসেছে। এবার তারা সুখের মুখ দেখেছে, এখন জমিতে ভালো ফসল হচ্ছে। বাজারে দামও পাচ্ছে। রাতের আলোতে এখানে এখন চা-বাগানেও কাজ হচ্ছে, ফলে তাদের অবস্থাও বদলাচ্ছে। জলসেচেরও সুবিধা পেয়েছে আর তা সম্ভব হয়েছে প্রভাতের চেষ্টাতেই। সবাই এখানে এখন কুমারের ভক্ত, সবাই কুমারকে ভালোবাসে।

সেদিন সারা গ্রামের মানুষ মিলে একটা মিটিং করে, সেখানে কুমার রজনীও আসে।

আজ তারা বলতে পারে বাপ-ঠাকুর্দার এই জমি আমরা ছাড়ব না। টাউনশিপের দরকার নেই আমাদের। কিন্তু যাদের দরকার তাদের হাতেই রয়েছে অগুনতি টাকা, রয়েছে অন্য সব মদতও। তাই আগরওয়াল কদিন পরেই আসে রজনীর বাংলোয়।

রজনীদেবী কুমারকে পেয়ে এই পাহাড়তলীকে তার পরিকল্পনা মতো সাজাতে চায়। তার মেয়ে বিদিশা অবশ্য প্রভাতের উপর মায়ের এই বিশ্বাসকে কখনও মেনে নিতে পারে না। কিন্তু সুজয় এখন প্রভাতের আপনজন হয়ে উঠেছে। দিদির কাছে আর না পড়ে এখন সে প্রভাতের কাছেই পড়ে। আর সুজয় এবার ক্লাসে ফার্স্ট হয়েছে।

রজনী সেদিন অফিসে কাজ করছে আগরওয়ালকে দেখে চাইল। মিঃ আগরওয়াল এবার সই করার কাগজটা বের করে দেয়।

—কি? রজনী জিজ্ঞাসা করে আগরওয়ালকে।

আগরওয়ালা বলে পাহাড়তলীর টাউনশিপ এগ্রিমেন্ট। ইটা সই করে দিন। এই সই থেকেই আমাদের টাউনশিপের কাজ শুরু হবে। তারপর বুলডোজার এসে সব সাফা করে দেবে।

রজনী এবার আগরওয়ালার কথায় বলে, আমি কিন্তু এ-ব্যাপারে মতা দিইনি। আমি টাউনশিপ করব, তবে এসবে আমি নেই।

আগরওয়াল দেখছে রজনীকে। রজনী ওর কথা শেষ করে উঠে পড়েছে। আগরওয়াল বলে, ম্যাডাম, সই করে দিন। আমি বলছি সই করে দিন। রজনী কণ্ঠস্বরকে শক্ত করে বলে, আমি সই করব না।

এমন সময় এসে পড়ে প্রভাত, বাইরে থেকে এসে সে আগরওয়ালের এই কণ্ঠস্বর শুনেই চিনেছে। এ সেই আগরওয়ালা সেই কারখানা তুলে দিয়ে ওখানে এখন হাউসিং করে এবার উঠেপড়ে লেগেছে বহু লোকের পেটের ভাত বন্ধ করে এখন এই উপত্যকার গরিব মানুষগুলোর ঘর-বাড়ি-জমি থেকে তাদের উৎখাত করতে।

রজনী দেবী কঠিন স্বরে বলেন, মিস্টার আগরওয়াল আমার যা বলার বলেছি এখন যেতে পারেন।

লোকটা মনে মনে ফুঁসছে, তবু বলে, ম্যাডাম, আমার কথাটা শুনলে ভালো করতেন। ঠিক আছে আমি যাচ্ছি। তবে কাজটা ভালো করলেন না।

আগরওয়াল কাগজটা তুলে নিয়ে গাড়িতে উঠে বসলেন, গাড়ি শব্দ তুলে বেরিয়ে গেল।

স্তব্ধতা নেমে আসে।

প্রভাত বলে রজনীকে, ম্যাডাম, লোকটা কিন্তু সুবিধের নয়।

রজনী বলে, তা জানি কুমার। ওই শয়তানের হাত থেকে এদের বাঁচাতেই হবে। উন্নয়নের নামে ওরা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করতে চায়। তা আমি হতে দেব না।

আগরওয়াল ও তার দলবল এখন টাকার গন্ধ পেয়ে মানুষখেকো বাঘের মতো হিংস্র হয়ে উঠেছে। ওরা দেখেছে এই কাজ শুরু করতে পারলে তাদের হাতে মোটা মোটা টাকা এসে যাবে। কিন্তু রজনী দেবী তাদের সেই পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

ওদিকে চা-বাগানও তুলে দিয়েছে, চা-বাগানের কাজ বন্ধ হয়ে রয়েছে। ফলে এলাকার বহু মানুষ, বহু ছেলেমেয়েরা কাজ হারিয়েছে। তারা এবার আন্দোলনে নামার কথা ভাবছে।

প্রভাতও এগিয়ে আসে, তার নেতৃত্বেই সেই কুলির দলবল চা-বাগান আর কারখানা ঘেরাও করেছে। ফলে আগরওয়ালের লোকও দখল পায়নি চা-বাগানের। তাদেরও সব দিক থেকেই লোকসান হতে শুরু করেছে।

এর কদিন পরেই ঘটনাটা ঘটে যায়।

শিলিগুড়ি থেকে ক্লাস করে ফিরছে বিদিশা-সুজয়। সেদিন দু-একটা কাজ সারতে দেরি হয়ে যায়।

বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা নামছে। সেদিন বিকাল থেকেই বৃষ্টি নেমেছে এদিকে প্রায়ই বৃষ্টি হয়। আজ বৃষ্টির সঙ্গে শুরু হয়েছে হাওয়ার দাপট। পথে লোকজনও কম, গাড়িগুলো চাকার শব্দ তুলে ছুটে চলেছে মাঝে মধ্যে।

ওদের গাড়িটা সেবক রোড ধরে আসছে, হঠাৎ দুটো গাড়ি এসে দুদিক থেকে ওদের গাড়ির গতিরোধ করে। আর সঙ্গে সঙ্গে দুটো গাড়ি থেকে কয়েকজন লোক নেমে আসে, হাতে উদ্যত হয়েছে রিভলবার। বিদিশা দেখছে লোকগুলোকে।

সুজয় ভীত কণ্ঠে বলে, দিদি এরা কে?

একটা লোক ধমকে ওঠে, চুপ।

তারপর ওরা দুজনকে টেনে নামিয়ে তাদের গাড়িতে তোলে। বিদিশাদের গাড়ির ড্রাইভারকে দুজন লোক হাতটা বেঁধে গাড়িতে ফেলে রেখেছে। ওরা পথের ধারে গাড়িতে ড্রাইভারকে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় ফেলে রেখে বিদিশা-সুজয়কে ওদের গাড়িতে তুলে নিয়ে চলে গেল।

রাত হয়েছে। রজনী দেবী ভাবছেন, এখনও বিদিশারা ফেরেনি। শিলিগুড়িতে ফোন করে জানতে পারে ওরা বের হয়ে গেছে। এদিকে রাত তখন নটা। ওরা তখনও ফেরেনি। রজনী ভাবছে।

প্রভাত বলে ম্যাডাম, আমি বের হয়ে দেখছি পথে হয়তো ওদের গাড়ি খারাপ হয়ে যেতে পারে।

রজনী বলে, তাই যাও কুমার, লোকজন সঙ্গে নিয়ে যাও। প্রভাত পথ দিয়ে আসছে। কিছুটা এসে পথের ধারে তাদের গাড়িটা দেখে এগিয়ে গিয়ে এবার ড্রাইভারকে উদ্ধার করে আর কি হয়েছে জেনে চমকে ওঠে। রজনী দেবী আজ অসহায় বোধ করে। প্রভাত ড্রাইভারকে উদ্ধার করে গাড়ি সমেত ফিরে আসে। রজনী দেবীরও ঘুম আসে না। সে চিন্তাতেই ছিল। রজনী দেবীও ড্রাইভারের সব কাহিনী শুনে চমকে ওঠে।

কুমার বলে, ম্যাডাম, এসব ওই আগরওয়ালারাই কাজ। আপনি ওদের টাউনশিপের পরিকল্পনায় সায় দেননি, ওদের হাত থেকে অনেক টাকা বেরিয়ে যাবে তাই সেই রাগেই এইভাবে আঘাত করার চেষ্টা করেছে আপনাকে। নাহলে এতদিন কিছু হল না—আজ কেন এইভাবে কিডন্যাপ হল বিদিশা-সুজয়। রজনীও ভাবছে কথাটা। রাত নেমেছে। বৃষ্টির তেজ কিছুটা কমেছে তবে বৃষ্টি তখনও থামেনি। এমন সময় ফোনটা বেজে ওঠে। রজনী এগিয়ে গিয়ে ফোনটা ধরে।

আগরওয়ালের এই কাজটা বেশ অবাক করে প্রভাতকে।

আগরওয়াল বলে, ম্যাডাম, আমাদের টাউনশিপের কাগজটা সই না করে ভুলই করেছিলেন। এর জবাব দেবার জন্যেই আমরা আপনার ছেলেমেয়েকে তুলে আনতে বাধ্য হয়েছি। আমাদের কাগজ সই করে দিন ওরাও বাড়ি ফিরে যাবে। নাহলে—

রজনী আর্তকণ্ঠে বলে ওঠে—ওরা কোথায় আছে? হ্যালো-হ্যালো লাইনটা কেটে যায়।

প্রভাতও বসেছিল সামনে, সে জিজ্ঞাসা করে—কার ফোন?

রজনী বলে, আগরওয়ালার গলা বলেই মনে হলো। বলেছে সেই কাগজে সই না করে দিলে ওদের ফেরত দেবে না।

রজনী বলে, কুমার, পুলিশকে খবর দাও।

প্রভাত বলে, ম্যাডাম, পুলিশকেও শয়তানটা নিশ্চয়ই হাতে এনেছে। ওরা আটঘাঁট বেঁধেই এই কাজে নেমেছে। পুলিশকে খবর দিয়ে ফল হবে না। থানা এসব ঘটনার কথা নিশ্চয়ই জানে।

—তাহলে কী করা যাবে?

প্রভাত বলে, ওদের দলিলে সই করে দিন।

রজনী যেন ফেটে পড়ে। কঠিন কণ্ঠে বলে, না। আমি এর শেষ দেখেই ছাড়ব কুমার। এইভাবে শয়তানটার কাছে নিজেকে বিক্রি করতে পারব না। আমার ছেলেমেয়েকে ওরা বিপদে ফেলেছে, তাই বলে সারা পাহাড়তলীর মানুষকে, সব পরিবারকে আমি কোনও বিপদে ফেলতে পারব না।

প্রভাতও রজনীর কথাগুলো শুনে খুশি হয়। সে বলে, আমিও তাই চাই ম্যাডাম। দেখা যাক এই লড়াই-এ কারা জয়ী হয়। ওরা না আমরা। শয়তান না মানুষ।

আগরওয়ালের লোকজনরা এখানে এর মধ্যে অনেক চেষ্টা-চরিত্র করেছে চা-বাগানগুলো দখল নেওয়ার জন্যে। আর আগরওয়ালও এমনিতে চতুর সাবধানী লোক।

সে এখানে এসেছিল চা-বাগানের ব্যবসা করতে। নানা ছলে সে কিছু চা-বাগান বগলদাবাও করে। সেইসব চা-বাগানে এইরকম মালিকানায় শ্রমিক অসন্তোষ ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। ধীরে ধীরে বাজারে যার জন্যে চায়ের চাহিদা কমতে থাকে। সেই বাজার দখল করে নেয় চীন-শ্রীলঙ্কার মতো দেশ।

ফলে ভারতের চা-বাজারে নেমে আসে মন্দার ভাব। একটা একটা চা-বাগান তখন নানা কারণে বন্ধ হয়ে যেতে থাকে। আগরওয়ালা সেই সুযোগে চা-বাগানগুলোকে তুলে দিয়ে ওখানে উপনগরী-হাউসিং এস্টেট গড়তে থাকে। আর তিনগুণ লাভে ওইসব ফ্ল্যাট বিক্রি করে লাভবান হয়ে ওঠে।

এইসব কাজে পাশে পাওয়া যায় নেতাদেরও। টাকার জোরে প্রশাসনের মাথা যারা সেইসব নেতাদেরও হাতে এনেছে। তাই এবার পাহাড়তলীতে আন্তর্জাতিক মানের রিসর্ট-হেলথ ক্লাব-ভিলেজ-উচ্চ মানের ফ্ল্যাট বিক্রির স্বপ্ন দেখছে।

সেই স্বপ্ন সত্যি করতেই এবার আগরওয়াল চরম পথে নেমেছে। তাই রজনী দেবীর ছেলেমেয়েকেই তুলে এনেছে সে। সেই সন্ধ্যায় ওই আগরওয়ালের বিশ্বস্ত অনুচর মদনলাল তার বসে-র নির্দেশমত গাড়ি আর লোকজন নিয়ে পথের ধারে বনের মধ্যে পথ আটকে ওদের অপহরণ করেছিল।

তাদের কাছে খবর ছিল বিদিশা আর সুজয়কে নিয়ে ওদের গাড়ি ওই পথ দিয়েই ফিরছে। আর বনের মধ্যে ওই দুর্যোগের রাতে ওদের গাড়ি থামিয়ে দুজনকে তাদের গাড়িতে তুলে সোজা দুর্গম পাহাড়ীর ওদিকে একটা গোপন ঘরেতে তাদের নিয়ে গিয়ে তোলে।

বিদিশা এই পাহাড়ী অঞ্চলে মানুষ হয়েছে। এদিকের কিছু অঞ্চল সে চেনে। সুজয় এসবের কিছুই জানে না। সে রাতের অন্ধকারে দুষ্কৃতীদের হানা দিতে দেখে ভয়ে শিউরে উঠেছিল। বিদিশা ঠিক ঠাওর করতে পারেনি যে কোথায় তাদের এনে ফেলেছে। বেশ অনেকটা পাহাড়ী চড়াই ভেঙেই উপরে উঠেছে গাড়িটা। তাদের নিয়ে এসছিল রাতের অন্ধকারে। বেশ কিছু পাইন গাছ দেখে মনে হয় পাহাড়ের অনেক ওপরেই তাদের আনা হয়েছে।

এই ধরনের পরিস্থিতির সম্মুখীন তারা হবে ভাবতে পারেনি, তাই ওরা বেশ অসহায় বোধ করে।

রাতটা কেটে যায়। সারা বনে টিপটিপ করে বৃষ্টি নেমেছে। এখানে উচ্চতার জন্যে ঠান্ডার প্রভাবটাও বেশি।

মদনজী অবশ্য এদের থাকার খাবার ভালোই ব্যবস্থা করে। বিদিশা বলে, কেন ধরে এনেছ আমাদের? মদনলাল বলে সব জেনে যাবে, এবার খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়ুন। ঠিক সময়েতেই বাড়ি পৌঁছে যাবেন। বিদিশা কিছু খায় না, সুজয় তবু কিছু খায়। বিদিশার ঘুম আসে না। তবু শেষ রাতের দিকে ঘুমিয়ে পড়েছিল। যখন ঘুম ভাঙে তখন সকাল হয়ে গেছে। ঘরের জানলা দিয়ে দেখা যায় তুষার বরফে ঢাকা কাঞ্চনজঙ্ঘার শিখর দেশ। ওরা যেন নেপালের কাছাকাছি অঞ্চলে রয়েছে। বাইরে বের হয়ে আসে। দেখে চারদিকে বেশ উঁচু দেওয়াল। বেশ সুরক্ষিত জায়গা-টা। দু-চারজন পাহাড়ী লোক কাজ করছে। কেউ তাদের সঙ্গে কোনও কথাই বলছে না।

একজন পাহারাদার, কাঁধে একটা দামী রাইফেল। সেই-ই বলে, বাহার মাত আসো। আন্দার যাইয়ে।

ও যেন চায় না বিদিশা বাইরে এসে-ওদের কাজ দেখুক। এদিক ওদিক কয়েকটা খচ্চরও দেখা যায়। তাদের পিঠেই মাল আনা নেওয়া করে এই দুর্গম পাহাড়ী অঞ্চলে। সব সময় গাড়িও চলে না বোধ হয়।

...খবরটা তখন ছড়িয়ে পড়েছে পাহাড়তলীর হাটে-ঘাটে, গঞ্জতে, মাঠে-মাঠে একই আলোচনা। এই খবরে চটে উঠেছে গর্ন্ধব সিংও। তার অধীনেও বেশ কয়েকটা বসতি রয়েছে। তিনিও গরিব মানুষের ঘর-বাড়ি-জীবিকা কেড়ে এখানে টাউনশিপ গড়তে দিতে নারাজ। তারাও এসব হতে দিতে চায় না।

এদিকে আগরওয়ালজিরাও বসে নেই। তারা শহরের প্রশাসনকে কাজে লাগিয়ে একটা সরকারি নোটিশ বের করে এইসব বসতির মানুষের কাছে সেই নোটিশ দিতে এসেছে। এর মধ্যে গর্ন্ধব সিং তার লোকজন নিয়ে প্রভাতবাবুর সঙ্গে বের হয়েছে। হাটতলায় আজ প্রচুর লোকজনের সমাগম হয়েছে। হাটবারে বিরাট এলাকা জুড়ে এখানে হাট বসে। পাহাড়ের পাহাড়তলীর শান্ত জীবন যাত্রায় একটার পর একটা বিপদের কালো ছায়া ঘনিয়ে আসে।

রজনী দেবীও এই কঠিন আঘাতে কেমন দিশেহারা হয়ে গেছে। বিদিশা আর সুজয়কে তুলে নিয়ে তার ওপর চাপ সৃষ্টি করছে আগরওয়াল। কিন্তু তিনি কোনওমতে মাথা নোয়াতে চাননি। প্রভাতও দেখেছে রজনী দেবীর এই কাঠিন্যতাকে।

রজনী দেবী বলে, আমার যা সর্বনাশ হয় হোক তবু আমি পাহাড়তলীর মানুষদের কোন বিপদ হতে দেব না। এদের জমি-বাড়ি ওদের হাতে তুলে দেব না।

প্রভাতও গর্ন্ধব সিং-এর লোকেদের নিয়ে বিদিশা-সুজয়কে কোথায় আটকে রেখেছে তার

খোঁজখবর নেবার চেষ্টা করছে। কিন্তু আগরওয়ালও বসে নেই। ওরা এবার উপত্যকার মানুষদের উপর আরও কঠিন আঘাত হানার পরিকল্পনা করেছে। যে ঝর্ণাটা পাহাড়ের ওদিক থেকে প্রবাহিত হয়ে এসেছে এই উপত্যকায়, সেই ঝর্ণাটাই ক্রমশ নদীর আকার ধারণ করে এই উপত্যকাকে সবুজ-শস্যশ্যামলা করে রখেছে। ওর জলেই এই উপত্যকার মানুষের তৃষ্ণা নিবারণ হয়।

আগরওয়ালের দল সেই নদীর উপর একটা বিশাল কর্মযজ্ঞ শুরু করেছে। নদীতে বাঁধ দিয়ে সেই জল আটকে এরা বিশাল জলাধার করবে। সেই জলাধার থেকে জল সরবরাহ করা হবে তাদের নতুন অত্যাধুনিক টাউনশিপে। আর জলাধারের জলকে জলবিদ্যুৎ-এর কাজে লাগানো হবে। তার জন্যই জল আটকাতে হবে—এতে করে সারা উপত্যকার মানুষের সামনে আজ এসেছে মরণপণ সংগ্রামের কথা। রজনী দেবীর কাছেই এসে হাজির হয় সারা উপত্যকার মানুষ। হাট-বাজার-স্কুল সব বন্ধ হয়ে গেছে। আশেপাশের দু-একটা চা-বাগানের শ্রমিকরাও কাজ বন্ধ করে আজ এসেছে এখানে। রজনী দেবীর বাড়ির সামনে বড় মাঠটা জনতার ভিড়ে ভরে গেছে। তাদের মধ্যে পাহাড়ি আদিবাসীরাও রয়েছে। চা-বাগানের কর্মীতো আছেই সঙ্গে রয়েছে চাষীর দলও। সবাই এসেছে তারা মাদল-ধামসা বাজায়, হাতে তীর-ধনুক সমেত। আজ এই বাঁচার লড়াই-এ তারাও মরিয়া, দরকার তারা সবাই মিলে নদীর বাঁধের কাজে বাধা দেবে। এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে তারা আজ প্রতিবাদ করবেই। এই জল প্রকৃতির সম্পদ তার ওপর টাকার জোর খাটিয়ে সাধারণ মানুষগুলোকে সেই সম্পদ থেকে বঞ্চিত করে রাখতে চায়। উপত্যকার মানুষগুলো যেন অধৈর্য হয়ে উঠেছে।

তাই ওরা সদর্পে ঘোষণা করে— দরকার হলে আমরা এই নদীর বাঁধ যারা বাঁধছে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ব। তাদের হারিয়ে দিয়ে—বাঁধমুক্ত করব এই নদীর জলধারাকে।

এদিকে রজনীদেবীও জানে—আগরওয়ালের দলবল এর মধ্যেই প্রশাসনকে হাতে এনেছে। তাদের অর্থবলও আছে।

তাই রজনী বলে, এখনই এত বড় সংঘাতে যাওয়া ঠিক হবে না। প্রভাতও চেনে এই আগরওয়ালকে। প্রভাত জানে নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য লোকটা সবকিছু করতে পারে। সেই কথা বলে গর্দ্ধব সিংও। গর্দ্ধব সিং এই অঞ্চলে সব রকম দু-নম্বরি কাজের ব্যাপার জানে। গন্ধর্ব সিং-এর কাঠের গোলা, বড় করাত কলও আছে। সেই সুবাদে কাঠের গোলায় একটা হাতিও আছে। হাতিটা তার কাছে নিজের ছেলের মতোই।

বীরবাহাদুর আজ অনেক বড়—তার দুটো গজদন্ত আছে। আর তার চেহারাটার মধ্যেও একটা আভিজাত্য আছে। প্রভাত গর্দ্ধব সিং-এর এখানে যাতায়াত করে সেই সুবাদেই বীরবাহাদুরের সঙ্গেও তার চেনাজানা হয়ে গেছে। প্রভাত এলে ওর জন্য কলা-কাঁঠাল যা পায় নিয়ে আসে তাই বীরবাহাদুরও খুশি। প্রভাত মাঝে মধ্যে ওর পিঠেও চাপে।

আগরওয়াল ভেবেছিল চাপ দিতে পারলে রজনী দেবী তাদের দলিলে সই করে দেবে। আর উপত্যকার দখল নিয়ে নিজের স্বার্থসিদ্ধির স্বপ্ন পূরণ করতে পারবে। তার নদীতে বাঁধের কাজও ক্রমশ এগোচ্ছে—এখন নদীর স্রোতে বাঁধ আসেনি— তাই জল কিছু আছে উপত্যকায়। তবে কাজ যত এগোবে ততই নদীর জলকে আটকেই দেবে।

· বিদিশা-সুজয়ের এই বন্দিদশা ভালো লাগে না। ওরা এখানকার লোকগুলোকেও সহ্য করতে পারে না। সুজয়ের এত কিছুর মধ্যেও তার কুমারদাকে বার বার মনে পড়ে। সে বলে, কুমারদাকে যদি একটা খবর দিতে পারতাম—বিদিশা বলে তোর কুমারদা যে এই শয়তানদের লোক নয় তা কি করে জানিস?

সুজয় এটা বিশ্বাস করে না।

সে বলে, কুমারদা তা নয়। ও খবর পেলে ঠিক এখানে এসে আমাদের উদ্ধার করবেই।

বিদিশা চুপ করে থাকে।

সুজয় বলে, যদি কোনো রকমে খবর দেওয়া যেত। ওরা দেখেছে জায়গাটা উঁচু পাহাড়ের উপর। চারদিকে উঁচু পাঁচিলে ঘেরা। বিজলী বাতিও নেই। রাতে চারদিকে অন্ধকার লাগে। তারাগুলোও সব

দেখা যায় না। মেঘে মেঘে ঢাকা থাকে। সুজয় তবু আশা ছাড়েনি। সে রাতের অন্ধকারে হ্যারিকেনের আলোটাকে উপর-নীচ, এপাশ-ওপাশ নাড়ায়।

বিদিশা বলে, কি হচ্ছে?

সুজয় বলে, সিগন্যাল দিচ্ছি। ঠিক কোনওদিন ওদের নজরে পড়বে।

গন্ধর্ব সিং—প্রভাতরাও খোঁজ করছে। গন্ধর্ব সিং এই অঞ্চলের বেশ কয়েকটি গোপন ডেরার সন্ধান রেখেছে। ওরা চলেছে একটা পাহাড়ী রাস্তা ধরে। মাঝে মাঝে গাড়ির আলো চোখে পড়ে।

প্রভাত বলে, গাড়ি যাতায়াত করে এদিকে।

গন্ধর্ব সিং বলে, ওদের ডেরাতে গাড়িও যায়।

ওরা সাবধানে এদিক থেকে পাইন বনের মধ্যে দিয়ে চলেছে। বৃষ্টি নামে—ওরা কোনও পাহাড়ী বাড়ির চালায় আশ্রয় নেয়।

রাত নামে—হঠাৎ প্রভাতের নজরে পড়ে পাহাড়ের উপরে একটা জায়গা থেকে একটা আলো কেমন ওঠা-নামা করছে। কেউ যেন সংকেত পাঠাতে চাইছে।

গন্ধর্ব সিং আলো দেখে বলে, ওটাইতো সেই ডেরা। মজবুত পাহাড় রয়েছে ওখানে।

প্রভাত বলে, ওখানে যেতেই হবে। নিশ্চয়ই ওখানেই রয়েছে বিদিশা-সুজয়।

এই খবরটা রজনী দেবীও পেয়ে গেছে—তিনিও তৈরি ছিল,এবার যা করার তিনি একাই করবেন। আজ সে সোজা এস.পি.সাহেবকেই এই খবরটা দিয়ে ফোন করে। তার সাহায্যও প্রার্থনা করে—যাতে নিরাপদে তার ছেলে-মেয়ে ঘরে ফেরে।

এসব খবর অবশ্য প্রভাত জানে না।

প্রভাত যখন গন্ধর্ব সিং-এর সঙ্গে প্ল্যান করে কিভাবে সুজয়-বিদিশাকে ওখান থেকে মুক্ত করে আনবে। প্রভাতের মনে পড়ে সেই ব্যাঙ্ক ডাকাতির কথা। তখন সে নিজে কয়েকটা বোমাও বানিয়েছিল—আজও তেমন কয়েকটা বোমা বানায়।

গন্ধর্ব সিং বলে, এগুলো কাজে লাগবে?

প্রভাত বলে, না-না। বিশেষ প্রয়োজন না হলে তেমন আওয়াজই করব না।

ওরা রাতের অন্ধকারে এগিয়ে চলে পাহাড় চূড়ার উদ্দেশ্যে। প্রভাতেরা আগেই লক্ষ করেছিল কোথাও কোথাও এদের পাহারাদার আছে। সর্তক রয়েছে গন্ধর্ব সিং নিজে আর প্রভাতকে দিয়েছে তার দলের বেশ শক্ত লড়াকু কিছু লোক। এদের সঙ্গে রয়েছে-টাঙি-গাঁইতি-বেলচা আর লাঠি। যে যা হাতিয়ার পেয়েছে নিয়ে রাতের অন্ধকারে সন্তর্পণে এগোচ্ছে। রাতেই সদ্য নির্মিত বাঁধে তারা ডিনামাইট দিয়ে সেই বাঁধ উড়িয়ে দেবে। আর এই ডিনামাইটের ব্যবহারও প্রভাত শিখিয়ে দিয়েছে বেশ কিছু তরুণদের। আজ তারাও এগিয়ে চলেছে বাঁধ উড়িয়ে দিতে। আগরওয়ালার দল অবশ্য সব খবর পায়নি। তবু তারা সাবধানী নজর রেখেছে। এই সব ডেরাগুলোতেই দেশের সীমানা পেরিয়ে নানা রকম সরঞ্জামের আমদানি-রপ্তানি ঘটে। আজ বাইরে থেকে একটা বিদেশি মালের চালান এসেছে। তাই আগরওয়ালও নিজে এসেছে এই পাহাড়ের ডেরাতে। রাতের বেলায় বেশ কয়েকজন পার্টি এসেছে মাল নিয়ে যাবার জন্য। সেই হাতিটা প্রভাতদের সঙ্গেই ছিল। সে লাথি মেরে ওদের উঁচু পাঁচিলটাকে ভেঙে ফেলে। আমন্ত্রিত লোকেরা দিশেহারা হয়ে ওঠে। তবু তারা এদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে চেষ্টা করে। ওদিকে পুলিশ বাহিনীও এগিয়ে আসছে পাহাড়ী পথ বেয়ে, এরা নীচ থেকে দেখতে পায় গুলি চলছে ওপরের পাহাড়ী বাংলোয়। ওরা সেইদিকেই ওঠে আসে। গন্ধর্ব সিং যে বিশাল বাহিনী নিয়ে এইভাবে তাদেরকে আক্রমণ করবে তা ভাবেনি আগরওয়াল। হাতিটাও এর মধ্যে শুঁড় নেড়ে দু-চারজন লোককে আহত করেছে। বেগতিক দেখে আগরওয়ালের দলের লোকজনই এবার তাদের বস আগরওয়ালকে ফেলে পালাবার চেষ্টা করে। বিদিশা-সুজয় ভাবতেই পারেনি তাদেরই আলো সত্যিসত্যি এইভাবে কুমারদার দৃষ্টি আকর্ষণ করে এদের বাংলোয় আক্রমণ চালাবে তাদের উদ্ধার করতে। সুজয় ছুটে আসে কুমারদার কাছে। দুজন দুজনকে জড়িয়ে ধরে।

বিদিশাও আজ খুশি যে সত্যি কুমার এইভাবে নিজের জীবন বিপন্ন করে তাদের উদ্ধার করতে এসেছে।

আগরওয়াল চমকে ওঠে—তুমি! প্রভাত!

আগরওয়াল আজ চিনেছে প্রভাতকে। কিন্তু এখন আর তার কিছু করার নেই। এর মধ্যে রজনী দেবীর সঙ্গে পুলিশ সুপার ফোর্স নিয়ে হাজির হয়। আজ সেও খুশি।

কিন্তু এবার আচমকাই আগরওয়াল সুপারকে জানায়, কে এই প্রভাত কুমার জানেন? এ এককালে ব্যাঙ্ক ডাকাতির ফেরার আসামি।

রজনী চমকে ওঠে—সে কি! না না—এসব মিথ্যা। আমি জানি কুমার একজন বিশ্বাসযোগ্য মানুষ, সৎ কর্মী।

আগরওয়াল বলে, আমাকে যদি অ্যারেস্ট করতে হয় তবে একেও অ্যারেস্ট করতে হবে। কলকাতা শহরে যোগাযোগ করলেই সব জানতে পারবেন—

আগরওয়াল আরও কিছু বলতে যাবে তার আগেই এবার প্রভাত বলে, হ্যাঁ, পুলিশ সাহেব চাকরি হারিয়ে আমি ব্যাঙ্ক ডাকাতি করেছি, তার জন্য এই আগরওয়ালও দায়ী। আমিও ভালোভাবে বাঁচতে চেয়েছিলাম।

পুলিশ সুপার সব শুনে বলে— সে সুযোগ আইন তোমাকে দেবে। আইন তার নিজের পথেই চলে। তাই তোমাকেও আমরা অ্যারেস্ট করতে বাধ্য হচ্ছি।

ওদিকে তখন উপত্যকায় সূর্যের আলো ফুটছে। সব অন্ধকার দূর করে নদীর ওপর তৈরী করা বাঁধ ততক্ষণে উড়িয়ে দিয়েছে। আজ এই উপত্যকার মানুষ সব বাধাকে দূর করে, সব চক্রান্তকে ব্যর্থ করে, নতুন করে বাঁচার আশ্বাস পেয়েছে। পুলিশ নিয়ে চলেছে প্রভাতকে। আজ রজনী-বিদিশা-সুজয়সহ উপত্যকার সব মানুষের মন এক অব্যক্ত বেদনায় ভরে ওঠে।

সুজয় কান্নাভরা স্বরে বলে, তুমি ফিরে আসবে কুমারদা।

প্রভাতের মনে হয়—তিমিরের মতো সুজয়ও তার জীবন থেকে চিরদিনের জন্যে হারিয়ে গেল।

আজকের নায়ক

কলোনির মধ্যে বিশ্বনাথবাবুর বাড়ি সকলেই চেনে। বিশ্বনাথবাবু নিষ্ঠাবান মানুষ, একটা বেসরকারি অফিসে চাকরি করেন। সকালে ঘন্টাখানেক পূজা স্তব পাঠ করে অফিসে যান। পাড়ার মানুষ সকলে তাঁকে শ্রদ্ধা সম্মান করে। অভাবের সংসার। তবু দুই ছেলে বিক্রম-রবি আর মেয়ে চন্দ্রাকে নিয়ে তিনি শান্তিতে সব দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে বাঁচতে চান।

স্ত্রী মালতীও স্বামীর মতোই শান্ত স্বভাবের। বিক্রমকে নিয়েই কিছু সমস্যা দেখা দেয় মাঝে মাঝে।

বিক্রম উচ্চমাধ্যমিক দিয়ে এখন কলেজে পড়ছে। সুন্দর চেহারা। এ বাড়িতে চন্দ্রা গান গায়, বিক্রমও। তাদের বাড়িতে লক্ষ্মীপুজোর দিন চন্দ্রা, বিক্রম লক্ষ্মীর ভজন গায়। পুজো করেন বিশ্বনাথবাবু।

বিশ্বনাথ বলেন,

—নিজে খেটে সৎপথে থেকে যেটুকু পারিস তাকেই মেনে নিবি। এই জীবনে তোকে বড় হতে হবে। লেখাপড়া শিখে মানুষ হতে হবে। ঈশ্বর তোর সহায় হবেন।

চন্দ্রা স্কুলে পড়ে। মাধ্যমিক দেবে। সে বাবার আদর্শে বিশ্বাসী। মাধ্যমিক দিয়ে নিজে পড়ে — গানের চর্চার করে। সে চায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে; আর রবি হাসিখুশিই থাকে। বিক্রমের সঙ্গে কলেজে পড়ে সন্ধ্যা। বড়লোকের মেয়ে, গাড়িতে করে কলেজে আসে। বিক্রম এমনিতেই একটু প্রতিবাদী চরিত্রের। কলেজের ছেলেদের লিডার।

সেদিন কলেজের অব্যবস্থার প্রতিবাদে ছেলেদের নিয়ে ধর্মঘট ডেকেছে। সন্ধ্যা এর প্রতিবাদ করে। বিক্রমের সঙ্গে বচসা করে। সন্ধ্যা জোর করে মেয়েদের নিয়ে ক্লাসে ঢোকে।

সন্ধ্যার সঙ্গে কলেজের অন্য দলের মস্তান পল্টুর খুব ঘনিষ্ঠতা। পল্টু গাড়ি হাঁকিয়ে কলেজে আসে। বড়লোকের ছেলে। বিক্রম ওদের দেখতে পারে না।

কলেজের পিকনিকে সন্ধ্যাও এসেছে। সেই পিকনিকে পল্টু সন্ধ্যাকে নির্জনে পেয়ে তার ওপর অত্যাচার করতে চায়। অসহায় সন্ধ্যা। এই সময়ে এসে পড়ে বিক্রম। সেই পল্টু ও তার দলবলকে মারধোর করে সন্ধ্যাকে বাঁচায়। এবার সন্ধ্যাও বুঝতে পারে অর্থবানরা নয়, যারা সাধারণ ঘরের ছেলে তাদের অনেকেই সৎ-তেজস্বী। সন্ধ্যার এবার ধারণাটা বদলে যায়। সে বিক্রমকে এখন বিশ্বাস করে।

এমনি দিনে বিশ্বনাথবাবু যে কারখানায় কাজ করতেন, তার মালিক সরকারের কাছ থেকে অনেক টাকা ঋণ করে, সব টাকা মেরে দিয়ে কারখানা লকআউট করে।

সংসারে এবার অভাবের ছায়া নামে। ঐ কলোনির অন্যদিকে থাকেন সত্যচরণবাবু। স্কুলের শিক্ষক। ছাত্র-ছাত্রীদের স্নেহ করেন। তাঁর মেয়ে রেবা, ছেলে অজয়। বাড়িতে গানের রেওয়াজ করে রেবা। রেবা চন্দ্রার সঙ্গে পড়ে। চন্দ্রাও আসে রেবার বাড়িতে।

সত্যচরণও ঐ বিশ্বনাথবাবুকে চেনেন। অবসর নিয়েছেন সত্যচরণ। মাঝে মাঝে পার্কে বিশ্বনাথবাবুর সঙ্গে দেখা হয়। বিশ্বনাথের মালিকের অত্যাচারের কথাও শোনেন, বলেন—সমাজের রূপটাই বদলে গেল বিশ্বনাথবাবু।

বিক্রম তখন সন্ধ্যাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখছে। দুজনে যেন কোনও স্বপ্নের রাজ্যে হারিয়ে যায়।

এমনি দিনে বিক্রম বাবাকে কারখানা থেকে আহত বিধ্বস্ত হয়ে ফিরতে দেখে চটে ওঠে। মালিকের অফিসে গিয়ে হাজির হয়। মালিককে যা-তা বলে শাসায়। মালিকও তাকে শাসায়। —সিধে করে দেবে মস্তানদের এই বলে।

—আমি মস্তান নই, আপনার অন্যায়কে মেনে নেব না। বিক্রম জবাব দেয়।

বিশ্বনাথবাবু এসব শুনে বিক্রমকে শাসান।

চন্দ্রা ও রেবা টিউশানি করে দিন চালায়। রবির পড়াশুনা বন্ধ হবার উপক্রম। তবু বিশ্বনাথবাবু বলেন,

—বিক্রম, আর তো কটা মাস। তুই বি.এটা পাস কর, কাজ একটা হবেই। ঠাকুর মুখ তুলে চাইবেন!

সন্ধ্যা এখন বিক্রমকে ভালোবাসে। তারা দুজন এখন স্বপ্ন দেখে। সন্ধ্যা বলে, বাবাকে বলেছি —আমাদের বিয়েটা হয়ে গেলে সব ঠিক হয়ে যাবে।

কিশোরবাবু সন্ধ্যার বাবা—এখন কারখানা বন্ধ, নেতা হয়ে ভালো আছেন। একমাত্র মেয়ে সন্ধ্যা—তার বিয়ে-থা দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চান। সন্ধ্যা একটি ছেলের কথা বলেছে। সন্ধ্যার কথামত তিনি ছেলেটিকে দেখতে চান। সেইমতো আজ বিক্রম অনেক আশা নিয়ে এসেছে সন্ধ্যার বাবার সঙ্গে দেখা করতে। কিন্তু কিশোরবাবু বিক্রমকে দেখেই চমকে ওঠে— সেই বিশ্বনাথবাবুর ছেলে। এবং বখাটে, মস্তান বলে এবার বিক্রমকে অপমান করে কিশোরবাবু তাকে তাড়িয়ে দেন।

অপমানিত বিক্রম বলে, —আপনাদের মতো ভণ্ড নেতা — রক্তচোষা মালিকদের বিরুদ্ধেই এবার লড়ব। আপনাদের মুখোশ খুলে দেব।

সন্ধ্যার স্বপ্নভঙ্গ হয়। বাবাও তাকে যা-তা বলে। এমনি দিনে সন্ধ্যা আবিষ্কার করে — সে মা হতে চলেছে। বিক্রমের সন্তান তার গর্ভে।

সন্ধ্যা ছুটে আসে বিক্রমের কাছে। কিন্তু তার মধ্যেই কিশোরবাবু পুলিশকে বলেন—ঐ মস্তানকে সিধে করতে হবে।

সুযোগও মিলে যায়। কিশোরবাবুর দল এখন প্রমোটারি করছে । ঐ সত্যচরণবাবুর পাঁচকাঠা জমি তে-মাথার মোড়ে। এখন তার দাম অনেক। ঐ জায়গাটা তাদের চাই। কিশোরবাবুই তার সহকারীকে পাঠান জায়গার দখল নিতে। তারা সত্যচরণকে ভয় দেখায়। তাঁর ছেলে অজয়ও প্রতিবাদ করে।

এমন সময় এসে পড়ে বিক্রম। সেও লোকজনদের মারধোর করে তাড়ায়। মধুবাবু এবার বিক্রমকেই ধরে খুনের চার্জ ও ডাকাতির চার্জে জড়িয়ে জেল-হাজতে পাঠায়। সন্ধ্যা এসেছে। দেখে, এখন বিক্রম নেই। খুনের, ডাকাতির দায়ে জড়িয়ে, কেস দিয়ে তাকে মিথ্যা অজুহাতে হাজতে পুরেছে। আর এ তার বাবারই কাজ।

এবার সন্ধ্যার তেজস্বী রূপ ফুটে ওঠে। সে আজ তার বাবাকে ঘৃণা করে। বাবা মেয়েকে টাকা, প্রতিষ্ঠার লোভ দেখাতে চায়। কিন্তু সন্ধ্যা, বলে, বিক্রমই আমার সব। তার সন্তান আমার গর্ভে। আর তুমিই তাকে মিথ্যা ষড়যন্ত্র করে জেলে পুরেছ। তোমার টাকা, প্রতিষ্ঠা, এসবকে আমি ঘৃণা করি। কিছুই চাই না—আমি নিজের পায়েই দাঁড়াব।

সন্ধ্যা বাড়ি ছেড়ে তার এক বান্ধবী ইলার কাছে চলে যায়।

ইলা কোনও হোটেলে ক্যাবারে নাচে। তার ফ্লাটেই ওঠে। ইলার সঙ্গে থাকা শুরু করে সন্ধ্যা।

বিক্রম ভাবতে পারেনি যে ওইভাবে তাকে মিথ্যা অপবাদে জেল হাজতে যেতে হবে। বিশ্বনাথবাবু এখানে ওখানে ঘোরেন ছেলেকে ছাড়াবার জন্য। উকিলবাবু টাকা চান। চন্দ্রা-রবিও চেষ্টা করে। কিন্তু কিছুই হয় না — বিক্রম জেলেই গেল।

কিশোরবাবুও খুশি হন। কিন্তু সন্ধ্যাকে ফেরাতে পারেন না। তার এখন একটি ছেলে হয়েছে। নাম রেখেছে শুভ্র। কিশোরবাবু সন্ধ্যাকে বলেন,

—ছেলেকে মানুষ করতে হবে তো? ওর বাবা এখন তো জেলে। একটা মস্তান, তোলাবাজের জন্য নিজের জীবনটাকে নষ্ট করবি?

সন্ধ্যা বলে,

—তোলাবাজ মস্তানদের নেতা তোমরাই—সে তোলাবাজ নয়। আর তোমার পাপের পয়সায়

আমার ছেলেকে মানুষ করব না। আমার নিজের পরিশ্রমের পয়সাতেই সে সৎ মানুষ হবে। আর তোমাদের ঐ অত্যাচারের জবাবই আমার শুভ্র দেবে।

কিশোরবাবু এখন মন্ত্রী হয়েছেন। কয়েকটা বছর কেটে গেছে। বিক্রম জেল থেকে বের হয়, সাতটা বছর তার হারিয়ে গেছে। জেলেই তার দেখা হয় আলির সঙ্গে। কলকাতার অন্ধকার জগতের মস্তান সে। আলি দেখে ভাবে বিক্রমকে লেখাপড়া জানা ভদ্রলোকের ঘরের ছেলে। মিথ্যা অভিযোগে জেল খাটছে। বলে,— বাবুজি, ভাল মানুষ থেকে ঝুটা ইলজাম নিয়ে জেল খাটছ, তোমার জিন্দেগি বরবাদ করে দিল। ঘর বসাতে ভি দিল না। এর বদলা তোমাকে নিতে হবে।

—কেমন করে তা হবে?

আলি বলে,

—তার পথ আমিই তোমাকে বাতলে দেব। আর তার জন্য থোড়া ট্রেনিং—তাও ভি দিয়ে দেব।

জেলেই বিক্রমকে ঐ আলি, আর তার দলবল ট্রেনিং দিয়ে দেয়। ক্যারাটে, বক্সিং—আর রিভালবারও চালাতে শিখেছে বিক্রম। মনে মনে তার একটা চাপা রাগ জাগে সেই কিশোরবাবুর উপরই।

সংগ্রাম একজন সৎ দক্ষ পুলিশ অফিসার। বাগুইহাটি থানাতে রয়েছে। তার কাছে খবর আসে, নতুন একটা গ্যাং তোলাবাজি-গুন্ডামি করছে। ব্যবসায়ীদের চাপ দিচ্ছে। সংগ্রাম পুলিশ নিয়ে সেই জায়গায় রেড করে তিনজনকে ধরে। বাবুয়া দলের সর্দার। সে পালাচ্ছে বড় রাস্তা দিয়ে। পিছনে সংগ্রামের জিপ। হঠাৎ মন্ত্রীর কনভয় এসে পড়ে। সংগ্রাম তাকে অ্যারেস্ট করে।

মন্ত্রী সেই কিশোরবাবু। তিনিও দেখেন ব্যাপারটা গাড়িতে বসে। ওদিকে বাড়িতে পৌঁছে মন্ত্রী কিশোরবাবু ফোন পান তার প্রিয় সহকারী মন্টুর কাছ থেকে বাবুয়া তার দলের খুব বড় কর্মী। পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে। তাকে ছাড়াতে হবে। না হলে পুলিশের চাপে সে যদি মুখ খোলে, সকলেই বিপদে পড়বে। সেই মতো মন্ত্রী অফিসারকে ডেকে পাঠান।

সংগ্রাম আসে। কিন্তু সে বাবুয়াকে ছেড়ে দিতে চায় না। কারণ, এর মধ্যে সত্যচরণবাবুর বাড়িতে হামলা করেছে ঐ তোলাবাজ বাবুয়া। বোম মেরেছে। সত্যচরণ আহত! সে থানাতে অভিযোগ করেছে।

ব্যাপারটা অবশ্য কিশোরবাবুকে জানিয়ে মন্টুই করেছে। মন্টু এখন বিল্ডিং তৈরি করছে। সত্যচরণবাবুর জায়গার উপর তাদের নজর আছে। ওখানে তিনমাথার মোড়ে সত্যবাবুর জায়গাটা তাদের দরকার। খুব লাভজনক বিল্ডিং হবে।

কিন্তু সত্যচরণ ও তার ছেলে অজয় রাজি হয় না। অজয় গান-টান গায়। তার বোন রেবাও কোথায় যেন কাজ করে।

হাসিখুশি অজয় কিশোরের কাছে চাকরির জন্য আসে। ওরা চাপ দেয় ঐ জায়গার জন্য। কিন্তু অজয় রাজি হয় না। তাই জোর করেই ওদের আক্রমণ করে। সেইজন্য সত্যচরণবাবু বাবুয়ার নামে নালিশ করেছে।

মন্ত্রী বলেন, সাক্ষী কেউ দেবে না। বাবুয়ার বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ টিকবে না। তুমি ওদের ছেড়ে দাও।

কিন্তু সংগ্রাম রাজি হয় না। মন্ত্রীও চটে যান—তবে মুখে বলেন, তোমার কর্তব্য জ্ঞানে আমি খুশি অফিসার, এমনি সৎ অফিসারই আমার দরকার। সংগ্রাম খুশি মনে বাড়ি ফেরে কিন্তু বাড়িতে মন্টুর ফোন আসে, বাবুয়াকে ছেড়ে দেবার জন্য। পরে সংগ্রামের স্ত্রী স্বাতীকেও মন্টু হুমকি দেয়। সংগ্রাম তবু অনড়। তার স্ত্রী-ছেলে নিয়ে সংসার। বোন রিয়া মুম্বাইতে থাকে। সেও আসবে লিখেছে।

আদালতে সত্যচরণের মামলা ওঠে—বাবুয়া আসামি। কিন্তু সংগ্রাম কোনও সাক্ষীই দিতে পারে না। ফলে, বাবুয়াকে মন্টুরা ছাড়িয়ে নিয়ে যায়। সংগ্রাম হতাশ হয়।

সংগ্রামের বোন রিয়া আসছে মুম্বাই থেকে। ওকে বাড়িতে আনে সংগ্রাম। রিয়াও শোনে সংগ্রামের হতাশার কথা। রিয়া বলে, দেশের নেতারাই আজ দেশকে নরক বানিয়েছে।

ওদিকে দেখা যায় মন্টু এবার বাবুয়াদের নিয়ে সত্যচরণের বাড়িতে হানা দেয়। জবরদখল করে

রয়েছে ওরা — তাই তুলেই দেবে। আর অজয়, রেবারও সর্বনাশ করে দেবে ওরা যদি জায়গা ছেড়ে না দেয়।

অজয়, রেবা রাজি নয়। তবু সত্যচরণ ওদের বাঁচাবার জন্যই এই জায়গা ছেড়ে চলে যায় অন্যত্র। অজয় বলে, এর বিহিত করবই।

সে আসে সংগ্রামের কাছে। এখানে পরিচয় হয় রিয়ার সঙ্গে। সংগ্রাম আজ অসহায়। সে শয়তানদের কাছে হেরে গেছে। অজয় বলে,

—না, হার মানবেন না। এই লড়াইয়ে জয়ী হতেই হবে।

রিয়াও তার দাদাকে জয়ী দেখতে চায়। সেও লেখাপড়া জানে। খেলাধুলাতেও চৌকস। বুদ্ধিমতী। রিয়াও বলে,

—অজয়বাবু ঠিকই বলেছে দাদা! আমিও তোমার পাশে থাকব। ওদের মুখোশ তোমাকে খুলে দিতেই হবে।

স্বাতী, সংগ্রামের স্ত্রী। সে বলে,—ঘর সংসার করি, ওদের চটিয়ে লাভ কি? আরও তো অনেক পুলিশ অফিসার আছে, তারা কেমন নিশ্চিন্তে আছে! তাদের বাড়িতে তো ফোনে হুমকি যায় না! তোমার এখানেই আসে।

রিয়া বলে, দাদা ওদের মুখোশ খুলে দিতে চায়! দাদা ওদের দাস নয়!

স্বাতীর ভালো লাগে না। সংগ্রাম তার কর্তব্য করবেই।

এবার মন্টু চায় সরকার থেকে কিছু মোটা টাকা লোন নিয়ে সেটা গিলে ফেলতে। তার জন্য অবশ্য একটা গালভরা স্কিমও আছে। কী কারখানা করবে। তাই এসেছে ঐ কিশোরবাবুর কাছে।

কিশোরবাবু এখন ঝাড়া হাত-পা। একমাত্র মেয়ে সন্ধ্যা বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে। তার ছেলে নাকি এখন কোনও বোর্ডিং-এ থাকে। সন্ধ্যা ইলার কাছেই থাকে।

কিশোরবাবুও ধাপে ধাপে উপরে উঠছে। মন্ত্রী হয়েছে। এখন তার টাকা — প্রতিষ্ঠা হয়েছে। তাই ফূর্তির উপকরণও জোটে।

মন্টুকে কিশোরবাবু বলেন, জানিস তো, এখন সংসার ছেড়ে জনসেবা নিয়ে রয়েছি। তোরা আমার সেবার ব্যবস্থা কর।

মন্টু বলে, বারাসাতের বাগান-বাড়িতে ওসব ব্যবস্থা থাকবে গুরু। ফুলের মতো মেয়ে! খুশি হয় কিশোরবাবু। মন্টুর দলের বাবুয়াকে মেয়ের খোঁজ করতে বললে সে বলে, সেই মাস্টারের মেয়েটা তো বেশ ডগবগ হয়েছে — ওটাকেই তুলে নিয়ে যাব। ব্যাটা মাস্টার আর তার তেজি ছেলেটা বুঝবে কাদের ল্যাজে পা দিয়েছিল!

সেই মতো বাবুয়ার দলও তৈরি ছিল। রেবা সন্ধ্যার নির্জন পথে টিউশান সেরে ফিরছে। ওরা তাকে তুলে নিয়ে যাবে বলে ধরেছে। চিৎকার করে রেবা। ছুটে আসে লোকজন। অজয়ও ফিরছিল। কিন্তু বাবুয়ার দল বোম চার্জ করে লোকজন থামিয়ে মেয়েটাকে জিপে তুলে নিয়ে পালায়।

অজয় বাড়িতে খবরটা আনে। সত্যচরণ অসুস্থ হয়ে পড়ে ঐ খবর শুনে।

—রেবাকে কারা ধরে নিয়ে গেল!

অজয় বলে, আমি জানি, খুঁজে বার করবোই রেবাকে।

রেবাকে ওরা এনেছে বারাসাতের বাগান বাড়িতে। অসহায়—তবু বিদ্রোহ করে। কিশোরবাবুও ঘাবড়ে যান।

—কাকে এনেছিস! এ তো সব ফাঁস করে দেবে!

মন্টু বলে, —ওর সর্বনাশ তো কর, তারপর আমি ওর মুখ চিরদিনের জন্য বন্ধ করে দেব।

—তাহলে তাই করি? কি বল!

কিশোরবাবু বলেন,

—তবে যেন ওর মুখ বন্ধ হয়ে যায়। তুইও পেসাদ নিবি।

রাতের অন্ধকারে দেখা যায় মন্টুর দল লাশটা এনে রেললাইনে ফেলে দিয়ে যায়। একটা ট্রেন পাস করছে।

লোকজন দেখে একটি মেয়ের লাশ পড়ে আছে। এদিকে অজয় খুঁজছে রেবাকে উদ্ভ্রান্তের মতো। সে দেখে মন্টুর দলকে জিপটাতে। আড়াল থেকে শোনে — শালা মাস্টারের মেয়েটার দফারফা করেছে ঐ কিশোরদা— আমরা ঠিকানা লাগিয়ে দিয়ে গেলাম।

তারপর লোকজনের ভিড় দেখে অজয় এগিয়ে দেখে রেবার দেহটা।

চিৎকার করে ওঠে সে।

বাড়িতে সত্যচরণ অসুস্থ। রেবার ঐভাবে মৃত্যু সংবাদ পায় অজয়ের মুখে। পুলিশ অফিসার সংগ্রামও আসে খবর পেয়ে। সত্যচরণবাবু হার্টফেল করেন।

অজয়ের সামনে তার বাবা-বোন ঐ শয়তানের জন্য মারা গেল। সংগ্রাম চেষ্টা করে, কিন্তু পোস্টমর্টেম রিপোর্ট আসে — ট্রেনে কাটা পড়ে মারা গেছে রেবা। অজয় এসেছে সংগ্রামের বাড়িতে। রিয়াও সব শুনে চটে ওঠে, মেয়েদের মান-ইজ্জত প্রাণ নিয়ে খেলা করবে এইভাবে? ঐ শয়তানদের দলের শাস্তি হবে না?

অজয় বলে, মন্ত্রী আর তার লোকজনই দায়ী। এসবের কোনও প্রতিকার তাই হবে না।

সংগ্রাম বলে, ওদের কালো হাত আইনের গলা টিপে ধরেছে।

রিয়া বলে, কেউ কি তাদের বাধা দিতে পারবে না?

জেল থেকে ছাড়া পায় বিক্রম। সে এসেছে আলির আস্তানায়। আলি বলে, তাহলে এবার কাজে লেগে পড় বিক্রমবাবু! যা এলেম তোমার, এই লাইনে টপ হয়ে যাবে। আমি তোমার আন্ডারেই কাজ করব। টাকা-বাড়ি-গাড়ি সব পাবে বস! বিক্রম রাজি হয় না। সে এই অন্ধকারের জীবনকে মেনে নিতে পারে না। নিজে অপরাধী হয়ে অন্য অপরাধীদের শাস্তি দিতে পারবে না। সেই কিশোরবাবুকে জবাব দিতে হবে। আলি বলে, তা এখানে থেকেই পারবে। টাকা-হাতিয়ার লোক সব হাতে থাকবে।

—আমি একাই লড়াই করব, সৎভাবে লড়ব, বলে বিক্রম।

—ঠিক আছে, তবে দরকার হলে এই আলিকে ডেকো।

বিশ্বনাথবাবুর সংসারে এখন দৈন্যদশা। বিশ্বনাথবাবু তবু ঠাকুরকে পূজা করেন। স্ত্রী বলে, কী হয় ওতে? বিক্রমের কিছু হয়েছে? বিশ্বনাথ বলে, ঠিক বিচার হবেই। সে একজন লোভী মানুষ। পাপের সাজা হবেই। তবু চন্দ্রা, রবি যে করে হোক সংসার চালাচ্ছে। এই সংসারে পাপ ঢুকতে দেবে না।

বিক্রম আসে। মা ছুটে যায়। ঘরে আনবে। চন্দ্রাও খুশি হয়েছে দাদাকে দেখে। আজ মা তার হারানো ছেলেকে ফিরে পেয়েছে।

চন্দ্রাই বলে, দাদা তুই চলে যাবার পর সন্ধ্যা—

—ওর নাম করিস নে। বিক্রম বলে, ওর বাবার জন্যই সব শেষ হয়ে গেল আমার। সেও—

—না! চন্দ্রা বলে—

সেই সন্ধ্যাও তোর সন্তানের মা! সেও তোর উপর ওর বাবার ঐ অত্যাচারের প্রতিবাদে ঘর ছেড়ে চলে গেছে। আজ সে কীভাবে পরিশ্রম করে নিজের ছেলেকে হোস্টেলে রেখে পড়াচ্ছে—তা ইলাদির কাছে শুনেছি।

বিক্রম অবাক হয় সন্ধ্যার এই প্রতিবাদের কথা শুনে, তার সন্তান হয়েছে!

মা বলে,

—ওরে বিক্রম, যেভাবে হোক একটা কাজ কর্ম তুই কর। বৌমা-দাদুভাইকে তুই ঘরে আন। শূন্য ঘর আবার পূর্ণ হয়ে উঠবে।

চন্দ্রা বলে, তাই কর দাদা!

ঢুকছে বিশ্বনাথ। এখন সে অন্নের জন্য অন্যের বাড়িতে পূজা করে। হাতে শালগ্রাম শিলা। বিক্রমকে দেখে থমকে দাঁড়ায় বৃদ্ধ—তুমি?

—জেল থেকে ছাড়া পেয়ে এসেছে! মা বলে।

—তীর্থ সেরে এসেছে তোমার সন্তান! একটা পাপ করেছে। পাপী-নীচ-ইতর যারা, তারা পাপই করবে। আর সেই পাপীর সঙ্গে এক বাড়িতে বাস করতে হবে না।

চমকে উঠে! চন্দ্রা বলে, বাবা! কাকে কি বলছ?

—ঠিকই বলছি। হাতে আমার পবিত্র শালগ্রাম শিলা। এখানে থেকে এ দেবতাকে অপবিত্র করতে পারবে না। খুনি-অত্যাচারী-লম্পট—

—না! আমি খুনি নই!

—থাক! কৈফিয়ত দিতে হবে না। আমি চলে যাচ্ছি এ বাড়ি ছেড়ে—বলে বিশ্বনাথ। এবার বিক্রমই বলে, তুমি যাবে কেন? আমি খুনি-তোলাবাজি-পাপী। আমি চলে যাব। মা-বোন ব্যাকুল হয় কিন্তু তাদের বাধা দেন বিশ্বনাথ। বের হয়ে যায় বিক্রম।

আলি হাসছে। বলে, বস্ একবার মার্কা মারা হয়ে গেলে সমাজ তাকে আর ঘরে নেয় না। তারা ঘেন্না করে! তাই বলছিলাম—তোমার চাই টাকা-লোকবল। ঐ শয়তান যারা তোমার সব কেড়ে নিয়েছে, তাদের মুখোশ খোলা ঐ ভালমানুষির পথ নয়!

—তাই হবে আলি! বিক্রমও বুঝেছে, তার আর ঘরে ফেরার পথ নেই। এবার ডকে বিদেশি জাহাজ থেকে মাল নামে। আলি, বিক্রম তাদের গাড়িতে, কৌশলে মাল নিয়ে চলে যায়।

ক্রমশ দেখা যায় তাদের বিভিন্ন কর্ম পদ্ধতি—টাকা-সোনার চোরাচালান। এ ছাড়া আলি এলাকার ব্যবসায়ীদের ফোন করে হুমকি দেয়। টাকা আসে লাখ লাখ।

কোনও স্কুলের অনুষ্ঠান। বিক্রম সেখানে প্রধান অতিথি। মালা পরে ভাষণ দেয়। তিন লাখ টাকা দেয় ছাত্রদের কল্যাণে।

বিক্রম হোটেলের মালিকের ঘরে আসে। হোটেল মালিকও বিক্রমের চোরাকারবারের পার্টনার। সন্ধ্যা শোনে তাদের সেই ড্রাগ-সোনা এমনকি অস্ত্র প্রভৃতির গোপন ব্যবসার কথা। সরে আসে সে।

ক্যাবারে হয়ে নাচতে হয় সন্ধ্যাকে। মাঝে মাঝে সে হোস্টেলে যায় তার ছেলেকে দেখতে। তার জন্যই এই জীবনে এসেছে সন্ধ্যা।

সেদিন ক্যাবারে নাচের হলে এসেছে বিক্রম। দেখে সে সন্ধ্যাকে। ক্যাবারে নাচছে সে। অবাক হয়। অফিস থেকে ঠিকানা নিয়ে আসে বিক্রম সন্ধ্যার বাড়িতে।

সন্ধ্যা একাই থাকে। সন্ধ্যা জানে, তার বাবার কাহিনী। সে বাবাকেও ফিরিয়ে দিয়েছে তার সবকিছু ঐ সন্তান। হঠাৎ বিক্রমকে দেখে সে চমকে গেল এবং বলল, মানুষের মতো যেদিন বাঁচবে, সেদিন ঘর বাঁধব। না—ঐ পাপের ঘরে আমার সন্তানকে নিয়ে যাব না।

—কোথায় আছে আমার সন্তান? —শুধোয় বিক্রম।

সন্ধ্যা বলে, সে কথা জানতে চেও না। তুমি যেত পারো।

হতাশ বিক্রম ফিরে আসে। হতাশায় ভেঙে পরে সে। জীবনের সব করুণ ঘটনাগুলো যেন বেদনার সুরে ভরে ওঠে।

আলি বলে, বস, আমরা মানুষের খাতা থেকে বাতিল হয়ে গেছি। তোলবাজ-মস্তান-না—যারা আমাদের তোলাবাজ-মস্তান তৈরি করেছে, তাদের ছাড়ব না। কিশোরবাবু এখন মন্টুর জন্যই মন্ত্রী। এত টাকা, মন্টুরা এখন রসে বসে আছে। তাদের আড্ডার আশেপাশে দেখা যায় অজয়কে—তার পাগলের মতো বেশ। তেমনি চেহারা। সে কান পেতে শোনে মস্তানদের কথা। ওরা যেন কি প্ল্যান করছে। বলে, একেবারে বিদেশে পাচার করবে—

—মন্ত্রীমশাই জানেন। কাজ হাসিল হলে টাকা নয়—হাজার হাজার ডলার হাতে আসবে।

সংগ্রামের বাড়িতে সেদিন রিয়ার জন্মদিন। অতিথিরা এসেছে। সাজানো ঘর। সংগ্রামও রয়েছে।

ঐ উৎসবের বাড়িতে অজয়কে দারোয়ান ঢুকতে দেবে না। রিয়াই তাকে আনে। বন্ধুরা হাসাহাসি করে। রিয়াকে অজয় বলে, সংগ্রাম কোথায়?

—দাদা এসে পড়বে। আমার জন্মদিনে তুমি এসেছ—চলোতো। অজয়কে গানও গাইতে হয়। এবার অজয় ওকে গোপনে ডেকে নিয়ে গিয়ে কি খবর দেয়।

সেই মন্টুর দলের সাংঘাতিক একটা ষড়যন্ত্রের খবর। আর সময় নেই। আজ রাতেই তাদের অপারেশন। সংগ্রাম জরুরি ফোন করে বের হয়ে যায়। রিয়াও আসে।

মন্টুর দল মন্ত্রী কিশোরবাবুর মদতেই এবার হোস্টেলের ছেলেদের পাচার করার প্ল্যান করেছে। মন্টু এর আগে হোস্টেলে আসত মন্ত্রীর সঙ্গে। মন্ত্রী এই স্কুলের পরিচিতি। টাকাও দিয়েছেন সরকারি ফান্ড থেকে।

মন্ত্রী গোপনে মন্টুকে বলে, বিদেশে পাচার কর ছেলেদের। ফি ছেলেদের জন্য পাঁচ হাজার ডলার দেবে। গোটা পঞ্চাশকে পাচার করলে অনেক টাকা।

মন্টু তাই এখানে এসে মাদারের বিশ্বাস অর্জন করে আর তারই উদ্যোগে পিকনিকে নিয়ে যায় ছেলেদের। সেই গাড়িটাই পাচার করার প্ল্যান আছে। সেইমত বর্ডারে গেছে। সন্ধ্যার অন্ধকারে অন্যপক্ষের কাছ থেকে টাকা নিয়ে পাচার করবে। এবার এসে পড়ে সংগ্রাম পুলিশ নিয়ে। রীতিমত যুদ্ধ করেই সে ছেলেদের গাড়ি সমেত উদ্ধার করে। বিক্রমবাবু অজয়ের সঙ্গেও যোগাযোগ করছে। অজয় জানে, বিক্রমও চায় কিশোরকে ধ্বংস করতে। তাই অজয়ও তাকে সমর্থন করে। অজয় জানে সন্ধ্যার ছেলেও ঐ বোর্ডিং-এ আছে। তাই অজয়ই বিক্রমকে তার ছেলের খবর দেয়।

সুতরাং অজয়ই খবর দেয়, শুভ্রর খুব বিপদ। ওদের বিদেশে পাচার করা হবে। আর এসবের মূলে ঐ কিশোরবাবুর লোক বাবুয়া।

বিক্রমই এসে প্রথমে ওদের বাধা দেয় পাচার করতে। তারপর সংগ্রাম পুলিশ নিয়ে আসে। বিক্রম ওদের হাত থেকে ছেলেদের বাঁচায়, শুভ্রকেও।

এবার সংগ্রামও বিক্রমের কাছে কৃতজ্ঞতা বোধ করে।

সন্ধ্যা ও অন্য অভিভাবকরা আসে। তারা আজ খুশি। সন্ধ্যাও দেখে বিক্রমের জন্যই তার শুভ্রর প্রাণ বেঁচেছে। এসবের জন্য দায়ী ঐ কিশোরবাবু। এটা বুঝে এবার সন্ধ্যা এসে তার বাবাকে চার্জ করে। কিশোরবাবু অবাক হয়ে ভালোমানুষের ভাব দেখায়। ঐ শয়তানদের সে দেখে নেবে—এটাও বলে সন্ধ্যাকে। সন্ধ্যা চলে যায়। মা হয়ে ছেলের জন্যই এসেছিল। বাবার সাহায্য সে চায় না।

সন্ধ্যা চলে যাবার পর মন্টু আসে। বলে, ঐ বিক্রমই সব গোলমাল করে দিয়েছে।

বিক্রম আসে কিশোরবাবুর কাছে। আজ বিক্রমের বাবা-মা-বোন থেকেও নেই, তার ঘরও ভেঙেছে কিশোরবাবু। এবার শুভ্রকেও ছিনিয়ে নিতে চায়। এ সে সইবে না। কিশোরবাবুর মুখোশকে খুলে দেবেই।

কিশোরবাবু এবার ভাবনায় পড়ে। মন্টুই ভরসা দেয়—ওর বোনটাকে তুলে আনবে।

এবার কিশোরবাবুরও ভয় হয়। ঐ অজয়টাই খবর দেওয়া-নেওয়া করে। অজয় রিয়াকেও বলে বিক্রমের কথা—তার বঞ্চিত জীবনের কথা। সন্ধ্যা ও রিয়া অজয়কে চেনে। তারাই আজ কৌশলে খবর আনে কিশোরবাবুর দল বিক্রমকেই শেষ করতে চায়। আজ সন্ধ্যা বিক্রমের জন্য ভাবে। আবার স্বপ্ন দেখে—তারা ঘর বাঁধবে তাদের ছেলেকে নিয়ে। বিক্রমও বলছে এসব পথে সে যেতে চায়নি। এখনও থাকতে চায় না। সে সামান্য নিয়েই বাঁচতে চায়। সুখী হতে চায়।

কিন্তু কিশোর বিক্রমকে প্রলোভন দেখায় — তার সঙ্গে বিবাদ না করে হাত মেলাতে চায়। তাহলে বিক্রম আরও উপরে উঠবে, মন্ত্রী হবে।

বিক্রম প্রতিবাদ করে — অনেক ভুল করেছি, আর নয়। সমাজের শত্রুদেরই শেষ করবে। বিক্রম বস্তির মানুষের জন্য ডাক্তারখানা খুলেছে—সেবাব্রত চালায়।

আলি জানে, বিক্রম নিজেকে বদলাতে চায় আর মন্ত্রীও তাকে হাতে নিতে চায়। আলি বলে,

বিক্রম, ওর কথাতেই সায় দাও। জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে বিবাদ করা যায় না। আমাদের মতো জেলখাটা, সমাজ তাড়ানো মানুষদের ভালোভাবে বাঁচার হক নেই।

বিক্রম প্রতিবাদ করে—আমি ঐ কিশোরবাবুকে শেষ করবোই। কিশোরবাবুও তার চ্যালাদের বলে, ওকে শেষ করতে।

সন্ধ্যার বাড়িতে এসেছে বিক্রম। ওরা এবার বোর্ডিং থেকে আসবে। তাদের ঘরে।

সন্ধ্যা বলে, তোমার বাবা-মাও খুশি হবেন।

বিক্রমের বিপদের কথা অজয় জানে। তাই এসেছে সংগ্রামের কাছে। সংগ্রাম অফিসে। রিয়া সব শুনে অজয়কে নিয়েই আসতে চায় বিক্রমের ওখানে।

কিন্তু বিক্রম গাড়ি নিয়ে বের হয়েছে। সন্ধ্যা সব শুনে ব্যাকুল হয়। তার বাবা সব পারে। আজ সে বাবাকেও ছাড়বে না।

সংগ্রামও পুলিশ নিয়ে আসছে। ওদিকে অজয়-রিয়া-সন্ধ্যাও আসছে। কিশোরবাবু মন্টুর গাড়িতে। ওরা পাহাড়ী পথে তাড়া করে বিক্রমকে। ধাক্কা মেরে গাড়িটাকে পাহাড়ের খাদেই না ফেলে দেয়। উল্টেপাল্টে পড়ছে গাড়িটা।—ছিটকে লাফ দেয় বিক্রম।

গাড়িটা নীচে পড়ে আগুন লেগে যায় — সংগ্রাম, রিয়া, সন্ধ্যা এসে পড়ে। ধরা পড়ে কিশোরবাবু, মন্টু।

কিন্তু বিক্রম আর নেই। সে ভালভাবে বাঁচতে চেয়েছিল। এরাই তা হতে দিল না।

দুর্ঘটনা

এখনও এই আবাদ অঞ্চলের চারপাশ ঘিরে আছে বন। ইদানীং সে বনের লাগোয়া গ্রামে বাঘের উপদ্রব বেড়েছে। গ্রাম বলতে ছড়ানো-ছিটানো দু'চারটে নিচু নিচু মাটির ঘর। মানুষ কোনো মতে এই বাদাবন অঞ্চলে বাঘ-সাপ-তুফানের সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে থাকে। চারিদিকে নোনা গাঙ, তার ওদিকেই শুরু হয়েছে সুন্দরবন। গোটা এলাকাটাই এক সময় জঙ্গল ছিল। আজ যেখানে খেত-খামার-গ্রাম সেখানে জড়াজড়ি করে ছিল গরান-বিতান-বাইন ও আরও কত গাছ।

মানুষ সেই বন কেটে বিস্তীর্ণ এলাকার চারপাশে বাঁধ বেঁধেছে, তারপর নোনা জল আটকে এই জমি উদ্ধার করে বসতি করেছে। ধান হয় কিছু একবারই, তারপর নোনা মাটিতে আর কোনো কিছু হয় না। বাঁধের ধারে দশ-বিশটা শিরীষ, বাবলা গাছ মাথা তুলেছে। সবুজ বলতে ওইটুকুই। এর মধ্যে দু'একজন এই বাদাবনেও নিজের তাগিদে ও উদ্যোগে নিজের দিন বদলে ফেলেছে।

অতুল নস্কর তাদেরই একজন। অতুলের বাবা এই আবাদে এসেছিলেন ডাক্তারি করতে। কলকাতার কাছে বারাসতের ওদিকে বাড়ি। সেখানেই কোনো ডাক্তারের কাছে কম্পাউন্ডারের কাজ করতেন। শহরে থাকলেও তাঁর বেশি রুগী ছিল গ্রামের দিকে। নাড়ি দেখে, জিব দেখে অতুলের পিতৃদেব ওষুধ বাতলাতেন। সেই ওষুধে কেউ সারত, কেউ বা নীরবে সরে যেত দুনিয়া থেকে। তারা ছিল গরীব গ্রামবাসী—দিনমজুর! বেঁচে থাকার জ্বালাটাই তাদের কাছে তীব্রতর। তাই কেউ. মারা গেলে ডাক্তারদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ত না। ভাগ্য বলেই মেনে নিত।

ফলে অতুলের বাবার ডাক্তারিও চলছিল কোনোমতে। তারপর কোনো এক কাঠ মহাজন খবর দিল এই কাটিখালের হাটতলার। বেশ বড়সড় আবাদ অঞ্চল। মানুষের বসতির শেষ এইখানে। আবাদ ছাড়ালেই ঝাউবন, সমুদ্র, বিস্তীর্ণ রায়মঙ্গল নদীর ওদিকে বাংলাদেশের অরণ্যভূমি। এই আবাদের হাটতলাতে বসতে পারলে কিন্তু রোজগার হবে। এদিকে এখন মাছের ব্যবসা, কাঠের ব্যবসাও বাড়ছে। লোকের হাতে পয়সা আছে। সুতরাং ডাক্তারিতে পসার জমে না ওঠার কোনো কারণ নেই।

অতুলের বাবা নরেন নস্কর এসেছিলেন কুমীরমারির হাটে। হাট বলতে শহরে যা বোঝায় তা নয়। মানুষের বসতি এখানে ছড়ানো-ছিটানো। এককালে জমিদারের এলাকা ছিল এইসব আবাদ। এখন জমিদারি নেই। সব জমিই চাষিদের হাতে। এর মধ্যে দু'চারজন সমৃদ্ধশালী লোকও আছে। তাদের বসত কিছুটা এমন উঁচু জায়গাতে। সেইখানেই কিছু বসতি আর ফাঁকা জমিতে হাটতলা। কয়েকটা ছোট ছোট দোকানও রয়েছে। তবে হাট বসে সপ্তাহে দু'দিন। বড় বড় নৌকায় দোকান-পসার আসে। সকাল থেকে কেনাবেচাও শুরু হয়ে যায়। খালের জলে সেদিন জমে নৌকা-ডিঙির ভিড়। সন্ধ্যের পর গ্যাসের আলো জ্বলে ওঠে। লোকজনও এসে জোটে সারা আবাদ অঞ্চল থেকে।

নরেন ডাক্তার এসে থিতু হলেন কুমীরমারির হাটতলাতে। অবশ্য তিনি বারাসতের কাছে গ্রামের বাড়িতে স্ত্রী-ছেলেদের রেখেই এসেছিলেন প্রথমে। এখানে কিছুদিন থাকার পরই তাঁর পসার জমে উঠল। এই এলাকাতে ডাক্তার কেউ আসেননি এতদিন। নরেনবাবু ডাক্তার না হোন, কাজ চালাবার মতো টুকিটাকি ওষুধপত্র দিতে পারেন। ফলে বৃক্ষহীন দেশে ভেরেন্ডা গাছ যেমন গাছেরই সম্মান পায়, তেমনি নরেনবাবুও এখানে ডাক্তারের প্রাপ্য খাতির পেয়ে গেলেন। কিছুদিন পর হাটের লাগোয়া বিঘে পাঁচেক জমিও কিনে ফেললেন। তারপর বাড়িঘর তুলে পরিবার-পরিজনদের নিয়ে এলেন বারাসতের গ্রাম থেকে।

অতুল তখন বার তিনেক ক্লাস টেনে গড়াগড়ি দিয়ে পাড়ায় মস্তানি করছে। শনিপূজা ক্লাবের সেক্রেটারি বলে ফি শনিবার তার কিছু কামাইও হয়। সেই সঙ্গে পার্টির দাদাদের পাশে থেকে কোমর বেঁধে ভোটের লড়াই লড়ে। নরেনবাবু এহেন করিতকর্মা ছেলেকে এনে বসালেন এই হাটতলার দোকানে।

এরমধ্যে ওষুধ কাম মুদিখানার দোকানও চালু করেছেন নরেনবাবু হাটতলায়। নতুন জায়গাতে এসে কিছুদিন সেখানকার ব্যাপার-স্যাপার দেখে নিয়ে কাজে নামে অতুল।

নদীর ধারে বেশ কিছুটা অনাবাদী চর পড়েছিল। নদীর ভাঙন চলছে ওদিকে। এদিকে জাগছে চরভূমি। অতুল দেখে নিয়েছে এদিকে মাছও হয় প্রচুর। সে এবার ওই চরে খুঁটি গড়ে চালা বানিয়ে মাছের আড়তদারি শুরু করল।

কাজটা অবশ্য অতুল শিখে এসেছিল কিছুদিন গোসাবার এক আড়ত থেকে। মাছ ওজন করার বিশেষ রীতিটাও শিখেছে সে। গোসাবার মহাজন তাকে বলেছে, এত দক্ষিণে আমার লোক তো নেই। কিন্তু ওদিকে মাছ ওঠে অনেক। তুমিই ওসব মাছ কিনে বরফ দিয়ে আমার আড়তে চালান দাও। বরফ, নৌকা আমি দেব। মাছের ন্যায্য দামও দেব।

নরেন ডাক্তারের নাম জানে এখানকার লোক। লোকটা আবাদের মানুষের সেবা-টেবা করে। টাকার তত খাই নেই। যা পায় তাতেই খুশি। তাই তারা নরেন ডাক্তারের ছেলে অতুলের আড়তে মাছ দিতে শুরু করে। অতুল তাদের ঠিক ঠিক দাম দেয়। আর কমিশনও সে ভালোই পায় গোসাবার মহাজনের কাছ থেকে। ক্রমশ অতুল ডানা-পালক মেলতে থাকে।

অতুল সাহসী ছেলে। ঝক্কিও নিতে জানে। সে দেখেছে, এই আবাদ অঞ্চলে মাছের ব্যবসা ছাড়াও কাঠের ব্যবসাও ভালো চলে। কারণ বেশকিছু লোক লুকিয়ে বনে যায় রাতের অন্ধকারে। কাঠ আনে নৌকা করে। এরজন্য বনবিভাগকে কোনো পয়সা দিতে হয় না। এ সব দেখে অতুল বুঝেছে, বনবিভাগের লোকেদের সামান্য কিছু দিয়ে এর থেকে অনেক বেশি পরিমাণ কাঠ আনা যেতে পারে।

তাই সে এবার বেশকিছু লোককে এই কাজে নামায়। আর বনবিভাগের লোকজনও বাড়তি কিছু পাবার আশায় এসব কাজকে নীরবে সমর্থনও করে। তারাই এই বে-আইনি কাঠগুলোকে আইন মোতাবেক কাটা কাঠ বলে ছাড়পত্র দেয়।

অতুল এই পথেই দেখতে দেখতে হাজার হাজার টাকা কামিয়ে নদীর ধারে কাঠগোলা-করাতকল বসিয়ে ফেলল। ওদিকে মাছের আড়তও জমে উঠেছে। বনের একদিকের সব মাছই আসে তার আড়তে।

অবশ্য এখন জেলেদের সে নিজেই জাল-নৌকা-টাকা দাদন দেয়। নিজের লঞ্চও করেছে। সব মাছ এখন সে সিধে ক্যানিং-এ চালান করে। ওদিকে কাঠগোলা-করাতকলের হাজার হাজার চায়ের বাক্স তৈরি করে সোজা চা-কোম্পানিদের জোগান দেয়।

রায়মঙ্গল দিয়ে অনেক জল বয়ে গেছে। কুমীরমারির চেহারাও এখন বদলেছে। নরেনবাবু আর বেঁচে নেই। তবে অতুল এখন পাকাবাড়ি, নিজের লঞ্চ, ওদিকে গুদাম এসব করেছে। বাদাবনের যেন শেরই এখন সে।

গ্রামের ওদিকে তার বিশাল চিংড়ি মাছের ভেড়ি তৈরি হচ্ছে। কেশব দেখেছে এসব। তাদের দিন বদলায়নি। তার বাবার কিছু জমি-জারাত ছিল। সে ওই জমি দিতে চায়নি অতুলবাবুকে। মাটির উপর তার ছিল অসীম মায়া। নিজে কাজ করে জমি চাষ করত। এখানে চারিদিকে জল। কিন্তু সেই নোনা জলে চাষ হয় না। রোদে সবুজ ধান গাছ পুড়ে বিবর্ণ হয়ে যায়। আকাশের জলই ভরসা। কখনও ধান হয়, কোনোবার বা অতিবৃষ্টিতে ডুবে যায়। তবু জমি ছাড়তে চায়নি।

কিন্তু অতুলের স্বভাব ওই বাদাবনের বাঘের মতো। যেভাবে হোক পিছনে লেগে থেকে দুর্বল মুহূর্তে শিকারের ঘাড়ে লাফিয়ে তাকে শেষ করবেই। কেশবের জমিও সে শেষ পর্যন্ত দখল করেছে। দখল করে তার ভেড়ির সামিল করেছে। কেশবকে অবশ্য তার জন্য দুশো টাকা দিতে চেয়েছিল, কেশব তা নেয়নি। সরকার বলে, নে, বাবু দিচ্ছেন।

কেশবের চোখের সামনে ভেসে ওঠে তার বাবার মুখটা। বাবাকে কারা ভেড়ির ধারে রাতের বেলায় টাঙির কোপ মেরেছিল। পুলিশ অবশ্য এসেছিল, কিন্তু ঐ পর্যন্তই। অতুলবাবুও এসেছিল। সেও বলে, দারোগাবাবু, খুনিকে ধরতেই হবে।

খুনি ধরা পড়েনি। দারোগাবাবু মুরগির মাংস-ভাত খেয়ে অতুলবাবুর লঞ্চেই ফিরে গেছিলেন।

কেশব জানে এ কার কাজ। কিন্তু তার কিছু করার সাধ্য ছিল না। এখন সে একটা ছোট ডিঙি নিয়ে নদীতে মাছ ধরে। আর তার বৌ কুসুম হাটে না হয় বসতির ঘরে ঘরে সেই মাছ বিক্রি করে। অবশ্য তাতে দিন চলে না।

কুসুমও খুশি নয়। তার রূপ-যৌবন আছে। তাদের ঘরে নাকি এমন সুন্দরী মেয়ে দেখা যায় না। কুসুম স্বপ্ন দেখত এই বাদাবন ছেড়ে সে শহরে গিয়ে থাকবে। এর মধ্যে তার মামার বাড়ি বসিরহাটে দু-চারবার গেছে লঞ্চে করে। সেখানের মানুষ কত আরামে আছে। ভালো জামাকাপড় পড়ে, ভালো খায়। সেজেগুজে সিনেমা দেখতে যায়। কুসুমেরও মন চায় ওই স্বপ্নের রাজ্যে উধাও হতে।

কিন্তু সে যেন এই বাদাবনে বন্দি হয়ে গেছে। দেখেছে সে, ওই অতুলবাবুর বাড়িতে কেমন সিনেমা হয়, ওরা বাড়িতে বসেই দেখে। ইদানীং অতুলবাবু করাতকলের জেনারেটার লাইন থেকে বাড়িতেও বিজলি বাতি নিয়েছে। টিভিও এনেছে। বিদেশি রঙিন টিভিতে কত সিনেমা হয়। গ্রামের অনেকেই গিয়ে ভিড় করে। কুসুমও যায়। রাত অবধি সিনেমা দেখে ফেরে। কেশব বলে, কোথায় ছিলে? ওই শালা দু'নম্বরি মালের বাড়িতে!

কুসুম বলে, নিজের মুরোদ তো ওই! তুমি করো না দু'নম্বরি। নিজের ক্ষমতা নেই, অন্যকে গাল দাও কেন?

কেশব চুপ করে থাকে। জানে, তাকে এমনি দুঃখের দিনই কাটাতে হবে। এখন তবু সে ধরে-করে ওই হাটের ঘাটে নৌকা বাইবার কাজটা পেয়েছে। ঘাটের ডাক অবশ্য অনেক। অতুলবাবুর এক কাঠের ব্যাপারীই অতুলবাবুকে ধরে সদরে গিয়ে ওই পারানীর ঘাটের ইজারা নিয়েছে। আর কেশব ওখানে নৌকা পারাপার করে। দিনে তিরিশ টাকা রোজ পায় আর একবেলার খোরাকি। রাতেও জেগে থাকতে হয়। এখন ঐ গাঙ পার হয়ে ওপারে গাড়ির রাস্তা হয়েছে। সোজা কলকাতা যাওয়া যায়। তাই এখন এই হাটের গুরুত্বও বেড়েছে। ব্যবসা-বাণিজ্য জমে উঠেছে।

হাট জমে ওঠার আর একটা কারণ কলকাতার বাবুরা আসছে সুন্দরবন দেখতে। ওদিকে সরকার থেকে যাত্রীনিবাস করে দেওয়া হয়েছে। অনেক কিছুই বদলেছে। বদলায়নি তবু কেশবদের মতো হাজারো মানুষের দিন। ওদের সবই হারিয়ে গেছে। তবু কেশব কুসুমকে নিয়ে সামান্য রোজগারেই দিন কাটাতে চায়, ঘর বাঁধতে চায়।

সেই খবরও গেছে অতুলবাবুর ভেড়িতে। এখন ঘর হারিয়ে কেশব নদীর ধারে একটা ঝুপড়িতে থাকে। কুসুম বলে, এর নাম ঘর! এর চেয়ে পথে থাকাই ভালো।

কেশব বলে, তবে কি কোটা বালাখানায় থাকবি?

কুসুম বলে, তা না হোক, মানুষের মতো থাকব তো? ঘরের চালচুলো নেই, আব্রু নেই!

কুসুম স্বপ্ন দেখে অন্য জীবনের। তার চোখে ওই সিনেমার রঙিন জগতের স্বপ্ন।

তাই প্রায়ই যায় সে অতুলবাবুর বাড়িতে। অতুল এখন মস্ত লোক। নানা ব্যবসা। শহরেও তার ব্যবসা ছড়াচ্ছে। কলকাতায় বাড়িঘর করেছে। কিন্তু তার সেই ভিতরের লোভী মানুষটার রূপবদল হয়নি। এখন নজর পড়েছে কুসুমের দিকে। মেয়েটার চেহারাটা চোখে পড়ার মতো। এত অভাবের মধ্যেও প্রকৃতি তাকে দিয়েছে অনেক। নিটোল যৌবন। মরাল দেহের ছটায় ফুটে ওঠে আদিম বন্যতা। উদ্ধত যৌবন যেন হাতছানি দেয়।

অতুল বলে, কী রে, ছবি দেখতে এসেছিলি?

কুসুম যেন এতকাল ধরে চেয়েছিল অতুলবাবু তার সঙ্গে কথা বলুক। সে তাই একটু সেজেগুজেই আসত। এতদিন পর সেই পাথরকে গলতে দেখে কুসুম খুশি হয়।

—হ্যাঁ গো। পেরায় তো আসি। সিনেমা দেখতে আমি খুব ভালোবাসি।

—হুঁ। অতুল দেখছে মেয়েটাকে। তবে নিজের দর কমাতে সে চায় না। বলে, তা ভালো।

দু'একদিন পর সেদিন রাতে ফিরছে কুসুম। অতুল যেন ওর পথ চেয়েই ছিল। নির্জন রাত। নদীতে জোয়ার চলছে। বাতাসে তারই মত্ততা। নদীর জলে তখন উথাল-পাথাল ঢেউ। অতুল বলে, কী রে, কী ছবি দেখলি?

কুসুম বলে, খুব ভালো ছবি গো। তবে সিনেমা হলে বসে দেখার খুব সাধ হয় গো। ই বাদাবনে আর ভালো লাগে না।

অতুল ভাবছে কথাটা। তার কলকাতার বাড়িতে কাজের লোকের দরকার। এমন একটা মেয়েকে ওখানে রাখতে পারলে তার পক্ষে সুবিধাই হবে। অতুলের চোখে সেই লালসাভরা দৃষ্টি। কুসুমও চেনে ওই চাহনি। দেহে ঝড় তুলে বলে, কী দেখছ গো মহাজন অমন করে? গিলে ফেলবা নাকি?

অতুল হাসে। বলে, না! তোর সাহস আছে। কলকাতায় যাবি? ওখানে থাকবি, কাজ করবি।

কুসুমের মনের অতলে যেন মুক্তির স্বাদ জাগে। বলে, কে নে যাবে গো?

কাজই বা কে দেবে সেখানে?

অতুল বলে, তুই যদি চাস তো আমিই দিতে পারি। পাকা বাড়িতে থাকবি। মাসে তিনশো টাকা আর থাকা-খাওয়া। জামাকাপড়ও সব পাবি। মায় সিনেমা দেখার খরচাও। ভেবে দেখ।

কুসুম যেন হাতে চাঁদ পায়। এখানে এভাবে পড়ে থেকে শেষ হতে সে পারবে না। তার যোগ্য প্রাপ্যই সে পেতে চায়। অতুল বলে, ভেবে দ্যাখ, যদি যেতে চাস তো বলবি।

কুসুম বলে, আমি তো তাই চাই গো। কিন্তু ওই ঘরের মানুষটা কি যেতে দেবে? এইখানে পড়েই শেষ হতে হবেক আমাকে। তুমি আমাকে বাঁচাও বাবু, আমাকে বাঁচাও।

অতুলও ভাবছে কথাটা। এত সহজে কাজ হবে তা ভাবেনি সে। তবে এসব কাজ করতে হবে গোপনে। অতুল বলে, কেশবের জন্য ভাবিস না। কাউকে বলবি না। তুই কাল রাতের বেলায় ওপারে চলে যাবি। আমার লোক থাকবে। গাড়িও থাকবে। সেই-ই তোকে সোজা কলকাতায় নে যাবে।

কুসুম ভাবছে কথাটা। একবার মনে হয় না করে দেবে। কিন্তু অন্য মন স্বপ্ন দেখে এক নতুন প্রাচুর্যভরা জীবনের। শেষ অবধি সেই জগতেই যাবার মনস্থ করে কুসুম। বলে, তাই যাবো গো। কেউ জানতেও পারবে না।

কেশবকে মাঝে মাঝে এদিক-ওদিকও নৌকা নিয়ে যেতে হয়। সেই রাতে একটা বিয়ের ভাড়ার নৌকার মাঝি হয়েই ফিরছে সে। বিয়েবাড়িতে ভালো খাওয়া মেলে। পয়সাও মেলে। তাই এমন ক্ষেপ ছাড়তে চায় না। বেশ ভালো খাবার খেয়ে—কিছু টাকা নিয়ে বাড়ি ফেরে দু'দিন পর। দেখে কুসুম নেই, ঘরেও তালা বন্ধ। কুসুমের পথ চেয়ে বসে থাকে কেশব। কিন্তু সন্ধ্যা হয়ে যায়, কুসুম ফেরে না। ওদিকে শান্তিবুড়ি হাট থেকে ফিরে বলে, ওরে মুখপোড়া, কোথায় ছিলি? পরের ঘর বাঁধতে গেলি, ওদিকে নিজের ঘর যে তোর ভেঙে গেল! কুসুম কাল রাত থেকেই বেপাত্তা। ও পাড়ার নবু বলেছিল, একখানা গাড়িতে চড়ে মাঝরাতে মেয়েটা কার সঙ্গে চলে গেছে।

চমকে ওঠে কেশব। বলে, সে কী!

কথাটা সত্যি। কুসুম আর ফেরে না। কেশবের ঘর শূন্যই হয়ে যায়। শেষ অবধি কেশব খবর পায়, কুসুম সত্যিই তাকে ছেড়ে চলে গেছে। আর এসবের মূলে ওই অতুলবাবু তাও জেনেছে সে।

নিরুপায় আক্রোশে কেশবের চোখে যেন আগুন ঝরে। ওই লোকটাই পদে পদে তার সর্বনাশ করেছে। বাবাকে মেরেছে। তার ঘর ভেঙেছে। কুসুমকেও কেড়ে নিয়েছে। কেড়ে নিয়েছে তার জীবনের সব স্বপ্ন। কিন্তু কেশবের কোনো সাধ্যই নেই তার কেশাগ্র স্পর্শ করার। ওদের সব আঘাত মাথা পেতে মেনেই নিতে হবে।

দিন যায়। কেশবের নৌকা যায় ঘাটে। অতুলও নিশ্চিন্ত হয়। ভোম্বল কেশব কোনো গোলমাল করতে পারে না। তা ছাড়া অতুলই যে এসব করেছে, তার কোনো প্রমাণও নেই। ফলে সব চুপচাপই হয়ে যায়

বয়ে যায় দিন। একদিন অতুলের হঠাৎ কী জরুরি কাজে কলকাতা যাওয়ার দরকার পড়ে। তার লঞ্চ এদিকে ঘাটে নেই। ওদিকে গাড়ি রয়েছে। নদী পার হয়ে ওপারে গেলে তবে গাড়ি পাবে। তাই বের হয় অতুল। পারঘাটে সেই রাতে একা কেশব রয়েছে। আর কেউ নেই। নদীতে উথাল-পাথাল ঢেউ। অতুল চাঁদের আলোয় নদীর রূপ দেখে বলে, কী সাংঘাতিক নদীরে!

অতুল এতদিন এখানে বাস করছে, কিন্তু সাঁতার জানে না। তবু যেতে হবে ওপারে। কেশব দেখছে ওকে। অতুল একটা দশ টাকার নোট ওর হাতে দিয়ে বলে, নদী পার করে দে।

কেশব ওকে নৌকায় তুলেছে। ঢেউ-এর মুখে টালমাটাল খাচ্ছে নৌকা। হাল ধরে বসে আছে কেশব। ওর মনে পড়ে বাবার মৃত্যুটা। তাদের ঘরও কেড়ে নিয়েছে। শেষ ভরসা ছিল কুসুম। তাকে নিয়েই বাঁচতে চেয়েছিল কেশব। তাকেও কেড়ে নিয়েছে ওই অতুল। আজ স্তব্ধ নির্জন রাতে এই তরঙ্গসঙ্কুল গাঙ-এ তার ডিঙিতেই বসে আছে লোকটা। নদীতে তুফান চলেছে। ঝড়-জলের মাথায় যেন বাদাবনের বাঘ এসেছে তার সামনে। হাতের মুঠি শক্ত হয়ে ওঠে কেশবের।

হালটা তুলে নিতেই স্রোতের বেগে বেতালা ঢেউ-এর ঝাপটায় নৌকাটা একদিকে কাত হয়ে ছিটকে পড়ে। আর ঐ ধাক্কায় ছিটকে পড়ে কেশব-অতুলও। অতুল চিৎকার করে, কেশব! বাঁচা—কেশব!

কেশব দেখছে নৌকাটা কাত হয়ে ভেসে চলেছে। হাতের বইঠা দিয়ে সপাটে এবার সে মারে অতুলের মাথায়। মাথা ফেটে যায়...অতুল অসহায়ের মতো তলিয়ে যাচ্ছে। কেশব নিপুণ সাঁতারুর মতো গিয়ে উপুড় হয়ে ভেসে থাকা নৌকাকে ধরে হাঁপাচ্ছে। দেখছে, ক্রমশ তলিয়ে গেল অতলে অতুল নস্কর।

এবার কেশব চিৎকার করে ওঠে, নৌকা ডুবেছে হে। পারাঘাটের নৌকা—

ওর চিৎকার রাতের ঝোড়ো হাওয়ায় মিশেছে। তীরে দু'চারটে নৌকায় টেমির আলো জ্বলছে। কেশব তখনও চিৎকার করছে।

পরাজয়

জলধর বড়াল বিল্ডিংটার দিকে চেয়ে দেখে বারবার। দেখে সাইনবোর্ড আর নিওন লাইট। সাততলা বিশাল বাড়িটা এখন জলধরের হোটেল। এখানের পয়লা নম্বরের হোটেল। লিফট-সুইমিং পুল-বার কাম রেস্তোরাঁ, নিজেদের গাড়ি--সবই আছে।

কাশীপুর সারাদেশে একটা পরিচিত নাম। এখানের মা কালীর মন্দির ও বহু প্রাচীন। মাও খুব জাগ্রত। ওদিকে মহাশ্মশান। ঘন বনে ঢাকা বিস্তীর্ণ অঞ্চল, পাশেই রয়েছে একটা নদী। অন্যসময় হাঁটুভর জল বয়ে যায়। আর বর্ষায় ওই ছোট নদীটা মহাশ্মশান---এদিকের বসতি মাঠ সব ডুবিয়ে দেয় গেরুয়া বিলে। কাশীপুরের এই মন্দির — দেবীর স্থান-- মহাশ্মশান সব মিলিয়ে এখন একটা বড় তীর্থকেন্দ্রে পরিণতি হয়েছে। প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ আসেন বাংলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে। আর অমাবস্যা বা কোনও উৎসবের সময় তো এখানের সব হোটেল-লজগুলোতে ভিড় উপচে পড়ে। তাদের রেটও দুশো টাকা-পাঁচশো টাকায় দাঁড়ায়। এখন এদিকে বিস্তীর্ণ এলাকা নিয়ে বহু দোকান গড়ে উঠেছে। আছে মনোহারী দোকান। খাবারের দোকান, ভাতের হোটেল, ছোট-বড় গেস্টহাউস, নানা উপহারের দোকান, ফুলের বহু দোকান ছাড়াও আছে পুজোর ডালার অনেক দোকান।

এছাড়াও অন্যদিকে রয়েছে দৈনিক বাজার। এত লোক আসে, তাদের খাবার চাই। তাই হোটেলগুলোও ব্যস্ত। তাদের জন্যই বড় মুদিখানার দোকানও গড়ে উঠেছে অনেক। ডাক্তারখানা, ওষুধের দোকানও গড়ে উঠেছে অনেক। আর রয়েছে অনেক দিশি, বিলাতি ও চোলাই মদের দোকান। ইদানিং ফ্রিজ, এয়ারকুলার ইত্যাদি মেশিনের দোকানও গড়ে উঠেছে।

জলধর দেখছে কাশীপুরের এই পরিবর্তন। তখন পথঘাটও তেমন ছিল না। নদীতে ব্রিজও গড়ে ওঠেনি। ওপারে আধকাঁচা রাস্তায় স্টেশন থেকে দু-একটা রিকশায় যাত্রীরা আসত। এখানে তখন সবে জলধর ভাবছে হোটেল করার কথা। এদিকে কয়েকটা মাটির বাড়িও ছিল। ছিল একটা ইঁদারা। এসব জায়গার দামও ছিল তখন অনেক কম। মাত্র কুড়ি হাজার টাকায় তিন বিঘা জায়গা কেনে জলধর।

তারপর সেখানে গোটা দুয়েক মাটির বাড়ি তোলে। জলের জোগান আসে ইঁদারা থেকে। কাছেই নদী। যাত্রীরা অনেকেই নদীতে স্নান সারে। জলধর ওই মাটির কটেজেই খান আষ্টেক ঘর করেছে যাত্রীদের জন্য। যাত্রীরাও এমন মনোরম জায়গায় থেকে যায় দু-তিনদিন। জলধর ওদের খাবার জোগান দেয় তার রান্নাঘর থেকে। জলধরের হোটেলের কথা মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে। তাই তার ভরসাতেই আসতে থাকে অনেক যাত্রী। জলধরের আতিথ্য গ্রহণ করে। কাশীপুর ক্রমশ আরও জমে উঠেছে। আগে ছিল নির্জন ঘুমন্ত একটা প্রত্যন্ত গ্রামের পুরোনো কালীমন্দির। স্থানীয় লোকজনরাই আসত পুজো দিতে। দুপুরে বিশ-পঁচিশ জন লোককে দেখা যেত মন্দিরে। বেলা বাড়লে তারাও ঘরে ফিরে যেত। মন্দির এলাকায় নামত স্তব্ধতা। পূজারিও তালা দিয়ে চলে যেতেন। আবার সন্ধ্যায় সামান্য ফল-মিষ্টি দিয়ে ভোগারতি সেরে মাকে শয়ন দিয়ে মন্দির তালাবন্ধ করে গ্রামে ফিরে যেতেন। স্তব্ধতা নামত মন্দিরের আশেপাশে। মহাশ্মশানে জেগে উঠত শিয়াল আর নেকড়ের দল। এসব তখন তাদেরই রাজ্যে পরিণত হত।

সেইসব দিনগুলোকে দেখেছে জলধর। তারপর স্টেশন থেকে হল পাকা রাস্তা, আর নদীর উপর হল ব্রিজ। ফলে আসা-যাওয়ার সুবিধা বাড়ল। কাশীপুর মন্দিরটা ও মহাশ্মশানকে নিয়ে অনেক গল্পই গড়ে উঠেছে। ওই মহাশ্মশানের জঙ্গলের মধ্যে দু-পাঁচটা ঝুপড়িও গড়ে উঠেছে। বেশ কিছু সাধুও সেখানে

থাকেন। ধ্যান-ট্যান করেন। অমাবস্যার রাতে হোম-টোম করেন। মন্দিরের যাত্রীসংখ্যা এখন বেড়েছে অনেক। দূরদূরান্ত থেকে, বহু শহর মায় কলকাতা থেকেও বহু লোকজন আসে। মন্দিরে পুজো দেয়। ভালো হোটেলের সন্ধান করে। ভালো খাবার চাই তাদের। আর ঘরও চাই, সেখানে একটা দিন থেকে দিনে-রাতে মায়ের দর্শন করতে পারে।

জলধরের হোটেলের রূপবদল ঘটেছে। জলধরের স্ত্রী পূরবী স্বামীর হোটেলের রান্নাঘরের ব্যাপারটা দেখে। জলধর এর মধ্যে দোতলা একটা বাড়িও করেছে। ঘর, দালানঘর, আর ছাদে একটা হলঘরের মতো। সেটাকে ডরমেটারি করেছে। ওদিকে সেই পুরনো একটা মাটির ঘরে জলধর থাকে তার স্ত্রীকে নিয়ে।

পূরবীর পরিচালনায় তাদের রান্নার ঠাকুর তৈরি করে নানারকম সুস্বাদু পদ। বহু যাত্রী এখন সেটা জানে। তাই তারা ভিড় করে জলধরের হোটেলে। কাশীপুরের নতুন পরিবেশে এখন অনেক হোটেলই গড়ে উঠেছে। তবে সবাই জানে জলধরের হোটেলই এখানে একনম্বর হোটেল। এখন জলধরের স্বপ্ন আরও কিছুটা জায়গা নিয়ে একটা পাঁচতলা বাড়ি করবে। সেখানে থাকবে এসি ঘর। আর অন্যসব ঘরেও বিলাস-ব্যসনের আয়োজনের ত্রুটি থাকবে না। জলধর ভেবে রেখেছে ব্যাঙ্ক থেকে লাখ তিরিশ টাকা লোন করবে। তবে তার জন্য ব্যাঙ্কেও কিছু টাকা গচ্ছিত রাখতে হবে। বেশ কয়েক হাজার টাকা তার চাই। নগদ টাকা যা ছিল সব সে হোটেলের কাজেই লাগিয়েছে। এদিকে স্বপ্নের হোটেল গড়বে সে। সামনে সাজানো বাগান থাকবে, লন থাকবে। আর পিছনে থাকবে কার পার্কিং-এর জায়গা। বিলডিং-এর প্ল্যান করতে দিয়েছে কলকাতার এক প্ল্যানমেকারকে। তার আগে তাকে এখানে জায়গাও দেখিয়ে দিয়েছে। তার হোটেল কেমন হবে তাও জানিয়েছে।

পূরবী দেখে জলধর যেন এক অন্য মানুষ। হোটেল নিয়েই ব্যস্ত। তার দরকার টাকার। সে এখন সংসারের দিকেও নজর দেয় না। বরং কোনও কোনও দিন খাবারে কিছু গোলমাল হলে প্রথমেই পূরবীকে যা-তা কথা বলে।

পূরবী বলে, তোমার হোটেলের রান্নাঘর তোমার লোকেদের দেখতে বলো। আমি ওসবে নেই। ভাবছি বাপের বাড়ি চলে যাব ক'দিন।

এবার বিপদে পড়ে জলধর। সামনে বেশ কিছু ভালো পার্টির বুকিং রয়েছে। ভালো খাবার চাই তাদের। এখানের রান্নার লোকদের পূরবীই গাইড করে ভালো আইটেম বানায়। জলধর বলে, এখন তোমার যাওয়া হবে কী করে? ঢের বুকিং রয়েছে। তোমার রান্নাই তো আমার হোটেলের প্লাস পয়েন্ট।

পূরবীকে থাকতে হয়। এর মধ্যে এখানকার কোন এক জমিদার প্রেমেন রায়চৌধুরী কাশীপুরে আসে মায়ের পুজো দিতে।

লোকটা বিয়ে-থা করেনি। অঢেল পয়সা, মহাশ্মশানে সাধুদের খাওয়ানোর জন্য বিশাল ভাণ্ডারা দেয়। আর এসবের আয়োজন করে দেয় জলধর। রান্নার কাজে লোকজন নিয়ে সাহায্য করে পূরবী। বিশাল কর্মকাণ্ড! তবু ঠিকঠাক কাজ তুলে দেয়। প্রেমেন রায়চৌধুরীও অবাক হয় পূরবীকে এমন নিপুণভাবে কাজ করতে দেখে। সুন্দর মেয়েটি। ব্যক্তিত্বও রয়েছে। আর লোকজনদের কীভাবে কাজ করাতে হয় তাও জানে। প্রেমেনই বলে পূরবীকে, সত্যিই আপনার কাছে কৃতজ্ঞ, ম্যাডাম। ভবিষ্যতে আপনাকে সাহায্য করতে পারব আশা করি।

পূরবী দেখছে প্রেমেনকে। প্রেমেনের ভালো লাগে পূরবীকে। প্রেমেন বলে, আপনাদের হোটেলেই উঠেছি, রুম নম্বর দুশো চার।

তাই নাকি?

আজ সন্ধ্যায় স্পেশাল করে চিকেন দোপেঁয়াজি যদি পাঠিয়ে দেন।

হাসে পূরবী। সন্ধ্যার পর প্রেমেন একটু মন্দির থেকে ঘুরে এসেছে। এখানে রাতের রূপও আলাদা। রাস্তার ধারে বাসস্ট্যান্ড, অটোস্ট্যান্ড, যাত্রী আসার বিরাম নেই। অনেকে ঘরে ফিরছে। আবার অনেকে আসছে এখানে। দরজায় নক করার শব্দে প্রেমেন বলে, ভিতরে এসো।

ঢুকছে পূরবী। পরনে আকাশী রং-এর শাড়ি। তার সুন্দর দেহ যেন ওই শাড়ির আবরণে আরও সুন্দর হয়ে উঠেছে। চোখে ওর স্নিগ্ধ চাহনি। পূরবী সঙ্গে একজন বেয়ারাকে এনেছে, তার হাতে দুটো হটপট। পূরবী বলে, এই আপনার বিরিয়ানি আর এটাতে চিকেন দোপেঁয়াজি।

প্রেমেন বলে, আমার জন্য সত্যিই কষ্ট করে এসব করবেন তা ভাবিনি।

পূরবী বলে, কষ্ট কীসের? এসব করে তো আনন্দ পাই। তাছাড়া আপনি নিজে বড় মুখ করে বললেন। দেখবেন কেমন হয়েছে।

এরপর প্রেমেন আরও দু-তিন দিন থেকে যায় এখানে। পূরবীও রোজ তাকে নতুন আইটেম খাওয়ায়। মাঝে মাঝে আসে তার ঘরে। প্রেমেনেরও ভালো লাগে। প্রেমেন বলে, কলকাতায় আসো যদি এই আমার ঠিকানা। আমার বাড়ি তো খালিই পড়ে আছে। জলধরবাবু আর তুমি ওখানেই উঠবে। তোমরা যে আমার জন্য কত করলে!

হাসে পূরবী, এ তো আমাদের কর্তব্য।

প্রেমেন চলে যায় মোটা টাকা পেমেন্ট করে। আবার আসে মাস দুয়েক পর পৌষমাসের অমাবস্যায়। এবারও সে হোম-যজ্ঞ, সাধু-সন্ন্যাসী ভোজন এসব করায়। আর পূরবীর জন্য এনেছে একটা নেকলেস। পূরবী অবাক হয়, একি! এটা কেন?

প্রেমেন বলে, ইচ্ছে হল দিই কিছু। না নিলে দুঃখ পাব, পূরবী।

পূরবী হাসে। তারও মনে হয়, সত্যি প্রেমেন বড় নিঃসঙ্গ, একা। তার জন্যও ভাবছে পূরবী। ওদিকে জলধর তার স্বপ্নের হোটেলের জন্য ব্যাঙ্ক লোন নেবার চেষ্টা করছে, টাকা চাই। জলধর বলে, পূরবী, তোমার গহনাগুলো দাও। ওসব বিক্রি করে সে টাকা ব্যাঙ্কে জমা রাখতে হবে, ক্যাশ না হলে ব্যাঙ্ক লোন দেবে না। তোমার ওইসব গহনা আমি ঠিক গড়িয়ে দেব বছর দুই-তিনেকের মধ্যে। নতুন হোটেল চালু হলে দেখবে, টাকার অভাব আর হবে না।

পূরবী কথাটা শুনে অবাক হয়। এত সহজে সে নিজের গহনা হাতছাড়া করতে চায় না। কারণ, সে ও চায় তার হাতেও কিছু থাকুক। তাই বলে সে, তা কী করে হয়? সব গহনা বিক্রি করে দেব? না-না।

জলধর বলে, কথাটা ভেবে দেখো। ব্যবসা বাড়াতে হবে। ব্যবসা বাড়বে তা নয় এই ছোট হোটেল নিয়ে পড়ে থাকব—আর তুমি গহনা পরে ঘরে বসে থাকবে?

তাই বলে আমার শেষ সম্বলটুকুও দিতে হবে?

জলধর বলে, তোমার স্বামীর এই কথাটুকু রাখতেই হবে, পূরবী!

প্রেমেন ওদের কথাগুলো শোনে। দেখছে পূরবীর চোখে জল। সে নিজের শেষ সম্বল হারাতে রাজি নয়। জলধর বলে, কম করে লাখখানেক টাকা রাখতে হবে ব্যাঙ্কে। তবেই ব্যাঙ্ক লোন দেবে।

প্রেমেন কী ভাবছে।

সেদিন বিকেলে জলধর হোটেলের অফিসে বসে কাগজপত্র দেখছে। প্রেমেনবাবুকে ঢুকতে দেখে চাইল। এর মধ্যে ক'বারই এখানে এসেছে প্রেমেনবাবু। আর এক একবার এসে নরনারায়ণের সেবায়, মন্দিরের উন্নতির জন্য ভালো টাকাই খরচ করে। তার যে অঢেল টাকা। এটা জানে জলধর। জলধর বলে, কী ব্যাপার? এনি প্রবলেম?

একটা প্রপোজাল ছিল যদি অ্যাকসেপ্ট করেন। এখানে হোটেল বিজনেস ভালোই চলবে। আরও বাড়বে ব্যবসা। তাই আমিও হোটেল ব্যবসাতে কিছু ইনভেস্ট করতে চাই। আর সেই কারণে আপনার সঙ্গে কথা বলতে এসেছি। ধরুন, লাখখানেক টাকা যদি দিই? পরে আরও দেব। যদি আমাকে তখন আপনার হোটেলের পঁচিশ পার্সেন্ট শেয়ার দিতে পারেন।

জলধর ভাবতে পারেনি যে, এতগুলো টাকা এত সহজে আসবে। তার চোখ দুটো জ্বলে ওঠে। জলধর বলে, মাত্র এক লাখ?

প্রেমেন বলে, ঠিক আছে ওটা দু-লাখই দেব। পরে বাকি টাকা দিয়ে লেখাপড়া করে নেব।

জলধর ভাবছে কথাটা। এখন ওই টাকাটা পেলে তার কাজ হয়ে যাবে। ব্যাঙ্কের লোনও পাবে। কাজও তুলে নেবে। তৈরি হবে তার স্বপ্নের হোটেল। পূরবী কথাটা শুনে অবাক হয়। প্রেমেনবাবু নিজে তার স্বামীকে দু-লাখ টাকা দিচ্ছে। পূরবী এসেছে প্রেমেনের সঙ্গে নদীর ধারে শ্মশানে। দুজনে এই সবুজ পাখির রাজ্যে এসে বদলে গেছে। পূরবী বলে, এতগুলো টাকা জলে দিলে? ও লোক সুবিধার নয়।

প্রেমেন হাসে, না-না। আমিও চাই এখানে জলধরবাবু তিন-চারতলা হোটেল গড়ে তুলুন। তুমি হবে তার মালকিন।

পূরবী বলে, না-না, এমন বাঁধনে আমি জড়াতে চাই না। আমি মুক্তি চাই। ওই লোকটার জীবনে এসে আমি কী পেয়েছি? বারবার বলেছি। ও চেনে শুধু নিজেকে। ওর চাওয়া অনেক। আমার দিকে নজর দেবার সময় ওর নেই, প্রেমেন। তুমি যেদিন এসেছিলে হোটেলে প্রথম তোমাকে দেখে মনে হয়েছিল তুমি যেন আমার অনেক দিনের চেনা—আপনজন। আর এতদিনে সেটা আমার মনকে দৃঢ়তর করে দিয়েছে।

প্রেমেন ওর দিকে তাকিয়ে থাকে। কাছে টেনে নেয় পূরবীকে। পূরবী বলে, আমার গহনাগুলো বাঁচাবার জন্যই তুমি এতগুলো টাকা দিয়েছ, তাই না?

ওদিকে ডাইনিং-রুমে খদ্দেরদের হৈ চৈ বেড়েছে। ওরা চিৎকার করছে। এবার জলধর খুঁজছে পূরবীকে। এসময় কাজ ফেলে কোথায় গেল পূরবী?

হঠাৎ কে বলে, দ্যাখো নদীর ধারে যেতে দেখলাম। প্রেমেনবাবু আজ চলে যাচ্ছেন। হয়তো তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেছে।

চটে ওঠে জলধর। নিজে গিয়ে ওদের কীর্তিটা দেখা প্রয়োজন। আর দৃশ্যটা দেখে চমকে ওঠে জলধর। তার স্ত্রী পূরবী আর প্রেমেনবাবুকে দেখে তাদের ঘনিষ্ঠ মুহূর্তে।

প্রেমেন জলধরকে দেখেই উঠে পড়ে। হোটেলে ফিরে বেয়ারাকে ডাক দেয় মালপত্র নিয়ে গিয়ে গাড়িতে তুলে দেবার জন্য। বের হয়ে যায় সে।

এবার জলধর মুখোমুখি হয়েছে পূরবীর। পূরবীও তৈরি। আজ তার নিগ্রহের কথা, বঞ্চনার কথাই জানাবে পূরবী। কিন্তু জলধর এসময় কোনও গোলমাল করতে চায় না। তাই বলে, ডাইনিং-হলে যাও। কাস্টোমারদের একটু সামলাতে হবে। ওদের খাবারগুলো তদারক করে তৈরি করে দিতে বলো।

চলে যায় পূরবী।

কথাটা ভেবেছে জলধর। বারবার ভেসে ওঠে পূরবীর সেই উচ্ছল ভঙ্গি। পূরবী তার জীবনে এসেছে বেশ কয়েক বছর। কিন্তু জলধর ওর দিকে নজর দিতে পারেনি। তার মনের সবটুকু জুড়ে রয়েছে বিরাট এক হোটেলের স্বপ্ন। টাকার পিছনেই দৌড়াচ্ছে সে। ব্যবসা আরও বাড়াতে পূরবীর সাহায্য চেয়েছিল। কিন্তু পূরবী তার গহনা দেয়নি। ওই প্রেমেনবাবু কেন এত টাকা দিয়েছে এবার যেন বুঝতে পারে জলধর। পূরবীকে কাছে টানবার জন্যই প্রেমেন টাকা দিয়েছে তাকে। আর তার জন্যই প্রেমেনের সঙ্গে পূরবীর সম্পর্কটা আরও ঘনিষ্ঠ হয়েছে। জলধর এটা সইবে না।

রাত অনেক হয়েছে। জলধর আজ পূরবীকে বলে, ওই প্রেমেনের সঙ্গে তোমার এইসব ব্যাপার কতদিন চলছে?

পূরবী দেখছে জলধরকে। লোভী একটা লোক। পূরবী বলে, তার কাছ থেকে এত টাকা নিতে এতটুকু বাধল না!

ওটা আমার ব্যাপার। আর তোমাকেও বলি ঘরের বউ হয়ে ইতরামি করতে লজ্জা করে না? শেষবারের মতো বলছি। ফের এসব ইতরামি দেখলে ঘাড় ধরে বাড়ি থেকে বের করে দেব।

পূরবী দেখছে একটা অর্থলোভী লোককে। তাদের বিয়ে হয়েছে পাঁচ বছরেরও বেশি। কী দিতে পেরেছে জলধর? বরং পূরবী তার হোটেলের সুনাম বাড়িয়েছে। পূরবীও তাই এবার মনস্থির করে

ফেলেছে। জলধর রাগে গজগজ করে। পূরবী কোনও জবাবই দেয় না। জবাবটা দেয় পরদিন ভোরেই। রাতেই সে গোছগাছ করে নিয়েছে। ব্যাগ হাতে বাইরে যাবার জন্য তৈরি।

জলধর ভোরেই হোটেলে বের হয়ে গেছে। সুইপারদের কাজের তদারক করে। ওদিকে বেড-টি রেডি করতে হবে। পূরবীও জানে সেটা। সে টেবিলের উপর একটা কাগজে লিখে রাখে, আমি চললাম। আর ফিরব না।

কাগজটা চাপা দিয়ে রেখে বের হয়ে গেল অটোস্ট্যান্ডের দিকে। ভোরের আলো ফুটেছে। তখনও ঘুম ভাঙেনি কাশীপুরের। চলে গেল পূরবী ভোরের ট্রেনে কলকাতায়। এবার সে নতুন করে বাঁচতে চায়।

জলধর কাগজটা দেখে। তার এসব ব্যাপারে কোনও আগ্রহ নেই। সে তার দরকার মতো টাকা পেয়ে গেছে আর ব্যাঙ্কও তার লোন স্যাংশন করেছে। জলধর এবার পূর্ণ উদ্যমে নতুন হোটেলের কাজ শুরু করেছে। অন্য কথা ভাবারও সময় নেই তার। তার এই হোটেলের সঙ্গে কলকাতার অনেক হোটেলের তুলনা করে কাস্টমারের দল। কাশীপুরে এখন এদিকের মাঠে— এপাশে-ওপাশে গড়ে উঠেছে রকমারি স্টার হোটেল-লজ-রেস্তোরাঁ। মা কালীর ভক্তদের সবরকম সুবিধা দেবার জন্য বহু আয়োজন হয়েছে। তবে তার মধ্যে সেরা ওই জলধরের হোটেল আর আজও প্রথম।

জলধর এখন নতুন হোটেল-এর কাজ শেষ করেছে। ক্লান্ত সে। এবার সে আবিষ্কার করে একদিন তার পাশে ছিল পূরবী। আজ সে নেই। ওই হোটেল দাঁড় করাতে গিয়ে জলধর তার জীবনের একমাত্র সঙ্গীকে হারিয়েছে। তার কোনও খবরই সে নেয়নি। প্রেমেনবাবুও এই হোটেলে আর আসেনি। অবশ্য এলে হয়তো সুদসমেত তার টাকা ফেরত চাইবে। তাই তার না-আসাটা ভালোই হয়েছে জলধরের পক্ষে। আজ সে ঐ কর্মব্যস্ত বিশাল হোটেলটার দিকে চেয়ে থাকে। একপাশে তার আগেকার পুরোনো হোটেলটাও রয়েছে সাধারণ মাপের যাত্রীদের জন্যে। অন্যপাশে মাথা তুলেছে নতুন প্রাসাদ-বাগান। এসব জলধরের সৃষ্টি।

হঠাৎ চমকে ওঠে জলধর। তার চেম্বার থেকে দেখে ওপাশের কাউন্টারে একটা দামী বিদেশি গাড়ি থেকে নেমে এসেছে প্রেমেনবাবু। এখন তার চুলে দু-একটা সাদা রেখা দেখা যায় আর তার সঙ্গে এসেছে একজন মহিলা। বয়স হলেও তার দেহের গড়ন আর মুখের শ্রী অটুট রয়েছে। তার হাত ধরে একটি ফুটফুটে বাচ্চা মেয়ে। ঐ সেই পূরবী যে তার জীবন থেকে হঠাৎই কোথায় হারিয়ে গেছিল। দেখছে এদের জলধর। মনে হয় বেশ সুখী একটা পরিবার। পূরবী নতুন সংসার পেতেছে। জলধর তাকে যা দিতে পারেনি তা দিয়েছে প্রেমেন। কাউন্টারে কর্মীরা সবাই নতুন। তাই ওরা ওদের চিনতে পারেনি। প্রেমেন ও তার পরিবার লিফটে করে সোজা নিজেদের রুমের দিকে চলে যায়। সাবধানে বের হয়ে আসে জলধর। আজ তার নিজেকে খুবই নিঃস্ব অসহায় মনে হয়। পূরবীকে সে কিছুই দিতে পারেনি তাই সে চলে গেছে তার জীবন থেকে।

জলধর যা নিয়ে এতদিন সব ভুলে ছিল, আজ মনে হয় তার জীবনে ওসবের প্রয়োজন অতি সামান্য। জলধর তার ম্যানেজারকে বলে, ক'দিন আমি থাকব না। সব কাজ যেন ঠিকঠাক মতো চলে, আমি ক'দিন ছুটি কাটাতে দীঘায় চলে যাচ্ছি।

জলধর আজ পূরবীর সামনে থেকে সরে যেতে চায়। প্রেমেনের কাছ থেকে দূরে যেতে চায়। যদি সে তার সেই টাকা মিটিয়ে দেবার কথা বলে! আর পূরবী যদি তার পরিপূর্ণতার ছবিটা জলধরের সামনে তুলে ধরে! তাই জলধর পালাতে চায় দূরে...অনেক দূরে।

মহেশের যাত্রা

মানুষ জন্মলগ্ন থেকেই বেশ কিছু ইচ্ছা কামনা-বাসনা নিয়েই জন্মায়। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সেইসব ইচ্ছাগুলোও মাথায় তুলতে থাকে পরিপূর্ণতার জন্য। তার জন্য তার মনে কিছু সংঘাতও দেখা দেয়। সেইসব কিছু পূর্ণ হয়, অনেক আশা কামনা অপূর্ণই থেকে যায়। যে সব স্বপ্ন সত্যি হয় না অনেক অপূর্ণ আশা নিয়ে সে ফিরে যায়। এই পূর্ণতা অপূর্ণতার সংঘাত নিয়েই মানুষের জীবন।

মহেশের জীবনেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। তখন স্কুলে পড়ি। ওর সঙ্গে পরিচয়। আমাদের পাশের গ্রাম দইপুরে ওর বাড়িটা গ্রামের প্রান্তে — চারিদিকে গাছ-গাছালির ভিড়। আকড় ফুলের সাজ, পলাশ ফুলের সাজে ওর বাড়ির চারিদিক রঙে ভরে ওঠে। সেই ফুল ফোটা জগতের মধ্যে একটা মাটির বড় দোচালা, সীমা প্রাচীর নেই বললেই চলে, রুক্ষ কর্কশ প্রান্তরের সামনে একটা বকুলগাছ। বহুদিনের পুরনো গাছটা বসন্তের দিন থেকেই ফুলে ফুলে ভরে ওঠে। মহেশ ফুল ভালোবাসে। এমনিতে সে শিল্পীই।

ওর বাবা কাকারা ছিল নামকরা কুমোর। সারা অঞ্চলে ওই ক'ঘর মৃৎশিল্পীর বাস। বড় বড় মাটির গোল ঘেরা কুয়োর চাতালের মতো ভাটিতে ভরা আগুন দিয়ে মাটির হাঁড়ি, মালসা, ভাঁড়, তিজেল কলসি এসব বানাত। স্কুলে যাবার সময় বটগাছতলায় ওদের ঘূর্ণায়মান চাকের সামনে দাঁড়িয়ে দেখতাম সেই ঘুরন্ত চাকা থেকে হাতের কৌশলে মাটির তাল থেকে রকমারি সাইজের হাঁড়ি-মালসা-কলসি-কুঁজো বের হচ্ছে! মহেশ তখন ছোট। সে তখন ওইসব মাটির পাত্রগুলোকে রোদে রাখত। কোনওদিন দেখতাম কিশোর মহেশও হাত লাগিয়েছে সেই ঘূর্ণায়মান চাকা থেকে তার হাতের কৌশলে সৃষ্টি করার জন্য।

—স্কুলে যাবি না মহেশ! শুধোই তাকে। মহেশ অবশ্য আমাদেব চেয়ে দু'তিন বছরের বড়। এক এক ক্লাসে দু'বছর থেকে পাকা হয়ে বের হতে চায় সে। তাই নীচু ক্লাস থেকে উঠে এসে আমরাই মহেশের সহপাঠী। মহেশ বলে, একটা ঘোড়া গড়ব রে। নক্সাটা করেছি, আজ আর স্কুলে যাব না।

মহেশের বুড়ো বাবা ওদিকে হাড়ি-কুঁড়ি বাছাই করছিল হাটে যাবে বলে।

বুড়ো বলে, ওসব হাতি-ঘোড়া রেখে ইস্কুলে যা তো। কত করে বলি লিখাপড়া কর। তা শালার মাথায় ঢুকেছে শিল্পী হবেক। যা ইস্কুলে। মহেশকে ঠেলে পাঠাত ইস্কুলে, কিন্তু মহেশ দেখত ইস্কুলের জানলা দিয়ে বাবার গরুর গাড়ি বোঝাই মাল জগন্নাথপুরের হাটে গেল। সেও ইস্কুলে পালিয়ে গিয়ে হাজির হল কুমোর শালে। তার মাথায় ঘুরছে নতুন ডিজাইনের ঘোড়ার কথা। তাই নিয়ে ব্যস্ত সে।

ওদিকে নন্দ পালের মেয়ে ময়না দেখছে মহেশের হাতের কাজ। ছোট মেয়েটা বলে, ইতো দারুণ একখানা ঘোড়া বানিয়েছ গো। মহেশ গাছের ছায়ায় বসে মাটির টুকরো জুড়ে একটা বিশেষ ভঙ্গির চলমান ঘোড়া বানিয়েছে। অবশ্য মহেশ এর মধ্যেই নিজের মাথা খাটিয়ে মাটির সরায় রং তুলি দিয়ে রামায়ণ মহাভারতের রাম, লক্ষণ, সীতা, কৃষ্ণ, দ্রৌপদী, ভীম এসবের টুকরো ছবি এঁকেছে অনেক। মা লক্ষ্মীর সরা, দুর্গার সরা হাটে এমনকি বাঁকুড়ার মেলাতেও ভাল বিক্রি হয়। এবার সে দেখছে ঘোড়ার মূর্তিতে গতিময়তা আনা যায় কি না। ময়না বলে, তুমি ওস্তাদ আঁকিয়ে গো।

মহেশ বলে, বাবা বলে পটুয়া। কুমোরের ছেলে হাঁড়ি কলসি গড়—তা-না এসব কেন রে। ময়না বলে, তুমি এসব আঁকো গো। আর ঘোড়াটা হয়েছে তোমার এতদিনের সেরা ঘোড়া।

—বলছিস ময়না। সাগ্রহে চাইল ওর দিকে মহেশ।

মহেশের বাবা ছেলেকে দিয়ে হাঁড়ি কলসি সরা তৈরি করাতে চায়। বুড়ো নিজে আর শালে কাজ করতে পারে না। মহেশ কিন্তু ওসব তৈরি করে না। তার নজর ওই নতুন ডিজাইনের হাতি-ঘোড়ার দিকে। নিজেই ডিজাইন করে মাটির মা মনসার বহুফণা যুক্ত ঝারি তৈরি করেছে। সেসব এখন ভাল দামে ঘরে বসেই শহরের খাদি ভবনে বিক্রি করে। বিষ্ণুপুরেও তার মাল যায়, দেশি-বিদেশি পর্যটকের কাছে ভাল দামে বিক্রি হয়।

দিন বসে থাকে না, সে নিজের গতিতে এগিয়ে চলে। ময়নার দেহে এসেছে যৌবনের ছোঁয়া। মেয়েটার সঙ্গে মহেশের মনের একটা নিবিড় যোগ রয়েছে। ময়নাই এখন তার শালে এসে নিজেও তুলি ধরে, সরায় ছবি আঁকে। মা মনসার বহুফণা যুক্ত ঝারিকে রঙবেরঙ-এ চিত্র বিচিত্র করে তোলে।

মহেশ বলে—তুই তো ভাল আঁকিস রে।

হাসে ময়না— তোমার দেখে দেখে আঁকি। ময়নার বাবার অবস্থা ভালোই। তার জমিজারাতও কিছু আছে, আর দু-তিনটে শালে অনেক হাঁড়ি-কলসি তৈরি হয়। এখন এসব বাজারে তার মালই বিকোয় বেশি। হরষিত পাল মেয়ের বিয়ের ঠিক করে সোনামুখি শহরের এক নামী পরিবারে। সেদিন খবরটা শুনে চমকে ওঠে মহেশ, বলে, তোর নাকি বিয়ে!

ময়নার চোখে জল। সে বলে, আমি ওখানে বিয়ে করব না। চাইল মহেশ। আজ মনে হয় ময়না যেন আরও কিছু বলতে চায় যে কথা মুখ ফুটে সে বলতে পারছে না। তার সেসব কথা না-বলাই থেকে যায়।

কারণ সেদিন অশিক্ষিতা মেয়ের প্রতিবাদের কোনও ভাষাই দেয়নি সমাজ। চোখের জলই ছিল তাদের নীরব প্রতিবাদের ভাষা। সে ভাষা কেউ শুনত না।

মহেশের জীবন থেকে চলে গেল ময়না, মহেশের মনে ছিল অনেক আশা অনেক স্বপ্ন। সে বড় শিল্পী হবে, তার জীবনে ময়নাই ছিল সেই সৃষ্টির অনুপ্রেরণা। তার ইচ্ছা ছিল ময়না আসবে তার জীবনে। ময়নাকেও হারাতে হয়েছে তাকে। ক'দিন তার কাজেও মন নেই। শালেও আগুন দেয় না। তার চালার তুলি রং ও পড়ে থাকে। জীবনে একটি রঙিন স্বপ্ন দেখেছিল মহেশ কিন্তু তাও ব্যর্থ হয়ে গেল। তখন স্কুলের গণ্ডি ছাড়িয়ে কলেজে ঢুকেছি। হোস্টেলেই থাকতে হয়। বাড়ি যাই ছুটি কাটাতে। মহেশের খবর আর রাখিনি কারণ পরিবেশের সঙ্গে বন্ধুও বদলায়। আজকের যে জগতে এসে পড়েছি সেখানে মহেশের ঠাঁই নেই। তবু অতীতের কথা—স্কুলের কথা ভুলিনি। তাই সেদিন হাটে গিয়ে দেখি মহেশ ও হাটে এসেছে। মনসা পুজোর সময়। গ্রীষ্মের শেষে বর্ষার ঘনকালো ছায়া। মাঠে সবুজ ধানের ক্ষেতে বাতাসের ঢেউ জাগে, বর্ষা যেন পূর্ণতার আশ্বাস আনে। মহেশের পসরায় এখন ছোটবড় সুন্দর চিত্রবিচিত্র করা মনসার ঝারি। সরায় মনসার মুখ। বিক্রিও বেশ ভালই হচ্ছে। বলি—একি রে। হাঁড়ি-কলসি মালসা ছেড়ে মা মনসা—

মহেশের দেহে যৌবনের ছোঁয়া। চোখে মুখে এক দীপ্তি। সে বলে—এখনই বেচছি। হাতি-ঘোড়া এসব। বাইরেও ভাল কাটে। ওসব হাঁড়ি-কলসির দিনও শেষ হবে। আজ সন্ধ্যায় গ্রামে আয়। কথা আছে।

মহেশের হাতের কাজ দেখে ভাল লাগে। মাটিকে যেন প্রাণবন্ত করে তুলেছে সে। সরাতে তার রামায়ণ- মহাভারতের টুকরো কাহিনী জীবন্ত হয়ে উঠেছে। তার অন্তরে যে শিল্পীমন লুকিয়ে ছিল তা জানা ছিল না। তাই ওর কথামতো সেদিন সন্ধ্যায় ওর বাড়িতে গেলাম। এখন ওর বাবা গত হয়েছে। মহেশকে অবশ্য ওর বাবাই সংসারী করে গেছলো। জগন্নাথপুরে বিয়ে দিয়েছিল মহেশের। ললিতা মহেশের ঘরে এসে আবার বলে,

—হাঁড়িকুড়িই গড়ো বাপু। ফি হাটে মাল বিকোবে। তা নয় ওই সব হাতি-ঘোড়া-সরা-পট কি হবে ওতে।

মহেশ বলে, হাঁড়ি কুঁড়িতো সবাই গড়ে। আর এসব কেউ পারে এখানে? শহরে বিষ্ণুপুরের মহাজনরা ঘরে এসে থোক টাকা দিয়ে যায়। ওসব হাঁড়ি-কলসিতে আমি নেই। ললিতার সঙ্গে

সংঘাতের শুরু এখান থেকেই। মহেশ রুখে দাঁড়ায় এবার। তার জীবন থেকে ময়না হারিয়ে গেছে প্রতিবাদ করতে পারেনি। এবার এই শিল্পীমনকে সে হারাতে পারবে না। ললিতা বলে, তোমার ওই পট-আঁকার কেচ্ছা আমি জানি।

—কেচ্ছা। চটে ওঠে মহেশ।

ললিতা বলে, সেই মুখপুড়িই তোমার মাথায় এইসব মেয়েছেলের ভূত-পেত্নিকে চালিয়ে দিয়ে গেছে। তার সঙ্গে তোমার মেলামেশার খবরও জেনেছি। আজও সেটাকে ভুলতে পারনি তাই তার ছবিই আঁকো।

মহেশ গর্জে ওঠে— থামবি। এসব শিল্পের কথা তুই কি বুঝবি? তুই চিনিস হাঁড়ি-কুঁড়ি হঃ। মুখ্যুঃ

—গেইয়াঁ মেয়েছেলে কোথাকার—ফুঁসে ওঠে ললিতা—শহরে ময়নার কাছেই যাও। ইখানে কেন?

মহেশের মন যেন কি এক শূন্যতায় ভরে ওঠে। সে চেয়েছিল একটি ছোট পরিসরে শিল্পের জগত গড়তে। কিন্তু সে আশাও তার পূর্ণ হয়নি। তবুও তার স্বপ্ন দেখা থামেনি।

ছেলেবেলা থেকেই গ্রামের যাত্রার দলে সে পার্ট করত, গানও গাইত। এখনও পার্ট করে। এই বয়সে সখী সেজে গান আর গাওয়া যায় না। তবু মহেশ যাত্রার স্বপ্ন দেখে। এ যেন এক বিচিত্র কল্পনার জগৎ। নিজের প্রতিদিনের দুঃখকষ্টের কথা—বঞ্চনার কথা ভুলে মানুষ অন্য এক জীবনে উত্তীর্ণ হয়। সেখানের সুখ-দুঃখের মাঝে নিজেকে ভুলে যায়, গড়ে তোলে কল্পনার এক রাজ্য।

সেদিন সন্ধ্যায় ওর বাড়ি গিয়ে দেখি মহেশের বাইরের শালের এদিকে একটা নতুন চালা বানিয়েছে। এখন তার ওই—মাটির হাতি-ঘোড়া মনসার ঝারি বাইরেও প্রচুর বিক্রি হয়। দু-তিনটে ছেলেও কাজ করে।

আর চালার এদিকে একটা ফরাস পাতা সেখানে গাঁয়ের কোকিল ভট্টাচার্য হারমোনিয়ামে সুর তুলে বকের মতো গলা তুলে গাইছে

—আয়লো সখি, কুসুম তুমি!

—বাজার বাগান।

আর সেই সঙ্গে তালে বেতালে গ্রামের কয়েকটা ছেলে হাত-পা ছুঁড়ে নৃত্য করার চেষ্টা করে। কোকিল ভট্টাচার্য-এর হাতে একটা বাঁশের ছড়ি। চিৎকার করে গান থামিয়ে— অ্যাঁই পটকা-কেবলা! তালে তালে পা ফ্যাল, এক-দুই-তিন। এক-দুই ফ্যাল। না হলে পায়ের গোছে মারব কঞ্চির ঘা, ধর—

—আয়লো সখি, কুসুম তুলি।

কোকিল ভট্টাচার্যের অবশ্য পিতৃদত্ত একটা নাম আছে, তবে ছেলেবেলা থেকেই গান গাইত তাই সেই পিতৃদত্ত নামের বদলে গ্রামের লোক ওকে এখন কোকিল ভটচায বলেই জানে। শীর্ণ লগার মতো দেহ, মদ-চুল্লু-মহুয়া মায় হাড়িয়া পেলেই খুশি। আগে সাতবেড়ের দলে সুরপাটির মাস্টার ছিল। এখন এসে জমেছে মহেশের এখানে।

মহেশ আমাকে দেখে খুশিই হয়।

—এস সমী। গাঁয়ের যাত্রার দল দলবাজি করে উঠে গেল। এবার—আমিই যাত্রা করব। এবার পালা ধরেছি মায়ের ঋণ। হেডমাস্টার রমন ডাক্তার, ধীরেনবাবু, গুরুপদবাবু, বঙ্কিম ডাক্তারকেও বলেছি। তোমাকেও করতে হবে হে। পরে একদিন এস।

কোকিলের গান আর ওদের নাচ চলেছে। হঠাৎ কার তীক্ষ্ণস্বর শুনে চাইলাম। মহিলা খ্যানখ্যানে গলা কোকিলের ও সুরের তাপমাত্রা ওপরে তুলে বলে— বলি আর কত ফুল তুলবি মুখপোড়া। রাতভোর কি ওই ফুলতোলা আর নাচ চলবেক। এবার গিলেকুটে আমাকে ক্ষ্যামা দাও। নাহলে ঝেটিয়ে সব বিদেয় করব—হ্যাঁ। কথাটা জানান দিয়ে ললিতা ভিতরে চলে গেল। কোকিলের গানও থেমে গেছে-নাচও। মহেশ বলে—আমার বৌ নয়, যেন কর্ত্রী, তুমি কিছু মনে করো না সমী। ওর কথা অমনি, চলহে মাস্টার খেয়ে দেয়ে নিতে হবে। তুমি এখন এস সমী। তোমার পাট নিয়ে পরে কথা হবে। বললাম—বেশ তো শিল্পকর্ম নিয়ে আছ মহেশ আবার যাত্রাফাত্রা কেন?

মহেশ বলে, মানুষের আশা স্বপ্নের শেষ নেই। রাজা-রাজপুত্র প্রেমিক তো এ জীবনে হতে পারিনি। একরাতে হয়েই আশাটা মিটিয়ে নিতে চায় মন। তাছাড়া এও তো বড় শিল্পকর্ম গো, এস কিন্তু।

রমন ডাক্তারের ডাক্তারখানা হাটতলার ওখানে। এই গ্রাম ও আশপাশের গ্রামের অনেক রুগী আসে তার কাছে। রসিক লোক এই অঞ্চলের পোস্টম্যানও। সব খবর তার কাছে পৌঁছে যায়। সেদিন হাটতলায় গেছি। রমন ডাক্তার তখন দাওয়ায় মাদুর পেতে বসে ওদিকে গাড্ডু থেকে জল নিয়ে মিকশ্চার বানাতে বানাতে আমাকে দেখে বলে,—কাল মহেশের ওখানে গেছিলে শুনলাম। বলি—তুমিও যাত্রা করছ বলল মহেশ।

রমন ডাক্তার বলে— একা আমি নই হে। হেডমাস্টার, পঞ্চায়েতের প্রেসিডেন্ট ওই ধীরেনবাবু, বরুণবাবু, বঙ্কিম ডাক্তার সারা এলাকার কাউকে বাদ দেয়নি।

বললাম তোমরাই কর। আমার তো চাকরি। কলকাতায় ফিরতে হবে। যাত্রা দেখাও হবে না। মহেশ দুঃখ পাবে।

রমন ডাক্তার বলে, দেখা যাক মহেশের যাত্রা কোথায় শেষ হয়।

তখন পাস করে চাকরিতে ঢুকেছি কলকাতায়, তাই মহেশের যাত্রায় পাঠ নিতে পারিনি। ফিরে আসতে হয়েছিল। কলকাতায় এসে নানা কাজের চাপে মহেশের যাত্রার কথা ভুলেই গেছি।

মহেশ অবশ্য স্বপ্ন দেখে আলো ঝলমল আসরে রাজপুত্র সেজে মহারাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে এক শবর কন্যার জন্য। সেই শবরকন্যা রাজপুত্রের প্রণয়ী। তাকে স্বীকার করবে না ওই মহারাজা। কোকিল ভটচায বলে, সুর যা দেব, দেখবি পালা জমবেই। আজকের একটা বোতল।

মহেশ জানে কোকিলের ওইটা চাই-ই। ললিতাকে লুকিয়ে কিছু পয়সা রাখে সে একটা মাটির বড় হাঁড়ির পেছনের ফোকরে। ললিতাও সেটা ধরে ফেলে সেখান থেকে মাল সাফ করেছে। মহেশের সঙ্গে তাই বেশ বচসা হয়েছে। ললিতা গর্জে ওঠে।

—ওসব যাত্রা ফাত্রার রোগ ছুটিয়ে দেব।

—খবরদার। গর্জে ওঠে মহেশ। সে তার আশা স্বপ্নকে বিসর্জন দিতে পারবে না। তাই নিয়ে আবার সংসারে যেন আগুন জ্বলে ওঠে। মহেশ বলে, আমার ইচ্ছা যাত্রা করব। ব্যাস—

ললিতা বলে, ওই ময়নাই তোমার মাথা বিগড়ে দিয়ে গেছে। মুখপুড়ি।

—যা-তা বলবি না তার নামে। মহেশ ফুঁসে ওঠে।

ললিতা বলে, খুব যে দরদ। সব ভূত ঝেঁটিয়ে বিদেয় করব।

মহেশের মনমেজাজ ভাল নেই। তুলি ধরতেও মন চায় না। বসে আছে একাই। হঠাৎ কার ডাক শুনে চাইল। সামনে দেখে ময়নাকে দীর্ঘদিন পর দেখছে তাকে। কিন্তু একি! এ কোন ময়না। পরনে সাদা থান, সিঁথিটাও শূন্য তার। চোখেমুখে সেই যৌবনের প্রদীপ্ততা নেই যেন শোকাচ্ছন্ন মূর্তি। মহেশ দেখছে ওকে। সেও চেয়েছিল ময়না সুখী হোক। কিন্তু সেই চাওয়া তার ব্যর্থ হয়ে গেছে। ময়না বলে,

—সব হারিয়ে আবার এখানেই ফিরে এলাম মহেশদা! এখন দিন চলবে কি করে জানি না। ময়নার বাবা হরষিত পালও আজ নেই। এখন ভাইদের সংসার। তাই দুই-ভাইও আলাদা হয়েছে। সেই রমরমাও আর নেই কুমোর পাড়ায়। এখন মাটির হাঁড়ি-কলসি-মালসার দিনও ফুরিয়ে আসছে। এখন এনামেলের হাঁড়ি-কলসি-বাটিই বেশি চলে। ভাইদের সংসারে তাদের দয়াতেই বাকী জীবন কাটাতে হবে ময়নাকে। মহেশের আরও একটা স্বপ্ন ব্যর্থ হয়ে যায়।

তবু মহেশ এখন ব্যবসাপত্র ভালই করছে। তার শালে এখন নানা সাইজের ঘোড়া-হাতি-যুয্যমান ষাঁড় এসব তৈরি হয়। মনসার ঝারিরও সুন্দরতর রূপ দিয়েছে মহেশ। তার সরায় আঁকা মনসা-লক্ষ্মী-দুর্গার মুখ এখন কলকাতা ছাড়িয়ে দিল্লি-বোম্বাই এমনকি সমুদ্র পারে লন্ডন-আমেরিকাতেও যায়।

মহেশ সেদিন ময়নাকে বলে, আবার তুলি ধর ময়না। পট আঁকো — এসব রঙ করো। তবু কিছু পয়সা

পাবি। ভাইয়ের বোঝা হয়ে থাকতে হবে না। ময়নার জীবন থেকে সব রঙ মুছে গেছে। শ্বশুরবাড়িতে দিনরাত কাজ নিয়ে থাকতে হত। তাদের সেই হাঁড়ি-কলসির আড়ত। সেখানে কোনও শিল্পকর্ম নেই। ময়নার মনে রঙ এনেছিল মহেশ। তার জীবন থেকে সে সরে যেতেই রঙ-এর বর্ণালীও ময়নার জীবন থেকে হারিয়ে গেছিল। তাই বলে সে —ওসব তো ভুলে গেছি। আর কি পারব মহেশদা।

মহেশ বলে, শূন্য জীবনকেও রঙিন করতে হয় আশা স্বপ্নের রঙ দিয়ে। আবার তুলি ধর সব রঙ ফিরে আসবে।

ময়নাও আজ সব হারিয়ে এসেছে এখানে। তবু মহেশদা তাকে ভোলেনি। ময়না আবার রঙ-এর কাজ শুরু করে। ধীরে ধীরে আগেকার সেই কল্পনাগুলো যেন বর্ণময় হয়ে ওঠে।

মহেশ বলে, আরে এ যে আমার চেয়েও ভাল হাত রে তোর।

সেবার শহরের মহাজনেরা মহেশের সরার কাজ দেখে কয়েকশো অমনি দুর্গা-মনসার মুখের কাজ দেয়। আর কলকাতায় এগজিবিশনেও সরকারি পুরস্কার পায় মহেশ। সেই ছবিগুলোর নক্সা করেছে মহেশ আর রঙ করেছে ময়না। খবরের কাগজে ছবি খবর ছাপা হয়। আমি দেখছি খবরটা। খুশিই হই, মহেশ তাহলে বসে নেই। তার একটা আশা স্বপ্ন তবুও সার্থক হয়েছে।

সেবার পুজোর কয়েকদিন আগেই বাড়ি গেছি। আর পরদিন সন্ধ্যাতেই মহেশ এসে হাজির। হাতে একটা লণ্ঠন। খুশি হই ওকে দেখে— এস মহেশ। আজকাল বেশ নাম ডাক হয়েছে তোমার। সরকার থেকে পুরস্কারও দিয়েছে। মহেশ বলে— তা দিয়েছে। তাই এলাম তোমার কাছে, যাত্রার কথাটা মনে আছে তো। অর্থাৎ মহেশ এখনও যাত্রার স্বপ্ন দেখছে। বলে ফেললাম।

—হ্যাঁ।

মহেশ বলে, এবার লক্ষ্মীপুজোর রাতেই যাত্রা নামাব। রমন ডাক্তার, ধীরেনবাবু, তিনু মাস্টার সবাই তৈরি। তুমি কাল এস। দু-চারদিন রিহার্সাল দিলেই হয়ে যাবে। আমার পাট তো মুখস্থ।

মহেশ ওখানে বসেই শুরু করে—

হের নাছ ঃ সিংহাসন তুচ্ছ
মোর কাছে, প্রেম জন্য স্বর্গের সুষমা
তার লাগি দিতে পারি বিসর্জন—
তুচ্ছ সিংহাসন।

মহেশের উদাত্ত কণ্ঠের রিহার্সাল শুনতে মা-বৌদিরাও এসে পড়ে। মহেশ তখন সেই কাল্পনিক সিংহাসনের মহিমা ত্যাগ করে প্রেমের মহিমা গাইছে। তারপর একটু দম নিয়ে বলে, কাল এস কিন্তু। তোমার জন্য রোল খুঁজে রেখেছি। সুচন্দের রোল পাঁচটা সিন ফাটিয়ে দেবে।

মহেশ চলে যেতে মা বলে, ওর যাত্রা রোগ সারবে না। সব ভাল রোগ ওই যাত্রারোগ। বৌদি বলে, ওর রিহার্সাল চলছে পাঁচবছর ধরে। পালা কবে নামবে কে জানে।

মহেশ এবার যাত্রা করবেই। শহরের মহাজনই বলেছে সে ড্রেস-মেকআপ-সিন এসব ব্যবস্থা করবে। ওদিকে কোকিল ভটচাযও পিছনে লেগে আছে; সুর সে দেবেই। ময়নারও খুব সাধ লোকটা চায় একরাত রাজপুত্র হয়। যে প্রেমকে বাস্তব জীবনে কোনও স্বীকৃতি দিতে পারেনি মহেশ, সেই প্রেমের জন্য একরাতের রাজপুত্র হয়ে সিংহাসনকে তুচ্ছ করে প্রেমের মহিমা কীর্তন করবে। ময়নাও বলে, বাবুদের নিয়ে মহড়া শুরু কর। কিছু টাকা লাগে আমিও দেব কারিগর।

মহেশের বৌ ললিতা দেখেছে ময়না আসার পর তাদের জিনিসের বিক্রিও অনেক বেড়েছে। এখন কাজকর্ম, আসবাবপত্রও বেড়েছে। ললিতা দেখেছে ময়নাকে মহেশ হাত ধরে কাজ শেখায়। ওদিকে আগুনের শিখার রঙ দেখে এখন ময়নাও বুঝতে পারে পোড় ঠিকমতো হয়েছে কি না। মহেশ বলে, তুই তো পাকা কারিগর হয়ে উঠলি রে।

ললিতারও মন চায় সেও তুলি ধরবে। ময়নাই বলে, ঠিকমত ধরো। ফুলের রঙটায় হলুদ দাও। আর মধ্যে লাল।

ললিতা কিন্তু তুলি টানতেই পারে না। সব রঙ যেন একাকার ধ্যাবড়া হয়ে যায়। মহেশ বলে, দিলি তো সরাটা বরবাদ করে। ময়নার মতো রঙ করবি তা নয়— ললিতার সর্বাঙ্গে জ্বলে ওঠে নিজের পরাজয়ের গ্লানিতে। ময়নাই যেন সব। ললিতা তুলি ফেলে সরাটা চুরমার করে দিয়ে চলে গেল। ময়না তাকিয়ে দেখে, তবে ললিতার চোখে জ্বালাটা সে দেখেছে। ললিতাই সেদিন বলে—যাত্রার খরচা করতে হবে না।

মহেশকে এর মধ্যে কোকিল ফিট করেছে। যাত্রার মহড়া লাগাও।

মহেশও তৈরি হচ্ছে। বাবুদের সকলকে ধরেছে—আজ্ঞে, আজ আসতে হবে। মহড়া না দিলে লক্ষ্মীপুজোর রাতে পালা হবেক কি করে। সন্ধ্যার পর অনেকেই এসেছে মহেশের বাড়ির বাইরের চালায়, রমন ডাক্তার - ধীরেনবাবু-তিনুবাবুরাও এসেছে। আমাকেও যেতে হয়েছে। ওদিকে কোকিল ভটচায তখন ধেনো গিলে ফিট হয়ে তার সেই নৃত্যগীত শুরু করেছে—

আয়লো সখী-কুসুম তুলি
বাজার বাগান—

মুখে ধেনোর গন্ধ। হাঁ করলেই সেই সুবাস বের হয়। ওদিকে নন্দ পার্ট ধরেছে। আজ মহেশ সব থেকে খুশি। সত্যিই মহড়া হবে এবার তার পালাও নামবে।

ওদিকে ললিতা রাগে গজগজ করছে। আজ ময়নাও এসেছে, দু'তিনটে ছেলে শালে যারা কাজ করে তাদের নিয়ে সে এর মধ্যে আলুর চপ-বেগুনি ভাজতে শুরু করেছে। ওই চপ-বেগুনি আর মুড়ি দিয়ে জলযোগ হবে— তারপর চা। ললিতা দেখে তাকে এসব আয়োজনের কথা মহেশ বলেনি। ময়নাই যেন ও বাড়ির গিন্নি— সেই কর্ত্রী। ময়নার রূপযৌবন এখনও যায়নি। আজ ললিতার মনে হয় ওর জন্যই মহেশ ময়নাকে কাছে পেতে চায়। ময়না এগিয়ে এসেছে। ললিতার মনের জ্বালাটা এবার সোচ্চার হয়ে ওঠে। ওদিকে নাচের নূপুরের শব্দ আসে। মহেশ তার পার্ট শুরু করেছে। প্রেমের মহিমা ব্যাখ্যা করে চলেছে। ললিতা ফুঁসে ওঠে— বুঝেছি ওই যাত্রা নয় পীরিতের খেলা। তাই ছুঁড়ির এত আনন্দ। এসেছে ললিতা ওই চালার ওদিকে। ওদিকে শালে আগুন দেবার জন্য খড় কাঠকুঠো গাদা করা আছে। ওদিকে ধানের মরাই। চালায় ময়না আর ছেলেদুটো উনুন জ্বেলে চপ বেগুনি ভাজছে। অন্য উনুনে চায়ের কেটলি। যাত্রার পার্ট শোনা যাচ্ছে। ললিতা এসে গর্জে ওঠে—এসব কি হচ্ছে! ওই মিনসের বাপের ছেরাদ্দর হচ্ছে নাকি! ময়না বলে— বৌদি ওঁরা এসেছেন।

—তাই তুইও সেজেগুজে ঢলানি করতে এসেছিস। মুখপুড়ি! নিজের ভাতারটাকে খেয়ে এবার অন্যের দিকে নজর। ঢলানি—

ময়না বলে, এসব কি বলছ বৌদি। থামো— বাবুরা রয়েছেন।

—নিকুচি করেছে তোর বাবুদের। মুখপুড়ির সরা আজ শেষই করব।

উনুন থেকে একটা জ্বলন্ত কাঠ টেনে নিয়েছে। একটা ছেলে বাঁটটা ধরতে যাবে। ললিতা সেই জ্বলন্ত কাঠটা ময়নার দিকে ছুঁড়েছে। ময়না সরে যায়। জ্বলন্ত কাঠটা গিয়ে পড়ে খড়গাদায়। শুকনো খড় দপ করে জ্বলে ওঠে। আর সেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে খড়ের চালে। তারপর শুধু আগুন আর আগুন।

সে এক হৈ চৈ কাণ্ড। যাত্রা মহড়া থেমে যায়। কোকিল ভটচায জাতে মাতাল হলেও তালে ঠিক আছে। হারমোনিয়াম নিয়ে দৌড়ায় বাইরে। তারপর গ্রামের লোকজন ছুটে যখন আগুন নেভায় তখন ক্ষতি যা হবার হয়ে গেছে। ধানের মরাই গেছে। শাল-এর চালাও শেষ। শুধুমাত্র ঘরখানা কোনওমতে বেঁচে গেছে। তৈরি মালও অনেক নষ্ট হয়ে গেছে। সেবার আর মহেশের যাত্রা হতে হতে হল না। ওই ছাই গাদায় দাঁড়িয়ে মহেশ অবশ্য ঘোষণা করে, এবার হল না, সামনের পুজোতে যাত্রা করবই বাবুরা। সেদিন পাট করতে হবে কিন্তু। রমন ডাক্তার বলে, নিশ্চয় করবে সবাই। সামনের পুজো অবশ্য অনেক দূরে। তাই এবার নিশ্চিন্তেই পুজো কাটল। মহেশ আপশোষ করে— এবার হল না। সামনের বার কিন্তু করতে হবে সমী।

কোকিল অবশ্য আর মদের পয়সা না পেয়ে রামায়ণ গাইতে যাবার দলে ভিড়েছে। মহেশ শালার ফুটানিই সার। যাত্রা হবে না কচু হবেক। তবু মহেশ আশা ছাড়েনি। এর মধ্যে দু-একবার বাড়ি গেছি দেখেছি মহেশ আবার কাজ শুরু করেছে। বলে, মনে আছে তো। আমি তৈরি হচ্ছি যাত্রার জন্য।

সেবার মাস কয়েক পর বাড়ি গেছি। বর্ষা শেষ হয়। শরতের আভাস এসেছে। ধানগাছগুলো এখন পুরুষ্ট। মাঠের আলে কোনও জায়গায় শরতের ডাকে কাশফুল মাথা তুলেছে। মেঘমুক্ত আকাশে মেঘের দল ভেসে এসেছে। শরতের মেলার পসরা নিয়ে। এবার মনে হয় মহেশ এল বোধহয়। তার যাত্রার নোটিশ নিয়ে।

কিন্তু মহেশের দেখা নেই। একটু অবাক হই, তবে কি মহেশের ঘাড় থেকে যাত্রার ভূত নেমেছে! সেদিন গেলাম রমন ডাক্তারের কাছে। রমনকে বলি, কি হে ডাক্তার! তোমাদের মহেশের যাত্রা কতদূর হে।

রমন চাইল আমার দিকে। বলে, এর খবর শোনো নি?

আমি চাইলাম। রমন বলে,

—গত মাসেই আন্ত্রিক হয়েছিল হঠাৎ মহেশের। অনেক চেষ্টা করলাম, কিছু করা গেল না। দু'দিন ভুগেই শেষ যাত্রায় চলে গেল মহেশ। যাবার সময়ও বলেছিল সেরে উঠে যাত্রাটা ধরতে হবে ডাক্তার। সেরে আর ওঠেনি। মহেশের জীবনে দুঃখ-বঞ্চনার মধ্যে একরাতের প্রেমিক রাজপুত্র সাজার স্বপ্ন ছিল। সে স্বপ্ন সার্থক হয়নি। সব আশা নিরাশা নিয়েই সে শেষ যাত্রায় চলে গেল, মহাযাত্রায়।

যদুর বাঁশি

রোজ সকালে স্তব্ধ পাড়াটাকে মুখর করে টিনের ঠ্যালাগাড়িটার কর্কশ শব্দ ওঠে। করপোরেশনের ময়লা ফেলার হাত গাড়িটায় লোহার চাকা লাগানো, সেই লোহার চাকার ঝন ঝন শব্দ ওঠে আর সেই সাথে বেজে ওঠে হুইসিল। করপোরেশন থেকে শহরকে জঞ্জাল মুক্ত, মালিন্যমুক্ত করার জন্যই এই ব্যবস্থা। রোজ সকালে করপোরেশনের ধাঙড় যদু ডোম ওই হাতগাড়িটা ঠেলতে ঠেলতে আসে বাড়ি বাড়ি, মুখের বাঁশিটা বেজে ওঠে ফু-র-র যদুর চিৎকারও ধ্বনিত হয় ময়লা ফেলবে ময়লা। পাড়ার বাসিন্দারা সারাদিনের ময়লা আবর্জনা সংগ্রহ করে রাখে বালতিতে না হয় প্লাস্টিকের প্যাকেটে। সেইগুলো যদুর গাড়িতে তুলে দিয়ে রোজ সকালে মালিন্যমুক্ত হওয়ার চেষ্টা করে।

ওদিকে সীতানাথবাবুর বড় বাড়িটাতে তখনও ঘুমের আমেজ কাটেনি। পাড়াটা সাধারণ মধ্যবিত্তদের পাড়াই। অধিকাংশ লোকই কোনো না কোনো অফিসে, ব্যাংকে চাকরি করে। মোটামুটি শান্তিতে থাকতে চায়। তাই এই পাড়াতে তেমন গোলমাল ও অশান্তি নেই। যে যার কাজ নিয়েই ব্যস্ত। বাচ্চারা পাড়াতেই খেলা করে। তাদের কচি-কাঁচা কণ্ঠস্বরই শোনা যায়। গাড়ির ভিড় এখানে বিশেষ নেই। কারণ এ পাড়াতে যারা থাকে তাদের গাড়ি কেনার ক্ষমতা বা প্রয়োজন কোনোটাই তেমন নেই। শুধু গাড়ি আছে ওই সীতানাথ বাবুদের। এ পাড়ার অন্যতম পুরোনো বাসিন্দা ওরাই। এসব জায়গা ছিল সীতানাথবাবুর ঠাকুরদার। তিনি তখন এদিকের বাঁশবন, জলাজমি সস্তায় কিনে বাড়ি করেছিলেন। কিছু জমিতে বাগানও করেছিলেন।

সীতানাথবাবুর বাবা ক্রমশ ব্যবসাপত্র শুরু করেন। জমিদারি চলে যাবার পর। তখন কলকাতা শহরের রূপও বদলাতে শুরু করেছে। শহরের আয়তন বাড়তে বাড়তে এখন এইদিকে থেমেছে। শুধু থেমেছেই নয়, এখানে শহর থাবা বসিয়েছে। চারদিকে বড় বড় রাস্তা, পাঁচ সাততলা বাড়ি, ঝকঝকে বাজার, সবই গড়ে উঠেছে। সীতানাথের পিতৃদেব তখন মোটা টাকার বিনিময়ে প্লট করে এসব জলাজমিতে ছোট ছোট বাড়ি করে সেগুলো বিক্রি করে প্রচুর টাকা ঘরে তোলেন।

আর তার যোগ্য পুত্র সীতানাথ এখন সেই টাকাকে খাটিয়ে চলেছে ব্যবসাতে। একটা বাজারই করেছে। এদিকে রেডিমেড পোশাক তৈরির কারখানা, দোকান অনেক কিছু করে দু-হাতে টাকা গুনছে।

সীতানাথের দুই ছেলে। তারাও এখন ব্যবসাপত্র দেখে। দু'জনের দু'টি গাড়ি। বাড়ির কাছেই ওদিকে মাঠে গুদামও করেছে ওইসব জামাকাপড়ের। রোজ মালপত্র আসা-যাওয়া করে।

এ পাড়ার মধ্যে তার বাড়িটাই বেশ বড়। আগেরকার আমলের চকমিলানো দুই মহলের বনেদি ছাপ ওয়ালা বাড়ি। সীতানাথের স্ত্রী মারা যান আগেই। অনেকদিনই ভুগেছিলেন ভদ্রমহিলা নানা ব্যাধিতে। সীতানাথের বয়সটা তখন বেশি নয়। ব্যবসার কাঁচা পয়সা আসছে স্রোতের মতোই।

সেই বয়সে কিছু মোসাহেবও জুটেছিলো। সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি ব্যবসাপত্র করার পর দেহমন একটু আরাম-আয়েস চাইত। বাড়িতেও শান্তি নেই। স্ত্রীর কড়া নজরদারি। তাই সীতানাথ বন্ধুদের পাল্লাতে পড়ে একটু এদিক-ওদিকেও যাতায়াত শুরু করে।

রূপা বাঈজির গান শুনতেও যায়। ক্রমশ ওই পাড়াতে যাতায়াত শুরু করে। এ যেন এক বিচিত্র নেশার জগৎ।

এর কিছুদিন পরই সীতানাথকে ওই ব্যাধিটি গ্রাস করে। ডাক্তারবাবু দেখেই রা' বলেন,

—ও সব জায়গায় যাতায়াত বন্ধ করুন। ওষুধ-ইনজেকশন এসব নিতে হবে। না হলে ওসব নোংরা

রোগ সারবে না। প্রাণের ভয়টা কিঞ্চিৎ বেশি। এমনি লোকদের এই ভয় একটু বেশিই হয়। কারণ তাদের দোষ অনেক। তাই সীতানাথ ওই পথে যাতায়াত বন্ধ করে।

আর তার স্ত্রীর শরীরেও তার স্ত্রীর অজানতে সেই বিষও ঢোকে। ক্রমশ ভুগে ভুগে তিনি মারা যান। পাড়ার লোক বলে, পয়সা খরচের ভয়ে স্ত্রীর চিকিৎসাও করায়নি।

অবশ্য সীতানাথও সেটা জানে। কিন্তু আসল কারণটা পাড়ার লোক, এমনকি সীতানাথের দুই ছেলে রামনাথ ও শ্যামনাথও জানে না, তার মেয়েও জানে না মায়ের আসল রোগটা কি। সীতানাথ জানাজানির ভয়েই ডাক্তারকে দেখায়নি।

ওর চিকিৎসা করত এক বুড়ো কবরেজ মশায়। সে সীতানাথের দয়াতে তারই একটা বাড়িতে থাকত। কবরেজকে সীতানাথ বলেছিল, আসল রোগটার কথা কেউ যেন জানতে না পারে, কবরেজ। জানতে পারলে তোমাকেই শেষ করে দেব।

কবরেজ মশাই ভয়ে অন্য অসুখের কথাই বলত। কবরেজ জানত, সীতানাথ ইদানীং এই এলাকাতে বিরাট চোলাই মদের ব্যবসা চালু করেছে। ওদিকে ওর একটা বাগানবাড়ি আছে। চাষবাড়িও বলা যেতে পারে। ওদিকে এখনও বাঁশবন, জঙ্গল রয়েছে। ওই দিকে বড় ধাপার মাঠে মদ তৈরি হয় প্রচুর। আর বিভিন্ন এলাকার মস্তানরাই এসব মালের এজেন্ট। তারাই নিয়ে যায়। আর পুলিশও যে কোনো কারণেই হোক এদিকে আসে না। অবশ্য সীতানাথের পুলিশের সাথে এখন বেশ ভালো সম্পর্কই গড়ে উঠেছে। তাই কবরেজও জানে তার মতো একটা চুনোপুটিকে টপকে দেয়ার কাজটা সীতানাথের বাঁ হাতের খেল।

তবু বলে কবরেজ—কিন্তু এটা অন্যায়। ভালো চিকিৎসা করালে উনি বেঁচে যাবেন।

সীতানাথ গর্জে ওঠে, আপনি বাঁচলে বাপের নাম। তুমি বাঁচতে চাও না মরতে চাও, হে কবরেজ?

কবরেজ ধমক খেয়ে চুপ করে যায়।

সীতানাথ গদগদ কণ্ঠে বলে ওঠে, হরি হে, দয়াময়। কৃপা করে, গুরু।

সীতানাথ এখন পরম ভক্ত সেজেছে। এর মধ্যে সে দেখছে ব্যবসাও। জগতে অন্যকে ঠকাতে গেলেও একটা 'ভেক'-এর দরকার। ভেক্ না হলে ভিখ্ মেলে না। তাই সীতানাথ এখন পরম ভক্ত সেজেছে।

কোনো বিশালদেহী পিপের মতো গোল চেহারার এক গুরুদেবকে পাকড়েছে। তিনিই নাকি তাকে ভবসমুদ্র পারের টিকিট কেটে দেবেন।

সীতানাথ রোজ জোর কণ্ঠে নামগান করে। আর আহারাদির খরচ কমাবার জন্য মাছ-মাংস ছেড়ে বাড়িতে নিরামিষ চালু করার কথাই ভাবছে। এখন মাছ-মাংসের দাম আকাশছোঁয়া।

অবশ্য এর মধ্যে সীতানাথের স্ত্রী মারা গেছেন। সীতানাথের কাছে যে আগে মৃত বলেই গণ্য হতো। সে শুধু যেন খরচ করানোর জন্যই বেঁচে ছিল।

সেই ভদ্রমহিলা মারা যেতেই কিছুটা নিশ্চিন্ত হয় সীতানাথ। খরচ তো কমলোই? একটা লোকের খরচ তো কম নয়। দৈনিক হিসাবে যোগ দিলে বছরে যে অঙ্কটা দাঁড়ায় সেটাও কমে যায়। তারপর খিটমিট ঝনঝাট—এসব তো আছেই।

সীতানাথ এখন বন্ধনমুক্ত মুক্ত পুরুষ। ওই গুরুদেবের নামই স্মরণ নিয়ে সকাল-সন্ধ্যা নামগান করে। গলাতে কণ্ঠি আর ললাটে তিলকও ধারণ করেছে। সকলেই বলে —স্ত্রী মারা যাবার পর সীতানাথবাবু বিবাগীই হয়ে গেছেন হে।

অবশ্য সীতানাথও বলে, সংসারে থাকতে হচ্ছে ছেলেমেয়েদের জন্য। তাই ব্যবসা করি, তবে অন্যায় করতে পারব না। গুরুর নিষেধ। নতুন একটা কোম্পানিও করেছে সীতানাথ। ব্যাঙ্ক থেকে দশ লাখ টাকা লোনও নিয়েছে। সস্তা দামে রেডিমেড পোশাক দেবে গরিবদের জন্য, তাই অনেক ব্যবসায়ী মোটা টাকা আগাম দিয়েছে মাল পাবার জন্য।

সীতানাথ কাগজপত্র দেখিয়ে বলে তাদের মাল সকলকেই দেয়া হবে। ম্যানেজারকে গিয়ে বলুন।

ম্যানেজারই এই কোম্পানির সব। রথীনবাবু এমন দরাজ দিল মালিক আগে কখনও দেখেনি। সীতানাথ বলে,

গুরুদেবের নির্দেশ, দরিদ্র নারায়ণের সেবা করো। তাই আমি কোনো লাভ নেবো না। তুমিই সব দেখাশোনা করো। যেন ঠিক মতো সেবার কাজ চলে। সীতানাথ বাড়িতে এখন বাইরের মহলেই থাকে। অবশ্য ভিতর মহলে থাকার কোনও ইচ্ছেও নাই। প্রথম প্রথম সীতানাথকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল বড় ছেলে।

বড় ছেলে রামনাথ এখন ওইসব কারখানা জমি বাড়ির কাজগুলো দেখে। নিজে গাড়ি হাঁকিয়ে অফিসে, সাইটে যায়।

রাতে ফেরে মদ গিলে পাড় মাতাল হয়ে। কোনোদিন ফেরেই না। কোনো হোটেলে পড়ে থাকে কোনো মেয়েকে নিয়ে।

সীতানাথের বয়স হয়েছে। দিন বদলেছে। তাদের আমলে এমন কলেজ গার্ল এখানে-সেখানে মিলত না। তাদের জন্য নির্দিষ্ট পাড়াতে যেতে হত।

এখন সেই পাড়াতে আর যেতে হয় না। পয়সা থাকলে হোটেলে রিসর্টে গিয়ে ফুর্তি করা যায়।

রামনাথ বাড়ি ফিরলেই বৌমাও গলা তুলে শোনায়,

—বাপ্ কা বেটা, হবে না? এমনই তো হবে। পচে গলে মরবে যদি ভগবান থাকে। রামনাথও হুঙ্কার ছাড়ে, খতম করে দেঙ্গা। তারপর চুলের ঝুটি ধরে স্ত্রীকেই দু'চার ঘা বসাতে থাকে। সে এক বিশ্রী পরিবেশ।

আর ছোট ছেলে শ্যামনাথ এমনিতেই পাগল। জন্ম থেকেই ওর পা দুটো বাঁকা। মুখ দিয়ে লালা পড়ে। সে বৌদিকে চিৎকার করতে দেখে হাততালি দেয়—জমেছে? দারুণ জমেছে।

সীতানাথও শোনে সব। শ্যামনাথও কোনো কোনো দিন বাঁকা-বাঁকা পায়ে হেঁটে এসে বলে,

—বৌ—আমার বৌ হবে না? ও বাবা?

সীতানাথের কাছে সাঁড়া বাড়ির পরিবেশ যেন বিষিয়ে উঠেছে। টাকার অভাব তার নেই। ব্যবসা-কারখানা সবই রয়েছে। কিন্তু বাড়িতে তার কৃতকর্মের ফল যেন সজীব হয়ে ঘুরছে তার চোখের সামনে। ছোট মেয়েটা তবু অনেকটা ভালো। সীতানাথের ওই একটু মাত্র সান্ত্বনা। স্ত্রী মারা যাবার পর এবার সীতানাথ বুঝেছে সেবা করার জন্যও স্ত্রীকে খুবই দরকার শেষ বয়সে।

বাড়িতে কাজ করার লোক দু'একজন রেখেছে রামনাথ বাবার ইচ্ছার বিরুদ্ধেও। আর এই নিরামিষ পদের প্রচলনও হতে দেয়নি। মাছ-মাংস সবই চলে এ বাড়িতে।

তবে বৌমা স্বামীর দিকে তো চায় না। শ্বশুরের ওপরও রাগ অনেক। শীলা এ বাড়িতে বৌ হয়ে এসে দেখেছে এদের স্বভাবটা। মনের অতলে এদের নোংরা যেন ফিক ফিক করছে।

সীতানাথকে দেখেছে শীলা। নিজের কুৎসিত রোগটা নিজে সারাল, অথচ একজন ভদ্রমহিলাকে মরতে হল ওর জন্যই।

নিজের স্বামীকেও দেখছে। এই মানুষগুলোর সম্বন্ধে ওর মনে জন্মেছে কটু-ঘৃণাই। তাদের জন্য কিছু করার কথাও তার মনে আসে না। যেন এদের সেও একটা অপমানজনক আঘাতই দিতে পারলে খুশি হবে। এদের মনের কোণে শুধু আবর্জনাই জন্মেছে।

এর মধ্যে সীতানাথের সেই দরিদ্র নারায়ণকে পোশাক সরবরাহ করার কোম্পানি লাটে উঠেছে। ব্যাঙ্কের দশ লাখ টাকা আর ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে নেয়া আগাম লাখ পাঁচেক টাকাও এসে ঢুকেছে সীতানাথের সিন্ধুকে।

পুলিশ এসে ধরেছে সেই রথীনবাবুকে। কারণ সেই কোম্পানির ডিরেক্টর ছিল রথীনবাবুই। সীতানাথ কাগজে-কলমে কোথাও নেই। পুলিশকে সে সাফ জানিয়ে দেয়,

—ওই রথীনবাবুই আমার বাড়িতে অফিস করে সাতমাস ভাড়া দেয়নি স্যার। আমারই এত টাকা জলে গেছে ওর জন্য। এইভাবে আমাকে ঠকাবে তা ভাবিনি। হরে কেষ্ট। ঈশ্বরের নাম স্মরণ করে উদাস চিত্তে সীতানাথ বলে। রথীনবাবু বলে,

আপনি গুরুদেবের আদেশে এসব করছেন। বলেছিলেন—

হাসে সীতানাথ—কই! ওসব কথা তো বলিনি! ছিঃ! ছিঃ! গুরুদেবের নাম করে মিথ্যে কথা বললে যে পাপের অবধি থাকবে না। গুরু হে দয়া করো! সীতানাথ তখন গুরুদেবকে স্মরণ করছে। পুলিশ তো এমন ভক্তিমান লোকের কথা বিশ্বাস না করে পারে না।

গুরুদেবের নামই করে সীতানাথ। সকালে নামকীর্তন শুরু করে। এই সময়ই আসে যদু করপোরেশনের ময়লা ফেলা গাড়িটা নিয়ে। তখন এ বাড়ির মানুষদের ঘুমই ভাঙে না। রামনাথের তখন মধ্যরাত্রি। কাজের মেয়ে ললিতা ও বাড়িতে এখন একটা ঠাঁই করে নিয়েছে। সেও ওদিকের ঘরে একটা তক্তাপোষে শুয়ে থাকে। সীতানাথই রান্নাঘর থেকে বড় প্লাস্টিকের বালতিতে রাখা আবর্জনাগুলো নিয়ে গেট খুলে বের হয়। এই সময় ময়লা না দিলে সারাদিন ওই ময়লা ঘরেই রাখতে হবে। পচে গন্ধ ছাড়বে। তারপর পথে ফেলেছিল ওই বাড়ির নরেশবাবু। করপোরেশন তাকে ধরে কোর্ট কাছারি করে একশো' টাকা জরিমানা করেছিল।

তাই সীতানাথ নিজেই আবর্জনা ফেলে যদুর হাতগাড়িতে। এ তার নিত্যদিনের কাজ। বাড়ির এটা করত ললিতা। বাড়িটা নির্জনই। লোকজন বিশেষ নেই। বাইরের মহলে। সেখানে একা সীতানাথই থাকে বিনিদ্র প্রহরীর মতো। সিন্দুকে এখানে ওখানে টাকা, সোনাদানাও কম নেই। সব তো ব্যাঙ্কে রাখা যায় না। এই ভাবেই রেখেছে।

ভিতর বাড়িতেও বৌমা, সীতানাথের মেয়ে অঞ্জলি আর শ্যামনাথ। ললিতা সেখানেই কাজকর্ম দেখে। বাইরের বাড়িতে সীতানাথের জন্য চা-জলখাবার আনে।

সীতানাথ হঠাৎ সেদিন ললিতাকে দেখতে চাইল। ললিতাও জানে, চেনে সীতানাথ বাবুকে। ওর সম্বন্ধে কিছু কথাও শুনেছে। লোকটা টাকার কুমীর। আর ওর স্বভাব-চরিত্রের কথা তো শুনেছে নিজে ও বৌ-গিন্নির কাছ থেকে। ললিতার দেহে যৌবনের সাড়াটা সোচ্চার হয়েই ফুটে ওঠে। দেখতেও সুন্দরই। যৌবন তাকে আরও মোহময়ী করে তুলেছে।

উন্নত বুক সুগঠিত মসৃণ হাত, কাঁধ থেকে ছন্দ নিয়ে যেন বের হয়েছে। ব্লাউজের নিচে মসৃণ পেটের হলুদ আভা বিগত যৌবন সীতানাথের নারীখাদক রক্তে যেন নতুন জোয়ার আনে।

জীবনে কিছু পায়নি সীতানাথ। ভালোবাসা-শ্রদ্ধা-সেবা— কিছুই নয়। পেয়েছে শুধু টাকা আর নীরব ঘৃণা। তাই তার মন যেন আরও অনেক কিছুই পেতে চায়।

ললিতাও দেখেছে সীতানাথের চোখে সেই মত্ততার একাংশ। সেও অনেক ঘাটের জল খাওয়া জীব। তাই শিকারী বিড়ালের গোঁফ দেখলেই চিনতে পারে। ব্যস ললিতা চোখে কি লহর তুলে বলে,

—হ্যাঁ করে কি দেখছ গো? কত্তাবাবু?

সীতানাথ বলে, কত্তাফত্তা বলিস কেনরে? শুধু বাবু বলেই ডাকবি। শোন। ললিতা এদিক-ওদিক চেয়ে বলে,

—কি? যা বলার তাড়াতাড়ি বলো বাবু। কেউ এসে পড়বে।

সীতানাথের মনে ঝড় ওঠে। শীর্ণ পাকানো হাত দিয়ে ললিতার নরম পুরুষ্ট দেহটাকে ধরে কাছে নেওয়ার চেষ্টা করে।

ললিতা হাসে। বলে, এখনও রস আছে দেখছি!

সীতানাথ বলে,

—তোকে দেখে খুব ভালো লাগছে রে!

সীতানাথ ফতুয়ার পকেট থেকে দমকা একটা পঞ্চাশ টাকার নোট দিয়ে বলে,

—এটা রাখ! মাঝে মাঝে দুপুরে ও সন্ধ্যায় একটু আসবি।

ললিতা নোটখানাকে খুঁটে বেঁধে বলে,

—আসতে তো চাই গো। তবে বৌদির যা নজর। সীতানাথ বলে ওদের কথা ছাড় তো। সেবা যত্ন করার জন্যই তো আছিস। কি?

ললিতা ঘাড় নেড়ে বলে, এখন আসি বাবু?

সীতানাথ ওর গতিপথের দিকে চেয়ে থাকে। আজ সীতানাথ যেন নতুন করে বাঁচার পথ পেয়েছে। তাই খুশিতে আজ সন্ধ্যায় জোরে জোরে নামকীর্তন করতে থাকে।

রামনাথ দিনভর ব্যবসাপত্র আর টাকা রোজগারের ধান্ধা নিয়েই থাকে। বাড়িতে ফেরে রাতদুপুরে মাতাল হয়ে, কোনো কোনো রাতে ফেরেই না। বড় বৌ শীলা দেখেছে এই অবজ্ঞা আর অবহেলাকে। নিজেকে সে অপমানিতই মনে করে। মেয়েদের একটা মানুষের প্রয়োজন যে তাকে ভালোবাসবে আপন করে নেবে। স্বামীকে সে কাছে পায়নি। তাই শীলার বিক্ষুব্ধ মন নীরবে প্রস্তুতি নেয় একটা চরম আঘাত হানার জন্য।

সীতানাথ ছোট মেয়ের অনেক আবদার পূর্ণ করে। তাকে না বলতে পারে না। ছোট মেয়ে এখন কলেজে পড়ে। নিজেই যাতায়াত করে। কখনও গাড়িতে, কখনও বাসে। অঞ্জলির পরিচয় হয় অনিমেষের সাথে।

সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে। অঞ্জলি তার দাদাকে দেখেছে। রামনাথের মাতাল মূর্তিটা দেখে সেও ভয় পায়। অনিমেষ কিন্তু তার থেকে স্বতন্ত্র।

সামান্য ব্যবসা ওর বাবার। অঞ্জলি তাদের বাড়িতেও গেছে। দেখেছে সুখী একটি পরিবারকে। এখানে যেন শান্তি বিরাজমান। নিজের মাকে মনে পড়ে না। অনিমেষের মাকে দেখে নিজের মায়ের কথা মনে পড়ে। মা বলেন, আবার এসো মা।

অঞ্জলির এই বাড়ির ওপরই মায়া পড়ে। অনিমেষকে সে বলে,

তোমাদের বাড়ি, বাড়ির মানুষগুলো খুব ভালো।

অনিমেষ বলে, এত ভালো লাগা ভালো নয় কিন্তু।

—কেন?

অনিমেষ বলে, পরে বুঝবে!

তবু অঞ্জলি অনিমেষের কথা মন থেকে মুছে ফেলতে পারে না। বাড়িতে গানের মাস্টার শেখর বাবু এসে বসে আছেন। অবশ্য শেখরকে একলা বসে থাকতে হয় না। বরং শেখর অঞ্জলিকে না দেখে খুশিই হয়। এ বাড়িতে বড় বৌ শীলাই কিছুদিন ধরে ওর দিকে একটু বিশেষ নজর দিচ্ছে। শেখর এলে শীলাও আসে বেশ সাজগোজ করে। ওর জন্য নিজেই জলখাবার আনে। শেখরও তাই এখন অঞ্জলি কলেজে যখন থাকে সেই নির্জন দুপুরেই আসে।

শীলা বলে, অঞ্জলি না থাকলে কি আসতে নেই?

শেখরও দেখছে শীলা বৌদিকে। চোখেমুখে ওর কি উল্লসিত ছাপ।

দুপুরে বাড়িটা নির্জন। কাজের লোক দু'একজন মায়ের ঘরে ঘুমুচ্ছে। দু'একটা কবুতরের মৃদু ডাক শোনা যাচ্ছে।

বাইরের মহলেও নির্জনতা মিশেছে। সীতানাথ এখন ললিতার কোলে মাথা রেখে বুড়ো খোকার মতো আদর করে চলেছে আর ওদিকে অন্দরে শীলা-শেখরের প্রেমপর্ব জমে উঠেছে। শেখর জানে শীলার মনের জ্বালার কথাটা। শেখরও সেই সুযোগ নিতে চায়। সেও দেখেছে এই বড় বাড়ির মানুষগুলোকে। ওই বুড়ো অর্থপিশাচ এখনও মনের নগ্ন লোভে ললিতাকে ছাড়তে পারেনি। এই বাড়িটাকে তার মনের কোণের অন্ধকার ছায়ায় পরিবেশটাকে কালো করে তুলেছে।

এ বাড়ির বড় ছেলে রামনাথের স্বভাবের কথাও সে জানে। এরা টাকা আর ভোগ এই দুটিকেই জীবনের সবচেয়ে দামী বলে জেনেছে। তাই ঘরে স্ত্রীকেও তারা অপমানিত করেছে।

আজ শীলা সেই আক্রোশের জ্বালাতেই শেখরকেই অবলম্বন করে রাখতে চায়। সব নীতি-বিবেককেও সে তাই তুচ্ছ করে শেখরকেই প্রেম নিবেদন করে। শেখরও এমন প্রাপ্তিযোগ হারাতে চায় না। অঞ্জলি দেখেছে সবকিছুই। এই বাড়ির কোণে কোণে যেন একটা পাপের কালো ছায়া বাসা বেঁধেছে। দেখেছে তার বাবার এই জঘন্য কীর্তি। ললিতাই এখন সংসারের কর্ত্রী হয়েছে সীতানাথকে হাত করে।

আর শীলাও এ বাড়ির সব মানসম্মানকে বিকিয়ে দিয়েছে শেখরের কাছে। সেদিন রামনাথ এ খবর জানতে পেরে স্ত্রীকে শাসন করে,

—এত বড় সাহস তোমার?

শীলাও এবার রুখে ওঠে। এতোদিনের পুঞ্জীভূত জ্বালা তার মনে ঝড় তোলে, ঝলসে ওঠে।

—এই নরকের বাড়িতে সবগুলোই নরকের কীট। এ বাড়ির কোণে কোণে শুধু নোংরা আর আবর্জনা। তোমার বাবা মুখে হরিনাম করেন লোককে ঠকান। মেয়েদের নিয়ে এখনও ফুর্তি করেন। জঘন্য একটা মানুষ। তারই ছেলে তুমি। তোমার স্বভাব চরিত্রের কথা সবাই জানে। তুমি আর অন্যের স্বভাব চরিত্র নিয়ে কথা বলো না। দেবো হাটে হাঁড়ি ভেঙে। সীতানাথও শোনে কথাগুলো। শীলা জানায়, তার পতিদেবতাকে- যে পাপের বীজ এ বাড়িতে পুঁতেছ তাতে এই পাপের ফলই ফলবে। এ বাড়িতে কেউ কোনোদিন শান্তি পাবে না।

অঞ্জলিও তার ঘর থেকে কথাগুলো শুনেছে। দেখছে এই বড় বাড়ির মানুষদের শোচনীয় স্বার্থপরতা আর লালসার কথা। তারও মনে হয় এখানে থাকলে তার দম বন্ধ হয়ে যাবে। তাই অঞ্জলিও তার পথ স্থির করে নিয়েছে। এই পাপপুরীর উপর তার আর কোনো মোহই নেই। সামান্য নিয়ে সে তবু সুখী হতে চায়। শান্তিতে থাকতে চায়।

তাই সে অনিমেষকে বলে,

—তোমার বাড়িতে নিয়ে চলো অনিমেষ। এই পাপপুরীর সব পাপের ঐশ্বর্য ফেলে আমি তোমার ওখানে সামান্য নিয়েই শান্তিতে বাঁচতে চাই।

অনিমেষও স্বপ্ন দেখে। সত্যিই যাবে অঞ্জলি?

পরদিন থেকেই অঞ্জলিকেও আর পায় না এ বাড়িতে সীতানাথ। একটা চিঠি লিখে রেখে অঞ্জলি চলে গেছে এই বাড়ি থেকে। সে এদিকের সব দায় থেকে মুক্তি দিয়ে গেছে।

ভোর হয়। সীতানাথ অবশ্য কিছুটা নিশ্চিন্তই হয়। অঞ্জলি তার অনেকগুলো টাকা বাঁচিয়ে দিয়ে গেছে। তাই ভোরের অন্ধকার থাকতে আজ সে নামগান করছে।

করপোরেশনের ঠেলা গাড়িটা এসেছে ঘর থেকে ময়লা আবর্জনা নিয়ে যেতে। সীতানাথই ময়লার বালতিটা গাড়িতে তুলে দেয়।

হঠাৎ মনে হয় তার ঘরের আবর্জনায় নয়, তাদের মনের কোণে কোণে জমে থাকা সব আবর্জনা যদি এমনি করে ওই ময়লা ফেলা গাড়িতে তুলে দিতে পারত তাহলে তাদের অন্তর ও মনও মালিন্য মুক্ত হতো। কিন্তু সেই কাজটা কি করে করা যাবে তা জানা নেই। মুখে হরিনাম করে আর অন্তরে ওই গ্লানি, ময়লার পাহাড় জমেই চলেছে। তাকে মুক্ত করার পথ সীতানাথের জানা নেই। আজ মনে হয় সেই পথটা জানা থাকলে সে খুশিই হতো। করপোরেশনের ঠেলা গাড়িটা ভোরের রাস্তায় কর্কশ যান্ত্রিক একটা শব্দ তুলে চলেছে— সব ময়লা ওটা বইতে পারে না। শুধু বাইরের আবর্জনাই নিয়ে যায় — মনের ময়লা জমতেই থাকে। মানুষ হয়তো সেটাকে সাফ করতে জানে না, নয়তো চায় না।

পণ্য

যতীন সেই ভোর থেকে মাঠে লাঙল দিচ্ছে। পাহাড়ী অঞ্চলের মাটিতে লাঙলের ফলা সহজে বসতে চায় না। যতীন দশাসই চেহারার যুবক। বুকের ছাতিটা বনের প্রাচীন শালগাছের মতো বিশাল, আর দেহটাও বিশাল। পেশিগুলো টান টান করে শক্ত হাতের চাপে মাটির বুকে লাঙলের ফলাটা টিপে ধরে হাল চালায়। তার শক্ত হাতের চাপে মাটি উলটে-পালটে যায়। ভুরভুরে সোদা গন্ধ ওঠে। কুমারী মৃত্তিকার আদিম আরণ্যক একটা সুবাস।

ওদিকে শুশুনিয়া পাহাড়। বিশাল পাহাড়ের পাঁচটা শিখরদেশ যেন সাপের পাঁচটা ফণার মতো আকাশে উঠেছে। ওর বুকে ঘন শাল, সেগুনের জঙ্গল। আটাড়ি লতাগুলো ওই অরণ্যভূমিকে যেন দুর্ভেদ্য করে তুলেছে। নীচের দিকে বনবিভাগ থেকে এখন সেগুন গাছের জঙ্গল করেছে। সেই বনও বেশ গভীর, ছায়ান্ধকার মতো।

পাহাড়ের চারিপাশ ঘিরে অরণ্যভূমি। ভোরের বাতাসে পাখিদের কলরব ওঠে। বাতাসে মেশে ফুলের সুবাস। নানা ফুল। বলন্তের শেষে পলাশের গাছে গাছে এসেছে প্রদীপের আভা। সবুজ অরণ্যভূমিতে সিন্দুরের ছিটে ছড়ানো।

এই রুক্ষ অনুর্বর মাটিতে তবু চাষ কিছু হয়। পাহাড়ের আশপাশে উপরে কোথাও কোনও জলাশয় নেই। পাহাড় সীমার দিকে নেমে গেছে। ওরই নীচের দিকে দু'দশটার ধান ছড়ানো আছে। তার নীচের দিয়ে চলে গেছে গন্ধেশ্বরী নদীর বালুরেখা। নামেই নদী, বাস্তবে একটা বালুর প্রবাহ। এই রুক্ষ প্রান্তরে তিরতির করে বালুর বুক চিরে একটু জলের রেখা বয়ে গেছে। তৃষিত মানুষ গরু-বাছুর রোদ্রের তাপে তেতেপুড়ে ওই জলই পান করে।

এখন জলের সঞ্চয় কোথায় আছে জানা নেই। কিনকু বালুকিয়া পাহাড়ের এক দিকে নীচের পাথুরে স্তর ভেদ করে একটা জলের ধারা সব সময়ই বের হয়। ওই জলের রংটা ঈষৎ ঘোলাটে। যেন চুনগোলা। মোটা ধারায় সেই জল বের হয়ে আসছে অনাদি অনন্তকাল থেকে। বালুকিয়ার বুকের ভিতর থেকে। স্থানীয় লোক বলে মা বসুমতীর ক্ষীরধারা।

মিষ্টিজল আর সেই জলই নিয়ে যায় সারা এলাকার আট দশ খানা গ্রামের মেয়েরা কলসি ভরে। এ জলে পাথরও হজম হয়ে যায়। এই অঞ্চলের মানুষের পানীয় জলের জন্য অবশ্য সরকারি ইঁদারা রয়েছে। কিন্তু গ্রামের মানুষ ওই জলই পান করে।

দিনরাত বছরের পর বছর যুগ যুগ ধরে এই জলপ্রবাহ চলেছে অফুরান ভাবেই। তাই ওই জল স্থানীয় লোকদের ব্যবহারের পরও প্রচুর উদ্বৃত্ত থাকে। সেই উদ্বৃত্ত জল গিয়ে পড়ে নীচের একটা বিস্তীর্ণ এলাকায়। গ্রামের লোক ওর একদিকে উঁচু বাঁধ দিয়ে সেই জলধারাটাকে আটকে রেখে আর সেই বিস্তীর্ণ এলাকাকে একটা জলাধারে পরিণত করেছে। এই জলেই তারা বেশ কিছু কাঁকুরে জমিকে সরস, সুজলা, সুফলা করে চাষ বাস করে। বলে,

—মা বসুমতীর দান গো। মা জল দেয়, তেষ্টায়-খিদেতে প্যাটে অন্ন দেয়।

তাই এই পাহাড়—ওই ক্ষীরধারা তাদের কাছে পবিত্র। জায়গাটা সবুজস্নিগ্ধ। বড় বড় কয়েকটা বট-শাল-নাজাড় গাছ যেন প্রহরীর মতো ওই ক্ষীরধারাকে পাহারা দিয়ে রেখেছে। জলধারা পাথরে পাথরে ঘা খেয়ে ছন্দ তুলে নীচের দিকে বয়ে চলেছে। মানুষ-গরু-ছাগলের পাল দুপুরে চড়া রোদে ওই জল পান করে। ছায়ায় বিশ্রাম করে। যেন শুশুনিয়ার মমতার স্পর্শ ওখানে মাখানো।

বিকালে আসে আটদশখানা গ্রামের মেয়েরা। সার সার জল ভরে কলসি নামিয়ে ওরা বনের ছায়ায় দুর্দান্ত মুক্তির আস্বাদ পায়, সুখ-দুঃখের কথা বলে। একদল আসে—অন্যদল ফিরে যায় জল নিয়ে।

সন্ধ্যা নামে, তখন জনহীন হয়ে যায় পাহাড়ের বনে ওঠে—শন শন হাওয়ার শব্দ। ভেসে ওঠে ওই ঝর্ণার কলধ্বনি। দলবেঁধে আসে বন হরিণ-বনশুয়োরের দল। এজলে তাদেরও তৃষ্ণা মেটে। এখন তাদেরই রাজ্য। তারা জ্বলে শুশুনিয়ার উর্ধ্বাকাশে।

এই ক্ষীরধারা এদের জীবনের সঙ্গে জড়িত হয়ে গেছে বংশ পরম্পরায়। যতীন কেন অন্য অনেকেই বেলা হলে প্রখর রোদের তাপ থেকে বাঁচার জন্য আসে ঝর্ণারতলায়। তৃষ্ণা মেটায়—ছায়ার স্পর্শ মেলে।

সেবার শহরের ভগবান দাস শেঠ এসেছিল। সে সেবার দুর্ভিক্ষের বাজারে চালের গোপন স্টক করে আর রিলিফের চালও প্রচুর বাইরে চড়াদামে বিক্রি করে কয়েক লাখ টাকা কামায়। অনেকেই বলে শালা শকুনি!

এসব অবশ্য ভগবান দাস গায়ে মাখে না। ওই শুশুনিয়ায় এসে ওই ঝর্ণার জল দেখে ভালো লাগে তার। বলে, এ-দেবতার মহিমা। বাবা মহাদেওজীর কৃপা! ইহা এক মন্দির বানায়েগা। ই জায়গাটাকে হামি বহু মজবুত করে করিয়ে দেবে।

ভগবান দাসের মহাদেব ভক্তির কথাও সারা এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। জায়গাটা আসলে বনবিভাগের। অবশ্য জায়গার মালিকানা নিয়ে কয়েক শতাব্দী ধরে কোনও প্রশ্নই ওঠেনি। বন পর্বত ও ছিল। সারা এলাকার মানুষের এখানে আসার কোনও বাধাও ছিল না। জল সকলের জন্য, তাই তারা জলও নিয়েছে ঝর্ণা থেকে।

এবার ওই বাঁধানো — মন্দির গড়ার ব্যাপারে গ্রামের মানুষই নানা প্রশ্ন তোলে। ভগবান দাসের নাম তারা জানে। শহরের ধনী লোক। শহরে ধানকল—বিশাল পাইকারী মুদিখানার আড়ত। সারা জেলার ছোট খাটো গ্রামের দোকানদারদের মহাজন ওই ভগবান দাস। অনেকে বলে,

—শালা সুঁচ হয়ে ঢুকে ফাল হয়ে বেরবে নাকি গো? গাঁয়ের মাতব্বর ধরণীবাবু বলে, মন্দির — করবে, বাবা মহাদেবের মন্দির। জলের তোড়ে পাথর সেছে। যদি জায়গাটা বাঁধিয়ে দেয়, আর মাটি গোলা জল বের হবে না। পরিষ্কারই জলই বের হবে। এলাকার মানুষের উপকারই হবে।

পটলা ইদানীং ওই পাহাড়ের নীচে একটা বড় কদম গাছের নীচে ঝুপড়িতে চা-মুড়ি-চপের দোকান করেছে। শহর থেকে এখন বেশ কিছু লোক বেড়াতে আসে। পিকনিক পার্টিও আসে অনেক শীতকালে। তাছাড়া কলকাতা থেকে পাহাড় চড়ার তালিম নিতেও ছেলেরা দলবেঁধে আসে। বনের ধারে তাঁবু ফেলে পাঁচ সাতদিন থাকে। পটলার বিক্রিবাটাও হয়। জায়গায়টায় মন্দির হলে পুজোর জিনিসও বিক্রি হবে, চা মুড়ি চপও। পটলা বলে,

—মন্দির জায়গাটা বাঁধানো হলেই ভালোই হবেক গো। ইখানে বাইরের বাবুরাও আসবে—দিদিমণিরাও।

এইসব কথা ভেবে গ্রামের লোকেরাও অমত করে না। ফলে দেখতে দেখতে ভগবান দাসের ওই দুই নম্বরি টাকায় ওখানে পাহাড়ের কোলে কয়েকটা বুনো বেলগাছের নীচে বাবার মন্দির গড়ে উঠল। সেখানে ঘটা করে ভগবান দাস বাবার মূর্তি তৈরি করল। পাথরের মূর্তি-শিবের মাথা থেকে গঙ্গা বের হয়েছে। আর ওই ঝর্ণার নীচে বেশ খানিকটা জায়গা পাঁচিল দিয়ে ঘেরা পাকা মেজে দেওয়া হল। আর পাহাড়ের ফাটক থেকে জল বের হয় না। সেখানে একটা মোটা পাইপই বসানো হয়েছে পাহাড়ের গভীরে। ওই পাইপ দিয়ে জলধারা মোটা ধারায় অবিরত বের হয়ে নীচের বাঁধানো চাতালে পড়েছে। লোকজন সেই বাধা থেকে কলসিতে জল নেয়। আর বাড়তি জল ওই চাতাল থেকে বের হয়ে একটা বাঁধানো বড় নালা দিয়ে দিঘিতে পড়ছে। অফুরান প্রবাহ, তাই দিঘির জলও বিশেষ কমে না। সেই জলে নীচের বিস্তীর্ণ জমিতে ধান- আনাজপত্র চাষ হয় বারোমাস। জায়গাটা সবুজ হয়ে থাকে। গ্রামের বহু মানুষের অন্ন সংস্থান হয় ওই থেকেই। ওই ক্ষীরধারা তাদের বাঁচিয়ে রেখেছে।

যতীন-মদন-নিশিকান্তরা চাষ বাস করে ওইসব জমিতে। দিন যায়, মানুষ এখন শহর থেকে প্রায়ই বেড়াতে আসে এই অঞ্চলে। পাহাড়-বন-জলধারা ওই সবুজ পরিবেশও তাদের মন কাড়ে। তারা ওই জলও নিয়ে যায় ড্রামে ভরে, ওই জলে নাকি হজম হয় ভালো। পেটের সব অসুখও সেরে যায়।

প্রমথ ঘোষ এদিকেরই একটা গ্রামের বাসিন্দা। এখন দিন বদলেছে। জমিদার শ্রেণী চলে গেছে—কিন্তু সমাজের বুকে এসেছে এক নতুন শ্রেণী। তারা জমিদারদের থেকে এককাঠি উপরে। এরা শুধু ভোটের জোরেই আর গায়ের জোরে রাজ্যপাট পেয়েছে। প্রমথও তেমনিভাবেই এই এলাকার অঞ্চল প্রধান হয়ে বসেছে।

পঞ্চায়েতে নানা কাজের জন্য লাখ টাকা আসে। খাতায়-কলমে ওসব কাজের হিসাব ঠিক রেখে বাকিটা নিজের পকেটে পোরে। অবশ্য বাইরে তার অন্যরূপ। এখন এই শুশুনিয়া পাহাড়ে ভ্রমণকারীর দল আসছে অনেক। পাহাড়ে চড়ার দলও আসে।

প্রমথবাবুর শহরে যোগাযোগ আছে। ওই ভগবান দাসের পুত্র ওই নারায়ণ দাস শেঠিয়াই এখন এই অঞ্চলের দরদী দেশসেবক। ভগবানদাস অবশ্য তার ব্যবসাপত্র আরও বাড়িয়েছে। নারায়ণ দাস এখন এম এল এ হয়ে বাবার ব্যবসাকে আরও ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে দিয়েছে। এবার এলাকার মানুষদের মধ্যে বেকারি দূর করার জন্য নতুন শিল্প কারখানা, গ্রাম-গ্রামান্তরে তোলার কথা ভাবছে।

প্রমথ ঘোষও এখন নারায়ণ দাসের সহযোগী — সে এখন পঞ্চায়েত থেকেই ওই শুশুনিয়া পাহাড়ের নীচে একটা গেস্টহাউসও গড়েছে। অবশ্য লোকে বলে,

টাকা পঞ্চায়েতের, তবে গেস্টহাউস থেকে আমদানি তেমন হয় না। কিন্তু সবসময় বুকিংও থাকে। সেগুলি নাকি খাতায় ওঠে না, যায় প্রমথবাবুর পকেটে। গেস্টহাউসের ব্যয়ভার বহন করে পঞ্চায়েত—আর মধু খায় অন্যরা। নারায়ণ দাসও মাঝে মাঝে এখানে আসে। প্রমথই তার খাতিরদারি করে।

শিবমন্দির এখন জাগ্রত হয়ে উঠেছে। ভক্তরা আসে দূর-দূরান্ত থেকে। মন্দিরের লাগোয়া পূজারীর ঘরও হয়েছে। শ্রাবণ মাসে তো মেলাই বসায় ভগবান দাস। তখন এই শুশুনিয়ার পবিত্র জল বাঁকে করে বয়ে নিয়ে যায় হাজার ভক্ত, আর সেই জল ঢালে বিশ কিলোমিটার দূরে অন্য এক প্রাচীন শিবের মাথায়। ভগবান দাস তখন পথে চটিও করে দেয়, ওই যাত্রীদের জন্য, খাবারও দেয়। ফলে শুশুনিয়ার খবর এখন কলকাতার সমাজেও পৌঁছে গেছে। এখন টিভি কাগজের লোকজনও আসে। এসব খবর ফলাও করে ছাপা হয়।

আর কলকাতা — অন্য সব জায়গা থেকে আসা যাত্রীরা ক্যান ক্যান ভর্তি করে ওই হজমি আসল মিনারেল ওয়াটার বয়ে নিয়ে যায়। শহরের দু'একটা দোকানও এই জল বোতলে ভর্তি করে রাখে। চড়া দামে বিক্রিও করে অনেক বাইরের লোককে। শুশুনিয়ার জল এখন শুশুনিয়া মিনারেল ওয়াটার নামেই বিখ্যাত হয়ে উঠেছে।

প্রমথবাবু অবশ্য পঞ্চায়েত মিটিং-এ এসব গৌরবের কথা প্রচার করে। এ যেন তারই বাহাদুরি এমনি ভাব দেখায়।

বিভিন্ন গ্রামের মেয়েরা জল নিতে আসত বিকালে কলসি বালতি নিয়ে। তখন এটা মেয়েদের ভিড়ে ভরে যেত। এখন এসে হাজির হয় বাইরের যাত্রীরা। দু-একটা দোকানও হয়েছে। সেখানে বসে চা খায়—জল নিতে যায় যখন তখন। মেয়েদের দিকে দু'একটা ইঙ্গিতও করে। প্রথম প্রথম মেয়েরা চুপ করে থাকত। সেদিন কে একজন একটা মেয়ের হাত ধরতে যায়। তাই নিয়ে কথা কাটাকাটি হয়। তারপরই যতীনরা ছিল মাঠে। তারা এসে ওদের দলের দু-চারজনকে প্রহারই করে।

এই নিয়ে গোলমাল, যাত্রীরাও বাধা দেয়, শেষ অবধি প্রমথবাবুই থামায়। বলে গ্রামবাসীদের,

—বাইরের টুরিস্ট ওরা।

যতীন বলে,তাই বলে মেয়েদের গায়ে হাত দেবে। ফের এসব করলে হাতই কেটে নেব। দরকার নাই অমন ট্যুরিস্টদের।

প্রমথবাবু— ভগবান দাসের ওই ট্যুরিস্টদের দরকার। দরকার প্রচারের। এরজন্য ট্যুরিজম বিভাগ

থেকে প্রমথকে মোটা টাকাই দেবে, ওই দিঘীর ধারে রিসর্ট—বোটিং এসব করার জন্য।

তাই প্রমথ, নারায়ণ দাস ওখানে এবার পুলিশ পোস্টিং- এর ব্যবস্থা করে। মেয়েদেরও এবার জল নেবার সময় নির্ধারিত করা হয়।

যতীনের বিক্ষোভ শুরু হয়। মেয়েরাও এতদিন সংসারের কাজের ফাঁকে নিজেদের ইচ্ছামতো জল নিতে যেত সময় করে। এখন সন্ধ্যা না হলে আর জল পাবে না। পরে বাইরের লোকদের ভিড় জমে যায়। তখন কলসি নিয়ে মেয়েরা যায় না। বাইরের লোকজন ওই চাতালে জলকেলি শুরু করে। এই নিয়েই অশান্তি শুরু হয়।

এবার প্রমথবাবু — নারায়ণ দাস শেঠও অন্য চিন্তা করছে। ইদানীং মানুষজনের হাতে অনেক নগদ পয়সাও আসছে। তারা আর কুয়োর জল-কলের জলকে বিশ্বাস করে না। তাই বোতলে বিশুদ্ধ পানীয় জল বের করেছে বহু কোম্পানি। সেই জলের দাম প্রায় দুধের দামেরই সমান। এক রোতল জলের দাম চোদ্দ টাকা। সেই খাচ্ছে এখন অনেকে। তাদের শহরেও আসছে সেই জল কলকাতার আশপাশ থেকে বোতল বন্দি হয়ে বিক্রিও হচ্ছে। কলকাতায় ট্রেনে—বাসে সর্বত্র এখন এই জল খাওয়াই সামাজিক মর্যাদার পরিচয়।

শেঠ ভগবান দাসের নজর খুবই তীক্ষ্ণ। হিসাবী ব্যক্তি সে। এর মধ্যে খবর নিয়েছে সারা শহরে বোতলের জল বিক্রি হয় দিনে কয়েক ট্রাক। বোতলের দাম তেরো টাকা। আর কলকাতায় এক জল কোম্পানির সাথে কথা হয়েছে। তারা দিনে চার ট্রাক করে জলের বোতল নেবে। বোতলের দাম দেবে ছয় টাকা করে।

প্রমথ — নারায়ণও এসেছে শেঠজীর তলব পেয়ে। ভগবান দাসই এবার বুদ্ধিটা দেয়। সে জেনেছে এখন ওই পাহাড়ের ঝর্ণার জলের সুখ্যাতি ছড়িয়েছে চারিদিকে। কলকাতার মানুষও জানে এই জলের মাহাত্ম্য। আর প্রকৃতির এই অফুরান সম্পদের অপেক্ষাই করেছে মানুষ এতদিন ধরে। এবার ভগবান শেঠ তার সদ্ব্যবহারই করতে চায়। প্রমথ বলে,

—কোনও গোলমাল হবে না তো? এখন ওদিকের মানুষও ক্ষেপে উঠেছে।

ভগবান দাস বলে,আরে তুমি সালটে নেবে। তার জন্য তুমিও মাসে মাসে পাবে পয়সা। আর ইটাকে এখন একটা শিল্প গড়াব বলে চালাও। বেকার ছেলেদের কাজ হবে।

প্রমথ জানে এখন এটা একটা প্রধান অস্ত্র। এই বেকার সমস্যা সমাধানের নাম করে অনেকের চোখেই ধুলো দিতে পারবে।

তাই এবার পাহাড়ের কাছে হাটতলায় সেদিন বিশাল জনসভাও হয়ে গেল। নারায়ণ দাস নেতা-প্রমুখ আরও অনেকেই মালা পরে মঞ্চে ভাষণ দেয়। ঘোষণা করে,

—এবার এলাকার বেকার ছেলেদেরও কাজের ব্যবস্থা হবে। আমরা এখানে একটা প্রতিষ্ঠান গড়ে প্রাকৃতিক এই জলের অপচয় বন্ধ করে, একে বোতলজাত করে কলকাতার বাজারে পাঠাব। এই জল বিক্রির টাকায় এখানের মাটিতে গড়ে তুলব হাসপাতাল, স্কুল।

দলের লোকের অভাব নেই। তারা জয়ধ্বনি দেয়। হাততালির শব্দ ওঠে।

প্রমথ আজই ওই পাহাড়তলীর পাশের জমিতে জলতুলে বোতলবন্দি করার কারখানার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করার জন্য শহরের কোনও জনপ্রিয় নেতাকে ধরে এনেছে।

এবার বেশ কিছু বেকার ছেলেকেও ফিট করে প্রমথ। তার কয়েকদিন পরই ট্রাক ভর্তি ইট-সিমেন্ট এসে যায়। কারখানা তৈরি হবে। তাই এবার পাঁচিলও তৈরি হতে থাকে ওই জলধারার চারিদিকে। প্রমথত নারায়ণ দাসও জানে গোলমাল হতে পারে।

ওরা পাঁচিল দিয়ে ঝর্ণার জায়গাটাকে ঘিরে ফেলে, এবার যতীন—গ্রামের অন্যরাও এগিয়ে আসে। অনেকেই বলে— এই ঝর্ণার জলে আমাদেরও হক আছে। এই জল সকলে নেয়। তাদের জল নিতে দিতে হবে।

প্রমথ জানতো এসব প্রশ্ন উঠবেই। তাই প্রমথ বলে,

—জল সবাই নেবে। শুধু জায়গাটা পড়েছিল, এটা ঘিরে আরও সুন্দর করে সাজানো পার্ক হবে।

কিন্তু কিছুদিন পরই সেখানে একটা গেটও বসে গেল। এবারও গোলমাল শুরু হয়, প্রমথ বলে—গেট বসিয়েছি, তবে গেট তো দিনভোর খোলা থাকবে। শুধু রাতে বন্ধ থাকবে। জল সবাই পাবে। আর যাত্রীদের কাছে এক টাকা করে টিকিট নিতে হবে। সেই টাকাতেই গ্রামের উন্নতি হবে।

অবশ্য উন্নতির কাজ দেখাবার জন্য ওদিকে একটা বাড়িও তুলেছে। একটা বোর্ডও লাগানো হয়েছে "বিদ্যালয়"।

তারপর শুরু হয়ে যায় ঘটা করে জল বোতল বন্দি করার কাজ। ওই ঝর্ণা থেকে পাইপ গেছে সোজা ওই কারখানায়। সেখানে কনভেয়ার বেল্টে সারি সারি বোতল বসানো। আপনা থেকেই জল তাতে ভর্তি হচ্ছে আর মুখ বন্ধ হয়ে চলে যাচ্ছে সোজা ক্রেটে। ক্রেট ক্রেট বোতল এবার ট্রাকে উঠে চলে যাচ্ছে। গেটে গেটে এখন খাকি পোশাক পরা পাহারাদার।

ওই শুশুনিয়ার ক্ষীরধারা যা এতদিন বংশানুক্রমে এই এলাকার মানুষের তেষ্টা মিটিয়েছে সেই জলে তাদের আজ কোনও অধিকারই নেই। প্রমথ-নারায়ণ দাস শেঠের দল সেই তৃষ্ণার জল নিয়ে এখন বেসাতি শুরু করেছে। জল দূষিত হয়ে যাবে, তাই স্থানীয় মানুষদেরও সেখানে ঢোকার অনুমতি নেই।

তৃষ্ণার জলই নয়, আরও সর্বনাশই হয়েছে তাদের। যতীনের লাঙলের ফলা এখন শক্ত মাটিতে আর বসে না। বিস্তীর্ণ মাঠ, যা ওই বাড়তি জলের দিঘীতে জমা হতো, সেই মাটি ফেটে গেছে, দিঘীর বুকও শূন্য। মাটির স্নিগ্ধতা আর নেই।

সেই সরস মাটি আবার বন্ধ্যা পতিত জমিতে পরিণত হয়েছে। ক্লান্ত পরিশ্রান্ত যতীনের রোদের তাপে সর্বাঙ্গ জ্বলছে। বুকে তার তৃষ্ণা। ওই গন্ধেশ্বরীর বালুরেখার বুকে দু-হাত দিয়ে আঁচড়ে বালি তুলছে। নীচে যদি একটু খোলা জল খেলে। দুহাত দিয়ে বালিই খুঁড়ছে, ভিজে বালিমাত্র, জল অনেক অনেক নীচে।

সেই তৃষ্ণার জলের জন্য পাগলের মতো বালি খুঁড়ছে, যতীন আগুনজ্বালা রোদের তাপে। তাদের জন্য তৃষ্ণার জলও নেই।

ক্ষীরধারায় আজ তাদের কোনও অধিকারও নেই। জলের সন্ধানও নেই। ওসব এখন পণ্যে পরিণত হয়েছে।

রজনীকুঞ্জ

শ্যামবাজারের একটা রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে আছে পুরোনো বাড়িটা। বাড়ি না বলে ওটাকে প্রাসাদই বলা চলে। অন্তত চুনী দত্তের আমলে ওটা প্রাসাদই ছিল। সামনে বিঘে খানেক ফাঁকা জায়গা। তখন সেটা ছিল চুনীবাবুর বাড়ির সামনের বাগান। পাশে একটা পুকুর। তার চারিদিকে গাছগাছালি। এখন ওটা ডোবাতেই পরিণত হয়েছে। আর সেটাও শুকিয়ে থাকে। ঝোপঝাড় গজিয়ে উঠেছে।

চুনী দত্ত ছিল সাহেবি আমলে সাহেব কোম্পানির বেনিয়ান। তার পূর্বপুরুষ কোম্পানির আমলে ব্যবসা করে বেশ ভালোই রোজগার করেছিল। আর তখনকার দিনে কলকাতার এদিকটা ছিল গ্রাম্য পরিবেশ। সেইখানে বিঘে সাতেক জমির ওপর এই প্রাসাদ গড়ে তুলতে শুরু করে সেটাকে সাজিয়ে তোলে চুনী দত্ত। তার স্ত্রীর নাম ছিল রজনী। সম্রাট সাজাহান স্ত্রীর স্মৃতিতে তৈরি করেছিলেন তাজমহল। তেমনি চুনী দত্ত স্ত্রীর নামে প্রাসাদের নাম রেখেছিলেন রজনীকুঞ্জ। গ্যারেজের চলন ছিল না। তখন জুড়ি গাড়ির ব্যবহার ছিল। চুনী দত্তের ছিল দু-খানা ফিটন গাড়ি। তার জন্য ওদিকে ছিল ঘোড়ার আস্তাবল। পাইক কর্মচারীদের জন্য ছিল পুকুর-পাড়ে আউটহাউস। সব মিলিয়ে চুনী দত্ত একটা রাজকীয় পরিবেশ গড়ে তুলেছিল। ওদিকে ঠাকুরদালান, নাটমন্দির। দুর্গোৎসব হতো সব ঘটা করে। আর নাচমহলে মাঝে মাঝে বাঈজিদের নাচ হতো। টাকা উড়তো নাচগানের আসরে।

ঘুড়ি ওড়ানোর সময় ঘুরি সঙ্গে নোট বেঁধে দেওয়া হত। যাতে যে তাদের কাটা ঘুড়ি ধরবে সে যেন দত্তবাবুর নাম করে।

চুনীবাবুর আমলে তারা ছিল কেনারামের বংশ। তখন পর্যন্ত তাদের ছিল নানা ব্যবসা। আর চুনীবাবু মুর্শিদাবাদ-বর্ধমান-মেদিনীপুরের বহু অঞ্চলে বেশ কিছু ফাঁকা জায়গাও কিনেছিলেন। জমিদারির আয়ও কম হত না। চুনীবাবুর আমল পর্যন্ত ছিল তাদের উপার্জনের দিন। সমৃদ্ধির কাল। কেনারামের সময়।

তারপর এল ভোগরামের দিন। চুনীবাবু মারা যাবার পর তার সন্তানরা কেউ রোজগারের দিকে নজর দেয়নি। রজনীকুঞ্জের কেউ খেটে খাবে এটা তারা ভাবতেই পারত না। বসে বসে খেতো। বাঈজি বাড়িতে যেত। হাজার হাজার টাকা উড়িয়ে ফূর্তি করত। দু'পুরুষ ধরে এই ভোগবিলাসে সঞ্চিত অর্থ, বেশ কিছু মহল, কলকাতার নানা অঞ্চলে কয়েকটা বাড়ি বিক্রি করে এসব চলল।

তারপরই জমিদারিও চলে গেল। কলকাতার বাড়িও আর নেই। কলসির জল গড়াতে থাকলে আর কতক্ষণ থাকবে। একসময় তা শেষ হবেই। দত্তবাড়ির অবস্থাও হল তাই।

দিন বদলেছে। এখন খরচা বেড়েছে। রোজগারের পথও নেই। তাই এই বড় বাড়ির ছেলেরা এবার এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়ে। কিছু লোক আগেই কলকাতার বিভিন্ন এলাকায় চলে গেছে। ভেঙে গেছে কবে সেই একান্নবর্তী পরিবার। বহু শরিকানা। তাই এতবড় বাড়িতেও আর কুলোয় না। বড় বাড়ির ঘর অনেক। শরিক তার চেয়েও বেশি। ফলে ভাগে পড়েছে দু-একটা করে ঘর। রান্না খাওয়ার জায়গাও নেই। সমস্যা বাথরুম নিয়ে।

তাই যাদের সামর্থ আছে তারা চলে গেছে অন্যত্র। কেউ বা দিল্লি-বোম্বাই-এ চলে গেছে চাকরি নিয়ে। আর তাদের ভাগের ঘরে ভাড়াটে বসিয়ে গেছে দখলটাকে কায়েম রাখার জন্য। তারা নিজেদের মধ্যেই বাথরুম-রান্নার জায়গা নিয়ে ঝগড়া ঝাটি করে। বহুবিধ জীব বহু চরিত্রে বহু জাতের মানুষ এখন ঘর বেঁধেছে এই রজনীকুঞ্জে। চুনী দত্তের আত্মা যদি কোনওদিন আসে এ বাড়িতে তার স্থান খুঁজে পাবে না।

তিনমহলা সেদিনের সেই প্রাসাদ আজ যেন একটা বাজারে না হয় চিড়িয়াখানায় পরিণত হয়েছে। দিনরাত এখন ঘরে ঘরে না হয় ঘরের বাইরে অসন্তোষের রূপই দেখা যায়।

দোতলায় রয়েছে শ্যামলবাবু। কোনও এক ব্যাঙ্কে কাজ করে। এ বাড়ির বংশধরদের একমাত্র সেই-ই টিকে আছে এখানে। তার অন্য এক শরিক ভাই চাকরি নিয়ে চলে গেছে দিল্লি। সাউথ কলকাতায় ফ্ল্যাটও কিনেছে। তার অংশের দু-খানা ঘরে শ্যামলবাবু তারই অফিসের সহকর্মী নরেনবাবুকে এনেছে। অবশ্য শ্যামলবাবু বেশ চালু লোক। দিল্লির সেই ভাই শ্যামলের উপর ভাড়াটে বসাবার ভার দিয়েছিল। শ্যামল তার সহকর্মী নরেনববাবুকে এখানে ভাড়াটে এনেছে মাসে দু-হাজার ভাড়ায়। তবে তার ভাই রণজিতকে বলেছে হাজার টাকা। সেইমত শ্যামলবাবু ভাইকে হাজার টাকাই মানি অর্ডার পাঠায়। নিজে মারে হাজার টাকা।

তাতেও শ্যামলের অভাব যায়নি। কারণ ওর নেশা হঠাৎ বড়লোক হবার। তার পূর্বপুরুষ চুনী দত্ত দু-হাতে রোজগার করেছে। শ্যামলবাবুও দু-হাতে রোজগার করার জন্যই রেসের মাঠে যান প্রতি সপ্তাহে। ঘোড়ার পিছনে তার ভালো টাকাই যায়। তাই তার অভাব আর মেটে না। এই নিয়ে বাড়িতেও অশান্তি বাড়ে।

শ্যামলবাবুর ছেলে নৃপেন স্কুলে পড়ার সময় থেকে দেখছে তার বাবার নানা ছলে টাকা রোজগার করার চেষ্টাটা। ঘোড়ার পেছনেই সব যায়। বাড়িতেও তাই অশান্তি।

নৃপেনও এর মধ্যে পাড়ায় পরিচিত হয়ে উঠেছে। নৃপেন বার দুয়েক মাধ্যমিকে ফেল করেছে। তৃতীয়বার পরীক্ষা দেবে নাকি ভাবছে। পাড়ার মধ্যেও সে নামডাক করেছে। বড়বাড়ির বংশধর। দত্তবাড়ির রাজকুমার সে। এরমধ্যে তার দলবলও জুটেছে।

তার প্রথম মস্তানির হাতেখড়ি হয় এই বাড়িতেই। সারা বাড়িতে কম করে ত্রিশখানা ঘর আছে। তাদের কিল্লী- বিল্লীও কম নয়। আর তাদের বহুজনের বহুবিধ ভাষা।

নীচের তলায় থাকে কেশব সিং। পাঞ্জাবের লোক। এর আগে ট্রাক চালাত। তারপর এখানে ভাড়া আসে কোনও শরিকের অংশে। কিছুদিন পরই এবাড়ির অন্যতম বংশধর শ্যামলবাবুকে কিছু টাকা দিয়ে বাড়ির সামনের খালি জায়গাতে শুরু করে গাড়ি মেরামতের কাজ। নৃপেনও জেনেছে কেশব সিংকে চাপে রাখলে হপ্তাতে তার কিছু মিলবে। আর সেই মৌকাও মিলে যায়।

কেশব সিং-এর গ্যারেজ বেশ চালু হয়েছে। নৃপেনও বাজারের দুজন দোকানিকে এনে বসিয়েছে গ্যারেজের পাশে। তারাও মুদিখানার দোকান করেছে। আর কেশবের বৌ মতিয়াও ওর পাশে একটা চায়ের দোকান দিয়েছে। মতিয়াও বেশ চালু মেয়ে। নৃপেনকে সেও হাতে এনেছে। আর নৃপেনই তাকে বলে,

—শুধু চা-বিস্কুট কেন? এ পাড়ায় চোরাই মদের কারবার শুরু করো।

মতিয়াও এমন একটা মৌকা খুঁজছিল। তবে এসবের কাজে পুলিশের হ্যাপা। অনেক ঝামেলা সামলাতে হবে।

তাই মতিয়া বলে— ছোটা সাব্‌'ই সব কাজে পুলিশের মদত ভি লাগবে। নৃপেন এর মধ্যে পাড়ার নেতা মদনবাবুর খুব কাছের লোক হয়ে উঠেছে। গত নির্বাচনেই নৃপেনের দল মদনবাবুর হয়ে ভোটে খেটেছে। এ বাড়ির শ'দেড়েক সিওর ভোটকে ধমকে চমকে সে মদনবাবুর ভোটবাক্সে ফেলেছে। এছাড়া পাড়ার লোকজনদেরও ধমকে চমকে, বাড়িতে আটকে রেখে নিজেরাই সব ভোট দিয়েছে মদনবাবুকে। তাই মদনবাবুও জিতে যায়। তারপর থেকেই নৃপেনের খাতিরও বেড়ে যায় পাড়াতে। নৃপেন মতিয়ার কথায় বলে,

-ওর জন্য ভাবতে হবে না। মাসে মাসে কিছু টাকা পুলিশকে দিতে হবে। মতিয়া এখন চায়ের দোকানের পিছনে দেশি-বিদেশি মদ এমনকি চুল্লুর প্যাকেটও রাখে। তার এই ব্যবসাও বেশ জমে উঠেছে। নৃপেনের আমদানিও ভালোই হচ্ছে।

এবাড়ির ভাড়াটেদের মধ্যে নানারকম ঝুটঝামেলা লেগেই আছে। নৃপেন ওদের সব সমস্যা মিটিয়ে দেয়। দরকার হলে এসে শাসায়।

—তুলে দেব মশাই। চুপচাপ থাকবেন।

অন্য পক্ষের কাছ থেকে এর জন্য মোটা টাকাও আদায় করে।

শ্যামলবাবু তার সহকর্মী নরেনবাবুকে এনেছে তার পাশের ঘরগুলোতে। নরেনবাবুর স্ত্রী চৈতালী এখানে এসে ক্রমশ বুঝেছে যে সে ঠিক তার পছন্দমত জায়গায় আসেনি। তাদের মেয়ে বিজলী স্কুলে পড়ে।

নরেনবাবু এখানে এসেছিলেন এই ভেবে যে তার অফিসের কাজে শ্যামলবাবুর সাহায্য পাবে, সহযোগিতা পাবে। এলাকাটাও পুরনো আমলের। বনেদি বাড়ি। অফিস থেকে যাতায়াত করতেও সুবিধা আছে, আর ভাড়াটাও তুলনামূলকভাবে কমই। এই অঞ্চলে এখন ভাড়া নিতে গেলে মোটা টাকা সেলামি দিতে হবে। আর দু'ঘরের ফ্ল্যাটের ভাড়াও তিন হাজারের কম নয়। তাছাড়া তার মেয়ে বিজলীকে কাছেই নিবেদিতা স্কুলের মতো ভালো স্কুলে ভর্তি করেছে। তাই এদিকেই তাকে থাকতে হবে যে ভাবে হোক। তাই নরেনবাবু রয়ে গেছেন।

নরেনবাবু নিরীহ ধরনের ভদ্রলোক। সাতেপাঁচে থাকেন না। এ বাড়িতে অনেক ভাড়াটেই আছে। ওদিকেই থাকেন নীরদবাবু। বড়বাজারে লোহাপট্টিতে তিনি দালালি করেন। স্ত্রী কমলা এদিকের একটা শাড়ির দোকানের সেলস্ লেডি। আর তাদের মেয়ে সাবিত্রী মাধ্যমিক পাস করে এখন নাকি সিনেমা-টিভি সিরিয়ালে অভিনয় করার জন্য টালিগঞ্জে যাতায়াত করছে। মাঝারি দু-একটা সিনেমাতে নাকি অভিনয়ও করেছে। নৃপেন পাড়ার ফাংশনেও তাকে চান্স দিয়েছিল।

নৃপেন পাড়ার নেতা মদনদার জন্মদিনে পার্কে প্যান্ডেল করে পাড়ার লোকদের কাছে এ বাড়ির ভাড়াটেদের কাছে এমনকি বাজারের দোকানদারদের কাছেও মোটা টাকা ডোনেশন তুলে দু'একজন নামী শিল্পী গাইয়ের সঙ্গে পাড়ার ছেলেমেয়েদের মঞ্চে তুলে কড়া বাজানার সঙ্গে তাদের উদ্দাম নাচ গীত পরিবেশন করে।

সেই মঞ্চে সেবার সাবিত্রীও নেচেছিল শর্টপ্যান্ট আর শার্ট পরে। তার উদ্দাম নাচ নাকি দর্শকদের বুকে ঝড় তুলেছিল। সিটি বেজেছিল। কে আবার টাকাও ছোঁড়ে সাবিত্রীকে লক্ষ্য করে।

বিজলীও গেছিল সেই অনুষ্ঠানে। সে বাড়িতে রবীন্দ্রসঙ্গীত গায়। তার পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে গানটাও শিখেছে। সংস্কৃতিমনা মেয়ে সে। নৃপেন বলে,

—বিজলী, এরপর তোমার প্রোগ্রাম। সাবিত্রী তো যা অনুষ্ঠান করেছে এক্কেবারে ফাটাফাটি। তোমাকেও এর চেয়ে সরেস অনুষ্ঠান করতে হবে।

বিজলী দেখছে ওই অর্ধনগ্ন মেয়েটার উদ্দাম নাচ আর শুনছে তেমনি গান। সে এসব দেখে ঘাবড়ে গেছে। ভিড়ের মধ্যে কোনও মতে বের হয়ে চলে আসে বাড়িতে।

তাতে অবশ্য নৃপেনের কিছু যায় আসে না। সে তখন আর এক জগতে রয়েছে। সেই মেয়েও তখন স্টেজ কাঁপাচ্ছে — তবে নৃপেন অবশ্য ভেবে নেয় যে বিজলী তাকে এড়াবার জন্যই পালিয়েছে।

পরদিন সকালে নৃপেন তখন মতিয়ার দোকানে বসে চা খাচ্ছে। সঙ্গে রয়েছে তার দলবলও। এই মদনদার জন্মদিন করে ভালোই মাল কামিয়েছে নৃপেন। বিজলী স্কুলে যাচ্ছে। সামনে তার টেস্ট পরীক্ষা। নৃপেন এগিয়ে আসে।

—এই যে বিজলী, কাল চলে এলে অনুষ্ঠান না করে।

বিজলী চেনে নৃপেনকে। আসল কথাটা বলতে পারে না যে ওই ধরনের আসরে সে গান গাইবে না। তাই চুপ করে ভাবছে কী জবাব দেবে।

নৃপেন বলে,

—আমাকে ইনসাল্ট করলে?

—না-না। মানে এতবড় আসরে আমি তো গাইনি। তাই নার্ভাস হয়ে পড়েছিলাম। চলে এসেছি নৃপেনদা।

নৃপেন এবার বেশ গর্বভরেই বলে—নৃপেন দত্ত ছোটখাটো অনুষ্ঠান করেই না। দুর্গাপুজোর পর বিজয়ার ফাংশানে আর পালানো চলবে না। বুঝেছ?

মাথা নাড়ে বিজলী। কোনওমতে পালাতে পারলে বাঁচে। তাই চলে যায় স্কুলের দিকে।

নৃপেনের সহচর এক চ্যালা বলে,

—মেয়েটার খুব ডাঁট গুরু! আমাদের যেন চোখেই দেখে না।

নৃপেন বলে,দেখবে দেখবে। চল আজ মিত্রায় নতুন ছবি রিলিজ করেছে। হেভি! টিকিটের ডিমান্ডও তেমন। চল দ্যাখাবো বুকিং ক্লার্ককে বলে কিছু টিকিট তুলে নিই।

চ্যালারাও গুরুর এই ব্যবসার খবর জানে। তাই বলে এক চ্যালা,

—বুকিং ক্লার্ক যদি না দেয় টিকিট!

নৃপেন গর্জে ওঠে— ওর বাপ দেবে। চল তো—

ওরা ওদের অভিযানে বের হয়ে গেল দলবল নিয়ে।

এ বাড়ির নীচের তলার একদিকে থাকেন বসন্তবাবু। একটা স্কুলে শিক্ষকতা করেন তিনি। সংসারে তার স্ত্রী আর ছেলে আকাশ। আকাশ কলেজে পড়ে। পড়াশোনাতে বেশ ভালো সে। মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিকে স্টার নম্বর পেয়ে পাস করে এখন কলেজে ইংরাজি অনার্স নিয়ে পড়ছে। এই বাড়ির বিচিত্র জীবদের মধ্যে ওই পরিবারটি যেন স্বতন্ত্রই।

বসন্তবাবু অন্যান্য শিক্ষকদের মতো স্কুলে ফাঁকি দিয়ে কোচিং ক্লাস করেন না। তার স্ত্রীও এদিকের একটা মেয়েদের স্কুলের শিক্ষিকা। বসন্তবাবুর মা এখনও বেঁচে আছেন। এই বড় বাড়ির ওরা পিছন দিকটায় থাকে। তাই যেন এই বাড়ির সামনের দিকের উৎপাতগুলো ওখানে তত বেশি পৌছায় না। এদিকটায় গোলমালও কম। তাই আকাশের পড়াশোনার তেমন ব্যাঘাত হয় না। সে শান্তিতেই নৃপেনদের ওই হল্লাবাজি থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারে। বসন্তবাবু মানুষ গড়ার কারিগর। আজকালকার তরুণ-তরুণীদের দেখে তিনি হতাশই হন। এতবড় বাড়িটাতে রয়েছে বেশ কিছু পরিবার। তাদের ছেলেমেয়েও বড় হয়েছে। বসন্তবাবু দেখেছেন লেখাপড়ার থেকে তাদের এই বয়সে নজর যেন অন্যদিকেই বেশি। ওদের পরিবারের সমর্থন নেই কিন্তু ছেলেমেয়েদের চাওয়ার যেন শেষ নেই। দেখেছে তিনতলার ননীবাবুকে। চোখের সামনে ঘটনাটা এ বাড়িতে যেন বেশ ঝড়ই তুলেছিল।

ওর সংসারে স্ত্রী,ছেলে আর মেয়ে। ছেলে স্কুলের গণ্ডি পার হয়ে আর বেশি পড়াশোনা করেনি। ননীবাবু বেসরকারি অফিসে কাজ করেন। ননীবাবুর স্ত্রী বেশ সাজগোজ নিয়েই ব্যস্ত। দুপুরে এ বাড়ির গিন্নি মেয়েদের অনেকেই ছাদে আসে। তখন দেখা যায় ননীবাবুর স্ত্রীকে। ননীবাবুর স্ত্রী বলে,

—সময় আর পাই না দিদি। সকালে কর্তার অফিসের তাড়া। তারপর ছেলে যায় কম্পিউটার শিখতে। ওর বাবা তো ছেলেকে কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার করাবেই। আর মেয়েও এবার জয়েন্ট পরীক্ষা দিয়ে ডাক্তারী পড়তে চায়। তার লেখাপড়া আছে। কলেজের তাড়া। এ বাড়ির ছেলেদের মতো ওই বাজে আড্ডায় ওরা নেই।

তেতলার দত্তগিন্নি শুনছে ওর কথা। দোতলার কেষ্টবাবুর পিসিমাও রয়েছে। ননীবাবুর স্ত্রী তার সংসারের ওইসব প্ল্যানিং-এর কথা বলে জানায়, —যাই পিসিমা। মেয়ে কলেজ থেকে ফিরবে। খেয়েদেয়ে আবার কোচিং-এ যাবে। বসন্তবাবুর স্ত্রীও ছাদের মিটিং-এ আসেন মাঝে মাঝে। তবে সে বড় বড় কথা বলে না। শোনে ওদের ছেলেমেয়ে সংসারের কথা। সাবিত্রীর মা কমলা দেবীও আসে দুপুরের মিটিং-এ। কমলাও শোনায়,

—সাবিত্রী তো ভালো একটা অফিসে চাকরির চান্সও পেয়েছিল। তা মেয়েও রাজি হল না। একজন নামী ডিরেক্টর, কি যেন নাম— হ্যাঁ সমরবাবু, ওর ছবিতেই নাকি ওকে নায়িকা করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। বসন্তবাবুর স্ত্রী বলে,

—এখন তো বাংলা ছবির নায়িকাদের নাম-সম্মানও আছে। আর ভালো টাকাও দেয়।

সাবিত্রীর মা বলে,টাকাই সব নয়, একটা ভালো ছবির হিরোইন হওয়াই বড়। মেয়ের ইচ্ছা সে সুচিত্রা সেনের মতো নামী হিরোইন হবে। যাই। সাবিত্রীর ফেরার কথা। এলো কিনা দেখি।

ননীবাবুর স্ত্রী বলে,

—আমার মেয়ে তো ডাক্তারই হতে চায়। ওর বাবা কত বলে প্রফেসর হবি। তা মেয়ের স্বপ্ন ডাক্তার হবে। কি আর করা যাবে, মেয়ে যখন চাইছে, তাই হবে। চলি দিদি।

ওরা চলে যেতে কেষ্টবাবুর পিসিমা বলে,

—যত্তো সব লম্বা লম্বা কথা। ওই ননীর তো সামান্য চাকরি। ছেলেটা তো নৃপেনের সঙ্গে জুটে হাতিবাগানে সিনেমার টিকিট বেলাক করে আর মেয়ে তো সেজেগুজে কলেজে যায় ছেলে ধরতে। আর ওই সাবিত্রীর গুলের কথা আর কে না জানে। মেয়ে টালিগঞ্জ পাড়ায় ফ্যা-ফ্যা করে ঘোরে বেহায়ার মতো। হিরোইন হবে! এ বাড়ির সব মানুষকে তুমি চেনো না বাছা, আমি চিনি। সব ফক্কিবাজী এদের। তবে ভালো যে নেই তা হয়। তোমার ছেলে আকাশ সত্যিই ভালো ছেলে বাছা। আর কষ্টে বলে, ওই যে দোতলায় নরেন, ব্যাঙ্কে কাজ করে ওদের কথা। মেয়েটাও বেশ ভালো।

বসন্তবাবুর স্ত্রী বলে,

—না মাসিমা, এ বাড়িতে অনেকেই সত্যিকারের ভালো। হয়তো আমরা তাদের চিনি না। ওই সর্দারজী—

পিসিমা এ বাড়ির গেজেট। অনেকেরই হাঁড়ি খবর জানেন। পিসিমা বলে,

—ওই কেশব সিং! ওটা ডাকাত! গ্যারেজ করার নাম করেও ব্যাটা ডাকাতির ডেরা বানিয়েছে। আর ওর বৌটা তো আরও সাংঘাতিক। মদ বেচে। বাড়িটাকে শুড়িখানা বানিয়ে তুলেছে। যত্তোসব উটকো লোকের ভিড় লেগেই আছে এখানে।

বসন্তের স্ত্রী শিপ্রা বলে,

—তাই নাকি! মদও বিক্রি হয় এখানে! কি সব্বোনাশে কথা গো! তা বাড়িওয়ালা কিছু বলে না?

পিসিমা বলে,বাড়িওয়ালা তো সব থাকে এদিক-ওদিক! এ বাড়িতে থাকে একজন। সে ওই শ্যামলবাবু। তিনিও তো শুনি বড়বাড়ির ছেলে—নেশা ভাং করে। আর তার ছেলে নৃপেন তো পাড়ার মস্তান! সেই-ই মদত দেয় ওই কেশবের বৌ মতিয়াকে। তাই ওই সর্দারণীও দু-হাতে মদ বেচে। বাড়িটাকে শেষে শুঁড়িখানা না বানিয়ে ফেলে। তাই বলছি বাছা— ছেলেকে আগলে রাখো। এই নরকে ছেলেমেয়ে নিয়ে বাস করাও বিপদের কথা!

শিপ্রাও এদের বুঝতে পারে এবাড়ির ভেতরের ব্যাপারটা।

ননীবাবু এই বাড়িতে থাকতে বাধ্য হয়েছে। এরমধ্যে ছেলেটাও পড়াশোনা ছেড়ে দিয়েছে। ননীবাবুর মেয়েটা এখন কলেজে পড়ার নামে বাড়ি থেকে বের হয়ে ক্লাস না করে ছেলে বন্ধুদের সঙ্গে যায় ঘুরতে না হয় সিনেমায়। সন্ধ্যেবেলা যায় কোনো রেস্তোরাঁয়। এর মধ্যে নাকি মদ্যপানও করে বাড়ি ফিরেছে।

ননীবাবু বলেন মেয়েকে,

—কাল থেকে সন্ধ্যার আগেই ফিরবে।

মেয়ে বলে, বান্ধবীদের বাড়িতে যেতে হয়।

ননীবাবু ধমকে ওঠে ওসব বাজে কথা বলো না। আমার কথাই শুনতে হবে। এই নিয়েও অশান্তি হয় মাঝে মাঝে। মা ধমকায় স্বামীকে — মেয়ে বড় হয়েছে, ওকে এভাবে ধমকিও না। ননীবাবু বলেন,

—আদর দিয়ে ছেলেটাকে বাঁদর করেছ, আর মেয়েটার মাথা খেও না। মেয়েকে সামলাও, নাহলে শেষে বিপদই হবে।

নরেনবাবুর সংসারে এসব সমস্যা নেই। সে নিজেও নিরীহ ধরনের মানুষ। স্ত্রী চৈতালীও শান্ত

ধরনের মহিলা। স্বামীর যা রোজগার তাতেই হিসাব করে সংসার চালায়। তাদের একমাত্র লক্ষ্য তাদের একমাত্র মেয়ে বিজলীকে মনের মতো করে গড়ে তোলা। এই বারোয়ারী বাড়ির পরিবেশ থেকে তারা দূরেই থাকে।

বিজলী এ বাড়ির সাবিত্রী, নন্দিতাদের সঙ্গে মেশে না। সেতার, গান আর পড়াশোনা নিয়েই থাকে। নিজের ঘরটাও বিজলী সাজিয়েছে নিজের পছন্দসই করে।

সেদিন নরেনবাবু চায়ের সঙ্গে কাগজটা নিয়ে বসেছে। এমন সময় ঘরে এসে ঢোকে শ্যামলবাবু। দত্ত বাড়ির বংশধর। এই রজনীকুঞ্জের আড়াইখানা ঘরের মালিক। নরেনবাবু আর চৈতালী ঘরেই ছিল। শ্যামল বলে,

—নরেন, যাক্ ঘরে রয়েছ দেখছি! বাজার যাওনি?

নরেন বলে,গেছিলাম। এবার অফিস যাবার উদ্যোগ করছি।

চৈতালীদেবী জানে শ্যামলবাবু কেন এসেছে। কিন্তু এখন স্বামীকে কিছু বলতেও পারে না। বরং চৈতালী বলে,

—বসুন শ্যামলদা। আমি চা করে আনছি।

শ্যামল জানে এসময় চৈতালীদেবীকে সরানোর দরকার। তাই বলে, —তবে র'চা বৌদি।

চৈতালী বের হয়ে যেতে এবার শ্যামল বলে,

—নরেন, একটা দরকারে এসেছিলাম। শ'তিনেক টাকা দিতে পারো? আজ সন্ধ্যাতেই দিয়ে দেব। মানে হঠাৎ দরকার হয়ে পড়ল। যদি দিতে পারো!

শ্যামল দত্ত মাঝে মাঝেই এমন হাত মারে এদিক-ওদিক।

নরেন বলে,

—হঠাৎ টাকার দরকার কেন?

শ্যামল দত্ত জানে নরেন টাকা তাকে দেবেই। তাই বলে,

—তোমার কাছে বলতে বাধা নেই। বাজার যাচ্ছিলাম। সাত নম্বরের তারকদা রেসকোর্সের বুকিং অফিসে কাজ করে। ও একটা সিওর টিপস্ দিল ট্রিপল টোটের। ওর খবর একেবারে ঘোড়ার মুখের খবর। যদি লাগাতে পারি শ'আড়াই টাকা — পঞ্চাশ হাজার এসে যেতে পারে। পুরো না আসুক তিরিশ হাজার সিওর। সন্ধ্যার মধ্যেই ফেরত পেয়ে যাবে।

নরেনবাবু বলেন,

—শ্যামলদা, এই নিয়ে কয়েকবারই তো সিওর টিপস্-এর আশা নিয়ে টাকা ঢেলেছ। কি হয়েছে? আবার আক্কেল সেলামি দেবে?

শ্যামল বলে,

—ন্যাপাও নেই। থাকলে ওর কাছে নিতাম। থাকে তো দাও।

নরেন বলে,দিচ্ছি। তবে এরপর ঘোড়ার জন্য আর টাকা চেয়ো না। পাবে না।

শ্যামল টাকা পেয়েই উঠে পড়ে। নরেনবাবু বলেন,

—আরে চা খেয়ে যাও।

শ্যামল তখন চা খাবার কথাও ভুলে গেছে। সে বের হয়ে যায়।

চৈতালী চা নিয়ে ঢুকে দেখে পাখি উড়ে গেছে। চৈতালী জানে ওর ব্যাপারটা। তাই নরেনকেই বলে,

—নিশ্চয়ই টাকা নিতে এসেছিল! আর তুমি দিয়েছ!

নরেন বলে,কি করব! এসে চাইল!

চৈতালী বলে,

—ওই বড়লোকের বখাটে ছেলেটাকে দু-চোখে দেখতে পারি না। যেমন বাপ — তেমনি ছেলে! ওর দলবল বিজলীর দিকে এমনভাবে চেয়ে থাকে! এই নোংরা হাটের থেকে এবার উঠে যাবার ব্যবস্থা করো।

নরেন বলে-দেশের বাড়িতে মা,ভাইদের সাহায্য করতে হয়। এখানে সংসার খরচও আছে। একার ওপরই সমস্ত সংসারের চাপ!

চৈতালী বলে,

—তারপর এই সব হতচ্ছাড়া বন্ধুদের জন্যও খরচা আছে। তোমার দ্বারা কিছুই হবে না। নীচের তলার বসন্তবাবু এর মধ্যে সল্টলেকে জায়গা কিনেছে শুনলাম। দু-চার বছরের মধ্যে বাড়ি করে ওঠে যাবে। ওর ছেলেটাও ভালো। আমাদের যদি একটা ছেলে থাকত!

নরেন বলে,চৈতালী, আমাদের ছেলে না থাক, দেখবে মেয়েকে আমি ঠিক মানুষ করবো। বিজলীই আমাদের ছেলের কাজ করবে।

চৈতালী বলে,

—হাজার হোক মেয়ে! সে তো একদিন পরের ঘরেই চলে যাবে। তার কাছে কি প্রত্যাশা থাকবে বাবা মায়ের!

নরেনবাবু বলেন, আমাদের কর্তব্য আমরা করেছি। মেয়ে যদি ভালো বোঝে করবে। না করে কিছু বলার নেই।

নরেন জানে না। কিন্তু বিজলী বাইরে থেকে বাবা-মায়ের কথা শুনেছে। সে বড় হয়েছে। বুদ্ধিমতী মেয়ে। বাবা-মায়ের ওই প্রত্যাশার কথা বিজলীর মনে যেন গভীরভাবেই রেখাপাত করে। কথাটা যেন নতুন করে ভাবছে বিজলী। পড়াশোনাতে সে ভালোই। এখন গ্রাজুয়েশন করে সে বাবাকে রাজি করিয়েছে। সে আজকের মেয়ে। তাই নিজেকে সে তৈরি করতে চায় এ যুগের মতো করেই। এখন নামী কলেজে বিজনেস ম্যানেজমেন্ট পড়ছে। নিজেকে একালের উপযোগী করে তুলতে চায়। সে দেখেছে আজকের সমাজকে। এই সভ্যতা তাদের ভালোও দিয়েছে অনেক কিছু। তেমনি এর অন্ধকার দিকটাও কম নয়।

বিজলী দেখেছে আজকের ছেলেমেয়েদের অনেকেই এই অন্ধকারের দিকটাকেই আঁকড়ে ধরেছে। তারা নাইটক্লাবে যায়। ডেটিং করে। দেখেছে সে সাবিত্রীদের, দোতলার ননীবাবুর মেয়ে মানসীদের। তারা স্বপ্ন দেখে কেউ নায়িকা হবে রূপালি পর্দার। কেউ ভাবে সে নামকরা গায়িকা হবে। তাই বারেও মদ্যপ মানুষগুলোর সামনে স্বল্পবাস পরে নেচে নেচে গায়। এখানে ওখানে ঘোরে। বাড়ি ফেরারও ঠিক নেই।

দেখেছে নৃপেনকে। তিনতলার ননীবাবুর ছেলে পরেশকে। আরও অনেককে। তারা পড়াশোনা ছেড়ে কেউ হিরো—কেউ মস্তান হয়ে উঠেছে। মোটর বাইক নিয়ে ঘোরে। ধমকে চমকে মদ খায়। চাঁদা তোলে। শুধুমাত্র নিজেদেরটা নিয়েই ব্যস্ত।

বিজলী দেখেছে এ বাড়ির আরও একজনকে। সে বসন্তবাবুর ছেলে আকাশকে। আকাশ এখন এম.এ. পড়ছে আর সেই সঙ্গে আই.এ.এস.—ডব্লু.বি.সি.এস পরীক্ষায় বসার জন্য তৈরি করছে নীরবে। বিজলীর মনে হয় আকাশও যেন তার মতোই লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। বিজলীর লক্ষ্য একটাই। জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। বাবা-মাকে দেখিয়ে দেবে সেও একটা কিছু করতে পারে এই অবক্ষয়ের মধ্যে থেকেও। তাই তার যেন এগিয়ে যাবার প্রচেষ্টা। সে হারিয়ে যাবে না।

নবকেষ্ট এ বাড়ির দেড়খানা ঘরের বাসিন্দা। তার ছেলেপুলে নেই। সংসারে আপন বলতে এক বিধবা দিদি বাতাসী। নবকেষ্টর নেশাটাও বিচিত্র। একতলার একদিকে প্রায়ান্ধকার ঘরে থাকে সে। আগে নাকি ওদিকটা ঘোড়া থাকত। নবকেষ্টও বলে,

—আমি আস্তাবলের বাসিন্দা। বহুরূপী। আজকের সমাজে বহুলোকই বহুরূপী। বাইরে একেবারে নিপাট ভালো মানুষ সেজে থাকে। মুখে যেন মধু ঝরছে। আর ভিতরে শালা খচ্চর দি গ্রেট — একেবারে অন্যমানুষ। শয়তানের বাচ্চা! আর আমি ব্যাটা পেটের দায়ে রূপ বদলাই। এরা জন্ম থেকেই বহুরূপী। তাই বহুরূপের মালিক।

নবকেষ্ট মাঝে মাঝে খড়-বাখারি দিয়ে নেতাদের কুশপুত্তলিকাও বানায়। পেছনের দিকে ঘেরা বাধা জায়গাতে খড়-বাখারি দড়ি এসব থাকে। মিটিং মিছিল হলেই কোন নেতা-মায় বিদেশি নেতাদেরও কুশপুতুল দাহ করা হয়। ওসব তৈরি করে দেয় নবকেষ্ট।

কেষ্ট কখনও জটাজুটধারী মহাদেব সেজে পথঘাট দোকান-বাজারে যায়। যে যা দেয় তাই নেয়। অল্প নিয়েই সে খুশি। নবকেষ্টর দিদি বলে,

—কাজকম্ম কিছু কর। এভাবে কি সংসার চলে।

নবকেষ্ট বলে,আরে দিন তো চলে যাচ্ছে। এখন যাও তো। তিন-চারটে কুশপুতুল বানাতে হবে। পটলদারই দুটো লাগবে। ভালো দাম দেবে। সুতলির বান্ডিলটা দিয়ে যাও তো! খড়গুলো বাঁধি। নবকেষ্ট তার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

যাত্রার দলের থেকেও তার ডাক আসে। মাঝে মাঝে যায়। তবে বলে,

—ওদের অসুরের জীবন। দিনে ঘুমোয় আর রাতে প্রেমের নাটক করে। না হয় যুদ্ধ করো। ওর থেকে আমার বহুরূপীর বেশই ভালো। মাকালী বাবা মহাদেব সাজলে বহুলোকেই পেন্নাম করে। সেদিন রাম সেজেছিলাম, তাও সীতা পাইনি। তাই বড়বাজারে গে দুশো টাকা কামিয়েছি। এ যুগ শালা মিথ্যার যুগ।

বসন্তবাবু এ বাড়ির মধ্যে ওই নবকেষ্টর সঙ্গেই বেশি মেশেন। বসন্তবাবুও এই সহজ সরল ছেলেটাকে ভালোবাসেন। খড় দিয়ে সে পেটের দায়ে কুশপুত্তলিকা বানায়। কিন্তু আসলে সে একজন শিল্পীই।

ননীবাবু মেয়েকে এত বলেও বদলাতে পারেনি। তার মাও চাইত মেয়ের সব সখ সাধ পূর্ণ করতে। তাই মেয়ে যা চাইত, দিত যেভাবে হোক। মানসীর জুতোই ছিল প্রায় সাত-আট জোড়া। তার প্রসাধন সামগ্রী কিনতে কিনতে ননীবাবুকে অফিস থেকে লোন নিতে হতো। ননীবাবু বলতেন,

—চাহিদা কমাও। পড়াশোনা করতে বলো। আজকালকার মেয়েরা তো চাকরিও করে, পড়াশোনাও করে।

মা বলতো,চাকরি কেন করবে! ওর ভালো ঘরে বিয়ে দেব।

এর কিছুদিন পরই ঘটনাটা ঘটে যায়। ননীবাবুর বাজারেও বেশ কিছু দেনা হয়েছে। বাড়ি ভাড়ার টাকা দিতে পারেনি দু'মাস। শ্যামলবাবুর ভাই-এর অংশ। শ্যামলই এ বাড়ির বাকি শরিকদের ম্যানেজার। শ্যামলই আসে ননীবাবুর কাছে। বলে।

—দুমাসের ভাড়া বাকি পড়েছে। ভাইপো লিখেছে টাকা আমাকে দিতে। রশিদ আমিই দেব। টাকাটা দিন।

টাকাটা পেলে আজ শ্যামলবাবু ঘোড়ার পিছনেই লাগাবে। আজও নাকি ঘোড়ার মুখের কোনও সিওর টিপস্ পেয়েছে সে। তাই আশা নিয়ে এসেছে শ্যামলবাবু।

কিন্তু ননীবাবুর অবস্থাও ভালো নয়। বলে ননীবাবু,

—আজ টাকা দিতে পারব না। এ মাসের মাইনে পেলে ভাড়া মিটিয়ে দেব শ্যামলবাবু।

শ্যামলও টাকা না পেয়ে চটে ওঠে। বাড়িওয়ালার মেজাজ নিয়ে বলে,

—ভাইপো বলছে পুরো টাকা মিটিয়ে না দিলে বাড়ি ছেড়ে দিতে হবে এই মাসে। অন্য ভাড়াটে আসবে। আর ভালো কথায় বাড়ি না ছাড়লে নৃপেনকে বলব। সব ব্যবস্থা ওই-ই করে দেবে।

এর আগেও এ বাড়ির দু'একজন ভাড়াটেকে নৃপেনের দল জোর করে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে। পুলিশও নৃপেনের কথা শোনে। ননীও জানে নৃপেনের এমন কীর্তির কথা। তাই এবার ননীবাবুও ভাবনায় পড়েছে।

ননীবাবু বলেন, না-না, যেভাবে হোক আপনাদের টাকা মিটিয়ে দেব সামনের মাসেই।

শ্যামল বিরক্ত হয়ে বলে,তাই দেবেন। নাহলে ফল ভালো হবে না।

ননীবাবুরও মনমেজাজ ভালো নেই। সংসার খরচাও চাই। কীভাবে কি হবে তাই ভাবছে। এমনি দিনে মেয়েও এবার জেদ ধরে,

—আমার একটা মোবাইল ফোন চাই। কলেজের সব ছেলেমেয়ের মোবাইল ফোন আছে। হাজার

সাতেক টাকা হলে একটা ভালো মোবাইল ফোন হবে। ওটা দিতে হবে।

ননীবাবু বলেন,কলেজে যাস না মোবাইল ফোনে কথা বলতে? কি দরকার ও সবের? পাস করে চাকরি কর, তখন নিজের টাকায় কিনবি।

মানসীও জেদ ধরে— সব ছেলেমেয়ের বাবারাই তাদের মোবাইল ফোন কিনে দেয়। এটা এখন সোশ্যাল স্ট্যাটাসের ব্যাপার!

ননীবাবু বলেন, দরকার নেই এমন সোশ্যাল স্ট্যাটাস্!

এবার চটে ওঠে মানসী। তার চাওয়ার সীমা নেই। যে সমাজে মেশে সে সেটা শুধু লুটে নেবার সমাজ। আর একধরনের লুটতরাজ করা মানুষের সমাজ। তাদের দাবিও অনেক। মেয়েও এবার বলে,

—মেয়েকে একটা সামান্য মোবাইল দিতে পারো না, তবে বাবা হয়েছিলে কেন?

—কী বললি! চটে ওঠেন ননীবাবু।

মানসীও রুখে ওঠে — ঠিকই বলেছি। এমন বাবার থাকার কি দরকার! কথাটা শুনে ননীবাবুরও মনে হয় এইভাবে প্রতিদিনের গ্লানি সহ্য করে বেঁচে থাকাটাই অন্যায়ের। সেই অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত করবে নিজেকে শেষ করে।

ওদিকে একটা হেরিক্যান ছিল কেরোসিন তেলের। আর ননীবাবুর স্ত্রী ওদিকে বসে বারান্দায় রান্না করছিল স্টোভ জ্বেলে। দেশলাই-এর বাক্সটাও পড়ে আছে। শশীবাবুর মাথার ঠিক নেই।

সে নিমেষের মধ্যে ওই কেরোসিন তেলটা গায়ে মাথায় ঢেলে দেশলাইটা তুলে নিয়ে নিজের গায়ে ফেলে দেয় জ্বলন্ত কাঠিটা। আর সারাটা দেহ দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। ননীবাবুর স্ত্রী হঠাৎ দেখে কি করবে ভেবে না পেয়ে ওকে জড়িয়ে ধরে। ভদ্রমহিলার পরনে ছিল সিন্থেটিক শাড়ি। তার শাড়িটাও দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। মেঝেতে কিছু কেরোসিন তেল পড়েছিল। সেখানেও আগুন জ্বলে ওঠে। ওদিকে পড়ে ছিল শাড়ি-কাপড়, চোপড়। সেগুলোতেও আগুন লেগে যায়। সারা ঘরে তখন প্রলয় কাণ্ড শুরু হয়েছে।

মানসীও এবার ভয়ে বের হয়ে চিৎকার করাতে পাশের ঘর-দোতলা-একতলা থেকে লোকজন মেয়েরা ছুটে আসে। তারাই জল দিয়ে আগুন নেভায়। ততক্ষণে যা ক্ষতি হবার হয়ে গেছে। পুরোপুরি অগ্নিদগ্ধ হয়ে গেছে ননীবাবু, তার স্ত্রী। ওদের দুজনকে নৃপেনরাই হাসপাতালে পাঠায়। পুলিশও এসে পড়ে।

রজনীকুঞ্জের ইতিহাসে এমন ঘটনা ঘটেনি এর আগে। শ্যামলবাবু---বসন্তবাবু---নারেনদা—কেশব সিং—মতিয়ারা ছুটে আসে। নৃপেন তার দলবলও ব্যস্ত। মানসী-পরেশ বুঝেছে তাদের কতবড় সর্বনাশ হয়ে গেল। অনেক পাবার স্বপ্ন এবার ধুলোয় মিশে যাবে।

তাই হয়েছেও। হাসপাতালে দুদিন থাকার পর ননীবাবু তার স্ত্রী দুজনেই মারা যায়। এবারে বিপদে পড়ে তারা। রজনীকুঞ্জের সীমানা ছাড়িয়ে এই আগুনের জ্বালাটা যেন সারা এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। এ বাড়ির বাবা-মা সকলেই কেমন যেন আঁতকে উঠেছে এই ঘটনায়।

ঘটনাটা গভীরভাবে ছায়াপাত করেছে বিজলীর মনেও। নরেনবাবু-বিজলীও দেখেছে ওই শোচনীয় মৃত্যুকে। মানসীও এবার বুঝেছে তার ভুলটা।

চৈতালী বলে,

—এরজন্য বাবা-মাও কম দায়ী নয়। তারাও মেয়েকে উচিত শিক্ষা দিতে পারে নি। তাই প্রাণ দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে হলো।

নরেনবাবু বলেন,

—তাদের দোষ তো আছেই। আর দোষ আজকের দিনের এই অনেক পেতে চাওয়া সমাজকেও।

চৈতালী বলে,মেয়ের ভুলটার কথা বলবে না! এক একজন এক একধরনের হয়, জন্ম থেকেই। তাই ভয় হয় বিজলীকে নিয়ে।

নরেনবাবু বলেন,

—বিজলী ওই ধরনের মেয়ে নয়। দেখবে ও ঠিক তার পথ বেছে নেবেই।

বিজলী ওদের কথা শোনে। ননীবাবুদের এই ঘটনাটা বিজলীর কাছেও যেন একটা সাবধানের সংকেত এনেছে। সেও তার মনের অতলের শক্তিকে জাগ্রত করতে থাকে। সেদিন বিজলী ফিরছে তার কলেজ থেকে। পথে জোর বৃষ্টি নেমেছে। বিজলী ওদিকে একটা রেস্তোরাঁ দেখে সেখানেই ঢোকে।

আকাশও কলেজ থেকে ফিরছে। সেও এমনি প্রবল বৃষ্টিতে আশ্রয়ের সন্ধানে গিয়ে পথের ধারে ওই রেস্তোরাঁতেই আশ্রয় নিয়েছে। টেবিলগুলো আশ্রয় প্রার্থীদের ভিড়ে ভর্তি। ওদিকে বিজলীকে একটা টেবিলে বসে থাকতে দেখে আকাশও গিয়ে বসে সেখানে। আকাশ বলে,

—তুমি! এখানে!

বিজলী বলে, কলেজ থেকে বাড়ি ফিরছিলাম। পথে বৃষ্টি নামল। মাথা বাঁচানোর ঠাঁই খুঁজতে ঢুকে পড়েছি এখানে। তুমি?

আকাশ বইপত্তরগুলো টেবিলের ওপর রেখে বলে, আমারও সেই অবস্থা। আর এখানে ঢুকে দেখি তুমি বসে আছ। তাই চলে এলাম। ভিজে গেছ। কফি খাবে তো?

বিজলী বলে,

—কফি কমই খাই। তবে যা ভিজেছি, কফি ভালোই লাগবে।

আকাশ বেয়ারাকে কফি আর পকোড়ার অর্ডার দিয়ে বলে,

—পড়াশোনা কেমন হচ্ছে? তুমি তো ছাত্রী হিসাবে সুপার্ব।

বিজলী বলে—নিজের কথা কেন বলছ না? তুমি তো ইউনিভার্সিটির নামী ছাত্র। তা আই.এ.এস পরীক্ষা দিচ্ছ এবার?

আকাশ বলে,

—বাবার ইচ্ছা তো আছে। তবে বাড়ির ওই পরিবেশে পড়াশোনাও ঠিকমতো হয় না। চিৎকার-চেঁচামেচি-ঝগড়া তারপর নীচের তলার নৃপেনদের মাইক বাজিয়ে শনিপুজো। ওদিকে মতিয়ার দোকানে মাতালের হল্লা। তুমিই বা পড়াশোনা করবে কি করে? যদি একটু ভালো পরিবেশে যেতাম পড়াশোনাটা ভালো হত। তারপর ওই ননী আঙ্কেল-আন্টির শোচনীয় মৃত্যু! সত্যি মনকে নাড়া দেয়।

বিজলী বলে,

—আমার মনেও এসব সমস্যার কথা ওঠে। তবে কি জানো, যে সমাজে আমরা বাস করছি তাকে অস্বীকার করার পথ নেই। আমার মনে হয়, আজকের সমাজে, আজকের এই লোভনীয় হাতছানি আমাদের যেন দিশেহারা, লক্ষ্যভ্রষ্ট করে তুলেছে। তাই সবাই কাঞ্চন ভেবে কাচই কুড়িয়ে নিয়েছে।

আকাশ বলে,কথাটা সত্যি বলেছ বিজলী। ওই বড় বাড়ির অনেককেই দেখেছি, তারা সামান্য পাবার জন্যই ঘুরছে। তাই মরুভূমিতে মরীচিকার পিছনে ছোটা পথিকের মতোই মরছে।

আকাশ বলে,

—তোমাকে দেখে আমিও আশান্বিত হই বিজলী। তুমি যেন জীবনের লক্ষ্যপথে এগিয়ে যেতে চাও।

বিজলী আজ বর্ষামুখর সন্ধ্যায় দেখছে আকাশকে। বড় বাড়িতে ওকে দেখেছে মাঝে মাঝে। দুজনে দুজনকে চেনে মাত্র। দুজনের মনের অতলের এই চিন্তাধারার মিলটা আজ বিজলীও যেন উপলব্ধি করে। বিজলী বলে,

—আমিও তোমার কথা ভাবি আকাশ! তুমি ওদের দলের নও। জীবনে এত ঝড়ঝাপটার মাঝেও নিজের পথে এগোতে চাও। তাই ভরসা পাই আমিও।

কফি-পকোড়া এসে গেছে। ওদিকে বৃষ্টি থামার নাম নেই। সমানে চলেছে। বিজলী বলে,

—সর্বনাশ! বৃষ্টি তো এখনও থামল না।

আকাশও রাস্তার দিকে চেয়ে দেখে, রাস্তায় তখন জলস্রোত বইছে। হাঁটু জল হয়ে গেছে। গাড়িগুলো যেন ভেসে চলেছে। দু'একটা গাড়ি এর মধ্যেই দম বন্ধ করে দাঁড়িয়ে আছে। রাস্তার আলো জ্বলে গেছে। ওই জলের মধ্যে যেন কলকাতার আর এক রূপ ফুটে উঠেছে। বিজলী বলে,

—বাড়ি ফিরব কী করে? মা ভাবছে, বাবাও—

আকাশ বলে,

—দাঁড়াও বাড়িতে ফোন করে দিই। তোমার বাড়িতেও ফোন করে দেব। রেস্তোরাঁ থেকেই ফোনটা করে দিই। তারপর বৃষ্টি কমলে দেখি, কিভাবে যাওয়া যায়।

আকাশ কাউন্টারে গিয়ে ফোন করছে। বিজলীও এবার কথাটা ভাবছে। ওর মা-বাবা খবরটা শুনে হয়তো একটু অবাক হবে। ওরা ভাববে হয়তো বিজলী আকাশের সঙ্গে প্রায়ই বের হয়। আজ যেন ধরা পড়ে গেছে। কিন্তু আর করারও কিছু নেই।

আকাশ ফিরে এসে বলে,মাকে বলেছি, তোমার মাকেও খবর দিয়ে দেবে। চলো, ওঠা যাক-বৃষ্টি তো থেমেছে। তবে রাস্তা তো এখন নদী হয়ে গেছে। কলকাতার রাস্তা দিয়ে তখন জলস্রোত বয়ে চলেছে।

বিজলী বলে, যাব কী করে? গর্তে পড়লে—

আকাশ বলে,

—হাতটা ধরো, গর্তে পড়লে টেনে তুলব।

বিজলী ওর হাতটা ধরেছে। একটা তরুণ মন ওই স্পর্শে যেন বিচলিত হয়ে ওঠে। ওদিকে একটা রিক্সা দেখে আকাশ তাকে থামায়। বলে,

—ফড়িয়াপুকুর যাবে?

রিক্সাওয়ালা বলে, — কুড়ি টাকা লাগবে।

বিজলী বলে,দশ টাকা ভাড়া। চাইছ ডবল!

লোকটা হয়তো বলতে চাইছিল যে তোমরা মৌজমস্তি করতে বের হবে, মাশুল দেবে না! তবে ওই কথা না বলে, বলে,

—পুরো জল টেনে যেতে হবে। সামনে জল আরও বেশি। কুড়ি টাকাই লাগবে।

আকাশ আর কথা বাড়ায় না। বলে,

—তাই দেব। চলো তো। ওঠো বিজলী।

ওরা দুজনে ওই রিক্সায় ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে ফিরছে বাড়ির দিকে।

বৃষ্টির দিনে মতিয়ার দোকানে ভিড় একটু বেশিই হয়। ওদিকে মতিয়াই একটা লোক রেখেছে সে অফুরান বেগুনি, ধোকা এসব বানায়। চা অবশ্য সন্ধ্যার পর আর চলে না। তখন চায়ের না, মদের খদ্দেরই বেশি।

নৃপেন-পলাশ-বাদলা-পঞ্চুরাও রয়েছে। ওরাও এবেলা বের হয়নি বাজারে-সিনেমা হলে। আজ ওদের তোলা আদায়—টিকিট ব্ল্যাকের কাজও বন্ধ। তাই এসে জুটেছে মতিয়ার দোকানে।

ওদিকে কেশব সিং। ইদানীং নৃপেনও তাদের দু'চারজনকে চেনে। গাড়ি আসে ভালো অবস্থাতেই। তারপর তার নাম্বার প্লেটও মুছে যায়, আর গাড়ির টায়ার-যন্ত্রপাতি সবই আলাদা হয়ে চলে যায়। আর ইঞ্জিনও চলে যায় অন্যত্র। মায় খোলটাও কালোয়ার পট্টিতে চলে যায়।

ঘন্টাখানেকের কাজ করে ভালোই রোজগার হয় সিংজীর। আর নৃপেনকেও কমিশন দিতে হয়। না হলে নৃপেনই গোলমাল বাধাবে। নৃপেনের আমদানিও হয়। আর তারপর নৃপেন আসে মতিয়ার দোকানে।

—দুটো বোতল দাও ভাবি।

নৃপেনের সঙ্গে দুটো চ্যালা। পঞ্চু বলে বিলাতি। মতিয়া ফুঁসে ওঠে বিলাতি দুশো রুপেয়া। নিকালো রুপেয়া। নৃপেন ফস করে দুটো একশো টাকার নোট বের করে বলে, —এই নাও তোমার টাকা।

আজকাল খুব লাভ করছে ভাবী। এখানে লাভ করলে নৃপেনকে বখরা দিতে হয়। কেষ্ট নিয়ে আয় পকোড়া-বেগুনি।

কেষ্টা বলে—দাম!

গর্জে ওঠে নৃপেন — বলবি আমি চেয়েছি। যা তো!

মতিয়া জানে এখানে ব্যবসা করতে গেলে নৃপেনকে বখরা দিতেই হয়। বলে সে —দিচ্ছি দিচ্ছি!

ওরা বোতল আর চাট নিয়ে জমিয়ে বসেছে।

দেখা যায় রিক্সাটা এসে থামল বড় বাড়ির সামনে। রিক্সা থেকে নামছে বিজলী আর আকাশ। পঞ্চু বলে,

—গুরু দেখেছ! তোমাদের গুড বয় আর ঐ যে তোমাদের পাশের ঘরের নরেনবাবুর মেয়ে, তোমাদের গুড গার্লের কাণ্ড।

কেলো বলে,বসন্ত মাস্টারের ছেলেটাকে দেখছি ছুপা রুস্তম্ — ওই মেয়েটা কাউকে পাত্তা দেয় না। আর আকাশের সঙ্গে ডুবে ডুবে জল খাচ্ছে। দেখছে নৃপেন। তার মাথায় তখন মদের উত্তাপ। নৃপেনও-এর আগেও তার বাবার সহকর্মী নরেনবাবুর ঘরে যেত। ওদের টুকটাক কাজও করে দিত। আর তার নজর ছিল বিজলীর দিকে। নৃপেন বিজলীকে দু'একবার সিনেমার টিকিটও দিতে গেছিল। কিন্তু বিজলী তাকে এড়িয়ে গেছে।

সেবার দুর্গাপুজোর সময় নৃপেনই বলেছিল, চলো বিজলী, কলকাতা শহরের বেশ কিছু ঠাকুর দেখে আসবে। আমি মদনদার গাড়িটা নিচ্ছি। বেশ ঘোরা যাবে প্যাণ্ডেল-প্যাণ্ডেলে। বিজলী নৃপেনের এহেন প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিল। শেষে নৃপেন বাধ্য হয়ে বের হয় এই বাড়ির কেয়াকে নিয়ে।

কেয়া মেয়েটা নৃপেনের ভক্ত। নৃপেনের সঙ্গে সিনেমায় যায়। নৃপেন অবশ্য সাবিত্রীকেও টোপ দিয়েছিল। তবে সে দু-একজন পরিচালক—ছোটোখাটো প্রযোজকদের সঙ্গে ঘোরে। হোটেল-বারে যায়।

সাবিত্রী এখন বেশ অসুবিধায় পড়েছে। এতদিন বাবার পাটকলে চাকরিটা ছিল। তবে দেখেছে সাবিত্রী, আগে পাটকলের চাকরির স্থায়িত্ব ছিল। এখন কারখানা কখন চালু থাকে আর কখন বন্ধ থাকে তার কোনও ঠিক ঠিকানা নেই। এখন একটানা একবছর কারখানা বন্ধ আছে। আদৌ খুলবে কিনা তারও ঠিকঠিকানা নেই।

সাবিত্রীর স্বপ্নছিল সে বড় নায়িকা হবে। বাংলা ছবির জগতে যেতে পারবে। তাই মাধ্যমিকের পড়া শেষ করেই সে টালিগঞ্জে যেতে শুরু করে। তাকে এই জগতের পথ দেখিয়েছিল, ওই বহুরূপী নবকেষ্টও দু'একটা ছবিতে কখন জ্যান্ত কালী-মহাদেব আবার যমরাজ সেজেছে। সেই সুবাদে তার দু-চারজন পরিচালকের সাথে চেনাজানাও ছিল। নবকেষ্টই বলে সাবিত্রীকে,

—ওসব পথ ভালো নয় রে! ওখানে চান্স পেতে গেলে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়। তার চেয়ে কোনও অফিসে যদি কোনও কাজকর্ম পাস তো কর। নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবি।

সাবিত্রীর চোখে তখন রূপালি পর্দার স্বপ্ন। তাই সে বলে, —নবকাকা, তুমি দু চারজনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দাও। তারপর দেখি চান্স পাই কিনা!

নবকেষ্ট তাকে দু-চারজন পরিচালক-প্রডাকশন ম্যানেজারের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিল।

সাবিত্রী তারপর নিজেই যাতায়াত করে ওদের সাথে মেলামেশা শুরু করে। কাজ করার চেয়ে এখন বেশি পরের জন্যই সময় নষ্ট করতে হয়। অনেকেই আশা দেয়। অনেকের কাছে চান্স যদিও বা মেলে ভিড়ের মধ্যে, হিরোইনের বন্ধুদের দলে। ডায়লগও থাকে না।

এখন সাবিত্রীর টাকার দরকার। বাবার চাকরিও নেই। বাবা হাতিবাগানের মোড়ে হকারি করে। নৃপেনকে ধরে সেখানে হকারি করার অনুমতি পেয়েছে নেতা মদনবাবুর কাছ থেকে। সাবিত্রীও দেখেছে সমাজের অন্ধকার জগতের রূপটা। এক শ্রেণীর মানুষের হাতে এসেছে অফুরান টাকা। এক শ্রেণীর ব্যবসাদার আছে, তারা সরকারি বন আমলাদের সাহায্যে বহু অর্ডার—কনট্রাক্ট আদায় করার

জন্য তাদের নামীদামী হোটেলে মৌজমস্তির ব্যবস্থা করে। সেই সব আসরে ডাক পড়ে সাবিত্রীর। সাবিত্রীও ভালো টাকাই পায়। বাবা-মা-ভাই-বোনদের মুখে অন্ন জোগায়। বড় বাড়ির দু-খানা ঘরের ভাড়াটে সাবিত্রী—নীরোদবাবুরা। সাবিত্রীর পোশাক-আশাকও এখন ভালোই। এই জীবিকার জন্য এসব চাই। রাত দুপুরে গাড়িতে করে বাড়ি ফেরে। তখন সাবিত্রীর পাও ঠিকমত পড়ে না। আজকের রোজগারের টাকা মায়ের হাতে দিয়ে সাবিত্রী তার নিজের ঘরে গিয়ে ঢোকে।

নৃপেন—পঞ্চুর দল তখনও মতিয়ার ঠেকে বসে থাকে। বাদল বলে,

—তোমাদের হিরোইন কোথা থেকে ক্ষেপ মেরে ফিরল গুরু! নৃপেন এখন কেয়াকেই হিরোইন বানাতে চায়। নেতা মদনবাবু এখন এদিকে প্রমোটারির ব্যবসা শুরু করেছে। নৃপেন সেই কাজ নিয়েই ব্যস্ত। ওদিকে কাদের বাড়ি হচ্ছে, সেখানে গিয়ে সেই ভদ্রলোককে বলে,

—দাদা, বাড়ি করেছেন করুন। তবে আমি মদনদার লোক। এ পাড়ায় বাড়ি করতে গেলে মালমশলা নিতে হবে আমাদের কাছ থেকে। ভদ্রলোক বলেন,তোমার দোকান, গোলা কোথায়?

বাদল বলে,নৃপেনদা এই চত্বরে একেবারে সেরা ইটভাটার ইট, নদীর বালি, আর গুদাম থেকে সিমেন্ট বাড়িতে এনে দেয়। টাকা দেবেন, মাল বুঝে নেবেন। নৃপেন সবসময় একটা চেম্বারও কোমরে রাখে। ওটা পেয়েছিল মদনদার ভোটের সময়। তারপর থেকে ওটা রেখেই দিয়েছে। সেই পার্টির সঙ্গে কথার মধ্যে জামাটা তুলে ঘাম মোছার ভান করে ভদ্রলোককে চেম্বারের কাটটা দেখায়। যেন নীরবে হুঁশিয়ারী দিচ্ছে।

আর তাতেই কাজ হয়। নৃপেন এখন তিন নম্বরি ইট— দুনম্বরি বালি—অনামী কোম্পানির সিমেন্ট নামী কোম্পনীর ব্যাগে পুরে সাপ্লাই দেয়। খোয়া আনে চিৎপুর থেকে। পার্টিকে বলে সিধে পাহাড় থেকে মাল এনেছি দাদা। একনম্বর মাল।

নৃপেন এখন মদনদার কোম্পানির কেয়ারটেকার। ওখানে অনেকে কাজকর্ম করে। ফলে তার দলও বাড়ছে। ইদানীং—কেশব সিং—এর কাছ থেকে একটা পুরোনো বাইক কিনে পাড়া কাঁপিয়ে বেড়ায়। মাঝে মাঝে কেয়াকে নিয়ে বারে হোটেলে যায়। কেয়াও স্বপ্ন দেখে নৃপেনকে নিয়ে।

•

বিজলীর বড় বাড়ির জীবদের এসব উত্তরণ দেখার সময় নেই। সামনে তার বিজনেস ম্যানেজমেন্টের ফাইনাল পরীক্ষা। এমনিতেই সে তাদের কলেজের কৃতি ছাত্রী। সব বিষয়েই সে গ্রেড ওয়ান। তাই এর মধ্যেই তাদের ক্যাম্পাস রিক্রুটমেন্টে ওর চাহিদা রয়েছে। দু-চারটে কোম্পানি তাকে পেতে চায় পড়া শেষ হলে। তবে বিজলী চায় একটি নামী বিদেশি প্রতিষ্ঠানে কাজ নিতে। তাই তাকে ভাল ফল পেতেই হবে।

ননীবাবুর ছেলে পরেশ—তার বোন মানসী এখন এই বাড়িতেই রয়েছে। পরেশ ওর বাবার অফিসে একটা চাকরি পেয়েছে। তাই ওদের দিন চলে যাচ্ছে। আর মানসীও যেন আরও বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। পরেশ বলে,

—মানসী, বাবা-মা নেই। আমাকেই সব দেখতে হয়। তুইও কলেজের পড়াটা শেষ করে যদি কাজকর্ম পাস নিবি। মানসী বলে—আমি তোর বোঝা হয়ে আছি, না রে?

বিজলী এখন নিজের পড়া নিয়ে ব্যস্ত। মাঝে মাঝে আসে বিকালে আকাশ। বাড়ির পিছনের দিকের বাগানের আমগাছে মুকুল এসেছে। ফাল্গুনের শুরু। কাঠাল গাছের ফুলের তীব্র সুবাস মো মো করছে বাতাসে।

সেদিন বিকালে বিজলী পেছনের বাগানে এসেছে। দেখে আকাশকে। আকাশও কিছুদিন ব্যস্ত। তার বাবা বসন্তবাবু এবার চাকরি থেকে রিটায়ার করবেন। বসন্তবাবুও জানে এই পরিবেশে আকাশের পড়াশোনার অসুবিধা হচ্ছে। রজনীকুঞ্জের সামনের মাঠে কেশব সিং এর গ্যারেজের পাশেই নৃপেন একটা শনিমন্দির করেছে। শনিবার বিকাল থেকেই একেবারে ঘটা করে মাইক বাজিয়ে শনি দেবতার

আরাধনা শুরু হয়। একটা বড় থালায় প্রণামীও পড়ে। বাদল-পঞ্চুরা পাহারা দেয়। ওই প্রণামী দিয়ে তাদের দুতিনদিনের মদের খরচা চলে যায়।

আজও সেই মাইকের চিৎকার শুরু হয়েছে। বিজলী-আকাশদের পড়া আর হয় না। তাই তারা পিছনের বাগানে এসেছে। বিজলী-আকাশের এই ঘনিষ্ঠতার খবর অবশ্য বসন্তবাবু—নরেনবাবু—চৈতালী—শিপ্রাও জানে। বিজলী বলে, তোমার পরীক্ষা তো হল! কদিন তো খুব ব্যস্ত ছিলে আইএস পরীক্ষা নিয়ে।

আকাশ বলে—দিলাম তো ভালোই মনে হচ্ছে। তবে বিড়ালের ভাগ্যে কি শিকে ছিড়বে?

বিজলী বলে,

—কেন ছিড়বে না? তুমি তো ইউনিভার্সিটির সেরা ছাত্র। দেখবে তুমি পাস ঠিকই করবে!

আকাশ বলে,তোমার পরীক্ষা কেমন হয়েছে বলো? আমি চাই, তুমিও ভালোভাবেই পাস করবে। নিশ্চয় কোনও নামীদামী প্রতিষ্ঠান থেকে ভালো অফার পাবে।

হাসে বিজলী। বলে,

—আমরা কেমন বদলে গেছি আকাশ। আগে ছেলেমেয়েদের মধ্যে কিসের আলোচনা হত জানো? কাকে কার কেমন লাগে? আর এখন? পরীক্ষা আর চাকরির কথা। আকাশ বলে,

—এখন প্রেম-ট্রেম কর্পূরের মতো জীবন থেকে উড়ে গেছে বিজলী। এখন বড় হচ্ছে শুধু বেঁচে থাকার প্রশ্ন। ফুল-চাঁদ-সবুজের জগৎ আমাদের জীবন থেকে হারিয়ে গেছে।

হাসে বিজলী—হয়তো তাই। চলো-দেখি, বাবুদের মাইক থেমেছে। কাল সকালে আবার পরীক্ষা। ওরা আসে ওদের বাস্তব জীবনে।

এমনি দিনে রজনীকুঞ্জের বসবাসকারী দত্ত বংশের একমাত্র শরিক শ্রী শ্যামল দত্তের চাকরিই চলে গেল। অবশ্য শ্যামলবাবুর দোষও ছিল অনেক। তখন প্রতি সন্ধ্যাতেই শ্যামল দত্ত মদ নিয়ে বসতেন। স্ত্রী বারণ করতো। নৃপেন তখন ছোট। শ্যামল বলত—তুমি তো সাধারণ কেরানীর মেয়ে। দত্ত বাড়ির রেওয়াজের ব্যাপারে কি জানবে! আমার দাদু চৌবাচ্চায় মদ ঢেলে জবা ফুল ভাসিয়ে দিত। তারপর নল দিয়ে মদের সঙ্গে সেই ফুল টানতো। নাচমহলে মদের ফোয়ারা চলতো। সেই খানদানের ছেলে একটা পাঁইট নিয়ে বসেছে। নো গেলাস্—

মদের নেশাটাও বেড়েছে মতিয়ার দোকান থেকে।

সেই সঙ্গে বেড়ে ওঠে টাকার চাহিদা। তাই রেসের মাঠেই যাতায়াত শুরু হয়। চারিদিকে ধারদেনা—বাইরে থেকে আর টাকা পাবার কোনও আশা নেই।—হঠাৎ সেদিন একেবারে সিওর একটা টিপস্ পেয়ে যায়। যা লাগাবে, দশ গুণ রিটার্ন। তাই ব্যাঙ্কের ক্যাশ থেকেই পঞ্চাশ হাজার টাকা নিয়ে বাজি ধরে। নগদ একেবারে পাঁচলাখ টাকা আসবে। ব্যাঙ্কের টাকা—ধারদেনা শোধ দিয়ে ওর হাতে ভালোই থাকবে।

কিন্তু বরাত খারাপ। পুরো টাকাই চোট হয়ে যায়। যে ঘোড়ার উপর বাজি ধরেছিল সে প্রথম না এসে সেদিন একেবারে শেষে। শ্যামলবাবুও এবার লটকে পড়ে মাঠে।

পরদিনই ব্যাঙ্ক কর্মকর্তা পুলিশে খবর দেয়। পুলিশ ধরে নিয়ে যাবে শ্যামলবাবুকে। রজনীকুঞ্জে হৈ চৈ পড়ে যায়। পুলিশ শ্যামলকে ধরে। এবার মতিয়ার দোকানেও রেড করে। এর মধ্যে তারা চোরাই গাড়ির সন্ধান করতে এসে আগেই কেশব সিংকেও ধরে নিয়ে গেছিল। নৃপেন অবশ্য মদনদাকে নিয়ে থানায় গেছিল। থানা অফিসারকে ভালো টাকা দিয়ে কেশব সিংকে কোনওমতে ছাড়িয়ে এনেছিল।

নৃপেন বাবাকেও ছাড়াতে আসে দুতিন দিন হাজতবাসের পর। কেসও চলছে আর এই মধ্যেই ব্যাঙ্কও ছাঁটাই-এর নোটিশ ধরিয়েছে শ্যামল দত্তকে তহবিল তছরূপের দায়ে।

এবার বিপদে পড়েছে নরেনবাবুও। তিনি আর শ্যামল দত্ত একই ব্যাঙ্কের একই ব্রাঞ্চে চাকরি করত। নরেনবাবু এর আগেই শ্যামলবাবুকে বার বার নিষেধ করেছিল,— এসব করো না শ্যামল। নিজেকেও বদলাও।

এবার শ্যামলের প্রমোশন পাবার কথা। আর এই সময়ই শ্যামলবাবুকে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ চাকরি থেকে বরখাস্ত করেছে। নরেনবাবুকেই সেই প্রমোশন দিয়েছে। সারা রজনীকুঞ্জে খবরটা ছড়িয়ে পড়ে। পাশাপাশি ঘর। দেখেছে চৈতালী শ্যামলবাবুকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে পুলিশ। নৃপেন গজরাচ্ছে, —আমি মদনদাকে নিয়ে পুলিশ কমিশনারের কাছে যাচ্ছি। দেখে নেব আপনাদের।

তাতেও কাজ হয় না। শ্যামল দত্ত ছাড়া পেল তিন দিন পর। এবার চৈতালী বলে নরেনকে,

—এখান থেকে এবার পাততাড়ি গুটিয়ে চলো অন্য কোথাও। যে বন্ধুর ভরসাতে ছিলে এখানে তিনি যে কি জিনিস তা তো দেখলে!

বিজলীও দেখেছে সব। সেও ভাবছে কথাটা। তার পরীক্ষা শেষ হয়েছে। আর এর মধ্যেই বিজলী একটা আমেরিকান নামী ফার্মে চান্স পেয়েছে। তাই নরেনবাবু বলে, দেখি, ভালো বাড়ি যদি পাই। তবে একটা বাড়ি বানাবোই ভাবছি। জায়গাও পেয়েছি দমদম পাতাল রেলের কাছে। ভাবছি বাড়ি করেই উঠে যাব। এতদিন এখানে ছিলাম। আর বছর খানেক থাকব মুখ বুজে। বিজলী এখন সেই বিদেশি প্রতিষ্ঠানে যোগ দিয়েছে। আর কর্মঠ—বুদ্ধিমতী বিজলীও এর মধ্যে তাদের প্রতিষ্ঠানে নানা কাজের সঙ্গেও পরিচিত হয়ে উঠেছে। তার আমেরিকান বস মিঃ পাওয়ারও বিজলীর চটপট কাজে খুব খুশি। দেখেছে সে মেয়েটা কোনও কাজই ফেলে রাখতে চায় না। নিজে সেকশনে গিয়ে ফাইল নিয়ে তিন দিনের কাজ একদিনে করে আনে নিখুঁত ভাবে। মিঃ পাওয়েল বলেন,

—ইউ ওয়ার্ক ইন আমেরিকান স্টাইল। ভেরি গুড। পাওয়ার নিজেই ওকে একটা স্টেটমেন্ট করতে দেন, বলেন, কাজটা কঠিন। তবে দ্যাখো তুমি যদি কাজটা করতে পারো।

বিজলী দেখছে কাজটাকে। সত্যিই কঠিন কাজ। আর সময়ও লাগবে অনেক দিন। কিন্তু কোম্পানির হেড অফিসের মিটিং-এ এসব কাগজপত্র নিয়ে যেতে হবে। মাত্র দু-তিন সপ্তাহ সময়। তবু বিজলী বলে,

—আমি আপ্রাণ চেষ্টা করবো স্যার।

বিজলী সেদিন থেকেই কাজে লেগে যায়। অফিসে থাকে রাত নটা অবধি। নিজেই সব কাগজ- ফাইল-খাতাপত্র বের করে সব কিছু কম্পিউটারে তুলতে থাকে। বাড়িতে কাগজপত্র এনে কাজ করতে থাকে ভোর অবধি।

সকালে নরেনবাবু প্রাতঃভ্রমণে, বাজার সেরে বাড়ি ফিরে এক কাপ চা আর কাগজ নিয়ে বসেছে। এই আধঘন্টা তার খবরের কাগজ পড়ার সময়। হঠাৎ শ্যামলবাবুকে ঢুকতে দেখে চাইল নরেনবাবু। শ্যামলবাবু এই সময়ই মদ গিলে ফিট হয়ে এসেছে। কদিন হাজত বাস করে এসে ঘর থেকে বের হয়নি। কাল অফিসে গেছিল। নরেন দেখেছে কি নিয়ে শ্যামলবাবু ম্যানেজারকেই যা-তা গালাগালি দিতে থাকে। শেষ অবধি বেয়ারা ওকে বের করে দেয়। নরেনের দুঃখও হয়েছিল। এইভাবে চোখের সামনে দেখেছে একটা লোক কিভাবে নিজের সর্বনাশ ডেকে এনেছে।

নরেন কিছু বলার আগেই শ্যামল বলে,—আমাকে টপকে প্রমোশন নিয়েছ নরেন! আমাকে ইচ্ছা করেই তোমরা ফাঁসিয়েছ নিজেদের স্বার্থে। ইউ রাস্কেল—শ্যামলবাবু টলছে আর মুখ দিয়ে বিশ্রী মদের গন্ধ বের হচ্ছে। গজরাচ্ছে সে, —এমন চাকরিতে আমি ইয়ে করি। আরে চুনী দত্তের জেনারেশন আমি। হাত বাড়ালেই পর্বত। যত্তোসব ফোর্থক্লাস চাকর-বাকরের দল। তবে মনে রেখ নরেন, তোমাকে আমি উচিত শিক্ষা দিতে পারি। শ্যামল দত্তকে চেনোনি। এবার চিনবে।

নরেন বলে, শ্যামলদা, এসব অফিস করেছে।

—ঠিক আছে। আমিও দেখে নেব। শ্যামল দত্ত শাসিয়ে বের হয়ে গেল। চৈতালীও ভীতকণ্ঠে বলে, কি সব বলে গেল গো!

নরেন চেনে শ্যামলকে। এমন বড় বড় কথা সে বলে। তাই বলে নরেন—ওর কথা ছাড়ো তো! ওর মুরোদ দেখা আছে।

চৈতালী বলে,না গো! ওর ছেলেটা তো এক নম্বর মস্তান। মোটর বাইক নিয়ে পাড়া কাঁপিয়ে ঘোরে। যদি কিছু করে! বিজলী তো রাত করে অফিস থেকে ফিরছে।

নরেনবাবুও টনক নড়ে এবার। সেও বুঝেছে শ্যামল বা তার ছেলে নৃপেন এবার কোনও ঝামেলাই না বাধায়। ওরাই এ বাড়ির একচ্ছত্র সম্রাট।

তাই নরেন অফিস-ফেরতা সন্ধ্যাবেলায় গেছে একতলায় বসন্তবাবুর কাছে। এ বাড়িতে ভদ্রলোক বলতে যে দুইজন, তার মধ্যে বসন্তবাবু একজন। এপাড়ার অনেক ছেলেই তার ছাত্র। আর বসন্তবাবুও শান্ত, ধীর প্রকৃতির মানুষ। বসন্তবাবু নরেনবাবুর কাছে সব শুনে বলেন,

—শ্যামলবাবুর চাকরি যেতে এবার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। রোজগার বলতে তো ছিল ওই। আর এ পাড়ার ছেলেদের কথা বলেছেন! এককালে ওদের অনেকে আমার ছাত্র ছিল। তা আমিই ওদের সুমতি আনতে পারিনি। ফেল করেছে। ওরাই বা আমাকে মানবে কেন?

নরেন বলেন,তাহলে কি থানাতেই বলে রাখব? শিপ্রাও শুনছে কথাগুলো। নরেনবাবু বলেন, বিজলীও দেরি করে ফিরছে অফিস থেকে। যদি ওর ছেলেরা কিছু বলে!

আকাশও ছিল বাড়িতে। তার পরীক্ষার ফল বের হবে সামনের সপ্তাহে। সে এখন তার রিসার্চের কাজই করছে। আকাশ বলে,ওরা বিজলীকে কিছু বলবে না। বিজলীও জানে কি করে ওদের ট্যাকল করতে হয়।

বসন্তবাবু বলেন,চুপ চাপ থাকুন। তবে মনে হয় কি জানেন, এবার এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়াই ভালো। আমি তো সল্টলেকে বাড়ি তৈরির কাজ শুরু করে দিয়েছি।

নরেন বলে,আমার জায়গাতো পড়েই আছে। মেয়েটার বিয়ে-থা দিতে হবে, তাই কিছু টাকা রেখেছি। তরপর বাড়ি তৈরির জন্য দেখি কি হয়!

বসন্তবাবু বলেন,যে ভাবে হোক বাড়ি তৈরির চেষ্টা করুন। এই ভাঙা বাড়িতে আর বেশিদিন থাকা নিরাপদ নয়। কোন দিন না ধসে পড়ে এই চুনী দত্তের তাজমহল।

অন্ধকারের মধ্যে তবু একটু আলোর সন্ধান থাকে। আকাশের আইএএস পরীক্ষার ফল বের হয়েছে। আকাশও এবার ভালো র‍্যাঙ্ক নিয়ে পাস করেছে। ওর নাম তালিকার বেশ উপরেই আছে।

খবরটা শুনে বিজলী বলে,মা দেখো, আকাশদা, আইএএস পাস করেছে। চৈতালীর মনের অতলে এই ছেলেটাকে নিয়ে একটা স্বপ্ন ছিল। সে দেখেছে বিজলীর মতো মেয়েও আকাশের সঙ্গে মেশে। দুজনে বাইরে যায় বেড়াতে। বসন্তবাবুদের পরিবার বেশ ভালো। অবস্থাও ভালো। আর এখন তো আকাশ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হবে। পাত্র হিসাবে ওর বাজার দর এখন তুঙ্গে। কত বড় লোক বাবারা টাকার থলে নিয়ে এখন বসন্তবাবুদের পিছনে ঘুরবে। তাই চৈতালী বলে,চল মা, মিষ্টি নিয়ে আয়। ওদের বাড়ি যাই। সুখবরটা শুনে খুশি হয়েছি তা জানানো দরকার।

বসন্তবাবুও জানতেন তার ছেলের সাধনা বৃথা যাবে না। দীর্ঘ এতগুলো বছর ধরে আকাশ পরিশ্রম করেছে স্থির লক্ষ্যে। আর এই করুণ অবক্ষয়ের যন্ত্রণাভরা সমাজের মধ্যে আজ তার পথ পেয়েছে আকাশ।

চৈতালী, বিজলীও এসেছে। আকাশ-বিজলী গেছে বাইরে ওই বাগানে। বিজলী বলে, এবার তো তোমাকেও চলে যেতে হবে হায়দ্রাবাদ। সেখানেই তো তোমাদের ট্রেনিং হবে। আকাশ বলে,হ্যাঁ। বাবা তো উঠেপড়ে লেগেছেন, ছমাসের মধ্যে বাড়ি শেষ করতে। যাতে আমি পোস্টিং-এ নিজের বাড়ি থেকে যাই।

বিজলী বলে,

—তুমিও চলে যাবে। এখানে কাকাবাবুরাও থাকবেন না। পড়ে থাকতে হবে এই নরকে আমাদেরই।

আকাশ বলে এত ভেঙে পড়ছো কেন? যদি আমি ট্রেনিং থেকে ফিরে এসে তোমাকে আমাদের বাড়িতে নিয়ে যাই। সেখানে থাকার জন্য?

অবাক হয় বিজলী মানে?

হাসে আকাশ। বলে,মানেটা খুবই সহজ। মেয়েরা তো নিজেদের ঘরেই থাকে। ওই বাড়িই হবে তোমার নিজের বাড়ি। ওই বাড়ির বৌ হয়েই যাবে। বিজলী দেখছে আকাশকে। সেও এমনি স্বপ্ন দেখেছিল, তবে স্বপ্ন আর বাস্তবের মধ্যে অনেক পার্থক্য! তাই বলে,—দেখা যাক।

এবার নৃপেন চিন্তায় পড়েছে। বাবাই এতদিন যেভাবে হোক সংসার চালাত। নৃপেন রোজগার করত তবে আয়েসই করত বেশি। এখন সেও ব্যবসা শুরু করেছে। ইট—সিমেন্ট—স্টোনচিপস্-এর জোগনদার আর এই সময়ই বাবা চাকরিটা হারাল। মা বলে,

—ওরে নৃপেন, এবার তুই-ই হাল ধর বাবা। তোর বাবা তো নেশা ভাং করেই পড়ে থাকে।

নৃপেন গর্জায়—পিটিয়ে নেশা ছুটিয়ে দেব।

শ্যামল দত্তও ইদানীং বেশি মদ্যপ হয়ে উঠেছে। ভাড়াটেরাও অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে ওর উৎপাতে।

বিজলী দশ-বারোদিন অক্লান্ত পরিশ্রম করে দুবছরের সব হিসাব বের করে অডিট করেছে। মিঃ পাওয়ালকে সেই রিপোর্ট, ব্যালেন্স শিট জমা দেয় বিজলী। মিঃ পাওয়ার দেখছে বিজলীকে। এটা যেন তার বিশ্বাসই হয় না যে বিজলী এই কাজ করে ফেলেছে এই কদিনে। মিঃ পাওয়েল বলে,

—আমি সব দেখে তোমার সাথে ডিসকাস্ করব।

মিঃ পাওয়ার এতদিন ধরে এতবড় আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান চালাচ্ছেন কিন্তু এই কাজ এই অল্প সময়ে এমন নিখুঁত ভাবে করা যায় তা ভাবেনি। ব্যাপার নিয়ে তিনি চিন্তায় ছিলেন। কিন্তু এই বিজলী যেভাবে এই কাজ করেছে তা দেখে তিনিও অবাক হন। সব বিষয়ে ডিটেলড রিপোর্টও আছে আর আছে ওর নিজের মন্তব্য। সেই মন্তব্যে বিজলী সুন্দরভাবে এদের পরিকল্পনা তাদের কর্মপন্থা তাদের ভবিষ্যত পরিকল্পনাগুলোকে সহজভাবেই তুলে ধরেছে।

মিঃ পাওয়ার আমেরিকায় বসে এই কাজ ঠিকমতো করতে পারেননি। বেশ কয়েকজন মিলে করেছে, আর তাতে রয়েছে কো-অর্ডিনেশনের অভাব ফলে সেই রিপোর্টও অসম্পূর্ণ থেকে গেছে। কিন্তু বিজলী সব দিকের কথা ভেবেই এই রিপোর্ট দিয়েছে, মন্তব্য করেছে। এই রিপোর্ট থেকে এই প্রতিষ্ঠান আরও কি কি করতে পারে বা করা সম্ভব তার দিকেও নজর দিয়েছে। সেটা বিশেষভাবে মিঃ পাওয়ারকে অভিভূত করেছে। আমেরিকায় এই সব রিপোর্ট পাওয়ার জন্য হাজার হাজার ডলার খরচ করেছে ওরা, তাতেও ঠিকমতো খুশি হতে পারেনি। খুশি হয়েছে বিজলীর এই রিপোর্টে।

মিঃ পাওয়ার ভাবছে বিজলীর কথা। এদেশে ওদের মতো কর্মীদের দাম দেবে না। তাই মিঃ পাওয়ার ভাবছে অন্য কথা। আর তার ভাবনাটা সে জানিয়ে দিয়েছে তার নিউইয়র্কের হেড অফিসে। এই সব রিপোর্টও চলে গেছে মিঃ পাওয়ারের মন্তব্য নিয়ে।

নৃপেন এবার সত্যিই বিপদে পড়েছে। এতদিন কেয়াকে নিয়ে ঘুরেছে পার্টিতে হোটেলে গেছে। কেয়াকেও নিয়ে গেছে দু-একটা জায়গায়। তাকে দু-চারজনের সঙ্গে পরিচয়ও করিয়ে দিয়েছে। মদনবাবু এখন বেশ বড় করেই প্রমোটারি ব্যবসা শুরু করেছে। অনেক বেআইনি কাজ করতে হয় তাকে। নৃপেনই এইসব করে থাকে। তার জন্য অনেক সময় কর্তাদের খুশিও করতে হয়। আর কেয়াকেই এসব কাজে লাগায় নৃপেন। তার বিনিময়ে কেয়াও কিছু পায়। কেয়া স্বপ্ন দেখে নৃপেন তাকে বিয়ে করবে। দুজনে মিলে ব্যবসা শুরু করবে।

তারপরই কেয়া আবিষ্কার করে সে মা হতে চলেছে। কেয়ার বাবা কোনও ছোট কারখানায় কাজ করে। তার মা দু-একটা বাড়িতে রান্নার কাজ করে। গরিবের সংসার। তবু মানসম্মান নিয়েই থাকতে চায় তারা। এবার কেয়ার এই অবস্থা শুনে কেয়ার বাবা এসে হাজির হয় নৃপেনের ঘরে। দাবি জানায় সে—নৃপেনবাবু তোমার জন্যই আমার মেয়ের এই সর্বনাশ হয়েছে। ওই মেয়েকে তোমায় বিয়ে করতে হবে। না হলে আমি ছাড়ব না। এ বাড়ির সবাইকে বলব, দরকার হয় কোর্ট-কাছারি করব।

নৃপেন কথাটা শুনে চমকে ওঠে। কেয়াও বলে।

—তোমার জন্য আমার এই বিপদ। তোমাকেই এর বিহিত করতে হবে। নৃপেন ওর বাবাকে কিছু টাকা দিয়ে এখান থেকে চলে যেতে বলে। কিন্তু ওরা যাবে না। কেয়া জেদ ধরে।

এবার নৃপেন ভাবছে একটা পথ তাকে নিতেই হবে। নৃপেন এখন মদনদার সঙ্গে জুটে ভালো ব্যবসা করছে। এর কদিন পরই রজনীকুঞ্জের মানুষগুলো চকিত হয়ে ওঠে। সারা বাড়িতে হৈ চৈ পড়ে যায়। দেখা যায় বাড়ির পিছনের ওই বাগানের একটা গাছে কেয়ার দেহটা ঝুলছে। গলায় দড়ি দিয়ে কেয়া আত্মহত্যা করেছে।

কেয়ার বাবা-মা কাঁদছে। এসেছে মতিয়া, এ বাড়ির অনেকেই। নবকেষ্টও অবাক হয়। দেখে ওর মধ্যে নৃপেনই পুলিশকে এনেছে। জানা যায় কেয়া ছিল সন্তানসম্ভবা—তাই বোধ হয় লজ্জায় এই কাজ করছে। কেয়ার বাবা শশীপদ আর্তনাদ করে,

—ও আত্মহত্যা করেনি। যারা ওর এই অবস্থা করেছে তারাই ওকে মেরে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে দিয়েছে। এটা আত্মহত্যা নয়,খুন।

নৃপেন অবশ্য আঁটঘাট বেঁধেই এসেছে। পুলিশের লোকও এখন তার হাতে। দারোগাবাবু বলেন,

—ওসব ব্যাপারে তদন্ত হবে। এখন ডেডবডি নিয়ে চলো।

বাড়ির লোকজনও জুটে গেছে। তারাও শুনেছে কেয়ার বাবার ওই কথা। ওর মাও বলে,

—ওই নৃপেনই এসব জানে। ওই-ই আমার কেয়াকে শেষ করেছে। ওই শয়তানের দল।

নৃপেনের দলও শাসায়—গুরুর নামে যা-তা বলবে না। তাহলে মেয়ে গেছে, তোমাদেরও যেতে হবে এখান থেকে। ওঠো—

পুলিশ ভিড় সরিয়ে বডি নিয়ে যায়। অবশ্য বলে যায়, —তদন্ত হবে। কিন্তু তদন্ত কিছুই হয়নি। লাশ জ্বালিয়ে দিয়েছে ওরা। এই নিয়ে এবার এ বাড়ির বেশ কিছু লোকও নিজেদের মধ্যে আলোচনা শুরু করেছে। তারাও দল বেঁধেছে। নৃপেনের অন্যায়ের প্রতিকার করবেই তারা। কেশব সিং-এর গ্যারাজেই ওদের মিটিং হয়। নৃপেনের দলবলও এসব খবর রাখে। তারাই বলে নৃপেনকে,

—গুরু, শালারা জোট বাঁধছে। কেশব সিং ওদের নেতা।

নৃপেন বলে,

—সূঁচ হয়ে ঢুকে ব্যাটা এখন ফাল হতে চায়। নিজেই এই বাড়ির পুরো মাঠ দখল করতে চায়।

ন্যাপা বলে—ওই মতিয়ার কি তেজ! বলে তুমিই নাকি কেয়ার সর্ব্বনাশ করেছ। আমরা বললাম, সব চুকে গেছে, এ নিয়ে আবার গোলমাল কোরো না। তা কে শোনে কার কথা। দেব একদিন এর দোকান তচনছ করে।

নৃপেন এখন ভাবছে কথাটা। মদনবাবুকেও বলেছে। আজ মদনবাবুও এসেছে। সারা বাড়ি ঘুরে দেখে। দেখে সেই পিছনের বাগান। বাগানের মধ্যে কেশব সিং-এর গ্যারেজ। বাড়ির লোকজনও জুটেছে। কেশব তাকেও এবাড়ির অনাচার-অত্যাচারের কথা জানাতে চায়। বসন্ত-নরেনবাবুরা অবশ্য নেতার কাছে কোনও অভিযোগ জানাতে চায় না।

বসন্তবাবু বলেন— ওদের গোলমালে আর যাব না। কয়েকমাস পর তো চলেই যাচ্ছি নতুন বাড়িতে। এসব ঝামেলায় আমি আর নেই। আকাশও এখন হাদ্রাবাদে ট্রেনিং-এ গেছে। ফিরে আসার আগেই বাড়ি শেষ করে চলে যাব। নরেনবাবু বলেন,আপনার ব্যবস্থা তো হয়েই গেছে বসন্তবাবু। আমিও চেষ্টা করছি অন্যত্র চলে যাবার। দেখা যাক কি হয়।

বিজলী দেখছে সব কিছু। তার মনে হয় এসবের মূলে রয়েছে নৃপেনই। না হলে সে নিজে এত দায়িত্ব নিয়ে এসব কাজ করত না। বিজলীও বুঝেছে এ বাড়িতে থাকা আর সম্ভব হবে না। এদিকে অফিসের তাড়া। বিজলী বাবাকে বলে,

—তুমি অন্য বাড়ির সন্ধান করো। যদি তেমন পাও।

বিজলী চিন্তিত মনেই অফিসে ঢুকেছে। তারপরই বড় সাহেবের ফোন আসে, তার চেম্বারে যেতে হবে। সাহেব ওকে দেখে বলে,

—এসো, তোমার সব স্টেটমেন্ট রিপোর্ট আমি দেখেছি। আর অবাক হচ্ছি এত তাড়াতাড়ি এই কাজ এত নিখুঁতভাবে করলে কি করে। তোমার ফাইন্ডিংও দারুণ। প্রজেক্ট তেমনি ইনফরমেটিভ।

বিজলী বলে,ধন্যবাদ স্যার।

মিঃ পাওয়ার বলেন,তোমার কথা আমি নিউইয়ার্কে হেড অফিসে জানিয়েছি। তারা এসব রিপোর্ট পেয়ে তোমাকে ওখানে পেতে আগ্রহী। নিউইয়র্ক যাবে? বিজলী যেন এমনি একটা স্বপ্ন দেখছিল। সে এইখানেই আটকে থাকবে না। একটা বড় ক্ষেত্রে তার ডাক আসবে। সেখানে সে অনেক কিছুই করতে পারবে। এই বৃহত্তর ক্ষেত্রে যাবারই লক্ষ্য ছিল তার।

বিজলী বলে,হ্যাঁ স্যার।

—তাহলে আমি আমাদের ট্রাভেল এজেন্সিকে বলে দিচ্ছি। ওরা তোমার পাসপোর্ট-ভিসা করে দেবে। এয়ার টিকিটও। মাসখানেক সময় লাগবে। এর মধ্যে তুমিও রেডি হবে নেবে। কনগ্রাচুলেশন্ বিজলী — আশা করি তুমিও তোমার যোগ্যতার প্রমাণ দিতে পারবে। বেস্ট অব্ দ্য লাক —

বিজলী বাড়ি ফিরে খবরটা বাবা-মাকে জানায়।

নরেনবাবুও খুশি হন। তবে চৈতালী বলে,

—একটা মেয়ে দূর বিদেশে যাবে! অজানা জায়গায়—

বিজলী বলে এ নিয়ে ভেব না মা। তাছাড়া নিউইয়র্কে বহু বাঙালি পরিবার আছে। সেখানে আমাদের কোম্পানিতেও বেশ কিছু বাঙালি কাজ করে। কোনও অসুবিধাই হবে না। আর পৃথিবীটাও এখন ছোট হয়ে গেছে। এখান থেকে বোম্বাই যেতে যে সময় লাগে, প্লেনে নিউইয়র্ক যেতে তার চেয়ে কম সময় লাগে।

নরেনবাবু বলেন,তাই যা মা। এখানে এই শয়তানের নজর থেকে তবু দূরে থাকবি।

বাড়িতে এবার নৃপেনের বিরুদ্ধে একটা জনমত গড়ে উঠেছে। শ্যামলবাবুও এসব শুনে ছেলেকেই সমর্থন করে। সে বলে কেশব সিং-কে,

—তোমার গ্যারাজ হটাও। এ জায়গা তোমাকে ভাড়াদিই নি। মতিয়া অবশ্য দু-বোতল মদ দিতে শ্যামল থেমে যায়।

—ঠিক আছে। তবে এ নিয়ে তোমাকে নোটিশই দেব।

কেশব সিং বলে,সে দেখা যাবে।

ওদিকে বহুরূপী নবকেষ্ট এখন তার কারখানার কুশপুতুল তৈরি ছাড়াও ঠাকুর গড়ছে। তাই নিয়েই বাধে নৃপেনের সঙ্গে। আর শশীবাবু-কেশব সিং-নবকেষ্ট এবার প্রতিরোধই গড়তে চায়। ওদের হৈ চৈ-তে রজনীকুঞ্জ সরগরম হয়ে উঠেছে।

এমনি দিনে বসন্তবাবু বাড়ি থেকে চলে যাচ্ছে নিজের বাড়িতে। নরেনবাবু বলেন,

—আপনি তো মুক্তি পেলেন দাদা! যদি আকাশ ফেরে একবার দেখা করতে বলবেন। আমরা তো এখানেই পড়ে রইলাম।

বসন্ত বলে,বেশিদিন থাকতে হবে না। বিজলী তো এখন স্টেটস্-এ যাচ্ছে। এবার আপনিও বাড়ির কাজ শুরু করুন।

বিজলীও ভাবছে কথাটা। সে এখন তার অফিসের কাজ নিয়ে ব্যস্ত। তারও দেশ ছেড়ে যাবার দিন এসে গেছে।

নৃপেন বুঝেছে তারও বাড়ির পরিবেশ গরম হয়ে উঠেছে। এবার নৃপেনও কঠিন আঘাত হানতে চায়। আর তার পথও করে ফেলেছে সে। মদনবাবুর এখন খুবই নামডাক। এলাকার তিনি মুকুটহীন সম্রাট। তার প্রমোটারি ব্যবসাও ভালোই চলছে। নৃপেনও তাকে মদত দিচ্ছে।

এই রজনীকুঞ্জকে এখন বিপজ্জনক বলেই ঘোষণা করেছে কর্পোরেশন। বাড়িটা জরাজীর্ণ হয়ে গেছে। চুনী দত্তের প্রাসাদ যে কোনও দিন ভেঙে পড়বে। তাই নৃপেন তার আত্মীয়দের রাজী করিয়েছে, এখন এই বিশাল প্রাসাদ সামনের পিছনের জায়গা নিয়ে গড়ে উঠবে বিশাল হাউজিং কমপ্লেক্স। খাস

কলকাতার মধ্যে এই প্রায় দশ বিঘা জমিতে গড়ে উঠবে কমপ্লেক্স মার্কেট। এর মধ্যে পার্টিরা আসতে শুরু করেছে মদনবাবুর অফিসে।

মদনবাবুও এমন অফার ছাড়তে রাজি নয়। এর মধ্যে মদনবাবু এই রজনীকুঞ্জের দু-চারজন নিরীহ ভাড়াটেদের না হয় অন্যবাড়ি, না হয় ভালো টাকা দিয়েছেন। তারাও এই ধ্বংসপুরী থেকে প্রাণে বাঁচার জন্য অন্যত্র চলে গেছে। বাকিদেরও তোলার কথা ভাবছে মদনবাবু। মদনবাবু বলে নৃপেনকে,

—তাড়াতাড়ি করিস না। সময় নেয় ধীরে-সুস্থে কাজ করতে হবে।

বসন্তবাবুরা চলে গেছে। এদিকে বিজলীও চলে গেছে আমেরিকায়। নরেনবাবু তার স্ত্রী রয়েছে গেছেন। তারা খুশি যে বিজলী এই পরিবেশ থেকে নিজের জায়গা খুঁজে নিয়েছে। নরেনবাবু মেয়ের ফোনও পান।

কদিন ধরেই কথাটা ভাবছেন নরেনবাবু। সেদিন নৃপেন তাদের ঘরে এসে বলে,

—কাকাবাবু কর্পোরেশন এই বাড়িতে বিপজ্জনক বলে ঘোষণা করেছে এতদিন ছিলেন এবার তো চলে যেতে হবে বাড়ি ছেড়ে। আমিও চলে যাচ্ছি। যারা যাবে না, সরকার থেকে তাদের তুলে দেবার কথা ভাবছে।

নরেনবাবু বলেন,

—আমি নতুন বাড়ি খুঁজছি নৃপেন। পেলেই চলে যাব।

—তাই যান,তবে বেশি দেরি করবেন না।

কথাটা নৃপেন হুকুম দেবার ভঙ্গিতে বলেই চলে গেল। জানে নরেন নৃপেনের দলবলের খবর। এ বাড়ি থেকে এর মধ্যে ওরা ধমক দিয়ে বেশ কিছু লোকলে তাড়িয়েছে। নরেনবাবুও তাই ভাবনায় পড়ে।

এমনি দিনে ফোনটা আসে আমেরিকা থেকে। বিজলী রয়েছে সেখানে কয়েকমাস। ওদের ফার্ম বিজলীকে পাকাপাকিভাবেই ওখানে রাখতে চায়। বিজলীকেও তাই ওখানে থাকতে হবে। সেও এরমধ্যে নিজেকে ওখানের জীবনযাত্রার সঙ্গে মানিয়ে নিয়েছে। কোম্পানি থেকে তাকে কুইনস অঞ্চলে তাকে একটা দু'কামরার অ্যাপার্টমেন্ট দিয়েছে। আর এই অঞ্চলে বেশ কিছু বাঙালিও আছে। তাদের অনেকের সঙ্গে আলাপও হয়েছে বিজলীর। সেও চায় তার বাবা-মাকে এখানে আনতে। বাবা চাকরি থেকে রিটায়ারমেন্ট হয়েছে। ওখানে আর কোন কাজই নেই। ওরা পড়ে আছে ভাড়াবাড়ির নরকে।

নরেনবাবু ভাবতেই পারেনি যে তাদের সমস্যাটা এত সহজে দূর হয়ে যাবে। বিজলী বলে,

—তুমি আমাদের ট্রাভেল এজেন্টের অফিসে দেখা করো। ওদের বলা আছে ওরা তোমাদের এখানে আসার ব্যবস্থা করে দেবে। মাকে নিয়ে চলে এসো। এখানেই থাকবে নিশ্চিন্তে। সব ব্যবস্থা আমি করে দিয়েছি। পাসপোর্ট এসে এয়ার টিকিটের ব্যবস্থাও করে দেব তোমাদের। নরেন যেন মুক্তির স্বাদ পায়। আজ তাদের মেয়েই তাদের জন্য ছেলের যোগ্য কাজ করেছে। বিজলী জীবনে কিছু করতে চেয়েছিল। এই অবক্ষয়ের মধ্যেও সে হারায়নি। নরেনবাবু এবার এদেশ থেকে চলে যাবার কথা ভাবছেন।

আকাশ দেরাদুন থেকে ট্রেনিং নিয়ে ফিরছে। এবার তার পোস্টিং হবে কোনও জেলায়। মাঝে কয়েক দিনের ছুটি। এখন তাদের নতুন বাড়ি হয়ে গেছে সল্টলেকে। আকাশ তাই কলকাতায় ফিরেই ছুটে এসেছে পুরোনো বাড়িতে। বারবার মনে পড়ে বিজলীর কথা। এতদিন সে কথা সে মুখ ফুটে জানাতে পারেনি বিজলীকে। এবার কথাটাই বলবে আকাশ সেই স্বপ্ন দেখে ঘর বাঁধবে।

ভাঙা বাড়িটায় এসে আকাশ যায় নরেনবাবুর ঘরে। ওদিকে শোনা যায় শ্যালম দত্ত মদ গিলে কাউকে শাসাচ্ছে। নীচে মতিয়া অশ্রাব্য খিস্তি গালাগাল করছে। কোনওমাতাল পয়সা না দিয়ে মদ নিতে এসেছে, কেশব সিং-এর গ্যারেজ থেকে প্রবল শব্দে হাতুড়ির ঘা শোনা যায়। আজ আকাশের মনে হয় বিজলীকে সে এই নরক থেকে উদ্ধার করবে। কিন্তু এখানে শোনে বিজলীর খবর। বিজলী এদেশে নেই। সে এখন নিউইর্য়কের একটা বড় আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের উচ্চপদস্থ কর্মচারী। নরেনবাবু বলেন,

—আমরাও নিউইয়র্ক চলে যাচ্ছি এই নরক থেকে। এয়ার টিকিটও এসে গেছে। ওখানেই পাকাপাকি থাকবো।

শুনছে আকাশ। আজ তার স্বপ্ন ব্যর্থ হয়ে গেল। বাঁচার লড়াই দু'জনকে দু'দিকে করে দিয়েছে।

বের হয়ে আসে আকাশ। আজ তার অনেক কিছুই হারিয়ে গেছে। তবু বাঁচার লড়াই থামেনি। বরং সে লড়াই আর-ও বেড়েছে। নৃপেন একন ভাঙা বাড়িটকে মাঠ করে দশ বিঘে জায়গার ওপর শপিং মল-কমপ্লেক্স গড়ার স্বপ্ন দেখছে। মদনবাবু-ও এমন জায়গায় বাড়ির করার মতো লাভজনক কাজ পেয়ে এগিয়ে এসেছে সর্বশক্তি নিয়ে। কিছু ভাড়াটে এখনও রয়ে গেছে। কেশব সিং-মতিয়া-ই এখন তাদের নেতা। কেশব সিংও এই জায়গার দখল ছাড়বে না।

মদনবাবু-ও তাড়া দেয়,

—নৃপেন বাড়িটা খালি করো। ওটাকে ভেঙে মাঠ করে নতুন কাজ শুরু করতে হবে। পার্টিরা টাকা দিয়েছে আরও টাকা আসছে। কাজ শুরু না করলে সবাই টাকা ফেরত চাইবে।

নৃপেন ও ভাবছে কথাটা। বলে সে,

—ওটা তো পারি একরাতেই। তবে তুমি পুলিশ কর্তাদের একটু বলো। ওরা যেন এর মধ্যে মাথা না ঘামায়। আমি এর মধ্যে ওদের বিসর্জন দিয়ে দেব। অনেক টাকা গিলে ফেলেছে মদনবাবু। নৃপেনও ভালো টাকা পেয়েছে। তাই সে চরম ব্যবস্থাই নিতে চায়। মদনও তাতে রাজি। তাই বলে,

—ঠিক আছে আমিও কথা বলছি। তুমিও রেডি হও। সিগন্যাল পেলেই ঝাঁপিয়ে পড়বে।

নরেনবাবুদের ফ্লাইট আজ রাত বারোটায়। এতদিন এই দেশে বাস করেছে, আজ এই দেশ ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে। তাই নরেনবাবুর-ও মন ভালো নেই। চৈতালী বলে,

—শেষ বয়সে বিদেশ যেতে হবে। সেখানে কীভাবে থাকব কে জানে?

—তবু যেতেই হবে। চলো গাড়ি এসে গেছে। ওরা বের হয়ে গেল।

নৃপেন তার অনুচরদের নিয়ে তৈরি হয়ে আসছে এ বাড়ির কটা মানুষের ওপর চরম আঘাত হানতে। সেই আঘাত হানবে ওরা রাতের অন্ধকারে যাতে এরা কেউ তৈরি হতে না পারে। নৃপেনের দল অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এসেছে। এমনন কি দরজা ভাঙার জন্য হাতুড়ি শাবলও।

কেশব সিং এ-সবের কিছুই জানে না। রাতে সে গ্যারেজে হিসাব করছে। মতিয়ার দোকানে দু-চার জন খদ্দের আসে মদের সন্ধানে। নবকেষ্ট, শশী বাবুরাও নিশ্চিন্তে রয়েছে। হঠাৎ রাতের অন্ধকারে নৃপেনের দল ঢুকেই পরপর কয়েকটা বোমা বাজি করে কেশব সিং-এর গ্যারাজের উপর। তাবা এসে ছুরি রিভলভার দেখিয়ে কেশব সিংকেই কব্জা করেছে। আর মতিয়াকেও। ওদিকে বাড়িতে এবার আর্তনাদ কলরব উঠে। নৃপেন বলে ওর লোকদের, —চালা বোমা। গুঁড়িয়ে রজনীকুঞ্জ।

বোমার পরপর আঘাতে পুরোনো ওই বাড়িটা ভেঙে পড়ে। নৃপেন গজরায়, মাঠ করে দে। কোনও শালা যেন ঢুকতে না পারে। বিকট গর্জনে বোমা ফাটছে। চুনী দত্ত একদিন অনেক আশা আর স্বপ্ন নিয়ে এই প্রাসাদ গড়েছিল। তার উত্তর পুরুষই আজ নিশ্চিহ্ন করে দিল তার স্বপ্নকে।

বিকট গর্জন করে বোয়িং প্লেনটা রানওয়ে ছেড়ে উপরে উঠে গেল। জানলার বাইরে চেয়ে দেখেন নরেনবাবু। কলকাতার আলোকিত পথঘাট। প্লেনটা কলকাতা ছেড়ে উড়ে চলেছে।

পূর্ণ অপূর্ণ

কলকাতার আলো ঝলমল পরিবেশ, কর্মব্যস্ততা আর কলরবমুখর পরিবেশ থেকে এমনি অজ পাড়াগাঁয়ে এসে মনে হয়েছিল পরমেশের তার অবস্থাটা যেন জল ছাড়া মাছের মতোই। তেমনি ছটপটানি জাগে, মনে হয় এবার মানুষের জগৎ থেকে সে সত্যিকার নির্বাসিতই হয়েছে। বার বার মনে পড়ে কলকাতার ভবানীপুর অঞ্চলের সেই ছোট্ট বাড়িটার কথা, লেকের ঘন সবুজ পরিবেশে কাটা কত সূর্য চলা বৈকাল। সে আর মণিকা দুজনে সুজাতা লেকের পাশে ছায়া ঢাকা পথে, সন্ধ্যা নামত।

কোনও দিন ছুটি পেলে মণিকা আর সে বের হতো দীঘাগামী বাসে। ঝাউবন, সমুদ্র একদিকে মাটির স্পর্শ, ছোট্ট কটেজে সন্ধ্যা নামত, লোডশেডিং-এর রাতে মোমের আলোয় দুজনে স্বপ্ন দেখত ঘর বাঁধার স্বপ্ন। মণিকার বাবার মত নেই। মণিকা তখন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী, আর পরমেশ এমএ, বিএড করে। সেবারই টালিগঞ্জের একটা স্কুলে চাকরি পেয়েছে। পরমেশ বলে দুজনে লড়াই করে নিজেদের ভবিষ্যৎ গড়ে নেব। পিএইচডি টা করতে পারলে কোনও কলেজে কাজ পাবো, তুমিও এম এটা করে নিলে কোথাও সুযোগ পাবে।

মণিকাও স্বপ্ন দেখে, তারা দুজনে ঘর বেঁধেছে। দুজনের পরিশ্রমে তারা সুখী হয়েছে। কিন্তু মণিকার বাবা-মা রাজি নন। মণিকার রূপ-গুণের অভাব নেই। সুন্দরীই বলা যায়, ফর্সা রং, ডাগর দুটো চোখ, নাকমুখও ধারালো, আর তার হাসিটাও বেশ মিষ্টি। পড়াশোনাতেও ভালো, মণিকাও দেখছে তার পিছনে ইউনির্ভাসিটির ছাত্র আর তরুণ অধ্যাপকরা একটু বিশেষ মনোযোগ দিতে ব্যস্ত।

বিশেষ করে অর্ক রায় তো তাকে তার গাড়িতে লিফট্ দেবার জন্য তৈরি। অর্ক থাকে হরিশ মুখার্জি রোডে। বনেদী পরিবারের ছেলে, ইলেকট্রনিক্স-এর ছাত্র। বাড়িতে কয়েকখানা গাড়ি, এখানকার নামী পরিবার।

সেদিন মণিকার মাও দেখেছে রায়বাড়ির ছেলেটা মনিকাকে এসে নামিয়ে দিয়ে গেল। ছেলেটা দেখতেও সুন্দর।

মা ভেবেছিল বোধহয় অর্কের কথাই বলছে মেয়ে। ইদানীং মনিকা হুটহাট বের হয়ে যায়, পরীক্ষা শেষ হবার পরও সাহসও যেন বেড়েছে, আর কদিন পর মাকে বলে পরমেশকে বিয়ে করছি মা।

—ওই গাড়ি নিয়ে আসে ওই রায় বাড়ির ছেলেটি।

মা মনে মনে খুশিই হয়। তাদের সাধ্য নেই এতবড় ঘরে মেয়েকে দেবার, মেয়ে যদি নিজে ব্যবস্থা করতে পারে তার অমত হবে না। মণিকার বাবাও মত দেবে। কিন্তু গোল বাঁধায় মণিকাই, ও কেন হবে? ও তো অর্ক।

—তবে?

—পরমেশকে দেখেছ মাঝে মাঝে আসে। এখন শিক্ষকতা করছে। বাবাই ফুঁসে ওঠে—না। একটা মাস্টার তায় অন্য জাত, সেখানে বিয়ে হবেনা।

মাও রাজি নয়। কিন্তু মণিকা তখন নিজের চেষ্টায় একটা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে কাজ করছে। সে বলে আমি ওকে কথা দিয়েছি মা। মা গর্জে ওঠে— নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মারবি?

তবু মণিকা মা বাবার নিষেধ অগ্রাহ্য করেই এসেছিল পরমেশের ঘরে। দুজনে কালীঘাটের ওদিকে একটা দুঘরের বাসাও বেঁধেছিল। পরমেশ বলে তুমি যে আমার জন্য পিছনের সব পরিচয় মুছে চলে আসবে তা স্বপ্নেও ভাবিনি জানো।

মণিকা পরমেশের কপালে পড়া এলোমেলো চুলগুলোতে হাত বোলাতে বোলাতে বলে মেয়েরা ভালোবাসার জন্য সব কিছু করতে পারে মশাই।

—চা দিব গো মাস্টার বাবু?

চমকে ওঠে পরমেশ, কঠিন বাস্তবে ফিরে আসে পরমেশ। চাইল মেয়েটার দিকে। কলকাতার সেই স্বপ্নের জগতটা মন থেকে মুছে যায়। বারান্দায় বসে আছে। সামনে কাল কপিকা প্রান্তর কাছিমের পিঠের মতো নেমে গেছে, তারপর অন্যদিকে কিছু শস্যহীন ক্ষেত, আর নীচে একটা জলশূন্য নদীধার। ওদিকে উঠে গেছে দিগন্ত প্রসারী বন। আগে নাকি ভরাট ছিল ঘন সবুজ হলুদ শালবনে ঢাকা, বাতাসে উঠত শাল মঞ্জরীর সুবাস, এখন সব শালকে উৎখাত করে গড়া হয়েছে ইউক্যালিপটাসের বন, তবু ওই দিকটায় কিছু শালবান এখনও আছে, মহুয়া ফোটে এইসময়।

হলুদ ফুলগুলো সন্ধ্যার অন্ধকারে চোখ মেলে, দেখে বিচিত্র রঙিন আকাশ, আর রাতের তারা নেভার সাথে সাথেই তারা বাতাসে ব্যাকুল সুরভির কান্নার রেশ চোখে ঝরে পড়ে। একরাতের পরমায়ু এদের।এক রাতেই শেষ, আবার আসে অস্র ঝুড়ি—তাও এক রাতের জন্যই।

কিছুদিন হল এসেছে পরমেশ কলকাতা থেকে এই পিয়ালবনীতে। স্টেশন থেকে বাসে ঘণ্টাখানেক এসে শালবনের মাঝে একটা স্টপেজ। গ্রামের থেকে একটু দূরে বনের শুরু এখানে, সেখানে কয়েকটা চা-পান বিড়ির দোকান, এই বনকাটির মোড়ে কয়েকখানা সাইকেল রিক্সা থাকে, ওতেই চলে বনের মধ্য দিয়ে মোরাম ঢালা পথ দিয়ে প্রায় ছ-সাত কিলোমিটার এসে তবে নাগাল পাওয়া যাবে এই পিয়ালবনীর, এখানেই এই রাস্তাটা থেমে গেছে, এরপর সরু হয়েছে মাঠ — মাঝে মাঝে দু-চারটে গ্রাম।

পিয়ালবনীর খবর পরমেশ তার বন্ধু যোগেশের মুখেই শুনেছিল, এখানের হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলে কি খেয়াল বশেই দরখাস্তটা করেছিল, কারণ পরমেশ কলকাতার এই জীবন, সভ্যজগতের হৃদয়হীন মানুষ গুলোর কাছ থেকে দূরে এক অজানা পরিবেশেই চলে আসতে চেয়েছিল।

দিনের আলো মুছে আসছে, একটা বাতি জ্বালিয়ে দেয় লবঙ্গ, বারান্দায় বসে আছে, এদিকে স্কুলবিল্ডিংটা অন্ধকারে একটা বিশাল টিবির মতো দেখাচ্ছে, ওপাশে বোর্ডিং-এর টানা ব্যারাকমত ঘরগুলোয় বাতি জ্বলছে, ছেলেদের কথার শব্দ, কারও চিৎকার, জোরালো হাসির শব্দ ওঠে মাঝে মাঝে। আবার স্তব্ধ এই সমাগত অন্ধকারকে যেন মোচন করার জন্য মাঝে মাঝে দু'একটা শিয়ালের ডাকও শোনা যায় বনের দিক থেকে।

লবঙ্গ বলে কাল হাটবার গো, ট্যাকা দিও। ইতো শহর কলকাতা নয় যে হাত বাড়ালেই সব পাব, কাল তিনদিনের হাট করে দিব। সোম আর শুক্রবার জগন্নাথপুরের হাট, তবে গাঁয়ে লটকোনার দুকান আছে। তেল ঝাল মশলা পাবো। আজ রাতে রুটি আর আলুর দম করে দিই ঘরকে যাব।

মেয়েটা বকেও কলকল করে, তবে খুব কামের।

ও না থাকলে কাঠের পা নিয়ে পরমেশের বোধ হয় না খেয়েই থাকতে হতো। বোর্ডিং-এর খাবার দু-চার দিন খেতে হয়েছিল বাধ্য হয়ে। কিন্তু রাতের বেলায় ক্র্যাচ নিয়ে ওই পাথুরে টিলা ভেঙে যাতায়াত করাও কষ্টকর। আর ওদের রান্নাও পরমেশের পক্ষে হজম করা কষ্টকর। যা ঝাল।

শেষ অবধি গ্রামের শিক্ষক অধরবাবুই লবঙ্গকে ঠিক করে দেন। পরমেশ এখানের নবাগত, হেডমাস্টার মশাইও ওকে সত্যিই এই অজ গ্রামের স্কুলে কলকাতা থেকে আসতে দেখে অবাক হন, কৃতি ছাত্র শহরের স্কুলেই সে চাকরি পেতে পারে। তবু পরমেশ এখানে এসেছে।

পরমেশই বলে, দেখছেন তো একটা পা অ্যাকসিডেন্টে গেছে, শহরে চলাফেরার সমস্যা তাই এখানেই এলাম।

অধরবাবুর বাড়ি পিয়ালবনীতেই, বেশ সঙ্গতিপন্ন পরিবার, এককালে জমিদারই ছিলেন ওর পিতৃপুরুষ, এখন সব গিয়েও অনেক জমি, পুকুর, এই স্কুলের পিছনে বিরাট আমবাগান রয়ে গেছে, ওর পিতামহ বাগানে একটা বাংলোবাড়ি বানিয়েছিল, এখনও তারা সেটাকে বজায় রেখেছেন, পরমেশ বলে একটা আস্তানা যদি পেতাম স্কুলের কাছাকাছি —

অধরবাবুই বলেন ওই বাংলোতেই থাকতে পারবেন, গাঁয়ের বাইরে অসুবিধা হবে, পরমেশও দেখেছে বাংলোটা। বেশ নিরিবিলি, একটা কুয়োও আছে, ওদিকে ডোম লোহারদের বাস, তারাই জল নিয়ে যায় ওখান থেকে, পরমেশ এমনি নিঃসঙ্গ নির্জনতাই চায়, সে বলে না না, কোনও অসুবিধা হবে না, তা ভাড়া কত দিতে হবে মাসে?

অধরবাবুর বাড়িতে বসেই কথা হচ্ছে।

পরমেশ কদিন স্কুলে বোর্ডিং-এর একটা ঘরে রয়েছে, মেজেটা ফাটা, দরজা-জানলাগুলোর পাল্লাও ঠিকমত বন্ধ হয় না, টিনের চাল, দুঃসহ গরম, ছেলেরা এতে অভ্যস্ত, কিন্তু পরমেশের কষ্ট হয়, এটা যদিও মানিয়ে নিতে পারে ছেলেদের কলরব, চিৎকারটা কানে বাজে, তাই অন্যত্র থাকাটা ভালো। অধরবাবু এবার বলেন — এ কলকাতা নয় পরমেশবাবু, যে ভাড়াটে-বাড়িওয়ালা সম্পর্কটা হবে, বাড়িটা পড়ে আছে আপনি থাকলে সরা বরা হবে, তাই আমার স্বার্থও রয়েছে, ভাড়ার কথা কেন উঠছে, ওখানেই থাকবেন, তবে কাজকর্ম করার লোক একজন চাই।

পরমেশও ভাবে কথাটা, অধরবাবু বলেন আপনার জাতপাতের ব্যাপার নেই তো?

পরমেশের জবাব বালাই নাই, কোথায় তার মনের অতলে একটা নীচের ব্যর্থতার জ্বালাই গুমরে ওঠে, বলে পরমেশ।

আমি মাত্র দুটো জাত বিশ্বাস করি অধরবাবু, হ্যাভস্ এন্ড হ্যাভনটস্। গরিব আর বড়লোক, আর কোনও জাতই মানি না।

পরমেশ ওই বাগানের মধ্যে বাড়িটায় এসেছে, সকাল বিকাল স্কুলের কাজ সেরে ক্র্যাচ নিয়ে ওই বাগানের আসেপাশেই ঘোরে, বোর্ডিং এর দিকে যায়, দেখেছে ওই কুয়ো থেকে জল তুলে নিয়ে যায় পাশের লোহার, ডোম পাড়ার মেয়েরা। ছেলেরা মাঠে গরু চরায়, গুলি-ডান্ডা খেলে, ওদের মাঝে একটা মেয়েকে দেখেছে, বুড়ি-মা বোধহয় তাকে নিয়ে গ্রামের দিকে যায় ঝুড়িতে ক্ষেতের সামান্য আনাজপত্র। মেয়েটার যৌবনদৃপ্ত চেহারা নিটোল স্বাস্থ্য সহজেই মানুষের চোখে পড়ে।

গ্রামের মুখেই গ্রামের আটচালা ওখানেই একটা খড়ের ঘরে পোস্টাপিস, ওদিকে দু'একটা চায়ের দোকান, খুদুরামের ছোট মুদিখানা. ওখানেই গ্রামের সার্বজনীন দুর্গাপূজাও হয়, পুরোনো কাঠামোটা ওদিকে রাখা, কয়েকটা বকুল, পাকুড় গাছও রয়েছে, ওরই নীচে কয়েকজন সকালে আনাজপত্র নিয়ে বসে, মটরের দোকানে সকাল বিকাল গরম তেলে ভাজাও বিক্রি হয়।

ওখানেই দেখেছিল মেয়েটাকে আনাজ বেচতে। একটা ছেলে কী বলছে, পরমেশ দেখেছিল মেয়েটা উঠে সপাটে ছেলেটার গালে একটা চড় কসে গজরায় ঘরে তুর মা-বুন নাই।

মেয়েটার তেজদৃপ্ত ভঙ্গি দেখে ছেলেটাও সরে পড়েছিল।

সেদিন পরমেশ ঘরে বসে পড়ছে 'স্কুলের ছুটি' অধরবাবুকে আসতে দেখে বলল,আসুন, আসুন।

অধরবাবুর পিছনে সেই মেয়েটা কালো তবে খুব কালো নয়, শ্যামবর্ণা, ডাগর চোখ। মেয়েটা জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অধরবাবু বলে, আয় ভিতরে আয়, লবঙ্গ। মেয়েটা এসে কি ভেবে প্রণাম করে, ওদের দুজনকেই। সেই প্রণাম ভক্তিভয়, সম্ভ্রম সবই মেশানো। পরমেশ দেখছে, এখন সেদিনের দেখা সেই রণচণ্ডী নয়, তবে যে-কোনও মুহূর্তে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার বিদ্রোহ ঘোষণা করতে পারে।

অধরবাবু বলেন পরমেশবাবু এই লবঙ্গ, এই লোহার পাড়ায় এদের বাড়ি, বুড়িমা আর ও, লবঙ্গই আপনার কাজ করে দেবে। কিরে রান্না করতে পারবি তো?

লবঙ্গ বলে আপনি আমার হাতে খাবেন গো নতুন ম্যাস্টার? আমি তো লোহার ব্যাটি।

পরমেশ হেসে ওঠে। জানে না কলকাতায় কে কোন জাতের ঠাকুর, কে রান্না করছে তা কেউ দেখেনা। পরমেশ বলে।

—তুই রাঁধতে পারলে আমি কেন খেতে পারবো না রে?

লুকে যদি কিছু বলে? লবঙ্গের সন্দেহ যায় না। পরমেশ বলে — লোকের কথা ছাড় তো। এই

যে খোঁড়া মানুষ আমি, কাঠের পা নিয়ে রাঁধা যায় বল? উঠ-বোস করা যায় না, জাত মেনে উপোস দে মরলে কেউ দেখবে? তাই ওসব মেনে মরার চেয়ে না মেনে বাঁচাটাই বড় কথা, পারবি তো।

লবঙ্গ দেখছে অসহায় অর্ধপঙ্গু মানুষটাকে। আপনজনদের ছেড়ে এই দূরে পড়ে আছে। দেখভাল করারও কেউ নাই। লবঙ্গ জানে জীবন সংগ্রাম কত কঠিন। সে এমনি অসহায়, নিঃসঙ্গ, লড়াই করে কোনওমতে মা মেয়েতে বেঁচে আছে। জাত, সমাজ তাকে কিছু দেয়নি। তবু মান্যি করতে হবে সমাজকে। লবঙ্গ বলে—

তাহলে রেঁধে দিব। সব কাজও করে দিব। ঘরখানকে তো বাবুই পাখির বাসা করে রেখেছেন গো। বাইরে বাগান সাফ করি ঝাঁটা কোতায়?

পরমেশ বলে মাইনে কত নিবি বল?

লবঙ্গ ততক্ষণে ঝাঁটার সন্ধানে ব্যস্ত। বলে যা হয় দেবেন? অধরবাবু বলেন,ঠিক আছে, বাইরে গাছতলাতে চেয়ার দুটো বের করে দিয়ে আগে দু-কাপ চা কর। দেখি চা করতে পারিস কিনা। তারপর ওসব শুরু করবে।

সেই থেকেই লবঙ্গ রয়ে গেছে এইখানে।

কোনও কোনও দিন ওর মা এসে কাজ করে সকালে, লবঙ্গ আনাজপত্র বেচেও কিছু রোজগার করে।

তবু রান্নার সময় এসে পড়ে। ছিমছাম মেয়েটি; ক্ষারে কাচা কাপড় পরে সব সময় ফিটফাট থাকে, বুড়ি সেদিন সকালে কাজে এসেছে। লবঙ্গ গেছে পাশের গাঁ জগন্নাথপুরের হাটে।

পরমেশও বুড়ির কথা ভাবে। লবঙ্গকে খাবার দেয় দুবেলা বেশি করেই নিয়ে যেতে বলে, মাকেও দিবি। মাসে একশো টাকা মাইনে দিতে লবঙ্গ একটু অবাক হয়। একশো টাকা?

পরমেশ জানে কলকাতায় এর থেকে অনেক বেশিই দিতে হতো তাকে।

তাই বলে আর কি দিতে হবে বল?

লবঙ্গ বলে আর কেনে দিবা গ? দুজনের দুবেলা খোরাকী দেছ তারপর একশো টাকা আর চাইলে যে অধম্ম হবে গ! এই ঢের।

পরমেশ এদের ধর্ম বোধের নমুনা দেখে অবাক হয়।

বুড়ি সেদিন সকালে এসে চা করে দেয় পরমেশকে, ক্ষেতের একটা লাউ এনেছে পরমেশকে বলে, ইবার বৌমাকে আনো গ ছেলে। তা বিয়ে-টিয়ে করেছ তো?

চমকে ওঠে পরমেশ, বুড়ি তাকে ছেলে বলেই ডাকে। পরমেশের মাকে মনে পড়ে না, মা-বাবা-ভাই-বোন —কেউ তার নেই। বাবা-মায়ের এক সন্তান, তারা চলে যেতেই পরমেশও এত বড় পৃথিবীতে একা। তাই মণিকাকে নিয়েই বাঁচতে চেয়েছিল, তার জীবনের সব শূন্যতাকে পূর্ণ করতে চেয়েছিল, কিন্তু সব তার মিথ্যা হয়ে গেছে। পরমেশ সেই ভয়ঙ্কর অপমানের কথাটা জানাতেও পারে না, বলে মলিন হাসি ফুটিয়ে—এই কাঠের পাওয়ালা লোককে কে বিয়ে করবে বলো মাসি?

বুড়ি বলে হেই মা গ? সোনার আংটি আবার বাঁকা কিগা? এত পণ্ডিত, কত কুড়ি কুড়ি ট্যাকা মাইনে পাও মেয়ের আবার অভাব? বিয়ে-থা করো।

হাসে পরমেশ বিয়ে, তারপর বৌ কেমন হবে কে জানে? যদি না দেখে? বুড়ি এবার ভাবনায় পড়ে। তার অন্তরের সুপ্ত বেদনাময় জায়গাটাকেই যেন স্পর্শ করেছে গো, কাউকে বিশ্বাস করার যো নাই। আমার বড়াতে এ তাই হলো গ।

পরমেশ শুধোয়,তোমার আবার কী হলো?

বুড়ি বলে ,ওই লবঙ্গের কথা বলছি। গরিব মানুষ তবু বিত্তি বিচে জমি ঘুচিয়ে বিয়ে দেলাম মেয়েটার পলাশডাঙায় ভালো খাটিয়ে ছেলে তা শ্বশুরঘর গেল মেয়ে, ওমা কিছুদিন পর ছোঁড়া ঘর ছেড়ে বাপের সঙ্গে ঝগড়া করে কোতায় নিরুদ্দেশ হয়ে গেল, আর ফিরল না। পাত্তাই নাই।

সেকি! পরমেশ জানত না হাসিখুশি বেপরোয়া মেয়েটার জীবনের এই করুণ কাহিনী। লবঙ্গ যেন

হাসি দিয়েই, সেবা দিয়েই তার নিজের জীবনের চরম ব্যর্থতাকে ভুলতে চায়। বুড়ি বলে বেদনা ভরা কণ্ঠে।

শ্বশুর আর রাখল নি লবঙ্গকে। বলে অপয়াঅলুক্ষুণে মেয়ে, তোর জন্যেই ছেলে চলে গেল। তুই দূর হে।

কেঁদে এসে পড়ল মেয়ে সব খুইয়ে। গাছকে তো ফল ভাবি লাগে না, কি করব মেয়েকে কাছে রাখলাম, ভাতারের ভাত তো জুটলো না, গতর খাটিয়ে, ভাত জোটাতে হচ্ছে, এ ওর পোড়া বরাত। তাই বলি মানুষকে ইখন ভরসা করা যায় না। তবু বাঁচতে তো হবেক।

লবঙ্গ কখন এসে পড়েছিল এটা খেয়াল করিনি। হাট ফেরত আনাজের থলেটা রেখে শাড়ির আঁচল দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে বলে সে মাকে সেই পচা পাঁচালী গাইতে শুরু করলি মা? আর কুন কাজ নাই। ম্যাস্টার মায়ের উসব পেঁদো কথা ছাড়ান দাও তো! লবঙ্গ এবার উনুন ধরাতে শুরু করে, ওসব বেদনাময় স্মৃতি যেন তাকে স্পর্শই করে না। একজন পুরুষ তাকে ছেড়ে চলে গেছে যাক। সে নিজের জনকে সেই পরাজয়ের বেদনায় অন্ধকার করে দিতে চায় না।

কিন্তু পরমেশের কাছে সেই বেদনাটা একটা গভীর ক্ষতের সৃষ্টিই করেছে, বাইরে থেকে তা দেখা যায় না, কিন্তু তার অস্তিত্বটা অহরহ মনকে ব্যথিত করে তোলে, জীবন যুদ্ধে সে আজ পরাজিত সৈনিক, লবঙ্গের মতো মনের জোর তার নেই, দেখছে পরমেশ বোধহয় এই মুক্ত উদার প্রকৃতি, তাদের মনেও সহনশীলতা এসেছে যা তার মতো ইটকাঠ কংক্রিটে গড়া ক্ষতবিক্ষত মানুষের মনে নাই।

মণিকাকে নিয়ে ঘর বেঁধেছিল সে অনেক স্বপ্নই দেখেছিল, কিন্তু মণিকার স্বপ্নের ঘোর ক্রমশ ফিকে হয়ে আসে। কলকাতার সমাজ মানুষকে শান্তি দিতে পারে না, যা দেয় তা অশান্ত আর অপূর্ণতাই, মণিকা এমএতে ফার্স্টক্লাস পেয়েছে এখন সে রিসার্চ করতে চায়। তাই ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের চাকরিটা ছেড়ে দেয়। পরমেশ এতদিন দুজনের রোজগারের মধ্যে ঠাটবাট বাড়িয়ে ফেলেছে, ফ্রিজ, কালার টিভি, ফোন এসবের খরচ তো আছেই, বাড়িটাও বদলেছে, দেড়হাজার টাকা ভাড়া দিতেই চলে যায়। কিন্তু মণিকার রোজগার বন্ধ হতে এবার চমকে ওঠে সে, এটা কি করলে? চাকরি করেও রিসার্চ করা যেত, স্কুল তো সকালে, এতগুলো টাকা আসছিল।

মণিকা দেখেছে এতদিন ধরে পরমেশ তার টাকা নিয়েছে, সে মুখে কিছু না বল্লেও মনে মনে এটাকে আদৌ পছন্দ করেনি, মণিকা এর মধ্যে অর্ককেও দেখেছে, সে এম.এস.সি করে রিসার্চ করছে, দু'একদিন দুজন ইউনিভার্সিটি থেকে বের হয়ে কোনও রিসর্টে গেছে, সবুজ ফুল ফোটা এক প্রাচুর্যের জগতের ইঙ্গিতই দিয়েছে অর্ক তাকে। অর্ক বলে,আমেরিকায় কলম্বিয়া ইউনিভাসিটিতে রিসার্চ স্কলার হয়ে যাচ্ছে, এদেশে থাকলে কিছু হবে না, তুমিও তো চেষ্টা করতে পারো মণিকা ও দেশের কোনও ইউনিভাসিটিতে নিশ্চয়ই চান্স পাবে।

মণিকা স্বপ্ন দেখেছে,সে আমেরিকায় গেছে, নতুন জগতে গিয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে, কিন্তু এ যেন তার কাছে দুঃস্বপ্নই, হতাশা ভরা কণ্ঠে বলে মণিকা—আমি! বামন হয়ে চাঁদ ধরতে পারা যায় না অর্ক। সেখানে চেনাজানা কেউ নেই।

অর্ক বলে,তুমি দরখাস্ত করো, আমি ওখানে পাঠাবার ব্যবস্থা করব। কাকাবাবু ওখানে সাইকিউজ ইউনিভাসিটিতে আছেন, দুবছরের জন্য স্কলারশিপ পেতে পারো।

মণিকার মন খুশিতে ভরে ওঠে। তবু এক দ্বিধাবোধ হয় তার, ঘরসংসার ফেলে এতদিন বাইরে থাকতে হবে। হাসে অর্ক, এসব পিছুটান নিয়েই বাঙালি জাতটা শেষ হয়ে যাবে মণিকা, তোমাদের রবীন্দ্রনাথই বলেছেন,

"দেশ দেশান্তর মাঝে যার যেথা স্থান
খুঁজিয়া জগতে দাও করিয়া সন্ধান।"

নিজের ভাগ্য নিজেকেই গড়ে নিতে হবে মণিকা, তাই দেশান্তরে যেতে হয় যাবে সব পিছুটান কাটিয়ে।

আর সংসার, ওই পরমেশবাবু! সামান্য একজন স্কুলমাস্টারকে নিয়েই কলকাতার এঁদো গলিতে জীবনটাকে শেষ করে দেবে? ননসেন্স।

অর্কের কথাগুলো মণিকার মনের অতলে কি ঝড় আনে, আজ মনে হয় তাকে সব বাঁধন ছিঁড়ে এগিয়েই যেতে হবে, পরমেশের ওই টাকার লোভের কথাটা আজ তার মনে বড় হয়ে ওঠে। এই সংকীর্ণমনা স্বার্থপর পরমেশকে আজ মেনে নিতে পারে না সে, তার জন্য ওই বৃহত্তর জগতে এক সম্ভাবনাময় জীবনকে অস্বীকার করবে না সে।

ক'দিনেই অর্কের কাছে অনেক সহযোগিতাই পায় সে, অর্কের চেষ্টাতেই আমেরিকার ওই ইউনিভার্সিটি থেকে তার নিয়োগপত্রও আসে; পাসপোর্ট, ভিসার চেষ্টাও করছে।

পরমেশ দেখছে মণিকা যেন বদলে গেছে, আগেকার সেই উচ্ছ্বলতা আর নেই। সব সময়ই ব্যস্ত, যখন তখন বের হয়ে যায়, ফেরারও ঠিক নেই, পরমেশ কিছু বললে মণিকা বলে কাজ পড়েছে তাই, ব্যস্ত। কি কাজ! পরমেশ যেন সব কিছু জানতে চায়, মণিকা বলে সব কৈফিয়ত দিতে হবে? আমার কি ব্যক্তি-স্বাধীনতা বলে কিছু নেই? পরমেশ চুপ করে যায়। এই মণিকাকে যেন চেনে না সে, দুজনের মধ্যে একটা অদৃশ্য পাঁচিল গড়ে ওঠে। মণিকার মন থেকে সরে যাচ্ছে পরমেশ, আর সেই শূন্যস্থানে এসেছে অর্ক। আজ অর্ককেই বেশি দরকার মণিকার, তাকেই সবচেয়ে বেশি নির্ভর করতে শুরু করেছে সে।

এমনি একদিন হঠাৎ দুর্ঘটনা ঘটে যায়, পরমেশ সেদিন বাড়ি থেকে বের হবার আগে তুচ্ছ একটা কারণেই মণিকার সঙ্গে বেশ কথা কাটাকাটিই করে ফেলে, মণিকাও বলে— এতই যদি অবিশ্বাস তবে আমার সঙ্গে রয়েছ কেন? দুজনে দুদিকে সরে গেলেই শান্তি।

চমকে ওঠে পরমেশ, একি বলছ মণি!

মণিকা রুষ্টকণ্ঠে বলে রোজ রোজ এসব আমার কাছেও বিরক্তিকর হয়ে উঠছে, তাই একথা বলতে বাধ্য হচ্ছি।

পরমেশ বের হয়ে যায়, স্কুলেও কাজে মন দিতে পারে না, কোনওমতে ক্লাস সেরে ফিরছে, তখন রাস্তায় বৈকালের গাড়ি ঘোড়া, মানুষজনের ভিড় শুরু হয়েছে, কর্মব্যস্ত রাস্তা, ট্রামে করে রাসবিহারীর মোড়ে এসে একটু টিউশানি সেরে ফিরবে, পরমেশ চলন্ত ট্রামটাতে উঠতে যাবে হাতটা ফসকে যায়, ধাবমান ট্রাম থেকে ছিটকে পড়ে, একটা তীব্র বেদনা, কোলাহল তারপর আর তার কিছু মনে নেই।

জ্ঞান ফেরে হাসপাতালে, মণিকা, স্কুলের দুচারজন ছাত্রও হাসপাতালে রোজ যাতায়াত করে, খবর নেয়, মণিকা দু-একদিন এসে তারপর আর আসেনি, ছেলেরাই স্যারের খোঁজখবর নেয়। পরমেশের মনে হয় মণিকা বোধ হয় অসুস্থ, ভাবনাও হয়, কিন্তু খবরও পায় না, একটা পা-ই চলে গেছে পরমেশের ওই দুর্ঘটনায়।

মাস দুয়েক কেটে গেছে, হাসপাতাল থেকে ক্রাচ নিয়ে কোনওমতে বাসায় ফেরে পরমেশ দুরু দুরু বুকে। মণিকার খবর পায়নি বেশ কিছু দিন, কোনও বিপদ হয়নি তার, আজ সে অসহায়, তার নির্ভর ওই মণিকাই।

বাসায় ফিরে আসতে এবার দেখে বন্ধ ঘর, বেশ কিছুদিন বন্ধই রয়েছে, বাড়িওলা এসে তালা খুলে দিতে পরমেশ ঢোকে, বেশ কিছুদিন বন্ধ রয়েছে ঘরটা। পরমেশ শুধায়—মণিকা?

বাড়িওয়ালা একটা চিঠি তুলে দেয় ওর হাতে, কম্পিত হস্তে চিঠিখানা খুলে পড়তে থাকে পরমেশ, বিশ্বাসই করতে পারে না, মণিকা তার সঙ্গে এমনি ব্যবহার করবে তা স্বপ্নেও ভাবেনি, পরমেশের চরম দুর্দিনে মণিকা তাকে ফেলে চলে গেছে আমেরিকার কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ে রিসার্চ করতে, আরও জানিয়ে গেছে,পঙ্গু একটা লোককে সারাজীবন মেনে নিতে পারবে না, তাই সব সম্পর্ক ত্যাগ করেই চলে গেলাম।

বাড়িওয়ালা বলে সেই অর্কবাবু আসতেন, তিনিও চলে গেছেন আমেরিকায়।

পরমেশের আর মণিকার সম্বন্ধে কোনও আগ্রহই নাই। তার দোষ কি? মানুষ তো অনেক কিছু

পেতে চায়, তার পিছনে ছোটাই স্বাভাবিক , তাই এই বাতিল মানুষটাকে ফেলে চলে গেছে মণিকা। সভ্য শিক্ষিত সমাজে ভালোবাসার বন্ধন, কর্তব্যের প্রতি নিষ্ঠা এসব চরম দুর্বলতার লক্ষণ, মণিকা দুর্বলতাকে জয় করেছে।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে কখন খেয়াল করেনি পরমেশ,বাইরে এসে চেয়ে থাকে, দূরে শালবন সীমার মাথায় দু'চারটে তারা ফুটে ওঠেছে, প্রান্তরে নামে শূন্যতা। পিছনের বাগানে আঁধার নেমেছে। এগিয়ে চলেছে সে, হঠাৎ আবছা অন্ধকারে দেখে একটা আমগাছের নীচে লবঙ্গ,পাশে একটি তরুণ।

লবঙ্গ বলে— চাপাস্বরে, চলে যাও চলে যাও তুমি, কেউ দেখলে বিপদ হবেক। ছেলেটি কি বলতে চায় ব্যাকুলভাবে, তার চোখমুখে কি উত্তেজনা। লবঙ্গের হাতটা ধরে বলে শোন, —শোনার কিছুই নাই, চলে যাও।

পরমেশবাবুর মনের ভিতর একটা অবিশ্বাসের ছোঁয়াই লাগে। মণিকা চলে যাবার পর মেয়েদের আর বিশ্বাস করে না। লবঙ্গকে ভেবেছিল জীবন যুদ্ধের লড়াকু একটি মেয়ে, কিন্তু আজ এই অন্ধকারে পরমেশ দেখেছে লবঙ্গও চিরস্বৈরিণীদেরই একজন, গোপনে তার অভিসার চলেছে। আর বাইরে সেই ঘৃণ্য স্বভাবটাকে চাপা দেবার জন্যই ওই রুদ্রমূর্তি ধরার ভান করে।

পরমেশ সরে এল, তখনও লবঙ্গ আর সেই ছেলেটি অন্ধকারে ঘনিষ্ঠ হয়ে কী বলাবলি করছে। মনে হলো লবঙ্গ এবার যেন কাঁদছে, তাকে কাছে টেনে নিয়ে সান্ত্বনা দিচ্ছে ছেলেটি ঘনিষ্ঠ ভাবেই।

পরমেশ এবার ভাবনায় পড়ে। এখানে পরদেশী সে, এই লবঙ্গ যা শুরু করেছে এরপর একটা গোলমাল কিছু হলে তার দায় ভার এসে পড়বে পরমেশের ওপর। তাই দরকার হলে লবঙ্গকেই বিদায় করতে হবে, অবশ্য আবার কাকে পাবে জানে না, সেই বোর্ডিং-এই খেতে হবে তাকে, তবু নিশ্চিন্ত থাকবে পরমেশ।

রাত নেমেছে, এর মধ্যে দেখে পরমেশ লবঙ্গ কোন ফাঁকে বাগান থেকে ফিরে রান্নার কাজে লেগেছে। মুখে একটা খুশির ভাব পরমেশের নজর এড়ায় না। স্বৈরিণী মেয়েটা গোপন অভিসার সেরে খুশি হয়ে ফিরেছে।

শোন, পরমেশের ডাকে চাইল লবঙ্গ। পরমেশ শুধায়, ছেলেটা কে? চমকে ওঠে লবঙ্গ, উনুনের আঁচের লালাভ আভা লেগেছে ওর গালে। পরমেশ কঠিন কণ্ঠে বলে, কে ছেলেটা? বাগানে কি এত কথা হচ্ছিল ওর সঙ্গে? কেন আসে ও এখানে? লবঙ্গ চুপ করে থাকে, পরমেশ ততই রেগে ওঠে, জবাব দে। লবঙ্গ বলে, ও আমার স্বোয়ামী।

—তোর স্বামী! পরমেশ চমকে ওঠে। মনে পড়ে ওর মায়ের কথা। মেয়েটাকে ফেলে তার স্বামী কোথায় হারিয়ে গেছে বেশ ক'বছর আগে। পরমেশ বলে, এতদিন কোথায় ছিল?

লবঙ্গ জানায়, লোকটা খুব ভালো গ, এতদিন বদ্ধমান-দুগ্গোপুরে পথে পথে টেরেনে হকারি করেছে, দুটো পয়সা জমিয়ে দুগ্গোপুরের মুচিপাড়ার বাজারে একটা দুকান দিয়ে এখন থিতু হয়েই খুঁজে খুঁজে এসেছিল ইখানে। আমাকে সিখানে ইবার নে যেতে চায়।

লবঙ্গ কথা শেষ করে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকে। তার মনে কি এক আশার সুর।

তুই কি বললি? ও ঝুলোঝুলি করছিল আজই নে যাবে, তা মাকে বলতে হবে, তুমারও মত চাই। বলতে, উ-বললেক সবাইকে বলে রাখো, সামনের সোমবার আসব পরমেশ শুধোয়, তুই যাবি তো? শেষে যদি আবার ফেলে পালায়।

লবঙ্গ বলে, না গো, দুকান দিয়েছে তা জগন্নাথপুরের গোবরাও জানে, বলেছে আর পালাতে হবেক নাই, থিতু হবো, ঘর করবো, কিন্তুক—

পরমেশ বলে, কিন্তু—

বুড়ি মা রইছে, তুমারও কাজের লুক নাই, কে চাট্টি ভাতজল দিবেক, তাই লবঙ্গ চুপ করে যায়, একদিকে ঘরের স্বপ্ন, অন্যদিকে কর্তব্য। দোটানার মাঝে পড়েছে সে, পরমেশ বলে,

—ও এলে আমার কাছে আনবি ছেলেটাকে।

ঘাড় নাড়ে লবঙ্গ, বলে বাবু আর কাউকে বলোনি এখন, মা'টা শুনলে ওর মুয়ে আগুন দেবে, আমাকেও গালমন্দ করবে। থাক উসব।

পরমেশ ভাবছে কথাটা। শিক্ষিত সমাজের একজন তাকে ফেলে অবজ্ঞাভরে চলে গেল নিজের ভবিষ্যৎ এর সন্ধানে, আর একজন মুর্খ মেয়ে অপরের জন্য নিজের কর্তব্যের জন্য নিজের ভবিষ্যতকে অস্বীকার করতে চায়।

পরমেশ তার কর্তব্য স্থির করে নিয়ছে, বুড়িকে সেদিন বলে, মাসি, তুমিই আমার কাজকর্ম করে দেবে। বুড়ি ফুসে ওঠে—লবঙ্গ মুখপুড়ি আবার কি করলেক? কাজ করবো নাই বলেছে? কুন রাজাত্তি পাট পেয়েছে সে বলতো ছেলে? দেখাচ্ছি নবানাটকীটাকে?

—তারও তো ঘর-বর আছে, যদি সেই স্বামী কোনওদিন এসে নিয়ে যেতে চায়?

বুড়ি গর্জে ওঠে, তার মুয়ে আধোয়া খ্যাংরা মেরে বিদেয় করবো, এতকাল কুথাকে ছেল সে? মাগের খবর লিয়েছে? মুখপোড়া—

পরমেশ বলে আহা, এত রাগছ কেন? এমন হতেও পারে। ছাড়ান দাও তো। বুড়ি গজ গজ করে— সে বরাত কি করে এসেছে ওই মুখপুড়ীটা? বলে না ভাত দেয় না ভাতারে, ভাত দেয় মোর গতরে। গতর খাটিয়ে আজন্ম ভাতের জোগাড় করতে হবেক উকে।

পরমেশ অপেক্ষাতেই ছিল। ছেলেটা কথা রেখেছে, এসেছে সোমবারই। লবঙ্গ আনে তাকে পরমেশের কাছে, ছেলেটি প্রণাম করে ওকে, লবঙ্গও। এর মধ্যে পরমেশ অধরবাবুকেও কথাটা বলেছে, বলেছে লবঙ্গের মাকেও। বুড়িও এতদিন পর জামাইকে দেখে আর রাগ করতে পারে না, কান্নায় ভেঙে পড়ে।

আজ সেজেছে লবঙ্গ। সিঁথিতে লুপ্তপ্রায় সিন্দুরের দাগটিকে আবার নতুন সিন্দুরে ভরে তোলে, কপালে টিপ, পরমেশের দেওয়া নতুন শাড়িটা পরে মাথায় ঘোমটা দিয়েছে, যেন ঘরের বউই।

পরমেশ বলে আর পালাবে না তো বসন্ত? ছেলেটির নামও জেনেছে লবঙ্গের কাছ থেকে। বসন্ত বলে অনেক লড়াই করে পায়ের নীচে মাটি একটুন পেয়েছি, ওর মম্ম এবার বুঝেছি বাবু। তাই থিতু হতে চাই। দুজনে মিলে নতুন করে বাঁচব এখন।

রিক্সায় চেপে চলে গেল লবঙ্গ বসন্ত তাদের ঘরে। মনে এদের খুশির সুর। এতদিন পর লবঙ্গ তার ঠিকানা খুঁজে পেয়েছে, বুড়ির চোখে জল, বলে ছেলে, মেয়েটার একটা হিল্লে করে দিলে তুমি। ভগবান তোমার ভালো করবে গ। অধরবাবুও বলেন, সত্যি একটা ভালো কাজ করলেন পরমেশবাবু।

পরমেশর ওর ঘরের দিকে। পাথরে ফেরে বুকে ওর কাঠের ক্র্যাচের শব্দ ওঠে। তবু মনে হয় পরমেশের দুনিয়াটা শুধুমাত্র বঞ্চনাতে ভরা নয়, ইটকাঠ কনক্রিটের রাজ্য স্বপ্ন, ভালোবাসার অপমৃত্যু ঘটে তথাকথিত শিক্ষিত সমাজে, মাটির কাছাকাছি যারা আছে তাদের মনে ভালোবাসার ফুলগুলো আজও ঝরে নিঃশেষ হয়ে যায়নি।

তাই লবঙ্গরা সুখী হতে পারে, আর পরমেশদের জীবনে শুধু তিক্ততা, ব্যর্থতার বেদনাতেই বিবর্ণ। রুক্ষ উপল বন্ধুর পথে ক্র্যাচের শব্দ তুলে মানুষটা নিঃসঙ্গ ঘরের দিকে এগিয়ে চলেছে। এ চলার যেন শেষ নাই।

হারানো সুর

সবে দিনের শুরু হচ্ছে পাতাজোড়ায়। গ্রামটা বেশ বড় গ্রামই বলা যেতে পারে। তবে এর ভৌগোলিক অবস্থানের জন্যেই পাতাজোড়ার তেমন নাম ডাক নেই।

জেলা সদর থেকে একটা ঢিলেঢালা এবড়ো খেবড়ো পথ চড়াই উৎরাই ঘন শালবন পার হয়ে চলে এসেছে পাতাজোড়ার ওদিকেই — বিস্তীর্ণ দামোদরের বালুচর, দামোদরের ওপারের জমিটা উটের মতো উঠে গেছে লালমাটির দেশ। নদীর ওপারে বিস্তীর্ণ বনভূমি-বনভূমি যেখানে শেষ হয়েছে, সেইখানে গড়ে উঠেছে ছোট বসতি। আর বন শেষ হয়ে এসে ট্রেনগুলো ওখানে কয়েক মিনিটের জন্যে দাঁড়ায়। দম নিয়ে আবার যাত্রা শুরু করে দুর্গাপুর স্টেশন থেকে। ছোট্ট স্টেশন, তাকে ঘিরেই সামান্য জনবসতি। তাই এই স্টেশন তেমন কোনও মর্যাদাও পায়নি। সাধারণ যাত্রীদের জন্যে দু-তিন জোড়া ট্রেনই এখানে দাঁড়ায়। বাকি মেল এক্সপ্রেস ট্রেনগুলো এই ছোট্ট-ঘুমন্ত স্টেশানকে পাত্তাও দেয় না।

পাতাজোড়া — এই অঞ্চলের মানুষের যাতায়াতের পথ এটাই। তবে গ্রীষ্মে এই বিস্তীর্ণ বালুচর মরুভূমির রূপ নেয়। বেলা নটার পর কেউ নদীতে নামে না। আর লোক চলাচল শুরু হয় বিকালে। সন্ধ্যার অন্ধকার নামলে এসব চলে যায় এই অঞ্চলের ঠ্যাঙাড়েদের কবলে। নিরীহ পথচারীদেরও ওরা রেহাই দেয় না। আর বর্ষা নামলে দামোদরের বুকে নামে দিগন্ত প্রসারী উন্মত্ত জলপ্রবাহ। উন্মত্ত জলধারা তখন অট্টরোলে ছুটে চলে। নদী হয়ে ওঠে তখন দুস্তর পারাপার। নৌকা চলে। গ্রীষ্মের মরা নদীর সাথে তখন এই বর্ষার জলে ভরা বীভৎস রূপের কোনও মিল থাকে না। বুকে সাহস নিয়েই বর্ষায় নৌকা করে নদী পারাপার করতে হয়, আবার মত্ত এই জলস্রোত গ্রাস করে এই যাত্রীবাহী নৌকাগুলোকে — এমন দুর্ঘটনা মাঝে মধ্যেই ঘটে যায়। অনেক সময় বর্ষার বন্যা এই পাতাজোড়ার অনেকাংশ তছনছ করে দেয়।

এ যেন ঘুমন্ত এক প্রান্তিক পরিবেশ। যেন মানুষের বসবাসের শেষ ঠিকানা। আশেপাশের গ্রামগুলোর অবস্থাও তাই। জমি আছে — সেচের ব্যবস্থা নেই। আকাশের বদান্যতায় পর্যাপ্ত বৃষ্টি হলে কিছু ধান হয় — নাহলে তাও নয়। ফলে সারা অঞ্চলে রয়েছে অভাব-দারিদ্র্যতার করুণ ছবি। তবু এখানকার মানুষ এই না পাওয়ার জীবনেই অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। তাদের প্রত্যাশা কিছু নেই — সামান্য কিছু পেলে এরা তাতেই খুশি। শূন্যতার মধ্যে তারা পূর্ণতার কামনা করে।

সকালের আলো গ্রামের আনাচে কানাচে বনে বনে ছড়িয়ে পড়েছে। এদিকে রুক্ষ-উত্তপ্ত দিগন্ত, ওদিকে কিছুটা গাছগাছালি ছায়াছন্ন পরিবেশ। সকালে বাড়ির গরু-বাছুরগুলোকে বাগানে রাখালদের জিম্মায় ছেড়ে দিয়ে যায়। গরুগুলো খুশি মনে এদিক সেদিক ঘুরে বেড়ায়। জলাধারের দিকে যায় খুশি মনে ঘাস যা খাওয়ার খেয়ে ফিরে আসে বিকালে।

গ্রামের গুরু পাগলা বলে — স্কুলে যেমন ছেলেমেয়েরা পড়তে যায় গরুগুলোও তেমন স্কুলে যায় গো। লেখাপড়া শিখে গোয়ালে ফিরে আসে।

মুদিখানার দোকানে গ্রামের লোকজনের আনাগোনা শুরু হয়। এদের কাজ বলতে বর্ষার সময় মাঠে চাষ করা, নদীতে হয়তো একটু সাহসী লোকেদের নৌকা চালানো। এছাড়াও কাজের ব্যবস্থাও আর তেমন কিছু নেই। তাই গ্রামের আটচালায় মুদির দোকান, না হয় হাটতলায় এদের আড্ডা চলে। সন্ধ্যায় তবু চাটুজ্জের যাত্রার মহড়া বসে সেখানেই জমায়েত হয় তারা।

গ্রামের বাইরে বনের ধারে ডোম পাড়া। চাষ-বাস হয় সামান্যই। এদের অধিকাংশই জীবনধারণের জন্য নানা কাজ করে। বন থেকে গাছ কেটে আনে। আবার এদের অনেকেই রেললাইনে বেশ কিছু স্থানীয় ভূস্বামীদের মদতে ওয়াগান থেকে কয়লা, অন্য সব মালও চুরি করে, মাঝে মধ্যে রাতের অন্ধকারে কোনও সম্ভ্রান্ত গৃহস্থের বাড়িতে না হয় পথে অসহায় পথচারীদের উপর চড়াও হয়ে সর্বস্ব কেড়ে নেয়। এসব কাজ করে এরা রাত্রিবেলায় আর দিনের বেলায় এদেরই অন্যরূপ।

তবু এখানে সুর আছে—প্রাণ আছে। গ্রামের মানুষ নিজেদের মধ্যে একটা সুন্দর সম্পর্ক গড়ে একসঙ্গে যেন জীবনের সব কাঠিন্যকে দূর করে মনে আনন্দ নিয়েই বেঁচে থাকতে চায়।

ভোলানাথ সেই দলেরই লোক। সে সঙ্গীতকে ভালোবাসে। এর মাঝেই সে নিজেকে খুঁজে পায়। চাটুজ্জে মশাই বলে — গান গাইছিস গা — এর সঙ্গে যাত্রার গানের সুরও কর। দিন বদলাচ্ছে — সুরও বদলাবে।

ভোলানাথ বলে —মাটির সুর তবু এ মাটির গন্ধ মিশেই বেঁচে থাকবে।

সেদিন সকালে হঠাৎ একটা সুর শুনে ভোলানাথ তাই উৎসুক হয়ে ওঠে। একজন বয়স্ক গলার সুরে মিশেছে একটি তরুণ কচি গলার মিষ্টি সুর।

চাটুজ্জে মশাই মানে নন্দু চাটুজ্জে সেই সুর শুনে বলে, যোগিন বাউলের সঙ্গে কে গাইছে রে ভোলা?

ভোলানাথও ঠিক ঠাউর করতে পারছে না। সে বলে, —দারুণ গলা হে নন্দু। সিধে পঞ্চমে উঠেছে — সুরটা যেন কলজে ছিঁড়ে দিচ্ছে —

যোগিন বাউলকে এরা চেনে। গ্রামের বাইরে এক ঝুপড়ি করে থাকে। গ্রামে গ্রামে একতারা কখনও বীণাবাদ্য নিয়ে ঘোরে। গান গেয়ে ভিক্ষা করে যা পায় তাই দিয়েই চলে যায় তার। সদাহাস্যময় পুরুষ।

দেখা যায় যোগিন বাউলের সঙ্গে রয়েছে একটা ছোট্ট ছেলে। তার হাতেও একতারা। যোগিন বাউলের বয়স হয়েছে, সে গলা চড়ায় আর তুলতে পারে না। গলা তুলছে ছেলেটা। ছেলেটির গলা চড়ায় উঠেও স্বচ্ছন্দ বিচরণ করতে পারে। ওরা গাইছে — "ওরে মন...

সুরটা সারা সকালের উজ্জ্বল আলোকে বিষণ্নতার আবেশে ভরিয়ে দিয়েছে। এই গানের মানেটাও যেন অন্তরমন দিয়ে বুঝে অন্তরের আবেগ দিয়ে তাকে প্রাণময় করে তুলেছে। গৃহস্থের একটি মেয়ে ওদের ঝুলিতে কিছুটা চাল দিতে ওরা এগিয়ে চলে। যোগিন বাউল নন্দুকে দেখে দাঁড়ায়। ভোলানাথকেও চেনে সে।

ভোলানাথই বলে, এটি কে গো বাউল? বাউলকে জবাব দিতে হয় না। ছেলেটিই বলে,

—আমাকে চিনতে পারলে না ঠাকুর। আমি ডোমপাড়ার তিনুগো।

নন্দু চাটুজ্জে চিনেছে তাকে। সে বলে, তুই রাজু ডোমের ব্যাটা। গায়ের যাত্রাদলে পাট করতিস না?

ছেলেটা অবশ্য একটা ময়লা প্যান্ট আর ছেঁড়া গেঞ্জি পরে আছে। যোগিনের পরনে বাউলের গেরুয়া একটা ময়লা পাঞ্জাবির মতো মাথায় একটা পাগড়ি।

ছেলেটা যত সহজে তার জীবনকাহিনীটা বলে গেল, বাস্তবে জীবনটা আরও কঠিন করুণ।

রাজু ডোম আর পাঁচজনের মতো ছিল না এই ডোমপাড়ায়। সে সানাই বাজাত। দু-একজন ছেলেকে নিয়ে বাজনের পার্টি করে এখানে ওখানে বাজাত, পালা করত, বিয়েতে বাজাত।

লোকটা অসুখে পড়ে বিনা চিকিৎসাতেই মারা যায়। তার বড় ছেলে নান্টু দেখেছে বাবা ভালোমানুষের মতো বাঁচার চেষ্টা করে ভুলই করেছিল। তিনুর দাদার এখন ভালোনাম পাঁচকড়ি থেকে পাঁচু নামেই পরিচিত, সে এদিককার ডাকসাইটে জমিদার ভূধরবাবুর কাছের লোক। ভূধরবাবুর দুর্গাপুর বাজারে ব্যবসা করে, চোরাই কাঠের ব্যবসা। সে তার লোকজন দিয়ে বন থেকে কাঠ লুঠ করায়। দুদিকে পাহাড়ী টিলা আর ঘন শালবন। ওরা বনের মধ্যে মালগাড়ি থেকে মাল লুঠ করে। ওসব মাল পরে ভূধরবাবু পাচার করে দেয়। এর জন্য পাঁচুও ভালো টাকাই পায়। অবশ্য একা পাঁচু নয়, ডোমপাড়ার বেশ কয়েকজনও এখন এসব করে।

পাঁচু ভেবেছিল তিনুকেও ভূধরবাবুর দোকানে কাজে লাগিয়ে দেবে। এখন থেকেই তাকে ওই সব কাজে তালিম দিয়ে তৈরি করে নেবে। কিন্তু তা হয়নি।

বাবা মারা যাওয়ার পর তিনু দাদা-বৌদির আশ্রয়েই রয়েছে। তিনু চলে নিজের খেয়ালেই। তার গানের গলাও সুন্দর। এর মধ্যে পাড়ায় তার গানও শুনেছে অনেকে। ছোট থেকেই তিনু মাঠেঘাটে ঘুরে বেড়াতে ভালোবাসত। সকালে গ্রামের সকলে তাদের গরু-বাছুর ছাগলগুলোকে তার জিম্মায় দিয়ে যেত। তিন চারজন ছেলে মিলে গরুরপালকে মাঠে নিয়ে যেত। দিনভোর মাঠে ঘাটে গরুগুলো চড়ে বেড়াত। আর ছেলেগুলো ওদের পাহারা দিয়ে বিকালে গ্রামে এনে ছুটি হত। গরুগুলোও তাদের নির্দেশ মতো যে যার গোয়ালে ফিরে যেত। এই ছেলেগুলো গৃহস্থের ঘর থেকে কিছুটা ধান পেতো মজুরি হিসাবে, তা সামান্যই।

তিনু এইভাবে চলতো। দিনভোর মাঠে সে আপনমনে গান গাইতো। সবুজ মাঠ, মুক্ত প্রান্তর, হাওয়ার টুর, পাখির ডাক, ভিজে মাটির মিষ্টি সোঁদা গন্ধ — যেন মিশে তৈরি হত সেই সুর। তার গান শুনে গ্রামের যাত্রাদলের অধিকারী ওকে নিয়ে আসে গানের দলে। নন্দু চাটুজ্জে তাদের গানের মাস্টার। চাটুজ্জেমশাই দেখে ছেলেটা সহজেই সব গান তুলে নিতে পারে। সুর-তাল-লয়-ও যেন তার সহজাত। যাত্রাদলের প্রথম দিনের পালাগান থেকেই তিনু সকলের মনে সাড়া জাগায়। তারপর থেকে তিনু নন্দু চাটুজ্জে-র প্রিয় হয়ে ওঠে। আর কয়েকটা পালাগান গেয়ে সুনামও কুড়োয়। আর যোগিন বাউলের গান তিনু-র মনেও যেন কি আবেশ আনে। সে যোগিনের কাছে আসে। গ্রামের বাইরে একটা ছোট জলধারা বয়ে চলেছে পাশেই রয়েছে শাল-মহুয়ার গাছ। তারই নীচে যোগিন বাউল একটা ঝুপড়ি করে থাকে। দিন-ভোর গ্রাম-প্রান্তরে ঘোরে —গ্রামে যেখানে যেখানে হাট বসে সেখানেই গানের আসর করে। যে যা দেয় তাতেই খুশি। তিনুও শুনেছে যোগিন বাউলের গান—

“তিলক কেটে গেরুয়া পরে
বাউল সাজলাম ভাই
বাইরেটা সবই মিছে—
মনে বাউল হতে লাগবে নাই বাউল হওয়া বড্ড কঠিন —
বাউল হও যদি মন —
বাহির সব নয় —
ওরে মন —
ধর গুরুর চরণ
ওরে গুরু বিনা আর গতি নাই”।

তিনু মন্ত্রমুগ্ধের মতো শোনে ওর গান। সেদিন পাতাজোড়ার হাটতলায় যোগিন বাউল গাইছে। আপনমনে হঠাৎ শোনে সেই তিনুও কখন তার সঙ্গে গলা মিলিয়েছে, যোগিনের বয়স হয়েছে, আর চড়ায় গেলে তার গলায় সুর ঠিক মেলে না। তবে গানের সঙ্গে মিশেছে তিনু-র গলা। অচিরেই তার গলা উদারা মুদারা ছাড়িয়ে তারায় ওঠে। যেন একটা পাখির মতো সুরটা দূর আকাশ থেকে হারিয়ে যায়।

লোকজনও জুটেছে ওদের যুগলবন্দি গান শুনে। যোগিনও খুশি। সেও যেন একজন যোগ্য শিষ্য পেয়েছে। সেদিন থেকেই ওদের সখ্যতা গড়ে ওঠে ওদের গানের প্রতি। যোগিন তিনুকে ওদিকে নিধু ময়রার দোকানে বটগাছের ছায়ায় বসিয়ে মুড়ি-বাতাসা আর জিলাপি খাওয়ায়। নিজেই বলে যোগিন— তুই তো খুব ভালো গান গাস রে।

তিনুরও ভালো লেগেছে যোগিন বাউলের গান। কিছু দিন থেকে সে শুনেছে যোগিনের গান। আর দু-চারজন বাউল এদিকে আসে। তাদেরও গান শুনেছে। তিনু নন্দু চাটুজ্জের কাছে গানের তালিম নিয়েছে। নন্দু চাটুজ্জে ওকে কলের গান, যাত্রা-র গানের তালিম দেয়। তিনু-র কাছে এসব কঠিন মনে হয়, তার কথা। তার তুলনায় যোগিন বাউলের গান যেন এই মাটির গন্ধমাখা।

এই গানে গ্রাম বাংলার মানুষের মনের কথা সহজ ভাবে ফুটে ওঠে। এই গানই তাকে টানে।

তিনু বলে, শেখাবে আমাকে?

যোগিন বলে, এ তো শুধু গান-ই নয়রে, এ সাধনার জিনিস। এই নিয়েই ডুবে থাকতে হবে রে।

তিনুও ভেবেছে কথাটা।

তিনু-র দাদা-বৌদি চায় ছেলেটা ভূধরবাবু-র দোকানেই কাজে লাগুক। পাঁচু ওকে ওদের লাইনের রাতের কাজ শেখাতে চায়। রোজগার ভালোই হয়।

তিনু এসব জানে না। সে দাদার সঙ্গে নদীর পারে দুর্গাপুরে যায়।

তখন দুর্গাপুর-এর বন কেটে বিশাল কর্মকাণ্ড শুরু হচ্ছে। তিনু দেখে রাতের অন্ধকারে ওদের লোক — বনের মধ্যে মাল গাড়ি লুঠ করে।

পুলিশ তখন গুলিও চালায়। রাতের স্তব্ধতা ভেদ করে গুলির শব্দ ওঠে। অন্ধকারে কারা দৌড়াদৌড়ি করছে — একজন নাকি গুলিতে মারাও গেছে। সেই লোকেরা পালায়।

তিনু দেখেছিল সেই রাতে তার দাদাকেও ওদের দলেই ছিল। তিনু ওদের কাজের খবরও জেনেছিল—বুঝেছিল ওরা কি কাজ করে। তারপরেই চলে আসে তিনু তাদের বাড়িতে । বৌদি বলে, চলে এলি যে কাজকর্ম ছেড়ে?

কোনও জবাব দেয় না তিনু। এরমধ্যে পাঁচুও ঘরে ফিরেছে, কাল রাত্রে তাদের কাজও ঠিকঠাক হয়নি, পুলিশও সর্তক হয়ে গেছে। কিছুদিন কাজ বন্ধ রাখতে হবে। তাই মনমেজাজও ভালো নেই পাঁচুর।

তিনুকে সে কাজ শেখার জন্যে ওখানে রেখে এসেছিলো। তাই তিনুকে ফিরে আসতে দেখে চমকে ওঠে, — কাজ ছেড়ে চলে এলি যে।

তিনু বলে, ওই গুলি খাওয়ার কাজ করব নাই। তোমরা চুরি-ডাকাতি করো—

পাঁচু তিনুর এহেন মন্তব্য শুনে ওর গালে সপাটে একটা চড় মারে — ভদ্রলোকের বাচ্ছা এয়েছেন — আমরা চোর-ডাকাত আর উনি সাধু। ওকে বসে বসে খাওয়াতে হবে। পাঁচুর বৌ চায় এহেন বেয়াড়া ছেলেকে সায়েস্তা করতে তাই বলে — দূর.করে দাও ওকে। কিসব কথা বলে গো।

পাঁচু বৌ-র কথায় আরও রেগে উঠে বলে, যা বেরো এখানে থেকে। নিজের পয়সায় ভাত খেগে যা। চলে যা ইখান থেকে যা —

বৌদিও এখন চেঁচাচ্ছে। তিনু-র এখন সম্বল বলতে দু'খানা ছেঁড়া প্যান্ট, গেঞ্জি, আর একটা দলা পাকানো গামছা।

তিনু কাঁদে না। মা-বাবা মারা যেতে সে অনেক কেঁদেছিল কিন্তু লাভ হয়নি। তখন থেকেই তিনু বুঝেছে এই দুনিয়ায় চোখের জলের কোনও দামই নেই। তাই তিনু আজ শেষ আশ্রয় হারিয়েও কাঁদে না।

সে বৌদির ছুঁড়ে দেওয়া পটুলিটাকে তুলে নিয়ে পায়ে পায়ে বের হয়ে এসেছিল।

পাঁচু তখনও গর্জাচ্ছে — যা পালা সাধুর বাচ্চা —

দুপুর গড়িয়ে বিকাল নামছে, গ্রামের বাইরে বিস্তীর্ণ রুক্ষ প্রান্তর গ্রীষ্মের খররোদ যেন লেলিহানশিখা হয়ে তখন নৃত্য শুরু করেছে। দামোদরের বিস্তীর্ণ বালুচরের জল থেকে যেন আগুনের হলকা ছুটে চলেছে।

গ্রাম ছেড়ে তিনু চলেছে ওদিকে। দূরে দেখা যায় নদীর ওপারে দুর্গাপুরের বনভূমি। ওখানে এখন বন কেটে কল কারখানা গড়ার আয়োজন চলছে।

যোগিন বাউল সেদিন একটু সকাল সকাল পরিক্রমা সেরে ফিরছে, ওদিককার গাছ-গাছালির নীচে ডোবার জল তলানিতে ঠেকেছে, তবু নদীর সামান্য জলরেখা-র কিছুটা ডোবায় এসে পড়ে তাই ওর জল তবু কিছুটা থাকে, সেখানেই স্নান সেরে যোগিন বাউল কাঠ কুটো জ্বেলে মাটির হাঁড়িতে চাল-আলু-কুমড়োর টুকরো ফেলে সেদ্ধ করছে, হঠাৎ শুকনো পাতায় কার পায়ের শব্দ শুনে চাইল।

দেখে তিনুকে। উস্কোখুস্কো চেহারা, এই রোদে এতটা পথ এসেছে — তাই কিছুটা ক্লান্ত লাগছে, সে বলে, তিনু — তুই!

খরা রোদ থেকে গাছ-গাছালির ছায়ায় এসে যেন একটা শান্তির পরশ পায় এখানে। একটা শালগাছের ছায়ায় বসে তিনু যোগিন বাউলের কথার জবাবে বলে, — দাদাটা ঘর থেকে তাড়িয়ে দিলেক, চলে এলাম তাই এখানে। একটু জল দিবা —

যোগিন দেখছে তিনুকে। এতটা পথ দুপুরে খর রোদে এসে তেষ্টা পেয়েছে ছেলেটার।

যোগিন পাশে রাখা মাটির জ্বালা থেকে একটা টিনের গ্লাসে জল গড়িয়ে দিতে ছেলেটা ঢকঢক করে এক নিঃশ্বাসে জলটা খেয়ে বলে, খুব তেষ্টা পেয়েছিল। বিকাল তখন গড়িয়ে আসছে।

যোগিন বলে, খেয়ে এসেছিস?

তিনু নির্লিপ্তের বলে — ওরা আর খেতে দিবেক নাই। ছাপ্ ভাষায় বলে দিছে গো।

ছেলেটার এতবড় বিপদেও যেন কোনও ভ্রূক্ষেপ পর্যন্ত নেই।

যোগিনের মনে হয় মা-বাবা মরা ছেলেটা জানেনা যে এত বড় পৃথিবীতে বেঁচে থাকাটা কত কঠিন।

ওদিকে মাটির হাঁড়ির ভাত ফুটে এসেছে।

যোগিন বলে, যা পুকুরের জলে একটা ডুব দিয়ে এসে ইখানেই খেয়ে নে চাট্টি।

তিনু বলে, তুমি খেতে দিবা? ঠিক আছে।

ছেলেটা পুঁটলি থেকে একটা প্যান্ট বের করে ডোবার দিকে এগিয়ে যায়।

সন্ধ্যা নামছে — ঘরে ফেরা পাখিদের কলরবে মুখর হয়ে ওঠে চারিদিকে। ছেলেটা গাছতলায় তখনও ঘুমুচ্ছে, কদিন বোধহয় ঠিক মতো খেতেও পায়নি। তাই আজ পেট ভরে খেয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়েছে।

যোগিন সন্ধ্যায় একতারা নিয়ে বসেছে। দূরাকাশে তারার মেলা — দূরে বনভূমিতে আঁধার নেমেছে, অন্ধকারের অন্তহীন স্তব্ধতার মাঝে যোগিন বাউল সুর তুলেছে —

"ওরে গুরু বলে করে স্মরণ তোমারি মন
অর্ধেক গুরু, পতিতগুরু, গুরু অগনন-
গুরু যে তোর বুকের জ্বালা-
জ্বালায় অনুক্ষণ"—

সুরটা ভেসে চলেছে। তিনুরও ঘুম ভেঙে গেছে। উঠে বসে সে। বার দুয়েক গানটা শুনে তিনুও গান ধরে —

"গুরু যে তোর বুকের জ্বালা-
জ্বালায় অনুক্ষণ —
ওরে মন -গুরু বলে করে স্মরণ - তোমারি মন।"

ওর গলাটা পঞ্চম ছাড়িয়ে সপ্তমে উঠেছে। যোগিন নিজের গান থামিয়ে মুগ্ধ বিস্ময়ে ওই তিনু-র গান শুনছে আর একতারাটা বাজিয়ে চলেছে।

গান শেষ হতে যোগিন বলে, তিনু তুই থাক ইখানে। আমার কাছে—তুকে গান শেখাব। আমার গলা তো আর চড়ায় ওঠে না। —

সেই থেকেই তিনুও রয়েছে যোগিনের কাছেই। দুজনে গ্রামে গ্রামে — হাটতলায় গান গায়। যে যা দেয় তাই দিয়েই দিন চলে যায়।

ক্রমশ দিন বদলাচ্ছে। ওদিকে দুর্গাপুরের চেহারাটাও বদলে যাচ্ছে। এখন বনভূমি নিশ্চিহ্ন করে সেখানে গড়ে উঠেছে ছোট কলোনি—দোকানপাট—চওড়া পিচের রাস্তা। হাজারো মানুষ, গাড়ি, ট্রাক-এর ভিড়। গড়ে উঠছে ঝাঁ-চকচকে বাজার, নানা দোকান। এসেছে বহু মানুষ।

দেশটাও নাকি দু-টুকরো হয়ে গেছে। পাতজোড়ার দিকেও সেই পরিবর্তনের আঁচ লেগেছে। এখন

দামোদর আর বাধা হয়ে নেই। পারাপারের প্রশ্নও নেই — আর এই দুরন্ত জলস্রোতে প্রাণ হাতে নিয়ে নদী পারাপার করতে হবে না। এখন নদীর ওপর ব্যারেজ গড়ে উঠেছে।

সদর থেকে খোয়া ঢালা রাস্তা এসে এবড়ো খেবড়ো রাস্তাটা এক সময় দামোদরের সামনে থমকে গিয়েছিলো। এখন তার ওপরই গড়ে উঠেছে ব্যারেজের উপরে ব্রিজ।

গাড়িগুলো এখন, এছাড়াও যাত্রীবাহী বাস, মালবাহী ট্রাকগুলো এখন নদীর বুকের উপর দিয়ে ছুটে যায় দুর্গাপুরের দিকে।

বর্ষার দুর্বার জলস্রোত আর গ্রীষ্মের বিস্তীর্ণ উত্তপ্ত বালুচর পার হয়ে এপার ওপার করার আর ঝামেলা নেই।

পাতাজোড়ায় এখন হয়েছে নতুন পিচঢালা বড় রাস্তা। এই রাস্তা দিয়ে এখন রাতেও বাস গাড়ি ট্রাক ছুটে চলে।।

যোগিনেরও বয়স বেড়েছে। এখন যোগিন আর বের হতে পারে না।

তিনুর জীবনের গতিও বদলেছে। ছোট ছেলেটা এখন সুন্দর এক তরুণ। তিনুও এই ক'বছর ধরে যোগিনের কাছে গান শিখেছে।

এখন এসেছে টেপরেকর্ডারের যুগ, পাতাজোড়ার চেহরাটাও বদলে যাচ্ছে।

দুর্গাপুরের দিন বদলের আঁচ এসে পৌঁচচ্ছে সেইখানেতেও।

দুর্গাপুরের কল-কারাখানায় এখান-ওখান থেকে কাজের সন্ধানে আসছে বহু মানুষ।

তাছাড়া দেশ বিভাগের পরও ওদেশ থেকে বহু ছিন্নমূল মানুষও এসে পড়েছে এইদিকে আশ্রয়ের সন্ধানে।

পাতাজোড়ার নির্জন প্রান্তরেও গড়ে উঠেছে বাজার-দোকান। ওদিকে বড় বড় বাড়িও উঠছে।

তিনু এখন তার গানের জগতে বেশ এগিয়ে গেছে। সেই নন্দু চাটুজ্জে এখন আর গান শেখায় না। তবে সদ্য গড়ে ওঠা বাজারে একটা দোকান দিয়েছে। ক্যাসেট-টেপরেকর্ডার-হারমোনিয়াম আরও অনেক কিছু বিক্রি করে। আধুনিক বাজারে গানের ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করে।

তিনু এখন ঘটা করে এই বাজারেও গান গায়। তার গানে এসেছে অনেক শানিত ভাব।

নন্দু চাটুজ্জে বলে তিনু, গাঁয়ে গাঁয়ে আর বাজারে গান গেয়ে কত পাস। তোর যা গলা তাতে কইলকাতায় যা, দেখবি রেডিও-টিভিতেও চান্স পেয়ে যাবি। যা কইলকাতায়। চলে যা এখান থেকে —

তিনুও ভেবেছে কথাটা, কিন্তু এই লালমাটি, শালবন, সবুজ মাঠ যেন তার গানের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। ওর গানে ওঠে সেই মাটির সুর — এই মাটি ছেড়ে যেতে মন চায় না তার।

যোগিনও দেখেছে আজকের দিন বদলের পালাটা। যোগিন বলে — তিনু, সুর আছে এই মাটিতে, বনের এই হাওয়া, পাখিদের কলরব সব মিলেমিশে সুরে ফুটে মাটির গান। এই মাটি ছেড়ে চলে গেলে তোর সুর কি থাকবে? মাটির গাছকে টবে পুঁতলে ফল বিকবে রে?

তিনুও বলে, না গো গোঁসাই। এ মাটি ছেড়ে আমি যাব নাই। তোমাকে ছেড়ে যাব নাই গো।

যোগিন বলে, মাটি আঁকড়ে ধরে থাকিস, মাটি থাকবে রে। মানুষ থাকে না সে তো একদিন যাবেই। তুই আমি চলে গেলেও এই মাটি থাকবে রে।

তিনু এই মানুষটাকে যেন আপন করে নিয়েছে। গ্রাম থেকে বের হয়ে আসার পর যোগিন-ই ওকে আশ্রয় দিয়েছে। তিনুকেও বাউল অন্তর মাটির গানও শিখিয়েছে। যোগিন তার গুরুর কাছ থেকে পাওয়া সব শিক্ষাই উজাড় করে দিয়েছে তিনুকে। তিনু গান গায় সেইসব গান। তাছাড়া ছেলেটার একটা জন্মগত প্রতিভাও আছে। যে গানই শোনে, দু-একবার শোনার পর তা নিজের গলায় তুলে নিতে পারে। তার সুরেলা গলায় সেই গান যেন নতুন প্রাণ পায়।

পাতাজোড়া সিনেমা হলে অনেক ছায়াছবি আসে। তাতে যেমন মান্না দে, হেমন্ত মুখার্জি আরও অনেক গুণী শিল্পী গান গায়। তিনু সেই সব জনপ্রিয় গানও গায় বাজারে, লোকের ভিড় জমে যায়।

তখন এসব গান শুনতে অনুরোধ এলে বলে বাবু মালিকরা একটা মাটির গান শোনো গো।

বাউল গানের সুর ধরে তখন তার সুরেলা কণ্ঠে, এইগানে পাতাজোড়ার জীবন, এখানকার মাটির গন্ধমাখা গান। এই গান গেয়েই তিনু বেশি আনন্দ পায়।

সেদিন হাটতলায় তিনু এসেছে, দেখে ওদিকে বেশ লোকজন জুটেছে। একটা গানের সুর ওঠে—

"খাঁচার ভিতর অচিন পাখি-
ক্যামনে আসে যায়।
তারে ধরতি পারলে মন বেড়ী
দিতাম পাখির পায়ে"

একতারা নয়, সঙ্গে সঙ্গত করছে অন্য একটা যন্ত্র। তার সুরটাও এই গাঁয়ের পরিবেশে মাটিতে মিশে গেছে। বাংলাদেশের গান তাতে যেন অন্য মাটির সুর। তিনুও চুপ করে দাঁড়িয়ে শুনছে সেই গান।

প্রথম ঠিক চিনতে পারেনি তিনু, তারপর সেই সম্বলহারা বৃদ্ধকে দেখে এবার চিনতে পারে তিনু। লোকটা এর আগে দু-একদিন গানও গেয়েছে। তবে ওই বুড়ো ভাঙা গলায় গান শোনার জন্যে কেউ দাঁড়ায়নি। আজও মেয়েটার সতেজ গলার গান তার যৌবন মদির দেহের আকর্ষণেই যেন ওরা ভিড় করেছে।

গান শেষ হতে দক্ষিণাও মন্দ জোটে না। ওদিকে দু-তিনটে বাসও এসে গেছে। যাত্রীরাও চলে যায় বাস ধরার জন্যে। তিনু বলে বুড়োকে -- এ কোন স্বজ্জনের গান গো? বেশ ভালো বাধা, সুরও নতুন বটে।

মেয়েটা দেখছে তিনুকে। তিনুর পরনে গেরুয়া একটা পাঞ্জাবি, খাটো ধুতি। মাথায় একটা পাগড়ি হাতে একতারা।

বুড়ো জয়ধ্বনি দেয় — জয়গুরু। বাবা এতো আমাগো দ্যাশের লালন ফকিরের গান। মস্ত বড় সাধক বাউল। বুড়ো সেই বাউলের উদ্দেশ্যে নমস্কার করে বলে, — ফরিদপুরে আমাগো দ্যাশ ছিলো। ভিটেমাটি ছাইড়া এহন বানে ভাসা খুড়কুটোর মতো ভাসতে ভাসতে এহানে আইসা ঠেকেছি। ঘর-দোর চুলচুলাও নাই। হাটতলার ওদিকে ওই পইড়া আছি মাইয়াটারে নিয়া। কি করি কুথায় যে যাই কিছুই ঠিক নাই বাবা।

বিকাল নামছে। হাটতলার ওদিকে থাকে হরিদাস বাউল। ওর ছেলে বাবার এই দোতারা বাজিয়ে গানের ব্যাপারটাকে পছন্দ করে না। ও এখন দুর্গাপুরের একটা ছোট কারখানায় কাজ করে। সন্ধ্যার পর এখানে ফেরে। এখানে থাকে হরিদাস তার মেয়ে মেঘনাকে নিয়ে।

মেঘনাই এর মধ্যে খড়কুটো জ্বেলে মাটির বাটিতে চা-র জল গরম করছে। তিনুকেও দেয় চা।

হরিদাস বলে, বাবা তুমিও তো দেখি বাউল গোঁসাই। তিনু হাসে। গেয়ে ওঠে —

"তিলক কেটে গেরুয়া পরে
বাউল সাজলাম ভাই।
বাইরের আমি বদলেছি
মনের রূপতো না বদলায়।"

ওর গানটা শুনেছে মেঘনা। এর আগেও সে এই হাটতলায় তিনুর গান শুনেছে। দেখেছে এখানে ওর নাম-ডাক পরিচিতি আছে। আর গানও গায় খুব সুন্দর। মেঘনা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে দেখছে তরুণ তিনুকে।

হরিদাস বলে, তোমার গান আমি শুনেছি। গুরুর নাম বজায় রেখো বাবা। জয়গুরু।

সন্ধ্যা নামছে। তিনু বলে, আজ উঠি। আমার গুরুর শরীরটা ভালো নেই। অপেক্ষা করছে — যেতে হবে।

হরিদাস বলে, একদিন যামু তোমার গুরুর দ্বারে দর্শন প্রণাম করতে।

এরপরেও দেখা হয়েছে ওদের তিনুর সঙ্গে। সেদিন সত্যিই ওরা বিপদে পড়েছে। সেদিন হাটতলায় বেশ হৈ চৈ শুরু হয়েছে। লোকজনও জুটেছে অনেক। গোলমাল হচ্ছে।

তিনুও ওদিকে যাচ্ছিল। গোলমাল শুনে এগিয়ে গিয়ে দেখে যে, ওরা হাটতলায় যে চালায় থাকে সেই চালার মালিক কেষ্ট পাল লোকজনকে নিয়ে এসে সেই চালাঘর থেকে হাড়িকুড়ি রং, চটা তোরঙ্গ

বাইরে ফেলে দিয়ে চিৎকার করছে — দয়া করে থাকতে দিয়েছিলাম কদিনের জন্যে তাই গেড়ে বসবে এখানে? দূর করে দেয় এখান থেকে। ওদিকে ছিটকে পড়া দোতারাটা তুলে নিয়ে হরিদাস বাউল বুকে চেপে ধরে। আর তার মেয়ে মেঘনা একটা পুঁটলি বগলে ভীত ত্রস্ত নীরব চাহনি মেলে অসহায়ের মতো দাঁড়িয়ে আছে। মাঝে মাঝে বলে,

— বাবা, চলে এসো।

তিনু ওদের অবস্থাটা দেখে এগিয়ে আসে। হরিদাস তিনুকে দেখে বলে — দ্যাখছ তিনু আমাগো বার কইরা দিছে —

পালমশাই ফুঁসে ওঠে — না। চিরকাল রেখে দেবো? এখন বাজারের সীমা বাড়ছে। তাই কেষ্ট পালও তার দোকান গুদাম এসব বাড়াবে। জায়গা চাই সেই কারণেই এভাবে উৎখাত করছে এদের।

মেঘনা বলে, দুর্গাপুর ইস্টিশানে পইরা রহুম, চল বাবা। হরিদাস বলে, তার চেয়ে এহানেই কোন গাছতলায় রহুম। তিনু বলে — আমাদের ওদিকটায় যাবে বাউল। এই বনের ধারে আমাদের আশ্রয়ের পাশেই তো অনেকটা জায়গা পড়েই আছে। ওখানেই চলো।

মেঘনা চাইল ওর দিকে। এই বিপদের সময় তিনু যে এইভাবে আশ্রয় দেবে তাদের তা ভাবতেই পারেনি। হরিদাস বলে ছেলেটা তো দুর্গাপুরে গেছে গিয়া। খবরও নেয় না বুড়ো বাপ-বোনটার। তবু তুমি আইছ। চলো ওখানেই যামু।

তিনু নিজের হাতে এই আশ্রয় আশ্রমের রূপ ফিরিয়েছে। এখন কয়েকটা চালাঘরও বানিয়েছে ওদিকে পুকুরের ধারে। বাউল উৎসবে লোকের কাছে টাকা তুলে চালাগুলোতে নতুন খড়ও দেয়।

যোগিন বাউলেরও শরীর ভালো নেই। বয়স হয়েছে চোখের নজর, গানের গলাও গেছে। তিনু বের হলে একাই থাকে। তাকে দেখাশোনারও কেউ থাকে না। তিনু ফিরে এসে রান্না করে তাই খায়। এদিকটা এখনও নির্জনই রয়েছে।

যোগিন তিনুকে হরিদাস মেঘনাকে নিয়ে আসতে দেখে চাইল। হরিদাস মেঘনা এর আগে উৎসবের সময় এখানে এসেছে। গানও গেয়েছে। সেই সুবাদেই চেনাজানা ছিল যোগিনের সঙ্গে।

তিনু হরিদাসদের নিয়ে ভিতরে এসেছে। যোগিন দেখে ওদের। তিনু আজকের বাজারের ঘটনাটা জানিয়ে বলে, — ওদের থাকার ঠাঁই নাই বাউল। কেষ্ট পাল ওদের তাড়িয়ে দিয়েছে। ওদের ইখানেই আনলাম। যদি আমাদের আশ্রমের পাশে ওদের থাকার ঠাঁই হয়।

যোগিন বলে ওঠে, জয়— গুরু। এত বড় পৃথিবীতে দুটো মানুষের ঠাঁই হবে না। তা কি হয় গো—আমরাই যার আশ্রয়ে আছি, এরাও তাঁর আশ্রয়ে থাকবে। এসো গো বাউল — এসো মা।

হরিদাস মেঘনা দেখছে যোগিনকে।

যোগিন বলে, তবু একটা পড়শী এল।

হরিদাস গেয়ে ওঠে—

"সামনে আমার অচিন নগর
তাতে এক পড়শী এল ঘরে
আমি চিনলাম নাকো তারে।"

যোগিন হাসে — খাসা গেয়েছ গো বাউল। পড়শীদেরও চিনতে পারব না। তবে মনের মানুষকে চিনব কী করে?

হরিদাস মেঘনা এখন আশ্রয় পেয়েছে এখানে। পুকুরের ধারে গ্রীষ্মের এই ডোবাই বর্ষার জল পেলে উপরন্তু দামোদরের থেকে আসা জল পরিপূর্ণ হয়ে এটাই যেন পুকুরের রূপ নিয়ে থাকে। সেই পুকুরের ধারে তিনুই গড়ে দিয়েছে ওদের জন্য একটা ঘর। তাতেই বাবা-মেয়ে থাকে।

এদিকে যোগিনের শরীরটাও ভেঙে গেছে। তবু যোগিন এখন আনন্দেই আছে।

সকালে তিনু মেঘনা এখন চলে আসে পাতাজোড়ার বাজারে। কর্মব্যস্ত বাজার। পথের দুদিকে গড়ে উঠেছে বড় বড় দোকান, নিধু ময়রার পুরোনো সেই দোকানটা নতুন তিনতলা বাড়ির নীচে এসেছে।

ওদিকে স্কুল ঘরে বাচ্চাদের ভিড়। যাত্রীবাহী নানা দিকের বাস ছুটে চলেছে। ওদিকে একটা গাছের নীচে এদের গানের আসর বসে।

এখন আর ওদের গ্রামে গ্রামে ঘুরে ভিক্ষাও করতে হয় না। এক জায়গাতেই বসে ওদের গানের আসর। যাত্রীরা আসে যায়, পথের মানুষ, দূরদূরান্তের মানুষ যারা গাড়ি নিয়ে যাতায়াত করে তারাও ওদের সুরেলা গলার গান শুনে দাঁড়ায়। খুশি হয়ে পাঁচ দশটাকার নোট দেয়।

মেঘনা এখন তিনুকে তার পূর্ববঙ্গের বাউল গানও শিখিয়েছে আর নিজে শিখেছে পশ্চিমবঙ্গের বাউল গান।

মেঘনার রূপযৌবন এখন যেন ভরা দামোদরের মতোই উত্তাল। তার সঙ্গে ঈশ্বরদাও গলা তার গানকে আরও বৈচিত্র্যময় করে তুলেছে।

যোগিন হরিদাস আশ্রমেই থাকে। দুপুরে মেঘনা এসে রান্না করে।

যোগিন বলে, মেঘনা সত্যই, তোমাদের আসার পর আশ্রমের যেন শ্রী ফিরেছে।

হরিদাস বলে সত্যি বাউল, যাবার বেলা হয়েছে — এতদিন দ্যাশ ছাড়া ভিটা ছাড়া হয়ি ঘুরলুম শ্যাষে এহানে আইসা মন বসিছে — এবার যামু হরির আশ্রয়ে এই পৃথিবী ছাইরা —

তিনু বলে, এখানে মন টিকছে না?

সেদিন হঠাৎ আশ্রমের ওদিকে একটা গাড়ি এসে থামে। এখন আর এখানকার প্রান্তর জনশূন্য নয়। এখানে ওখানে বাড়ি উঠেছে — প্রান্তরে ভিড় বেড়েছে। নতুন মানুষের দল।

গাড়ি থেকে নামছে নন্দু চাটুজ্জে সঙ্গে দুজন লোক।

নন্দু চাটুজ্জে এগিয়ে আসে — তিনু আছিস?

তিনু বের হয়ে আসে — চাটুজ্জে মশাই, আসুন—

নন্দু চাটুজ্জে এখন এদিকে যাত্রার আসর করে শীতের সময়। তার থেকে ভালো রোজগার করে তার লোকজনও আছে। বাজারে একটা দোকান আছে। ওখানে টিভি—ফ্রিজও বিক্রি করে। আর দুর্গাপুরের কোনও মহাজন তাকে সাহায্য করে এখানে গড়ে তুলেছে নতুন সিনেমা হল।

নন্দু বলে, ইনি ভূধরবাবু।

তিনু ওর নামটা জানে। দুর্গাপুরে উনি এখন বিরাট ব্যবসা করছেন — কয়লার বড় ব্যবসায়ী, সিনেমা হল, আরও নাকি কিসের কারখানা আছে আর এই অঞ্চলের নামী লোক উনি। তিনু দেখছে ভূধরবাবুকে। বয়স হয়েছে। বয়স যেন তাকে স্পর্শ করতে পারেনি।

নন্দু বলে, দুর্গাপুরে পশ্চিমবঙ্গ সাংস্কৃতিক উৎসব করছে সরকার থেকে। সারা বাংলার নামী লোকশিল্পীরা আসবে। ভূধরবাবু বলে, তোমাদের নাম তো দুর্গাপুরে প্রায়ই শুনি। তোমরা দুজনেই উৎসবে আসবে।

যোগিন হরিদাসও শুনছে ওদের কথা।

মেঘনা এর মধ্যে অতিথিদের জন্য চা করে এনেছে। মেঘনাই এখন এই আশ্রমে দামী কাপ-প্লেটও এনেছে। সে জানে এখন অনেকেই বাইরে থেকে আসে। তাদের আপ্যায়ন করে মেঘনাই।

তিনু বলে, ওই আসরে আমরাও গাইব? আমি তো পথের বাউল গো —

ভূধরবাবু বলে, পূর্ণদাসের মতো বাউল সম্রাটও তো একদিন পথের বাউল ছিলই — তোরা পথ থেকে শহরে যাবি, সারা দেশ জানবে তোদের নাম।

নন্দু বলে, দুজনের জন্যে পাঁচ হাজার টাকা পাবি। এখন হাজার টাকা রাখ। সেদিন আমরাই তোদের গাড়িতে করে নিয়ে যাব। দেশের লোক দেখুক ছেঁড়া বস্তার মধ্যেও বাসমতী চাল থাকে।

ভূধর বলে, দুর্গাপুরের প্রোগ্রামের পর দেখবি বাইরে থেকে ডাক আসবে। গলা আছে প্রতিভা আছে তার দাম উসুল করবি না কেন? চিরকালই কি পথের ধারে পড়ে থাকবি? ওরে চলে যায়। তিনু বলে, হে গোঁসাই, একি ফেরে পড়লাম গো!

যোগিন গেয়ে ওঠে—যোগিন বলে তিনুকে হাঁড়িকে মজবুত করতে হলে হাঁড়িকে ভালো করে

পোড়াতে হয় রে। কাঁচা পাকা হাঁড়ি বাজারে বিকয় না সে হাঁড়ি টেকেও না।

তিনু বলে, আমি তো সেই কাঁচা-পাকা হাঁড়ি গো, বাজারে আমার দাম কি?

মেঘনা শুনছে ওদের কথা। সে জানে তার রূপ আছে তার গলার গান মানুষের মনে দোলা আনে, সে দেখেছে বিমুগ্ধ জনতাকে। মেঘনা চায় কিছু হতে। চোখে তার রঙিন স্বপ্ন আছে। পাতাজোড়ার নতুন বস্তির মেয়েদের দেখেছে সে। তারা ঘর সংসার করে, সেজেগুজে চাকরিও করে। সুখে রয়েছে। মেঘনার নারীমনও অনেক কিছু করতে চায়।

এই গ্রামের বাইরে মেঘনা এরমধ্যে শ্রাবণী ঘোষকে দেখেছে, তাদের অঞ্চলের মেয়ে। এখানে বিয়ে-থা করে স্বামীর সঙ্গে এসেছে। স্বামী এখানকার বি.ডি.ও অফিসে কাজ করে, আর শ্রাবণী এখানকার মেয়েদের স্কুলে শিক্ষিকা। শ্রাবণী মেঘনাকে আবিষ্কার করে একদিন বাজারে। মেঘনা আর তিনু এখন দুজনে গান গাইছে। শ্রাবণী হঠাৎ দেখে ওদের। মেঘনাও দেখে শ্রাবণীকে। এখন সেই শ্রাবণীও অনেক বদলে গেছে। গানের শেষে মেঘনা এসে হাজির ওর কাছে — শ্রাবণী না?

শ্রাবণী বলে, চিনেছিস তাহলে মেঘনা।

মেঘনা বলে, প্রথমে পারিনি, কতদিন পর দেখা — শ্রাবণী বলে, বিয়ে-থা করে এখানেই এসেছি। আমার স্বামী এখানে চাকরি করে।

শ্রাবণী মেঘনাকে নিয়ে আসে তাদের বাড়িতে। নতুন একটা বাড়ি। গাছগাছালি রয়েছে।

শ্রাবণী বলে, তুইতো এখন দারুণ গাস রে— শহরের গায়িকাদের থেকেই কোনও অংশে কম নয়। শ্রাবণী ওর টেপ রেকর্ডারটা চালু করে নামী-দামী বাউলের গান শোনায়। ছবির গানও শোনে।

ওদের গান শুনছে মেঘনা, তার মনে হয় যেন এদের থেকে সত্যিই সে কোনও অংশে কম নয়।

সেদিন শ্রাবণী মেঘনার গলা টেপ করে তাকে শোনায় আর নিজের গান শুনেই মেঘনা চমকে ওঠে। এযেন তার গলা সে নিজেই চিনতে পারে না।

শ্রাবণী বলে, এর সঙ্গে অন্য সব যন্ত্র বাজালে কি দারুণ হবে বলতো তাই বলছি, এখানে পথের ধারে পড়ে না থেকে এখানে গান না গেয়ে তুই কলকাতায় যা। যদি কোনও ক্যাসেট কোম্পানি তোকে দিয়ে প্লে-ব্যাক করায়। দেখবি তোর দিন বদলে যাবে।

মেঘনা স্বপ্ন দেখে। বেদনা জড়িত কণ্ঠে বলে,

— কে আমাদের কলকাতায় নে যাবে কও? আমাদের জীবন ভিক্ষা করে কাটবে গো দিদি।

শ্রাবণী বলে, এত ভেঙে পড়ছিস কেন?

মেঘনা আজ শ্রাবণীর কথাটা ভাবছে। সে বলেছিল, দেখবি সুযোগ আসবেই একদিন।

মেঘনা মনে মনে এই সুযোগটা হারাতে চায় না। তিনুও ভাবছে কথাটা। সন্ধ্যার পর যোগিন হরিদাস ওদিকে বসে গল্প করছে। উনুনে রান্না চাপিয়েছে মেঘনা। জ্বলন্ত কাঠের আগুনের আভা পড়ছে মেঘনার নির্মেদ পুরুষ্ট গালটাকে কেমন যেন মোহময়ী করে তুলছে সঙ্গে তাকেও।

তিনু বলে, কি ফ্যাসাদে পড়লাম বল তো? দুর্গাপুরের ইস্টেজে ওসব নামী লোক খবরের কাগজের লোকেদের সামনে গান কি হবে রে। আমরা কি যাব ওখানে?

মেঘনা বলে, বাউল, নিশ্চয়ই যাবো আমরা। গানও গাইব—আমরা দেখাব পথের বাউল গায়করা এস্টেএজও গাইতে পারে।

মেঘনা চায় এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে।

ভূধরবাবু সামান্য অবস্থা থেকে অনেক উপরে উঠেছে। এখন তাকে আর লোকজন দিয়ে রাতের অন্ধকারে ওয়াগান লুঠ করতে হয় না। ঘরে বসেই তার ঠিকাদাররা লাখ লাখ টাকা লুঠ করে। অবশ্য এরজন্যে বেশ কিছু নেতার পিছনে অন্যান্য জায়গায় খরচ করতে হয়। কলের জল বের করতে হলে যেমন কলে আগে একটু জল ঢোকাতে হয় — এ যেন তেমনই। ভূধরবাবু এখন এই অঞ্চলের নামী লোক। তারই সিনেমা হলে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। এসেছে বহু নামী লোকজন, কলকাতা থেকে খবরের কাগজের লোক, টিভির লোকজনও এসেছে। ভূধরবাবু এখন কলকাতার সিনেমা

জগতেও বেশ পরিচিতি ঘটিয়ে তুলেছে। তার কালোটাকার অভাব নেই। বিশেষ করে আসানসোলের বেশ কিছু সদ্য পরিত্যক্ত কয়লাখনির রাতের মালিকানা এসে যায় তার লোকজনের হাতে। তারাও লোকজন নিয়ে তৈরি থাকে। রাতের অন্ধকারে তারা নেমে যায় সেইসব পরিত্যক্ত কয়লার খাদানে। মাটির অভ্যন্তরে তারা এখান সেখান থেকে টন টন কয়লা তোলে বে-আইনি ভাবে। আর তাদের এসব মাল পাচার করার জন্যে ট্রাকও তৈরি থাকে। ওসব কয়লা রাতের অন্ধকারেই নানা জায়গায় পাচার হয়ে যায়।

পুলিশ এসব নিয়ে নীরব থাকে। কারণ এই কাজে তাদেরও ভালোই প্রণামী জোটে।

ভূধরবাবু এসব কালো টাকা সাদা করার জন্যে কলকাতায় নানা ব্যবসা করে। এর মধ্যে দু-একটা ফিল্মও তৈরি করেছে। তাতে লোকসানও হয় তবে একটা ছবি কোনওভাবে হিট করলে দুটো ছবির লোকসান পুষিয়ে যায়।

ভূধরবাবু সেদিন মেঘনাকে দেখেছিল ক্ষণিকের জন্যে। মেয়েটাকে দেখে একনজরেই বুঝেছিল এর ভিতর আগুনে আছে। ভূধরবাবু সেদিন থেকেই কথাটা ভাবছে। উৎসবের দিন এই অঞ্চলে সাড়া পড়ে যায়। সব টিকিট বিক্রি হয়ে গেছে। ভিড়ে ভিড়। মাইকে ঘোষণা হচ্ছে শিল্পীদের নাম।

নন্দু চাটুজ্জে গাড়িতে করে এনেছে তিনু আর মেঘনাকে। মেঘনা আজ ভাল শাড়ি পড়েছে। তিনুর পরনে সেই বাউলের পোশাক।

ওদের গাড়িটা এসে থামে সাজানো হলের সামনে। সানাই বাজছে। লোকজন গাড়ির ভিড়। তিনু বলে, — এ কোথায় এলাম রে?

মেঘনা যেন স্বপ্ন দেখছে। সে আজ এত বড় আসরে গাইবে। মেঘনা বলে, ভিতরে চলো বাউল।

তিনু বলে, এ যে রাজপ্রাসাদ রে। কত লোকজন — এসেছে কলকাতার নামী শিল্পীরাও। দূর জেলা থেকেও এসেছে শিল্পীর দল। মেঘনা জানে এখানে তাকে জয়ী হতেই হবে।

সন্ধ্যার অনুষ্ঠান শুরু হয়। তিনু গাইছে—

“পাখি কখন উড়ে যায়
বদল হাওয়া লেগেছে খাঁচায়-
কার বা খাঁচা, কার বা পাখি—
কবে আসে পাখি, পথ চেয়ে থাকি।
কার জন্যে বুজে আঁখি-
পাখি আমাদের কাঁদাতে চায় —”

সারা হলে স্তব্ধতা নেমেছে। তিনু গেয়ে চলেছে সুর গিয়ে পৌছেছে হলের বাইরেও। আজ সে এই পরিবেশকে ভুলে গেছে, তিনু তার গুরুর শেখান গান থেকে গাইছে তার আজকের গান —

“মন ফকীরা-
প্রেম করে তুই পড়লি বিপদে—”

মেঘনাও তৈরী। এই উৎসবের মধ্যে দিয়েই তার স্বপ্নকে ছুঁতে হবে। মেঘনা গাইছে তার সেরা গান কটা। তিনু তখন সঙ্গে গাইছে। মেঘনা গেয়েছে তিনুর সঙ্গে। মেঘনার যৌবনের মুখরতা সারা হলের দর্শকদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে। ওর সুরটা যেন সারা হলে ছড়িয়ে পড়ে। ওদের অনুষ্ঠানের পর সারা হল করতালিতে ভরে ওঠে। ওরা দর্শকদের উদ্দেশ্যে নমস্কার করে।

ভূধরবাবু আরও অনেকে এগিয়ে আসে। দু-একটা টিভি চ্যানেলের লোক ওদের গানও রেকর্ড করেছে। ছবিও নেয় খবরের কাগজের লোকেরা।

নন্দু চাটুজ্জে বলে, কি ভূধরদা বলিনি — ছেঁড়া বস্তার মধ্যে বাসমতী চালও থাকে।

ভূধর বলে, তা সত্যি নন্দু। ওরা ফিরছে গাড়িতে।

নন্দু বলে, নে বাবু, তোদের আরও পাঁচ হাজার টাকা, দুজনের দশ হাজার টাকা দিচ্ছে। যা নাম ফাটিয়েছিস তোরা।

যোগিন হরিদাসরা জেগেই ছিল। ওদিকে হাইওয়েতে এখন আলো জ্বলে। রাতের অন্ধকার বিদীর্ণ করে ছুটে যায় ট্রাকগুলো দূরপাল্লায় যাত্রীবাহী বাসও চলে। বিদেশিরা এসেও বেশ খানিকটা জায়গা দখল করেছে এই বনের ধারে। শাল মহুয়ার গাছ কেটে বিশাল ধাবা বানিয়েছে। ওখানে খাবারের সঙ্গে মদও খায় পাবলিক। রাতভোর চলে হইহল্লোড়। তার ওদিকে বনের ধারে গড়ে উঠেছে একটা আধুনিক প্রযুক্তি সম্পন্ন আয়রনের কারখানা। কারখানার চিমনি থেকে ধোঁয়া বের হয় গলগল করে। চারিদিকে মাঠের সবুজ ধান গাছ, মায় বনের সবুজ-বনাঞ্চলের শাল-মহুয়ার পাতাগুলোও কুঁকড়ে যায়, কালচে হয়ে যায় তার বিষে।

যোগিন বলে, পাতাজোড়ার সব সবুজকে ওরা শ্যাষ কইরা দিবেক গো। বুক ভরা একদিন বাতাস নিয়েছি। আজ সেই বাতাসে বিষ মিশছে গো —

হরিদাস বলে, ই যে সভ্যতার জ্বালা গো। ঘর ছাড়ছি, দ্যাশ ছাড়ছি, ইবার এসবের জন্যে পৃথিবীটাই না ছাড়তে হয়। ওরা কাশছে। দুটো বুড়ো যেন এবার এই জগতের বিকৃত রূপটাকে দেখে অজানা ভয়ে শিউরে উঠছে।

ওদের গাড়িটা এসে থামে। বিজয়নীর মতো নামছে মেঘনা। পিছনে তিনু। সে যেন এখানে এসে শান্তি পায়। বলে, —অতো লোকজনের ভিড় — গোলমালের মধ্যে যেন হারিয়ে গিয়েছিলাম রে। ইখানে ফিরে এসে মনে হল যেন ঘরে ফিরছি। শান্তি পেয়েছি। লোকজনের যেন ঢেউ বয়েছিল - বাবারে—

মেঘনা যেন এতক্ষণ তার স্বপ্নের জগতে হারিয়ে গিয়েছিল। অত লোকজনের স্বীকৃতি, ভূধরবাবুর প্রশংসা তাকে যেন অন্য জগতে নিয়ে গিয়েছিলো। টিভির লোকজনের সঙ্গে কথা বলেছে। মেঘনা বলে — আবার সেই চালাঘর, সেই বনের ধার। কাল আবার বাজারে গানের আসর।

মেঘনা জিনিসপত্রগুলো নামায় — বেশ কিছু প্যাকেট, টাকাও সে পেয়েছে। তিনু ওসবের খবরও রাখে না।

শ্রাবণীও শুনছে মেঘনার কথা। মেঘনা বর্ণনা দিয়ে চলেছে ওদের দুর্গাপুরের বিজয়ের কাহিনী। খবরের কাগজেও তাদের ছবি ছাপা হয়েছে সঙ্গে তাদের গানের প্রশংসাও করেছে। শ্রাবণী বলে, দ্যাখ এবার যদি বাইরে থেকে ডাক আসে। এরমধ্যে সদর শহর, এদিকে আসানসোল থেকেও কয়েকটা গানের আসরে ডাক আসে।

মেঘনা বলে, টাকার কথা আমি বলছি।

তিনু বলে, যা ভালো বুঝিস কর। বেশ ছিলাম — ইবার এমন করে দৌড়াতে হবে তা ভাবিনি।

মেঘনা বলে, মা লক্ষ্মী দরজায় এলে তাকে ফিরায়ে দেবে? তিনু রাজি হয় বাধ্য হয়ে। ওদিকে যোগিনের শরীর খারাপ। বুক ধড়ফড় করে। সেই কারখানার পঞ্জীভূত কালো ধোঁয়া এদিকের কিছু গাছগুলোকে কালো করে তুলছে, অনেক গাছের পাতাও ঝরে গেছে। পত্রহীন জীর্ণ ডালগুলো ভেঙে পড়ে। গাছগুলো ক্রমশ মুখিয়ে আসে শেষ হয়ে যায়।

হরিদাস বলে, ইখানে মানুষ আর বাঁচবে না গো।

ডাক্তারও ওষুধ দেয়।

যোগিন বলে, আর ঔষুধে কাজ হবে নাই গো। গাছের পাতাগুলোর মতো আমিও ঝরে পড়ব।

বর্ষা নেমেছে, প্রান্তরে আর ফাঁকা জায়গা নেই। নতুন লোকের ভিড়ে ভরে উঠেছে পাতাজোড়ার প্রান্তর। পথের ধারে বাজারে গড়ে উঠেছে তিনতলা বড় বড় বাড়ি। শাল বনের শ্যামলিমা হারিয়ে গেছে। তবু বৃষ্টি নামে আকাশ ভেঙে। আশ্রমের পাশের পুকুরগুলো বর্ষার জলে ভরে গেছে। সেদিন বাজারে যেতে পারিনি তিনু আশ্রমেই রয়েছে। তবে পাতাজোড়ার জীবন চলেছে তার নিজের ছন্দেই। গাড়িগুলো বৃষ্টির মধ্যেই যাত্রীদের নিয়ে ভেজাকাকের মতো যাতায়াত করছে। হাট বাজারও বসেছে। তবে আকাশও থেমে নেই। গাছগুলোর গা-বেয়ে বৃষ্টিরধারা নেমেছে।

যোগিন কদিন ধরেই কথাটা ভাবছে। তার শরীর মোটেই ভালো যাচ্ছে না। কখন কি হয়ে যাবে কে জানে। তিনুর দাদাও আর তিনুর কোনও খোঁজখবর রাখে না।

ওদিকে হরিদাসও ভেবেছে কথাটা। হরিদাসের ছেলে এখন দুর্গাপুরেই গেড়ে বসেছে। সেও তার বাবা বোনের খবর রাখে না। হরিদাসেরও শরীর ভেঙে পড়ছে। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয়। বুক ধড়ফড় করে। হরিদাসও বলেছে যোগিনকে — মেয়েটার জন্য ভাবনা হয় বাউল। আমি ছাড়া এ জগতে তার আর কেউ নেই। ছেলেটাও আর কোনও খবর নেয় না। আমি মরলে মেয়েটার যে কি গতি হবে? দ্যাশছাড়া, ঘরছাড়া হয়ছি, মাইয়াটাও কি লক্ষ্মীছাড়া হই যাইবো?

যোগিন সেদিন বৃষ্টিভরা ছাই রং-র আকাশ দেখে কি ভাবছে।

যোগিন বলে, বাউল, যদি তিনু মেঘনাকে ওদের ঘরবেঁধে দিই — দুজন দুজনকে চেনে, দুজনে গান গায়। দুজনে যদি ঘর করতে পারে।

হরিদাস কথাটা শুনে বলে, খাসা হইব বাউল। তিনুর মতো পোলা যদি ঘরে নেয় তো জয় গুরু।

হরিদাস কথাটা ভেবেই খুশি হয়। তারপর সে বলে, — ভয়, তিনু কি রাজি হইব?

যোগিন বলে, আমি বলছি ওদের।

তিনুও কথাটা শুনেছে। ওদিকে বৃষ্টির দিনে মেঘনা রান্না করছে। আজ তাদের ছুটি। মেঘনার হাতের রান্না বেশ উপাদেয়।

মেঘনা আজ ঘুমচ্ছে। তিনু দেখছে ওকে। তিনুর মনেও ওদের এই কথাটা যেন বিচিত্র একটা সুর তোলে। নতুন চোখে দেখছে তিনু —মেঘনাকে। ওর যৌবনমদির দেহ — ডাগর ডাগর দুটো চোখ, তিনুকে যেন কোনও এক স্বপ্নের জগতে নিয়ে যায়। মেঘনার সঙ্গে মিশেছে তার সঙ্গে এতদিন গান করেছে ঘুরেছে তবু তিনু তাকে নিয়ে এমন স্বপ্ন আগে কোনও দিন দেখেনি।

তিনু এখন গান নিয়ে ভাবে। পাতাজোড়ার স্কুলের গানের মাস্টার হরেনবাবুর কাছে তিনু নতুন কিছু গানও শিখেছে। সে গেয়ে ওঠে — "শ্রাবণ

মাসের মেঘ গরজায়-
শূন্য মনের মাঝে —"

মেঘনা মুগ্ধ নয়নে বলে, এ যে রাধিকার বিরহের গান গো — তিনু বলে একালের রাধিকাদের বিরহ বেদনা আর নাই গো। মেঘনা দেখছে তিনুকে। সে বলে — কে বল্লো একথা?

তিনু দেখছে মেঘনাকে। মনে হয় ওদের আলোচনার কথাটা সে জানাবে মেঘনাকে। কিন্তু পারে না। তিনু জীবনে নিজের জন্যে কিছু চায়নি কোনওদিন। তাই আজও সে তার মনের কথা জানাতে পারে না।

মেঘনাও তিনুর এসব কথায় বিস্মিত হয়েছে। তিনু এমন ভাবে কোনও দিন কথা বলেনি। মেঘনার কাছে তিনুর এই কথাগুলো একটা নতুন প্রশ্নের মতো বোধ হয়।

সেদিন রাতে কথাটা বলে হরিদাস মেঘনাকে। বাইরে তখন বৃষ্টি পড়ছে। গাছে-গাছে, পাতায়-পাতায় বৃষ্টির সুর ওঠে। বনের দিক থেকে দু-একটা শিয়াল ডাকছে। রাতের স্তব্ধতার মাঝে শব্দ তুলে রাস্তা দিয়ে ট্রাকগুলো ছুটে চলেছে।

হরিদাস বলে, মেঘনা আমার শরীর গতিক ভালো ঠেকছে না। তোর দাদাটারও কোনও খবর নেই। তোকে নিয়ে বড় ভাবনা হয় মা। মেঘনা বলে বেশ তো আছি। গান-বাজনা করছি, রোজগার করছি।

হরিদাস বলে, না মা, আমি আজ আছি কাল নেই? আমি না থাকলে তখন তোর কি হবে? তাই একজন মানুষকে প্রয়োজন যে তোর পাশে থাকবে, যে তোকে আপন করে নেবে। তাই ভাবছি, তুই আর তিনু যদি একসাথে ঘর বাঁধিস—

মেঘনা চমকে ওঠে। তার মনে পড়ে তিনুর কথাগুলো। তাহলে তিনুও মনস্থির করে ফেলেছে। কিন্তু মেঘনা এই বনভূমির ধারে এই চালাঘরে ঘর বেধে বাঁধা পড়তে রাজি নয়। তার চোখে এখন নতুন জগতের স্বপ্ন। সে চায় শহরের আলো ঝলমলে বিলাস বহুল জগৎ। প্রাচুর্যের জগৎ। সে তার গান-তার রূপ দিয়ে সেই জগতে প্রতিষ্ঠা পেতে চায়।

হরিদাস মেঘনাকে চুপ করে থাকতে দেখে বলে,— এহনি তোরে কিছু বলতি হবে না। ভাবনাচিন্তা কইরা কইবি। নে শুইয়্যা পড়। রাত হইছে—

হরিদাসও ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ে। মেঘনার ঘুম আসে না। সে বেশ ভাবনাতেই পরেছে এই কথাটা শুনে। এরমধ্যে তিনুকে আসানসোল যেতে হবে কয়েকটা অনুষ্ঠানের জন্যে। মেঘনারও যাওয়ার কথা। তবে দুটো বুড়োরই শরীর খারাপ, তাই মেঘনা থেকে যায়। আর মেঘনাও তিনুর সঙ্গে এই কয়েকদিনের বাইরের অনুষ্ঠানে যেতে চায় না। সেদিনের পর থেকে মেঘনা তিনুর সঙ্গে কথা বলে, তবে একটা দূরত্ব রেখে চলেছে। সে যেন তিনুর স্বার্থপর মনটাকে আজ চিনেছে। তার মনে হয় তিনু হিসাব করেই তার দিকে এগিয়েছে। এর জন্যেই তাকে একদিন এখানে এনে তুলেছে।

মেঘনা আজ নিজের কথাই ভাবছে। এই বন্দিজীবন থেকে সে যেন মুক্তি পেতে চায়। সে এই প্রান্তর পরিবেশ থেকে আরও বৃহত্তর জগতের পথে হারিয়ে যেতে পায়।

তিনু চলে গেছে বাইরে অনুষ্ঠান করতে। মেঘনা একাই বাজারে আসে, একাই গান গায়। আজ তাকে একা দেখে ভিড় জমে। ভাল দক্ষিণীও পায়।

বেলা হয়ে গেছে। আজকের দিনটা বেশ রোদ উজ্জ্বলই। আকাশে মেঘের দেখা নেই। দূরে মাঠে সবুজ ক্ষেতের মধ্যে হাওয়া আলোড়ন তোলে। ওদিক থেকে নন্দু চাটুজ্জেকে আসতে দেখে চাইল।

নন্দু বলে, তোমাকেই খুঁজছি। তিনু নেই?

মেঘনা বলে, ও বাইরে গেছে গান গাইতে —

নন্দু চাটুজ্জে বলে, ভালই হয়েছে।

নন্দু চাটুজ্জে ওকে তার সাজানো-গোছানো দোকানে নিয়ে আসে। ওর দোকান এখন জমে উঠেছে। টিভি ফ্রিজ পাখা মায় এয়ারকুলার সি.ডি. এছাড়া নানা রকম জিনিসপত্র মেলে। দোকানে নামী সব ফিল্মস্টারের ছবি টাঙানো।

ওদিকে ওর নিজের অফিসে নিয়ে যায় মেঘনাকে। মেঝেতে কার্পেট, গদিওয়ালা চেয়ার । মেঘনা সেখানে বসতে ইতস্তত করে।

নন্দু চাটুজ্জে এর মধ্যে ভূধরবাবুকে ফোনে খবর করে দিয়েছে।

ভূধরবাবুর মুখে শুনছে নন্দু চাটুজ্জে মেঘনার কথা।

ভূধরবাবু বলে, মেঘনার অনেক প্রতিভা। যেমন রূপ-যৌবন তেমন তার গানের গলা। ওর এখানকার অনুষ্ঠানে গান শুনে কলকাতার নামী ক্যাসেট কোম্পানি ওকে তাদের দুটো অ্যালবামে গান গাওয়াতে চায়।

নন্দু চাটুজ্জে শুনছে ওর কথা।

ভূধর বলে, ক্যাসেট অ্যালবাম করলে করুক, আর আমিও দেখছি আমাদের নতুন ছবির হিরোইন লাগবে — গান জানা মেয়ে। আমার মনে হয় দারুণ ফিট করবে ওকে। আমি ডিরেক্টারকে এখানে আসতে বলেছি। সেদিন যদি মেঘনা আসে আর একবার যদি পছন্দ হয়ে যায় মেয়েটার বরাত ফিরে যাবে। তখন মেঘনা হবে ছবির হিরোইন।

নন্দু চাটুজ্জে জানে ভূধরবাবুকে তার হাতে রাখতে হবে। কারণ নন্দু চাটুজ্জে এখন এখানকার নেতা হতে চায়। তাই নন্দু ভূধরকে বলে আপনি ভাববেন না ভূধরদা। মেঘনাই হবে আপনাদের ছবির নতুন হিরোইন।

ভূধর বলে, ওর বাবা আর ওই যে তিনু বাউল ওরা আবার ব্যাগড়া দেবে না তো?

নন্দু ওর কথা ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে বলে না না। তাহলে তিনু বাউলকে ঠান্ডা করে দেব।

নন্দু চাটুজ্জে মেঘনাকে তার অফিসঘরে বসিয়ে ঠান্ডা পানীয় দিয়ে বলে, ভূধরবাবু-র কলকাতায় খুব নামডাক। ও যদি তোকে সাহায্য করে তাহলে তুই ক্যাসেট কোম্পানিতে গান গাইতে পারবি এমনকি সিনেমার নায়িকাও হয়ে যাবি। ভালো টাকাও দেবে। কলকাতায় ওর কত ফ্ল্যাট ঘর আছে একটাতে থেকে যাবি। আর একটা ছবি হিট করলে তোকে আর পায় কে? তখন দেখবি বোম্বাই থেকেও ডাক আসবে —

মেঘনা যেন স্বপ্ন দেখছে।

মেঘনা বলে, আমি পারব চাট্টুজ্জেবাবু?

নন্দু বলে, তোর গান শুনে আর তোর ছবি দেখেই তো ওরা তোকে ডেকেছে। দেখবি তুই ঠিক পারবি। তোর মতো গুণী শিল্পী এখানে পড়ে থাকবি তাই কি হয়।

মেঘনা বলে, বাবাকে বলি।

নন্দু চাট্টুজ্জে বলে, এখন এসব কথাতো পাকা হয়নি। আগে এদিকের ব্যাপার সব পাকাপাকি হয়ে যাক, তারপর এইসব কথাগুলো জানাবি। আগেভাগে এখন জানাবার দরকার নেই। নন্দু চাট্টুজ্জে মেঘনাকে সাবধান করে দেয়। মেঘনাও ভেবেছে কথাটা সে বলে ঠিক আছে। এই রোববার আমি তোমার এখানে চলে আসব সকালে।

নন্দুও খুশি হয়।

মেঘনা যেন স্বপ্ন দেখছে। পথে সিনেমা হাউসটা পড়ে। আজ শুক্রবার, নতুন ছবি আসবে। সামনে পোস্টারে নায়িকার বিরাট পোস্টার। পোস্টারটা দেখছে সে। মেঘনার মনে হয় একদিন এই হলের সামনে তার ছবিও চালানো হবে। সে এখন গাছের নীচে গান গেয়ে পয়সা রোজগার করে দুদিন পর তার গান ক্যাসেটে শোনা যাবে —এই কথাটা ভাবতেই মেঘনার শিহরন মেলে যায়। মেঘনা তখন আর এই পাতাজোড়ায় থাকবে না।

তবু মেঘনা একজনকে এই কথাটা না বলে পারেনি। শ্রাবণীদিকে সে জানায় কথাগুলো। শ্রাবণীর কাছে মাঝে মাঝে আসে মেঘনা। শ্রাবণীকে তিনুর কথাটাও জানিয়েছিল মেঘনা।

শ্রাবণী বলে, তোকে অনেক এগোতে হবে। দেখবি দিন ঠিক আসবে।

মেঘনা আজ সেই কথাটা জানাতে শ্রাবণী বলে,

—কি বলিনি তোকে, বাইরের জগৎ থেকে তোর ডাক আসবেই। এই ডাকে তুই সাড়া দিবি মেঘনা।

মেঘনা বলে তাহলে যাব দুর্গাপুরে? কলকাতা থেকে লোক আসবে ওখানে কথা বলতে — শ্রাবণী বলে — তুই নিশ্চিয়ই যাবি। ডাক এলে চলে যাবি। ওরে এই অচেনা জগতকে নতুন করে চিনে নিতে পারবি। তোকে এগিয়ে যেতেই হবে।

মেঘনা আশ্রমে কাউকে এসব কথা বলেনি। যোগিন হরিদাস দুজনেরই শরীর ভাল নেই। তিনুও এখন এসময় বাইরে গেছে গান গাইতে। মেঘনা সেদিনও রোজকারের মতো বেড়িয়ে এসেছে গান গাইতে। এখান থেকেই চলে আসে নন্দু চাট্টুজ্জের দোকানে। নন্দুর গাড়িও রয়েছে।

নন্দু বলে, এসে গেছিস। বাঃ দারুণ মেকআপ দিয়েছিস তো। মেঘনা যে শ্রাবণীর বাড়ি থেকে এসব করে এসেছে তা জানে না। গাড়িতে উঠে বসে।

ভূধরবাবুর এদিকে নতুন হোটেলও হয়েছে। কলকাতা থেকে তার ডিরেকটার, ক্যাসেট মালিক এমনকি চিত্রনাট্যকারও এসেছে।

সেই হোটেলের ঘরে নিয়ে আসে তাকে ভূধরবাবু। ভূধরবাবু নিজে পরিচয় করিয়ে দেন— এই ডিরেকটার এই মেঘনা। এর কথাই বলছিলাম।

ডিরেকটার দেখছে মেঘনাকে। এরমধ্যে চিত্রনাট্যকারও তার ছবির দু-চার লাইন তাকে পড়িয়ে শিখিয়ে বুঝিয়ে দেন। ওপার বাংলা থেকে আসা একটি উদ্বাস্তু মেয়ের চরিত্র।

মেঘনা এব্যাপারটা ভালোই জানে।

তাই দু-চার লাইন ডায়লগ পড়ে ঠিকঠাক অভিনয় করে দেখাতেই ডিরেকটার বলে সুপার, ভূধরবাবু ঠিক এমনি একটা মেয়েকেই চেয়েছিলাম। গানও জানে — মেঘনার গানের গলাটাও ক্যাসেট মালিকের পছন্দ হয়। তাই সেও খুশি এমন একটা গায়িকা পেয়ে।

ভূধরবাবু বলে, কি সমীরবাবু বলিনি হিরোইন যা দেব দেখে নেবেন।

এসবের মধ্যে এদের কথাবার্তা হয়ে যায়। মেঘনা যে একসঙ্গে এতো টাকা পাবে তা সে জীবনেও কল্পনা করতে পারেনি। সমীরবাবু তাকে একটা মোটা খাম দিয়ে বলে এতে পঁচিশ হাজার টাকা আছে গুনে নিও।

মেঘনার হাত কাঁপছে। সে বলে ঠিক আছে।

ভূধর বলে — তাহলে এই কথাই রইল। দিন দশ-পনেরো বাদেই কাজে নামা হবে। আর ওকে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে সেটেল করিয়ে দেব। আমাদের কাজ শুরু হবে তারপরই।

মেঘনা ফিরছে। আজ তার সামনে নতুন জগতে-এর ডাক। কিন্তু আশ্রমে ফিরে দেখে দু-চারজন লোকের ভিড়। মেঘনা একটু অবাক হয় — সে এগিয়ে আসে। দেখে যোগিন কাঁদছে। মেঘনাকে আসতে দেখে যোগিন বলে ওঠে, — মেঘনা হরিদাস আর নেই রে।

চমকে ওঠে মেঘনা। তার পায়ের নীচ থেকে যেন মাটি সরে যাচ্ছে। তার বাবাও চলে গেল। আজ একদিকে পূর্ণতা — অন্যদিকে অসীম শূন্যতা। মেঘনা অসহায় কান্নায় ভেঙে পড়ে।

খবর পেয়ে কয়েকটা অনুষ্ঠান বাতিল করে, কয়েকটা অনুষ্ঠানের দিন পিছিয়ে দিয়ে ফিরে আসে তিনুও। এরমধ্যে একদিন এসেছিল হরিদাসের ছেলে। আশ্রমে সেদিনও ওর শেষ কাজ করেছে।

মেঘনা বাবার শ্রাদ্ধের কাজ করেছে। হরিদাসের ছেলে শুধু একবার মুখ দেখিয়ে চলে যায়।

যোগিন বলে, মেঘনা বাবাকে তুই দেখেছিস। শেষ কাজ তুই কর। ওর আত্মা শান্তি পাবে।

প্রতিবেশীরা এসেছিল। তিনু বাউলও আশ্রমে সেদিন বাজারের কাছের কিছু মানুষকে অন্ন তুলে দিয়েছিলো হরিদাসের আত্মার শান্তি কামনা করে।

যোগিন বাউল এবার নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ে। এখন তারও শেষ অবস্থা। তবু সে চায় হরিদাসের শেষ ইচ্ছা সে পূর্ণ করবে।

সেদিন মেঘনা চুপ করে বসে আছে। কদিন তিনু তাকে গান গাইতে যেতে দেয়নি। মেঘনাও ওর জীবনে যে একটা পিছুটান ছিল সেটাও কেটে গেছে। মেঘনার মন টেকে না আর এখানে। আর মেঘনাও ভূধরবাবুদের সঙ্গে তার কথাবার্তার কাউকেই কিছু জানায়নি। জানাবার দরকারও বোধ করে না সে।

বিকাল নামছে। তিনু ফিরে এসেছে বাজার থেকে। ওদের খাওয়া-দাওয়ার পর যোগিনই ডাকে মেঘনাকে। তিনুও রয়েছে। যোগিন বলে — তোর বাবার একটা ইচ্ছা ছিল মেঘনা। মেঘনা চাইল যোগিনের দিকে।

যোগিন বলে, তোর বাবা চেয়েছিল তুই আর তিনু ঘর বাঁধ। হরিদাস গেছে আমিও কবে যাব ঠিক নেই। তাই অমি যাওয়ার আগে তোদের বিয়ের ব্যাপারটা চুকিয়ে দিয়ে যেতে চাই।

মেঘনা জানত বাউল এই কথাই বলবে। কিন্তু মেঘনা চুপ করেই থাকে। তিনু ওদিকে বসে আছে।

তিনুও স্বপ্ন দেখে দুজনে মিলে এই আশ্রমকে আরও বড় করে গড়ে তুলবে।

মেঘনাকে চুপ করে থাকতে দেখে যোগিন বলে,

—কী মেঘনা?

তিনু বলে, বাউল। সামনে আর কটা অনুষ্ঠান আছে। ওদের দিন ঠিক হয়ে গেছে। এবার যেতে হবে। ওসব অনুষ্ঠান শেষ করে এসে সব ঠিক হবে। আর তো কটা দিন। ফিরে এসেই না হয় যা হয় করা যাবে। মেঘনা তিনুর কথায় যেন কিছুটা শান্ত হয়। তবু বেশ কিছু দিন সময় পাবে সে।

যোগিন বলে, ঠিক আছে। তাহলে অনুষ্ঠানে গাওনা সেরে ফিরে আয়। তারপর কিন্তু আমি আর অপেক্ষা করতে পারব না। আমি শুধু ভয় পাই কখন যে ডাক আসবে আমার তখন কে দেখবে তোদের। হরিদাস তো চলে গেল।

তিনু বলে এসব কথা কেন ভাবছ গোঁসাই। তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হবে। ভেব না। আগে অনুষ্ঠানগুলো শেষ করে আসি। পরের দিনই চলে যায় তিনু, আসানসোলে ওদের কয়েকটা অনুষ্ঠান সেরে তারপর বাঁকুড়ায় এসে দুটো অনুষ্ঠান করে দিন পনেরো বাদে ফিরবে।

তিনু যাবার সময় বলে মেঘনাকে — মেঘনা, কদিন তোমাকে আর বাইরে যেতে হবে না। বাউল রইল সাবধানে থেকো তোমরা।

তিনু চলে যায়। আজ তিনুর মনে যেন নতুন আশার সুর জাগে। ফিরে এসে ওদের বিয়েটা পাকা

করবে। কয়েকটা ঘরও বাড়াবে। এরমধ্যে বেশ কিছু তরুণ এদিকে আনাগোনা শুরু করেছে। তাদের নিয়ে এই বাউল গান আশ্রমের প্রচার শুরু করবে। মেঘনাও থাকবে তাদের পাশে। মেঘনা চুপ করেই থাকে। বাবা মারা যাবার পর থেকে মেঘনা কেমন যেন গুম হয়ে থাকে। মাঝে মধ্যে রেওয়াজ করে বাবার শেখানো গানগুলি গায়।

যোগিন বলে, রেওয়াজ করবি মা। গানের মধ্যে তাকে খুঁজে পাবি। বাউলের কাছে গানই ছিল তার সাধনা। গায় মা জয়গুরু —

সেদিন দু-একটা গান গেয়েই ওঠে যায়। এখন তার টাকার জন্যে গান গাইতে হয় না।

যোগিন দেখছে মেঘনাকে। সেদিন মেঘনা এসেছে বাজারে। কি ভেবে নন্দু চাটুজ্জের ওখানে গেছে। নতুন ছবির গান বাজছে। মেঘনা সোজা চলে যায় তার অফিসে। এখন দেখেছে মেঘনা তার সেই হীনমন্যতা অনেক কেটে গেছে। সোজা নন্দু চাটুজ্জের অফিসে গিয়েই হাজির হয়।

নন্দু চাটুজ্জে তখন অন্য কাজে ব্যস্ত। ওকে দেখে বলে, — এসেছিস ভালই হয়েছে। পাকা কথা হয়েছে। এর মধ্যেই ওর জন্যে ঠান্ডা পানীয় চলে আসে। আর ফোনটাও বেজে ওঠে তখনই।

নন্দু চাটুজ্জে ফোনটা ধরে বলে — হ্যাঁ, ভূধরদা। হ্যাঁ, হ্যাঁ ঠিক আছে। ও এখানে এসেছে, কথা বলবেন —

ফোনটা ধরিয়ে দেয় মেঘনাকে। মেঘনা অবশ্য ভাবেনি যে ব্যাপারটা এতো তাড়াতাড়ি এগিয়ে যাবে।

ভূধরবাবু বলে, মেঘনা। কলকাতায় সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে। তুমি কালই নন্দুর সঙ্গে তৈরি হয়ে চলে এসো। আমি তোমাকে কলকাতায় পৌঁছে দেব। ওদের ছবির কাজ শুরু হচ্ছে। কলকাতায় ফিরে মিউজিক অ্যালবামের কাজটা সেরে ফেলতে হবে। নন্দুকে ফোনটা দাও — মেঘনা নিজেই কল্পনা করতে পারেনি যে কাজটা এত তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে।

নন্দু চাটুজ্জে তখন ফোনে ভূধরদাকে কথা দেয় যে — কালই মেঘনাকে সে ওদের হোটেলে পৌঁছে দেবে। ফোনটা নামিয়ে রেখে নন্দু চাটুজ্জে বলে, —একেই বলে যোগাযোগ। তাহলে চল্লি এবার এখান থেকে রাজ্য জয় করতে। তাহলে কাল সকালে তৈরি হয়ে চলে আসবি। ভালই হয়েছে, পিছুটান ছিল বাবাটা, সেও তোকে মুক্তি দিয়ে গেছে।

শ্রাবণীই ব্যাপারটা জানে। তাই মেঘনা এসেছে তার কাছে। শ্রাবণী সব শুনে বলে,

—চলে যা মেঘনা। চিন্তা করে কি হবে। পিছনে অনেক কিছু ফেলেই এগিয়ে যেতে হবে তোকে। আমি নিজেকে বন্দী করে ফেলে বুঝেছি রে পিছিয়ে পড়ার যন্ত্রণা কী। তুই থামবি না। জীবনে প্রেম-ভালবাসা অনেক জুটবে। কিন্তু এমন সুযোগ আর একটাও আসবে না। এই সুযোগ ছাড়তে নেই মেঘনা।

মেঘনা বলে, আমিও তাই চাই দিদি। আমাকে উপরে উঠতেই হবে।

আশ্রমে এসেছে মেঘনা। যোগিন কাসছে। মেঘনাকে দেখে বলে আয় মা। কোথায় গিয়েছিলি। তোকে না দেখলে মনে হয় আশ্রমটা শূন্য হয়ে গেছে। তোরা এবার দুজনে মিলে এই আশ্রমটা সুন্দর করে গড়ে তোল। আমার কোনও ঠিক নাই চোখেও আর সেভাবে দেখতে পাই না তাই যা করার এবার তোদেরকেই করতে হবে। জয়গুরু — মেঘনা বলে, চা আনব - · যোগিন বলে মায়ের আমার নজর সবদিকেই।

সন্ধ্যা নামছে। যোগিনকে খাবার দিয়ে গেছে মেঘনা। আশ্রমের কাজ দেখাশোনার জন্যে এখন নিধুর মাকে রেখেছে তিনু। মেঘনা নিধুর মাকেও খেতে দেয়।

নিধুর মা বলে— তুমি খাবে না?

মেঘনা বলে, তোমরা খাওনা মাসি—আমি পরে খাব।

আজ মেঘনার ঘুম আসে না। আশ্রমের এই শান্ত জীবনে আজ তার শেষ রাত্র। কাল থেকে শুরু হবে তার অন্যজীবন। এই জীবনের স্বপ্ন সে অনেক দিন ধরেই দেখে আসছিলো। আজ সেটাই সত্যি

হতে চলেছে। তবু এই আশ্রমের মায়া কাটাতে তার বুক কেঁদে ওঠে। এখানে একদিন আশ্রয় না পেলে সে এই জগতে পৌঁছাতেই পারত না। পথের মানুষ পথেই হারিয়ে যেত। তিনুই তাদের রাস্তা থেকে তুলে এনে এখানে আশ্রয় দিয়েছিল। অন্ন দিয়েছিল — তাকে পায়ের তলায় মাটি এনে দিয়েছিল।

তার বাবাও এদের কাছে কৃতজ্ঞ। শেষ জীবনে তবু শান্তির স্পর্শ পেয়েছিল তার বাবা এখানে এসেই। মনে হয় এই রাতের অন্ধকারে তার বাবা তাকে দেখছে। কাল সকাল হলে মেঘনা চলবে তার নতুন পথে।

আকাশের তারাগুলো এখনও উজ্জ্বল। বাজারে সেই গান গাওয়া পাখিদের প্রভাতী সুর আর শুনতে পাবে না এখানে। মেঘনা তবু কথাগুলো যোগিনকে জানাতে পারে না। যোগিন স্বপ্ন দেখেছে তিনু-মেঘনার বিয়ে হবে, তারা একসঙ্গে আশ্রমের কাজ দেখাশোনা করবে। সুন্দর করে সাজিয়ে তুলবে আশ্রমটাকে।

নানা কথা ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল জানে না মেঘনা। ঘুম ভাঙে তখন সকাল হয়ে গেছে। পাখিদের কলরব ওঠে।

নিধুর মা বলে, কি গো শরীর খারাপ নাকি?

মেঘনা বলে, না। উঠছি।

বেলা বাড়ছে। মেঘনা কাল সন্ধ্যাবেলাতেই একটা ব্যাগ রেখে এসেছিল শ্রাবণীর বাড়িতে। কারণ আজ তাহলে তার বেরোতে কোন অসুবিধা হবে না। যোগিনকে জলখাবার করে দিয়ে তাকে বলে, আমি আসছি বাবা।

যোগিন বলে, দেরি করিস না মা।

মেঘনা জবাব দিল না। ধীর পায়ে আশ্রম থেকে বের হয়ে এল। শেষবারের চেয়ে দেখে আশ্রমটাকে। বাবার মুখটা মনে পড়ে শেষ জীবনের তার বাবার সেই কথাগুলো—একটা মেয়ে কি একা চলতে পারে। একজন সঙ্গী তার চাই-ই।

মেঘনা এবার যাত্রা করবে। আর দাঁড়াবে না। এগিয়ে চলে সে শ্রাবণীদির বাড়ির দিকে। পাতাজোড়ায় মায়া কাটিয়ে সে এবার নতুন দেশে পাড়ি দেবে নতুন জীবনে। সামনে কি আছে তার জন্যে আর ভাবার সময় তার নেই।

এগিয়ে চলে মেঘনা।

বিকাল নামে। আশ্রমের গাছে গাছে ঘরছাড়া পাখিরা সব ফিরে এসেছে ঘরে। তাদের কলরব ওঠে। সূর্য তখন অস্ত যাচ্ছে। শহরের দিকে আলো ফুটে উঠছে।

নিধুর মা আজ আশ্রমে সন্ধ্যা দেয়।

যোগিন বলে, মেয়েটা এখনও ফিরল না?

নিধু বলে আমি বাজারে গিয়েছিলাম —দিদি তো সেখানে গান গাইতে যায়নি আজ।

যোগিন এবার ভীষণ ভাবনায় পড়ে মেয়েটার জন্যে। বুকের ভিতরটা কেমন যেন ধড়ফড় করে।

নিধুর মা বলে, কি গা শরীর খারাপ করছে নাকি? যোগিন কথা বলতে পারে না। ধীরে ধীরে শরীরটা কেমন এলিয়ে পড়ে।

নিধুর মা হাঁক পাড়ে — ওরে নিধু, তাড়াতাড়ি আয়। বাবার শরীর খারাপ।

আশ্রমে আর কেউ নেই। নিধুর মা আর নিধু। যোগিন তখন হাঁফাচ্ছে।

নিধুর মা বলে, ওরে নিধু যা একবার ডাক্তারের কাছে ছুটে যা বাবা।

নিধিও ছুটল অন্ধকারে ডাক্তারের সন্ধানে। আশ্রমে তখন শূন্যতা নামছে। নিঃশব্দ স্তব্ধতায় আকাশের তারাগুলো চেয়ে আছে।

গাড়িটা তখন কলকাতা শহরের অনেকটা কাছে চলে এসেছে।

ভূধর বলে, এসে গেছি কলকাতায়।

মেঘনা দেখছে গাড়ির জানলা দিয়ে ঝকঝকে নতুন শহরটাকে। একদিন খুব ছোটবেলায় সে তার

বাবার হাত ধরে ঘুরতে এসেছিল এই কলকাতা শহরে তাও আবার পায়ে হেঁটে। আজ আর পায়ে হেঁটে না—গাড়িতে চড়েই চলেছে বালিগঞ্জের কোনও এক ফ্ল্যাট বাড়িতে।

গাড়িটা এসে থেমেছে বড় বাড়িটার সামনে। মেঘনা দেখছে বাড়িটাকে। বেশ সুন্দর সাজানো-গোছানো সামনে কিছুটা ফাঁকা জায়গায় বাগান মতো করা। বাড়ির গেটের সামনে রয়েছে দারোয়ান। সে মেঘনাকে সেলাম করে।

মেঘনাকে যেন এই প্রথম কেউ সেলাম করে।

ভূধরবাবু বলে, চলো ভেতরে। সাততলায় ফ্ল্যাট।

মেঘনা জীবনে এই প্রথম লিফ্‌টে-এ উঠেছে। বুকটা কেমন যেন টিপ টিপ করছে। ওদের সঙ্গে লিফটা সাততলায় উঠে যায়। ওদিককার ফ্ল্যাটটা তার জন্যে বরাদ্দ হয়েছে।

এই প্রথম এত উপর থেকে শহর, শহরের পথঘাটগুলোকে দেখছে মেঘনা। তাকে জীবনে আরও উপরে ওঠার জন্যে অনেক লড়াই করতে হবে — তাই যেন মেঘনা এমন মনে মনে ভাবছে আর সেই ভেবে নিজেকে প্রস্তুত করছে।

তিনু তখন আসানসোল শহরের একটা হলে তার অনুষ্ঠান করছে। তিনুকে সারাজীবন ধরে গান গাইতে শিখিয়েছে যোগিন বাউল। নিজের সবকিছু উজার করে তাকে নিজের হাতে গড়ে তুলেছে যোগিন। আজ এই হলে তার গুরুর সেইসব গানগুলিই প্রাণ দিয়ে গেয়ে ওঠে তিনু। সেই বাউল গান।

সারা হলে তার গুণমুগ্ধ দর্শকদের ভিড়। তিনু গানের মধ্যে যেন নিজেকে হারিয়ে ফেলে। তাই একটার পর একটা অনুষ্ঠানে ডাক আসে তার।

তিনু স্বপ্ন দেখে মেঘনা এসেছে তার শূন্যজীবনে। দুজনে ঘর বেঁধেছে। তাই টাকার দরকার। তাই এইসব অনুষ্ঠান শেষ করে সে টাকা নিয়ে বাড়ি ফিরবে।

আসানসোলের অনুষ্ঠান থেকে এসেছে বাঁকুড়া শহরে। সেখানে যে'কটা অনুষ্ঠান আছে সেগুলো ছাড়াও আরও দু-চারটে অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণ আসে তার কাছে।

এদিকে প্রায় পনেরো দিন হয়ে গেছে। এবার তাকে ফিরে আসতে হবে। গ্রামে এসে যোগিন বাউলের ইচ্ছা পূরণ করতে হবে।

তিনু মেঘনার জন্যে দামী শাড়ি আরও অনেক জিনিসপত্র কিনে নিয়ে আসে। আশ্রমের ফিরে দিন কয়েক পরে তাদের বিয়ে হবে।

তাই এবার অন্যান্য অনুষ্ঠানে ডাক আসতে তিনু তাদেরকে বলে — আপনাদের অনুষ্ঠান করতে পারব সামনের মাসে। এখন আমার ফিরে যেতে হবে— আর গাইব না। তারা বলে, ঠিক আছে, তাই হবে।

সেদিন সকালের বাসে তিনু ফিরছে। এখন গ্রামের রাস্তাগুলোতে পিচ হয়ে গেছে। সেই সময়কার এবরো খেবরো রাস্তা আর নেই। গ্রামের সেই নারকেল দঁড়ি বাধা দরজা নিয়ে সেই আদ্যিকালের নড়বড়ে বাড়িগুলো এখন বিদায় নিয়েছে। এসেছে কংক্রিটের নতুন বাড়ি। পাতাজোড়ার সেই গ্রাম্যজীবন অনেকটাই বদলে গেছে।

এখন সকালের ভিড় শুরু হয়েছে। যাত্রীদের কলরব ওঠে দুর্গাপুরের দিকে যাওয়া রাস্তা এখানে এসে মিশেছে। নামছে তিনু চোখে পড়ে বাজারের কাছে সেই গাছটা সেই গান গাওয়ার জায়গাটা।

মেঘনাকে সে কদিন গান গাইতে আসার জন্যে নিষেধ করেছিল। মেঘনা তার কথা শুনে আসেনি ওখানে। মনে মনে খুশি হয় তিনু।

তিনু এগিয়ে চলে তাদের আশ্রমের দিকে।

গ্রামের আর ফাঁকা প্রান্তর নেই। সেইসব জায়গায় বড় বাড়ি উঠে গেছে। হয়েছে নতুন রাস্তা। তবে তাদের দিকটা এখনও কিছুটা ফাঁকা রয়েছে। গাছ গাছালি আছে। পাশেই বনভূমি। তবে সেই ঘন ঘন আর নেই। এখন সবুজের লেশ মাত্র।

বিষাক্ত ধোঁয়ায় এইসব সবুজগুলো ধীরে ধীরে উধাও হতে বসেছে। এদিককার গাছগুলোকে কালো

করে তুলেছে। এগিয়ে যায় তিনু। দেখা যায় তাদের আশ্রমটাকে। সেই শান্ত পরিবেশ। ওখানেই অপেক্ষা করে আছে তার জন্যে মেঘনা — যোগিন বাবা।

তিনু এবার তার যোগিন গোঁসাই-র ইচ্ছাপূর্ণ করবে। এগিয়ে আসে। শান্ত আশ্রম।

হাঁক পাড়ে তিনু,মেঘনা। বাউল,আমি এসে গেছি। কোন সাড়া নেই। এগিয়ে আসে তিনু— মেঘনা, বাউল। বের হয়ে আসে নিধুর মা।

তিনু বলে, এরা সব কোথায়?

নিধুর মা কান্নায় ভেঙে পড়ে।

কাঁপা কাঁপা স্বরে বলে, ওরা আর কেউ নেই গো।

চমকে ওঠে তিনু। তিনু বলে নাই? কোথায় গেছে?

নিধুর মা বলে, আজ দশদিন হল মেঘনা আশ্রম ছেড়ে চলে গেছে আর ফেরেনি। আর বাউল বাবা সেই রাতেই চলে গেল। সব শেষ হয়ে গেল। ওরা আর কেউ নেই একা আমি আর নিধু এই ভিটে আশ্রমে আছি তোমার জন্যে।

—বাউলবাবা নেই। আর্তনাদ করে ওঠে তিনু।

নিধুর মা বলে, শুনছিলাম মেঘনা নাকি কইলকাতায় চলে গেছে, আর ফিরবে নাই—

তিনু কোনও জবাব দেয় না শূন্য আকাশের দিকে চেয়ে থাকে। তার জীবন থেকে যেন সব আশা স্বপ্ন সবকিছুই হারিয়ে গেছে। সব স্বপ্ন ব্যর্থ হয়ে গেছে তার।

তিনু চুপ করে শূন্য আশ্রমে বসে আছে। ধীরে ধীরে উঠে আসে ঘরের মধ্যে। ওদিকে ঘরের মধ্যে গর্ত করা ছিল একটা। ওতেই তিনু তাদের সমস্ত টাকা রাখত। তার সন্ধান জানত সে আর মেঘনা। সেখানে হাজার পনেরো টাকা ছিল প্রায়। আশ্রমের কাজের জন্যে টাকা জমিয়েছিল। সেই টাকাও আর নেই। জায়গাটা শূন্য অবস্থায় পড়ে আছে। মেঘনা তার শেষ সম্বলটুকু নিয়ে গেছে। তার জন্যেই যোগিনবাবাও মারা গেছে।

তিনু স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি যে মেঘনাকে সে আশ্রয় দিয়েছিল, বিশ্বাস করেছিল, একদিন সেই এভাবে তাকে ঠকিয়ে চলে যাবে নিজের জগতে।

তাই আজ তিনু সব হারিয়েও বেঁচে থাকতে চায়। যা হবার হয়ে গেছে — তিনু স্বপ্ন দেখে সে এই মাটির সুর নিয়েই বেঁচে থাকবে।

তাই সে আবার কদিন পরেই বের হয় তার গানের আসরে। এই কদিন তার দেহমনের ওপর দিয়ে ঝড় বয়ে গেছে। এখন পাতাজোড়ার আগেকার গ্রাম্য সহজ সরল জীবন অনেকটাই বদলে গেছে — এসেছে পরিবর্তন। তাই এই পরিবর্তনের ছোঁয়া লেগেছে পাতাজোড়ার মানুষগুলোর মধ্যেও। এখন এই অঞ্চলে মানুষের ভিড়ে গিজগিজ করছে।

গ্রামের সেই রাঙামাটি আজ হাই রোডে পরিণত হয়েছে। দূরদূরান্তের গাড়ি-ট্রাকগুলো বিকট হন বাজিয়ে ছুটে আসে এই রাস্তা দিয়ে।

তার মধ্যেই আজকের নিঃস্ব তিনু সেই গাছের তলায় ফিরে এসেছে। একটার পর একটা সুর ওঠে আজ গলায়। তার গানে সুরে কোনও এক না-বলা বেদনা ভেসে বেড়াতে থাকে।

তিনু গেয়ে ওঠে —

"বদল হাওয়া লেগেছে খাঁচায়-
পাখি কখন উড়ে যায়।
কার বা খাঁচা, কার বা পাখি।"

যোগিন বাউলের যোগ্য শিষ্যের গান শুনে পথের লোকজন আশে পাশে ভিড় করে। এই সুর যেন মনে করিয়ে দেয় মাটিকেই। চিনতে শেখায় মাটিকে।

তিনু ওঠে পড়ে। আজ তার শরীরটা ভাল নেই। কদিন থেকেই জ্বর হয়েছে তার। শূন্য আশ্রমে থেকে সে হাফিয়ে উঠেছিল তাই জোড় করেই এখানে এসেছে তিনু।

তিনু উঠে চলেছে ওদিকে—বড় রাস্তা পার হয়ে হাটতলার পথ দিয়ে আশ্রমে ফিরবে।

শরীরটা টলছে পথে নেমেছে, হঠাৎ মনে হয় একটা বিকট দৈত্য যেন তাকে ছিঁড়ে খেতে তার দিকে এগিয়ে আসছে।

একটা ট্রাক বিকট স্বরে হর্ণ বাজিয়ে তার দিকে ছুটে আসছে। তিনুর শরীর টলছে মাথা ঘুরছে কোনওমতে সরে আসার চেষ্টা করে কিন্তু তার আগেই ঘটে যায় অঘটন।

কলরব ওঠে — গেল গেল —

ছিটকে পড়ে তিনু অন্ধকারে যেন সব হারিয়ে যায়। দশচাকার একটা ট্রাকের মুখোমুখি এসে পড়েছিল তিনু, শরীর খারাপের জন্যে নিজেকে আর সামলাতে পারল না। যোগিন শিষ্য সদ্য সর্বস্ব হারিয়ে ফেলা এই বাউল মানুষটা। ড্রাইভার অনেক দূর থেকেই হর্ণ দিয়েছিল - ড্রাইভার অনেক চেষ্টাও করেছিল কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারেনি। ততক্ষণে যা ঘটার ঘটে গেছে।

কালো পিচের রাস্তা রক্তে লাল হয়ে ওঠে।

ওদিকে দুমড়ে মুচড়ে গেছে একতারাটা। তিনু বাউল শেষ হয়ে গেছে।

...পাতাজোড়ার জীবন আগের মতোই চলছে। কোনও মানুষের জন্যেই হয়তো পরের দিন থমকে থাকে না— পাতাজোড়ার জীবনও থমকে নেই। শুধু বাজারের সেই গাছতলায় আর সেই মাটির সুর উঠবে না। বাউলরা হারিয়ে গেছে। দুমড়ে মুচড়ে যাওয়া একতারাটা আজ আস্তাকুড়ে স্থান করে নিয়েছে। কেউ আর সেই একতারাওয়ালার খবর রাখে না। যে যার কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকে।

...ওদিকে নন্দু চাটুজ্জের দোকানে বাজে বিকট শব্দে কোনও এক নতুন হিন্দি গানের সুর—

"ধুম মাচালে ধুম" —

তিনু —তার গান—সেই পাতাজোড়ার মাটির সুর আজ হারিয়ে গেছে। তারাও ভুলে গেছে তিনু বাউলকে। নতুন গানের সুরে আজ সবাই দিশেহারা।

হারজিৎ

দুজনের হরিহর আত্মা—একেবারে গলাগলি ভাব। তা সত্ত্বেও হঠাৎ হঠাৎই বেধে যায় তুমুল ঝগড়া। একেবারে শ'কার, ব'কার অবধি পৌছে গিয়ে হাতাহাতি হবার উপক্রম। এ ঘোষণা করে—তোর মুখদর্শন করবো না। অন্যজনও জানায়—তোর কোনো কিছুতেই আমি নেই।

কিন্তু সে মাত্র অল্প কিছুক্ষণের জন্য। তারপর নরুই হুঁকো টানার পর বলে, নে ভুতো। ভুতো গুম হয়ে বসেছিল; এবার তামাকের দখল পেয়ে নীরবে টানতে থাকে হুঁকো। ভুড়ুক ভুড়ুক শব্দ ওঠে। আবার সন্ধি হয়ে যায়।

যা ভাত চাপা ভুতো। খেতে হবে তো ভুতো। খিদে পেয়েছে।

ভুতো ভাত চাপায়।

দুজনের প্রকৃত সম্পর্কটা কি তা গ্রামের লোকও জানে না। নরেশ্বর ভটচাযের হাল সাকিম এই গোপগাঁয়ে। ওর বাবা কালীকিঙ্কর ভটচায ছিলেন সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ। যজমান-পুজো আচ্চা-কথকতা নিয়েই থাকতেন। জমিজায়গাও কিছু আছে। কালীকিঙ্কর মারা যাবার পর নরেশ্বরই বাবার যজমানিগুলো নিয়েছে। তবে নরেশ্বরের পেটে কালির আঁচড় তেমন নেই। ভাগবত পাঠ করতে গেলেই বিপদ। তাই ওসব করে না। কোনোরকমে পুজোটুজোগুলো অং বং করে সেরে দেয় মাত্র। একাই থাকে। কালীকিঙ্কর ছেলের বিয়ে দিয়ে যেতে পারেনি। নরেশ্বরও বুঝেছে এই বাজারে সংসার করার ঝামেলা অনেক, তাই একাই ছিল।

হঠাৎ এসে জোটে ভূতেশ্বর। ওর নাকি মাসতুতো না পিসতুতো ভাই। বয়স বেশি নয়—বেশ গোলগাল চেহারা। তবে ঐ বয়সেই মাথাটা বেবাক ফাঁকা হয়ে গেছে। একগাছিও চুল নেই। মাথা তো নয়, যেন একটা পাঁচসেরী খাসা বেল, চকচক করছে। তারও তিনকুলে আর কেউ নেই। নরেশ্বরের ডেরাতেই বানে ভাসা খড়কুটোর মতো এসে ঠেকেছে।

ভূতেশ্বর কাব্য ব্যাকরণ পাশ না করুক, কোন এক টোলে ভাত আর আশ্রয় পাবার জন্য ছিল কিছুদিন। টোলের ঘর বারান্দা ঝাঁট দিত, রান্না করতো। বলে সে, নরুদা, ওসব সংস্কৃত, মন্তর-টন্তর, ব্যাকরণ শুনে শুনেই শিখে গেছি গো। বামুনের ছেলে, এবার পুজোটুজোতে তোমার তল্পেটি হয়ে থাকবো।

নরেশ্বরও ভুতোর কথায় ভরসা পেয়ে সেবার শিবপুরের বারোয়ারী দুর্গাপুজার পুরোহিতের কাজটা নেয়। শিবপুরের পুজো যিনি করতেন তিনি বাক্সের প্রণামীটা পেতে চান। বারোয়ারী কমিটির সেখানেই আপত্তি। কারণ প্রণামী বাক্সে শ' পাঁচেক টাকা পড়ে। ওটাতে পুজোর পর কমিটির মেম্বারদের একরাত পানভোজন উৎসব হয়। তারা প্রণামীর টাকা ছাড়তে রাজী না হতে সেই পুরুত ঠাকুর পুজো ছেড়ে দেন। বারোয়ারী কমিটি বিপদে পড়ে। তখন নরুই বলে, আমরাই করবো পুজো। পেন্নামী চাই না। দক্ষিণা কাপড়-চোপড় হলেই হবে।

শিবপুর মূলত চাষাভুষো মানুষদের গ্রাম। তবে বর্ধিষ্ণু। চাষের আয়পয়ও আছে, দুর্গাপুজো করে তাই। তবে পুজোর খুঁটিনাটি ব্যাপারে তেমন নজর নেই, তাই নরু ভুতো কি মন্তর পড়ছে, কি করছে তা জানার চেষ্টাও করে না। ওরা শুধু চায় আরতিটা যেন ভালো করে হয়। তা আরতিটা জব্বর করে ভুতো।

ঘণ্টাখানেক ধরে পঞ্চ-প্রদীপ-শঙ্খ-ফুল-গামছা ইত্যাদি নেড়ে ঢাকের তালে তালে কোমর দুলিয়ে

চলে। এক সময় যাত্রার দলের সখী সেজে নাচতো। সাপুড়ে নৃত্য, বোতল নৃত্যও জানে। তাই আরতির নাচটা সেই নাচতো। ধোঁয়ায় ধোঁয়া, চকচকে টাকে আলো ঠিকরোচ্ছে। ভুতোর নাচ দেখে শিবপুরবাসী খুব খুশি—হ্যাঁ, পুজো হচ্ছে বটে। যা আরতি করে ঠাকুর! আহা!

নরেশ্বর শিটকে গোছের মানুষ, হামেশাই দাঁতের ব্যামোয় ভোগে। এর মধ্যে রমণ ডাক্তার সাঁড়াশি দিয়ে টেনে গোটা পাঁচেক দাঁত তুলেছে। সামনের দাঁত কটা নেই তাই মন্তরও ঠিক উচ্চারণ করতে পারে না, লিক করে যায়। ভুতো বলে, তুমি আস্তে আস্তে বলো—আমি জোরে জোরে বলবো।

এই করে পুজো শেষ হলো ওদের। পরে আবিষ্কার করে নরু, —হ্যাঁরে ভুতো, বই-এর পাতা ওল্টাতে ভুল করেছি। মা ষষ্ঠীর বোধনের মন্তরের জায়গায় যে বেসজ্জনের মন্তর পড়েছি র‍্যা!

ভুতো বলে, ঠিক আছে গো নরুদা, মায়ের আগমন বেসজ্জন সবই এক। মায়ের আর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই। স্রেফ নাড়ু মুড়কি আর শশা খেতে শিবপুর আসবে। তিনি জমিদার বাড়িতেই গেছেন।

পুজো তো আর সব সময় থাকে না। ওগুলো সিজনের ব্যাপার, চাষবাসও সামান্য। ভুতোর ব্যবসায়িক বুদ্ধিটা একটু বেশি। ভুতো বলে, দুজনের সংসারেও খরচা আছে গো নরুদা। হাটবাজার, তামাক-বিড়ি-চা, এত খরচা।

নরুও দেখেছে খরচা বেড়েছে। ভুতো ভাত খায় আধসের চালের। দুবেলায় একসের। নিজে তো পেটরোগা মানুষ। দাঁতের ব্যথায় ভুগছে—রমণ আরও তিনখানা দাঁত তুলেছে। তাতেও টাকা লেগেছে। টাকা দরকার। রমণ বলে, দাঁত সব তুলে একেবারে বাঁধানো দাঁত করে নাও নরু, চেহারা কার্তিকের মতো হয়ে যাবে। যত রোগ তোমার দাঁতে। পাঁচশো টাকার দরকার।

ভুতো বলে, নরুদা, বামুনের তিন ফুঁ। শাখে ফুঁ মানে পুজোটুজো। কানে ফুঁ মানে গুরুগিরি। ওটা না হয় থাক। বাকি উনুনে ফুঁ-রান্নাটান্না। রান্নার কাজই ধরো না।

নরু ভাবছে কথাটা। রান্নার কাজ তো শহরে, গ্রামে কি হবে? তবু সুযোগটা এসে যায়। পাশের গ্রামের সুবোধ মিত্তিররা এককালে এই চাকলার জমিদার ছিল। বিশাল জমিদারি। বাড়ির লাগোয়া বিরাট মন্দির, বিশাল প্রাসাদ, মন্দিরে নিত্যপুজা হয় এখন, জমিদারি চলে গেলেও।

মিত্তিরদের শহর কলকাতায় বিরাট বাড়ি-ব্যবসা-গাড়ি সবই আছে। এতটুকু টসকায়নি অবস্থা, বরং বেড়েছে। বাড়িতে নিত্যপুজায় এখন দশ সের চালের ভোগ—তেমনি ব্যঞ্জন পরমান্ন এসব হয়। রাতে আড়াই সের ময়দার লুচি, মোহনভোগ ইত্যাদি নিবেদন করা হয়। ওদের রাঁধুনী ব্রাহ্মণের বয়স হয়েছে, চোখে দেখে কম, চিনি দিতে নুনই ঢেলে দেয়। তাই প্রসাদ-পুষ্পান্ন সবই বিগড়ে যায়। নতুন রাঁধুনী চাই।

নরেশ্বর খবর পেয়ে ম্যানেজারবাবুকে গিয়ে ধরে—কাজটা আমাদেরই দিন। আমি ভুতো দুজনে রান্নাটা করে দোব। দরকার হয় শীতলও দিয়ে দোব।

ম্যানেজারবাবুর উপরই সব দায়িত্ব। বাবুরা মাঝে মাঝে আসেন। গিন্নীমা অবশ্য এখানেই থাকেন। ম্যানেজারবাবু কালীকিঙ্কর ভটচাযকে শ্রদ্ধা করতো। তার ছেলে—পুজো আচ্চাও করে। তাই তাদেরই কাজটা দেয়।

ভুতো বলে, দেখলে তো—বুদ্ধিটা কেমন দিলাম। এখন দুজনের খাওয়া 'ফিরি'। খাও ভালো-মন্দ—মাসের মাইনেটা জমবে। তার কিছু টাকা জমাতে পারলে 'বিজিনেস' করবে নরুদা।

অবাক হয় নরু—বিজিনেস!

—হ্যাঁ, ব্যবসা। চিরদিন এক যায় না গো। দেখবে হাল ফিরবেই। বিয়ে-থা করে ঘর সংসার করবে।

নরুর ওই ব্যাপারটা মাথায় ছিল না। ইদানীং মাঝে মাঝে কথাটা ভাবছে সে। বিশেষ করে দখিন পাড়ার নিতাই মুখুয্যের মেয়ে অতসীকে দেখার পরই মনটা কেমন আনচান করে। তবু ভুতোর কথায় বলে নরু, ছাড় তো। কুঁজোর আবার চিৎ হয়ে শোবার সাধ।

ভুতো বলে, দিন বদলাবেই গো।

ভোগ রান্নার কাজ। তাই স্নান করে ভোগমন্দিরে ঢুকতে হয় ওদের। ভুতো অবশ্য রান্নাটা ভালোই

করে। আর তেল-ঘি-মশলার অভাব নেই। ক'দিনেই গিন্নীমা, ম্যানেজারবাবুও ওদের রান্নায় খুশি।

নরু যোগাড়যন্ত্র করে দেয়—ভুতো দশসেরি ভাতের হাঁড়ি, ডালের কড়াই, তরকারির কড়াই নামায়। তাদের দিন বদলেছে। মাইনের টাকা জমছে, চাষের চাল খরচা করে খেতে হয় না। মন্দিরের ভালো-মন্দ রান্না—পরমান্ন, সন্দেশ এসবও আসছে বাড়িতে। যোগযাগেও বিশেষ রান্না হয়। খাঁটি ঘিয়ের পুষ্পান্ন, ছানার ডালনা মায় পানতুয়া-কাঁচাগোল্লাও হয়।

এর মধ্যে নরু বাকি দাঁতগুলোও তুলে ফেলেছে, নতুন দাঁত বাঁধিয়েছে। সেদিন ঠাকুরবাড়ি থেকে আসছে, এদিকের পথটা নির্জন, দুপুরের ছায়া নেমেছে আমবাগানে। হঠাৎ অতসীকে দেখে দাঁড়ালো।

অতসী দেখছে নরুকে। নরুর বুকটা কেমন কেমন করে।

অতসীর বাড়িতে সৎমা কাদম্বিনী দিনরাত তার পিছনে লেগে আছে। বাবাও খাণ্ডারনী সৎমাকে যমের মতো ভয় করে। কাদম্বিনীও জানে সেটা। অতসীর বাবা নিতাই মুখুয্যের শিটকে পাকানো চেহারা। নেশা তার একটা আছে, গঞ্জিকার নেশা। দু'তিন পুরিয়া গাঁজা তার চাই। তবে নেশা একটা থাকলেও বাঁধাধরা পেশা কিছুই তেমন নেই। কখনও গোরু-মোষের চিকিৎসা করে, কখনও লক্ষ্মী পুজো, ষষ্ঠী পুজো করে। বাকিসময় অঞ্চল অফিসে ঘুরঘুর করে। এর কৃষিঋণ, ওর পাম্পসেট, এর লোন, কারুর বলদ কেনার ঋণ—এসবের দালালি করে যা পায়।

ফলে সংসারে অশান্তি লেগেই আছে। কাদম্বিনীর চেহারাটা গোলগাল, গালে পান-দোক্তা ঠুসে নিত্যই নিতাইকে শাসায়, ট্যাকা না নিয়ে এলে ঘরে ঢুকতে দোব না। বাপ আর ওই সতীনকাঁটাকে ঝেঁটিয়ে বিদেয় করবো।

নিতাই ছাতা বগলে কেটে পড়ে স্ত্রীর সামনে থেকে। কাদম্বিনী তখন অতসীকেই ধমক দেয়, বাসন মেজে কাপড়চোপড়গুলো কেচে নে। কে কাচবে? আমার বাপ? গিলছ তো কাঁড়ি কাঁড়ি।

তবু অতসী দু'বেলা ভরপেট খেতে পায় না। তার বয়সী গ্রামের অন্য মেয়েদের বিয়ে হয়ে গেছে, তার বিয়ের কথা কিন্তু কেউ বলে না। নিজের ঘর নয়, এখানে সৎমায়ের ঝিগিরি করার জন্যই যেন জন্মেছে সে। অতসীর মনে শুধু নীরব হাহাকারই বেজে চলে।

তবু মরুভূমিতে যেন ক্ষণিকের সবুজ স্নিগ্ধতা জাগে। নরুকে দেখে দাঁড়ায় অতসী, কি গো। ক'দিন দেখাই নেই, ডুমুরের ফুল হয়ে গেলা নাকি?

নরু দেখছে অতসীকে। আমবাগানের ছায়া-অন্ধকারে ওকে যেন রহস্যময়ীর মতোই মনে হয়। নরু সেদিন ঠাকুরবাড়ি থেকে বেশ কিছু সন্দেশ-ফলমূল নিয়ে ফিরছে। নরু সন্দেশের বাক্সটা ওর হাতে দিয়ে বলে, এটা নাও।

সন্দেশ! অতসী অবাক হয়।

নরু বলে, এখন মিত্তিরবাবুদের ঠাকুর মন্দিরে ভোগ পুজোর কাজ করছি। প্রসাদ। খেও কিন্তু।

অতসী বলে, কাজই করো বাপু কিছু। পুরুষ মানুষ কাজ না করলে চলে? তারপর—

তারপর? নরু এগিয়ে আসে। ও আশা করেছিল কথাটা অতসীই বলবে। সে যে স্বপ্ন দেখে তার শূন্য ঘরে অতসী আসবে।

অতসী বলে, জানি না। দুচোখে হাসির লহর তুলে বলে মেয়েটা, সেটাও কি আমাকে বলতে হবে? ও বাড়িতে আর তিষ্ঠুতে পারছি না। সৎমা তো নয়—ডাইনি।

সেটা জানে নরুও। তাকেও কাদম্বিনী পথেঘাটে শাসায়, শখ কতো। সব জানি, ওই দাঁতপড়া বুড়োর মুখে নুড়ো জ্বেলে দোব।

নরু বলে, তা জানি, তবে দিন বদলাবেই। ভুতোও বলে, ও বলে, এবার কোবরেজি শুরু করতে। ওর সব জানা। দেখবি একটা ব্যবসা ফাঁদতে পারলে সব ঠিক হয়ে যাবে।

অতসী বলে, যা হয় করো কিছু।

বিকেল নামছে। ছায়া ঘনিয়ে আসে। নরু বলে, ভাবিস না অতসী, একটা কিছু হবেই।

নরু চলে যায়। অতসী চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে।

বাগানে ফিকে আঁধার নামছে। হঠাৎ ভুতোকে দেখে চাইলো। ভূতেশ্বরও ইদানীং স্বপ্ন দেখছে। এখন সে দুচার পয়সা রোজগার করছে। সে এর মধ্যে হাটতলায় একটা চালাঘরে বসে জড়িবুটি বেচে। দরকারে মাদুলিও দেয়, তার জন্য দক্ষিণা সওয়া পাঁচ আনা আর একস্ট্রা স্ট্রং মাদুলির দক্ষিণা পাঁচসিকে। দুচারটে বিক্রিও হয়। ভুতোও অতসীকে নিয়ে স্বপ্ন দেখে। অবশ্য খুবই সঙ্গোপনে। আজ একটা শাড়ি ম্যানেজ করেছে ভুতো। মন্দিরে কে প্রণামী দিয়েছিল। ওটা সেই-ই চাদরের তলে পুরে এনেছে অতসীর জন্য। ভুতো বলে, এটা তুমি পরো অতসী, যা মানাবে না!

অতসীর শাড়ির দরকার, সেটা পেয়ে খুশিই হয়।

ভুতো বলে, দেখবে সব ঠিক হয়ে যাবে অতসী।

ঠিক তো? অতসীও রহস্যময়ী হয়ে ওঠে। আজ সে নতুন করে বাঁচতে চায়। সেখান নরু-ভুতো তাদের পার্থক্য নেই তার কাছে, বরং দুজনের সঙ্গেই লুকোচুরি খেলতে তার ভালোই লাগে। এ যেন একটা নতুন খেলা অতসীর কাছে।

ভুতো রাতের প্রসাদ থেকে দুজনের মতো লুচি, তরকারিও ম্যানেজ করে। নরু আর ভুতো খেতে বসেছে, ভুতো চকচকে টাক নিয়ে পরিবেশন করছে, একজোড়া পুরুষ্টু গোঁফও রেখেছে ভুতো। নরুর মনে হয় ও ভুতো নয় যেন অতসীই এসেছে তার ঘরে, পরিবেশন করছে তাকে।

ভুতোও স্বপ্ন দেখে দাঁতপড়া নরু নয়, অতসীই এসেছে এখানে। নরুটাকেই তাড়াতে হবে এখান থেকে। তারপর অতসীকে নিয়ে ঘর বাঁধবে।

ভুতো খেতে খেতে বলে, এত সন্দেশ দিলাম, কইগো? লুচির সঙ্গে সন্দেশ হলে জমে ভালো।

নরু যে সন্দেশ অতসীকে দিয়ে এসেছে সেটা জানাতে পারে না। বলে, আর বলিস না, বাটিতে রাখলাম একটা হুলো বেড়াল সব শেষ করে দিল।

ভুতো বলে, একাই সাবাড় করোনি তো! যা পেটুক তুমি!

গর্জে ওঠে নরু, খবরদার ভুতো, যা তা বলবি না। আমি পেটুক?

দুজনে লেগে যায় জোর। নরু বলে, শাড়িখানা হাতালি। সেটা কোথায়?

ভুতোও বিপদে পড়ে। বলে, ওটা দোকানে বিক্রি করে জড়ি-বুটি কিনেছি নরুদা। কোবরেজী ওষুধের ব্যবসাটা তো চালাতে হবে।

নরু এবার ঠান্ডা হয়,কারণ সেও কোবরেজী ওষুধ তৈরির স্বপ্ন দেখে। তেমন একটা ওষুধ বের করতে পারলে তার দিন বদলাবে। অতসীকে ঘরে আনতে পারবে। ভুতোর মনেও সেই একই আশা।

মিত্রদের ঠাকুরবাড়িতে মহোৎসব। প্রসাদেরও দারুণ ব্যবস্থা। ইতিমধ্যে অবশ্য ভুতো প্রসাদ থেকে ঘি-তেল-মশলাপত্রও পাচার করে। নরু বলে, এত নিস না ভুতো, ধরা পড়ে যাবি।

ভুতোর সাহস বাড়ে। বলে সে, থামো তো, দৈনিক পাঁচ-সাত টাকা বাড়তি আমদানি চাই।

ফলে, পুষ্পান্নে ঘিয়ের সুবাস থাকে না। তরকারিতেও তেল মশলা নেই। গিন্নীমা ম্যানেজারবাবুকে বলেন, একি রান্না ম্যানেজারবাবু? এত তেল-ঘি-মশলা যাচ্ছে কোথায়?

ম্যানেজারবাবুও প্রসাদ খেতে গিয়ে সেটা টের পায়। তাই বলে, আমি দেখছি মা, নরু-ভুতোর উপর নজর রাখছি। নির্ঘাৎ তেল-ঘি সরাচ্ছে ওরা।

তাই দেখুন।

গিন্নীমার আদেশ মতো ম্যানেজার বলে, নরু কি রান্না হচ্ছে? গিন্নীমাও চটে গেছেন, উৎসবের দিন প্রসাদ পুষ্পান্ন যেন ঠিক মতো রান্না হয়। ঘি তেল এসব যায় কোথায়?

নরুর বুক কাঁপে ভয়ে। বলে সে, তেল-ঘি তো ঠিকমতোই দিই!

দিলে এই স্বাদ হয়? উৎসবের দিন যেন ঠিকমতো রান্না হয়, অতিথিরা আসবেন।

নরু ভুতোকে আড়ালে বলে, বেশি বাড়িস না ভুতো। সব হারাবি।

ভুতো বলে, তুমি থামো তো, ম্যানেজারবাবু নিজে এসে দেখুন না তেল ঘি দিই কি না!

ম্যানেজারবাবু উৎসবের দিন নজর রেখেছে, ভোগমন্দিরে রান্না হচ্ছে ভিতরে। সেখানে অব্রাহ্মণের

ঢোকার অধিকার নেই। তাই ম্যানেজারবাবু ভোগমন্দিরের দরজায় দাঁড়িয়েই রান্না দেখছে। বড় হাণ্ডায় পুষ্পান্ন রান্না হচ্ছে। ম্যানেজারবাবুকে দেখিয়ে ভুতো বলে, দেখুন ম্যানেজারবাবু, পাক্কা দু'সের ঘিই দিচ্ছি পুষ্পান্নের হাণ্ডায়।

ম্যানেজারবাবুও দেখে দু'সের ঘিই ঢেলে দিল ভুতো ওই হাণ্ডায়। তারপর ভিতরের অন্ন নাড়াচাড়া করে ঘিটাকে নাড়াতে থাকে। ম্যানেজারবাবুও নিশ্চিন্ত হয়ে বের হয়ে আসে।

নরু ওদিকে পায়েস রাঁধছে। সে দেখে ম্যানেজারবাবু চলে যেতেই ভুতো এদিক ওদিক চেয়ে সেই পোলাও-এর বড় হাঁড়ির ভিতর থেকে প্রায় সের দেড়েক ঘি-ভর্তি বড় একটা বাটি তুলে ওদিকে জিনিষপত্রের আড়ালে সরিয়ে রাখে। ঘি ঢালবার আগেই ওই বাটিটা হাঁড়ির মধ্যে রেখেছিল ভুতো। ঘি পোলাওতে পড়েনি। বেশির ভাগ পড়েছে ওই বাটিতে। ম্যানেজার এহেন চুরির কৌশল বুঝতেই পারেনি।

বোঝা গেল পরে, পোলাও-এ ঘিয়ের চিহ্নও নেই। অতিথিরা নাক সেঁটকান। ম্যানেজারও অবাক। ভুতো বলে, আজ্ঞে ঘিটাই আসল ছিল না ম্যানেজারবাবু, ভেজালের যুগ। নাহলে স্বচক্ষে দেখলেন সব ঘি দিলাম—তবু বলেন ঘি নেই। আমদের দোষ কি বলেন?

অবশ্য দোষটা কয়েকদিনের মধ্যেই জানা গেল। তেল-ঘি পাচার করার সময় হাতেনাতে ধরা পড়ে গেল ভুতো। নরুর হাতে বেশ বড় খোলের হুঁকো, তামাখ খায় তারা। তবে সেই হুঁকোর নারকেলের মতো খোলের মধ্যে থেকে জল নয়—গলানো আসল ঘি বের করে ফেলে ম্যানেজারবাবু। সেই মুহূর্তেই ওদের চাকরি নট।

ফেরার পথে আমবাগানে লেগে যায় নরু আর ভুতোর মধ্যে। নরু বলে, তোর জন্যেই এমন সুখের চাকরিটা গেল, দিব্যি ভালোমন্দ খেয়েদেয়ে সামলে নিয়েছিলাম। দুটো পয়সা আসছিল। বলিনি অতি লোভে তাঁতি নষ্ট। তাই হলো শেষ পর্যন্ত।

ভুতো বলে, চুরি তুমি করোনি? একা আমিই চোর?

দুজন লাগে আর কি, ভুতো কোনোমতে সামলে নিয়ে ঘরে ফেরে। নরু একাই বসে আছে আমবাগানে। অতসীকে দেখে চাইলে। অতসীও শুনেছে কথাটা। বলে, চাকরিটা গেল তো? এখন?

নরু বলে, ও চাকরি ছেড়েই দিলাম, রাঁধুনীগিরি আর করবো না। এবার কোবরেজী করবো, কোবরেজী ওষুধই তৈরি করবো।

অতসী বলে,তবু চাকরিটা ছিল—

নরু সান্ত্বনা দেয়, ভয় নেই রে, এবার কোবরেজী করে ঘর বাঁধবো।

ভুতো তাকে তাকে থাকে। পুকুরঘাটে অতসীকে একলা দেখে বলে, এবার তোকে নিয়ে শহরে যাবো অতসী। সেখানে কাজ পাবোই।

কবে গো? অতসী শুধোয়, এজন্মে না আসছে জন্মে?

ভুতো বলে, এই জন্মেই, ক'মাসের মধ্যে একটু গুছিয়ে নিতে দাও অতসী।

অতসীও ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখে, কিন্তু সে জানে না কার ঘরে উঠবে।

নরুর ভুতোকে ছাড়া চলে না। ভুতোরও নরুকে দরকার। এ যেন ওর ছায়া। ভুতো অবশ্য বেশি করিৎকর্মা। নরু বাবার কাছে কোবরেজী কিছু শিখেছিল। নান গাছগাছড়া থেকে দন্তমঞ্জন, কুসুম কেশ তৈল, সর্বজ্বরের বটিকা, হজমের ওষুধ—এসব কিছু তৈরি করতে শিখেছিল। ভুতো এবার হাটতলার সেই চালায় পুরোপুরি কোবরেজখানা খুলে নরুকে বসিয়ে দেয়, সাইনবোর্ডে লেখে,

আয়ুর্বেদিক কার্যালয়, নরেশ্বর ভট্টাচার্য কবিরাজ শিরোমণি ভিষকাচার্য (লন্ডন)।

বিক্রিবাটা কিছু হয় হাটবারে। বিশেষ করে দন্তমঞ্জন আর কুসুমকেশ তৈল ভালোই চলে। ভুতো এদিক-ওদিক ঘুরে রোগী ধরে আনে।

মাঝে মাঝে সেও কোবরেজী করে। তার রোগী মানুষ নয়, গৃহস্থের গাই গরু বলদ ছাগল এসবের চিকিৎসা করে ভুতো। কিছু রোজগার হয়।

আমবাগানের নির্জনে অতসীর সঙ্গে দেখা হয় ভুতোর। অতসী বলে, কিছু একটা করো। না পারলে এবার বিষ খেয়ে মরতে হবে আমায়। এভাবে বাঁচা যায় না।

ভুতো বলে, হবে। শহরে কোবরেজী করবো। ঘর পেলেই তোমাকে নিয়ে যাব সেখানে।

নরুও আসে বাগানে। অতসীকে সেও সান্ত্বনা দেয়, ব্যবসা জমছে। আর ভয় নেই অতসী। ক'টা দিন সবুর করো শুধু।

ভুতোই বুদ্ধিটা দেয়। হাটবার সপ্তাহে দু'দিন। সেই দুটো দিন ভালো বিক্রি বাটা হয়, বাকি কটা দিন চলো ট্রেনে ফিরি করা যাবে।

ভুতো ইদানীং ট্রেনে ওই সব ওষুধ হকারি করে ভালো সাড়া পেয়েছে। সে বলে, বেশি কাটতি হলে আরও হকার লাগাবো। কারখানা করে মাল তৈরি করবো নরুদা।

নরু বলে, তাও মন্দ নয়।

এর মধ্যে নরুর নড়বড়ে সব দাঁতগুলোই পড়ে গেছে, গালও তুবড়ে গেছে। তাই ভুতো বলে, তবে ভেক না হলে ভিখ মেলে না। ওই দাঁতগুলো ঝকঝকে করে বাঁধিয়ে নিয়ে তুমি বেচবে দন্তকৌমুদীচূর্ণ।

আর তুই?

ভুতো ব্যাগ থেকে একটা পরচুলো বের করে টাক মাথায় সেটা পরে নেয়। অবাক হয় নরু, এ যে একেবারে নাজপুত্তুর হয়ে গেছিস রে।

ভুতো বলে, আমি বেচব কুসুমকেশ তৈল, হজমের ওষুধ, অগ্নি রসায়ন, আরও সব ওষুধ।

ভুতো অবশ্য এসব ওষুধ ভালোই বেচে। সেদিন আমবাগানে অতসী এসেছে। অতসী সেদিন সৎমায়ের হাতে দু'চার ঘা মারও খেয়েছে। আজ অতসী দেখছে ভুতোকে। মাথায় কোঁকড়ানো চুল, পরনে প্যান্ট শার্ট। ভুতো এখন ভালোই রোজগার করে। শহরের অন্য কোম্পানির সে এখন মাইনে করা ক্যানভাসার। নরুকে তার আর ভরসা নেই, শহরেই একটা ঘর নিয়েছে।

অতসীর চোখে জল। ভুতো তার পথ বেছে নিয়েছে। বলে সে, অতসী, চলো কালই আমরা শহরে গিয়ে ঘর বাঁধবো। এখানে আর নয়।

অতসী যেন তাই চাইছিল। বলে সে, সত্যি!

হ্যাঁ অতসী, কাল দুপুরের ট্রেন। তুমি স্টেশনে চলে আসবে। আমিও থাকবো।

অতসীও আজ মুক্তির স্বপ্ন দেখে।

বাগানে সন্ধ্যা নেমেছে। অতসী-ভুতো কেউ খেয়াল করেনি, তারা নিজেদের স্বপ্নেই বিভোর। নরু জানে এসময় অতসীকে এখানে পাওয়া যাবে, সেও তাই এসেছে। অন্ধকারে হঠাৎ ওদিকে ভুতোর মতো কাকে চলে যেতে দেখে অবাক হয় নরু।

ভুতোকে এসময় এখানে দেখবে ভাবেনি, আরও অবাক হয় অতসীও চলেছে ওর সঙ্গে বাগান থেকে। ভুতো আর অতসীর মধ্যে এমন ঘনিষ্ঠতা থাকতে পারে সে স্বপ্নেও ভাবেনি।

কোনো কথাই বলা হলো না নরুর। অতসীর আজ যেন ভুতোকেই বেশি দরকার।

নরু বাড়ি ফিরে আসে। ওষুধপত্র তৈরির কাজ করছে। ভুতোও হাত লাগায়, যেন কিছুই হয়নি। নরু চুপ করে দেখছে তাকে। মনে হচ্ছে গলা টিপে ভুতোটাকে শেষ করে দেবে।

কিন্তু ভুতো নির্বিকার। চা করে আনে—ওদিকে রান্নাও চাপায় দুজনের জন্য। নরু বলে, আমার শরীর ভালো নেই, রাতে খাবো না।

ভুতো বলে, তাহলে মুড়িই খাও। না খেলে শরীর টিকবে কি করে?

নরু গর্জে ওঠে, আমার কথা তোকে ভাবতে হবে না, তুই খা!

ভুতো চুপ করে থাকে।

পরদিন ভুতো বের হয়ে যায় সকালে ওষুধপত্র নিয়ে তার কাজে। নরু বের হবে দুপুরের ট্রেনে। ওই ট্রেনেই মাল ভালো বিক্রি হয়। ট্রেনে উঠে সে হঠাৎ দেখে একটা কামরায় অতসী বসে আছে। আরও অবাক হয় ভুতোকে দেখে। অতসীর হাতে পুঁটলি। চমকে ওঠে নরু। ভুতো তাহলে নরুর সঙ্গে

থেকে শিকার কেড়ে নিয়ে পালাচ্ছে শহরে। কাল আমবাগানে এই পরামর্শই করছিল দুজনে।

ভুতো ওদিকের কামরায় তখন নিজের মাথার কোঁকড়ানো সুন্দর চুল দেখিয়ে কুসুমকেশ তৈলের গুণাগুণ বর্ণনা করছে। নরুও উঠেছিল কামরায় এদিকে তার দন্তকৌমুদী দেখিয়ে সেও এই দন্তমঞ্জনের গুণ বর্ণনা করছে। হঠাৎ সামনে ভুতোকে দেখে এবার নরু রাগে ফেটে পড়ে, তুই! হারামজাদা ঠগ্—জোচ্চোর!

দুজনের সেই নিত্য ঝগড়াটা এখন সত্য হয়ে ওঠে। ভুতো এখন স্বাধীন। নরুকে আর তার দরকার নেই। ভুতোও বলে, জোচ্চোর আমি না তুই রে?

বেইমান! গর্জে ওঠে নরু, আমাকে ঠকালি, সারা রেলের লোকদের ঠকাচ্ছিস ওই কুসুম তেলে তোর এই চুল হয়েছে।

ওই দন্তকৌমুদীও তোর ফক্কা—দেখবি।

ট্রেনের লোকজনও অবাক। নরু লাফদিয়ে পড়ে ভুতোর ঘাড়ে। ওর চুলের মুঠি ধরে টান দিতেই পরচুলা খুলে চকচকে টাক বেরিয়ে পড়ে। লোকজন এবার বলে, অ্যাঁ! এই করে লোক ঠকিয়ে কেশতেল বেচা! শালা টেকো।

ভুতোও গর্জায়, আর ওর দন্তকৌমুদী—

একটা ভরাটি হাতের থাপ্পড়ে নরুর দুপাটি বাঁধানো দাঁত ছিটকে পড়ে কামরায়। দন্তবিহীন গালবসা নরুও অসহায়। এদিকে পাবলিক গর্জায়, শালার নিজের বাঁধানো দাঁত, আর বেচে কিনা দন্তকৌমুদী মঞ্জন! ধর—ধর—মার শালাকে।

নরু বুঝেছে আর এখানে নিরাপদ নয়। সে স্টেশনে ঢোকার আগে ট্রেন থেকে নমে পড়ে। ভুতো তখন পরচুলো ফিট করে ওদিকের কামরায় গিয়ে অতসীর পাশে বসে পড়ে। ট্রেন বাঁশি বাজিয়ে স্টেশন ছেড়ে চলেছে। ভুতো দেখে প্ল্যাটফর্মের শিরীষগাছের নিচে দন্তবিহীন নিঃসঙ্গ অসহায় একটি প্রাণী। তার পাশে কেউ নেই।

রানীপসন্দ

ভূষণ মালি গাছগুলোর দিকে চেয়ে থাকে। ওর চোখের দৃষ্টিতে যেন মায়ের মমতা ঝরছে। সাত বিঘের বাগানটায় বেশ কিছু পুরনো আমগাছের ওদিকে তার নতুন লাগানো কলমের আমগাছের ডালগুলো ভরে মুকুল এসেছে।

এসময় বাগানের চেহারাই বদলে যায়, বদলে যায় পরিবেশও। ঝাঁকড়া বড় বড় গাছগুলো ডালপালা মেলে যেন খুশিতে ঝলমল করছে, বাতাসে মধুর মিষ্টি সুবাস, মৌমাছির ঝাঁক ঘুরছে মুকুলে মুকুলে। ওরা মধুটুকুই শুষে নেয় না, বিনিময়ে পরাগমিলনে ওদের বুকে আনে ফসলের সম্ভাবনা। ওই মুকুলগুলো পরিণত হবে ফলে। গাছ ছেয়ে আসবে আমের গুটি, ক্রমশ তা পরিণত হবে ফলে। সবুজ ফলগুলো ক্রমশ পুষ্ট হয়ে উঠবে—তারপর পরিণত হবে বর্ণাঢ্য রসালো সুপক্কতায়।

ভূষণ এই বাগানটা দেখাশোনা করার ভার পেয়েছিল প্রায় চোদ্দ বছর আগে। সেদিন নবাব বংশের কোন লতায়পাতায় জড়ানো এক দৌহিত্রের ছিল এই বাগান। আয়তন প্রায় বাহান্ন বিঘের। বড় বড় কলমী আমগাছ। সবই খানদানী আম। নবাবপসন্দ, রানীপসন্দ, বাদশাভোগ, কালাপাহাড়, সাদুল্লা এসব তো ছিলই, আর ছিল নবাবী আমলের সেরা খানদানী আমের গাছ কোহিতুর, মাল-ই-আনজাম, আরও বেশ কিছু সরেস জাতের আম। মির্জা সাহেবের এই বাগানের আম তখন ছিল বিগত দিনের আম কালচারের ইজ্জতদার সাক্ষী। নবাবী আমলের মুর্শিদাবাদে তো রীতিমতো রাজকীয় রমরমা ছিল এই ফলটির। এখানকার আম তখন ঘোড়ার ডাকের সঙ্গে যেত দিল্লীতে শাহী দরবারে। সরেস আমের মধ্যে ছিল পেয়ারাফুলি, ল্যাংড়া। কোনো এক ফজলি বেগমের নামে আমের নামকরণ করা হলো 'ফজলি'। সেসব আমের কত কদর শাহী দরবারে। বাছাই বাছাই কলম নিয়ে গিয়ে দিল্লীর আশপাশে নানা জায়গাতে লাগানো হলো। চৌষা নামের কোনো গ্রামের মাটিতে পেয়ারফুলির রূপান্তর, নামান্তর হলো 'চৌষা'। শীতের দেশ। মুকুল আসে দেরিতে। তাই মরসুমের শেষ আম চৌষা, উত্তরপ্রদেশের আম বলেই আজ যার খ্যাতি ও পরিচিতি।

এসব কথা শুনেছিল ভূষণ ওই বাগানের সাবেক মালি কাসেম আলির কাছ থেকে। কাসেম আলি তখন বুড়ো হয়ে গেছে। চোখের নজরও তাই নেই। তবু বাতাসে মুকুলের গন্ধ শুঁকে, মৌমাছির আনাগোনার শব্দ শুনে বলতো, আম সরেসই হবে রে ভূষণ, শুধু আল্লা যদি ঝড়-বারিষ একটু সামলে দেয়।

কোহিতুর গাছের নিচে দাঁড়িয়ে বলতো, এ হলো আমের মধ্যে শাহানশা, আর ওই যে দেখছিস মাল-ই-আনজাম; ও হলো বেগম, পাকলে অপরূপ রং, নিটোল পূর্ণতায় রূপমতী, যেন যুবতীর পুরুস্তন। রূপ-রস-বর্ণে বর্ণময় আর তেমনি খোসবুদার। বাগান যেন মৌ মৌ করে ওঠে। তবে কোহিতুর গাছে বেশি থাকে না, সহজে ঝরে যায় রোদে পুড়ে যায়। গাছে পাঁচ-সাতশোর বেশি ফলে না। আঁঠি নেই বললেই চলে। তবে এ আম শাহী আমলে খানদানী ঘর ছাড়া কেউ পেত না। এর তরিবৎ আলাদা বাপ্!

ভূষণ কাসেম আলির বিশ্বস্ত সহকারী। বুড়ো ওকে নিজের হাতে জোড়কলম, চোখকলম, নানা ধরনের আমের খানদান, তাদের তদবিরের তারিকা সব শিখিয়েছিল। বুড়োর কাছে আমের ইজ্জত ছিল আলাদা।

বাগানের রানীপসন্দ আম পাড়া হয়েছে। উজ্জ্বল সোনারঙের আম। কোন এক কলকাতাইয়া বাবু বলে, চাক্কু লাগিয়ে কাটো, দেখি তোমার রানীপসন্দ মিষ্টি কিনা?

কাসেম আলি আর্তকণ্ঠে বলে—রানীতে নয় সাব, ওই চাক্কু আমার কলজেয় চালান। সে সইবো। লেকিন রানীপসন্দে চাক্কু মৎ লাগাইয়ে।

খানদানী আম কাটা হতো চাকু দিয়ে নয়, বাঁশের চ্যাঁচাড়ি দিয়ে, কোনো ধাতব স্পর্শে সরমী খানদানী আমকে বেইজ্জত হতে দিতে বাধতো ওদের।

ভূষণ সেই সব দিন কিছু কিছু দেখেছে। ঘরানা ধরে রাখার খুঁটিনাটি শিখেছে কাসেম আলির কাছ থেকে। আলি সাহেবের তিনকুলে কেউ ছিল না। ভূষণই তাকে দেখভাল করতো। ভূষণের বৌ মালতীই ওর সেবাযত্ন করতো। কাসেম আলি বলতো, ভূষণ, এই গাছগুলোই আমার সব, ছেলেপুলে এরাই। দিল লাগিয়ে এদের দেখভাল করবি, তোর দানাপানির অভাব হবে না।

ভূষণ কার ডাকে চাইল। কতক্ষণ যে বাগানে ঘুরছে খেয়াল নেই। মুকুলগুলোকে স্প্রে করছিল মেশিন দিয়ে। ওতে আমের গুটি মজবুত হয়। এখন দিন বদলেছে। আম এই বাগান থেকেই বেশ চড়া দামে বিক্রি হয়। তাই ওইসব ওষুধপত্রেরও রেওয়াজ হয়েছে যাতে ফল বেশি হয়।

ভূষণের মেয়ে কাজরী বলে, দিনরাত বাগানে পড়ে থাকো, গাছগুলোর সঙ্গেই কথা বলছো, মাথা-টাথা খারাপ হলো নাকি তুমার?

ভূষণের কাছে ওই গাছগুলো সব যেন জীবন্তই। ওদের ডালে ডালে যেন গলাগলি ভাব। ভূষণ ওদের সবাইকে চেনে, ওই রানীপসন্দ, মাল-ই আনজাম, ওদিকে কোহিতুর, ওই ফজলি গাছের সঙ্গে তার কত কথা হয়। রানীপসন্দ গাছটা যেন ঘোমটা দেওয়া কনে বউ। যৌবনবতী—সলজ্জ, দুদিন পর ফলভারে নুইয়ে পড়বে—যেন পূর্ণগর্ভা কোনো নারী। বলে ভূষণ, ওরা আমার কতদিনের সঙ্গী রে। আপনজন। ওরাই তো আমাদের খাওয়ায়, পরায়, কত ভালবাসে।

কাজরীর দেহে যৌবনের নব জাগরণ। জগৎ সে এখন অন্য চোখে দেখে। মা-মরা মেয়েটা বনবাসে থাকতে থাকতে হাঁপিয়ে উঠেছে। শহর তাকে টানে। এই নির্জন সবুজের কোনো দামই নেই তার কাছে। তাই সে বার বার বলেছে তার বাবাকে, এখানে এই বাগানের ঝুপড়িতে কতদিন পড়ে থাকবা বাবা, চল শহরে যাই। কত রোশনী, লোকজন, দোঁকানপশরা।

কিন্তু ভূষণের প্রাণ এই বাগান আর জমি। আম-কাঁঠাল-নারকেল—এসব থেকেই তার আয়পয়। ওদিকের জমিতেও চাষবাস করে। এখানেই আশ্রয় নিয়েছে কাসেম আলি। বাগানের ওদিকটায় জ্বলে উঠেছিল ভূষণের বৌ মালতীর চিতা। তারা এই মাটিতেই মিশে আছে। ভূষণ তাই এ মাটি ছেড়ে যেতে চায় না। এই গাছদের সঙ্গেই তার মিতালি। এরাই তার আপনজন। তাই মেয়ের কথায় বলে, এখানেই যে সব রে। এ সব ছেড়ে যাবো কোথায়?

কাজরীর রাগটা এইখানেই।

কাজরী এতদিন একাই ছিল বনবাসে। গ্রামবসত কিছুটা দূরে। কাজরী একটু বড় হতে মাঠ-বাগান-অড়হর ক্ষেত পার হয়ে গ্রামের পাঠশালায় যেত, দোকানেও যাতায়াত করতো। গ্রামে কত ছেলে মেয়ে, লোকজন, কতজনের সঙ্গে চেনাজানা!

কিন্তু বিকাল থেকেই এখানে নামতো স্তব্ধতা। ক্রমশ আঁধার নামতো। কাজরী কুপি জ্বেলে রান্না করতো। কাঠের আগুনের আভায় অন্ধকার কেমন রহস্যময় হয়ে উঠতো। ভূষণ হুঁকো টানতো। আর বকবক করতো।

—ওই রানীপসন্দ গাছটায় সার দিতে হবে। মুকুল ধোয়ালে সেরা আম হবে। নতুন দুটো সাদুল্লা গাছে এবার পয়লা ফল আসছে। আপন মনে আওড়ে চলে ভূষণ।

কাজরী বলে, আর কি কুনো কথা নাই তুমার? শহরে নতুন সিনেমা হলে একদিন ছবি দেখতে যাবো বাপ্! একখান শাড়িও কেনবো—

ভূষণ হুঁকো টেনেই চলে। শহরে যায় সে শুধু মহাজনের আড়তে না হয় দোকানে বীজ সার,

কীটনাশক ওষুধের জন্য। ওই গোলমাল, কলরব—লোকজনের ভিড়ে তার দম বন্ধ হয়ে আসে। বলে ভূষণ, শহরে মানুষ থাকে? যা ভিড়! এখানে কেমন শান্তি। চারিদিক সবুজ, পাখির ডাকে ভরা। কত ফুল—

কাজরী গুম হয়ে থাকে। বাবা তার জগতের সন্ধান জানে না, জানতেও চায় না। সে রয়েছে তার নিজের জগৎ নিয়ে। কাজরীর মনে ক্রমশ জেগে ওঠে বঞ্চনার দুঃসহ জ্বালা। একটা রাগ জমছে তার মনে।

সেদিন গ্রামে গেছে, সংসারের নুন-তেল কেনার কাজটা এখন তাকেই করতে হয়। এখন আমগুলো পুরুষ্টু হয়ে উঠেছে। গাছেদের রূপই আলাদা। এসময় বাগানে কড়া পাহারা দিতে হয়। ভূষণ জানে এক বছরের খোরাক যোগায় তারা। তাই ওদের তদারকিতেই থাকতে হয় দিনরাত।

রাতের বেলাতেও বাগানে একটা মাচা করে সেখানে আর দু'তিনজনকে পাহারায় রাখে। মদন ছেলেটা খুব হুঁশিয়ার। খাটতেও পারে। বাগানের কাজ শিখছে, মাঠের কাজও জানে। গম-সরষের চাষ করেও ভালো টাকা পেয়েছে।

মদনকেই রাতপাহারায় রাখে ভূষণ। নিজেও ঘোরে।

সেদিন কাজরী গ্রামের দিকে চলেছে, হঠাৎ মদনকে দেখে দাঁড়ালো।

ছেলেটা ভালো বাঁশি বাজায়। কাজরী মাঝে মাঝে রাতের অন্ধকারে জেগে থাকে। তার ঘুম আসে না। অন্ধকারে ওই বাঁশির সুরটা ওঠে—কাজরীর মনে হয় ও যেন তার মনের বেদনার সুরটাকেই স্পর্শ করেছে।

ছেলেটার বাড়িঘর আপনজন কেউ আছে কিনা জানে না। ভূষণ ওকে এনেছিল। দু'চারদিন জনমজুরের কাজ করার পর বুঝেছে ছেলেটার এলেম আছে। পাম্পসেট মেরামত করে চালু করেছে। স্প্রে মেশিনটাকে খুলে সাফসুতরা করে চালু করে। টিউবওয়েলের কাজও জানে। মদন রয়ে যায় এখানেই।

কাজরীও দেখেছে ওকে। সেদিন গ্রামের পথে কাজরীকে দেখে মদন বলে, দোকানে যাচ্ছো? চল, আমিও যাই।

ও নিজে সঙ্গে যায়। চাল-ডাল-তেল মশলার বোঝাটা বইতে হতো কাজরীকে। আজ মদন বলে আমিই নিয়ে যাচ্ছি।

কাজরী আর সে ফিরছে। কাজরী বলে, শহরে গেছে কোনোদিন? সেখানে কত আলো, লোকজন, সিনেমা চলে। এই বনবাসে থাকতে আমার আর ভালো লাগে না। বাবা তো এখান থেকে নড়বে না। তা তুমি শহর ছেড়ে এই আদাড় বনে পড়ে আছো কেন?

মদন দেখছে কাজরীকে। খালের কালো জলে একটা পানকৌড়ি ডুব দিয়ে মাছের সন্ধান করছে, আবার মাথা তুলে দেখছে এদিক ওদিক। গ্রীষ্মের দিন। মাঝে মাঝে ছোট ছোট ঘূর্ণি ঝড় ওঠে, ধুলোর রাশ, শুকনো পাতাগুলোকে নিয়ে ঘুরপাক খাইয়ে যেন খেলা করছে কে।

মদন বলে, উপায় থাকলে শহরেই থাকতাম, নৈহাটির পাটকলে চাকরি করতাম। কল বন্ধ। ঘুরতে ঘুরতে এসে ঠেকেছি এখানেই। কতদিন এখানের জলভাত জুটবে জানি না। তারপর অমনি ঝরাপাতার মতো হারিয়ে যাবো।

কাজরী দেখছে ওকে। শুদোয়, কলকাতা দেখেছো?

মদন বলে, হ্যাঁ, নৈহাটির কাছেই, কতদিন গেছি সেখানে। সেখানে আমার এক মামা থাকে।

কাজরী অবাক হয়ে দেখছে মদনকে। মদনের এই পরিচয়টা জানা ছিল না। তাই বলে কাজরী, মস্ত শহর, তাই না? বড় বড় টেরাম, বাস—কত কি চলে। রাতের বেলাতেও দিনের মতো আলো। কত দোকান—

মদনও কলকাতার গল্প শোনায় কাজরীকে। ওই ধানজমি-বাঁশবন-আমবাগান-ঘেঁটুফুলের গাছে ছাওয়া প্রান্তর কাজরীর চোখ থেকে মুছে গেছে, সেখানে যেন ফুটে উঠেছে তার স্বপ্নের জগৎ।

সেই রাতে ভূষণ রয়েছে বাগানের পাহারায়। আমগুলো এখন নিটোল পুরুষ্টু হয়ে উঠেছে। এবার রানীপসন্দ গাছগুলোতে এসেছে প্রচুর আম। হাওয়ায় দুলছে ফলবতী গাছের ডালপালা। এবার রঙ ধরবে রানীপসন্দ, বোম্বাই আর গোলাপখাসে। গোলাপখাসের বোঁটার গায়ে এসেচে লালচে আভা। ওরা সিন্দুরবরণ হবে আর রানীর রং হবে উজ্জ্বল সোনাবরণ।

মহাজনদের আনাগোনা শুরু হয়েছে। তার বাগানের আমের দর আলাদা, মহাজনও তা জানে। তারাগুলো দীপ দীপ করছে আকাশের গায়ে। ভূষণ ঘুরছে নিঃশব্দ পায়ে বাগানে।

কাজরী আজ যেন একটা দুঃসাহসিক কাজই করে বসেছে। সে জানে বাবা বাগানেই থাকবে। সন্ধ্যার পর গ্রামে পাঁচালী গানের আসর বসে চণ্ডীমণ্ডপে। অনেকেই আসে। কাজরীও বাবাকে বলেছে চণ্ডীমণ্ডপেই যাবে সে। ভূষণ বাধা দেয়নি। দিনভোর মেয়েটা একলা থাকে, তবু ওই গানের আসরে গেলে মনটা ভালো হবে। ঠাকুর-দেবতার গান। তাই বাধা দেয়নি ভূষণ। বলে, দেরি করিস না।

—না, না। দেরি হবে না। কাজরী বাবাকে জানায়।

কিন্তু পাঁচালী গান নয়, কাজরী এসেছে শহরে সিনেমা দেখতে। মদনের আজ ছুটি। সে বিকাল থেকেই বের হয়ে গিয়ে সন্ধ্যার শো'র দুটো টিকিট কেটে সিনেমা হাউসের কাছে কাজরীর পথ চেয়ে আছে। কাজরীই তাকে বুদ্ধিটা বাতলেছে। মদন এদিকে-ওদিকে চাইছে। হাউসের বাইরে লোকজনের ভিড়। ওদের মধ্যে সে দুচোখ মেলে খুঁজছে কাজরীকে।

হঠাৎ দেখে তাকে। কাজরীর দু'চোখও এই ভিড়ের মধ্যে একজনকে খুঁজছে। মদনকে দেখে এগিয়ে আসে কাজরী। মদন বলে, এত দেরি হলো?

কাজরীর মুখচোখে আজ খুশির ঝলক। বলে সে, বাবাকে বলেছি পাঁচালী শুনতে যাচ্ছি। বিকালের চা দিয়ে এলাম, তাই দেরি হলো। চলো।

তারা দু'জনে এক স্বপ্নরাজ্যে হারিয়ে গেছে। আলোঝলমল শহরের ছেলে-মেয়েদের দেখছে কাজরী। দেখছে তাদের পোশাক। ওদের নাচগান। কাজরীর দু'চোখে কি স্বপ্ন। কাজরীর একটা হাত মদনের হাতে। সে দেখছে নতুন এক কাজরীকে।

ছবি দেখে ফিরছে দু'জনে। নির্জন পথ। গাছগাছালির মাথায় তারাভরা আকাশ। খালের জলে তারার ঝিকিমিকি। কাজরীর মনে এক বিচিত্র খুশির সুর। বলে সে, ওরা বেশ আছে না? ওই শহরের ছেলে-মেয়ে মানুষগুলো?

কাজরীর কথায় সায় দেয় মদন। সে বলে, তা সত্যি। ঐ জনমনিষ্যিহীন থানে মানুষ কি করে যে থাকে।

কাজরী বলে, বাবাকে কত বলি শহরে চলো। তা কে শোনে কার কথা।

মদন দেখছে কাজরীকে। কাজরীর চোখে এখন এক নতুন জীবনের স্বপ্ন। আজ কাজরী পাশে মদনকে পেয়েছে যাকে তার মনের কথা বলে কিছুটা হাল্কা হতে পারে।

ওদের এই মেলামেশার খবর ভূষণ জানে না। সে ব্যস্ত তার বাগান নিয়ে। সেদিন বাগানের মালিক মির্জা সাহেবের নাতি নিজে এসেছিলেন গাড়িতে করে। মির্জা সাহেব আর বেঁচে নেই। এখন নাতিই মালিক।

ভূষণ বলে, কাজরী, মালিক আসবেন। চাটা দিবি, বহুৎ বড় খানদানের মানুষ। নবাবের বংশ রে। ঠিকমতো খাতিরদারী করতে হবে।

নাতি সাহেব এসেছেন দামী গাড়িতে ধুলো উড়িয়ে। প্যান্ট-কোট পরা—একেবারে সাহেব। সঙ্গে সদরের কোন এক ব্যবসায়ী। ভূষণ ডাবের জল দেয়। কোনোমতে খেয়ে বাগানের চারপাশ ঘুরে দেখেন, ভূষণ এর মধ্যে নতুন ঝুড়িতে করে আশশেওড়ার পাতার আস্তর দিয়ে তাতে মাল-ই-আনজাম, রানীপসন্দ—এসব আম সাজিয়ে গাড়িতে তুলে দেয়। নাতি সাহেব বলেন, অ্যালফ্যান্‌সো নাই?

ভূষণ বলে, এই মুর্শিদাবাদের সেরা খানদানী আম সাহেব। রানীপসন্দ।

নাতি সাহেবের ওসব জানাও নেই। ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলতে বলতে গাড়িতে উঠে চলে গেল। ভূষণ হতাশ হয়। সে চেয়েছিল বাগান দেখাতে, গাছ দেখাতে, খানদানী আম চেনাতে, কিন্তু ওসবে নাতি সাহেবের কোনো আগ্রহই নেই। তার গাড়ি আবার মাঠের পথে ধুলো রাশ উড়িয়ে চলে গেল।

ভূষণ অবাক। কাজরীও এদিকেই ছিল। বলে ভূষণ, ই কি রে। এ্যাঁ—রানীপসন্দের কদর দিতে জানে না? ফিরেও চাইলো না।

কাজরী বলে, শহুরে মানুষ। ওঁদের কাছে রানীপসন্দের দাম কি বাবা? তার চেয়ে দামী অনেক জিনিস ওঁদের হাতের মুঠোয়। তাই এসবের দাম তাদের কাছে নাই।

ভূষণ বলে, না রে। এর দাম বুঝতেন ওঁর দাদু, বড় মির্জা সাহেব।

এখন আমের হাটের দিকে বাগানওয়ালাদের চেয়ে থাকতে হয় না। গাছের মুকুল আসার সময় থেকেই মহাজনরা বের হয়। মুকুল দেখেই বাগানের দর দেয়। গরীব চাষী জানে মুকুল থেকে গুটি, গুটি থেকে আম, সেই কচি আম থেকে পুরুষ্টু আম, তার থেকে পাকা আম, এই পর্যায়ে আসতে অনেক বিপদ আছে। কুয়াশাতে জ্বলে যাবে, বৃষ্টিতে ঝরে যাবে, বৃষ্টি সময়ে না হলেও ঝরে যাবে। তারপর শোষক পোকা, ঝড়—মায় চুরি নানা হ্যাপা সামলে এরকম সিকি আম পাকার অবস্থা অবধি থাকতে পারে। তাই মুকুলেই বিক্রি করে দেয় চাষী। মহাজন মুকুল থেকে গুটিতে, গুটি থেকে আমে পরিণত হলে আবার অন্যজনকে বিক্রি করে লাভ রেখে।

ভূষণ এসবে নেই। মির্জা সাহেবের আমল থেকে তাদের রীতি আমই হবে। তারপর খাওয়া—বিক্রি করা। ভূষণ তাই করে। মদনরা এখন বাগানে টুসি আম পাড়ে দিনভোর। লগির ডগে দড়ি খাঁচা মত করা, আম মাটিতে পড়লে বিস্বাদ হয়ে যাবে, ফেটে যাবে তাই ওই দড়ির খাঁচায় পাড়া হয়।

প্রথমে গোলাপখাস, বোম্বাই আমে রং ধরে, তারপর রং ধরে সাদুল্লায়। কলকাতায় একে বলে হিমসাগর। ওই সঙ্গে নামবে রানীপসন্দ, নবাবপসন্দ, বিমলি, মাল-ই-আনজাম। এদের পর রং ধরবে ল্যাংড়ায়। জিবে দিলে গলে যাবে, তেমনি খোসবু উঠবে। এখন বাগান প্রায় শেষ। গ্রীষ্মের পর প্রথম বর্ষা আসবে, আকাশে দেখা দেবে কালো মেঘের দল, পাটক্ষেত তখন লকলকিয়ে উঠবে। এবার তৈরি হবে ফজলি, গোপালভোগ, বিরাট আকারের মোহনভোগ। শুরু হবে রথের মেলা। বৃষ্টি নামবে আমবাগানে। শেষ হবে এক বছরের মতো আমের উৎসব।

এবার আমের ব্যবসাতে ভালোই রোজগার করেছে ভূষণ। বাগানের বন্দোবস্ত বাবদ মালিকের টাকা মিটিয়ে দিয়েও এবার হাতে বেশ কয়েক হাজার টাকা রয়েছে। ভূষণ চায় বাগানের ওদিকে আর বিঘে দুয়েক জমি কিনে ওখানেও নতুন ধরনের আমগাছ লাগাবে।

আম্রপালি—আর দু'এক ধরনের গাছ-এর কলম হয়েছে। চার বছরেই ফসল দেয়, বারোমেসে আমও হয়েছে। নতুন বাগান করবে।

কিন্তু কাজরী বলে, এবার শহরে বাড়ি করো, বাগান যেমন আছে, থাক। আমরা শহরেই থাকবো। ইখানে বনবাসে থাকা পছন্দ নয় বাপ।

ভূষণ বলে, সেখানে সবুজ গাছগাছালি, পাখির ডাক, মৌমাছির সুর, ফুলের বাস ইসব নাইরে। বড্ড ভিড়। তাছাড়া ইখানেই রয়েছে আমার ধম্মবাপ ওই আলি সাহেব। তোর মা। তাদের ছোঁয়া মাটি। আমিও থাকবো ইখানেই। তুইও।

কাজরী গুম হয়ে বসে উনুনে কাঠ ঠেলে। ডালটা টগবগিয়ে ফুটছে তার মনের উত্তপ্ত বাসনার মতোই। ভূষণের সেদিকে নজর নেই। সে হুঁকো টানছে, আর আপনমনে বলে চলে, ইবার গুরুর নাম নে জোড়কলম বেঁধেছি। রানীপসন্দ আর ল্যাংড়া মিলিয়ে। রানী আর ল্যাংড়া।

কাজরী বলে, রানীর সঙ্গে ল্যাংড়া! যা মানাবে না!

ওর কণ্ঠে তীব্র ব্যঙ্গের সুরটা কানে আসে না ভূষণের। সে বলে, দেখবি দানাও বড় হবে। রানীর সোনার রং, মিষ্টত্ব আর ল্যাংড়ার খোসবু মিশে যা আম হবে—বাজারের সেরা। কি নাম দেব জানিস! নামও ঠিক করেছি, কাজরী।

কাজরী ফুঁসে ওঠে, থাক। আর আম হয়ে রোদে-জলে গাছে ঝুলে অন্যের ভোগে লাগতে রাজী নই।

হাসে ভূষণ, নারে। এক ডাকে সবাই চিনবে। এখনও চেনে বলাগড়ের চাটুয্যে মশায়কে। নিজে জোড়কলম বেঁধে আমের নাম দিয়েছিলেন চাটুয্যে মশায়। এখনও সে আমের কদর সারা হুগলী মুলুকে।

কাজরী বেশ বুঝেছে তার বাবা এই বাগান, এই আমের স্বপ্ন ছেড়ে কোথাও যাবে না। এই নির্জন বনবাসেই লোকটা পড়ে থাকবে ওই মুকুলের স্বপ্ন নিয়ে। ওকে এই মাটির বুক থেকে কোনোমতেই নড়ানো যাবে না।

এখন বাগান পাহারার কাজ নেই। বর্ষার মেঘ জমেছে আকাশে। কিছু পাট, ওদিকের তাড়া জমিতে আউস ধান লাগিয়েছে। সব্জীও করেছ ভূষণ। আর বর্ষার সময়ই ব্যস্ত থাকে সে আমের কলম বানতে। তাজা দু'রকম গাছের ডাল কেটে সাবধানে জোড় মিলিয়ে সার-ওষুধ-গোবর ইত্যাদি দিয়ে পাটের ফেঁসো জড়িয়ে হাপরে রাখে। ক্রমশ দুই ভিন্নধর্মী গাছের মিলনে তৈরি হয় ভবিষ্যতের অমৃতবৃক্ষ। কত ফল দেবে—চাষীকে অন্ন দেবে, ছায়া দেবে, মরে গেলেও কাণ্ডটাতে অনেক কাজ হবে। ওরাই মানুষের প্রকৃত বন্ধু, আদিমকাল থেকে সভ্যতার ইতিহাস রচনা করেছে। মৃত্তিকার বুক থেকে তিলে তিলে রস আহরণ করে মানুষ সমাজকে বাঁচিয়ে এসেছে নিঃস্বার্থভাবে পরম বন্ধু মতোই।

মদন এখন মাঠে । নৈহাটির কথা মনে পড়ে। জুটমিলে কাজ করতো, শেডে উড়তো পাটের ফেঁসো, ধুলো। তবু কাজের শেষে সেজেগুজে শহরে বের হতো কেষ্ট, গদাই, বিশ্বনাথদের সঙ্গে। নোটনদার চায়ের দোকানে বসে রাজা-উজীর মারতো, কখনও সিনেমা দেখে গঙ্গার ধারে বসে নিজেদের কেউ সলমান খান, শাহরুখ খান ভেবে নায়িকার সন্ধান করতো। ঘাটের ধারে কালোর চায়ের দোকানের পিছনে বসে চুল্লুও খেতো মাঝে মাঝে। মেজাজটা রঙিন হয়ে উঠতো। তারপর সব কেমন ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল, মিলও বন্ধ হয়ে গেল।

তবু মদন ভেবেছিল ফেরিঘাটের ধারে একটা গুমটির দোকান দেবে। সব ঠিকও হয়ে গেছলো। কিন্তু ভেস্তে গেল ওই কেষ্টার জন্যে। কেষ্টা ছেনতাই করতে গিয়ে ধরা পড়তে পুলিশ তাদের পিছনে পড়লো। মদন ওসব ঝামেলা থেকে বাঁচার জন্যই কেটে পড়েছিল। তারপর বানে ভাসা খড়কুটোর মতো ভাসতে ভাসতে এই ঘাটে এসে ঠেকেছিল।

এখন এই নির্জন বনবাসে ঝুপড়ি ঘরে বসে বর্ষানামা সন্ধ্যায় তার মন যেন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। গাছে পাতায় বৃষ্টির শব্দ। ব্যাঙগুলো ডাকছে বিশ্রী কর্কশ স্বরে। মনে হয় মদনের, সে যেন আদিম অন্ধকারে হারিয়ে গেছে। এখানে কোনো আলোর ছোঁয়া নেই, আসা নেই।

কিছুদিন ধরে মদন দেখছে কাজরীকে। মেয়েটা সহজ ভাবেই তার দিকে এগিয়ে এসেছিল। নির্জন বনবাসে সেও ক্লান্ত। একটা বয়সে মন চায় নিজেকে অন্যের কাছে মেলে ধরতে। কাজরী তাই নিজেকে মেলে ধরার জন্যই এগিয়ে এসেছিল মদনের দিকে। নিঃসঙ্গ মদনও সাড়া দিয়েছিল। এই বনবসত ছেড়ে আলোভরা শহরের কোলাহলে, দু'দনে দু'জনকে ঘিরে স্বপ্ন দেখেছিল।

কিন্তু মদনের সম্বল এমন কিছুই নেই যে তার স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করতে পারে। ভেবেছিল কাজরীর কাছে নিজের ব্যর্থতা, অক্ষমতা ঢাকার জন্যই তাকে চলে যেতে হবে এখান থেকে তা সে যেখানেই হোক। এতদিনে পুলিশ নিশ্চয়ই তার কথা ভুলে গেছে। তাছাড়া সে তো কোনো অপরাধ করেনি। তাই ওখানে ফিরে যাবে। চেনা জায়গা—চেনাজানা লোক কিছু আছে। সেখানেই সে বাঁচার চেষ্টা করবে।

ওই বৃষ্টির মধ্যেই কাকে এসে ঝুপড়িতে ঢুকতে দেখে চাইলো মদন। গায়ের গন্ধটা ওর চেনা। টেমির আলোয় দেখে সে কাজরীকে।

তুমি!

কাজরী মনস্থির করে ফেলেছে। এই বনবাসে কিছুতেই আর সে থাকবে না। তাই সে তৈরি হয়েই এসেছে। বলে সে মদনকে, এখান থেকে কোথায় নিয়ে যাবে বলেছিলে, চলো সেখানেই যাই।

অবাক হয় মদন—কি বলছ তুমি?

কাজরী বুঝেছে বাবা তাকে এই বনবাসেতেই বন্দী করে রাখবে। তার জীবনের আশা-স্বপ্নকে সে ব্যর্থ হতে দেবে না। আজ তাই কাজরী বলে, তুমি আমাকে বাঁচাও মদনদা, এখানে পড়ে থাকলে ওই গাছে গলায় দড়ি দিয়েই নিজেকে শেষ করতে হবে। বাঁচার অবলম্বন যা বাবার কাছে, আমার কাছে তা মরণফাঁদ। বাঁচাও আমাকে।

মদনও মুক্তি চায় এখান থেকে। সেই মুক্তির ডাকই এসেছে। তবু বলে সে, কিন্তু।

কাজরী জানে ওর এই দ্বিধার কারণটা। তাই সে বলে, খরচের জন্য ভেব না। বাবা ঘুমুলে তার সব জমানো টাকা, গহনা নিয়েই এসেছি। আর ফিরে যাব না।

মদন এদিক-ওদিক চাইলো। অতল অন্ধকার, বৃষ্টি চলছে। ওরা ছায়া অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

ভূষণ চারিদিকে খোঁজখবর করেও কোনো হদিস পায় না মেয়ের। মদনকেও পাওয়া গেল না। ক'দিনেই ভূষণের চেহারাটা যেন ধসে পড়েছে। সব বিশ্বাসই হারিয়ে গেছে তার। এই বাগান, এই গাছগাছালি, ওই সবুজ—সব যেনবিবর্ণ হয়ে গেছে তার সামনে।

পাশের বাগানের নুটু বলে, আর ইসবে কি হবে গো ভূষণ দাদা! সবই তো চলে যাচ্ছে। সবাই ইবার হারিয়ে যাবে ওই কাজরীর মতোই। ই বাগান—রানীপসন্দের বাগান সবই লোপাট হয়ে ইখানে মির্জা সাহেবের নাতি আর শহরের কোঠারী মাড়োয়ারী পাটকল বানাবে।

—সেকি! চমকে ওঠে ভূষণ। বলে, আলিসাহেবের বাগান—

কিন্তু যা হবার তাই হয়। কয়েকদিনের মধ্যে ওই সাত বিঘের বাগান, পাশে নুটুর পাঁচ বিঘের বাগান সবই কেটে সাফ করে ওরা। ওদিকে ঝাঁকড়া সবুজ রানীপসন্দের আমগাছটাও আর্তনাদ করে ছিটকে পড়ে। এখন সব শূন্য মাঠ। ট্রাকবন্দী ইট পাথর বালি পড়ছে। পাটকল হবে।

একালের রাজা-রানীদের পছন্দই আলাদা। সেই পছন্দের জন্যই ভূষণদের সবুজ পৃথিবীও হারিয়ে যায়। হারিয়ে যায় সব আশা, স্বপ্নও।

বাধার প্রাচীর

আজকের সকালটা বেশ ঝলমলে রোদ উঠেছে বেশ ক'দিন পর। অনিমেষ দরজা খুলে এসে, ব্যালকনিতে দাঁড়ায়। নামেই ব্যালকনি। এক চিলতে বারান্দা মত। চার ফিট বাই দশ ফিট একটু ফাঙ্গি। প্রমোটারের তৈরি ফ্ল্যাট, প্রতিটি ইঞ্চি এর মাপা—একচুল এদিক ওদিক হবার উপায় নেই।

মহাভাগ্য যে ফ্ল্যাটবাড়িটার দক্ষিণে একটা পার্ক মত। কলকাতার পার্ক নামেই পার্ক। সাজানো গোছানোর জন্য লোকও আছে। তবে সে পার্কের মধ্যে একটা ঘরে থাকে আর পার্কের কাজ না করে বাইরে কোথায় কাজ করে। ফলে পার্কে কয়েকটি পুরোনো সোনাঝুরি, আকাশমণি—কয়েকটা পিটুলিগাছই রয়ে গেছে। তবু কিছুটা সবুজের ছোঁয়া আছে তাই অনিমেষের কাছে প্রমোটার একটু বেশি দামই নিয়েছে।

তবু শীলা ফ্ল্যাটটা দেখে খুশিই হয়েছিল।

বাহ্, দক্ষিণ খোলা, পার্কেও ঘোরা যাবে। এটাই নাও।

অনিমেষ ব্যাঙ্কের কর্মচারী, মাইনেও মোটামুটি ভালোই পায়, তাই এ বাজারে ঘর বেঁধেছে। আর শীলাও কোন একটা মেয়েদের স্কুলের টিচার, তারও নিজের রোজগার আছে। তবু অনিমেষ স্ত্রীর পয়সা নিতে চায় না। নিজের জমানো কিছু টাকা আর ব্যাঙ্কের থেকে লোন নিয়েই ফ্ল্যাটটা কিনেছিল ঝোঁকের বশে।

মোটা টাকা মাসে মাসে কাটছে মাইনে থেকে—দুজনের সংসার, শীলাও জানে অনিমেষের মাইনে অনেক কমে গেছে।

শীলা বলে—খরচা কমাও।

অর্থাৎ অনিমেষের ট্যাক্সি—দামী সিগ্রেটও ছাড়তে হয়।

অফিসের সহকর্মীরা দেখেছে এতদিন অনিমেষ ফাইভ ফিফটি ফাইভ সিগ্রেট খেয়েছে, এখন ধরেছে গোল্ড ফ্লেক, ক্যানটিনে তার ঢালাও বন্ধুসৎকারও কমে গেছে।

বন্ধুরা বলে—ঘর বেঁধে যে হিসাবী হয়ে উঠলি অনিমেষ, গিন্নী খুব টাইট দিচ্ছে বুঝি।

শীলা অবশ্য নিজের নিয়েই থাকে। অনিমেষ বিয়ে করেছে, শীলার বাবা মায়ের আগ্রহেই। কিন্তু শীলার দিক থেকে তেমন সাড়া পায়নি অনিমেষ, অথচ শীলার ব্যবহারে কাঠিন্য-অসহিষ্ণুতা কিছুই দেখেনি।

সকালে শীলার স্কুল—স্কুলটা এই ফ্ল্যাট থেকে একটু বেপট জায়গায়। এখান থেকে বাস রাস্তা একটু হেঁটে পার্ক পার হয়ে যেতে হয়, বাসে করে পাইকপাড়া—সেখান থেকে আট দশ মিনিট হেঁটে যেতে হয় তার স্কুলে।

তাই সকালবেলাতেই বের হতে হয় শীলাকে। অনিমেষ তখন বিছানাতে, শীলা বেডটি দিয়ে ওর জামা কাপড় গোছগাছ করে নিজে কিছু খেয়ে নিয়ে বের হয়ে যায়। ফেরে বেলা বারোটা নাগাদ। অনিমেষ তখন অফিসে।

শীলা সন্ধ্যায় এদিকেই কোথায় দুটো মেয়েকে পড়িয়ে বাড়ি ফেরে রাত ন'টা নাগাদ। রাতটুকুই দুজনে বাড়িতে থাকে—দিনভোর দুজনে দুদিকে।

ছুটি-ছাটার দিনটা কিছু আলাদা মাত্র।

অনিমেষ আজ সকালে উঠে ব্যালকনিতে দাঁড়ায়।

ক'দিন গোমড়ামুখো হয়ে ছিল আকাশটা। বৃষ্টি হয়েছে যখন তখন। আজ মেঘ কেটে ঝলমলে রোদ উঠেছে। অনিমেষের আজ ছুটি—শীলাকেও বলেছে ছুটি নিতে, দুজনে এই ঝলমলে রোদে কোথাও বের হবে। বাইরেই কোথাও খেয়ে নেবে। কিন্তু শীলা বলে—আজ ক্লাশের পরীক্ষা ছুটি নিই কি করে, দুপুরে স্কুল কমিটির মিটিং, থাকতেই হবে।

অর্থাৎ অনিমেষের দাবীর চেয়ে, ওই কাজের দাবীগুলোই তার কাছে জোরদার। শীলা চলে গেছে।

কেমন একটা নীরব ব্যবধান রেখেই চলে শীলা। দেড়বছর হল বিয়ে হয়েছে তাদের, অনিমেষ শীলার সুবিধার জন্যই বারোয়ারি ভাড়াবাড়ি ছেড়ে নিজে মোটা অঙ্কের ঋণ মাথায় নিয়ে ফ্ল্যাটটা কিনেছে, কিন্তু শীলার মনে খুশি আনতে পারেনি।

স্বামীরও স্ত্রীর কাছে কিছু দাবী থাকে, হয়তো সামাজিক অধিকারে সেই দাবী গড়ে ওঠে। স্ত্রীরও কিছু কর্তব্য থাকে স্বামীর প্রতি। অনিমেষ যখনই এগিয়ে গেছে শীলার দিকে—দেখেছে অনিমেষ শীলা আহ্বানে কোন সাড়াতো দেয়ইনি, বরং এড়িয়ে গেছে তাকে নানা অজুহাতে।

এমন ভাব দেখায় যাতে মনে হয় শীলা তার স্ত্রী নয়। অনিমেষ যেন সম্পূর্ণ অচেনা একজন পুরুষ।

মাঝে মাঝে অনিমেষের মনে হয় শীলা বোধ হয় এখানে এসে খুশি হয় নি। কিন্তু নিজের পায়ে দাঁড়াতে পেরেছে শীলা—লেখাপড়াও জানে, বাইরের জগতকে দেখেছেও। তবে এই বিয়েটাকে অপছন্দ জেনেও মেনে নিল কেন?

বেলা বাড়ছে, আকাশ এখনও পরিষ্কার। বর্ষার কালো মেঘ দু একটা ভেসে বেড়াচ্ছে, তার ফাঁকে নীল আকাশ ঝলমলে রোদও দেখা যায়। শীলাকে মনে হয় অমনি নীল আকাশ—যার প্রকাশে বাধা দেয় ওই কালো মেঘের দল। ওর মনের আড়ালের খবরও জানে না অনিমেষ।

কোথায় যাবে ভাবছে অনিমেষ। ভেবেছিল শীলা সঙ্গে থাকবে, বাইরে দুজনে মিলে ঘুরবে একটা দিন মুক্ত বিহঙ্গের মত। কিন্তু তা হয় নি। তাই দিনটা কেমন লম্বা বোধ হয়, এ গুমোটটা কাটাতে হবে একা। অন্য দিন অফিসের কাজে দিন কেটে যায়—টের পায় না। আজ শীলার জন্যই তার আনন্দের দিনটাই মাটি হয়ে যায়। স্কুল-ক্লাশ-মিটিং—শীলা যেন তাদের দুজনের মধ্যে একটা পাঁচিলই গড়ে রেখেছে।

অনিমেষের মনে পড়ে ওই পাঁচিলের কথা।

কালো শেওলা পড়া বিশাল উঁচু প্রাচীর ঘেরা একটা বিস্তীর্ণ এলাকা ছিল তাদের মফঃস্বল শহরে। তার বাইরে তাদের খেলার মাঠ। মফঃস্বল শহরে তখনও জনসমুদ্রের প্লাবন নামেনি। শহরটা ছিল ফাঁকা, ওদিকে ছিল বিস্তীর্ণ মাঠ—কালকাসিন্দে, তেলাকচু বন, খেজুরের ঝোপভরা মাঠ, তার পাশই ওই বিশাল প্রাচীর ঘেরা এলাকা—ভারি লোহার পাত বসানো দরজাটাও ছিল বন্ধ। বড় তালা একটা ঝুলতো—কিন্তু ওই রহস্যপুরীর তালার চাবি কার কাছে আছে কেউ জানতো না। বাইরে থেকে ওই রহস্যময় জগতের বিশেষ কিছুই দেখা যেত না—মাঝে মাঝে দু চারটে বট অশত্থ-জারুল গাছের মাথা দেখা যেত।

অনিমেষদের ভয় লাগতো সন্ধ্যার অন্ধকারে।

ওই প্রাচীরের আড়ালে কি আছে—তা ও অজানা।

আজ শীলাকেও অমনি প্রাচীর ঘেরা রহস্য মনে হয়। তার সম্বন্ধে নানা ভাবনা, কল্পনা রয়ে গেছে। অনিমেষ এতদিন আনন্দেই ছিল একা একা। একটা হোটেলে থাকতো, বন্ধু বান্ধব আর অফিস—নাটকের ক্লাব নিয়ে সময় কেটে যেত।

নাটকের ক্লাবেই দেখা হয় শীলার সঙ্গে। শীলাও ছোটখাটো চরিত্রে অভিনয় করে, সেদিন রিহার্সালের মধ্যেই বৃষ্টি নামে। একেবারে আকাশভাঙা বৃষ্টি। কিছুক্ষণের মধ্যেই পথে বান ডাকে, বাসগুলোও যেন বৃষ্টির ভয়ে রাস্তা থেকে পালিয়ে যায়, ট্রামতো আগেই গেছে।

বাড়ি ফিরতে হবে। ডিরেক্টার দুলালের কিছুটা দায়িত্ব রয়ে গেছে। অন্য মেয়েদের বাড়ি কাছাকাছি, তারা চলে যায়। শীলাকে যেতে হবে পাইকপাড়ায়, হাতিবাগান থেকে পাইকপাড়া তখন অনেক দূরের পথ, আর গাড়িও নেই।

অনিমেষ তখন ওদিকেই থাকে। দুলাল বলে,—তুই শীলাকে পৌঁছে দে।

বৃষ্টি তখনও টিপটিপ করে পড়ছে, পথে জল—পাইকপাড়াতে তো হাঁটু জল জমেছে। একটা রিক্সাকে কোন মতে বেশী টাকায় রাজী করে বের হল তাই ওই রিক্সায় কোনমতে।

বৃষ্টিতে ভিজে অনেক রাতে শীলাকে বাড়ি পৌঁছে দেয় অনিমেষ। তারপর থেকেই পরিচয়টা ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। অনিমেষও যায় ওদের বাড়িতে ছুটি-ছাটার দিন। শীলার বাবা-মাও তাকে পছন্দ করে। ক্রমশ তারাও অনিমেষের সম্বন্ধে খোঁজ খবর নিয়ে কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়েই বিয়ের কথা পাড়ে।

শীলা প্রথমে মত দেয়নি। তার ভবিষ্যৎ নিয়ে ওদের বিব্রত হতে দেখে শেষে নিমরাজী হয় শীলা। যেন নিজের জন্য নয়—বাবা মাকে খুশী করার জন্যেই বিয়ে করছে সে।

অনিমেষ জানতো না শীলার এই অনীহার কারণ। শীলাও সেটা জানাবার চেষ্টা করে নি। কেমন এড়িয়ে গেছে বার বার।

দেড় বছর ধরে শীলা যেন স্বামী স্ত্রীর নাটকেমুখ বুজে স্ত্রীর অভিনয় করে গেছে মাত্র। অনিমেষ অনেক আশা নিয়ে তার বাইরের জীবন ছেড়ে ঘরের ঠিকানায় এসেছিল। কিন্তু আজ মনে হয় অনিমেষের কোথায় যেন ভুল করেছে সে। শীলাকে চিনতে পারে নি, শীলা যেন শুধুমাত্র জীবনের মঞ্চে স্ত্রীর ভূমিকায় অভিনয়ই করে চলেছে।

বেলা বাড়ছে। ফ্ল্যাটের ডুপ্লিকেট চাবি থাকে শীলার কাছেও। তাদের আসা যাওয়ার ঠিক নেই—তাই যে যখন আসে ফ্ল্যাটে ঢোকবার অসুবিধা হয় না।

অনিমেষ স্নান করে একাই বের হয়ে যায়, কোথায় যাবে জানে না। শীলা আজ তার এমনি দিনটাকে ব্যর্থ করে দিয়েছে।

* * *

শীলা যেন নিজের সঙ্গেই লুকোচুরি খেলে চলেছে।

বিয়ের আগে শীলা ভেবেছিল আর একজনের কথা। জীবনে তাকে ঘিরেই শীলার মানস মুকুল ফুটে উঠেছিল। সারা মনে ছিল তারই ভাবনা। কিন্তু সেদিন সেই ছেলেটি ছিল বেকার, নাটক নিয়েই পড়ে থাকতো সেই দুলাল।

পড়াশোনাতেও ছিল ভাল ছাত্র। অভিনয় করাটা ছিল তার রক্তে, আর নাটকও লিখতো। নিজের নাটক নিয়েই কিছু ছেলেমেয়ে একত্রিত করে নাটক করতো।

শীলাও এসেছিল ওই দলে দুলালের জন্যই।

বাস্তব ক্ষেত্রে পাত্র হিসাবে দুলালের চেয়ে অনিমেষ অনেক দামী। তাই মেয়ের মা বাবা তাকেই পছন্দ করেছিল। দুলাল খবরটা শুনে চমকে উঠেছিল।

ভেবেছিল শীলাও তাই চায়। দুলাল সেই বুঝেই সব ছেড়ে বোম্বাইয়ে ওর এক আত্মীয়ের ওখানে চলে গেছিল। শীলা ভাবতে পারেনি যে দুলালের প্রেম এত ঠুনকো, কিছু না জেনেই এভাবে চলে গেল।

হয়তো অভিমান ভরেই শীলা এই নিশ্চিন্ত জীবনের ডাকে সাড়া দিয়েছিল। মত দিয়েছিল বিয়েতে। শীলাও চেষ্টা করেছিল দুলালকে ভুলতে।

কিন্তু ওদের বিয়ের কিছুদিন পরই দুলাল ফিরে আসে। শীলা তখন ও পাড়াতে আর নেই। লেকটাউনের দিকে সাজানো এলাকার নতুন ফ্ল্যাটে ঘর বেঁধেছে, তবে স্কুলের চাকরিটা ছাড়েনি।

স্কুল থেকে বের হচ্ছে সেদিন শীলা—হঠাৎ একটা গাড়িকে থামতে দেখে চাইল। দুলাল নেমে আসে। ক'মাস পর দেখা। চেহারাটা এখন বেশ ভালোই হয়েছে দুলালের। আগেকার সেই এ্যাংরি ইয়ং ম্যানদের মত চোয়াড়ে ধরনের আর নয়, পরনে দামী পোশাক—

শীলা চমকে ওঠে—দুলাল!

দুলাল বলে—যাক-ভোলোনি তাহলে। উঠে এসো—

শীলা দেখছে স্কুলের মেয়েরা ছুটির পর বের হয়েছে। ওদের নজর এড়াবার জন্যই গাড়িতে ওঠে।

দুপুরটা কোনদিকে কেটে যায়, জানে না শীলা।

কত দিন পর দুলালকে দেখছে। দুলাল এখন একেবারে বদলে গেছে। বোম্বেতে সেই আত্মীয়ের চেষ্টায় একটা বড় কোম্পানিতে চাকরি পেয়ে যায়। এখন তাদেরই কলকাতার অফিসে বদলি হয়ে এসেছে।

শীলা খুশী হয়—তাহলে ভালো চাকরী করছো।

দুলাল ওকে নিয়ে যায় পার্ক স্ট্রীট এলাকার বড় রেস্তোরাঁয়। সেখানে তখনও ভিড় জমেনি। মেঝেতে কার্পেটের নরম ছোঁয়া। হলের এক কোণে নিরিবিলি দেখে একটা টেবিলে বসেছে তারা দুজনে।

হালকা মিউজিক-এর সুর ওঠে।

হাসে শীলা—এবার বিয়ে থা কর—

দুলাল চাইল ওর দিকে। শীলার হাতটা ওর হাতে। শীলাও আজ প্রতিবাদ করে না। ও যেন সারা মন দিয়ে এমনি মুহূর্তগুলোর স্বপ্নই দেখেছিল।

দুলাল বলে—বিয়ে তো আমার হয়ে গেছে।—অবশ্য মনে মনে তবে সে এখন অন্য ঘরে। কিন্তু আমার মনে তার নিত্য আনাগোনা। পরণে ঢাকাই শাড়ি, কপালে সিঁদুর?

চমকে ওঠে শীলা। আজ তার পরণে একটা ঢাকাই শাড়ি, সিঁথিতে সিঁদুরও দিতে হয়। লোকাচার হিসাবে। সেটা যে দুলালের কাছে এইভাবে ফুটে উঠবে তা ভাবেনি।

দুলাল বলে, তোমার পথ চেয়েই তো আছি শীলা।

শীলার সারা মনে বিচিত্র একটি সুর গুণগুনিয়ে ওঠে। মনে হয় শীলার কিছুই তার হারায়নি, সবই রয়ে গেছে। দুলালের মনে আজও তার ঠাঁই তেমনিই রয়েছে। দুলাল তার নারীত্বকে এক নতুন স্বীকৃতি দিয়েছে তার প্রতীক্ষার মাধ্যমে, যা অনিমেষ পারেনি।

পার্ক স্ট্রীট থেকে বের হয়ে শীলা এসেছে দুলালের ফ্ল্যাটে। ওই পাড়াতেই তার কোম্পানি থেকে সাজানো ফ্ল্যাট দিয়েছে। ফার্নিচারগুলোও দামী, মেঝেতে কার্পেট পাতা—হাইরাইজ বিলডিংটাও বেশ ঝকঝকে তকতকে। ওদিকে কালার টিভি, ফ্রিজ, ফোন সবকিছুই রয়েছে।

এসবের তুলনায় অনিমেষের এক চিলতে ফ্ল্যাটটার দৈন্যদশার কথাই মনে পড়ে।

বৈকাল নামে। শীলা বলে,—এবার ফিরতে হবে।

দুলাল জানায়—ফিরে যাবে তাহলে, আমার প্রতীক্ষার পালা চলবে এখনও?

চমকে ওঠে শীলা ওই কথা শুনে জবাব দিল না। দুলাল এ নিয়ে আর কথা বাড়ায় না। বলে—চল, তোমায় পৌঁছে দিয়ে আসি। তোমার আস্তানাটাও দেখা হবে।

শীলা বলে—একটা ট্যাক্সি নিয়ে চলে যাব।

দুলাল ছাড়ে না। নিজেই লাল মারুতিটা নিয়ে বের হল শীলাকে পৌঁছে দিতে।

শীলার মনে হয় অনিমেষ যদি ফিরে আসে তাহলে জবাবটা কি দেবে। কিন্তু নিশ্চিন্ত হয়। অনিমেষ ফেরেনি।

দুলাল এসে ওঠে ওদের বাড়িতে। বলে অনিমেষটা তাহলে ঘর বাঁধার চেষ্টা করছে।

* * *

শীলা বার বার কথাটা ভেবেছে।

এবার একটা সিদ্ধান্ত তাকে নিতেই হবে। দুনৌকোয় পা দিয়ে চলা যাবে না। অনিমেষের কথা মনে পড়ে। ওকে যেন ঠকিয়ে চলেছে সে, আর সেই সঙ্গে নিজেকেও তিলে তিলে বঞ্চিত করেছে, এই বঞ্চনার শেষই করবে সে।

* * *

দুলালের এখানে আসে স্কুলের পর শীলা। এই ফ্ল্যাটের সংসারও যেন তারই। দুলাল সকালে আউটডোরে বের হয়ে বারোটা নাগাদ ফেরে—দুপুরের লাঞ্চ করে দুজনে এখানে—বের হয় দুলাল আবার—বৈকালে শীলাকে নামিয়ে দিয়ে যায় তাদের ফ্ল্যাটের কাছে।

সন্ধ্যার পর শীলার এ যেন আর এক সংসার।

অনিমেষ দেখছে শীলাকে। কেমন যেন আনমনা ফ্যাকাসে। বলে—কি অত ভাবছ?

শীলা যেন নিজের মনের সঙ্গে যুদ্ধ করছে। বলে সে, কই না তো।

ওর এই এড়িয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা এবার অনিমেষের কাছেও স্পষ্ট হয়ে উঠছে। বলে—কি যেন হয়েছে তোমার শীলা?

শীলা একথা আজ চেষ্টা করেও জানাতে পারে না। কিন্তু বেশ জানে শীলা—এই কথা জানাতেই হবে অনিমেষকে। শীলা তার মনস্থির করে ফেলেছে।

অনিমেষ দেখছে শীলাকে—শীলার মনের বঞ্চনার ছায়া যেন ফুটে উঠেছে ওর মুখে—অনিমেষের কাছে শীলা যেন রহস্যই হয়ে উঠেছে।

অনিমেষ চলেছে আজ একাই।

ঝকঝকে রোদ। ওদিকে একটা রেস্তোরাঁয় চাইনীজ খেয়ে এসে পার্কের বেঞ্চে বসে। দুপুর গড়িয়ে বৈকাল নামছে, পার্ক এখনও ফাঁকা।

ওদিকে দেখা যায় একটা লাল মারুতি এসে থামে তাদের বাড়ির সামনে। অনিমেষ এমন কিছু বিস্মিত হয়নি। অনেক গাড়িই থামে—তার গাড়ি নেই, কিন্তু ওই বাড়ির অন্য ফ্ল্যাটের অনেক মালিকের গাড়ি আছে।

হঠাৎ ওই গাড়ি থেকে শীলাকে হাসিমুখে নামতে দেখে অবাক হয় অনিমেষ, আরও অবাক হয় গাড়ি থেকে নেমেছে দুলাল।

দুলালকে চেনে অনিমেষ—সেই দুলাল আজ বদলে গেছে, পরনে দামী স্যুট, চেহারাতেও জেল্লা এসেছে। ওরা দুজনে হাসতে হাসতে বাড়িতে ঢুকে গেল। অনিমেষ অবাক হয়। শীলাকে ওভাবে হাসতে সে দেখেনি। খুশিতে যেন উপছে পড়ছে সে।

অনিমেষের সামনে এবার ব্যাপারটা যেন পরিষ্কার হয়। শীলার ওই আনমনা ভাব তাকে এড়িয়ে যাবার কারণগুলো এবার স্বচ্ছ হয়ে ওঠে। মনে হয় শীলা তাকে ঠকিয়ে এসেছে এতদিন—নিজেও একটা ভুল করেছে অনিমেষ। তার স্বপ্ন ভালোবাসা—ঘর বাঁধা সবই ব্যর্থ হয়ে গেছে।

বসেই থাকে অনিমেষ ওই বেঞ্চে। উঠে নিজের ঘরে ফেরার ইচ্ছাটাও যেন নেই। তখনও লাল গাড়িটা রয়েছে ওখানে।... সন্ধ্যা নামে। কতক্ষণ বসেছিল পার্কে তা খেয়াল করেনি অনিমেষ। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। আঁধার নামছে। এবার ওঠে অনিমেষ।

শীলা দেখছে অনিমেষকে।

ও যেন নতুন এক অনিমেষ। তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলে অনিমেষ—

—অভিসার শেষ হল? দুলাল চলে গেল?

চমকে ওঠে শীলা। আজ তার এতদিনের স্বপ্নটা যেন সত্য হতে চলেছে। শীলাও ভেবেছে বারবার। একদিন কঠিন সত্যের মুখোমুখি তাকে হতেই হবে। শীলা বলে স্থির কণ্ঠে। —এবার আমিই চলে যাব দুলালের কাছে।

—শীলা!

শীলা বলে—তুমি ডাইভোর্স চাইতে পারো, বাধা দেব না। মনে হয় আমার এখানে আর না থাকাই ভালো। নিজেকে ঠকাতে আর চাই না—তোমাকেও মুক্তি দিতে চাই।

অনিমেষ দেখছে শীলাকে—মনে পড়ে সেই ছেলেবেলার দেখা সেই রহস্যময় পাঁচিলটা পরে ভেঙে পড়েছিল—তার ভিতর কিছুই ছিল না, ছিল শূন্য জমি-ঝোপ ঝাড়ে ভরা, কিছু ময়লা পচা জল ভরা খানা খন্দ।

শীলা আর তার মাঝে এতদিনের সেই দেওয়ালটা ভেঙে পড়েছে—ওদিকে কোন রহস্যই নেই, আছে শুধু শূন্যতার গ্লানি। অনিমেষ হেরেই গেছে, সব কিছু স্বপ্ন-রহস্যময়তা হারিয়ে গেছে কি অসীম শূন্যতায়।